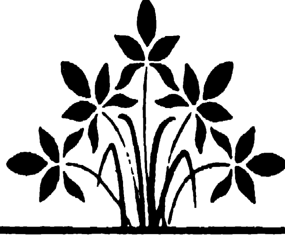
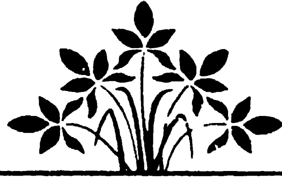


দশটি উপন্যাস



দশটি উপন্যাস

দিব্যেন্দু পালিত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৭ এপ্রিল ১৯৯০

প্রকাশক
গোপা দাশশর্মা
অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা সমিতি
নবার্ক। ৫৮/৪৭ বি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
কলকাতা ৭০০০৪৫

সম্পাদক পর্ষৎ
মুখ্য সম্পাদক : অসীম দাশশর্মা
সদস্যবৃন্দ : তুলসীদাস লাহিড়ী, বৈদ্যনাথ বসু, কাবেরী রায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলী মিত্র, গীতশ্রী চট্টোপাধ্যায়, জয় ঘোষাল, মিতা বসু, অনন্যা ঘোষ।

প্রচ্ছদ
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্ট ম্যাক্স, ইছাপুর, ২৪ পরগণা

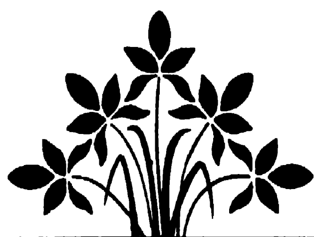
মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

সূচী

এই লেখকের অন্যান্য বই

অনুভব
অন্তর্ধান
উড়োচিঠি
গল্পসমগ্র (১-২)
ঢেউ
বহুদূর অভিমান
মাত্র কয়েকদিন
মৌনমুখর
যখন বৃষ্টি
রজত জয়ন্তী
সেকেন্ড হনিমুন
স্বপ্নের ভিতর
সঙ্গ ও প্রসঙ্গ
সিনেমায় যেমন হয়
হঠাৎ একদিন


দশটি উপন্যাস



সন্ধিক্ষণ

সন্ধিক্ষণ

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর ১৯৭১ (আশ্বিন ১৩৭৮)
প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৪·০০ । প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

উৎসর্গ :
সন্তোষকুমার ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ এক ॥

ভোরের দিকে চলে গেল কনক। কাকপক্ষী জেগে ওঠার আগে, উদাসীন হাওয়া আর রহস্যময় আলোছায়ার মধ্যে, এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমে ঢলে পড়ার মতো—নিঃশব্দে চলে গেল। নৈঃশব্দ্যই তখন একমাত্র ভূমিকা। তারায় ফুটফুটে আকাশ, নিচে ঘুম ; শুধু হাসপাতালের কেবিনের বাইরে ওরা তখনো কোনোক্রমে জেগে চলেছে।

রক্তের মধ্যে ছোট ছোট লাল বীজগুলো ক্রমশ সাদা হবার মুখেই বলে দিয়েছিল ডাক্তার, অসম্ভব। বাঁচবে না। রোগটা খারাপই বলতে হবে—লিউকোমিয়া, দৈবও যাকে ক্ষমা করে না। আর কনক ! সাধারণ, অতি সাধারণ কনক ; দূরত্বময় প্রহেলিকা ছাড়া দৈব তাকে আর কী দেবে !

তবু, টিম নির্ঘাত হেরে যাবে জেনেও একসময় যেমন ওরা গড়িমসি করে মাঠে যেত, রোদ-ঝড় উপেক্ষা করে দাঁড়াত টিকিটের লাইনে, হারতে হারতেও শেষ পর্যন্ত গ্যালারি ছেড়ে নড়তে পারত না—তেমনি, ক্ষয়ে ক্ষয়েও আশাটা জাগিয়ে রেখেছিল বুকের মধ্যে। সামনাসামনি কনককে বলত, 'বাগাপ্' । বল পায়ে যদিও বড়ো দুরূহ কোণে চলে গিয়েছিল কনক।

প্রখর বুদ্ধিমান ছেলে কনক। সে কি জানত না মরে যাবে !

নিশ্চয় জানত।

জানত ওর বাবা মা ভাই বোনেরাও। জানত পৃথিবীসুদ্ধ লোকে। চেনাশোনার মধ্যে থেকে হুট্ করে চলে যাবে একজন, চারিদিকের এই রটনা বহু দিন অপূর্ণ ঝুলে ছিল শুধু দিনক্ষণটির অভাবে !

দিনক্ষণটি না জানার জন্যেই গাঁইগুঁই করতে করতেও লোভীর মতো একদিন কনক চলে আসে হাসপাতালের দামী কেবিনে। ঘাড় থেকে প্যারালিটিক হাতের মতো ঝুলছে দুই আইবুড়ো মেয়ে, তবু, দিনক্ষণটি না জানার জন্যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের শেষ ছায়াটুকু গুটিয়ে নেয় কনকের বাবা ; মা যায় প্রত্যহ কালীঘাটে। দিনক্ষণটি না জানার জন্যে একই রক্ত বিভিন্ন বোতলে গিয়ে গ্রুপ পাল্টায়। রোজ। এইভাবে, একই নিয়মে, দিনক্ষণটির অভাব কিছু ভরসা রেখে দিয়েছিল বুকের মধ্যে। অথচ কনক মারা গেল নির্দিষ্ট সময়টুকু অঘোষিত রেখে।

কেবিনের ভিতর তখন অস্পষ্ট মিহি আলো। কেবিনের বাইরে বারান্দায় বসে নিবন্ত সিগারেট চুষছে অমিয়। নিখিলের কোলে মাথা রেখে, চোখে হাত চাপা দিয়ে মৃত্যুর, যে-কোনো মৃত্যুর, কারণ সম্পর্কে ভাবছে শ্যামল, নিখিল কী বলছে শুনছে না। নিখিল অমিয়কে বলছে, 'বড়ো কাহিল লাগে রে। কাল থেকে ফ্লাস্কে চা আনব—'

'রাত জাগার জন্যে চা ! ক'টা ফ্লাস্ক লাগবে হিসেব করেছিস ?' অমিয় হাত ঢোকাল শ্যামলের ট্রাউজার্সের পকেটে ; ফুসফুসে অনেক ধোঁয়া জমে ওঠার পরও মনে হচ্ছে আরো চাই ; শ্যামল ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, 'দাঁড়া দিচ্ছি ।'

'চায়ে কিস্‌স্যু হয় না ।' দেশলাইয়ের আলোয় অমিয়র মুখটা এক মুহূর্ত ঝলসানো মনে হলো, বলল, 'জেগে থাকার ইচ্ছেটাই ঘুমোতে দিচ্ছে না—'

জমল না । কিছু দিন থেকেই এই ব্যাপারটা মনে হচ্ছে, জমছে না কিছু । কথা, কথার পর কথা, আবার কথা ।

শ্যামল বলল, 'জেগে থাকা কাকে বলে বুঝেছি তোর বিয়ের রাতে । তুমি তো বউ নিয়ে শুলে । বৃষ্টি পড়ছিল, আমরা আটকে পড়লাম । রিয়েল টর্চার ! কনু সারা রাত তোদের খিস্তি করেই কাটিয়ে দিলে—'

হাঃ হাঃ হাঃ, অমিয়র গলার ভিতর ড্রাই হুইলের মতো হাসিটা চক্কর দিয়ে নিল ; চেষ্টা করেও শব্দময় হতে পারল না । নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকার অতর্কিতে ওকে থামিয়ে দিল । মনে পড়ল এটা হাসপাতাল, প্রায় নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে মৃত্যুকে পাহারা দিচ্ছে ওরা ; ঘুমোচ্ছে কনক ।

'জেগে থাকার অভ্যাসটা সবচেয়ে বেশি ছিল কনকের ।' নিখিল বলল, 'হোল নাইট শো থেকে মিউজিক কনফারেন্স কিছুই বাদ দিত না । ব্যাটা অফিসে শুনেছি দুটো থেকে সাড়ে তিনটে ঘুমিয়ে নিত ক্যান্টিনে বসে । নাম্বার ওয়ান ম্যানেজার, টিফিন পিরিয়ডটা বাড়িয়ে আড়াই ঘণ্টা করে নিয়েছিল—'

'আজ ওর মুখ দেখে কী মনে হচ্ছিল জানিস ?'

'কী ?'

'ও বেঁচে যাবে—'

'আয়ুটাকেও যদি অমনি বাড়িয়ে নিতে পারত !'

অমিয় কাশতে নিখিল বলল, 'একটু কম খা । ধোঁয়া গিলে একদিন তুইও—'

জমল না । নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেল, হঠাৎ যেমন পড়ে যায় । ছেঁদো সব কথাবার্তা ! জমছে না কিছু ।

শেষবার কেবিনে ঢুকে কনককে দেখে এসেছিল রাত দুটোয় । জেগে থাকার অভ্যাস সত্ত্বেও ও তখন দিব্যি ঘুমোচ্ছে, বুদ্ধের মতো চোখের পাতা নামিয়ে । অমিয়র মনে হয়েছিল বেঁচে যাবে—দামী কেবিনের পরিতৃপ্তি আর হাভাতে বাপের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা বৃথা যাবে না । মাথার বালিশটা টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে দু' বার ওর নাম ধরে ডেকেছিল নিখিল, কনক, কনক । খুব চাপা, মৃদু গলায় বলেছিল, আমরা আছি রে— । মনে মনেই এই সব কথা বলা হয় । শ্যামল কিছু বলেনি বা ভাবেনি, বা ভাবলেও কনককে উপলক্ষ করে নয় ।

কেবিন থেকে বেরুবার সময় তবু একটু খটকা লেগেছিল ওদের, ঠিক বাঁচবে তো !

মৃত্যুর জন্যে আপনা-আপনিই কিছু আবহাওয়া ও পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়—যেমন এই কেবিন, মিহি আলোর চুপচাপ, ওষুধের মোলায়েম গন্ধে মনে-পড়া হাসপাতাল—নিপুণ দর্জির হাতে তৈরি মৃত্যুর পোশাকটা ঠিকঠিক ফিট করবে কনকের গায়ে । বরং ভালো হতো যদি ও থাকত এঁদো গন্ধের ভিতর, বাড়িতে, জ্বর গায়ে হঠাৎ-হঠাৎ উঠে বসত বিছানায় । বলত, 'তিরিশ বছরও বয়স হলো না, এর মধ্যেই মরে যাবো ! ভাবলেই শালা ঠাণ্ডা মেরে

যাচ্ছি ! আর কিছু না, একটা মেয়ের ভালোবাসাটাসাও পেলুম না, পুজোয় বোনাস পেলে কাশ্মীর যাব ভেবেছিলুম—যাঃ শালা, তোরা ক'টা জোয়ান মদ্দ আমাকে দেখতে আসিস কেন ! লাই, সমস্তই লাই ।'

রাগ, অভিমান, ভয়, বাঁচার ইচ্ছে—এই সবই ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারত । আর বাঁচবে না ছেলেটা, হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচবে না ।

খুটখুট পায়ে নার্সরা ঘুরে বেড়ায় । রাত তিনটেয় পৃথিবীর দূরতম ঘড়িতে তিনটে বাজার ধ্বনি শোনা যায় । শেষ সিগারেটটি জ্বালার সময় দেশলাইয়ের আলোয় শ্যামল ঘড়ি দেখে নিয়েছিল, সাড়ে তিনটের কিছু বেশি । সময় যেন রবারের বলের মতো হঠাৎ লাফিয়ে বুকের ওপর পড়ল । তার পরের কথাবার্তা জমল না । বারণ সত্ত্বেও অমিয় আবার সিগারেট ধরাল ; বুক পকেট হাতড়ে সুপুরির কুচি পেয়ে মুখে দিল নিখিল ; শ্যামল একবার ডান পাশে কাত হলো, একবার বাঁ পাশে—তেমন জুত হলো না । তিনজনের মধ্যে ওরই প্রথম আর একবার কেবিনে যাবার কথা মনে হলো ।

আস্তে উঠে পড়ল শ্যামল । একবার পিছনে বেঁকে একবার সামনে ঝুঁকে আলস্য তাড়াল । তারপর, যতটা সম্ভব শব্দহীন থেকে কেবিনে ঢুকল ।

কনকের মুখের ভঙ্গি সন্দেহজনক । গায়ে এলোমেলো চাদর ফেলা ; ডান হাতের কব্জি থেকে আঙুলগুলো চাবির গোছার মতো নিস্পন্দ বেরিয়ে আছে । কব্জিটা তুলে ও চাদরে ঢাকতে গেল, ছুঁতেই মনে হলো টেবিল থেকে পেপারওয়েট তুলছে হাতে । ছোটবেলায় তুবড়ি বানাতে গিয়ে দুর্ঘটনার পর ডান হাতের কড়ে আঙুলটা অল্প বেঁকে গিয়েছিল কনকের ; সেই আঙুলটা, এখন, আঁকশির মতো শ্যামলের তালুতে লাগল । শ্যামল দ্বিতীয়বার সন্দেহ করল । তারপর টর্চ ফেলার মতো করে মুখের দিকে তাকাতেই দেখল দুই ঠোঁটের মাঝখানে জিবটা একটু কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে, শিশুর আঙুলের মতো একটুকরো জিব, জিবের ওপর একটা বড়ো মশা । কেবিনের ভিতর থেকেই ও চেঁচিয়ে ডাকল, 'অমিয় ! নিখিল !'

অমিয় আর নিখিল ঘরে ঢুকে শ্যামলের মুখের দিকে তাকাল । বুঝল, কনক মরে গেছে । ক' মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা—মৃত্যুটাকে অনুভব করার চেষ্টা করল । অননুভব্য বলেই আকস্মিক শূন্যতায় বুকটা ফাঁকা লাগল হঠাৎ ।

অমিয়র হাতে তখনো জ্বলন্ত সিগারেট, নাকে গন্ধ পৌঁছুতেই দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে । শ্যামল ছিল কনকের বেডের সবচেয়ে কাছে, কী ভেবে সরে দাঁড়াল ও, প্রায় নিখিলের গা ঘেঁসে । কিছু করার নেই এই বোধ মাথায় ধাক্কা দিতেই নিখিল সরে এলো কনকের খুব কাছে, আলগোছে হাত তুলে রাখল কনকের কপালে । কী মসৃণ ! কী শান্ত ! কনকের মুখ, বন্ধ দুটো চোখ, ওর বুকের ভিতর গুনগুন করে গেল । নিজের হাতের পিঠে একটা মশার হুল ফোটানো টের পেল নিখিল—মাথার ভিতর কিছু একটা দুলে গেল চকিতে । এরই নাম তাহলে মৃত্যু ! আঃ, কনক, বড়ো কম আয়োজনের মধ্যে মরে গেলি তুই !

অমিয় ডাক্তারকে খবর দেওয়ার কথা ভাবছিল । তার আগেই নার্স এলো, কনকের কব্জিটা তুলে নিল নাড়ি টেপার ছলে, উল্টে দেখল চোখের পাতা—তারপর, খুব চিন্তিত মুখে, খুটখুট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে । পিছনে অমিয় ।

শ্যামল বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'কী হবে দাঁড়িয়ে থেকে !' ঠাণ্ডা গলায় বলল অমিয়, 'শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারছিস না !'

'খেল খতম !' কমেন্টারি রিলে করার মতো কৌতুক মাখানো চাপা গলায় বলল নিখিল, 'কাল থেকে ফ্লাস্কে চা আনব—কখন যেন বললাম !'

'নিখিল !'

শ্যামল ওর পিঠে একটা হাত রাখল, আর এক হাতে চাদরটা টেনে মুখ ঢেকে দিল কনকের।

ভোরের হাওয়ায় জানলার পর্দাটা ফুলে উঠেছে। হাজরা লেনে কনকের শোবার ঘরের পাশেই রাস্তা—খোলা জানলা দিয়ে রাস্তা থেকে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। শূন্য ঘরের ভিতর খালি তক্তপোশটা এখন চুপচাপ পড়ে আছে অন্ধকারে। আর কোনো দিন সেখানে ফিরবে না কনক। হোক হাসপাতাল, তবু যাবার আগে আলো বাতাস কাকে বলে টের পেয়ে গেল।

আগে অমিয়, পরে নিখিল, তারপরে শ্যামল—পরপর তিনজন বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে। চুপচাপ। পরপর তিনজনে পা দিল সিঁড়িতে, নেমে এলো চত্বরে। ভোর হতে তখন আর দেরি নেই। আবছা অন্ধকারে দুটো কাক উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। একটা ট্যাক্সি ছুটে গেল মেটারনিটি ওয়ার্ডের দিকে। অ্যাম্বুলেন্সটাকে পাশে রেখে ওরা গেটের কাছাকাছি চলে এলো।

এর পর যা যা করা দরকার সবই জানা ছিল—প্রত্যুষের অপরিচ্ছন্ন আলোয় শ্মশানের সামনের রাস্তাটা দেখতে পেল ওরা। অমিয় আবার একটা সিগারেট চাইল ; শ্যামল আগুন জ্বেলে নিজেরটাও ধরিয়ে নিল ; নিখিল—স্মোকিং যার আদৌ পছন্দ নয়, অন্যমনস্ক হাতে একটা সিগারেট তুলে নিল শ্যামলের প্যাকেট থেকে। প্রায় একসঙ্গেই মনে পড়ল তিনজনের, কনক চলে গেছে।

কনকের মৃত্যুর পর ভোরের প্রথম হাওয়ায় কেমন হালকা, নির্ভার লাগল নিজেদের। রাত জাগার ক্লান্তিটা এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না। একটা ট্রাম চলে গেল লাইনের ওপর পিছলে পিছলে, সকালের প্রথম ট্রাম। প্রায় যাত্রীহীন। এখন গেলেই হয়—কনকের বাড়িতে খবরটা পৌঁছনো দরকার। কে যাবে ?

দুরূহ কাজ। কাল অনেক রাত পর্যন্ত ওরা হাসপাতালে ছিল—কনকের বাবা দাশরথি, বোন বুলা ; থাকতে চেয়েছিল। ওরাই জোর করে বাড়ি পাঠিয়েছে। 'এখনও অনেক রাত জাগতে হবে—', বলেছিল কেউ। তারপর এই ভোরবেলা ! কী বিড়ম্বনায় যে ফেলে গেল কনুটা !

ঠিক হল অমিয় হাসপাতালে থাকবে, একজনের থাকা দরকার। শ্যামল আর নিখিল যাবে খবর দিতে। তিনজনেই একসঙ্গে এগুলো বাস স্টপের দিকে। নাকি একটা ট্যাক্সি নেবে ! স্টপে পৌঁছে ওরা আবার চারজন হয়ে গেল।

বয়সে কনকই ছিল ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। সবচেয়ে তুখোড়, সবচেয়ে বেপরোয়া। শুকনো গাছ থেকে রস ছেনে প্রায়ই ম্যাজিক দেখাত। সবচেয়ে ধুরন্ধর আর খেয়ালের রাজা, সবচেয়ে পাজি। কুড়ি থেকে তিরিশে পৌঁছনোর মধ্যে বয়সটাকে থামিয়ে রেখেছিল এক জায়গায়। ট্রামে বাসে যেতে যেতে মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা বুক-দেখা হ্যাংলা লোকজনের পা মাড়িয়ে দিয়ে হাসত মুখ টিপে। অফিসে নতুন জয়েন-করা ওপরওলার

হাত দেখে বলেছিল, 'জায়গামতো তেল দিয়ে যান, স্যার, আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না।' লোকটা চুপসে গিয়েছিল কেমন ; কাজে অকাজে কনককে ডাকত ঠাণ্ডা ঘরে। 'দুটো থেকে সাড়ে তিনটে আমাকে ডাকবেন না।' কনক বলেছিল, 'ঐ সময়টা আমি ঘুমোই।' অমিয়র বউ রেখাকে প্রথম জপিয়েছিল কনকই। ক'দিন আলাপের পর অমিয়কে ধরে বলেছিল, 'একটা ফাস্ ক্লাশ মেয়ে আছে। বিয়ে করবি তো বল ; না হলে সত্যজিৎ রায়কে ধরে ফিল্মে নামিয়ে দেবো।'

এই সব। বাঁচার জন্যে কোনো দিন ওকে ভাবতে হয়নি। মাঝে মাঝে শুধু বিষণ্ণ হয়ে যেত বাবার দুটো 'প্যারালিটিক হাত' বুলা আর ঝুমির কথা ভেবে। মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করে বলত, 'শ্যামল, নিখিল, সৎপাত্র না হওয়া পর্যন্ত আমাকে শালা বলে ডেকো না।'

এই সব নিয়েই ফৌত হয়ে গেল। তেমন কিছুই তো ঘটেনি ! মৃত্যুর জন্যে যেসব উদ্যোগ আয়োজন থাকে তার কিছুই ছিল না কনকের বেলায়। হলদেটে চেহারা, প্রায়ই ঘুসঘুসে জ্বর হতো। ডাক্তার দেখাল, রক্ত পরীক্ষা হলো, রোগটা ধরা পড়ল। সব ক'দিনের মধ্যে—ক'মাসের মধ্যে। মনে হয় সেদিনের কথা !

ভাবতে ভাবতে তিন রকম নিঃশ্বাস পড়ল তিনজনের। ছুটে গেলে এখনো কেবিনের বিছানায় চমৎকার শুয়ে আছে দেখতে পাওয়া যাবে কনককে। তবু, সত্যি সত্যিই চলে গেল কনক !

ভোরের হাওয়ায় ডিজেলের গন্ধ শুঁকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শ্যামল, 'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি....'

॥ দুই ॥

'কখন' ?'

বাজারের থলি হাতে সবে রাস্তায় পা দিয়েছিলেন দাশরথি ; ট্যাক্সি থেকে নেমে ওরা সামনে এসে দাঁড়াল।

মিটার দেখে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে ব্যস্ত শ্যামল। মুখোমুখি নিখিল। দাশরথির শূন্য দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো রকমে বলল, 'এই তো, ভোর রাতে—'

'ও।' অল্প ঠোঁট কাঁপল দাশরথির। মাথা ঝুঁকিয়ে খুব মৃদু গলায় বললেন, 'তাহলে গেলই।'

বড়ো দুঃখময় কথাটা। যাওয়া। উচ্চারণের হেরফের হঠাৎ একবুক শূন্যতা এনে দেয়।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন দাশরথি—পাকা অভিনেতার মতো ওই কথাটি বলবার জন্যেই যেন এতো দিন প্রস্তুত হচ্ছিলেন মনে মনে। দর্শকের হাততালির মতো গম্ভীর শব্দ তুলে খালি ট্যাক্সিটা চলে গেল পাশ দিয়ে।

দাশরথির মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পিছন দিকে টাক পড়েছে অল্প। বেঁটেখাটো, ধড়ের সঙ্গে সরু গলাটা বেমানান। অফিসপাড়ায় হাঁটতে চলতে এমন লোক হামেশা দেখা যায়। নিতান্ত কনকের বাবা, না হলে বয়স আন্দাজ করা যেত না। দেখেই মনে হয় নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা মানুষটি—থলি হাতে বাজারে যান সকালে, অফিসের সময়ে অফিসে, ফেরার ভিড়ে অন্যমনস্ক চেয়ে থাকেন দূরে, আর চিন্তায় ঘুম হয় না রাতে।

সহজ ! হ্যাঁ, সহজই। তবু, কথাহীন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ল শ্যামলের, কনকের অসুখটা বাড়াবাড়ি হবার পরও ছেলেকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজি হননি দাশরথি ; বলেছিলেন, 'কেরানী মানুষের সম্বল তো ওই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডটি, ওতে হাত দেবো ! আমার তো শুধু একটিকে নিয়ে ভাবলেই চলে না !' 'লোকটা চামার !' আড়ালে অমিয়কে বলেছিল শ্যামল, 'জন্ম দিয়েই খালাস !'

এই সব ভেবে ছোট একটা ধাক্কা খেল শ্যামল। বুকের মধ্যে অল্প একটু চিন চিন করে উঠল। কোন ভাবনা থেকে সেদিন কথাগুলো বলেছিল এখন আর ঠিক মনে পড়ে না। দাশরথির সঙ্গে তাদের যেটুকু পরিচয় তা কনকের জন্যেই। কনক মারা গেল—মৃত্যুর প্রস্তুতি থেকে এ-পর্যন্ত খুব আপনজনের মতো দাশরথির সঙ্গে মেলামেশা করেছিল তারা। এখনই তাঁকে দূরত্বময় মনে হচ্ছে। এরপর কী হবে ভেবে নিজের ভিতর ডুবে গেল শ্যামল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। চটির ডগা ঘষে কংক্রিটের ওপর দাগ কাটার চেষ্টা করছিল নিখিল। ভিতরে হাতকাটা গেঞ্জি, ঘামে জ্যাবজ্যাবে জামার কাঁধদুটো স্পষ্ট। নিখিলের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল শ্যামল।

'মেসোমশাই !'

'হ্যাঁ, শুনছি।' বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন দাশরথি। 'একটু ভেবে নিচ্ছি। মানে—বুঝতেই পারছ, ও যে সত্যি সত্যিই চলে যাবে—'

'আপনি ভেঙে পড়বেন না—'

এ-ক্ষেত্রে যা বলা হয় ও যে-রকমভাবে, ঠিক তেমনি, অভ্যস্ত গলায় কথাটা বলল শ্যামল। চোখের ইশারায় নিখিলকে কিছু বলে, বাজারের থলিটা আস্তে টেনে নিল দাশরথির হাত থেকে।

'চলুন। বাড়ি চলুন—'

'চল। আজ আর বাজারে যাব না, কী বল ?' দাশরথি বললেন, হাঁটতে হাঁটতে। 'কাল রাতে ফিরে আমরা সবাই কনকের গল্প করলাম। কাল তো দেখে মনে হয়েছিল বেঁচে যাবে। মনটা ভালো ছিল। বড়ো হবার পর তো কখনো বাপ বলে ডাকেনি। কাল হঠাৎ ডাকল, হাতটা ধরল। তোমরা কি কেউ কাছে ছিলে ? বললাম, কী রে, কিছু বলবি ? বলল না তো কিছু। শুধু হাসল। তখন কিছুই বুঝিনি—'

কথা থামিয়ে হঠাৎ দিশেহারা চোখে তাকালেন দাশরথি। চোখ-মুখ ভেঙে যাচ্ছে। থেমে দাঁড়িয়ে বুক পকেট থেকে একটা আস্ত দশ টাকার নোট বার করে অদ্ভুত কাঁপা গলায় বললেন, 'এই দ্যাখো, ওর জন্যে মাছ কিনব বলে আজ বেশি টাকা নিয়েছিলাম—'

ওরা এগোতে লাগল।

সামনে কনকদের বাড়ি। রাস্তার ধারে খোলা জানলা। যে-রকম ভেবেছিল, বাইরে থেকেই শূন্য তক্তপোশটা চোখে পড়ে। খুব চেনা ছবি। জানলার পাল্লায় বড় পেরেকটা একইরকমভাবে গাঁথা। পেরেকে আয়না ঝুলিয়ে অফিস যাবার আগে প্রতিদিন দাড়ি কামাত কনক। গালভর্তি ফেনা নিয়ে চেঁচিয়ে বলত, 'এই ঝুমি, তাড়াতাড়ি বাথরুম খালি কর।'

এক রবিবারের সকালে চা দিতে এসে ঝুমি বলেছিল, 'আপনারা দাদাকে একটু সভ্য করতে পারেন না ! বাথরুম তো সকলের বাড়িতেই থাকে, অত চেঁচিয়ে লোককে জানানোর কী আছে !'

মনে পড়ার ব্যাপার আরো কতো।

শূন্য তক্তপোশটার দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক কিছুই বোধ হল না নিখিলের। কনকের থাকা আর না-থাকার মাঝখানে বিরাট ব্যবধান—অথচ ব্যবধানটা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। এ ক' দিন পরপর রাত জেগে তেমন ক্লান্তি লাগেনি। এখন মনে হচ্ছে কনক নয়, অন্য কোনো আকর্ষণ তাকে ব্যস্ত রেখেছিল মুহূর্তের পর মুহূর্ত, দিনের পর দিন, সময়ের পর সময়। এখন সে-সব কিছুই নেই। এখন শুধুই ক্লান্তি, অবসাদ। ঘামের মতো ঘুম গড়িয়ে পড়ছে শরীর বেয়ে।

পিছন থেকেই নিখিল দেখল দাশরথিকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল শ্যামল। এতক্ষণ নানা রকম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিলেন দাশরথি, একটু বা চড়া গলায়, অন্তত রাস্তায় চলমান মানুষের গলায় নয়। সাধারণত কম কথার মানুষ ; হাবভাব দেখে বাড়ির সঙ্গে ওঁর অভিভাবকত্বের সম্পর্কটা খুবই আল্গা মনে হতো। ছুটিছাটার দিনে সকালের দিকে কখনো-সখনো এ-বাড়িতে এসে দেখেছে সদর-ঘেঁসা ফালি জায়গায়টুকুতে উবু হয়ে বসে একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন দাশরথি। পায়ের শব্দে ঈষৎ চোখ তুলেই নামিয়ে নিতেন আবার—যাও, ভিতরে যাও। প্রায় অভ্যাসেই বলতেন। কনকের থাকা না-থাকার সঙ্গে ওঁর নির্দেশের বড়ো একটা সম্পর্ক থাকত না। এরপর, নিখিল ভাবল, কনকের মৃত্যুর বেশ কিছু দিন পরেও হয়তো কোনো দিন এসে সে একইভাবে উবু হয়ে বসে কাগজ পড়তে দেখবে দাশরথিকে, একই গলা শুনবে। কেন যেন মনে হলো নিখিলের, দাশরথির পক্ষে সেটাই সম্ভব। এই মৃত্যুটা উপলক্ষ মাত্র, একটু নাড়া দিয়ে গেল। না হলে এর আগে আরো অনেক মৃত্যুর স্তর পেরিয়ে এসেছেন দাশরথি।

অন্যমনস্কভাবে, প্রায় না-চলার ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে নিখিল তার সর্বাঙ্গে মৃদু ঘুম ছড়িয়ে পড়ছে টের পেল। হাই তুলল আলতো।

যতো দূর মনে হয় পুত্রশোক সইয়ে নেবেন দাশরথি। ভয় বসুধাকে নিয়ে। কনকের মা। টানা একটি মাস গোটা পৃথিবীটাকে হাসপাতালের বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল কনক—যা কিছু ভাবনা সবই সম্ভাব্য মৃত্যুকে ঘিরে। ওরই মধ্যে একা অচঞ্চল বসুধা। চুপচাপ শান্ত মানুষটি, এই এক মাসে যেন আরো বেশি চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে প্রায়ই যেতেন না ; মাঝে মাঝে মনে হতো রুগ্‌ণ ছেলের সংস্পর্শ ভালো লাগছে না বসুধার। সুযোগ পেলেই চলে যেতেন কালীঘাটে, যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। মনে হতো জাগতিক ব্যবস্থার বাইরে কোনো অমোঘ শক্তির সন্ধান পেয়ে গেছেন বসুধা ; ভালো মন্দ যা'ই হোক, তাঁর সমস্ত রফা সেই শক্তির সঙ্গে। যেন সারাক্ষণ সেই শক্তিকে টেনে আনতে চাইছেন নিজের মধ্যে—মূল থেকে শিকড়ের মতো যার গাঢ় সঞ্জীবনী ছড়িয়ে পড়বে কনকের ভিতর, ভালো হয়ে উঠবে কনক।

'একদিন কালীঘাটে নিয়ে যাবে ?' মাঝে মাঝেই বলতেন, 'বিকেলের দিকে চুপিচুপি চলে যাব। ওই সময় ভিড়টাও কম থাকে।'

একদিনের কথা। পুজো দিতে ভিতরে গেছেন বসুধা, সে অপেক্ষা করছে বাইরে। খানিক পরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আমাকে পাঁচটা টাকা দেবে নিখিল ?'

'টাকা কী করবেন মাসিমা ?'

অসহায় মুখ বসুধার। খানিক চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চোখ দেখে মনে হল মা তুষ্ট হননি, আমার কথা শুনছেন না। তাই আরো দিতাম।'

রাগ, দুঃখ সব মিলে একটা প্রচণ্ড শক্তি ছটফট করে উঠেছিল নিখিলের মধ্যে। পারা যায় না ধাতু মাটির তৈরি রঙিন পুতুলটিকে মুষ্ট্যাঘাতে ভেঙে দিতে! ভেবেছিল, তবু সাহস হয়নি বসুধার চোখের দিকে তাকিয়েই। বসুধার বিশ্বাস দৈবের ইচ্ছেতেই আরোগ্য হবে কনক। সেই আশ্বাসটুকু কেড়ে নিলে কোথায় দাঁড়াবেন বসুধা!

টাকাটা হাতে পেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন বসুধা। 'তুমিও এসো না বাবা?' নিখিলের হাত ধরে বলেছিলেন, 'আসবে? কনক তো তোমারও বন্ধু!'

চটিটা বাইরে রেখে ধীর পায়ে বসুধাকে অনুসরণ করেছিল নিখিল। মেয়ে-পুরুষের গিসগিসে ভিড়ে বসুধার পিছনে পিছনে সোঁদা মেঝেয় হাঁটতে হাঁটতে দেখেছিল দেবীর কী অপরিসীম শক্তি—স্থবির দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি ভক্তের রক্তমাংসের যাবতীয় ঘ্রাণ শুষে নিচ্ছে যেন! বসুধা থালার ওপর টাকাটা রাখতেই একসঙ্গে তিনজন সেবায়েত ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোঁচকানো মুখে মুদিত চক্ষু বসুধার কাঁধদুটো আলগোছে ধরে নিখিল বলল, 'মাসিমা, চলুন—'

বাইরে বেরিয়ে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন বসুধা।

'ও ভালো হয়ে উঠবে নিখিল। আমার মন বলছে কনু ভালো হয়ে উঠবে।'

কষ্টের সংসার। রিক্সায় ফিরতে ফিরতে নিখিল ভেবেছিল, ওই টাকায় একদিন ওরা পেট ভরে মাংস খেতে পারত।

'জানো, নিখিল—', কথায় পেয়েছিল বসুধাকে। 'বহরমপুরে আমার শ্বশুরবাড়ির সিঁড়িগুলো ছিল উঁচু আর পিছল। কনু তখন পেটে, একদিন পড়ে গেলাম। সে কী কষ্ট! নিজের চেয়ে বেশি পেটেরটার জন্যে। সবাই ভাবলে বাঁচবে না। কিন্তু—'

একটু থেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বসুধা।

'ছেলে ঠিক এলো কোল জুড়ে। সেদিনও তো একটা কিছু হতে পারত বাবা!'

প্রায় ঘুমের মধ্যে পরপর অনেক স্বপ্ন ও দৃশ্য পার হয়ে এলো নিখিল। প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো। খেয়াল হতে বুঝল সে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, প্রায় একই জায়গায়। এখান থেকে কনকদের সদরের দূরত্ব তেমন কিছু নয়। তাকে ঘিরে চারিদিকে রোদ বেড়ে উঠছে তরতর করে। পিছনে তাকাতেই চোখে পড়ল কনকের ঘরটা—শূন্য তক্তপোশের ওপর চুপচাপ বসে আছে বুলা। ভিতর থেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে ভেসে আসছে চাপা কান্না। আর সবই ঠিকঠাক চলছে। শব্দ, আলো, বাতাস, মানুষজন। বেঁচে থাকতে যাকে মনে হতো অনেকখানি—প্রচণ্ড আর চঞ্চল, সেই কনক মারা যাবার পর এতোটুকু বদলাল না পৃথিবী!

আলতো হাতে কপালের ঘাম মুছে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নিখিল।

'বুলা—'

রাস্তার দিকেই চোখ, তবু যেন খুব অন্যমনস্ক বুলা। নিখিলকে লক্ষ করেনি এতোক্ষণ। গলা শুনে এগিয়ে এসে শিক ধরে দাঁড়াল।

'ভেতরে আসবেন না?'

'কী হবে!'

একটু অপেক্ষা করল নিখিল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'মাসিমা জানেন?'

বুলা মাথা নাড়ল আস্তে। বিছানার পোশাকে বলেই এতো ঢিলেঢালা লাগছে এখন। চোখ দুটো ফোলা। রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুম হয়েছে বুলার। খানিক আগে দাশরথির কথা শুনে মনে হয়েছিল গত রাতে চমৎকার ঘুম ছিল ওদের চোখে। এখন হয়তো অনেক দিন

থাকবে না।

নিখিল বুলার চোখে জল জমতে দেখল। চোখ ফিরিয়ে নিল।

'আমি গেলে এতোটা হত না। মা বাবাকে সামলানো যাবে না নিখিলদা! দাদা বড়ো ক্ষতি করে গেল!'

'ভেবো না। এখন ওসব ভাববার সময় নয়।'

ভিতর থেকে একটা ছুঁচ-বেঁধা কান্না শুনল নিখিল। ঝুমি নিশ্চয়। পাশাপাশি অস্পষ্ট গলা শ্যামলের। এখন তার একবার ভিতরে যাওয়া দরকার।

'এখন শান্ত হতে চেষ্টা করো—।' দয়ালু গলায় কথাটা শেষ করল নিখিল। কথাগুলো ঠিকঠিক এসে যাচ্ছে মুখে। না, সে স্বাভাবিকই আছে।

তারপর ভিতরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

॥ তিন ॥

বেলা বারোটা নাগাদ কনকের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল শ্যামল।

কমন লাইনটা বারবার এনগেজড্ পাচ্ছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে ডাইরেক্ট লাইনে রিং করল। ফোন ধরল কনকের সেই ওপরওলা, মুখুজ্জ্যে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে এর আগেও দু' একবার কথা হয়েছে। ভীরু প্রকৃতির; কনক সম্পর্কে ভীতির কারণেই ওর বন্ধুবান্ধবদেরও সন্দেহের চোখে দেখে, সমীহ করে একটু। চেনা গলা। শ্যামল নিজের পরিচয় দিতেই নার্ভাস গলায় বলল, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার বন্ধু তো আসছেন না...অসুস্থ...'

অন্য সময় হলে বাজিয়ে নিত শ্যামল, গলার স্বর অল্পস্বল্প পাল্টিয়ে রগড় করে নিত একটু। অনেকবারই করেছে। এখন সেসব প্রশ্নই ওঠে না। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। কনক আজ সকালে মারা গেছে।'

'অ্যাঁ! বলেন কী!' ফোনের মধ্যেই চেয়ার ঠেলার শব্দ শুনল শ্যামল। মুখুজ্জ্যে বোধ হয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ডু ইউ আস্ক্ মি টু বিলিভ ইট্!'

শ্যামল সাড়াশব্দ দিল না। ভাবল ফোনটা ছেড়ে দেয়।

ওপাশে আবার মুখুজ্জ্যের বিব্রত গলা, 'হ্যালো...হ্যালো...শুনছেন?'

'বলুন—'

'ইট্ ইজ্ এক্সট্রিমলি শকিং।' একটু বিরতি। 'কী বলছেন, অফিস ছুটি দিয়ে দেবো?'

'সেটা আপনারা ভাবুন।'

ফোনটা নামিয়ে রাখল। চাপা গলায় বলল, 'ইডিয়েট!'

পাশে দাঁড়িয়ে অমিয়। একটু আগে সে ছোট ভাই দ্বিজুকে ফোন করেছে মা-কে নিয়ে শিগগির যেন চলে যায় কনকদের বাড়ি। মৃত্যুর খবর পাবার পর থেকে একটি কথা বলেননি বসুধা, তাঁকে সামলানো দরকার। অফিসে খবর দেবার কথাটা অমিয়রই প্রথম মনে পড়ে।

'কী হল!' শ্যামলকে বিরক্ত দেখে জিজ্ঞেস করল অমিয়।

'মুখুজ্জ্যে ধরেছিল। বলল খুব শক্‌ড্। সব শালাকেই জানা আছে। এক মাস হাসপাতালে থাকল, একদিন দেখে যেতে পারত!'

'ওসব ভেবে লাভ নেই।'

মাথার ওপর চড়া রোদ। শ্যামল ছায়া খুঁজল। নিঃশব্দে রোদ্দুর পেরিয়ে শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল দু'জন।

'রেখার কী হলো? গেছে?'

'না।'

'কেন?'

একটু বা অসহিষ্ণু চোখে শ্যামলের মুখের দিকে তাকাল অমিয়। বিরক্ত। জবাব দিল না।

শ্যামল বলল, 'গেলে পারত।'

'জানিস তো সবই।' শুকনো হাসল অমিয়। 'আমিই মানা করলুম। এ অবস্থায় কোনো রকম টেনসান ফেস করা ঠিক হবে না।'

'রেখা কিছু বলল না?'

'কী?'

'শেষ দেখা দেখতে চাইল না?'

অমিয় জবাব দিল না। গেটের কাছে নিখিলকে দেখল, সঙ্গে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক, সম্ভবত কনকের মামা। দমদমে খবর দিতে ছুটেছিল নিখিল। বিরক্ত মুখে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অমিয় বলল, 'তুই কি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি? আমি একটু ওদিকটা দেখে আসি।'

'যা—'

অমিয় চলে গেল। অনিচ্ছুক মনে আর একটা সিগারেট ধরাল শ্যামল। দু' টান দেবার পরই বিশ্রী, বিস্বাদ লাগল। ফেলে দিয়ে চটির তলায় আগুনের টুকরোটা চক্রাকারে পিষতে লাগল। কেমন একটা রাগ বুকের মধ্যে ঠেলে উঠছে থেকে থেকে। কেন, বুঝতে পারছে না। তবু রাগ, ভয়ঙ্কর রাগ গলার ভিতর জলকণা শুষে নিচ্ছে।

খানিক আগে, প্রায় অকারণেই, কেবিন ভেকাণ্ট করা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া হলো। এক কথা থেকে আর এক কথায় পড়ল। শ্যামল বলল, 'আপনাদের পরামর্শে আমরা স্পেশাল অ্যাটেন্ডেণ্ট রেখেছিলাম। পেশেণ্ট মারা যাবার সময় তাকে অ্যাটেণ্ড করা হয়নি। তাকে মশায় ছেঁকে ধরেছিল।'

'বেশ তো', ডাক্তার বলল, 'কোনো কমপ্লেন থাকলে ইন রাইটিং দিন। মশা না থাকলে পেশেণ্ট বাঁচত কি না আমরা এনকোয়ারি করে দেখব।'

'রাখুন মশাই আপনাদের এনকোয়ারি।' চড়া গলায় বলেছিল শ্যামল, 'এখানে যে ও এতো দিন বেঁচেছিল এটা পেশেণ্টের বাবার ভাগ্যি—'

মুহূর্তে চোখমুখ লাল হয়ে গেল ডাক্তারের। নিরস্ত হবার জন্যে হাতের স্টেথস্কোপটা ঝাড়ল দু'বার। 'আপনারা শিক্ষিত, ভদ্রলোক', কোনো রকমে বলল, 'ভুলে যাবেন না এটা হসপিট্যাল—'

রাগে মাথার ভিতর শিস্ জ্বলে উঠল শ্যামলের। ভঙ্গি দেখেই অমিয় বুঝল কিছু একটা হবে। তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনল ওকে।

'এমন অ্যাবনরম্যাল ব্যবহার করছিস কেন !' বাইরে এসে বলল, 'এটা কি রাগারাগির সময় !'

'তুমি আমাকে জ্ঞান দেবে না, অমিয় । তোমাদের জানা আছে ।'

ক্রিমির মতো লাল সরু কয়েকটা শিরা শ্যামলের চোখে, তেল না-পড়া উস্কোখুস্কো চুল, গালের শক্ত হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু মনে হয় । অকারণ, সমস্ত অকারণ ; তবু ওর ভাবগতিক দেখে চুপ করে গেল অমিয় ।

একা দাঁড়িয়ে শরীরে রোদের তাপ সইয়ে নিল শ্যামল । তখন সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল । কেন ঠিক বুঝতে পারে না । এটা ঠিক, কনক যেতই, দু' দিন আগে আর পরে—এই যা । নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে যত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি— এতো ভালোবাসার মধ্যে খুব কম জনই যায় । তবু কেন মনে হচ্ছে কোথায় একটু ফাঁক থেকে গেল ; যা যা পাবার ছিল, পেতে পারত, সব কিছু দেওয়া গেল না ওকে !

এই মুহূর্তের আবেগ আর অভাববোধ ধসিয়ে দিল শ্যামলকে । আকাশভরা রোদ্দুরের নিচে দাঁড়িয়ে ওর সমস্ত স্নায়ু চাপা কান্নায় ফেঁপে উঠল হঠাৎ ।

শনিবার । হাফ-ডে । তার ওপর খবরটা ঠিক সময়েই পেয়েছিল । মিনিট কতকের মধ্যেই ট্যাক্সি চেপে কনকের অফিসের কয়েকজন এসে পড়ল । পরপর পাঁচজন ।

'ডেডবডি কোথায় ?'

হত্যাকাণ্ডের পর সরেজমিন তদন্তে এসে পুলিস এইভাবে জিজ্ঞেস করে । বেল্ট বাঁধা ট্রাউজার্সের ঘের ছাড়িয়ে মোটা পেট ঝুলে এসেছে বাইরে, ফুলশার্টের হাত গোটানো, মোটামুটি ধুমসো চেহারা । শুনে মনে হয় সারা রাস্তা প্রশ্নটা ভেঁজেছে মনে মনে, এসেই উগরে দিল ।

শ্যামল বলল, 'ওই দিকে ।'

দিক স্পষ্ট না হোক, যাকে বলা হলো তার পক্ষে যথেষ্ট । অন্যদের দিকে তাকিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'তোমরা আসবে নাকি ?'

'আপনি যান ।'

লোকটা চলে যাবার পর শ্যামল অন্যদের মুখ দেখল । প্রবীণ লোকটি বিড়বিড় করে বলল, 'মেলানো যায় না । মেলানো যায় না ।' তারপর অনতিদূরে দারোয়ানের জন্যে রাখা খালি টুলের ওপর বসে পড়ল ।

সুদেবকে চিনতে পারল শ্যামল । কনকের ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি টেবিলে বসত ; পাতলা, দোহারা গড়ন । বড়ো খেলা থাকলে এক এক দিন কনকের সঙ্গী হয়ে মাঠে গেছে । আর সবাই অপরিচিত ।

নৈঃশব্দ্য মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয়ে দাঁড়ায় । যেমন এখন । শ্যামল কিছুটা বিমূঢ় বোধ করল । দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলি তার স্নায়ুর ওপর চাপ দিচ্ছে । ওরা কনকের কেউ নয়, বা আলাদা করে কনকের কেউ নয়—বলা যায় যে-কোনো মৃত্যুর সংবাদ পাবার জন্যে তৎপর ক'টি মুখ । যে-কোনো উপলক্ষেই ভালকান স্মিথ্ লিমিটেড নামক কোনো এক কোম্পানির সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে ছুটে যায় । মৃত্যু যাদের কাছে 'ডেডবডি' মাত্র, আর কিছু নয় ।

শ্যামল তলিয়ে যাচ্ছিল । দেখল ঘাড়ের পিছনে শার্টের কলার তুলে মোটা লোকটি ফিরে আসছে । মুখে কাজ হাসিলের হাসি । দূরে থাকতে থাকতেই শ্যামল সুদেবকে জিজ্ঞেস

করল, 'লোকটি কে ?'

'নৃসিংহদা। আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি।'

'মাতব্বর !' মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল কথাটা। এই ধরনের লোক দেখলেই কেমন হাত নিসপিস করে। নৃসিংহ কাছে আসতেই মুখ ব্যাজার করল শ্যামল।

'একেবারে 'কাম' ফেস্ ! বলিনি তোমাদের, হি ডায়েড লাইক এ হিরো— ।' খুব তৎপর হাতে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল নৃসিংহ। 'কাল মিটিং চালাবার সময়েই হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল কনকের কথা, আজ বিকেলেই আসতাম দেখা করতে। বাট—', একটু থেমে নাটকীয় গলায় বলল, 'পুওর চ্যাপ ! হি ডিড্ নট্ ওয়েট ফর আস্ !'

'বক্তৃতা পরে করো হে।' নৃসিংহ চুপ করতে টুলে-বসা প্রবীণটি বলল, 'যাত্রার জোগাড়যন্তর কী হলো দ্যাখো। কেউ কেউ তো আবার শ্মশানে যাবে বললে।'

সুদেব এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। শ্যামলের কাছাকাছি এগিয়ে এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন ? কেওড়াতলায় ?'

'কেওড়াতলায়—'

'কোলিগদের অনেকেই যাবে। আমি বরং একটা ফোন করে দিই। কখন যাবেন ?'

'গেলেই হয়—'

অল্প ইতস্তত করল সুদেব।

'ওঁর বাড়ির লোকজন এসেছেন ?'

শ্যামল ঘাড় নাড়ল। নৃসিংহের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এখন তার মনে কনক নেই। পরিবর্তে নিজের ছোটখাট স্মৃতি এসে ভিড় করছে। খুব খাপছাড়া, একটার সঙ্গে অন্যটা সম্পর্কহীন—তবু আলাদা করা যাচ্ছে না। হাওড়া স্টেশনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের দেখে যেমন বোঝা যায় না কোন ট্রেনে এলো।

প্রথম স্মৃতি বাবা। বোলপুরের বাড়িতে এনলার্জ করা একটা ছবি দেওয়ালে টাঙানো থাকে, নিচে লেখা : ১৯০৬-১৯৬১। ছবির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই মনে পড়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল বাবার। নিজের বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেল, আর খুব বেশি দিন বাঁচা যাবে না—হয়তো আরো পঁচিশটা বছর।

আর কিছু মনে হয় না, আর কিছু ভাবতে পারে না। বাবা সম্পর্কে কোনো গভীর স্মৃতি বা বেদনাবোধ তার মনে নেই। কোনো অভাবও নেই। মৃত্যুর তারিখটা ছিল একুশে মে। মাঠে জোর খেলা ছিল সেদিন, তুমুল বৃষ্টিতে শেষদিকে ভেঙে গেল খেলা—সে, নিখিল আর কনক ভিজে কাক হয়ে ঢুকেছিল ধর্মতলার এক চায়ের দোকানে। বেশ রাত করে মেসে ফিরে টেলিগ্রাম পেয়েছিল, ফাদার এক্সপায়ার্ড।

তেমন কিছু মনে হয়নি। বৃষ্টিতে ট্রেন ধরে ছুটে যাবার উপায়ও ছিল না তখন। শুধু একটা চাঞ্চল্য, টেলিগ্রামটা উল্টেপাল্টে পড়েছিল বারবার, খেতে বসে মনে হয়েছিল মাছ খাওয়া উচিত হবে না। পরদিন বেলায় বাড়ি পৌঁছে দেখেছিল থান পরে চৌকির ওপর বসে আছেন মা ; এক পাশে গায়ে ধুতি-জড়ানো দাদা, গলায় সুতোয় বাঁধা চাবি। আড়ালে ডেকে কোরা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বৌদি বলেছিল, 'সেই এলে ঠাকুরপো, এক দিন আগে এলে না কেন !'

ঘন হয়ে ভাবলে এই সবই মনে আসে। মৃত্যুর তারিখটা তবু ভুল হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন খেয়াল হয়, বাবার মৃত্যুর পর আরো একটা বছর কেটে গেল। বহু দিনের মধ্যে

একটি মাত্র দিন—দিনটিকে তবু ধরে রাখা যায় না, ইচ্ছে সত্ত্বেও না।

দুঃখিতভাবে নিঃশ্বাস চাপল শ্যামল। এ-বছর, মনে পড়ে, ওই একই দিনে ঝুমিকে নিয়ে ম্যাটিনি শো দেখেছে দুপুরে, অফিস পালিয়ে। সন্ধেয় যথারীতি আড্ডা দিয়েছে চায়ের দোকানে বসে। রাতে ফেরার পর মা'র পোস্টকার্ড পেয়েছিল—তোমার বাবার মৃত্যুর পর আরো এক বছর কেটে গেল। কতো তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময়। মনে হয় যেন মানুষটিকে দেখতে পাই সর্বদা। খোকন, যেখানেই থাকো মনে রেখো তোমাদের বাবা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন, তাঁর আশীর্বাদ সব সময় তোমাদের ঘিরে আছে—

'ওর রাশি কী ছিল ? মেষ ?'

শ্যামল একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ প্রশ্নে থতমত খেয়ে তাকাল। সেই প্রবীণ লোকটি, খানিক আগেই মেলানো যায় না, মেলানো যায় না বলতে বলতে বসেছিল দূরে গিয়ে। এখন একেবারে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

'কেন বলুন তো ?'

'নাঃ, এমনিই।' একটু হাসল, 'হিসেব কষে দেখলুম, মেষেই সম্ভব। শনির রোষ পড়েছিল। সময় থাকতে কিছু একটা ধারণ করলে—'

কথা শেষ হল না। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে নৃসিংহ বলল, 'আপনারা নাকি সৎকার সমিতির গাড়ি বুক করেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ইস্— !' মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল নৃসিংহ, 'একবারই কাঁধে চেপে যেত, মশাই ! সেটাও হতে দিলেন না !'

ওয়ার্ডে ঢোকার গেটের মুখে ছোটখাট জটলা। গেটের মুখে মুণ্ডু ঢুকিয়ে একটা কালো গাড়ি জায়গা ঠিক করে নিচ্ছে। ওখানে নিখিল দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি দ্বিজু। বুঝতে দেরি হলো না। পর্যাপ্ত আলো আর রোদ মাথায় অফিসের জটলা ফেলে সেদিকে হাঁটতে গিয়ে বুকের ভিতরটা সামান্য মুচড়ে উঠল শ্যামলের। কতো তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময় !

॥ চার ॥

সকাল থেকেই আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছেন দাশরথি। ভাঙলেন একেবারে শেষবেলায়, দাহর শেষে—ভালোয় ভালোয় সব চুকে গেল এই রকম একটা ধারণা যখন সকলের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

মনে হয়েছিল মানুষটি নির্বিকার, স্পর্শ থেকে বহু দূরে। যা যা করতে বলা হলো বা করা উচিত, করলেন মুখ বুজে, ধীর মাথায়, খটখটে চোখে। দেখে মনে হবে, এতো বড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, ঝড়ের সব হাওয়া যেন ওঁর আশপাশ দিয়েই চলে গেছে। একই রকম দাশরথি—থলি হাতে বাজারে যান সকালে, অফিসের সময় অফিসে, ফেরার ভিড়ে অন্যমনস্ক চেয়ে থাকেন দূরে, আর চিন্তায় ঘুম হয় না রাতে।

ট্যাক্সিতে তুলে দিতে ওরা তিনজনেই গেল। ভিতরে অলোক, কনকের ছোট ; তার ওদিকে পাড়ার কেউ। সামনে কনকের মামা। গঙ্গাজলের ঘটিটা অলোকের হাতে তুলে

দেবার সময় পর্যন্তও কিছু বোঝা যায়নি। ট্যাক্সির দরজাটা ঠেলে বন্ধ করতে যাচ্ছিল অমিয়, দাশরথি হঠাৎ ওর হাতটা ধরে ফেললেন—

'পুত্রশোক কেমন তোমরা আমাকে বলে দাও!' ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন দাশরথি, 'এতো বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না কেন...'

অমিয় বুদ্ধিমান। দাশরথি নেমে আসছেন দেখে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলল। পিছনের কাঁচে জলে-ঘষা একটি ঝাপ্‌সা মুখ অনেকক্ষণ লেগে থাকল। শ্মশানের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে তিনজন কনকের মুখ মনে করার চেষ্টা করল।

তখন বিকেল। কিছু দেরি আছে সন্ধে হতে। চারিদিক ছেঁকে হাওয়া আসছে। বিকেলে সাবান মেখে চান করা যুবতীরা পাফ-করা ঘাড় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, ভেঁপ্ ভেঁপ্ করে হর্ন্ দিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সি, বুড়ি আয়ার হাত ধরে টলমলে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিশু। আর যা সবই যথাযথ। আলাদাভাবে তিনজনের কিছুই মনে পড়ল না। মনে পড়ল, কনক চলে গেছে।

অলস ভঙ্গিতে চুপচাপ খানিকটা হেঁটে এলো ওরা। মন্থর পা দুটো শুধু কোনো রকমে টেনে চলা। কিছুটা এসে আবার থেমে দাঁড়াল, খুব সাধারণভাবে সিগারেট ধরিয়ে নিল পরস্পরের হাত থেকে। তারপর হাঁটতে শুরু করল আবার।

'কতো দিন ভুগল কনু?' প্রথম কথাটা নিখিলই বলল, 'তিন মাস?'

'না, অতো দিন না। অমিয়, কতো দিন রে?'

'ওই রকমই। মাস আড়াই—।' খুব জোরে মাথা নাড়ল অমিয়, নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে। 'মনে হচ্ছে নিজের দোষেই গেল।'

'কেন!'

'মনে হচ্ছে। কেন জানি না।'

'শেষের দিকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। পরশু হঠাৎ বলল, সিক্রেটলি খবর নিস তো বাবার কতো টাকা গেছে এ-পর্যন্ত—'

'কেন?'

'যতোটা বাঁচে। মরেই যদি যাই, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল, বলেছিল—'

'বড়ো ইচ্ছে ছিল বাঁচার—'

'কার না থাকে!' নিখিল সোজাসুজিই বলল, 'তোর নেই? আমার নেই?'

আবার চুপচাপ। সামনে পড়ে আছে রাস্তা। আর স্তব্ধতা। কাল পর্যন্ত ব্যস্ততা ছিল, খানিক আগে পর্যন্তও ছিল। এখন আর কিছু নেই।

তিনজনে তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে এ ওর মুখ দেখে নিল।

॥ পাঁচ ॥

সামনের রাস্তাটা বড়ো দীর্ঘ মনে হয় অমিয়র। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। অথচ মানুষজন চলে, চলে শব্দ, ট্রাফিক সঙ্কেতে মাছের ঝাঁকের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি গাড়ির ঝাঁক, আবার চলতে শুরু করে—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর—চলার কোনো বিরাম নেই।

ইচ্ছে করলেই অমিয় উঠে পড়তে পারে। অনিচ্ছায় ওঠে না। ক্লান্তির সঙ্গে ভোঁতা দুঃখ এসে মেশে—একা হবার পর থেকেই অসহায়বোধ তীব্র হয়ে ওঠে তার মধ্যে। রাস্তা পার হতে গিয়ে কয়েকবারই তার মনে দ্বিধা জাগে, হাঁটু কাঁপে। অমিয় বুঝতে পারে না কেন রাস্তা পার হওয়া তার পক্ষে জরুরী। সে এখন বাসে বা ট্রামে উঠবে না, অন্য কোনো ব্যস্ততাও নেই। রেখা ? না, রেখার জন্যেও এখন সে কোনো রকম চাঞ্চল্য বোধ করছে না।

অপরিসীম দূরত্ব নিয়ে কিছু না ভেবেই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল অমিয়।

ক্ষিদে পেয়েছিল, খেল না। চা নিল। চায়ের কাপে একাকী চুমুক দিতে দিতে সে এক রকম কুণ্ঠা বোধ করল। চায়ের প্রস্তাবটা করেছিল শ্যামল, বাড়ি ফেরার নামে সে ওদের বিদায় করেছে। তেমন কোনো কারণও যে ছিল তা নয়। শুধু ভালো লাগছিল একটু একা থাকতে, একা থেকে যেমন-তেমন করে সময় কাটিয়ে দিতে। অনেক দিন তারা একসঙ্গে ছিল—কতো দিন, ঠিক ঠিক মনে পড়ে না। তবে বহু দিন। আর কি থাকবে ?

কে জানে ! হয়তো থাকবে না।

একত্র থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। চারিদিক থেকে উল্টেপাল্টে এতো দিন দেখেছে নিজেকে। চারটে দেওয়ালের মতো ঘর করে কিছু একটা পাহারা দিচ্ছিল এতো দিন—কী পাহারা দিচ্ছিল ?

বোধহীন শূন্যতায় চায়ের কাপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে রাখল অমিয়। কিছু একটা, কিছু একটা করতে করতে সিগারেট জ্বালিয়ে বুকের শূন্য জায়গাটুকু ধোঁয়ায় ভরে তুলল। একভাবে, অনেকক্ষণ। কিছুই তার মাথায় এলো না। কনকের মৃত্যুর জন্যে বিশেষভাবে তাকে কিছু বিঁধল না। ভাবল, দিন চলে যাবে।

না যাবার কিছু নেই। ঘর সংসারে এখন থেকে সে আরো একটু ব্যস্ত হয়ে পড়বে। রেখা পাঁচ মাসের অন্তঃস্বত্বা। দেখতে দেখতে সন্তান এসে পড়বে। নাঃ ! সে ভালোই থাকবে।

দিনগুলিকে রুটিনে বাঁধতে বাঁধতে সন্ধে পেরিয়ে রাস্তায় নামল অমিয়। বাসে উঠে চমৎকার ঘামের গন্ধ পেল। সে আর কিছু চায় না—শুধু নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা কতগুলি প্রত্যহ।

বাস থেকে নেমে স্বচ্ছন্দে লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে গেল অমিয়। বাজারের পথ ছেড়ে নিজেদের গলিতে ঢুকতে সে এতোটুকু উদাসীন হলো না। ফেরার পথে একই দোকানির কাছে ডিম কেনা তার প্রত্যহের অভ্যাস, তাকে ফাঁকি দিতে আজ সে ডান দিক ঘেঁসে গেল। সহজেই পেরিয়ে গেল চায়ের দোকানটা।

'কে যেন মারা গেল ?'

অমিয় চোখ তুলল। বাড়িওলা ভবেনবাবু, তাস পিটতে চলেছেন। ভালো লাগল না। তবু সহজে এড়ানোর জন্যে বলল, 'কনক।'

'কে কনক ! সেই লম্বা মাথা, রোগাটে কালো ছোকরা ?'

বর্ণনা মেলে না। কনক মোটেই লম্বা ছিল না। তার গড়ন মাঝারি, মোটা বা রোগা কোনোটিতেই পড়ত না সে ; রঙ ফরসা ঘেঁসা ছিল বলেই মৃত্যুর আগে কয়েকটা দিন ওকে বড়ো বেশি উজ্জ্বল দেখাত। লম্বা, রোগা, কালো এসব কিছুই ছিল না সে। ভবেনকে কাটাবার জন্যে অমিয় তবু ঘাড় নাড়ল। তারপর সত্যি সত্যিই পাশ কাটিয়ে গেল। আরো কয়েক পা এগিয়ে সে বাড়ির দরজায় পৌঁছুল।

ঘরের আলো নেবানো, জানলাটা খোলা। জানলার গরাদে মুখ রেখে বসেছিল রেখা। অমিয়কে দেখে আলো জ্বালল।

'শেষ হয়ে গেল সব ?' দরজা খুলেই রেখা বলল। তারপর যেমন-তেমন করে একটু দুঃখ মিশিয়ে বলল, 'এতো দেরি হলো কাজ মিটতে !'

'একেবারেই মিটিয়ে এলাম—'

মমতাহীন, নির্বিকার চোখে রেখার মুখ দেখল অমিয়—হঠাৎই আকাশ দেখার মতো করে, মিটিয়ে এলাম কথাটা প্রতিধ্বনিত হলো ওর বুকের ভিতর। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ও বাথরুমে যাবার কথা ভাবল।

রেখা বলল, 'দাঁড়াও।'

'কেন !'

'শ্মশান থেকে ফিরছ, তেতো খেতে হয়। মড়ার মায়া নিয়ে ঘরে ঢুকতে নেই—'

অমিয় আপত্তি করল না। দাঁতের আগায় একটু নিমপাতা কেটে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'মায়া কী জিনিস ?'

'আমিই কি ছাই জানি !' পর্দার ওপার থেকে রেখার গলা শুনল, 'সবাই যা করে আমিও তাই করলাম।'

অমিয় হাসল, কিছুটা গলা পরিষ্কার করে, বোধ হয় সে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। হাসতে হাসতেই বলল, 'সবাই যা করে !' একটু থামল। 'কনককে তো তুমি চিনতে। চিনতে না ?'

রেখা বোধ হয় এ-ঘরেই আসছিল। দরজার পর্দায় অমিয় ওর ছায়াটাকে থেমে পড়তে দেখল। পর্দার নিচে দিয়ে যেটুকু মেঝে দেখা যায় দেখল সমানভাবে পায়ের পাতা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে রেখা। চমৎকার সাদা পা। গেঞ্জি আর ট্রাউজার্সটা খুলে দরজার কোণে ছুঁড়ে দিয়ে ও বলল, 'আমার চেয়ে বেশি চিনতে—একসময় ওকে ছাড়া আমাদের কাউকেই তুমি চিনতে না ! চিনতে কি ?'

বলতে বলতে বাথরুমে গেল।

চৌবাচ্চার জলে অনেকক্ষণ ধরে চান করল অমিয়। আজ তার হাতে প্রচুর সময়। মরে গিয়ে সময়ের দাম কমিয়ে দিয়েছে কনক। একদা'র বন্ধু, গতকাল পর্যন্তও যার মাথায়, কপালে সস্নেহে হাত বুলিয়েছে, সেই কনক আজ, এখন কোথায় !

খুব শিথিলভাবে অমিয় কনক সম্পর্কে তার অনুভূতিগুলো প্রখর করার চেষ্টা করল, সব কিছু থেকে আলাদা করে নিয়ে ভাবল কনককে, কিন্তু ভিতর থেকে তেমন সাড়া পেল না। দুঃখ বা বেদনাবোধ, শোক—এই সব ব্যাপার থেকে সে কোনো সার সংগ্রহ করতে পারল না। যতবারই কনককে মনে করার চেষ্টা করল, দেখল রেখা জুড়ে আছে তার সমস্ত মন—রেখা, তার স্ত্রী, পাঁচ মাস ধরে জঠরে যে তার সন্তানের লালন-পালন করছে।

বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াল অমিয়। কোনো মায়া নয় ; শ্মশান থেকে চিট ধরার মতো ক্লিন্ন একটা অনুভূতি বয়ে এনেছিল সর্বাঙ্গে, সেটা গেছে

অনুভব করে নিজেকে অনেক পবিত্র লাগছিল। আজ সে অফিসে যায়নি। হাসপাতাল থেকে শ্মশান এই নিয়েই কেটেছে সারাক্ষণ, একটা জ্যান্ত মৃত্যুর আবহাওয়া ! সত্যি সত্যিই বড়ো বেশি দিন ধরে তাদের অধিকার করে ছিল কনক। বন্ধুর জন্যে যা করার—কর্তব্য যা-কিছু, সবই করেছে অমিয়। এখন মুক্তি। কাল রবিবার। পরশু থেকে সে আবার নিয়মিত অফিস যাবে। আড্ডার প্রশ্ন ওঠে না এখন, সত্যি বলতে, আড্ডাও কি আর থাকবে ! কনক নেই, এখন আর আড্ডা থাকার কথা নয়। এবার ফুটবলের মরশুম পড়ার আগেই রোগে পড়ল কনক, একদিনও খেলা দেখা হয়নি। এরপর মাঠে যাওয়ার ভূত আপনা-আপনিই নেমে পড়বে ঘাড় থেকে। পরিবর্তে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে অমিয়। রেখা আর সে— দু'জনে বেড়াতে বেরুতে পারে ; বাচ্চা হলে বা আর কিছু দিন পর থেকেই তো ন্যাজেগোবরে হয়ে পড়বে রেখা ! তার আগে যে ক'টা দিন আছে, পুরনো স্বাদগুলো খুঁটে নেবে।

এই সব ভাবনার মধ্যেই ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে অমিয় খবরের কাগজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আটটি পৃষ্ঠা পুরো পড়ে ফেলল। ঘড়িতে তখন দশটা। স্নায়ুময় অবসাদ, চোখ টাটিয়ে ওঠে—রেখা বিছানা করে মশারি ফেলছে দেখতে পেল, হাই উঠল পরপর, গলির দিকে একটা জোরালো আলো নিবে গেল টপ করে। আজ রাতে সে অনেকক্ষণ ঘুমোবে, অমিয় ভাবল, কাল সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবে মৃত কনকের বয়স ততক্ষণে এক দিন পুরে গেছে। পরশু দু' দিন। তারপর তিন দিন। মাঝে মাঝে মনে পড়বে কনককে। খুব কাছের মানুষ ছিল সে। 'কবে থেকে দেখছি তোমরা হরিহর আত্মা', বসুধা একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা চাও বাবা, তোমরা চাইলেই ও বেঁচে উঠবে।' কী সব ছেঁদো কথাবার্তার ওপর মানুষের নির্ভর ! হরিহরদের একজন এখন চান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে দিনান্তে খবরের কাগজ পড়ছে। রাজ্যপাট একই রকম থাকল—মাঝখান থেকে দিব্যি চলে গেল কনক !

'শেষ পর্যন্ত অসুখটা কী হয়েছিল ? লিউকোমিয়া ?'

সাবধানে মশারি তুলে খাট থেকে নামবার সময় রেখার জানু পর্যন্ত শাড়ি উঠে যায়, মৃদু রোম সমেত ধবধবে পায়ের গোছ বেরিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে অমিয় বলল, 'তাই-ই হবে। আর তো কিছু জানা যায়নি।'

'কী বিশ্রী রোগ ! আচ্ছা—', খেতে বসে বলল রেখা. 'ও তোমাদের আগে কিছু বলেনি ? অসুখটা আসছে যে টের পায়নি !'

'কী করে পাবে !' রুচি পাচ্ছিল না, গ্লাস শূন্য করে জল খেল অমিয়। উঠতে উঠতে বলল, 'শরীরের ভেতর রক্ত। রক্তের রঙ পাল্টে যাচ্ছে কখন, কী করে, ও কী করে বুঝবে !'

'কী সব রোগ ! আমাদেরও যে হবে না কী করে বুঝব !'

ঠিক প্রশ্ন নয়, বিস্ময়ও নয় ; দু'য়ের মাঝখানে কোনো এক স্তরে কথাগুলো আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল রেখা। নিজের সঙ্গে নিজের রফা করার মতো।

বাড়িতে আয়েস করে খাবার জন্যে দামী সিগারেট রাখে অমিয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকার চেষ্টা করল। রেখার শেষের কথাগুলো পরিষ্কার কানে যায়নি তার। তবু মনে হলো, যা'ই বলে থাকুক রেখা, ঠিক উত্তর যেন সে চায়নি। কনক চলে গেল—বলতে গেলে তাদের দাম্পত্য জীবনের শুরু করে দিয়েছিল কনকই, তার জন্যে

গভীর কোনো বিষাদ এখন সে বুক হাতড়েও খুঁজে পাচ্ছে না। তা হলে থাক অমিয়, থাক, তার সম্পর্কে অন্য আলোচনাও থাক। কী লাভ ! সে তার, বা তাদের বন্ধুই ছিল, আর কিছু নয়। খামোকা তাকে নিয়ে আর কাটাছেঁড়া কেন !

রাত এগারোটায় অমিয় হাই তুলল। একই ধরনের হাই, হাসপাতালের কেবিনের বাইরে আচ্ছন্নের মতো বসে গত কয়েক দিন ধরে যে-রকম হাই উঠত। এতক্ষণ ছিল না, কিন্তু এখন, আলো নেবানো সত্ত্বেও, মশারির ভিতর শুয়ে খোলা চোখে সে এক রকম মিহি আলো চুপচাপ ছড়িয়ে পড়তে দেখল। রেখার পাশে শুয়ে রেখার গা থেকে এক রকম গন্ধ পেল, চেনা গন্ধ। গন্ধটা নাকের সামনে অদৃশ্য হাতের রুমালের মতো নড়তে থাকল। ঘুম এলো না।

'তুমি কি ঘুমোলে ?'

'না—।' চিত হয়ে শুয়ে চোখের ওপর হাত চাপা দিল রেখা, 'ঘুম আসছে না।'

'কেন !'

আরো একটা আলো নিবে গেল কোথাও। মশারির ভিতর এখন থমথমে অন্ধকার। রেখা কোনো জবাব দিল না।

হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর বুক ছুঁলো অমিয়। বুক থেকে হাত তুলে গলায় ছোঁয়াল—ঘাম। তারপর অন্ধকারে মিশে যাওয়া হাত তুলে অমিয় রেখার নাক-মুখের ওপর রাখল।

'কী করছ ! দম বন্ধ হয়ে যাবে না !'

শব্দ করে হাসল অমিয়। হাতটা সরিয়ে নিল।

'কী ভাবছ ?'

'কী আর ভাবব !'

সেফের মাথায় টাইমপিস্‌টা টিক টিক করে চলেছে। চোখের ওপর অন্ধকারে খানিক সময় পার করে দিল অমিয়।

'কনক মারা গেল, তোমার খারাপ লাগছে না ? একসময় তো ওকে ভালবাসতে তুমি !'

বাতাসহীন গরমে অমিয়র কপালের ঘাম চুঁয়ে চুঁয়ে গলার কাছে নেমে এলো। অন্ধকারেই পাশ ফিরে রেখা ওর বুকের ঘন রোম আঁকড়ে ধরে বলল, 'আমি বেঁচে গেছি। যদি ওর সঙ্গেই আমার একটা কিছু হতো !'

'নিমপাতা ছোঁয়ালে, তুমি নিজেই মায়া কাটাতে পারলে না !'

গলায় কাশি উঠে আসতে আস্তে ঢোক গিলে নিল অমিয়। রেখার নিঃশ্বাস বুকের ঘামের ওপর পড়ে বিজবিজ করতে থাকল। অসংখ্য অদৃশ্য পোকা এই সময় অমিয়র বুক বেয়ে হাঁটাচলা শুরু করে দেয়।

'তুমি স্বার্থপর, তাই অমন করে ভাবছ।' একটু থেমে বলল অমিয়, 'ভেবে দেখ, রোগটা তো আমারও হতে পারত। এইরকমভাবেই হুট করে চলে যাওয়া যেত—'

কথাটা আবছাভাবে শেষ করল অমিয়। নিঃশ্বাস বন্ধ। অন্ধকারেই ও বুঝতে পারল রেখা নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। অমিয়কে তখনো ছুঁয়ে আছে না-ছোঁয়ার মতো করে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে কিছু বুঝবার চেষ্টা করছে যেন। অমিয়র বুকের ওপর দিয়ে অন্ধকার গড়িয়ে গেল।

'এমনভাবে যে-কেউই তো যেতে পারে। হঠাৎ। তুমি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছ ? যদি আমি মরতাম ! কে বলতে পারে !'

'তুমি !' চেষ্টাকৃত গলায় হাসল অমিয়, 'তা হলে অমিয় ব্যানার্জি বিপত্নীক হয়ে পড়ত। কিন্তু কনক আর অমিয় দু'জনেই থাকত। তা হল না। একজন চলে গেল !'

ওদিক থেকে কোনো জবাব এলো না। পাশ ফিরে শুলো রেখা। সম্ভবত ক্ষুণ্ণ।

কথা হারিয়ে অমিয় কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকল। নিবাতাস ঘরে গা দিয়ে ঘাম ছুটছে তিরতির করে। আজ তার ঘুমোবার কথা, ঘুমের সমস্ত উপসর্গ জড়ো হয়েছিল শরীরে, অথচ ঘুম আসছে না। পরিবর্তে কনকের মুখই বারবার ভেসে উঠছে চোখে। যতো কাল ছিল আমোদে ছিল ; আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হত না। তবু সে গেল, চলে গেল !

টুকটাক অনেক কথাই মনে পড়ে। কাছের দূরের নানান সব ঘটনা। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানে অমিয়।

'রেখা একদিনও এলো না !' হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে একদিন বলেছিল। আক্ষেপ বেজেছিল কনকের গলায়, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে মানুষ যে-রকম গলায় কথা বলে।

অমিয় জবাব দিতে পারেনি।

'বড় ভালো লাগতো এলে—', রুগ্‌ণ হাতটা কপালে বোলাতে বোলাতে বলেছিল কনক। শূন্য কপাল, সরু সরু আঙুলের চলাফেরায় আরো রুগ্‌ণ লেগেছিল তখন।

'আনব। খুব শিগগিরই নিয়ে আসব একদিন।'

'না, থাক।' জানলার পর্দায় চোখ রেখে বলেছিল কনক, 'কী হবে এসে !'

কনককে দেখার জন্যে সেদিন একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছিল অমিয়। তখনো বেলা যায়নি। রোদ পড়ে যাওয়া বিকেলের আলো ক্রমশ ঘন হতে শুরু করেছে। পর্দার ওপারে যেটুকু আকাশ দেখা যায় সেদিকে তাকিয়ে কনক বলেছিল, 'তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া। একা থাকতে ভাল লাগছে।'

রহস্যময় ! হয়তো। খটকা বুকে নিয়ে কেবিনের বাইরে এসে অমিয় বুলাকে পেল। রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

'দাদার মনটা ভালো নেই মনে হলো।' বুলা বলল, 'কী হয়েছে বলুন তো ?'

'জানি না।'

সারা দিনের অপরিসীম ক্লান্তির পর ঘুম-না-আসা তন্দ্রার আচ্ছন্নতায় বুকের কোথাও পরপর ঘড়ির শব্দ ও দাঁড় টানার ছলছল শব্দ শুনতে পায় অমিয়। চিত হয়ে শুয়ে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে ; অবসন্ন হাতের আঙুলগুলো কপালে ছোঁয়াতেই কেমন হাড়-হাড়, রুগ্‌ণ মনে হয়। এখন চারিদিক নিঃশব্দ। রেখা ঘুমিয়ে বা জেগে ঠিক বোঝা যায় না।

অমিয় পাশ ফিরে শুলো।

'রেখা ?'

'কী ?'

'কনকের সঙ্গে তোমার কী ধরনের আলাপ ছিল ?'

'কেন ?'

'বলো। জানতে চাইছি—'

হঠাৎ মুখ ফেরাল রেখা। ক' মুহূর্ত থেমে থাকল।

'কোনো দিন তো জানতে চাওনি ! আজ কেন চাইছ !'

অমিয় ঠিক বুঝতে পারে না কী বলবে, কী বলা উচিত। দিশেহারা চোখে অন্ধকারে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হয় টাইমপিস্‌টা তার বুকের ওপর চেপে ধরেছে কেউ। নিঃশ্বাস সহজ করার জন্যে আবার পাশ ফিরে শুলো অমিয়।

॥ ছয় ॥

পরপর কয়েকটা দিন শুয়ে-বসে হাই তুলে কাটিয়ে দিল নিখিল। কনকের মৃত্যুর পর বেশ ক'টা দিন কেটে গেল আদ্যন্ত নিরুৎসাহের মধ্যে, উদ্দেশ্যহীন ভাবনায়। কাজ বলতে একটিই ছিল, অফিসে যাওয়া। গেল না। অর্থহীন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাবনায় ভিজে থাকল সারাক্ষণ। অগোচরের কোনো এক বোধ অভ্যস্ত দৈনন্দিনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনল তাকে। বুকভর্তি খাপছাড়া নিঃশ্বাস তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও। ভালো লাগে না—আর কিছুই ভালো লাগে না।

বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ একই সঙ্গে অস্বস্তি ও অনুতাপ বোধ করল নিখিল। এই ক' দিনে সে অনেক পিছিয়ে পড়েছে, নিস্তেজ তো হয়েইছে। কেমন ভুলে যাচ্ছে সব কিছু— দরকারী অদরকারী কিছুই আর মনে পড়ে না। আর কিছু না হোক, চাকরির দরখাস্তের কথাটা সে ভুলে গেল কেমন করে ! শেষ তারিখটা কবে ছিল ? বুধবার, না বেস্পতিবার !

প্রায় ভোর রাতেই ড্রয়ার টেনে সে ব্যক্তিগত কাগজপত্র বের করল—আশ্বস্ত হলো একটু। না, কাল পর্যন্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে। ফর্ম নেওয়া আছে, আজই পোস্টাল অর্ডার কিনে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবে।

বারোটা নাগাদ অফিসে পৌঁছে শুনল গতকাল ও আজ মিলিয়ে বার তিন-চার একজন তাকে ফোনে খুঁজেছে। মহিলা। নাম বলেনি। হয়তো আবার করবে।

কে ! আত্মগত হয়ে অনেক ভাবল নিখিল। ঠিক কে হতে পারে অনুমানে কুলোল না।

'কী দরকার কিছু বলেছে ?'

ফোন ধরেছিল বিলিংয়ের প্রফুল্ল। হেসে বলল, 'যে নাম বলেনি সে দরকার কেন বলবে দাদা !' তারপর, নিখিলকে ভাববার সময় দিয়ে, ফাজিল গলায় বলল, 'গলা শুনে মনে হলো ইয়াং। নিশ্চয় কোন প্রাইভেট ব্যাপার !'

জবাব দিল না নিখিল। প্রফুল্লর মুখের দিকে খানিক অন্যমনস্ক তাকিয়ে থেকে মাথাটা নামিয়ে আনল টেবিলে। প্রাইভেট ব্যাপার—প্রাইভেট ব্যাপার, আটাকলের চাকার মতো কথাটা ভনভন করে ঘুরতে থাকল মাথায়।

টেবিলে অনেক কাজ। গোটা চারেক ফিতে-বাঁধা ফাইল আর কাগজের স্তূপ ; ঘৃণাভরে দু' একটা উল্টে-পাল্টে দেখল সে—কিছুটা সময় গেল। টেলিফোন আর কাজ, দুটোর ভাবনাই তাকে বিমূঢ় করে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর, হঠাৎই সব কাগজপত্র তুলে সেকসান-ইনচার্জের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এইসব আমার টেবিলে পাঠিয়েছেন কেন ! কে করবে ?'

'কেন ! ওগুলো তো আপনারই কাজ ! তিন দিন আসেননি বলেই—'

নিখিল ভুরু কোঁচকাল। বিরক্ত।

'যদি এক মাস না আসি, তাহলেও সব টেবিলে জমা করবেন ! কী ধরনের সিস্টেম আপনাদের ! হোপলেস !'

মুকুন্দ সান্যাল নরম লোক। যে-কোনো কারণেই হোক নিখিলকে পছন্দ করে। কথাগুলো হজম করে নিল নির্বিবাদে। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

'বসে কী হবে !'

'আহা, রাগ করছেন কেন ! বসুনই না—'

অনিচ্ছায় বসল নিখিল। সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল মুকুন্দ।

'কী হয়েছিল দু' দিন ?'

'কিছু নয়। এমনিই—।' পরে বলল, 'আমার এক বন্ধু মারা গেছে।'

'সত্যি !' চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছড়িয়ে দিল মুকুন্দ, 'ইস্ ! কে বলুন তো ?'

'কনক। আপনি চিনবেন না—'

'নামটা চেনা চেনা লাগছে। হঠাৎই গেল ?'

'হঠাৎ কিছু না। ভুগছিল, খুব খারাপ অসুখ…', বলতে বলতে থামল নিখিল, তেরছা করে তাকাল মুকুন্দর দিকে।

'এতো কথা জানতে চাইছেন কেন ! বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'না, না, সে-সব কিছু নয়।' অপ্রতিভ হাসল মুকুন্দ। 'কাগজপত্র আপাতত আমার টেবিলে থাক। আজ আপনার মেজাজ খারাপ, রেস্ট নিন।'

এমনিতে খারাপ লাগে না। তবু এখন কেমন ধূর্ত মনে হলো মুকুন্দকে—একটু বসিং করে নিল যেন।

ফোনের কথাটা ভুলতে পারল না নিখিল। যতোটা সম্ভব একাগ্র হবার চেষ্টা করল, যদি কাউকে মনে পড়ে।

না, তেমন কেউই নেই। খুব কম মহিলার সঙ্গেই তার জানাশোনা। তাদের মধ্যেও এমন কেউ নেই যে তাকে ডাকতে পারে ফোনে। যাদবপুরের দিকে থাকে এক পিসতুতো দিদি, মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিত ফোনে। ছেলের চাকরির জন্যে কিছু দিন খুব ঘনঘন ফোন করত। দুর্গাপুরে ছেলের চাকরি হবার পর একটা খবর দিয়েছিল। সেই শেষ। পুরনো ব্যাপার। কী যেন নাম ছিল ছেলেটির ! অশোক ? সম্ভবত অশোক। আর কাউকে মনে পড়ে না।

অশান্তি নিয়ে টিফিনের আগেই উঠে পড়ল নিখিল। অপারেটর বসে দোতলায়, তাকে গিয়ে ধরল।

'আমার একটা ফোন এসেছিল। কে করেছিল বলতে পারেন ?'

খুব স্বচ্ছন্দ গলায় মেয়েটি বলল, 'না' ; তারপর লাইনে কথা বলতে শুরু করল।

নিখিল তবু দাঁড়িয়ে থাকল। কথা শেষ করে হাসল মেয়েটি।

'লাইন এলে তো দিয়েই দিই। ডিপার্টমেণ্টে বলতে পারবে, সেখানে জিজ্ঞেস করুন।' বলেই পটাপট লাইন খুলতে শুরু করল। অপেক্ষা না করে দ্রুত রাস্তায় নেমে এলো নিখিল।

টিফিনের সময় পি-বি-এক্স বন্ধ থাকবে। তার মানে এখন ঘণ্টা খানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত। এই এক ঘণ্টায় চটপট কাজগুলো সেরে নিতে হবে। পকেট থেকে খামসুদ্ধ

দরখাস্তের ফর্মটা হাতে নিয়ে জি. পি. ও-তে চলে এলো নিখিল ; পোস্টাল অর্ডার কেনার জন্যে লাইনে দাঁড়াল।

বেশ ভিড়। কাউন্টারের লোকটি হাত চালাচ্ছে নিজের মতো করে ; পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজনকেও নড়তে দেখল না লাইন থেকে। এইভাবে চললে ঘণ্টা দেড়েকের আগে সে ফিরতে পারবে না অফিসে। যে ফোন করেছিল ইতিমধ্যে সে যদি আবার ফোন করে ! পোশাকের আড়ালে কুলকুল করে ঘামতে থাকল নিখিল।

আবার অফিসে ফিরতে সওয়া দুটো বেজে গেল। মাঝ পথে কোনো জায়গায় লিফ্‌ট্‌ আটকে আছে, অপেক্ষা না করে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এলো তিনতলায়। জিজ্ঞেস করতে প্রফুল্ল বলল, 'আসেনি।'

নিখিল হতাশই হলো। বরং ভালো হতো যদি এসে শুনত ফোন এসেছিল, সেই একই গলা, নাম বলেনি। সে কি এই রকমই কিছু আশা করেনি !

চিন্তা গেল না। সিটে বসে তবু কিছুটা ধাতস্থ হয়ে নিল নিখিল। আত্মস্থতার মধ্যেই টের পেল বুক থেকে কঠিন ভারের মতো কিছু একটা নেমে যাচ্ছে। নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে এখন বেশ ভালো লাগছে। কিংবা, ধাতস্থ হবার পর ভাবল, এমনও হতে পারে, টেলিফোনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানানো, সুযোগ বুঝে প্রফুল্ল তার সঙ্গে একটু তামাশা করে নিল। এ-রকম তো কতোই হয় !

খুব অলসভাবে সময় কেটে যেতে লাগল নিখিলের। পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছে সকলে—আশেপাশে ব্যস্ততা। একা, কর্মহীন, তার সময় কাটতে লাগল ঢিকুতে ঢিকুতে। ঘড়িতে তিনটে বাজল, সওয়া তিনটের মধ্যে নিয়মমাফিক চা দিয়ে গেল বেয়ারা। অদূরে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে কুমিরের মতো একাগ্র চিন্তায় ভাসতে থাকল সে। নাঃ, এলো না।

খানিক আগেও চনমনে রোদ ছিল। দেওয়ালে ছায়া ঘনাতে দেখে বুঝল মেঘ করেছে। ক'দিন খুব গরম যাচ্ছে, বৃষ্টি হলেও হতে পারে। এই বদ্ধ গুমোট ভাবটা সত্যিই কাটা দরকার।

চা'টা কোনো রকমে শেষ করে বাইরে এলো নিখিল। বারান্দায়। এখানে দাঁড়ালে গঙ্গা দেখা যায়। মরা রোদে নৈরাশ্যের ভাব ; এই রকম বিকেলে হঠাৎই মন খারাপ হয়ে পড়ে।

জলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল নিখিল। একটা বড়ো জাহাজ চোখে পড়ল, রেখার আঁকিবুকি দেখে মনে হয় জাপানী। একটা মোটর লঞ্চ লেজের ঘায়ে জল ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যাচ্ছে—ব্রিজের নিচে পর্যন্ত নিখিল লঞ্চটাকে ধাওয়া করল। আকস্মিক হাওয়া ছুটে এলো কোথা থেকে। নদীর বুক ছুঁয়ে উঠে আসার জন্যেই সম্ভবত বাষ্পাচ্ছন্ন ও ভিজে। ঘাড়ে, মুখে ঝাপ্‌টা লাগতে আর্দ্রতা টের পেল নিখিল। বুকের মধ্যে মৃদু কষ্ট—চিন্তার ভিতর সব কেমন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠিক বোঝা যায় না কেন এই অস্বস্তি। সে কি সত্যি সত্যিই কারও অপেক্ষায় ছিল ! নাকি সব কিছুর শুরু সেই শূন্যতায়, কনকের মৃত্যুর পর ক্রমাগত তিন দিন যা তাকে নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল।

আবার ভিড়ের মধ্যে ফিরে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিখিল। একটু অপেক্ষা করে রিসিভারটা তুলে নিল হাতে।

প্রফুল্ল বলল, 'পাগ্‌লা হয়ে গেলেন নাকি দাদা ?'

'কেন !'

'ফোন এলে ডাকতুম...'

মুখে একটা বাজে খিস্তি এসে গিয়েছিল। সামনে নিয়ে লাইন চাইল—লঞ্চটা ব্রিজ বরাবর পৌঁছুবার সময়েই ফোন করার কথাটা প্রথমে মনে হয়েছিল তার। লাইন পেয়ে অমিয়কে খুঁজল।

এক হাত ঘুরে ওপাশে অমিয়র সাড়া পেল।

'নিখিল বলছি। খবর কী তোর ?'

'কী আর তেমন...চলে যাচ্ছে। তুই অফিসে আসছিস না কেন ?'

'ফোন করেছিলি ?'

'না, শ্যামল বলল। অসুখ-টসুখ নয় তো ?'

'না, না, ভালো লাগছিল না।'

নিখিল থামল। এই মুহূর্তে অমিয়কে ফোন করার একটা নিশ্চিত উদ্দেশ্য আছে, অথচ কথাটা পরিষ্কার করে বলতে অসুবিধে হচ্ছে। কানে রিসিভার লাগিয়ে অমিয়র পরের কথার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল নিখিল।

'কাল আমরা কনকের ওখানে গিয়েছিলাম।' অমিয় বলল, 'তুই থাকলে ভালো হতো।'

'হ্যাঁ। কেমন আছে ওরা ?'

'কেমন আর ! বুঝতেই পারছিস...'

একটু চুপ করে থাকল অমিয়। তারপর বলল, 'মাসিমা বলছিলেন তোর কথা। তুই যাচ্ছিস না কেন ?'

'ভালো লাগে না...'

'যাস একবার। আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি, পরে দেখা করব...'

'হ্যালো...হ্যালো...', অমিয় দূরে যেতে প্রায় চিৎকার করে উঠল নিখিল, 'হ্যালো, অমিয়...'

'কী বলছিস আবার ?'

'রেখাব খবর কী ? কেমন আছে ?'

'মোটামুটি। ওর জন্যেই বাড়ি ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি—'

'আচ্ছা', ভেবে বলল নিখিল, 'রেখা কি ফোন করেছিল আমাকে ?'

'রেখা ! হঠাৎ ?'

রিসিভারটা অল্প কেঁপে গেল হাতের মুঠোয়। প্রায় জ্বরের ঘোরে বলল নিখিল, 'একটি মেয়ে ফোনে আমাকে খুঁজছে। ভাবলাম, রেখা হয়তো।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না অমিয়। খানিক অপেক্ষার পর থতমত গম্ভীর গলায় বলল, 'তোরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস !'

ফোন ছেড়ে দিল। রিসিভার নামিয়ে রাখার গাঢ় ধাতব শব্দটা অনেকক্ষণ লেগে থাকল কানে।

ঠিক এভাবে কথাটা বলতে চায়নি সে। তবু বলা হলো। ভেবে দেখলে তার কথায় অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি—নিতান্তই কৌতূহল মেটানোর জন্যে একটা প্রশ্ন করেছিল, অমিয়র ক্ষুব্ধ হবার মতো কারণ ঘটেনি। যে যা'ই বলুক, সে অমিয়র প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কোনো দিন ছিল না। রেখা সম্পর্কে দুর্বলতা ? অসম্ভব। এ-রকম করে কোনো দিন কিছু ভাবেনি।

তা হলে এমন হলো কেন!

হয়তো একটু বেশি সময়ই নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল নিখিল। কতোক্ষণ, ঠিক খেয়াল ছিল না।

চমক ভাঙল বেয়ারার ডাকে। এনকোয়ারিতে এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন, ডাকছেন। জবাব না পেয়ে বলল, 'ডেকে আনব?'

'নাম বলেনি?'

'না। দেখে মনে হয় বিধবা। ডাকব?'

'না,থাক।'

আশেপাশে খুব সতর্কভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেয়ারাকে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিও।'

অভ্যাসে ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল হলো আজ সারা দিন সে ড্রয়ার খোলেনি। কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। বারোটা থেকে সাড়ে চারটে কিছু কম সময় নয়। সমস্ত সময়টুকুই সে কাটিয়েছে স্তব্ধ সময়হীনতার মধ্যে, এক রকম অন্যমনস্কতা নিয়ে। ক্ষতের খসে-পড়া চামড়ার মতো মাঝখানে অমিয়র সঙ্গে কথাবার্তা—ঘটনাটা ঘটে গেলেও এখন যা অবিশ্বাস্য লাগছে। এখন, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসতে আসতে, নিখিল শুধু ভাবল, কেউ অপেক্ষা করছে তার জন্যে। কে? বিশ্বাস হলো না।

নিচে এসে দেখল বুলা। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দিশেহারা চোখে তাকিয়েছিল সিঁড়ির দিকে, নিখিলকে দেখে এগিয়ে এলো।

'আরে, তুমি!'

শেষের কথাটা খুব আস্তে, হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার মতো করে উচ্চারণ করল নিখিল। আশেপাশে আরো কেউ কেউ বসে আছে, বিশেষত ঈষৎ সন্দিগ্ধ চোখে তাদের লক্ষ করছে রিসেপসানিস্ট মেয়েটি। খুব কম মহিলার সঙ্গে জানাশোনা বলেই এ-ব্যাপারে একটু সঙ্কোচ লাগল নিখিলের, এমনভাবে কথাটা বলল যাতে কেউ শুনতে না পায়।

বুলা এগিয়ে এলো কাছে। নিঃশ্বাস চাপতে চাপতে বলল, 'বাব্বা, তিনবার ফোন করেছি আপনাকে!'

'তা হলে তুমিই—!'

কেন বুলার কথাটা আগে মনে হয়নি ভেবে আক্ষেপ হলো নিখিলের। তারপরেই তাড়াহুড়ো করে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী হবে! চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'এতো তাড়াতাড়ি!'

দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে বুলাকে তাকাতে দেখে নিখিল বলল, 'আমার ছুটি হয়ে গেছে। এসো, বলছি।'

রাস্তায় নেমে অনেকটা হাল্‌কা লাগল নিজেকে। পিছনে বুলা।

অফিস ছুটি হতে এখনো কিছু দেরি আছে, জ্যাম নেই, এখনো খুব সাবলীলভাবে হাঁটাচলা করছে মানুষ। সামনে মসৃণ রাস্তাটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই পথ ধরে অফিস ছুটির আগেই কতো দিন হাইকোর্টের সামনে দিয়ে চমৎকার চলে যাওয়া যেত খেলার মাঠে। মনে পড়ায় বুকের ভিতরটা অল্প মুচড়ে উঠল নিখিলের। নিজের ভিতরেই তোলাপাড়-করা এক রকম অসহযোগ ক' দিন ধরে টের পাচ্ছে। এই মুহূর্তেও হঠাৎ অসহায় লাগল নিজেকে। কনক থাকলে বুলা নিশ্চিত এতো দূর ছুটে আসত না। কী

প্রয়োজন বুলার তার সঙ্গে !

সোজাসুজি বুলার মুখের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ হলো নিখিলের। সঙ্গে ডাকার মতো করে বুলার জন্যে পাশে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সামনে হাঁটতে লাগল। খুব সাধারণ একটা শাড়ি বুলার গায়ে, সাদা ব্লাউজ, পায়ে জঞ্জাল খুঁজে বের করে আনা রবারের চটি। বুলাকে কেন বিধবা মনে হবে ঠিক বুঝতে পারল না।

'অফিসে এসেছি জানলে কী করে ?' আরো খানিকটা হেঁটে এসে প্রথম কথা বলল নিখিল।

'বাড়িতে গিয়েছিলাম।' বুলার গলায় জড়তা। একটু কাশল, সহজ হবার চেষ্টা করল। 'অফিসে বলল অসুস্থ, তাই বাড়িতেই গেলাম। শুনলাম অফিসে এসেছেন—'

'অনেক ছুটোছুটি করেছ তা হলে— !' নিখিল বলল, 'অসুস্থ কিছু নয়। ভালো লাগছিল না, বুঝতেই পারছ—'

বুলা বলল, 'আপনার অফিসটা বেশ। দাদার অফিসটা বোধ হয় ওই দিকে ছিল…'

পুবমুখো হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকে তাকাল বুলা। নিখিল জবাব দিল না।

সত্যি বলতে, বুলার সান্নিধ্যে সে এক রকম অস্বস্তি বোধ করছিল। এই পরিবেশে কোনো মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি সে হেঁটেছে কি না সন্দেহ। ক্রমশ নরম হয়ে আসা রোদের আভা ছড়িয়ে আছে উঁচু বাড়িগুলোর মাথায়, হাওয়া বইছে এলোমেলো, চলমান প্রতিটি মুখই অপরিচিত—এর মধ্যে যতোবারই সে বুলাকে একান্ত করে ভাবল, ততোবারই মনে পড়ল কনকের মুখ—মৃত ও অক্ষম, ঝুলে-পড়া জিবের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে একটা জীবন্ত মশা।

এ-সবের কী মানে হয় ! নিখিল ভাবল। বুলা সম্পর্কে আলাদা করে চিন্তা করার সত্যিই কিছু আছে নাকি ! কনকের বোন, খুব কম করেও আট দশ বছর দেখছে তাকে, প্রায় ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয়ের মতন—বুলা সম্পর্কে এই মুহূর্তে অন্য কোনো ভাবনা প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে হেঁটে চলাতেও কোনো আকস্মিকতা নেই। আজ সারা দিন ধরে বুলা তাকে খুঁজেছে ফোনে, ফোনে না পেয়ে বাড়িতে গেছে, বাড়িতে না পেয়ে এসেছে অফিসে। নিশ্চিত নিখিলকে তার জরুরী দরকার। এমন কোনো কথাবার্তা আছে যে-জন্যে সামান্য অপেক্ষাও সহ্য হয়নি বুলার—ভাবতে ভাবতে বুক ভরে উঠল নিখিলের।

কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট পেরিয়ে এসে নিখিল দাঁড়াল।

'তোমাকে অনেকটা হাঁটিয়ে আনলাম। খারাপ লাগছে ?'

আস্তে ঘাড় নাড়ল বুলা। অশৌচের সময় বলেই সম্ভবত, অসম্ভব ক্লান্ত, রুক্ষ ও নীরক্ত লাগছিল বুলাকে। দূরে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'কোথাও না।' অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল নিখিল। নিচু গলায়, প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, 'ক'টা দিনে কেমন বদলে গেলাম—'

বলতে বলতে থামল। এসব কথা বুলাকে বলে কী লাভ ! বুলা তাকে বুঝবে না ; বস্তুত, বুঝতে পারার তেমন কোনো কারণই নেই। যতো দিন কনক ছিল—ওরা ছিল ; পল্‌কা, ভারা-ভাঙা সেতুর মতো এখনো একটা যোগাযোগ রেখে চলেছে কনক। যতোই উত্তপ্ত হোক, স্মৃতি মাত্র নির্ভর করে পারাপারের চেষ্টা বৃথা। আজ বলে নয়, আর কোনো দিনই কি সম্ভব হবে !

নিজেকে পাশ কাটিয়ে পরপর কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এলো নিখিল।

'তোমাদের কী খবর ? আমি দু' দিন যেতে পারিনি। এমনিই, কোনো কারণ ছিল না।' অল্প থামল। 'তুমি কি কিছু বলবে ?'

একটু ভাবল যেন বুলা। কোনো ভূমিকা না করেই বলল, 'আমার একটা চাকরি দরকার নিখিলদা।'

'হঠাৎ !'

অভ্যাসেই বলেছিল। পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল নিখিল, এভাবে বলা ঠিক হয়নি। বুলা কিছু ভাবতে পারে। সামাল দেবার মতো একটা কথার জন্যেও ছটফট করল ; কিন্তু জুতসই কোনো প্রসঙ্গ মনে এলো না।

ওরা যেখান দিয়ে হাঁটছিল, সেখানে, ফুটপাথের আশপাশ থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরুনোর মতো হঠাৎই মানুষ ও গাড়ির শব্দ সচকিত করে তুলল। সম্ভবত অফিস ছুটির সময় পেরিয়ে গেছে। প্রায় গা-ঘেঁসে যেতে যেতে জন চারেকের একটি দল পিছন ফিরে তাকাল তাদের দিকে। না, তাদের দেখে অন্য কিছু ভেবে নেওয়ার কারণ নেই। সম্পূর্ণ প্রেমহীন এই ভ্রমণ। বাড়ি ফিরে বিছানায় গড়াতে পারলেই তার এখন সবচেয়ে ভালো লাগত। আর বুলা—বুলার একটা চাকরি দরকার।

ব্যস্ত ও গতানুগতিক কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেকে অসম্ভব নির্জন লাগল নিখিলের। সেই একই বিচ্ছিন্নতার বোধে আবার সে আক্রান্ত হলো, গত ক' দিন ধরে ক্রমাগত যা তাকে ঘুমের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনুগতের মতো রাস্তা পেরুল বুলা। কিছুক্ষণ আগেও একটা উদ্বেগ ছায়া ফেলেছিল তার মুখে, এখন সে-সব কিছু নেই। অন্যমনস্কতায় দৃঢ় মুখ, বুলা হাঁটছে, দেখে মনে হয় আরো অনেকক্ষণ একইভাবে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না।

সামনে ময়দান। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিখিল বলল, 'মাঠে বসবে ? তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ !'

একটু কাঁপল বুলা, ইতস্তত করল অল্প। আশেপাশে তাকিয়ে বলল, 'বসি। আপনি আমায় বাসে তুলে দেবেন।'

বসার পর নিজেকে খানিকটা সহজ লাগল নিখিলের। দূরে খেলার মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের কি খুব অসুবিধে হচ্ছে, বুলা ?'

হাঁটুর ওপর গলা নামিয়ে বসে এক হাতে ঘাস খুঁটছিল বুলা। একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল।

'আপনি তো সবই জানেন— ।' সময় নিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বুলা বলল, 'দু' দিনেই বাবা কেমন বদলে গেছেন ! সারাক্ষণ গালমন্দ করছেন সকলকে। দাদার মৃত্যুর জন্যে নাকি আমরাই দায়ী—আমরা সকলে !'

কথাটা আচমকা শেষ করে গম্ভীর হয়ে গেল বুলা।

নিখিল অপ্রতিভ বোধ করল। ঠিক এই কথাগুলোর জন্যে সে তৈরি ছিল না।

'সবই টেম্পোরারি।' ভেবে বলল, 'শক্‌টা কম নয়। দু' দিন পরে আর বলবেন না।'

'জানি।' বুলা বলল, 'বাবার কোনো দোষ নেই। এতো দিনের পরিশ্রম, আশা, স্বপ্ন—বাবার কী গেছে আমি জানি। আর দু' বছর চাকরি। তারপর আমরা কোথায় দাঁড়াবো নিখিলদা !'

প্রচণ্ড বেগে একটা লরি ছুটে গেল সামনে দিয়ে। বুলার মুখ নামানো। চোখ দুটো

পায়ের পাতায়। ভিতরের আবেগ চাপা দেবার জন্যে একটা বড়ো ঘাস চেপে ধরেছে দাঁতের মাঝখানে। স্থির চোখে ক' পলক ওর সাদা কপাল ও রুক্ষ মাথার দিকে তাকিয়ে থাকল নিখিল।

'কী ঠিক করেছ? চাকরি করবে?'

'আর কী করব!' হতাশ গলায় বলল বুলা, 'পড়াশুনো ছেড়ে পাঁচ বছর বসে আছি। এতো দিন ঢুকে পড়তে পারতাম যা হোক কোথাও। দাদা দেয়নি। ঝুমি আছে, অলোকের স্কুল পেরোতে অনেক দেরি। দাদা এমন হঠাৎ চলে যাবে কে জানত!'

গভীর গলায় কথাটা শেষ করল বুলা। আঁচল তুলে মুখ মুছল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নিখিলের হঠাৎ মনে হলো, বুলাকে এতো দূরে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি।

কেন, তা নিজেও বুঝতে পারছিল না। কী বলবে বুলাকে! ভেবো না, আমি আছি। আমার দায়-দায়িত্ব কিছু নেই, আমি কিছু দিতে পারব তোমাদের! বড়ো বেশি উদার হয়ে পড়ছে না সে! বড্ড নাটকীয়! তার চেয়ে বরং বুলাকে কিছু আশ্বাস দেওয়া ভালো—আজ অন্তত ও বাড়ি ফিরে যাক।

'বুলা, আজ ওঠো, ফেরা যাক।' নিখিল বলল, 'আমি ভাবি একটু। একটা উপায় বেরিয়ে যাবে—চিন্তা করো না।'

ঘন চোখে নিখিলের মুখের দিকে তাকাল বুলা। ঠোঁট কাঁপছিল। উঠতে উঠতে বলল, 'কোনো দিন এরকম হবে ভাবিনি।'

নিখিল জবাব দিল না। কনকের মৃত্যুর দিন সকালে জানলায় দাঁড়িয়ে বুলা তাকে কী বলেছিল মনে পড়ল। পাশে এসে বুলা বলল, 'দাদার অফিসে আমায় একটা কাজ দেবে না?'

আকাশটা এক দিকে কাত হয়ে পড়েছে। আজ হয়তো তাড়াতাড়ি সন্ধে হবে।

বুলার প্রশ্নটা সাবধানে এড়িয়ে গেল নিখিল। ভারী পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে ওর হঠাৎই মনে হলো, বুলা তো অমিয় বা শ্যামলের কাছেও যেতে পারত, তবু তার কাছেই এলো কেন! বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

বাস স্টপে পৌঁছেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বুলা। পরশু থেকে দাশরথি অফিসে বেরুচ্ছেন; সেই সুযোগে আজ সে বেরিয়ে পড়েছিল। নিখিলের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনে এতোক্ষণ যেন বুলা ভুলে ছিল, বিকেল পড়ে আসতেই তৎপর হলো।

পরপর কয়েকটা বাস ছেড়ে দিতে হলো। ভিড় খুব বেশি; যতো জন নামছে, উঠছে তার বেশি। নিখিল তেমন উৎসাহ পাচ্ছিল না। বুলার মুখ ক্রমশ ফ্যাকাশে হতে দেখে বলল, 'চলো, একটা ট্যাক্সি নিই। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—'

'না, না।' বুলা আপত্তি করল, 'আপনি আলাদা যাবেন। আমি এসেছি কেউ তো জানে না।'

'বেশ। তোমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেবো। আমি যাচ্ছি না—'

খানিক ছুটোছুটির পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বুলাকে উঠিয়ে নিজে উঠল নিখিল। সাবধানের দূরত্বে বসে খানিক চোখ বন্ধ করে গতি অনুভব করার চেষ্টা করল। ছিমছাম হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল মুখের ওপর দিয়ে—মৃদু ঘুমের মতো সেই পুরনো অবসাদ আবার চারিদিক থেকে ছেঁকে আসছিল। ট্যাক্সির সিটে গা এলিয়ে দিয়ে একা নিখিল সেই অবসাদে গা ভাসিয়ে দিল।

হয়তো অনেকক্ষণ সে এই রকম আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিল। চমক ভাঙল বুলার কথায়।

'দাদা কি আত্মহত্যা করেছিল নিখিলদা ?'

'কেন !'

নিখিল সোজা হয়ে বসল, সোজাসুজি তাকাল বুলার মুখের দিকে।

বুলার চোখ বাইরে। ক' মুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে আড়ষ্ট গলায় বলল, 'কী জানি, মাঝে মাঝে মনে হয়... ।'

যেন কিছু বলতে চাইছিল বুলা, বলল না ; ওর গলা শুনে সেই রকম মনে হয় নিখিলের। খানিক আগে যাকে মনে হচ্ছিল অত্যন্ত অসহায়, এখন আবার তাকে রহস্যময় লাগছে। সান্নিধ্যে থেকেও বুলাকে বড়ো বেশি অস্পষ্ট মনে হলো নিখিলের। যেন এই ট্যাক্সিতে, তার পাশে, নিখিল নেই, বাকি পথটুকু সেই রকম কাঠকাঠ হয়ে বসে থাকল বুলা। আর কোনো কথা হলো না।

ট্যাক্সি থেকে নামার আগে বুলা বলল, 'দাদার একটা ডায়েরি খুঁজে পেয়েছি। আপনাকে দেখাবো।'

॥ সাত ॥

এটা ওটা করতেই অনেকখানি বেলা গেল। পুজোর কাজকর্ম, জোগাড়, যা করার বুলাই করেছে। তবু ক্লান্তি যেন সবটা তারই। অলস, ঘুম-ঘুম লাগছে। সরবতের গ্লাসটা কোনো রকমে এগিয়ে দিয়ে ঝুমি বলল, 'নাও।'

শ্যামলের হাত কাঁপল। খুব নিস্তেজ আঙুল ঝুমির। তবু, ছোঁয়া লাগতেই মনে হলো আগুন। গ্লাসটা শক্ত করে মুঠোয় চেপে বলল, 'জোর করে লাভ কী ! একটু সামলে নিতে দাও, নিজেই খাবেন।'

'আজ নিয়ে দু' দিন হলো।' চোখে চোখ রাখল ঝুমি। 'লক্ষণটা ভালো নয়। সকাল থেকে জিব চুষছে।'

'ও। আচ্ছা, দেখি—'

গ্লাস হাতে ঘরের দিকে এগুলো শ্যামল। এসব কাজ তার ভালো লাগে না। মানুষ মরে, এটাই ঠিক ; শোক সন্তাপের ব্যাপারটাও সত্যি। কিন্তু তা নিয়ে এতো ঘুনঘুন করার কী আছে ! এতেই কি কনক ফিরবে !

মনে মনে এই সব যুক্তি সাজাল শ্যামল। যা করছে, করতে হচ্ছে ঝুমির জন্যেই। ছুটির দিন বলে আজ একটু আগেভাগে এসেছিল। এসেই বিপত্তি ! নিখিল বা অমিয়র তখনো দেখা নেই।

সমস্যা বসুধাকে নিয়ে।

এতোগুলো দিন তবু যেমন-তেমন করে ছিলেন। কাজের ঠিক আগের দিন থেকে বেঁকে বসেছেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করছেন না। তাঁকে নিয়েই যতো উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। মেয়েদের কথায় কাজ হয়নি। বসুধার সেই এক রোখ, 'দুটো দিন যেতে দে। আর তো তার কথা কেউ ভাববি না। আমার জন্যে আর ভাবিস কেন ! খাই না খাই আমি আরো ঢের দিন

বাঁচবো।'

পারতেন দাশরথি। কিন্তু, কনক যাবার পর থেকে তিনি আরো বেশি উদাসীন। কারও জন্যে তাঁর ভাবনার সময় নেই।

শনিবার কনক গেল। রবিবারটা কোনো রকমে কাটিয়ে সোমবার সকালেই নাকে মুখে গুঁজে অফিসে বেরুলেন দাশরথি।

বসুধা বলেছিলেন, 'ক'টা দিন ছুটি নিলে হতো না!'

'কেন! ছুটি নিয়ে হবেটা কী!' রোগাসোগা আপাত-নিরীহ মানুষটির ভিতরে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে ওঠে। 'বাড়ি বসে ছেলের জন্যে কপাল চাপড়ালেই কি এই রাবণের গুষ্টির ক্ষিদে মিটবে!'

দাশরথিকে ঘাঁটাতে কেউ আর তেমন জোর পায় না।

সংসারের এই পরিবর্তিত চেহারায় সারাক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকে বুলা। মৃত্যু মানুষকে কাছে টানে—টানে নাকি! ছ' জনের একজন চলে গেল, এখন বৃত্তটা আরো ছোট হয়ে আসা উচিত ছিল। ভালো হতো যদি পরস্পরনির্ভর হয়ে গায়ে গায়ে লেগে থাকত তারা। বৃত্তটাই এমন ভেঙে যাবে কে ভেবেছিল! বাবা মা দু'জনকেই মনে হয় গুঁড়ি-কাটা গাছের শুকনো, বিচ্ছিন্ন ডালের মতো—যেন তাঁরা কোনো দিন একসঙ্গে ছিলেন না। অলোক ছোট, নিতান্তই ছোট, এখন খানিকটা দিশেহারা। ঝুমির ভাবসাব বুঝতে পারা মুশকিল—মৃত্যুর অনুভবের চেয়েও বড়ো কোনো অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সারাক্ষণ। শ্যামলের কাছে ও কি কোনো আশ্বাস পেয়ে গেল! আজ সকালেই পুজোর জোগাড় করতে করতে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিল, 'দিদি, ধরতো—'

দেখেশুনে মনে হচ্ছে মাটিতে পা নেই ঝুমির। ক্রমশ স্বপ্নের ভিতর গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। স্বপ্নটা ওকে হাসায়, থেকে থেকে অন্যমনস্ক করে দেয়। এতো বড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই মনের ভিতর গুন গুন করে উঠছে। যদি এমন হয়, সত্যি সত্যিই নিজের একটা ব্যবস্থা করে ফেলল ঝুমি, চলে গেল, সে কী করবে! বাবাকে ভরসা করা যায় না আর। হতো, যদি দাদা থাকত, সে-ই আগে যেত। এখন সে-রকম কিছু নেই, এসব ভাবনা অবান্তর। হিসেব নিকেশের বাইরে চলে গেছে সব কিছু।

বুলা একটা নিঃশ্বাস চাপল। দুপুর ঘন হলো। এই সময় আকাশ ভর্তি রোদ থাকার কথা। পরিবর্তে দলা দলা মেঘে কালো হয়ে আসছে আকাশ। হয়তো বৃষ্টি নামবে।

চোখে ঝাপ্‌সা দেখল বুলা। না, তার একটা চাকরির দরকার।

শান্তিজলের ছটা কখন শুকিয়ে গেল কপালে। পুজোপাঠ শেষ। ভট্‌চায্যিমশাই নতুন গামছায় পুঁটলি বেঁধে সামনে এসে দাঁড়াল।

'মা লক্ষ্মী, আমাকে এবার যেতে হয়। ব্রাহ্মণের বিদায়টা দিয়ে দাও।'

বুলা কথাটা বুঝল। গলার খুশখুশে ভাবটা কাটিয়ে বলল, 'সবই তো পেলেন। আর কী চান?'

'ওভাবে কি বলতে আছে মা!' হাড় পাঁজরার ওপর পৈতে রগড়াতে রগড়াতে ভট্‌চায্যি বলল, 'পুণ্যবানরা তাড়াতাড়ি যায়। শান্তির রাজ্যে পৌঁছে দিলাম তোমাদের দাদাকে, ব্রাহ্মণকে এবার খুশি মনে বিদেয় করো।'

বুলার ভাবতে সময় লাগে না। তার হাত খালি, কিছু দিতে হলে এখন ভরসা দাশরথি। বাবার কাছে সরাসরি গিয়ে চাইবার মুখ নেই। খরচের বহর দেখে সকালে বলেছিল, 'ওই

সঙ্গে বাপের পিণ্ডিটাও দিয়ে দিলি না কেন !' এখন কিছু বললে বারুদে আগুন লাগবে। অগত্যা বলল, 'বাবা বাইরে আছেন, ওঁর কাছে বলুন।'

ব্যাজার মুখে ভট্চায্যি বলল, 'দক্ষিণাটাও ভিক্ষে চাইতে হবে মা !'

কথা না বাড়িয়ে বুলা মা'র ঘরে গেল। খাটের ওপর মাথা হেঁট করে বসে আছেন বসুধা। শ্যামলের হাতে গ্লাসটা তেমনিই ধরা, বসুধাকে বুঝি কিছু বলার চেষ্টা করছে। এপাশে ঝুমি, খাটের বাজু ধরে দাঁড়ানো। কোণের দিকে টেবিলে কনকের বাঁধানো ছবি, ছবিতে মালা পরানো, কিছু খুচরো ফুল ছড়ানো। সকালে এক ডজন গন্ধধূপ জ্বেলে দিয়েছিল। পুড়ে পুড়ে এখন তার একটিই কোনো রকমে জ্বলছে। মৃদু গন্ধ ভেসে এলো নাকে। মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গন্ধটা কেমন ধাক্কা দিল যেন। গা গুলিয়ে উঠল।

বুলা বুঝল তার সারা শরীর মুচড়ে কান্না চাপ দিচ্ছে। ফাঁকা, রিক্ত মনে হচ্ছে সব কিছু। মা ঠিকই বলেছিল, এরপর তাদের একে একে ভুলে যেতে হবে। বাবার দাড়ি কামানো পরিচ্ছন্ন মুখ দেখেও এই কথাটা মনে হয়েছিল। কিন্তু, এটা কাঁদবার জায়গা নয়। দেহের প্রতিটি রোমকূপে আবেগের অত্যাচার সহ্য করতে করতে সে পাশের ঘরে গেল।

পুজোর জন্যে যেটুকু না করলেই নয় করে আবার বাইরে রোয়াকে এসে বসেছিলেন দাশরথি। এক হাতে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, অন্য হাতে নিজের মুখ দেখতে দেখতে মাথার চুল ঝাড়ছেন।

এই মাসটা একমুখ দাড়ি নিয়ে নিজেকে কেমন পবিত্র লাগত। কর্কশ ভাবটুকু শেষের দিকে মোলায়েম হয়ে এসেছিল। অফিসে কাজের ফাঁকে গালে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ছেলেটা তাঁর সঙ্গে বড়ো রকমের প্রবঞ্চনা করে গেল। এই দাড়ি তো তারই গালে গজাবার কথা ! অনুভূতির বেশিটাই ক্ষোভের, তবু তাঁর কী গেছে দাশরথি নিজেই শুধু জানেন। বুক চিরলে রক্তের বদলে আটান্ন বছরের সমস্ত অভিজ্ঞতা বালির মতো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে।

মুখটা প্রতিবারই ঝাপ্সা লাগছে। ধুতির খুঁটে আয়না মুছে দাশরথি চোখদুটো ছাড়া ভাঙাচোরা মুখের অনেকটাই দেখতে পেলেন। যুবক বয়সেই গেল, না হলে চোয়ালে, চিবুকে, নাকে অনেকটাই বাপের ধরন পেয়েছিল কনক। এক মাসে স্মৃতি খুঁড়ে এখানে ওখানে অনেক মিলই ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন দাশরথি। এখনো মনে হয় কতো স্পষ্ট—সামনের রাস্তা দিয়ে সটান হেঁটে এসে সদরে পা দেবে !

'মিত্তিরমশাই ?'

একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন দাশরথি। ভট্চায্যিকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন।

'হয়ে গেল সব— ?'

'হলো তো। দক্ষিণাটা পেলেই আমি রওনা হই।'

শরীর টান করে ভট্চায্যির চেহারাটা আপাদমস্তক লক্ষ করলেন দাশরথি।

'কেন ! দেয়নি পাঁচ টাকা ?'

'পাঁচ টাকায় তো পাঁচালি পড়া হয়, মিত্তিরমশাই। ছেলের শ্রাদ্ধ বলে কথা—'

স্তব্ধ হয়ে ক' মুহূর্ত ভট্চায্যির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দাশরথি হঠাৎ বললেন, 'হবে না, আর কিচ্ছু হবে না। পয়সা কি খোলামকুচি নাকি !'

'আঃ, কী অলক্ষুণে কথা দেখুন তো !' ভট্চায্যি বিরক্ত ভাব দেখাল, 'ব্রাহ্মণকে ঘরে

ডেকে অপমান করছেন, মশাই ! আরো পাঁচটা টাকা দিন, আমি চলে যাই ।'

'দেবো না, আর একটি পয়সাও দেবো না !' রোয়াক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দাশরথি । কপালের ওপর দপ্ করে একটা শিরা ফুলে উঠল । তারপর হাত উঁচিয়ে বললেন, 'আমার রক্ত জল করা রোজগারের টাকা । আমি বলছি, আর একটি পয়সাও দেবো না ।'

দাশরথির গলা রীতিমতো চড়া । একটু বা ঘড়ঘড়ে, শ্লেষ্মা জড়ানো ।

এই সময় রাস্তায় লোক চলাচল কম । ইতস্তত যে দু' চারজন হাঁটছিল, থেমে দাঁড়াল । কাছেই টিউবওয়েলে তেলকলের ক'জন গা ধুচ্ছে । সকলের নজর এদিকে । বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুলা বাবার গলা শুনল, কী ব্যাপার বুঝল না ।

বেগতিক দেখে রোয়াক ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল ভট্চায্যি । লোকজনকে শুনিয়ে বলল, 'আচ্ছা লোক তো, মশাই ! বায়না করে ডেকে আনলেন, এখন ধাপ্পা দিচ্ছেন ! পরকালের ভয় নেই !'

'কী, আমি ধাপ্পাবাজ ! আমাকে ভয় দেখানো !' ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছেড়ে ভট্চায্যির গায়ের ওপর পড়লেন দাশরথি । কাঁধসুদ্ধ নামাবলিটা মুঠোর মধ্যে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'খুন করে ফেলবো । এক্ষুনি বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি—'

'দেখুন আপনারা, দেখুন । ব্রাহ্মণের গায়ে হাত দিয়েছে—', পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল ভট্চায্যি ।

কিছু লোকজন ছুটে এসে দু'জনকে আলাদা করে দিল । চেঁচামেচি শুনে ওরাও বেরিয়ে এসেছিল—শ্যামল, বুলা, ঝুমি, অলোক । ভট্চায্যির নামাবলি রাস্তায় পড়ে থাকে, গামছা বাঁধা পুঁটিলিটা এক দিকে । ক্ষিপ্ত দাশরথি, প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে থামাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'নিজের হাতে সন্তানকে পুড়িয়ে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি । দাশরথি মিত্তির কাউকে ভয় পায় না । শ্রাদ্ধের মুখে আমি লাথি মারি—'

শ্যামল এসে তাড়াতাড়ি দাশরথিকে ছাড়িয়ে নিল । বাধা দিয়ে দাশরথি বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও । আমি এর শেষ দেখতে চাই—'

সেই সময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল । নিখিল নামল । একপলকে গোটা পরিবেশটা বুঝে নিল ও । দরজার কাছে থ দাঁড়িয়ে আছে বুলা ঝুমিরা । পিছনে কোনো রকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বসুধা । এ-বাড়ি ও-বাড়ি ব্যালকনি ও আল্‌সে থেকে কৌতূহলী মেয়ে পুরুষ উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে—টিউবওয়েলের সামনের ভিড়টা এখন মোটামুটি জমায়েতে পরিণত হয়েছে । এর মধ্যে নিখিলের অতর্কিত আবির্ভাব আগুনে জল ঢালার কাজ করল ।

শ্যামল ততোক্ষণে দাশরথিকে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে । লড়াইয়ে হেরে-যাওয়া মানুষের হাঁটার ধরন দাশরথির । থেমে থাকার মধ্যেও একবার ক্ষুব্ধ গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'উঃ, কী দুনিয়া ! পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনল না !'

নিখিল দেখল, ভিড়টা গলতে শুরু করেছে । দাশরথির গোটা পরিবারটা হঠাৎ হাঁ-করা দরজার ভিতর সেঁধিয়ে গেল । শূন্য রোয়াকের ওপর আয়না আর রুপোর বিড়ির কৌটো, দেশলাই এই সমস্ত দেখেই দাশরথির বলে চেনা যায় ।

নামাবলিটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিখিল ভট্চায্যির কাছে গেল ।

'কী হয়েছিল ?'

'কিছু তো হয়নি বাবা ।' পুঁটলির গা থেকে সাবধানে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ধাতব গলায় ভট্চায্যি বলল, 'খামোকা গালমন্দ করলেন মিত্তিরমশাই ! বিদায়টা গুনে দিলেই আমি চলে

যেতাম ।’

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা চকচকে দশ টাকার নোট ভট্‌চায্যির নাকের সামনে তুলে ধরল নিখিল ।

‘বয়স তো অনেক হয়েছে । ওঁর কষ্টটা বুঝতে পারলেন না !’

ভট্‌চায্যি বিনা কথায় টাকাটা হাতে নিল । ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে চোখ নিচু করে কী ভাবল একটু ।

‘বুঝি, অন্যায় হয়ে গেছে । যজমানি করে দু’ পয়সা পাই, এছাড়া আর কী !’ একটু থেমে বলল, ‘মিত্তিরমশাইকে বলো, পুজোয় ফাঁকি দিইনি । নারায়ণ রক্ষা করবেন ওঁদের—’

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভট্‌চায্যির চলে যাওয়া দেখল নিখিল । তারপর ফিরল ।

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ভরসা হয় না । নিজের সম্পর্কে তার একটিই দুর্বলতা, সচেতনভাবে কখনো কিছু করতে পারে না । একটা ঝোঁক দরকার, যে-কোনো রকমের একটা ধাক্কা । কনক বলত, ভাগাড়ের ঘোড়া, চাবুক না মারলে কখনো ছুটবি না !

ঠিকই । কড়া চাবুক মেরে গেলেন দাশরথি, অনুভব জুড়ে জ্বালাটা এখনো টের পাচ্ছে । না হলে এ-দৃশ্য কবে কে কল্পনা করেছিল ! শুধুই কি ক’টা টাকা বাঁচাবার দায়ে আজকের দিনে রাস্তায় নেমেছিলেন দাশরথি ! না, না তো !

শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি, শুধুই বৃষ্টি । তবু নিখিলের হাড়ের মধ্যে দিয়ে পরপর শীতের হাওয়া ছুটে গেল ।

দাশরথির আয়না আর বিড়ির কৌটোটা হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকল নিখিল । থমথমে ভাবটা আগেই চোখে পড়ে । পুজোর বাসনকোসন তখনো বারান্দায় ছড়ানো । এক দিকে চেয়ারের ওপর মাথায় পাট-করা ভিজে গামছা চাপিয়ে বসে আছেন দাশরথি ; পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পাখার বাতাস করছে ঝুমি । বুলা বুঝি ঘরের কোথাও ছিল, বেরিয়ে এসে পুজোর জায়গাটা গোছগাছ করতে লাগল ।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে কব্জিটা ধরে ফেললেন দাশরথি ।

‘আমি ছোটলোক নই বাবা । মাথাটা হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল—’

‘জানি ।’

স্বর স্পষ্ট হলো না । দাশরথির ঘামে ভেজা হাতের স্পর্শ নাড়ির স্পন্দন দ্রুত করে দেয় । ঝুমির সঙ্গে চোখাচোখি হতে নিখিল শুধোল, ‘মা কোথায় ?’

ঝুমি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল ।

নিখিল শ্যামলকে খুঁজল । পেল না । তারপর ঘরের দিকে পা বাড়াল ।

বিছানায় অর্ধশায়িতা বসুধা । নিখিলকে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে উঠলেন । নিখিল একটু অপেক্ষা করল, কীভাবে কথা শুরু করবে, আদৌ কিছু বলবে কি না ভাবল । পাশের ঘরে শ্যামলের গলা পাচ্ছে, সম্ভবত ও অলোকের সঙ্গে আছে । এ-বাড়ির ঘরদোর এখন তাদের জন্যে হাট করা—অবাধ যাতায়াতে কোনো অসুবিধে নেই । বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার সময়েই কথাটা মনে হয়েছিল তার । আপাতত বিছানার একপাশে সে বসার জায়গা করে নিল ।

বসুধা এখন কথা বলবেন না, এটা প্রায় জানা কথা । ক’দিনই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে নিখিল । কাছাকাছি কেউ থাকলে মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন, মনে হয় কিছু বলতে চান । পরেই ভুল ভেঙে যায় । স্বগতোক্তি প্রায় তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । আচ্ছন্নতার

মধ্যে কার সঙ্গে আলাপ করেন বসুধা ! নিজের সঙ্গে ? নাকি নিজের ভ্রষ্ট বিশ্বাসের সঙ্গে এখনো তিনি সংলাপের জের টেনে চলেছেন !

তবু, এ-বাড়িতে বসুধাকেই ভালো লাগে। কনক ছিল, এখন নেই, আর কোনো দিন থাকবে না—নিজের চলা, বলা, সারা দিনযাপনের মধ্যে, চিন্তা বা অনুভবের মধ্যে, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কনককে আজকাল কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দূর স্মৃতির মতো মাঝে মাঝে অতর্কিতে এসে হানা দিয়েই চলে যায় আবার। বসুধার সান্নিধ্যে তবু মনে হয় কনক ছিল, আছে।

ইত্যাদি আবেগে নিখিল ভিতরে ভিতরে গলতে থাকে। টেবিলের ওপর সাজানো কনকের ছবি। খুব পবিত্র মন নিয়ে কোনো দিন হয়তো ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিল। একই লক্ষ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখদুটো জ্বালা করে উঠল নিখিলের। হাতটা চলে গেল পায়ের পাতায়—এ-বাড়িতে মশার উপদ্রব বড়ো বেশি।

বসুধা হঠাৎ বললেন, 'অমিয় আসবে না ?'

এতোক্ষণ ধারণা ছিল অমিয় এসেছিল, চলে গেছে। বসুধার আকস্মিক প্রশ্নে বিমূঢ় বোধ করল নিখিল। ইতস্তত করে বলল, 'কী জানি ! আর কি আসবে !'

আবার সেই চুপচাপ। নিখিল ভাবল, একবার ঘরের বাইরে ঘুরে আসা দরকার। তবু উঠতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে চাপা গলায় বসুধা বললেন, 'আমাকে একদিন অমিয়র বাড়ি নিয়ে যাবে নিখিল ? রেখাকে দেখব।'

॥ আট ॥

অমিয় অফিসে বেরুবার আগে রেখা ফের কথাটা তুলল।

'আমার জন্যে কী করছ ?'

সামনে ঝুঁকে, ফ্লাইবাটনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে টেনেটুনে শার্টের ঝুল ঠিক করছিল অমিয়। শুনেও না শোনার ভান করল।

'কী ব্যাপার !'

'বাঃ ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে !'

চলকানো শব্দ তুলল রেখা। বিরক্তির। পাট-করা রুমালটা টেবিলের ওপর রেখে পান আনতে গেল। এটা অমিয়র নতুন অভ্যাস।

এমন নয় অমিয় জানে না ব্যাপারটা কী। গত ক'দিন ধরেই আছে টানাপোড়েনের মধ্যে। চাপা মনোমালিন্য, অশান্তি, মাঝে মাঝে দু' পক্ষের কথা বন্ধ। অত্যন্ত অস্বস্তিকর ঘটনাগুলো।

দোষ কার বলা কঠিন। তার ? রেখার ?

না, রেখার নয়। হয়তো তার নিজেরও নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে রক্ত ক্রমশ শীতল হতে থাকে—অমিয় ঠিক বুঝে পায় না এই অশান্তির দায়িত্ব কার ! নাকি সবই ভবিতব্য ? আপাত-সুখের গোপনে অদৃশ্য নালি-ঘা'র মতো কিছু একটা বিস্তৃত হচ্ছে ক্রমশ ; একদিন

হয়তো তাদের কুক্ষিগত করে ফেলবে।

বৃষ্টিধোয়া চমৎকার রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে এই সকালেই-প্রচ্ছন্ন বিষাদ অনুভব করে অমিয়। আয়নায় চুল আঁচড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায় কনকের মুখ, হাতটা আপনিই নীরব হয়ে আসে। খুব বেশি দিন তো হয়নি, তবু মনে হয় বহুদিন হলো। বিশদভাবে আজকাল প্রায়ই তাকে মনে পড়ে না। তবু সে ছিল এটা অস্বীকার করা যায় না। চতুর্দিকে অনিবার্য অশান্তির মধ্যে প্রায় একটা স্বপ্নের জগৎ তৈরি করে রেখেছিল। বেঁচে ছিল তীব্রভাবে—হঠাৎই একদিন চলে গেল চুপচাপ। কী যেন অসুখটা ছিল তার—লিউকোমিয়া! শরীরের ভিতর রক্ত, রক্তের ভিতর অগোচরের আক্রমণ—কনকই শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত হবে কে ভেবেছিল!

একান্তের স্মৃতি থেকে ফিরে এলো অমিয়। সুস্পষ্ট একটা জ্বালা গলার ভিতর ; রেখার হাত থেকে পানের খিলিটা নিয়ে মুখে পুরতে পুরতে এক ধরনের আতঙ্কে সামান্য কেঁপে উঠল।

'কী হলো!' চুপচাপ দেখে রেখা বলল, 'কিছু বললে না যে!'

'কী আর বলব!'

সাবধানে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল অমিয়। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে আড়চোখে দেখল রেখাকে। থমথমে মুখ, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। দেখে মনে হয় নির্জনে একচোট কেঁদে এলো এইমাত্র। শরীরের ভার ক্রমশ কাহিল করে ফেলছে। আর দু' মাস। নাকি তিন মাস! অন্যমনস্কতার জন্যেই হিসেবটা গুলিয়ে ফেলল অমিয়। চোখ দুটো আস্তে আস্তে নরম হয়ে এলো।

'রোজ রোজ এ অশান্তি আর ভালো লাগে না, রেখা!' কাছাকাছি এগিয়ে এলো অমিয়। 'অশান্তি করে কী লাভ!'

'আমাকে দোষ দিচ্ছ?'

'না।' টেবিলের ওপর থেকে বাকি পানটা তুলে মুখে পুরল অমিয়, 'দোষগুণের কথা নয়। অশান্তি হচ্ছে। এটাই ঠিক—'

পানের রসে মুখের ভিতর শব্দগুলো এলিয়ে পড়ছে। পিক ফেলার জন্যে জানলায় গেল অমিয়।

'অশান্তি তোমার একার নয়।' রেখা বলল, 'স্ত্রীকে যে-লোক প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ করে—'

মাঝপথে আটকে গেল রেখা, সম্ভবত অমিয়র চোখের দিকে তাকিয়ে।

'আমি তোমায় সন্দেহ করি না।' স্পষ্ট গলায় কথাটা বলে একটু থামল অমিয়, পরেরটা ভেবে নিল। 'একটা সত্যি ঘটনাকে দিনের পর দিন তুমি অস্বীকার করে যাচ্ছ, ভাবছ আমি নির্বোধ। এতো জেদ কেন তোমার!'

'জেদ!' রক্তশূন্য মুখ রেখার, উত্তেজনার মুহূর্তে আজকাল সে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'আমি কি কিছু বুঝি না! ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করেছিলে—এতো দিন আমাকে ব্যবহার করেছ। এতো দিন সুযোগ খুঁজছিলে, ও মারা যাবার পর পেয়ে গেলে—'

'কী যা তা বকছ!' অমিয় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। 'তোমার ব্যবহারেই তুমি সব স্পষ্ট করে দিচ্ছ। এতো দিন ও হাসপাতালে থাকল, একদিনও গেলে না। সেদিন শ্যামল এলো বাড়িতে, কথা বললে না। আমি কে! বাইরের লোকও সব বুঝতে পারে—'

'জানি', দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রেখা, 'তোমার বন্ধুরা তোমাকে ওসকাচ্ছে। আমি

ঠিক করে ফেলেছি—আমার শরীরে সইছে না। তুমি দাদাকে খবর দাও, আমাকে নিয়ে যাক।'

স্তম্ভিত চোখে খানিক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল অমিয়। জ্বালাটা মাথা থেকে নেমে যেতে দিল।

'যাওয়াটা এ-বাড়ি ও-বাড়ির ব্যাপার, যখন ইচ্ছে যেতে পারো। কিন্তু—', নিজেকে সংযত করে অমিয় বলল, 'এ অবস্থায় এমনভাবে মাথা গরম করে যাওয়াটা ঠিক নয়।'

'আমি পারব না—।' অতর্কিতে ভেঙে পড়ল রেখা। 'আমার অসহ্য লাগছে—'

'বেশ। আমি বিজনকে বলব।'

খাপছাড়াভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলল অমিয়। বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়াল একটু।

'সবটাই নিজের মতো করে ভাবলে। আমি তোমায় একবারও যাবার কথা বলিনি—'

রোদ তেমন তীব্র নয়। বর্ষার শেষ ; মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নীল আকাশ উপুড় হয়ে পড়ছে। আকাশে তাকিয়ে রবিবারের মতো লাগে। ছিমছাম হাওয়া। এখন শরীর আরাম চায়।

হাঁটতে বেশ ক্লান্তি লাগছিল অমিয়র। শরীরে একটা টিসটিসে ভাব, মৃদু জ্বরে যেমন হয়—মনের ওপর শরীরের আধিপত্য নিয়ে সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতেই মনে হয় কলকাতার শ্বাস রোধ হয়ে আসছে ক্রমশ, প্রতিদিনই মানুষের হাঁটবার, দাঁড়াবার, বেড়াবার জায়গা কমে যাচ্ছে। কালও সে একই রাস্তায় হেঁটে গেছে, কিন্তু রাস্তাটা এতো সঙ্কীর্ণ ছিল না, অনবধানে সে দু'জনের গায়ের ওপর দিয়ে পেরিয়ে এলো। একটু অশোভন হলো হয়তো—কেউ কিছু বলল না, ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। তার মানে কি এই, মানুষ ক্রমশ সহনশীল হয়ে উঠছে!

না, এতোটা ভাবা ভুল। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে, ভুল। আজকাল অল্পেই তার রাগ হয়, গা জ্বালা করে, ট্রামে বাসে সামান্য ক্লেশ সহ্য করতে খারাপ লাগে—ছোটখাট সামান্য কথাবার্তার মধ্যেই অপমানের বীজ খোঁজে। সত্যিই এ-রকম। না হলে রেখার সঙ্গে তার ঠিক এতোটা মনোমালিন্যের কারণ ছিল না। বিয়ের আগে কনকের সঙ্গে রেখার যে-কোনো রকমের একটা সম্পর্ক ছিল তা কি সে বিয়ের আগেই জানত না! যে-কোনো কারণেই হোক, বিয়ের পর রেখা ক্রমশ বন্ধুদের, বিশেষত কনককে, এড়িয়ে চলছিল। তারপরও দু' বছর হয়ে গেল, রেখার গর্ভে এখন তার সন্তান ; তবু, রেখার শরীর, রেখার মুখ, দূরের বা কাছের রেখাকে দেখে প্রায়ই কেন তার নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে হয়!

হতে পারে তার সমস্যা আলাদা, বড়ো বেশি ব্যক্তিগত। এই মুহূর্তে যারা হাঁটছে, বাজার করছে, অফিস যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে একা, সম্পূর্ণ একা, নিকট বা দূরের সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। তার স্ত্রী আছে, আছে বন্ধুবান্ধব, এই বৃহৎ ব্যস্ত কলকাতায় ছুটে যাবার মতো পরিচিতের অভাব নেই। কিন্তু, এই মুহূর্তে এমন কাউকে মনে পড়ছে না, নিজের দৈন্য নিয়ে যার ওপর পরিষ্কার নির্ভর করতে পারে।

চিন্তাটা অমিয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলল। ঘন নিঃশ্বাস পড়ল তার। নিজের মধ্যে নির্জন, গভীর সমুদ্রে দ্বীপের মতো ভেসে উঠল সে।

মাথায় পাগলা ঘন্টির মতো একটা শব্দ ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছিল। তক্তা বিছানো রেলের লাইনগুলো পেরুতে গিয়ে অমিয়র মনে হলো সে ক্রমশই পিছনে হাঁটছে ; অথচ তার

এগিয়ে যাওয়ার কথা। পা দুটো অসম্ভব ভারী, ভারী চোখের পাতা। কী হলো হঠাৎ! শরীরের ওজন বেড়ে যাচ্ছে নাকি! আকস্মিক রোগে সে কি হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে! মৃগী! স্বপ্নের মতো একটা আচ্ছন্নতার ঘোরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অমিয় নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করছিল, হঠাৎ ট্রেনের শব্দের আগে আগে একটা বাড়ানো হাত ছোঁ মেরে টেনে নিল তাকে।

'কী মশাই! মরবেন নাকি!'

কাছাকাছি যারা লেভেল ক্রশিং পেরুবে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। অমিয় দেখল প্ল্যাটফর্ম ছুঁয়ে ট্রেনটা আরো এগিয়ে যাচ্ছে। মৃদু, উত্তাপহীন গলায় সে আউড়ে গেল, 'বজবজ লোক্যাল।' তারপর অপরিচিত উদ্ধারকারীর মুখের দিকে গভীর অনুনয়ের চোখে তাকিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

কী হয়েছিল বুঝতে সময় লাগল না। সদ্য স্নান-করা ভিজে শরীরে জামা কাপড় পরার মতো জ্যাবজ্যাবে ভাব নিয়ে হেঁটে এলো খানিকটা। একটু অস্বস্তি লাগছিল। যদিও আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে, উল্টো-সোজা ভিড় ঠিক পরস্পরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এইমাত্র মৃত্যুর হাত থেকে ফস্‌কে আসা লোকটির জন্যে কারও কৌতূহল নেই। শান্তভাবে অমিয় তার উদ্ধারকারীর মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করল, মনে পড়ল না—নাঃ, মনে পড়ছে না। বাঁচা গেল—বস্তুত আশ্বস্ত হলো অমিয়, জীবনদানের জন্যে কারও কাছে তাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে না।

বসে যাবার জন্যে প্রথম ট্রামটি ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় ট্রামটিতে স্বচ্ছন্দে জায়গা পেল অমিয়।

ততক্ষণে অফিসের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কোনো রকম বিচলিত বোধ করল না সে। অফিসে তার যাতায়াত অত্যন্ত নিয়মিত, কোনো দুর্বিপাক না ঘটলে বছরের গোড়াতেই সে ক্যাজুয়াল লিভগুলো গুছিয়ে নিতে পারে। এ-বছর তেমনি একটি দিনই শুধু গেছে—শনিবার, কনকের মৃত্যুর দিন। আর আজ সে মৃত্যু পেরিয়ে এলো খুব সাবলীলভাবে, ইস্পাতের লাইনের ওপর ছিটেফোঁটা রক্তের দাগও লাগেনি। চমৎকার! বেঁচে থাকার প্রতি আশ্চর্য মমতায় কিছুক্ষণ মূক হয়ে থাকল সে। আজ সে অফিসে না গেলেও পারে। বরং মৃত্যুর নামে সে একটু এলোমেলো হবে, একটু নিয়মবিরুদ্ধ।

ইচ্ছে মতন ট্রাম থেকে নেমে অলসভাবে কিছুক্ষণ হাঁটল অমিয়। অফিসে যাবার কথাটা স্বচ্ছন্দে তাড়াল মন থেকে। আজ অনিয়ম, বরং এক দিন সে ক্যাজুয়াল লিভ নেবে। এমনিতেই পচে যায়, বছরের শেষ দিকে উপলক্ষের জন্যে মাথা কুটতে হয়। আশ্চর্য, ছুটির দরকার নেই বলেই সে এতো দিন ছুটি নেয়নি ; কোনো দিন মনে হয়নি এমন উপলক্ষহীন কেটে যাচ্ছে জীবন!

ভাবতে ভাবতে সে পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে এলো, বাঁক নিল মেয়ো রোডের দিকে। আধ ঘণ্টা আগে যে-হাঁটুতে প্রকম্পন অনুভব করেছিল, সেই হাঁটুতেই এখন অসম্ভব জোর—অমিয় হাঁটছে— অসম্ভব স্ফূর্তি মনে, আকস্মিক মৃত্যুর স্পর্শ যেন তার নেতিয়ে-পড়া অস্তিত্বটাকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

যেতে যেতেই সে মোটামুটি একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে নিল। ফোন-টোন করে বিজনকে পাওয়া যাবে না। কাছেই অফিস তার ; একবার ঢুঁ মেরে দেখতে ক্ষতি কী!

বারোটার কিছু আগে প্রিনসেপ্ স্ট্রিটে বিজনের অফিসের কাঠের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ

তুলে ওপরে উঠে এলো অমিয়। কতো দিন পরে ঠিক মনে করতে পারল না। তবে ছ' মাস তো হবেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই মনে হলো বিজন উন্নতি করছে। কেন মনে হলো বলা যায় না। বিজনকে সে কোনো দিনই তেমন পছন্দ করে না, রেখার দাদা বলেই যেটুকু সম্পর্ক। সম্ভবত এখন তার সব কিছুই ভালো লাগবে, এখন তার চোখে ক্ষমা ছাড়া আর কিছু নেই।

বার্নিশ-করা পুরু কাঠের চকমকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তবু একটু দ্বিধা হলো অমিয়র। রেখাকে কি সে ক্ষমা করতে পারে না! আর একটু উদার হওয়া কী আর এমন শক্ত! ফিরে যাবে?

মায়া মমতায় ফুলে উঠল অমিয়। ভালো হতো যদি এখন বাড়ি ফিরে বলা যেত—একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়া কেটে গেল রেখা!

না। বরং কিছু দিন দূরে থাকুক রেখা; একানুবর্তিতা থেকে দূরে; ঘাম, ক্লেদ, রোমশ রাত্রিযাপন থেকে দূরে—মাঝে মাঝে বিড়ালের মতো পরস্পরের প্রতি ফুঁসে-ওঠা থেকে দূরে। গভীর চোখে অমিয় তার ভ্রূণকে পাশ ফিরতে দেখল। আর কিছু দিন এই সময়টা রেখার ভালো থাকা দরকার।

নিঃশব্দে প্যাঁচ ঠেলে ভিতরে ঢুকল অমিয়। বিজন নেই। চুরুট মুখে সামনে বসা মেয়েটিকে ডিক্টেসান দিচ্ছিল বামনদাস। আচমকা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আসেন, আসেন। মোস্ট ওয়েলকাম—'

চেষ্টা সত্ত্বেও কথার টান এখনো কাটাতে পারেনি বামনদাস। ঠোঁট ছড়িয়ে হাসতে পরিচ্ছন্ন গালের ওপর নতুন ব্লেডের ঝিলিক খেলে গেল। রেখার সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম আলাপেই বলেছিল, 'আদি নিবাস মৈমনসিং? মশায়, আপনিও তো তবে বাঙাল!'

মনে পড়ে না কবেকার কথা। ছকে পরিষ্কার লেখা আছে, জন্ম: ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬, কলিকাতা। রেখা আর সে পাঁচ বছরের ছোটবড়ো।

বামনদাস মেয়েটিকে যেতে বলল। সেই চেয়ারেই বসল অমিয়।

'পার্টনার কোথায়?'

'পাবেন নাকি এখন!' চুরুটটা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ল বামনদাস। 'আপনিও যেমন! বর্ষায় দুটা জিনিসের জোর হয়—ব্যাঙের ছাতা আর আমাদের ব্যবসা। বসে না তো একেবারেই। আমিই হয়ে আছি এক ইনডোর স্টেডিয়াম। দ্যাখেন গিয়া রাইটার্স কি নিউ সেক্রেটারিয়েটে ধর্ণা দিতেছে।'

চুরুটটা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল বামনদাস। টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা ফাইলটা পাচার করে দিল ড্রয়ারে। টাইয়ের নট্ আলগা করতে করতে হাসল অমায়িক।

'তেরপলের কারবার তাহলে ভালোই চলছে?'

'তেরপলে সীমাবদ্ধ থাকলে কি চলে! এখন আবার জুট ব্যাগ সাপ্লাই ধরেছি।' একটু থামল বামনদাস। 'অফিসটা কেমন দেখছেন? কলি ফেরে নাই?'

অমিয়র বুকের মধ্যে বজবজ লোক্যালটা দৌড়ে গেল হঠাৎ। বামনদাস আত্মসুখী; তাকে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা বলা যাবে না। তার দরকার বিজনকে।

'ভালোই তো।' নিঃশ্বাস পড়ার আগেই অমিয় বলল, 'আসবে?'

'ভরসা নাই। ফোন করেছিল খানিক আগে। তবে, আর আধঘণ্টাটাক পরে কফি হাউসে গেলে পাবেন।'

আর কোনো প্রশ্ন নেই ; বিজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে আপাতত বামনদাসের সঙ্গে কথা চালানো দরকার। কী কথা বলবে সে ! ভাসা ভাসা আলাপ, ভদ্রতায় যেটুকু চলে ইতিমধ্যেই তা শেষ হয়েছে। একসময় কথা বলার জন্যে সারাক্ষণ ঠোঁট সরসর করত, প্রসঙ্গ তৈরি হতো নিজে নিজেই। চৈতন্য জুড়ে এখন শুধুই শব্দের প্রতারণা। এমালসান পেন্টেড দেওয়ালের পরিচ্ছন্নতায় অমিয় নিজের শব্দহীন অনুভবগুলো ছড়িয়ে থাকতে দেখল। আর কিছু নয়, যে-কোনো উপলক্ষ পেলেই সে এখন উঠে পড়তে পারে।

সুবিধে এইটুকু, বামনদাস এখন বাইরের কল্ অ্যাটেণ্ড করছে।

হাত বাড়িয়ে শৌখিন পেপারওয়েটটা মুঠোয় চেপে ধবল অমিয়। খানিক আগেকার ঘনবদ্ধ ভাবটুকু এখন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এতো তাড়াহুড়ো করে বিজনের এখানে ছুটে আসার তেমন কারণ হয়তো ছিল না। আশ্চর্য, বজবজ লোক্যালের ঝড়ো বাতাস চেতনা স্পর্শ করতেই সে কেন ধরে নিয়েছিল আজ তার মৃত্যু হতে পারত ! এখন বাড়ি ফিরতে পারবে না—এখন তার কোথাও যাবার নেই !

'কী খাবেন ?' ফোন রেখে বামনদাস বলল, 'চা, না ঠাণ্ডা কিছু আনাব ?'

'কিচ্ছু না—', প্রথম সুযোগটাই কাজে লাগাল অমিয়। 'আমি উঠছি। কফি হাউসে যাব। বিজন এলে বলবেন।'

বামনদাস না করল না। তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টেনে বলল, 'একটা ভালো সিগারেট খেয়ে যান।'

লাইটারটা নাকের সামনে জ্বেলে ধরে বামনদাস বলল, 'হ্যাঁ মশায়, আপনার সেই বন্ধু কনকবাবু নাকি—'

'মারা গেছে—'

'শুনলাম তো।' এই সব সময় যতোটা গম্ভীর হতে হয় তাই হলো বামনদাস। দরজার প্যাঁচ টেনে সরে দাঁড়াল। 'স্যাড নিউজ। লাস্ট সিজনে একদিন ক্রিকেটের টিকিট দিয়েছিলেন, মনে আছে ? সোবার্সের ব্যাটিং দেখা হলো—'

কাঠের সিঁড়ি। নামবার সময় ধপ ধপ বেখাপ্পা শব্দ হয়। একদিন ভোর রাতে নিঃশব্দে হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিল তারা—মনে হয়নি কোনো দিকে সিঁড়ির শেষ আছে। ভোরের পবিত্র হাওয়ায় প্রথম শব্দ হেনে রাতের ঘুম থেকে কলকাতাকে জাগিয়ে তুলেছিল ট্রাম। না, কোনো মহিমা ছিল না কনকের মৃত্যুতে ; রক্তলোভী ক্ষুদ্র একটি মশা ছাড়া আর কোনো সাক্ষীর দরকার হয়নি তার। অথচ, কনকের জন্যে সামান্য সহানুভূতিও বোধ করল না অমিয় ! মারা গেছে—, তুরুপের তাসের মতো অনায়াসে শব্দ দুটো ছুঁড়ে দিতে পারল সে—স্বার্থপর, বড়ো স্বার্থপর তুমি ! ভালোবাসাহীন যে চলে গেল পৃথিবী থেকে, তার প্রতি এতো ঈর্ষা কেন !

অমিয় হাঁটছিল। অন্যমনস্ক। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমেই চমকে উঠল।

'আরে ! মেসোমশাই !' তৎপর হতে সময় লাগল না বিশেষ, 'এদিকে ?'

নাকের ওপর চশমাটা নামানো। শুকনো মুখ। তবু গাল ছড়িয়ে হাসলেন দাশরথি।

'ঐ ইনসিওরেন্সের টাকাটার তদ্বির করতে— ।' ঘড়ঘড়ে গলা দাশরথির ! আপাদমস্তক অমিয়কে লক্ষ করে বললেন, 'তলে তলে কেমন বাহাদুর ছিল দ্যাখো ! দশটি হাজার টাকা দিয়ে গেল তো !'

অমিয় একটা ঘা খেল। কথা ফুটল না মুখে।

'তুমি কোন দিকে ?'

কোনো রকম ব্যস্ততা নেই দাশরথির। মাঝ রাস্তা থেকে সরে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

'কাছেই। কফি হাউসে—'

'ও। কফি খাবে তো?' কাঁচা-পাকা ভুরুর তলায় চোখ দুটো চকচক করে উঠল দাশরথির। 'এক আধবার গেছি। সেও কতো দিন আগে! কতো কাল যে কফি খাই না!'

'খাবেন? আসুন না— ?'

'তোমার সঙ্গে!' দ্বিধা নয়, দ্বিধার ভাব করলেন দাশরথি। 'তা বেশ। চলো...একটু চাঙ্গা হয়ে নিই। সারা দিন ঘোরাঘুরি!'

বিরক্তিটা চেপে গেল অমিয়। রাগ করে ফল হবে না। রেখার সঙ্গে মন কষাকষি, বজবজ লোক্যাল, বামনদাস এবং দাশরথির সঙ্গে আলাপ—এই রকম যোগাযোগ নিয়েই শুরু হয়েছিল আজকের দিনটা। হঠাৎই তার মনে হলো আজ আরো কিছু ঘটবে; এমন কিছু, যা তার প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বাইরে, যা সে পছন্দ করে না একেবারে। তবু ঘটবে, আর মুখ বুজে সহ্য করতে হবে তাকে। এই সব ভেবে বিমর্ষ বোধ করল অমিয়। বিজনের সঙ্গে দেখা করার তীব্রতা কমে এলো আস্তে আস্তে।

দাশরথি আসছেন পিছনে পিছনে। হাতে খাঁকি রঙের পুরনো খামে দশ হাজার টাকার স্বপ্ন।

কনকের দাম! বলা যায় না, দাশরথির বুক খুঁড়লে হয়তো এখন অন্য কিছু দেখা যাবে, যা নিশ্চিত শোক নয়—কনকের মৃত্যুর চেয়ে যা নিশ্চিতভাবে বড়ো। শ্মশান থেকে ফেরার সময় সেদিন কী যেন বলেছিলেন দাশরথি! এরিয়েলের তারে আটকে পড়া বিবর্ণ ঘুড়ির মতো আবছা একটা স্মৃতি ভেসে গেল চোখের ওপর দিয়ে। রোদ্দুর তীব্র হওয়ার ফলেই সম্ভবত অমিয় আর কিছু ভাবতে পারল না।

বিজন ছিল না। বামনদাস এমন কিছু বলেনি যাতে মনে হতে পারে বিজন থাকবেই। প্রত্যেকটি মুখের ভিড়ে অমিয় বিজনকে খুঁজল। সঙ্গে দাশরথি ঝুলে থাকায় গতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। জায়গা পেয়ে ও দাশরথিকে বসিয়ে এনেক্সে যাবার জন্যে রাস্তায় নেমে এলো।

না, নেই।

অনাবশ্যক, তবু ল্যাভাটরিতে গিয়ে আয়নার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল অমিয়। দাঁতের ফাঁকে লুকোনো মাংসের টুকরোর মতো অস্বস্তিটা ছাড়ল না তাকে।

কী হয় যদি দাশরথিকে একা ফেলে রেখে সে চলে যায়, ভাবল অমিয়। বিবেক? না, সে-রকম কোনো সংশয় তার নেই। কৈফিয়ত দেবারই বা আছে কী! ভবিষ্যতে দাশরথির সঙ্গে তার খুব একটা দেখা হবে না। হলেও, পাশ কাটিয়ে যাওয়া কি আর এমন কঠিন কাজ! এই মানুষটি সম্পর্কে তার মনে কোনো শ্রদ্ধা নেই, ছিল না কোনো দিন। আর এই মুহূর্তে স্পষ্টই সে দাশরথিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

কফির ব্যবস্থা নিজেই করেছেন দাশরথি।

'লোকটা দু'বার খোঁজ করে গেল।' অমিয়কে ফিরতে দেখে বললেন, 'ভাবলুম অর্ডারটা দিয়েই দিই।'

'ভালোই করেছেন—'

আড়াআড়ি চেয়ার টেনে বসল অমিয়। দাঁতের ফাঁকে মাংসের টুকরোটা জিব বুলিয়ে তোলবার চেষ্টা করল কয়েকবার। পট থেকে নিজের কাপে কফি ঢেলে যতোটা সম্ভব

স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু খাবেন ?'

'না, না। শুধু তুমি ডাকলে বলে—'

এক চুমুকেই সশব্দে অনেকটা কফি একসঙ্গে গিলে ফেললেন দাশরথি, 'চমৎকার, চমৎকার জিনিসটা !'

নিজেরটা ঠাণ্ডা হতে দিল অমিয়। এইভাবে যতোটা সময় যায়। বিজন আসবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। যদি না আসে, এর পরের সময়টা কী করে কাটাবে কিছুই ঠিক নেই। শ্যামল বা নিখিলের সঙ্গে দেখা করা যায়। যদি দু'জনকে বা দু'জনের একজনকেও ধরা যায়, তাহলে স্বচ্ছন্দে খেলার মাঠে চলে যেতে পারে তারা। বহু দিন তারা একসঙ্গে থাকেনি, বহু দিন একসঙ্গে পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো হয়নি। আজ সময় ছিল, আর উপলক্ষ, আজ তারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারত।

ভাবনাগুলো এসে যাচ্ছে পরপর, ঘুরন্ত পাখার ব্লেডের মতো একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। এইভাবে তার দৃষ্টি ও চেতনায় কফি হাউস, বন্ধুদের মুখ, অপরিচিত বহু মানুষের মুখ, ট্যাক্সি, মোটর, ট্রাম, বাস, শব্দ ও রঙ ক্রমশ একাকার হয়ে গেল। কোনো চিন্তাতেই সে আর উৎসাহ পেল না। বাড়িতে, অফিসে বা বাইরে সে যেমন আছে থাকবে, অমিয় ভাবল। বৈচিত্র্যহীন একার জীবন। এই মুহূর্তে বিজনের আসা না আসায় তার কিছুই এসে যাবে না। রেখা কোনো সমস্যা নয়। সে নিজেই কি !

উদাসীন ভাবনার মধ্যে ক্রমশ গভীর বিষাদে ডুবে যাচ্ছিল অমিয়। ঠাণ্ডা কফির কাপটা তুলে আস্তে ঠোঁটে ছোঁয়াল। প্লাস্টিকের নলের মতো কিছু একটা নেমে যাচ্ছে বুক দিয়ে, পেটের কাছে পাক দিতে বিষম খেয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল ও।

'আর কী পাওয়া যায় এখানে ?'

দাশরথির লক্ষ পাশের টেবিলে। ছোট ছোট জলের বিন্দু কপালে। টেবিলে চশমা আর খাম। হাই তুলতে দাঁত-মাড়িসুদ্ধ আলজিভ পর্যন্ত গলার ভিতর অনেকটা দেখা গেল।

'কী খাবেন ? কাটলেট ?'

'হ্যাঁ। একটা কাটলেট খাই—'

একটু বা জোর গলায় বললেন দাশরথি, ব্যস্তভাবে বয়কে খুঁজলেন। অমিয় কাটলেট আনতে বলল।

'তুমি হয়তো ভাবছ লোকটা হ্যাংলা ! না, সে-রকম কিছু নয়—'

অসহায় মুখে হাসলেন দাশরথি। অপেক্ষার পর বললেন, 'আমার একটা ইচ্ছে আছে অমিয়। ইনসিওরেন্সের টাকাটা পেলে একদিন তোমাদের খাওয়াবো।'

অমিয় শুনেও শুনল না। বিস্বাদ মুখে বমির ভাব। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাচের দরজার বাইরে বাস স্টপ পর্যন্ত যতো দূর দেখা যায় নির্বিকার তাকিয়ে থাকল সে।

দাশরথির হাতে ঝকঝকে ছুরি। ক্ষুধায় কদাকার মুখ। গরুর জিবের মতো সদ্য-ভেজা বস্তুটির গন্ধে নাক ডুবিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির গলায় বললেন, 'কালাশৌচের সময় বুঝি বাইরে খায় না ! দেখ, ব্যাপারটা যেন আর কেউ না জানে।'

॥ নয় ॥

স্বাভাবিক হলদে রঙ ক্রমশ নীলাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পর্দায়, চোখের পলকেই আবার লালের আভা। ঠিক লালও হয়তো নয়—যাকে ক্রিমসন বলে, অনেকটা তাই, রঙের ওঠাপড়া দেখে মনে হয় জলের নিচ দিয়ে তীব্র বাতাস ছুটে চলেছে। ওরই মধ্যে ঘুমন্ত মেয়েটির অস্পষ্ট মুখ ভেসে উঠে হারিয়ে গেল আবার—দুটো তেজী ঘোড়ার পা—ক্রমাগত রঙ বদলের আড়ালে পা দু'টি অদৃশ্য হতেই আরেকটি দৃশ্য : অস্ফুট স্তনের ওপর সোনালি অশ্বক্ষুর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে···

চোখের পাতা আপনিই বন্ধ হয়ে এলো ঝুমির। কিছুক্ষণ ধরেই তলপেটে একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে ; কলসি থেকে জল উপচে পড়ার মতো কেমন ছ্যালছেলে অনুভূতি, কানের গরম গাল পর্যন্ত ছড়ানো। একবার বাথরুমে গেলে হতো। শ্যামলের চোখ পর্দার ওপর স্থির ; কাঁধে বাহুতে ছোঁয়াছুঁয়ি সত্ত্বেও বিভোর। পাশের দুটো সিট খালি, পিছনে দেওয়াল। বেরুতে হলে ওদিকের কিছু লোকের হাঁটুর গুঁতো খেয়ে বেরুতে হবে। না, সম্ভব নয়।

দামী মেহগনি খাটের ওপর চমৎকার বিছানা, ঝাড়লণ্ঠন, নতুন ধরনের দেওয়ালঘড়ি থেকে ঝকঝকে সিঁড়ি, নির্জন রাস্তা—টর্চ ফেলার মতো করে দেখাচ্ছে এক একটা জিনিস। চোখের ওপর দিয়ে একটার পর একটা দৃশ্য পার করা ছাড়া আর কিছুই নেই। সংলাপ বুঝছে না বলেই অসুবিধে আরো বেশি। পাশের হলে হিন্দি ছবি চলছে—কথা ছিল শ্যামল টিকিট কেটে রাখবে, দু'জনে যাবে। টিকিট না পেয়ে অগত্যা এই হলে ঢোকা। জায়গাটা ভালোই পেয়েছিল বলতে হবে, অনেকটা এই রকমই চেয়েছিল। গড়িমসি করে যখন ঢুকল, ছবিটা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।

কলেজ-ফেরত সুনন্দাদের বাড়ি যাবে, জন্মদিন, এই রকমই বুঝিয়ে এসেছে বসুধাকে। বাঁধা ছকে পা ফেলতে আজকাল আর অসুবিধে হয় না। দাদা যাবার পর থেকে মা অন্যমনস্ক, বাবা তিতিবিরক্ত ; একটু বেশি গালমন্দ করেন, এই যা। স্বভাব ! না হলে চলাফেরায় আজকাল সে রীতিমতো অবাধ, রীতিমতো স্বাধীন। বুলাই যা একটু-আধটু চোখে চোখে রাখে। মাঝেমধ্যে উটকো এক আধটা প্রশ্ন করে বসে, সন্দেহের চোখে তাকায়, মুখে প্রায়ই 'ধরে ফেলেছি' ভাব। একে মেয়ে আর বয়সে পিঠোপিঠি বলেই কি ! হতে পারে।

ঝুমি খুব অবাক হয় না। বিরক্তি যেটুকু তা নিজেকে নিয়েই, অচেনা ভয়ে বুকটা সারাক্ষণ ধুকধুক করে। বুলার সন্দেহ—ঈর্ষা নয় তো ? —যতো দিন না খোলাখুলি প্রকাশ পাচ্ছে, ততো দিন অন্তত তার ভাবনার কিছু নেই। থাকলেই বা কী ! দাদা যাবার পর সংসার থেকে যেটুকু পাবার আশা ছিল সব গেছে। বাবা আর বেশি দিন বাঁচবে না ; অন্তত সে আর দিদি—দু'জনের চিন্তাই দাশরথিকে মারবে আরো তাড়াতাড়ি। সময় থাকতে সে যদি নিজের একটা ব্যবস্থা করে ফেলে, চলে যেতে পারে—আঃ, বাবার তাতে খুশি বই দুঃখ হবে না। দাদা বলত, তোরা দুটোই বাবার যম ! দুটো প্যারালিটিক হাত ! ঠাট্টা করেই বলত হয়তো। কিন্তু, দ্যাখো, কথাটা কেমন ফলে গেল !

দাদা, কনক, কনকেন্দ্র মিত্র। ডায়েরির প্রথম পাতাতেই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ছিল নামটা। দেশের বাড়িতে চতুর্দশীর রাতে জন্ম হয়েছিল নাকি ; নিতান্তই ভাসুরের নাম সুধাবিন্দু, নয়তো ওই নামটাই বেশি পছন্দ ছিল বসুধার। মাথার দিকে একটা তারিখ ছিল,

সম্ভবত ওই দিনই কিছু লেখার কথা মনে এসেছিল দাদার। কী, ঠিক জানা যায়নি। যেতো, যদি বুলা সরিয়ে না ফেলত। সামান্য জিনিস, কিন্তু, কেমন যেন অস্পষ্ট থেকে গেল পুরো ব্যাপারটা! কনক নামে কেউ একজন ছিল, যে তার দাদা, এখন ভাবলে কেমন ধাঁধার মতো লাগে। ঘরেরদেওয়ালে টাঙানো ছবিটায় প্রতি বুধবার আর শনিবার এখনো মালা পরিয়ে যাচ্ছে তারা। দাদার জন্ম আর মৃত্যুদিন। কিন্তু, প্রায়ই কৃত্রিম লাগে—অন্যান্য ছবির মতো লাগে। কনকেন্দ্র মানে কী!

এক বিছানায় শুতে হয় তাদের। এক বিছানায় শুতে গেলে প্রায়ই গায়ে গায়ে লাগে। বুলার সঙ্গে তবু একটা দূরত্ব—বন্ধুরা কেউ বেড়াতে এসে ফিরতে পারেনি, ভোর হলে চলে যাবে, এই রকম মনে হয়। বুলার কি মনে হয় কিছু? আজকাল কথা বলে কম, বেশির ভাগ সময়ই গম্ভীর হয়ে থাকে। যেন সাড়ে তিন নয়, বুলা আর তার মধ্যে বয়সের ব্যবধান দশ বছরের। আজকাল 'দিদি' ডাকটা কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। বুলা নামটা, অব্যবহারে, মনে পড়ে না আর—শাড়ি সায়ার নিচে চকচকে পুরুষ্ট হাঁটু দুটোর কথাও যেমন মনে পড়ে না। শুধু এক একসময় আরো একজন কেউ জেগে ওঠে মনের মধ্যে, রোম খাড়া-করা বিচিত্র এক একটা অনুভব দুলিয়ে দিয়ে যায় কেমন! এই রকম, প্রায়ই।

গতকাল গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে লক্ষ করেছিল বিছানার ওপর চুপচাপ জেগে বসে আছে দিদি। এ-ঘরে পাখা নেই, গরম; কিন্তু পাখা তো অনেক দিনই নেই—এই রকম গরমে তারা বরাবর অভ্যস্ত। রাত খুব গভীর হলে এক রকম শব্দ হয়, শব্দটা ওঠে বুকের মধ্যে। ঘন নিঃশ্বাস পড়ে দিদির। অন্ধকার মশারির ভিতর একটা উপুড়-করা পাথরের মতো লাগে। ডাকব? ডাকতে কেমন সাহস হয় না। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে একসময়। আস্তে আস্তে ঘুম আসে আবার। ঘুমের ভিতর, আস্তে আস্তে, কখন ভোর হয়ে যায়।

হাউসের অন্ধকার ঝুমির পা থেকে মাথা পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলল। ছোটবেলায় একটা প্রশ্নে প্রায়ই ধাঁধা লেগে যেতো—পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, না সূর্য পৃথিবীর! পর্দার দিকে তাকিয়ে পরপর অর্থহীন দৃশ্যের প্রবাহে ওর সেই রকম মনে হলো; সে কেন্দ্রাভিগ হয়ে আছে, অন্ধকারে একা, সামনে দিয়ে চলেছে মানুষজন, চলেছে ঘরবাড়ি, আয়না, টেবিল, ঝাড়লণ্ঠন, রাস্তা। যতো ভয় এই থেমে পড়াটাকে নিয়ে।

চুম্বনের দৃশ্যে মেশিনের প্যাঁচের মতো শ্যামলের হাতের পাঁচটা আঙুল ওর আঙুলে জড়িয়ে গেল। কানের লতিতে শ্যামলের ঠোঁট। ফিসফিসে নিঃশ্বাস।

'কিছু দেখছ? না বসে আছ চুপচাপ?'

একটু কাত হয়ে শরীরটা সামনে গড়িয়ে দিল ঝুমি। সামনের সিটের তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল পা দুটো। সমুদ্রতীরে বালির ওপর শুয়ে থাকা অচেতন মেয়েটির জলে-ভেজা মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে যুবকটি। উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ একবার তাদের ওপর দিয়ে ফিরে গেল। তলপেটে আবার ঢেউ ভাঙার অনুভূতি টের পেল ঝুমি।

'ছোটবেলায় আমি একবার ডুবে গিয়েছিলাম—'

অস্পষ্ট স্বর। শ্যামলের চিবুক ওর কাঁধের ওপর নামানো। প্যাঁচানো আঙুলের ভাঁজগুলো ঘামে ভিজে সিরসির করছে।

'কোথায়?'

'বহরমপুরে। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। বাড়ির লাগোয়া পুকুর—চোরা কাদায় পা ডুবে

যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মাথার ওপর কেউ দু' মণ পাথর চাপিয়ে চেপে ধরেছে—'

শ্যামল সাড়া দিল না। বাঁ হাতে বুকের ওপর থেকে শ্যামলের হাতটা সরিয়ে পা ক্রশ করে বসল ঝুমি। অনেকটা এখনকার মতো, বা মাঝে মাঝে আজকাল যেমন লাগে। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁ করল ঝুমি।

ঘাড় থেকে মুখ তুলে শ্যামল বলল, 'তুমি কোন সাবান মাখো ?'

ঝুমি কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলে উঠল।

বর্ণ, স্পর্শ, গন্ধ থেকে আবার সেই দূরত্বের শুরু ; যেন এতোক্ষণের ঘন আবেগের সবটাই মিথ্যে। আলো জ্বলে ওঠার পর মনে হলো অন্ধকারটাই ছিল ভালো, ছিল নৈকট্য, সান্নিধ্য, নিঃশ্বাস। সম্ভবত এটা পুরনো ছবি, তার দেখা, শ্যামল সেই রকমই বলেছিল। প্রায় ফাঁকা হাউসের লোকবিরলতা দেখে সেই রকমই মনে হয়।

শ্যামল আড়মোড়া ভাঙল, 'ঘুরে আসছি, বসো।'

ঝুমি একটু ইতস্তত করল, তারপর উঠল। অস্বস্তিটা অনেকক্ষণ ধরেই চেপে রেখেছে। হাউসের লবিতে অন্য রকম হাওয়ায় দাঁড়িয়ে ও ভাবল, যে-করেই হোক, শ্যামলকে আজ কথাটা জিজ্ঞেস করবে।

চায়ের অর্ডার দিয়ে শ্যামল কিছুক্ষণ ঝুমির জন্যে অপেক্ষা করল। ঝুমি সম্পর্কে এখন তার মনে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। এখন সে অনায়াসে ঝুমিকে ভাবতে পারে অধিকারের বস্তু হিসেবে—একান্ত করে, শারীরিক প্রচণ্ডতার ভিতর দিয়ে। দাশরথি, বসুধা, বুলা থেকে আলাদা করে। আর, কনক তো মৃত। নিখিল বা অমিয় সম্পর্কে তার কোনো মোহ নেই, বন্ধুত্ব ব্যাপারটাই আজকাল কেমন গোলমেলে লাগে। অমিয় বা নিখিল তাকে পছন্দ করে না, অনেক দিনই মনে হয়েছে এই কথাটা। তবু হাসপাতালের কেবিনের বাইরে একসঙ্গে রাত জেগেছে তারা, জড়াজড়ি করে, গায়ে গা লাগিয়ে। ঠিক বোঝা যায় না কেন ! আড্ডা, খেলার মাঠ, কাছাকাছি থাকা, এগুলো কি কোনো নির্ভর ? বিশ্বাস হয় না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ঝুমির ঘন হয়ে আসা চোখ-মুখ লক্ষ করল শ্যামল। দু' স্লাইস চর্বির মতো ঠোঁট দুটো ভেসে আছে সমগ্র মুখের ওপর ; টলটলে, সদ্য মোড়ক খোলা পুরো একটা শরীর ! হঠাৎ দেখলে মনে হয় ঝুমি তার অতীত থেকে উঠে এসেছে। চমৎকার, প্রবল এক ঝুমি !

'তোমার কি ভালো লাগছে ছবিটা ?' দাম মিটিয়ে জবাবের গলায় প্রশ্ন করল শ্যামল, 'দেখবে ?'

খাতাটা বুকের কাছে ধরে কাউন্টারে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল ঝুমি। জবাব দিল না।

'বরং বেরিয়ে পড়ি।' শ্যামল ঘড়ি দেখল, 'মাত্র সওয়া সাতটা—'

আঁচলে কাঁধ-পিঠ ঢেকে ঝুমি শ্যামলের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলো।

এই সময় সাধারণত রাস্তা ফাঁকা থাকে না। তবু ফাঁকা। মেয়ো রোড ধরে পার্ক স্ট্রিট এবং উল্টো দিকে কিছু গাড়ি যাতায়াত করছে। সামনে পড়ে আছে অতিকায় চৌরঙ্গির রাস্তা—শ্যামল ট্রাম বা বাস দেখতে পেল না। ফুটপাথে, আর্কেডের নিচে বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ। পাঁচ মিনিট পথ পেরুতে মাত্র বিক্ষিপ্ত দু'জনের সঙ্গে দেখা হলো।

পাশে ঝুমি। একটু বা মন্থর হাঁটার ভঙ্গি। ওপরে তাকালে পরিচ্ছন্ন আকাশ চোখে পড়ে, মিহি জ্যোৎস্না গাছ মাঠ ছাড়িয়ে চলে গেছে বহু দূর পর্যন্ত। গ্র্যাণ্ড হোটেলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই চোখ জ্বালা করে উঠল।

ছোট জটলায় চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে। থমথমে মুখ। ওপাশে পুলিস-ট্রাক ঘিরে কয়েকজন পুলিস। রাস্তা ভর্তি ইঁটের টুকরো, একজন পুলিস সেগুলো কুড়িয়ে রাস্তার ধারে ছুঁড়ে দিচ্ছে। একটা ডবলডেকারকে মেয়ো রোড ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটে যেতে দেখল।

জটলার কাছ বরাবর এসে শ্যামল দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতের রুমালে অনবরত চোখ রগড়াচ্ছে ঝুমি। শ্যামল অনুমান করল এইখানে টিয়ার-গ্যাসিং হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করতে একজন সেই কথা বলল। ভিয়েতনামে মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে ছাত্রদের মিছিল বেরিয়েছিল, সেই থেকে গোলমাল। খানিক আগেই টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়েছে। যে বলছিল সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কোথায় যাবেন?' বলে জুলজুলে চোখে ঝুমির দিকে তাকাল। শ্যামল দেখল অসাবধানে ঝুমির বুক থেকে আঁচল সরে গেছে। ট্রাম বাস বন্ধ কি না জিজ্ঞেস করে ও ঝুমির হাত ধরে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল।

এদিকটা স্বাভাবিক। তৎপরতা একটু কম হলেও স্বাভাবিক। দোকানপাট খোলা। চোখে জ্বালাধরা ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। কর্পোরেসানের সামনে দিয়ে একটা বাস এগুতে দেখে শ্যামল বুঝল অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

ঝুমি হাসল অপ্রস্তুতভাবে।

'এখন কী হবে?'

'কী আর হবে! কলকাতায় এটা রোজকার ব্যাপার—'

ঝুমি বলল, 'আমাদের কলেজে কাল ইলেকসান…'

খালি ট্যাক্সি দেখে শ্যামল চেঁচাল। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সিটা।

'কোথায়?'

'চলো, আমার ওখানে—'

'না। দেরি হয়ে যাবে।'

ঝুমির গলায় অনুৎসাহ নেই। কথাগুলো আলতো, প্রায়ই অস্ফুট। বিয়ের পর দিন সকালে বৌদি এই রকম গলায় কথা বলেছিল।

'ছবিটা পুরো দেখলে সাড়ে ন'টার আগে ফিরতে না।' শ্যামল ওর হাত ধরে টানল, 'তাছাড়া, তুমি এখন সুনন্দাদের বাড়িতে—'

ট্যাক্সিতে উঠে ঝুমি বলল, 'মেসের লোকগুলো কেমন করে তাকায়—'

শ্যামল কাছে টানতে কাটা ডালের মতো ঝুমির মাথাটা ওর কাঁধে নেতিয়ে পড়ল।

'বাড়িতে থাকতে আজকাল আর ভালো লাগে না।'

'জানি।'

'কী?' খাতাটা কোল থেকে খসে পড়েছিল, তোলবার জন্যে সামান্য ব্যগ্র হলো না ঝুমি। আঙুলে আঙুলে আবার সেই মেশিনের প্যাঁচ।

শ্যামলের নিঃশ্বাস তপ্ত। কিছু বলতে গিয়ে আবার নৈঃশব্দ্যে ফিরে গেল।

এখনই সময়। ঝুমি ভাবল, বলার কথাগুলো এখনই বলে ফেলতে হবে। উত্তেজনায় বুকের ভিতর কলকব্জাগুলো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, জামা কাপড়ের নিচে কুলকুল করে ঘেমে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। কীভাবে কথাটা শুরু করবে ঝুমি বুঝতে পারল না, প্রতিটি মুহূর্ত তার শিরার ভিতর ঢুকে রক্তের ফিন্‌কির মতো ছুটতে লাগল।

ট্রাফিকে গাড়ি দাঁড়াতে সরে বসল ও। অকারণেই ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। শ্যামলের চোখ বাইরের দিকে। শ্যামল, দাদার বন্ধু। মানেটা এই রকম, দাদার মৃত্যু এই

কাছাকাছি আসার সুযোগটা করে দিল। হয়তো এই রকমই হয়।

ঝুমি এক রকম বিষণ্ণতা বোধ করছিল। দাদাকে জড়িয়ে কিছু ভাবতে ভালো লাগল না। গতির নিস্তব্ধতায় শ্যামলের ঘন সান্নিধ্যে বিভোর হতে হতে হঠাৎ দাদার অসুখটার কথা মনে পড়ল। মৃত্যুর আগে ক'টা দিন খুব শান্ত দেখাত দাদাকে ; বিকারহীন, যেন তাদের সম্পর্ক থেকে দূরে এলোমেলো একটা ভাবনায় ডুবে থাকত সারাক্ষণ। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে দাদাকে নয়, দাদার শরীরের ভিতর রক্তকণিকাগুলো চোখে পড়ত যেন। লাল থেকে সাদা, লাল থেকে সাদা হতে হতে একদিন শেষ হয়ে গেল ! হয়তো এই রকমই হয়।

কী-বোর্ড থেকে চাবি তুলে দারোয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল শ্যামল। আগের দিন নিচে, বারান্দায়, চেয়ার পেতে কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখেছিল। আজ কেউ নেই। কপাল ভালো, আজ কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে ভারী, অসহায় শরীর টেনে উঠতে উঠতে নিজেকে কেমন দুর্বল মনে হয়। বলার কথাগুলো গুরগুর করে পেটের মধ্যে। মনে পড়ে বসুধার মুখ। গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্যামল ছাড়া আর কারও মুখ সে দেখেনি। সে কি শ্যামলের ওপর নির্ভর করতে পারবে ?

দরজা খুলে শ্যামল লাইট জ্বালল, পাখার স্যুইচটা অন্ করে দিল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'তোমাকে একটা জিনিস দেবো।'

'কী ?'

'দেখো—'

শ্যামলের মুখে একটা গন্ধ পেল ঝুমি। খানিক আগে ট্যাক্সিতে আসতে আসতে এই গন্ধটা সে নিজের শরীরেও টের পেয়েছিল। গন্ধটা বিশ্লেষণ করা যায় না। চেয়ারটা বাদ দিয়ে ও বিছানায় গিয়ে বসল।

আলনা থেকে পায়জামা তুলে নিয়ে বেরুতে বেরুতে শ্যামল বলল, 'বসো, বাথরুম থেকে আসছি।'

'ফিরতে হবে—'

'তাড়া কিসের !' বিচ্ছিন্নভাবে হাসল শ্যামল, 'আমি পৌঁছে দেবো—'

দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে গেল শ্যামল।

জানলাগুলো বন্ধ। ঝুমি খুলে দেবার কথা ভাবল, উঠতে পারল না। এই মুহূর্তে শ্যামলের থেকে দূরত্বে থেকেও সে তার শরীরে পরিষ্কার জ্বর আসা টের পেল। আলতো হাতে বালিশটা টেনে নিয়ে নাকের সামনে ধরল ; সেই অপরিচিত গন্ধটা আবার ফিরে আসছে। কাছেই কোথাও রেডিওতে খবর চলছে, উৎকর্ণ থেকে শব্দগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করল ও। আর-সব শব্দের মধ্যে হিজিবিজি একটা শব্দ কানের পর্দায় গুঞ্জন করছে। সম্ভবত পাখার শব্দ, সম্ভবত অবসাদের, সম্ভবত সময়হীনতার। শরীরটাকে বিছানার ওপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল ঝুমি। ক্লান্তি কি না ঠিক অনুভব করা যায় না। ভালো হতো যদি আলোটা নিবিয়ে দিত কেউ।

গায়ের ওপর নরম একটা ভার পড়তে ও চোখ খুলল। শ্যামল বলল, 'পছন্দ হয়েছে ?'

শূন্য চোখে শ্যামলকে দেখল ঝুমি। তারপর বুকের ওপর থেকে পরিষ্কার পাট-করা সিল্কের শাড়িটা তুলে নিল হাতে। উঠতে যাচ্ছিল, পাশে বসে কাঁধ দুটো ধরে নামিয়ে দিল শ্যামল। এক মুহূর্তে শরীরটা হিম হয়ে এলো যেন। কোনো রকমে ঘাড় তুলে ও দরজার দিকে তাকাল। খিল বন্ধ।

'আমি এবার যাব—'

স্বরটা পরিষ্কার হলো না। শরীরের দু' পাশে থামের মতো শ্যামলের দু'টি রোমশ হাত। গেঞ্জি পরার দরুন হাত ও কাঁধের পেশিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর মুখের মধ্যে চোখ দুটো বড়ো বেশি প্রকট। কপালে নিঃশ্বাস লাগতে দাঁতে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল ঝুমি।

'কিছু বললে না তো ?' শ্যামল বলল ; বলতে বলতে ভাঁজ-করা শাড়িটা ওর বুক থেকে নামিয়ে পাশে রাখল।

শাড়িটার দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট টের পেল ঝুমি, তার সমস্ত শরীর জুড়ে কান্নার বেগ আসছে। আর তখন, তীব্র অসহায়তার মধ্যে ও দেখল, শ্যামল বেড-স্যুইচটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

'শ্যামলদা, প্লিজ—'

গন্ধটা পুরোপুরি তরল হয়ে নেমে গেল মুখের মধ্যে। যাবতীয় শব্দ এখন অসাড়। অন্ধকারে বিদ্যুচ্চমকের মতো অসংখ্য আগুনের শিকড় নানা দিক থেকে ঢুকে পড়ছে শরীরে। সেই ডুবে যাওয়ার অনুভূতি, হাতে পায়ে পাথর বেঁধে ক্রমশ জলের নিচে তলিয়ে যাওয়া। তারতম্যহীন অন্ধকারে আশ্লিষ্ট হতে হতে নিঃশব্দ কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল ঝুমি।

॥ দশ ॥

লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে আরো কিছু দূর এসে বসুধা বললেন, 'তুমি এবার যাও নিখিল। আমি ফিরে যেতে পারব।'

কথা হচ্ছিল গলির মুখে দাঁড়িয়ে। ছিট-কাপড় আর মুদির দোকান পেরিয়ে অমিয়র বাড়িটা এখান থেকেই দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে নিখিল বলল, 'ঠিক পারবেন তো ? না আমি অপেক্ষা করব ?'

'পারব, পারব।' দ্রুত কথা বললেন বসুধা, 'এ-পাড়ার নাড়িনক্ষত্র সবই যে চিনি ! গোড়ায় একটু খটকা লেগেছিল, তাই বাড়িটা চিনে নিলুম। বয়স হয়েছে, ঠিকানা মিলিয়ে খুঁজে বের করা কি আমার কাজ !'

নিখিল তবু ভরসা পেল না। এমনিতে বসুধাকে বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। কিন্তু এই ভর-দুপুরে, অসময়ে, যখন অমিয় বাড়ি নেই, রেখার সঙ্গে কী এমন দরকার পড়বে বসুধার ! অমিয় থাকতে থাকতে এলেই ভালো হতো, খুশি হতো অমিয়—তাকেও অফিস পালিয়ে বসুধাকে সঙ্গ দিতে হতো না !

এই একটা জায়গায় সরল, স্নেহপ্রবণ, মমতাময়ী বসুধা কেমন যেন অস্পষ্ট। এখন মনে হচ্ছে এই রহস্য থেকে বসুধাকে দূর রাখতে পারলেই ভালো হতো।

নিজের শক্তিহীনতা, অক্ষমতা, মাঝে মাঝে মনের ওপর বড্ড বেশি চাপ দেয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই সব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারলেই ভালো হতো। শেষ পর্যন্ত এরা তার কে ! কেউ নয়। সম্পর্ক যার সঙ্গে ছিল তাকে মেঘ, হাওয়া, সময়ের মতো চিরজাগতিক ও অস্পৃশ্য মনে হয়। অথচ, নিঃসম্পর্কীয় এই মানুষগুলোর সঙ্গে তার দিনযাপন এমনভাবে জড়িয়ে গেল কেন ! অমিয় বা শ্যামলের মতো সে কেন পারল না

দূরে থাকতে !

সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল নিখিল। পুরনো কথার জের টেনে বসুধা বললেন, 'তুমি যাও এবার। আমার জন্যে ভেবো না।'

আরো একটু দাঁড়াল নিখিল। আরো একটু ভাবল। তারপর মাথা হেঁট করে ফেরার জন্যে পা বাড়াল।

যতোক্ষণ নিখিল ছিল ওকে এড়িয়ে যাওয়ার জেদটাই ছিল প্রবল। এতক্ষণে একটু দ্বিধায় পড়লেন বসুধা, এইভাবে একা একা যাওয়া কি ঠিক হবে! বা, সত্যিই এই যাওয়ার কি কোনো প্রয়োজন ছিল ! রেখা তাঁর কথা বুঝতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি ভুল বোঝে, যদি অপমান করে ! যদি এমন হয়, অমিয় ব্যাপারটা জানল, অমিয়র মুখ থেকে আরো পাঁচজন—কোথায় দাঁড়াবেন তিনি !

যুক্তি বসুধাকে চিন্তায় ফেলল, একটু বা আলোড়িত করল। কিন্তু, মনের বিকারটাই শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল তাঁকে। কী আর হবে, ভাবলেন, উচিত অনুচিত তাঁর মনের মধ্যে। নিজে মেয়েমানুষ হয়ে রেখা কি এই সামান্যটুকু বুঝবে না !

অমিয়র দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল টেপার পরও বেশ কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পেলেন না। সারা পথের উত্তেজনা এতোক্ষণে বেতাল হয়ে উঠল বুকের মধ্যে। কেমন এক দুপ্‌দাপ শব্দ—অস্থিগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে জায়গা বদল করে নিচ্ছে।

দরজা খোলার আগে জানলাটা খুলল। বসুধা রেখাকে দেখলেন। সম্ভবত ঘুম থেকে উঠে এলো।

'চিনতে পার, মা ?'

'ও !'

একটু সময় লাগল রেখার। বিস্ময় কেটে যেতে ফ্যাকাশে মুখে কথা ফুটল। তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলল রেখা।

'কতো দিন ভেবেছি তোমাকে দেখতে আসব—'

পেটের ভারে ঝুঁকতে অসুবিধে হয়। তবু কোনো রকমে ঝুঁকে বসুধার পায়ের পাতা ছোঁবার চেষ্টা করল রেখা। বসুধা ওর হাতটা ধরে ফেললেন।

'অমিয় নেই ?'

রেখার বিস্ময় যাচ্ছে না। আড়ষ্ট, একটু বা ভীত। দরজায় ছিটকিনি তুলে, মোড়াটা টেনে বসুধার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এখন তো অফিসে। আপনি আসবেন জানলে থাকতে বলতাম।'

'জানিয়ে আসবার সময় কোথায় মা !' মাথা থেকে পা পর্যন্ত রেখাকে লক্ষ করতে করতে বসুধা বললেন, 'এমনিতেই আধমরা হয়ে আছি। যার যাবার নয় সে-ই চলে গেল—সংসার আর ভালো লাগে না !'

বসুধার গলার স্বর আর্দ্র। দেওয়ালে রেখাদের বিয়ের ছবি। সেদিকে তাকিয়ে ভারী আঁচলের খুঁটটা তুলে নিলেন হাতে।

'এসো, কাছে এসে বসো—'

রেখা একটা ধাক্কা খেল। এতো দিন ধরে ছায়াটাকে প্রাণপণে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কে জানত এমনভাবে সে ফিরে আসবে ! শরীরময় স্পষ্টই সে কম্পন অনুভব করল। বসুধার চোখে চোখ রাখা যাচ্ছে না—ভালো হতো যদি যে-কোনো ছুতোয় একটু আড়ালে

যেতে পারত।

সেই ভেবেই বলল, 'দুপুরে এলেন, আপনাকে একটু সরবত করে দিই—'

'না, না।' আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বসুধা বললেন, 'তোমাকে অসুবিধেয় ফেলতে চাই না, মা। কাউকে না জানিয়ে এসেছি, এখুনি আবার চলে যাব।'

বুকের ভিতর এলোপাথাড়ি শব্দ। নিঃশ্বাস সহজ করতে দম নিলেন বসুধা।

'কাছে এসো একটু। তোমার হাতটা ধরি।'

রেখার নড়ার অপেক্ষা না করেই হঠাৎ ওর হাতটা টেনে মুঠোর ভিতর সোনার ছোট সিঁদুর কৌটোটা তুলে দিলেন বসুধা।

'ওর বউকে দেবো বলে তুলে রেখেছিলাম। তুমি এটা ব্যবহার করো মা ; আমার আশীর্বাদ আছে। আর কেউ জানতে পারবে না—'

বসুধার গলা বুজে এলো। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'ও তোমায় বড়ো ভালোবাসত। আমি মা, আমি সব বুঝতে পারি।'

নীরক্ত মুখে কিছুক্ষণ থ হয়ে বসুধার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রেখা। ক' মুহূর্ত। তারপরেই বসুধার জানুতে মাথা রেখে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আঁচলে চোখ মুছে হাসলেন বসুধা। রেখার মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এ-সময় উত্তেজনা ভালো নয় রেখা। কেঁদো না। তোমার বিরুদ্ধে কি কোনো অভিযোগ নিয়ে এসেছি! কাঁটার মতো বুকে বিঁধেছিল এতো দিন, এখন বড়ো হাল্‌কা লাগছে—'

বসুধা চলে যাবার পরও একভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রেখা। হাতের মুঠোয় সিঁদুরের কৌটো, হাতের মুঠোয় সময়টা ধরা। খোলা দরজা পেরিয়ে সামনে পড়ে থাকে ফাঁকা রাস্তা। একটা এঞ্জিন শান্টিং করে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে, সেই শব্দ ; দিকভ্রষ্টের মতো এঞ্জিনটা কোনো দিকেই এগোয় না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অনুভব করল মুঠোভর্তি ধাতুর অবিচ্ছিন্ন উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে—ধীরে ধীরে, কিন্তু প্রবলভাবে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে রক্তে। এইভাবে থাকলে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। এতো দিন পর্যন্ত কোনো রকমে যাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল যুক্তি, বোধ আর সহ্যশক্তি দিয়ে, এতো দিনের সমস্ত প্রতিক্রিয়া নিয়ে এই মুহূর্তে সে সামনে এসে দাঁড়াল। রেখার কাছে তার অনেক দাবি। না, রেখা তাকে ফেরাবে না। নিজেও ফিরবে না। এই সন্দেহ, ক্লিন্নতা আর অসহায় অভিমানের ভার নিয়ে বারবার আর সে জেগে উঠবে না।

আস্তে দরজাটা টেনে দিল রেখা। রোদ্দুরে ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে বিকেল। রাস্তায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত পারাপার করল শীত ; ফিউজ্‌ড বাল্‌বের ভিতরের বিচ্ছিন্ন তারের মতো কিছু একটা দুলতে থাকল বুকের ভিতর। আকাশের দিকে দীর্ঘ ও ধারালো শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে এঞ্জিনটা চলে যাবার পরও তার একটানা অনুরণন জের টেনে চলেছে মাথায়। রেখা হাঁটছে। সামনের কোনো এক দিনে ভূমিষ্ঠ হবে তার গর্ভজাত সন্তান, প্রায় অমিয়র মুখের আদল—তার ভারে নুয়ে পড়ছে পেট। এই মুহূর্তে তার চারপাশে কার্ফুর মতো অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর কিছু নেই। পুরনো হলেও, জানে, কবেকার স্মৃতির রাস্তা ধরে এখন সে হেঁটে যেতে পারবে পৃথিবীর শেষ ও নির্জনতম জায়গায়।

ক্লান্তিই টেনে নিয়ে যাবে তাকে। তারপর সিঁড়ি ধরে কয়েক পা ওপরে ওঠা, ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকাবে নিচে, জলের দিকে। মরে যাওয়া কী আর এমন শক্ত !

ভাবনা অমিয়কে নিয়ে। অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে অসুবিধে হবে না অমিয়র, বাড়ির চাবিটা সব সময়েই তার কাছে থাকে। না, সে-জন্যে নয়। বাড়ি ফিরে যখন দেখবে রেখা নেই, রেখা আসছে না, রেখা আর এলো না—চেনাশোনা সমস্ত ঠিকানা থেকেই ফিরে আসবে ব্যর্থ হয়ে, কী ভাববে তখন অমিয় ! রেখার মৃত্যুর জন্যে সে কি নিজেকেই দায়ী করবে ! তার অজাত সন্তানের অভাবে ভেঙে পড়বে আস্তে আস্তে ! অমিয় কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে ?

না। সমস্ত শরীর বেজে ওঠে ঝন্‌ঝন্ করে ; দপ্ করে কোথাও একটা আলো জ্বলে উঠেই হারিয়ে যায় আবার। অনেক দূর থেকে উল্টোমুখে অমিয়কে হাঁটতে দেখল রেখা—নিশি-পাওয়া মানুষের মতো সেই হাঁটা। বহু দূর থেকে ভেসে এলো একলা কুকুরের কান্না। ইদানীং এই সব নিয়েই বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল অমিয়, কেমন এক উদাসীন মায়ায় নিজেকে ভরে রাখত সারাক্ষণ। মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে কুকুর তাড়াত, দুধের বাটির শেষ চুমুকটুকু ছুঁড়ে দিত গৃহস্থ বিড়ালের দিকে। একেক দিন গভীর রাতে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানত চুপচাপ। ইস্পাতের লাইনের ওপর দিয়ে চুপিসারে গড়িয়ে যেত মালবাহী রাতের ট্রেন। শব্দ থেকে অন্ধকারে যেতে যেতে অশুভ ভাবনায় কেঁপে উঠত বুক—নিজেকে জাগিয়ে রেখে এইভাবে কাকে তুমি পাহারা দিচ্ছ, অমিয় ! আমাকে ? যে আসছে, তাকে ?

আচ্ছন্নতার ঘোরে একটার পর একটা বাঁক পেরিয়ে এলো রেখা। চতুর্দিক থেকে ছায়ার পর ছায়া এসে আড়াল করে দিচ্ছে অমিয়কে। পরিবর্তে ভেসে উঠছে আর একটি মুখ। নীরক্ত, রুগ্‌ণ, গলা-মোমের মতো সেই মুখের ভিতর একমাত্র চোখ দুটোই স্পষ্ট ; রেখার কাছে তার অনেক দাবি। কেন ! এই পৃথিবীর অপর্যাপ্ত সম্ভাবনার মধ্যে থেকে কেন টেনে নিয়ে যেতে চাইছ আমাকে ! নিরুত্তর বুকে ব্রিজের ওপর থেকে ঝুঁকে নিচে তাকাল রেখা। জলে জল এসে মিশে যাচ্ছে পরপর, দিনশেষের কাল্‌চে আভায় চোখে পড়ছে গভীর থেকে উঠে আসা মাছের ঝাঁক, নিস্তব্ধ লেক, শুধু অনেক দূর দিয়ে একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে মনে হলো। এখনই সময়, রেখা ভাবল, ঝপ্ করে শব্দ হবে একটু, আর যতোক্ষণে কেউ টের পাবে, ততোক্ষণে সে নেমে যাচ্ছে নিচে—তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গভীর কালো জল আর মাছের ঝাঁক, শ্যাওলা আর জলজ তৃণের গন্ধে শান্ত হয়ে আসছে নিঃশ্বাস, বিস্বাদ হাঁ-য়ের ভিতর আসা-যাওয়া করছে জলের পোকা !

পরিপূর্ণ মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে এইভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিল রেখা। হাতের মুঠো আল্‌গা করতে গিয়ে অতর্কিতে মনে হলো, অমিয়র কোনো ক্ষতি হবে না তো ! স্পষ্ট অনুভব করল তার পেটের ভিতর দুটো আবদ্ধ হাতের মুঠি খুলে যাচ্ছে ; রক্ত মাংস রোমকূপ ফুঁড়ে সিরসির করে উঠছে চিৎকার। না, এভাবে সে নিজেকে নিঃশেষ করতে পারবে না। শিশুর হাতের স্পর্শের মতো আলো-হাওয়া এসে ছেঁকে ধরছে তাকে। বেঁচে-থাকার প্রতি প্রগাঢ় মমতায় আস্তে আস্তে বসে পড়ে রেখা, আস্তে আস্তে গড়িয়ে দেয় চোখের জল। আর অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করে, ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।

॥ এগারো ॥

আজও কোনো কাজ হলো না। মুখুজ্জ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শুধু এইটুকু বুঝল তার দরখাস্ত রেকমেণ্ড করে পাঠানো হয়েছে। জবাব আসতে দু' চার দিন দেরি হবে।

তার মানে আরো কিছু দিন অপেক্ষা। আরো কিছু দিন উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকা।

এইভাবেই দেখতে দেখতে চারটে মাস চলে গেল। অপেক্ষার শেষেও যে কাজটা হয়ে যাবে—চাকরিটা পাবে সে, সে-রকম নিশ্চয়তা নেই। মুখুজ্জ্যে কি কোনো আশ্বাস দিচ্ছেন ?

সোজাসুজি প্রশ্নটা করে ফেলল বুলা। ভিতর থেকে আজকাল একটু জোর পাচ্ছে, কথাবার্তা বলতে আটকায় না। নিজের স্পষ্টতায় বা সাহস দেখে মাঝে মাঝে নিজেই রীতিমতো অবাক হয়ে যায়।

'আশা করতে দোষ কী ! মানে—', চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলল মুখুজ্জ্যে, 'ব্যাপারটা ঠিক আমার হাতে নেই। তবে, আপনার দাদা চাকরি করতেন এখানে, ইউনিয়ন সাপোর্ট করছে আপনার কেস্, মানে—'

বুলা বুঝল মুখুজ্জ্যে বিব্রত বোধ করছে। আসলে এর বেশি কিছু তার বলার নেই। এমনও হতে পারে, শুধু অক্ষমই নয়, তার ব্যাপারে বিশেষ খোঁজ-খবরও মুখুজ্জ্যে রাখে না।

'আপনাকে বিরক্ত করলাম।' চটিটা পায়ে টেনে উঠে দাঁড়িয়ে বুলা বলল, 'চলি তাহলে আজ—'

'কেন ! টি বললুম যে !' নাক দিয়ে গলগলে ধোঁয়া বের করে সামনে ঝুঁকে এলো মুখুজ্জ্যে, 'আমার টাইমের জন্যে ব্যস্ত হবেন না, মানে—চা খাবেন না ! এমনি গল্পগুজবও করতে পারি আমরা। আর ইউ সিওর—এখনই চলে যাবেন ?'

অল্প হাসল বুলা।

'ধন্যবাদ।'

তিনতলার ওপর থেকে নিচে রাস্তা দেখা যায়। সেখানে বহু মানুষের ভিড়। ফেস্টুন আর পতাকায় ছেয়ে গেছে। নির্বিকার মুখগুলিতে বিকেলের আভা; একটা চাপা চাঞ্চল্য। ডেপুটেসান আছে বলেই আজ নৃসিংহকে ধরা যায়নি। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে পড়বে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিচের ভিড়টাকে লক্ষ করল বুলা। তারপর খুব গতানুগতিকভাবে ভাল্‌কান স্মিথ্ লিমিটেডের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচে।

ওপর থেকে যা মনে হয়েছিল জটলা তার চেয়েও আরো অনেক বড়ো। দূরে কাছে দু'দিকের রাস্তায় সে আরো কয়েকটা জমায়েত দেখতে পেল। আজ হয়তো বড়ো কিছু হবে।

তাড়াতাড়ি পা চালাল বুলা। পাঁচটা নাগাদ মেট্রোর নিচে নিখিলের অপেক্ষা করার কথা। এইভাবে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেও সে ঠিক পৌঁছে যাবে। নাকি ট্রামে যাবে ? কোনো রকম ব্যস্ততা না থাকা সত্ত্বেও চৌরঙ্গিগামী একটা ট্রামের ভিড়ে শরীরটা সেঁধিয়ে দিল সে। একা, বড়ো একা লাগছে। ট্রামের গতি এবং মিছিলের চিৎকারে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল নিজেকে।

খুব হতাশ হলো না বুলা। গোড়ার চেয়ে এখন সে অনেক বেশি শক্ত। দুঃখটা সয়ে

আসবার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল কেমন একটা নির্ভরতা পায় মনে। কিংবা, দুঃখের মধ্যেই থাকতে ভালো লাগে! নিজেকে কেমন বয়স্ক মনে হয়। শোক, সুখ, এসবের বাইরে জীবনযাপনের একটা আলাদা ছক আছে, অদৃশ্য নিয়ামকের হাত মাঝে মাঝে গুটিগুলো ওলট-পালট করে দিচ্ছে—এই ছকের মধ্যে সে কোথায় ঠিক বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না কার শোক বেশি, কার দুঃখ, কে কতোটা অসহায়! সকলে কি সমান অসহায়! মনে তো হয় না। কিংবা, এমনও হতে পারে, সে ঠিক বুঝতে পারে না। দাশরথি কি বসুধা কি ঝুমি কি অলোকের মুখের দিকে আলাদা আলাদাভাবে তাকালে মনে হয় না প্রত্যেকের সমস্যা এক, প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঘিরে বাঁচতে চাইছে। সবাই আলাদা, ভীষণরকম আলাদা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, অবিন্যস্ত। চুপচাপ থাকার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। এর মধ্যে সে কোন ভূমিকা নেবে!

নিখিল বলে, ভেবো না। একটা কিছু হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কীভাবে, কোন দিকে, কিসের ওপর অবলম্বন করে, এসব কিছুই ওর মাথায় নেই। শুধু শূন্যতাকে নির্ভর করে এগিয়ে চলা—কেউ পারে নাকি! নিখিলদা সবই বোঝে। বোঝে না সময় বড়ো অল্প, সময় থেমে থাকছে না। যা পাবার তার জন্যে অপেক্ষায় থাকলে তাদের চলবে না।

ট্রামটা কি থেমে গেছে! যাত্রীদের অনেককেই নেমে পড়তে দেখে বুলার খেয়াল হলো জ্যামের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রাম। হাতে ফেস্টুন নিয়ে চারিদিক থেকে মিছিলকারীরা এগিয়ে আসছে। আর এগুনো যাবে না।

বুলা নেমে পড়ল। মিছিলের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডের ট্রামগুমটিতে পৌঁছে গেল। দূরে বড়ো বাড়ির ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে। ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে সারি সারি। মিছিলের নানা রকম ধ্বনি একটা ভোঁতা শব্দের সৃষ্টি করছে মাথার মধ্যে। বড়ো রাস্তায় এসে ও কিছুক্ষণ মিছিলটা পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল। না, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। সাত-পাঁচ ভেবে বুলা মিছিলের মধ্যে দিয়েই রাস্তা পেরুনো ঠিক করল।

দাঁড়িয়ে-পড়া গাড়ির ফাঁক দিয়ে প্রথমবার পা পা করে এগিয়েও ফিরে এলো। এগিয়ে যাবার ব্যস্ততায় লোকগুলো ছুটছে, মনে হলো তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। আর একটু অপেক্ষা করে ও দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল। বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করে চোখে অনুনয় এনে ও দু'জনকে পেরিয়ে দেখল দু'পাশ দিয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেছে মিছিলটা। ওদিকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাততালি দিল নিখিল। বুলার অস্বস্তি লাগল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চলমান লোকগুলির গায়ের ওপর দিয়েই ও রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠে এলো।

সহাস্য মুখে নিখিল বলল, 'বাঃ! তুমি তো বেশ স্মার্ট হয়ে উঠেছ দেখছি!'

আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বুলা বলল, 'চিরকাল কি এক রকম থাকব নিখিলদা?'

'তা বটে।' নিখিল বলল, 'খবর কী? হলো কিছু?'

'না—'

নিখিলের পাশে দাঁড়িয়ে বুলা খানিক মিছিলটা লক্ষ করল। পিছন দিকের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, রাস্তা জুড়ে জ্যাম।

বুলা বলল, 'শুধু ঘোরাঘুরিই সার!'

আস্তে ওর পিঠে হাত রেখে নিখিল এগিয়ে গেল। বুলা কাছে আসতে বলল, 'মুষড়ে

পড়ছ কেন ! আজ আমি ফোনে কথা বলেছি নৃসিংহ, সুদেবদের সঙ্গে। ওরা চেষ্টা করছে।'

বুলা চুপ করে থাকল। সেই পুরনো কথা—চেষ্টা চলছে, হচ্ছে, হয়ে যাবে। এসব শুনতে আর ভালো লাগে না, প্রতিটি আশ্বাসকেই কেমন সন্দেহ হয় আজকাল। নিখিলকে কি বলা যাবে, এই কথাগুলোও আমার কাছে নতুন ভার ! আমি আর পারছি না !

বুলা চুপ করে থাকল।

সম্ভবত দূরে কোনো নতুন মিছিল আসছে, স্লোগানের শব্দ কানের পর্দায় গমগম করে উঠল। জ্যাম নড়বে না জেনেও ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সি আর মোটরগুলো। বিপুল শব্দময়তার আঘাত সহ্য করতে করতে ক্লান্তিতে মূক হয়ে গেল বুলা। এমনকি, নিখিলের সঙ্গও এখন তার কাছে ক্লান্তিকর লাগছিল।

রেস্টুরেন্টের দোতলায় উঠে রাস্তামুখো হয়ে বসল ওরা। নিখিল খাবারের অর্ডার দিল। সেই একই নিয়মানুবর্তিতা—ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। নিখিলের সঙ্গে দেখা হওয়া—নিখিল চা-খাবারের অর্ডার দেবে, পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে গিলতে গিলতে আর একটি দিনের কথা ভাববে সে। নিখিল কি করুণা করে তাকে ? তাদের ? হয়তো। কী দরকার তাকে দিনের পর দিন নিজেদের সমস্যায় জড়ানোর !

বুলা ক্রমশ মুহ্যমান হয়ে পড়ছিল। যতো দিন যাচ্ছে, ভবিষ্যতের দিনগুলো যতোই সুদূর হয়ে উঠছে, ততোই বেশি করে মনে পড়ছে দাদাকে। রক্তমাংসের মানুষটিকে আজকাল আর তেমন করে মনে পড়ে না। দাদা এখন একটা ধারণা মাত্র—সকলের সব রকম স্বপ্ন আত্মসাৎ করে যে হঠাৎই চলে গেছে। সেই ধারণার গলায় প্রতি বুধ আর শনিবার মালা পরাতে পরাতে একটা আক্রোশ ফুঁসে ওঠে বুকের মধ্যে—আমরা কী করেছিলাম ! অসহায়তা ছাড়া তখন আর কিছু থাকে না।

নিজের ভাবনার মধ্যে ক্রমশ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল বুলা। সে কি খুব স্বার্থপর হয়ে পড়ছে ! না হলে আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে ক্রমশ এতো নিঃসঙ্গ, নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে কেন ! দাশরথি, বসুধা, ঝুমি—সকলকেই ক্রমশ অসহ্য মনে হচ্ছে কেন ! কেন ওদের শোক-সুখ-দুঃখ-সমস্যায় কাতর চাপা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কোনো জ্বালা, কোনো সহানুভূতি টের পায় না সে ! কাল রাতে, মনে পড়ে গেল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে ঝুমি কাঁদছে মনে হয়েছিল, হয়তো কাছে টেনে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তার। ঝুমু, ঠকে গেলি নাকি ! পরিবর্তে সে কেন চুপচাপ গুটিয়ে নিল নিজেকে !

নিজের মনে এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পেল না বুলা। শুধু ভাবল, যেন চতুর্দিকের ব্যস্ত সরব কোলাহলের ভিতর একাকী ভাবনাগুলো নিয়ে অন্ধকার গুহার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে।

চা, খাবার সমস্ত ঠাণ্ডা হচ্ছিল। নিখিলের ডাকে বর্তমানে ফিরে এলো বুলা।

'নিখিলদা, দাদাকে আজকাল মনে পড়ে আপনার ?'

আচমকা প্রশ্নে নিখিল একটু অপ্রস্তুত হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কেন বলো তো ?'

'না, হঠাৎ মনে হলো—'

প্লেট থেকে কাঁটাটা তুলে নিল বুলা। তারপর হঠাৎই বাষ্পাচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আজ কিছু খাব না। ভালো লাগছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না নিখিল। বুলার চোখ রাস্তার দিকে, একটু বা ভেজা,

অন্যমনস্ক। মিছিলের স্লোগানে কান পাতা যায় না। খানিক বুলার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ও বলল, 'একজনের অভাবে সব কিছুর শেষ হয়ে যায় না বুলা। নতুন করে শুরু করতে হয়। এতো ভেঙে পড়ার কী আছে! তুমি সমস্যা থেকে দূরে থাকতে চাও, সেটা সম্ভব নয়। ওর ভেতর দিয়েই এগোতে হবে—'

বুলা নিখিলের কথা শুনল কি শুনল না, হঠাৎ নিখিলের হাতে চাপ দিয়ে বলে উঠল, 'ওই দেখুন নিখিলদা, বাবা!'

বুলার পাশাপাশি রাস্তার দিকে ঝুঁকে নিখিল দেখল, মিছিলের মধ্যে মিশে অন্যদের সঙ্গে আকাশে মুঠি তুলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন দাশরথি। এতো দিনে আরো শীর্ণ হয়েছেন, আরো ন্যুব্জ। কিন্তু এই মুহূর্তে অদৃশ্য কোনো শক্তি ওঁর মুখে তীব্র প্রত্যয় এনে দিয়েছে!

ওরা অনেক দূর পর্যন্ত দাশরথির ওপর চোখ রাখল। অনেক দূর পর্যন্ত ওঁর উত্তোলিত হাতটা দেখা গেল। শেষে ধ্বনির রেশটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকল না।



সম্পর্ক

সম্পর্ক

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ (জুন ১৯৭২)
প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী
মূল্য : ৫·০০ । প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

উৎসর্গ :
রমাপদ চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ এক ॥

গাড়ি চালাতে চালাতে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে অনেক দিন পরে শরীরে আসুরিক শক্তি অনুভব করছিলেন রামতনু। যেন কোনো প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, শেষ না দেখা পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই। রাস্তা ফাঁকা, প্রতিদিনের মতো মোটরযাত্রীদের উপদ্রব নেই—স্পিডোমিটারে স্থির চোখ রেখে চমৎকার চলে আসা, এ-সবই তাঁর কাছে শুভ লক্ষণ বলে মনে হচ্ছিল। এইভাবে যেতে পারলে আর কিছুক্ষণ মাত্র। যথাসময়ে পৌঁছুনো যাবে, সকলের সামনে নিজেকে উপস্থিত করার কোনো অসুবিধে নেই।

তা হলো না। পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গি রোডে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই রক্তে হুইস্কির নেশা পাতলা হয়ে আসছিল। বড়ো রাস্তায় এসে এতোক্ষণের অসার কল্পনা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল।

বৃষ্টিটা হঠাৎ জোরে নামল। তীরের ফলার মতো তীব্র ধারা, ওয়াইপার সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও সামনের সব কিছু আবছা, অস্পষ্ট, ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছিল। তার ওপর পিছল রাস্তা। চেষ্টা করলেন, তবু গাড়ির স্পিড কিছুতেই দশের-ওপর তুলতে পারলেন না।

সামনে গাড়ির পর গাড়ি, ট্যাক্সি—জ্যামের মতন, একটা ডবল ডেকার ট্রাফিক সিগন্যাল এড়িয়ে চলে যাবার মুহূর্তে আটকে পড়ে বিশ্রী, বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করল। যা দাঁড়াল, তাতে দুই ট্রাফিকের মধ্যবর্তী পথ পেরোতে পেরোতে আবার লাল আলো জ্বলে উঠবে। তার মানেই আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা। অসহিষ্ণু হয়ে অকারণে দু'বার হর্ন দিলেন রামতনু। তাতে বিশৃঙ্খলার শব্দ হলো মাত্র। অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হলো না।

তখনই হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল। অসহায়তা দূর করবার জন্যে টিন খুলে সিগারেট বের করলেন রামতনু, দেশলাই জ্বাললেন। শার্সি বন্ধ ; তবু অলক্ষ্যের হাওয়া মুহূর্তের মধ্যেই আগুন নিবিয়ে দিল। ওরই মধ্যে সিগারেট ধরল ; স্বল্প আলোয় যেটুকু পারলেন ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিলেন রামতনু। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আর মাত্র পনেরো মিনিট। যা অবস্থা তাতে পনেরো মিনিটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছুতে পারবেন, শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হবে, এমন ভরসা হয় না।

ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন রামতনু। ঠোঁট কাঁপছে অল্প অল্প, স্নায়ু জুড়ে উত্তেজনা। জুনের প্রচণ্ড গরমের পর মরশুমী বৃষ্টিতে আজ আবহাওয়া বেশ শীতল ; বন্ধ গাড়ির ভিতর কোনো ভ্যাপসানো ভাব নেই। তবু, উত্তেজনার কারণেই হয়তো, কপালে, গলায়, চোখের নিচে ঘাম জমে উঠল।

ইতিমধ্যে লাল সবুজ হলো। গন্তব্যে পৌঁছুনোর তাগিদে অসাবধানীর মতো দুটো গাড়িকে ওভারটেক করে, একটা ট্যাক্সির ধাক্কা বাঁচাতে বাঁচাতে সুবিধে মতো খানিকটা ফাঁকায় ছুটে এলেন। সামনে স্ট্র্যাণ্ড রোড, আর মাত্র ক'মিনিটের পথ। যদি কপাল ভালো

থাকে, আর কোথাও বাধা না পান, তাহলে হয়তো এখনো পৌঁছুনো সম্ভব।

সময় যতো এগিয়ে আসছিল ততোই আশঙ্কা বাড়ছিল। গিয়ার বদল করে, স্পিড বাড়িয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে এলেন রামতনু। তারপরেই বাধা। সামনে ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়েছে। ব্যাক করে পাশ কাটিয়ে বেরোবেন যে তারও উপায় নেই। পিছনে ট্রাক ; পাশে যেটুকু জায়গা ছিল, পরপর গাড়ি এসে সবটুকু অধিকার করে নিল।

অগত্যা বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি থেকে নেমে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে বিরক্ত মনে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন রামতনু। বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটায় তাঁর চুল ভিজল, গায়ের দামী স্যুট ভিজল। চতুর্দিকে নানা রকম হর্নের শব্দ—হালকা, তীব্র, চিৎকারের মতো। সামনের ট্রামের ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বলল, 'যাওয়া যাবে না, সাহেব। ব্রিজের ওপর জ্যাম।'

রামতনু এই রকমই আশঙ্কা করছিলেন। বেরুবার সময়েই মনে হয়েছিল আজ কোনো-না-কোনো একটা অঘটন ঘটবে। মাঝে মাঝেই এমন হয়, যেটা ভাবা যায়, যা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মন—এমনকি অনুষঙ্গ প্রস্তুত থাকলেও শেষ মুহূর্তে অভাবিত কিছু ঘটে যায়।

যেমন আজ, এই মুহূর্তে। এই তীব্র বর্ষণের কথা বিকেল পর্যন্ত ভাবা যায়নি ; গেলে, হয়তো নীরার বাড়ির পথ না ধরে সোজাসুজি বাড়িই ফিরতেন। শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হতো। তার চেয়ে বড়ো কথা অংশুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজবে কাটানো যেত। ছুটিছাটা বড়ো একটা ও পায় না, সারাক্ষণ চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। ওদের বিয়ের পর দু' বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। এর মধ্যে শ্যামলী এসেছে বার চার-পাঁচ; কিন্তু অংশু সেই একবারই, পুজোর সময়। এবারও আসবে এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এলো হঠাৎ, টাটায় কী একটা কাজ পড়েছিল, সেই ফাঁকে একবার কলকাতায় ঘুরে আসা—শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে ফেরা। কাল সকালে দিল্লি থেকে ফিরে অংশুকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন রামতনু।

ঐ দেখা হওয়া পর্যন্তই। কাল সারা দিন কাটল ব্যস্ততায়। টানা এক হপ্তা অনুপস্থিত থাকার ফলে ডেস্ক-ওয়ার্ক জমেছিল প্রচুর, সেগুলির মোটামুটি ব্যবস্থা করতে হলো। ফিডার লিমিটেডের অ্যাকাউন্টটা পাওয়া গেছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ; কন্ট্রাক্ট সই হবার পর জিরোবার ফুরসত পাওয়া গেল না, দিন পনেরোর মধ্যে ক্যাম্পেন সাবমিট করতে হবে। অফিসে ব্রিফিংয়ের আগে মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করতে হলো নিজেকে। এই সবের পর দেরিতে বাড়ি ফিরে শুনলেন অংশু গেছে তার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সন্ধের অনেক পরে বেরিয়েছে, রামতনুর জন্যে অপেক্ষা করেছিল অনেকক্ষণ। তারপর, আজ, প্রতিদিনের মতোই একটি দিন, ঝামেলার মধ্যেই কেটে গেল।

রীতিমতো অবসন্ন বোধ করছিলেন রামতনু। অংশুর জন্যে যতোটা না, তার চেয়ে বেশি শ্যামলীর জন্যে। একটা দুঃখের বোধ কঠিন ভারের মতো চেপে বসছিল বুকে। তুমি ব্যস্ত হতে পার, একটা বড়ো ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অমানুষিক কাজের মানুষ ; কিন্তু শ্যামলীর সঙ্গে তোমার যা সম্পর্ক, তাতে ব্যস্ততা, দায়িত্ব, সমস্যা এগুলো নিতান্তই ফাঁকা বুলির মতো শোনাবে। শ্যামলীই বা তা শুনবে কেন! তাছাড়া, ক'দিনের জন্যেই বা এসেছিল মেয়েটা! কলকাতায় এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই তাঁকে দিল্লি ছুটতে হলো জরুরী কাজে, এক দিনের প্রয়োজন দাঁড়াল পাঁচ দিনে। শ্যামলী তাঁর আচরণে শৈথিল্য দেখতে পারে। অথচ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামতনুর, বাঙ্গালোর থেকে রওনা হবার আগে চিঠি

দিয়েছিল শ্যামলী ; বাবা, তুমি কিন্তু এবার এক সপ্তাহের ছুটি নিও, না হলে ভীষণ খারাপ লাগবে আমার।

শ্যামলীর চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন রামতনু। একটু বা বিমর্ষ। পিছনে ক্রমাগত হর্নের শব্দে খেয়াল হলো লাইন ক্লিয়ার হয়েছে, জ্যাম ভাঙছে। ঘণ্টি বাজিয়ে সামনের ট্রামটা প্রায় বাধাহীন অনেকটা পথ এগিয়ে গেল।

বৃষ্টি পড়ছিল তখনো। কিছুটা হাওয়ার আশায় গাড়ির শার্সি নামিয়ে দিলেন রামতনু। হাওয়া এলো অফুরন্ত, ঝড়ো হাওয়া, তীব্র বৃষ্টিতে তাঁর মুখ, গলা ভিজে গেল মুহূর্তের মধ্যেই। তবু ভালো লাগছিল ; উত্তেজনার ভাবটা কমে আসছিল আস্তে আস্তে। সামনে চোখ রেখে, সাবধানে, যতোটা সম্ভব দ্রুত যাবার চেষ্টা করলেন রামতনু। ঘড়ি দেখতে সাহস হলো না। বস্তুত, মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা তখনো উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। বলা যায় না, হয়তো এখনো সময় আছে। এখনো গিয়ে হয়তো ওদের সঙ্গে দেখা হবে।

বৃথা। স্টেশন-চত্বরে পৌঁছে ঘড়ি দেখে রামতনু বুঝলেন, জ্যাম তাঁর অনেকটা সময় নিয়েছে। বৃষ্টি-বাদলায় কখনো-সখনো ট্রেন ছাড়তে একটু দেরি হয়, কিন্তু, এখন সে-আশাও অসম্ভব চিন্তা মাত্র। টাইম-টেবল অনুযায়ী গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে প্রায় সাত মিনিট আগে। সাত মিনিট অনেকটা সময়, এতোক্ষণ দেরি করার কোনো কারণ নেই। অকারণেই তবু গাড়ি নিয়ে পার্কিং এরিয়ায় ঢুকে পড়লেন রামতনু।

প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা হয়ে আসছে। ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জনকয়েক, প্রায় মাঝ বরাবর বাক্স-প্যাঁটরার ওপর বসে সেনাবাহিনীর কিছু লোক নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে ব্যস্ত, চায়ের স্টলের ছোকরা কাপ প্লেট ধুয়ে গুছিয়ে রাখছিল। লাউড্স্পিকারে কোনো এক ট্রেনের লেট করে আসার সংবাদ ঘোষিত হলো ; হঠাৎ ব্যস্ততায় কুলিরা ছুটল পাশের প্ল্যাটফর্মের দিকে। দেখে মনে হয়, এইমাত্র নয়—শ্যামলীদের ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রামতনু হতাশ ও বিমূঢ় বোধ করলেন। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম ; প্রথম বলেই কেমন ব্যক্তিগত পরাজয়ের মতো লাগল। ব্যাপারটা নিশ্চিত ভালো হলো না। এই ঘটনায় শ্যামলী ক্ষুব্ধ হবে, অংশু ভাবতে পারে তাঁর মধ্যে আন্তরিকতার, সৌজন্যের অভাব আছে।

এখন আর দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন রামতনু, কী ভেবে শেডের নিচ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটলেন। যেন এইভাবেই শ্যামলীদের সান্নিধ্য লাভের শেষ চেষ্টা করছিলেন তিনি।

শুধু শ্যামলী বা অংশু নয়, এই মুহূর্তে রামতনুর মনে আরো একটা চিন্তা দেখা দিল। শ্যামলীদের সঙ্গে দেখা না হোক, ওদের সি-অফ করতে মৃদুলা, সুবীররা নিশ্চয় এসেছিল। ওদের সঙ্গে দেখা হলেও একটা জবাবদিহি করা যেত। তা হলে ব্যাপারটা এমন দৃষ্টিকটু বা অভব্য হতো না। শ্যামলীরা এখন দূরে, ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে ; বাঙ্গালোর পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওদের নিশ্চয় আজকের ঘটনার কথা মনে থাকবে না। কিন্তু, মৃদুলাদের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবেন তিনি ! ব্যস্ত ছিলাম ? শেষ মুহূর্তে জরুরী কাজ পড়েছিল ? জ্যাম ?

এর কোনোটাই যুক্তি হিসেবে সহনীয় মনে হলো না রামতনুর। তুমি কি জানতে না শ্যামলীরা আজ চলে যাচ্ছে ; তা ছাড়া, কাজের মধ্যে ভুলে যেতে পারো ভেবেই শ্যামলী তোমাকে বিকেলে ফোন করেছিল অফিসে, তুমি কথা দিয়েছিলে আসবে। বাড়িতে। বাড়িতে না হোক, স্টেশনে !

এই দ্বিতীয় সমস্যা রামতনুকে বিভ্রান্ত করল। নিজের ওপর এক ধরনের বিরক্তি দেখা দিল, আত্মধিক্কারে ক্ষুব্ধ বোধ করলেন তিনি। যা ঘটল, কোনো কৈফিয়ত দিয়েই তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অন্যের কথা বাদ দিলেও, নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবেন তিনি! অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো উদ্‌ভ্রান্তির ভিতর কিছু একটা সন্ধান করলেন রামতনু, হয়তো অবলম্বন, যে-কোনো অবলম্বন, এই মুহূর্তের গ্লানি থেকে নিজেকে উদ্ধারের জন্যে যা তাঁর প্রয়োজন ছিল।

অন্যমনস্ক হবার প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও সেই একই চিন্তা বারবার ফিরে আসছিল। শ্যামলী, অংশু, মৃদুলা, সুবীর, পরিচিত প্রত্যেকটি মুখেই অনুরূপ জিজ্ঞাসা লক্ষ করে অস্বস্তি বোধ করছিলেন রামতনু। আজ তাঁর হাতে প্রচুর সময় ছিল, বাড়ি ফিরে স্বচ্ছন্দে কিছুক্ষণ কাটানো যেত ওদের সঙ্গে, স্টেশনে আসা যেত। এই রকম ভেবেই যথাসময়ে অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। বিকেলের আকাশ পড়ন্ত রোদের ছায়ায় ঘন হয়ে উঠছিল ক্রমশ, চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া বইছিল চারিদিকে। পার্ক স্ট্রিটে এসে গাড়ি থামিয়ে শ্যামলীর জন্যে কেক্ কিনলেন। সচরাচর এতো তাড়াতাড়ি তাঁর ফেরা হয় না। আজ ফিরছেন, শ্যামলীর জন্যেই ফিরলেন। ফিরতে ফিরতে অনেক দিন পরে সাংসারিক টান অনুভব করছিলেন তিনি। নিজের সংসারের ভরন্ত ছবি বাইরের চাপে মন থেকে মুছেই যাচ্ছিল প্রায়, রঙ ও তুলি হাতে রামতনু সেই বিস্মৃতপ্রায় ছবিটা আবার সম্পূর্ণ করে আঁকবার চেষ্টা করছিলেন যেন।

তারপরেই হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। সুখের যে-ছবি তিনি আঁকতে চেষ্টা করছিলেন, তা সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিল। তার কোনোখানে মৃদুলা নেই, শ্যামলী নেই; যে আছে তার মুখ ভিন্ন। হারাতে হারাতে একসময় শূন্যের ছায়া নামল। সেই মুখে নীরার আদল। রামতনু তাঁর দায়িত্ব ভুলে গেলেন। ভুলে যাচ্ছেন, বিস্মৃত হচ্ছেন সব কিছু, আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছেন তীব্রতম আকর্ষণের মধ্যে—এই বোধও একসময় হারিয়ে গেল মন থেকে। অতর্কিতভাবে ড্রাইভার রামভরসকে গাড়ি থামাতে বললেন রামতনু। ওয়ালেট থেকে টাকা বের করে বললেন কেকের বাক্সগুলো সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে যেতে। তাঁর কাজ আছে।

শবদাহ সেরে শ্মশান থেকে ফেরার পথে যেমন হঠাৎই পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে, অতীত চিন্তা দেখা দেয় বড়ো হয়ে, সেইভাবে, স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিমর্ষ রামতনু আজ সন্ধ্যার ঘটনা মনে করছিলেন। নীরা, নীরার ফ্ল্যাট, সেই খর্বাকৃতি, পাতলা চুলের প্রৌঢ় ভদ্রলোক, অঙ্কুর তরফদার—নীরা যার পরিচয় দিল নিজের মামা বলে, আর রেকর্ড-প্লেয়ারে মন্থর, চটুল জ্যাজ, বোতলের হুইস্কি—ধারাবাহিক দৃশ্যের মতো একে একে সবই রামতনুর চোখের ওপর ভেসে উঠছিল। এখন ভাবলে অবাক লাগে, ঐ আবহাওয়া ও পরিবেশে অনায়াসে দু'ঘণ্টার ওপর সময় অতিবাহিত করেছেন তিনি; এতোটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি! সে কি শুধুই নীরার জন্যে! নীরার সান্নিধ্যের আকর্ষণে!

তা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে!

নিজেকে নিজের প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে রামতনু যেন কৃতকর্মের বিচার করছিলেন। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার কথা চিন্তা করে ঘৃণা বোধ করলেন তিনি। গ্লানিকর অনুভূতি মাথার ভিতর তীব্র ও অস্বস্তিকর জ্বালার মতো ঘুরতে থাকল। আর, অনেকক্ষণ পরে,

শোকের মধ্যে মানুষ যেমন আবার কর্মতৎপরতায় ফিরে আসে, তেমনি ক্লান্ত, ভারাতুর চিত্তে অভ্যস্ত গতানুগতিকতায় ফিরে এলেন তিনি।

॥ দুই ॥

বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে আকাশ দেখলেন রামতনু। বেশ কিছুক্ষণ, শান্তভাবে। নিরেট কালো আকাশ, কোথাও এতোটুকু আলোর চিহ্ন নেই, দক্ষিণ দিক থেকে একটা বড়ো মেঘ অনেক নিচু হয়ে ভাসতে ভাসতে চলল। বাতাস আর্দ্র, একটু বা ঠাণ্ডা মেশানো। আকস্মিক বিদ্যুৎ থেকে থেকে আকাশের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আজ হয়তো সারা রাত বৃষ্টি হবে।

বাড়ির বাইরে গেটের মাথায় অন্য দিন আলো জ্বলে। আজ অন্ধকার। অনতিদূরের লাইট পোস্টের আলোয় রেলিংয়ে সাজানো পাতাবাহারের গাছটা মসৃণ ছায়া ছড়িয়েছে; বৃষ্টির জলে ভেজা বাগান থেকে জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ভেসে আসছিল। এই পথে এমনিতেই লোকজনের যাতায়াত কম, সন্ধ্যার পর আরো কমে আসে। তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ দু' একজন চোখে পড়ে, নতুন দম্পতি কিংবা বিলম্বিত সান্ধ্য-ভ্রমণ-ফেরত কোনো প্রৌঢ়; মোটর বা ট্যাক্সির শব্দ মাঝে মাঝে সচকিত করে যায়। আলো বা শব্দ বা মানুষজনের চলাফেরা, আজ সবই অগোচর।

রামতনু গেট খুললেন নিঃশব্দে, সুরকি-ছড়ানো টেরাসের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় নিজের জুতোর শব্দ কেমন অদ্ভুত লাগল। অদ্ভুত এবং অস্বস্তিকর। এই অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্য পরিষ্কার তাঁর মনে বিরক্তির সঞ্চার করল। যেন এ-সবের একটা অর্থ আছে, যতোই সূক্ষ্ম ও সামান্য হোক, আজকের সন্ধ্যার ঘটনার সঙ্গে এর কোনো-না-কোনো সম্পর্ক আছে। বিষয়টা চিন্তা করে দুঃখিত হলেন রামতনু।

পরে ভাবলেন, হয়তো ঠিক নয়, এ-সবই তাঁর মনের ভুল। বিক্ষিপ্ত মনে তিনি অসার চিন্তা করছেন মাত্র। এ ক'দিন শ্যামলীরা ছিল, লোকজনের যাতায়াত ছিল, বাড়িতে সারাক্ষণ উৎসবের হাওয়া লেগে থাকত। তার ওপর বৃষ্টি। এমনও হতে পারে স্টেশন থেকে ফিরে ওরা সকলেই ক্লান্ত, বিষণ্ণ, বাইরের আলোটা জ্বালবার কথা কারও মনে পড়েনি।

যেভাবেই ভাবুন, সূক্ষ্ম অপরাধবোধ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলেন না রামতনু। হয়তো অপরাধবোধও নয়, এক ধরনের দুঃখ তাঁকে অবসন্ন করে ফেলছিল।

ওইভাবে ক'মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে কলিং বেল টিপলেন তিনি।

দরজা খুলল চাকর মহাবীর। ওপাশ থেকে রামভরসকেও বেরিয়ে আসতে দেখলেন। যেন এতোক্ষণ ওরা অন্ধকারে তাঁর অপেক্ষায় ছিল, শব্দ পেয়ে তৎপর হয়ে উঠল।

কার্পেটের ওপর দিয়ে ঘরের মাঝ বারবর হেঁটে গিয়ে কী ভেবে আবার ফিরে দাঁড়ালেন রামতনু।

'মা কোথায়?'

মহাবীর দরজা বন্ধ করছিল। বলল, 'ওপরে। শুয়েছেন বোধ হয়।'

'শরীর খারাপ ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না মহাবীর। আড়ষ্ট, একটু বা বিব্রত, যেন এখন এই প্রশ্ন সে আশা করেনি। সময় নিয়ে বলল, 'স্টেশন থেকে ফিরে ওপরে গেছেন। আর নামেননি।'

'ও।'

রামতনু কিছু ভাবলেন। প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কথার খেই হারিয়ে ফেললে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম, চোখে মুখে অসহায়, বিরক্ত ভাব ফুটল। তারপর, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এইভাবে বললেন, 'কোথায় থাকিস সব ! এই সন্ধেবেলায় বাড়িঘর অন্ধকার করে রেখেছিস কেন !'

নিজের গলার স্বর নিজের কানেই নতুন শোনাল। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—যেন তিনি প্রকৃতিস্থ নেই, স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। রামতনু আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে প্যাসেজে পা দিলেন, তারপর দোতলার সিঁড়িতে।

রাত যতো গভীর হয় প্রতিটি শব্দই যেন ধ্বনি বদলায়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে রামতনু নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ শুনলেন। মন্থর পা ফেলার শব্দ শুনলেন। প্রতিটি শব্দই অন্য রকম। এ ছাড়াও আরো কিছু শব্দ ছিল। দ্রুত ধাবমান মোটরের শব্দ, অসুখী বিড়ালের কান্নার শব্দ, দূরাগত রেডিওর শব্দ, রামভরস গ্যারাজে গাড়ি তুলছে, গ্যারাজ বন্ধ করল, সেই শব্দ। এই মুহূর্তে প্রতিটি শব্দই তাঁর অসহায়তা ঘন করে তোলে। ওপরের শেষ সিঁড়িতে পৌঁছে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলেন রামতনু। এক সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা যেন তাঁকে শূন্য করে গেছে।

ঘরে আলো জ্বলছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলেন রামতনু। আলতো পর্দা সরিয়ে দেখলেন মৃদুলা বিছানায়, আধশোয়া অবস্থায় বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। পায়ের শব্দে এদিকে তাকাল, তারপর উঠে বসল।

'ভিজে গেছ ?'

'না, তেমন আর কী !' কোটটা গা থেকে খুলে ফেললেন রামতনু, কাঁধের কাছটা স্যাঁতসেঁতে লাগল।

'যা বৃষ্টি, গাড়ি চালানো যায় না।'

মৃদুলা হ্যাঙ্গার নিয়ে এলো, রামতনুর হাত থেকে কোটটা নিল, তারপর দরজার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পর্দাটা পুরো টেনে দিল।

রামতনু অনুমান করলেন মৃদুলা হয়তো কিছু বলবে, এ তারই প্রস্তুতি। কিছু না বলে খাটের ওপর বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন। কোটটা যথাস্থানে রেখে মৃদুলা সামনে এসে দাঁড়াল।

'কফি দিতে বলব ?'

মৃদুলার ব্যবহারে চাপা অস্বস্তি লক্ষ করলেন রামতনু। যেন ও খুব সতর্কভাবে প্রয়োজনীয় কথাটা এড়িয়ে গেল। না হলে এতোক্ষণে সে দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করত বা শ্যামলীদের প্রসঙ্গ তুলত। মৃদুলা তার দায়িত্ব পালন করছে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কফি খাওয়া রামতনুর পুরনো অভ্যাস। রামতনুকে নয়, মৃদুলা যেন তাঁর অভ্যাসকেই মর্যাদা দিল।

রামতনু ভেবে নিলেন মৃদুলা যদি নিজে উত্থাপন না করে তিনি কোনো কৈফিয়ত দেবেন না। বরং রাত হলে কোনো সময় শ্যামলীদের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। ততোক্ষণে কিছুটা

সময় যাবে। বলা যায় না, মৃদুলা ততোক্ষণে শান্ত হতে পারে।

ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন রামতনু। হঠাৎ খেয়াল হলো মৃদুলা তাঁর উত্তরের অপেক্ষা করছে। শান্ত মুখ দেখে বোঝা যাবে না মৃদুলা অখুশি, অসন্তুষ্ট হয়েছে, রামতনুর উপস্থিতিতে বিরক্ত বোধ করছে। সোজাসুজি তাকিয়ে ছিল, চোখে চোখ পড়তে মুখ নামিয়ে নিল মৃদুলা।

আলগাভাবে হাসলেন রামতনু।

'দুপুর থেকে অনেক কাপ চা, কফি হয়েছে। যদি পারো ঠাণ্ডা কিছু দাও।'

মৃদুলা জবাব দিল না। চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল, পরিষ্কার চোখে তাকাল রামতনুর দিকে। তারপর বলল, 'খানিক আগে তোমার একটা ফোন এসেছিল।'

'কার ?'

'জানি না। খোকা ধরেছিল।' মৃদুলার গলার স্বর রুক্ষ ও দ্রুত। 'ঠিকমতো বাড়ি পৌঁছেছো কি না জিজ্ঞেস করছিল।'

'নাম বলেনি ?'

'না। মেয়ের গলা।'

মৃদুলা আর দাঁড়াল না। মাথার ওপর কাপড় টেনে, পর্দা সরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলো ঘর থেকে।

এমনই আকস্মিকভাবে সমস্ত ঘটনাটা ঘটল যে রামতনু বিমূঢ় না হয়ে পারলেন না। হাত-পা কাঁপতে শুরু করল, নিঃশ্বাস দ্রুত হলো। সন্ধ্যার অস্বস্তিকর ঘটনার ছাপ আস্তে আস্তে মুছে যাবার মুখে মৃদুলার আকস্মিক আক্রমণে যেন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন রামতনু। এই ঘর, এই পরিবেশ, এখানের সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে তাঁকে এক অপরিচিত গন্ডীর মধ্যে এনে ফেলে দিল। রামতনুর মনে হলো, অসহ্য, এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হবে।

সত্যি সত্যি তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। দুর্বোধ্য,অস্বাভাবিকএকটা যন্ত্রণা মাথা ঘুরে বুকের কাছে নেমে এলো।

খানিক স্থাণুর মতো বসে থেকে বুকের ভারটা হালকা হতে দিলেন তিনি। তারপর উঠলেন। রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে বাথরুমে গেলেন। ব্যস্ত হাতে শাওয়ার খুলে ঠাণ্ডা জলধারার নিচে সমর্পণ করলেন নিজেকে।

কতোক্ষণ খেয়াল ছিল না। যেন শরীরে অনেক ধুলো-ময়লা জমেছে, আজ রাতে সমস্ত ক্লেদ মুছে ফেলতে হবে। জল পড়ার অবিরাম শব্দ অনেকক্ষণ নেশার মতো আচ্ছন্ন করে রাখল তাঁকে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে এসে কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু কেউ যে এসেছিল, খাটের ওপর পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা রাতের পোশাক দেখেই তা অনুমান করা যায়। রামতনুর সন্দেহ হলো, মৃদুলাই এসেছিল, তাঁকে বাথরুমে দেখে ফিরে গেছে।

স্নান করার পর অপেক্ষাকৃত সুস্থ লাগছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের প্রতফলিত ছায়ার দিকে তাকিয়ে চাপা ঠোঁটে হাসলেন রামতনু। মেয়ের গলা ! মৃদুলা, এ-বাড়িতে মেয়ের গলা তুমি কি কম শুনেছ ! আমি, রামতনু সোম, পঞ্চান্ন বছর বয়স হলো আমার। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতো দিনের ! তিরিশ বছর ? এই তিরিশ বছরের দাম্পত্য-জীবনেও আমি কি তোমার বিশ্বাসভাজন হতে পারিনি ! যদি হয়ে

থাকি, তাহলে ফোনে-পাওয়া একটি মেয়ের গলায় তুমি এতো বিচলিত হয়ে পড়ছ কেন ? অবিশ্বাস ? সন্দেহ ? কিন্তু, তা করে তোমার কী লাভ ? আমি জানি, খুব ভালো করেই জানি, ঐ গলা কার। নীরার। তোমার আপত্তি কোথায় ? মেয়ের গলায় ? আমার কুশল প্রশ্নে ?

একের পর এক প্রশ্ন রামতনুকে ক্রমশ কুক্ষিগত করে ফেলছিল। মৃদুলাকে নয়, এসব প্রশ্ন তাঁর নিজের কাছে, নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্যে। যেভাবেই বিচার করুন, কোথায় একটা খুঁত থেকে যাচ্ছে। খুঁতটা কোথায় ধরা যাচ্ছে না !

অস্বস্তি গেল না। আয়নার সামনে থেকে সরে এসে সোফায় গা এলিয়ে বসলেন রামতনু। টেবিলের ওপর কিছু চিঠিপত্র পড়েছিল : কিছু ব্যক্তিগত, কিছু অফিস সংক্রান্ত কাজকর্মের খবর। একটা টেলিগ্রামের খসড়া চোখে পড়ল, অংশুর হাতে লেখা, বাঙ্গালোরে খবর পাঠিয়েছে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকার জন্যে। ওরা এখন অনেক দূরে, ট্রেনের কামরায়, দূর থেকে চলে যাচ্ছে দূরান্তে। রামতনু শ্যামলীর জন্যে মমতা অনুভব করলেন। দুঃখের ভার এখন তাঁর শরীরে জ্বরের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। অবসন্ন চিন্তার ভিতর শিথিলভাবে রামতনু সেই সব দিনের কথা ভাবলেন যখন শ্যামলী, সুবীর, শান্তনুরা ছিল ছোট, মৃদুলা বা তিনি ছিলেন অন্য রকম। তোমাদের প্রতি কর্তব্যে আমি কোনো ত্রুটি রাখিনি, স্বগতোক্তির গলায় নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন রামতনু, শ্যামু, মা আমার, আজকের একটি সামান্য ঘটনা দিয়ে তোমরা আমার বিচার করো না।

প্রিয়জন প্রসঙ্গে দুঃখের চিন্তায়ও এক ধরনের সুখ আছে—ভাবতে ভাবতে মন ভরে ওঠে, আর-সব চিন্তাই মনে হয় অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। সেই সুখের স্বাদ এখন পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করছিলেন রামতনু। হৃদবৃত্তির ব্যাপারে কোনো আবেগকে সাধারণত তিনি প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু, এই মুহূর্তের আবেগ তাঁকে আপ্লুত, ভারাক্রান্ত করে রাখল।

এই সময় নিভা ঘরে এলো। রেকাবের ওপর গ্লাসে ঠাণ্ডা লেবুর সরবত। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলে নিতে নিতে রামতনু ভাবলেন, মৃদুলা হয়তো তাঁর সম্মুখীন হতে চাইছে না, আপাতত নিভাকে পাঠিয়ে দূরে থাকল।

'এতো রাতে চান করে ঠিক করেননি, বাবা।' নিভা বলল, 'অসুখ-বিসুখ হতে পারে।'

'শরীরটা খারাপ লাগছিল—'

রামতনু কথা শেষ করলেন না। চোখ তুলে দেখলেন নিভাকে। ক' মুহূর্ত। মৃদুলার অনুপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করছিল। মানসিক অস্থিরতা গোপন করার জন্যে নিভার প্রতি মনোযোগ দিলেন তিনি।

'সুবীর কোথায় ?'

'ঘরে আছে।' হঠাৎ প্রশ্নে নিভা যেন অপ্রস্তুত হলো। ওকে চঞ্চল দেখাল।

'কিছু বলবেন ?'

'না—'

গ্লাসটা নিভার হাতে ফিরিয়ে দিলেন রামতনু। তারপর হঠাৎ বললেন, 'ফোন-টোন এলে কে ফোন করছে সব সময় জেনে নিও, মা। কতো জরুরী 'কল' আসে। জানতে না পারলে আমার অসুবিধা হয়।'

'কে ফোন করেছিল, বাবা ! আমি তো কিছু জানি না !'

নিভা স্পষ্টই অবাক হলো। রামতনু ওর মুখের রঙ বদলাতে দেখলেন।

আমি কি আর একটা ভুল করলাম ! রামতনু অস্বস্তি বোধ করলেন । নিভা হয়তো কিছুই জানে না ; সুবীর বা মৃদুলা ক্ষুব্ধ হলেও নিভার কাছে তা প্রকাশ করবে না এটাই স্বাভাবিক । অবিবেচকের মতো এই কথাগুলি বলে নিভাকে অকারণ বিব্রত করা ছাড়া আর কিছু হলো না । নিভা ভাববে, এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে সুবীরকে, যে-ঘটনা হয়তো সুবীর ও মৃদুলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা ছড়িয়ে পড়বে ক্রমশ—সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন রামতনু ।

আশ্চর্য ! কোন অভিপ্রায় থেকে নিভাকে এই সব কথা বলেছিলেন তিনি ! কেন বলেছিলেন ! ফোনের ঘটনাটা কিছুই নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক, কে ফোন করছে তা না জেনে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছ তোমরা—এইটুকু বোঝানোর জন্যেই কি ! আর-সব প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, নিভা তাঁর পুত্রবধূ, এ-বাড়িতে আসার পর গত দু' বছরে কখনো ওর সঙ্গে এমন রূঢ় ভাষায় কথা বলেছেন বলেও মনে পড়ে না । নিজের হঠকারিতা রামতনুকে হতবুদ্ধি করে ফেলল ।

নিভা তখনো দাঁড়িয়ে । ওর সরল মুখে দুঃখের ছায়া লক্ষ করে চিন্তিত হলেন রামতনু । আশ্বস্ত করার গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে কিছু বলিনি, মা । তুমি কিছু মনে করো না ।'

নিভা জবাব দিল না । একইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, 'আপনি বিশ্রাম করুন । খাবার তৈরি হচ্ছে, আমি ডেকে নিয়ে যাব ।'

'ঠিক আছে ।' কষ্টে হাসলেন রামতনু, 'ও-জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না ।'

নিভা চলে গেল ।

হাতে এখন প্রচুর সময় । অফিস থেকে ফেরার পর সামাজিক প্রয়োজনে বেরুতে না হলে এই সময়টা সাধারণত বই-টই পড়ে, ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে কেটে যায় ; বা কাগজ ঘেঁটে, বিজ্ঞাপনের খুঁটিনাটি দেখে । বোম্বাইয়ের একটি ইংরিজি দৈনিক বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ ব্যবসায়ের ওপর সাপ্লিমেণ্ট বের করছে, লেখা চেয়ে অনুরোধপত্র এসেছে প্রায় মাসখানেক আগে, তারপরেও দুটো রিমাইণ্ডার । বিষয় ভাবা আছে ; কিন্তু ইচ্ছে সত্ত্বেও কাজটায় হাত দেওয়া হয়ে উঠছে না । আজ দুপুরে অফিসে বসে ভেবেছিলেন রাত্রে বসবেন লিখতে । এখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ।

রামতনু উঠলেন । বড়ো আলো নিবিয়ে টেবিলে বসে ল্যাম্প জ্বাললেন । মনোরম মৃদু আলোয় প্যাডের সাদা কাগজ চোখে পরিচ্ছন্ন তৃপ্তি এনে দেয়, বিষয় ও ভাবনা শিথিল সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিন্দুতে এসে মেশে ।

কলম ছোঁয়ানো মাত্র প্রথম লাইনটা চমৎকার চলে এলো । দেশ স্বাধীন হয়েছে বাইশ বছরেরও বেশি দিন, এই বিপুল সময়ের মধ্যে সর্ব বিষয়ে আমরা স্বনির্ভর হব, পথও যতো খুঁজে নেব নিজেদের মতো করে, এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু কার্যত তা হয়নি । অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই বিজ্ঞাপন-চিন্তায় আমরা এখনো মাত্রাতিরিক্ত পরাশ্রয়ী, বিদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত । যে যাই বলুক, এখনো এ-দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞাপন পরিকল্পিত হয় মুষ্টিমেয় ইংরিজি-শিক্ষিত কেতাবি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে, যাঁরা সাহেবদের অনুকরণে ওঠেন, বসেন এবং নিদ্রা যান । সেই কোটি কোটি বিভিন্ন জনসাধারণের কথা ভুলে থাকি আমরা, চলায় বলায় মানসিক গঠনে যাঁরা পুরোদস্তুর ভারতীয় । আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই একটি স্বাধীন, অনুন্নত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারা কী রকম হতে পারে সে-সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নন ।

তথাকথিত কেতাদুরস্ত সমাজের এক অস্পষ্ট রূপ এখনো তাঁদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁদের অধিকাংশেরই দেশের সামাজিক ইতিহাস ও বিবর্তন এবং জনসাধারণের রুচি, মানসিকতা, আয় ও ক্রয়-ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। যতো দিন যাবে ততোই স্পষ্ট হবে তাঁরা সম্পূর্ণ ভুল ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

প্রথম চিন্তায় প্রথম পঙক্তির শব্দগুলি এক পিতার সন্তানের মতো সুস্থির ভাবনায় ভেসে এলো, একটি শব্দও পরিবর্তন করতে হলো না। দ্বিতীয় পঙক্তিতেও তাই, অনায়াস ও অনন্য, টু-দি-পয়েন্ট। লেখার অভ্যাস আজকাল প্রায় নেই বললেই হয়। তবু এখন কোনো রকম অসুবিধা বোধ করলেন না রামতনু। বিজ্ঞাপনে তাঁর হাতেখড়ি কপিরাইটার হিসেবে। তখন থেকেই, গত পঁচিশ বছর ধরে, স্টাইল ও প্রিসিসান দুই পরিপূরকের চর্চা করেছেন তিনি। একদার চেষ্টা আজ সাবলীল অভ্যাসে পরিণত, অস্বাচ্ছন্দ্য থাকার কথা নয়। শব্দগুলি পোষা পাখির মতো চিন্তার ভিতর গুঞ্জন করছিল। লিখতে ভালো লাগছিল রামতনুর।

কিন্তু প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষে থামতে হলো। সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এখন তিঁনি সরাসরি বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করবেন। বাধা পেলেন। জুতসই একটা শব্দের অভাব হঠাৎ তাঁর ভাবনার মধ্যে ঢুকে ধাক্কা দিল, বিশৃঙ্খল করে তুলল, এক মুহূর্তে এতোক্ষণের একাগ্রতা শিথিল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

রামতনু একটা সিগারেট ধরালেন। দেশলাই খুঁজলেন, পেলেন না। টেবিলে নেই; দেরাজ খুলে দেখলেন, সেখানেও নেই। এই এক বিরক্তিকর ব্যাপার—সিগারেটের টিনটা ঠিকই আছে, অথচ ভোজবাজির মতো দেশলাইটা উধাও হয়ে গেল!

বিজ্ঞাপন-চিন্তার সূত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনলেন রামতনু। ঘরের মধ্যে সম্ভাব্য যে-ক'টি জায়গায় দেশলাই থাকতে পারে খুঁজলেন। নেই।

হয়তো কোটের পকেটে আছে, অন্যমনস্কতার কারণে মৃদুলা বের করে রাখতে ভুলে গেছে—ইত্যাদি ভেবে রামতনু ওয়াড্রোব খুলে হ্যাঙারসুদ্ধ কোটটা বের করে আনলেন। পকেট হাতড়ে দেশলাই পেলেন না। পরিবর্তে হাতের মুঠোয় শীতল, ধাতব কিছু ধরা দিল।

একটা লাইটার। এক পলক সেই আকাশী রঙের বস্তুটির দিকে তাকিয়ে আবার মুঠো বন্ধ করলেন রামতনু। অসাবধানে বিপজ্জনক কিছু স্পর্শ করলে শরীরে যেমন আকস্মিক শীত সঞ্চারিত হয়, তেমনি, রামতনুর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। তারপর লাইটারটা আবার কোটের পকেটে রেখে ওয়াড্রোব বন্ধ করলেন তিনি। আশ্চর্য, এটাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে!

তিনি ভুলতে চাইলেও রাতকানা মাছির মতো চিন্তাটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে যাচ্ছে। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা বের করে অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে রাখলেন রামতনু। আবার সেই ভারবোধ, মাথার ভিতর অস্পষ্ট জ্বালা, উত্তেজনায় কান দুটো গরম হয়ে উঠল। ঘরে পাখা চলছিল, তবু রামতনুর মনে হলো এই হাওয়া অকিঞ্চিৎকর। আরো কিছু হাওয়ার প্রয়োজনে বন্ধ দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন।

অলক্ষে কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল আবার। হয়তো একে বৃষ্টি বলা যায় না, নিতান্তই ঝুরিঝুরি জলের গুঁড়ো। হাওয়ায় জলীয় ভাব, অল্প শীতের মতন। ওপরে চোখ তুলে অনেকক্ষণ আকাশ দেখলেন রামতনু। মেঘ আছে কি নেই বোঝা যায় না, যেন মাথার ওপর কেউ একটা ফোটোগ্রাফারের কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে

শূন্যতার অনুভবে হঠাৎ নিজেকে ভয়ঙ্কর অসহায় লাগল তাঁর। যেন দাঁড়াবার মতো আর কোনো জায়গা নেই, ভরসা রাখার মতো কোনো অবলম্বন নেই। নিজের হাতে গড়ে তোলা এই সুখ-স্মৃতি-লাবণ্যময় সংসার থেকে আজ তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

॥ তিন ॥

রাতে ভালো ঘুম হলো না রামতনুর। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করলেন। একবার মনে হলো গরম লাগছে, উঠে পাখাটা জোর করে দিলেন। হাওয়ায় শরীর জুড়োল, তন্দ্রার মতো জড়তা নামল চোখে ; পরক্ষণেই আবার নির্ঘুম অস্বস্তি। চোখ বন্ধ করলেই বাড়ির থমথমে গম্ভীর পরিবেশটা সামনে এসে দাঁড়ায়, নিজেকে মনে হয় অপমানিত। আর কিছু নয়, যা ছিল সামান্য, ক্রমশ যেন তা নালি ঘা'র মতো ছড়িয়ে পড়ছে!

ওপাশে খাটে মৃদুলা। কখনো আস্তে, কখনো বা জোরে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল। মৃদুলা ঘুমিয়ে, না এখনো জেগে আছে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বোঝা যায় না।

অন্ধকারে মৃদুলার খাটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামতনু ওর সমগ্র শরীর ও ঘুমোনোর ভঙ্গি অনুমান করে নিলেন। ওর মুখের একটা আদল ধরা দিল, মুখের চেহারা স্পষ্ট হলো না। এই সংসারে তাঁর নিকটতম আত্মীয় মৃদুলা, দীর্ঘ তিরিশ বছরের অভিন্ন সম্পর্ক ; কিন্তু এখন মনে হয় দু'জনের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান বড়ো বেশি—কোথায় যেন একটা অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে উঠেছে, ইচ্ছে করলেও সেই ব্যবধান অতিক্রম করা যাবে না।

দোষ আমার নয়। দোষ তোমার মৃদুলা, দোষ তোমাদের। ভেবে দেখ, তোমরা অন্যায় করছ আমার প্রতি, অবিচার করছ। তোমরা ভুলে গেছ তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমাদের উচিত অনুচিতের বিধান। মানুষের বিচারের যোগ্য পটভূমি দরকার, দরকার নিশ্চিত উপলক্ষের। একটি সন্ধ্যার ঘটনাই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। আর, তা ছাড়া, শ্যামলী কি শুধু তোমাদেরই! আমার কেউ নয়!

বিছানায় শুয়ে যতো ভাবছিলেন ততোই আবেগে রামতনুর বুকের ভিতর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠছিল। ঠিক আবেগেও হয়তো নয়, এক ধরনের অভিমান ক্রমশ তাঁকে ক্ষুব্ধ, বিপর্যস্ত ও শূন্য করে ফেলছিল। প্রতিটি ঘটনাই যেন অভিজ্ঞতা, নতুন তাৎপর্য নিয়ে একে একে তাঁর চেতনায় ধরা দিল।

রাত্রে খাবার টেবিলে সুবীরকে অনুপস্থিত দেখেই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। নিভাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নিভা একটা উত্তর দিল—এড়িয়ে যাওয়ার মতো।

এই ধরনের উত্তর তিনি আশা করেননি। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন সাজানো ; রামতনু এর মধ্যে তাঁকে তাচ্ছিল্য করার আভাস পেলেন।

মৃদুলা চেয়ারে বসে। নিভা দাঁড়িয়ে। একপলক তাকিয়ে দু'জনকেই লক্ষ করলেন রামতনু। ওরা চুপচাপ।

'খোকার শরীর খারাপ! কই, তখন তো তুমি কিছু বললে না!'

নিভা সঙ্কুচিত হলো, বিবর্ণ, নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকল। জবাব দিল না।

রামতনুর মাথায় রাগ চাপল। আদেশের গলায় বললেন, 'ও কি জেগে আছে ? জেগে থাকলে ডাকো।'

মৃদুলা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। রামতনুর রোখ উপলব্ধি করে বলল, 'কী দরকার এতো রাতে ডাকাডাকি করার ! ও খেয়েছে, তুমি খেয়ে নাও। আমাদের কাজকর্ম সারতে হবে।'

'তা হলেও একটা নিয়ম আছে। আমার জন্যে সে দু' দণ্ড অপেক্ষা করতে পারত !'

নিভা বুদ্ধিমতী। হয়তো বুঝেছিল ওদের কথাবার্তার মধ্যে উপস্থিত থাকা সমীচীন হবে না। ব্যস্ততার ভান করে সরে গেল।

নিভাকে চলে যাবার সময় দিয়ে মৃদুলা বলল, 'অপেক্ষা অনেক করেছে। শ্যামু গেল, কারো মন ভালো নেই। তুমি আর এতো রাতে চেঁচামেচি করো না।'

বাড়িতে আসার পর এই প্রথম শ্যামলীর উল্লেখ শুনলেন রামতনু। এমন হঠাৎ শ্যামলীর প্রসঙ্গ এসে পড়বে ভাবতে পারেননি। যেন মৃদুলা জানত, ঐ কথায় চুপ করবেন রামতনু, জেনেশুনেই বলেছে।

রামতনু ওর কথার শ্লেষটুকু ধরতে পারলেন। রাগের মাথায় একটা জবাব এসে গিয়েছিল মুখে, হয়তো বলেও ফেলতেন, কোনো রকমে নিরস্ত করলেন নিজেকে। এ-বাড়ির সম্ভ্রম এখন তাঁর হাতে, ভাবলেন, কখনো যা ঘটেনি, ঘটবে ভাবা যায় না, কোনোভাবেই তা ঘটতে দেওয়া যায় না। রাগ ও ক্ষোভ হজম করে দায়সারাভাবে খাওয়া শেষ করলেন রামতনু।

রাত বাড়ছিল। ঘরে এসে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করলেন রামতনু ; আকস্মিক এই সমস্যার একটা সমাধানের উপায় চিন্তা করলেন। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, না হলে ব্যাপারটা এতো দূর গড়াবার কথা নয়। সম্ভাব্য কারণগুলি একে একে অনুসন্ধান করলেন রামতনু। কোনোটাই মনে হলো না যুক্তিসঙ্গত। তিনি কোথায় ছিলেন, কী কাজে, কেনই বা ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছুতে পারেননি, তা এদের জানার উপায় নেই। হয়তো কোনো অসুবিধের সৃষ্টি হতো না যদি নীরা ফোন না করত। নীরা তার নাম জানায়নি ; জানালেও, নীরা কে, রামতনুর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, মৃদুলা বা সুবীর বা নিভা কেউ তা জানে না। নিতান্তই অনুমানের ওপর নির্ভর করে তোমরা আমার বিচার করছ, বাড়ির আবহাওয়া বিষিয়ে তুলছ, এটা ঠিক নয়। এর একটা বিহিত দরকার।

যতো ভাবলেন ততোই অপমানটা গাঢ় হয়ে জমতে থাকল। রামতনু স্থির করলেন, মৃদুলা ঘরে আসুক, তখনই এ-বিষয়ে পরিষ্কার কথাবার্তা বলে নেবেন।

মৃদুলা এলো আরো পরে। টুকিটাকি কাজ এই সময়ে যা হাতে থাকে, সারল। কাপড় ছাড়ল, বিছানা গুছোল। সবই নিঃশব্দে। বসে বসে রামতনু মৃদুলার ব্যস্ততা ও অস্বস্তি লক্ষ করলেন। ওকে সময় দিলেন।

শোবার আগে মৃদুলাই সাধারণত আলো নিবিয়ে দেয়। আজ যেন ব্যাপারটাও ভুলে গেছে, আলো না নিবিয়েই বিছানায় গেল ; মুখের ওপর আঁচল চাপা দিয়ে শুলো।

রামতনু অনুমান করলেন মৃদুলা এখন ঘুমোবে না। আজকের ঘটনায় সুস্থির হয়ে ঘুমোনোর মতো মানসিক অবস্থা ওর নয়। ও এখন সময় নিচ্ছে, অপেক্ষা করছে।

মৃদুলার এই ভঙ্গি পুরনো। শুধু আজ বলে নয়, আগেও লক্ষ করেছেন, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই মুহূর্তে মৃদুলার মনোভাব আঁচ করে নিলেন রামতনু।

মৃদুলা উঠল কিছুক্ষণ পরেই। বিছানা থেকেই দেখল রামতনুকে।

'কী, তুমি ঘুমোবে না ?'

রামতনু মাথা নাড়লেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা ছিল।'

'কী. বলো ?'

মৃদুলাকে খুব ক্লান্ত লাগল। ওর গলার স্বর স্পষ্ট হলো না।

রামতনু একটু সময় নিলেন। যেন তিনি কী বলবেন মৃদুলাকে তা বুঝবার সময় দিলেন। সোজা হয়ে পা ঝুলিয়ে বসল মৃদুলা।

'আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম। রাস্তায় জ্যাম ছিল। গিয়ে দেখলাম ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, তোমরাও কেউ নেই—'

'আমি তো তোমায় কিছু বলিনি।'

'না, বলনি ঠিকই—', রামতনু থামলেন একটু, মনে মনে কী বলবেন গুছিয়ে নিলেন। 'মনে হচ্ছে, তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছ। আমি চাই না এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না মৃদুলা। ওর ভুরু উঠল, কপালে ভাঁজের মতন রেখা ফুটল। অশান্তির কথায় যেন ও খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

'অশান্তি কে চায় !' একটু বা উদাস, আচ্ছন্ন গলা মৃদুলার। বলল, 'আমি তো কোনো অভিযোগ করছি না ! কিন্তু ছেলেমেয়েরা যখন কিছু বলে, আমি ছোট হয়ে যাই।'

'কে কী বলেছে ? সুবীর !'

আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল মৃদুলা, 'বলার অপেক্ষা কেউ করে না। ছ'টায় যে-মানুষ অফিস থেকে বেরিয়েছে, তিন ঘণ্টায় মধ্যে সে আর পৌঁছতে পারল না, তুমি একে কী বলো !'

মৃদুলার দুঃখিত কণ্ঠস্বর রামতনুকে স্পর্শ করল। এরপর কী উত্তর দেবেন তিনি ! আমি লজ্জিত, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো ? না, তা বলা উচিত হবে না। মৃদুলা ধরে নিতে পারে রামতনু উদাসীন, সংসারের প্রতি প্রয়োজনীয় দায়িত্ব অনুভব করছেন না। সেটা ঠিক হবে না।

কথার অভাব রামতনুকে মূক করে রাখল। তাঁর মনে হচ্ছিল, মৃদুলার মনে যে-মর্যাদায় তিনি এতো দিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তার ভিত নড়ে উঠেছে। এই চিন্তা তাঁকে শঙ্কিত করে তুলল।

মৃদুলা যেন ধরেই নিল রামতনু আর কিছু বলবেন না ; তাঁর আর কিছুই বলার নেই। খানিক চুপ করে থেকে সোজাসুজি তাকাল স্বামীর মুখের দিকে ; সে-চোখে সন্দেহ ছিল, হয়তো বা ঘৃণাও। আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার বাইরের জগৎটাকে আমি মেনে নিয়েছি ; কোনো দিন কিছু বলিনি, কোনো কথা জিজ্ঞেস করিনি। এই বয়সে আমাকে আর জড়িও না !'

মৃদুলার কথার প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা হয়ে রামতনুর মাথায় ঘুরতে থাকল। এই মৃদুলা তাঁর অপরিচিত। তার গলার স্বর, চোখের দৃষ্টি সবই রামতনুর অচেনা ; যেন সব হার্দ্যিক যোগ ছিন্ন করে সম্পর্কের শেষে এসে দাঁড়িয়েছে মৃদুলা। রামতনুর মাথায় জ্বালা ধরে গেল ; কোনো কথার অর্থই তাঁর কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, মৃদুলা !' হতচকিত ভাব কাটিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বললেন রামতনু, 'কী বলছ এসব ! যা বলছ তার মানে জানো ?'

'জানতে চাই না।' আলোচনার শেষ করতে চাইল মৃদুলা, 'কে তোমায় ফোন করেছে জানি না! আজ খোকা জানল, কাল বৌমা জানবে, শান্তনু জানবে। তুমি আমায় কী করতে বলো?'

রামতনুর মুখে কথা জোগাল না। অপমান ও অবসাদের ভারে তাঁর মাথা নুয়ে পড়ল। নিজেকে হঠাৎ মনে হলো দুরূহ নাটকের অভিনেতার মতো—যার কাহিনীক্রম তাঁর জানা নেই, পাত্রপাত্রীরা অপরিচিত, যেন অগোচরে থেকে কেউ তাঁর ভবিতব্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

মৃদুলা শুয়ে পড়েছিল। অনন্যোপায় রামতনু আলো নিবিয়ে বিছানায় এসে শুলেন।

এই অন্ধকার তবু ভালো। মনে মনে প্রার্থনা করলেন রামতনু, এই অন্ধকার যেন চিরস্থায়ী হয়।

॥ চার ॥

সকালের চেহারা অন্য রকম। রাত জুড়ে অস্বস্তির পর ভোরের দিকে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন রামতনু। কষ্টের ঘুম। ঘুম ভাঙলেও আলস্য ও অস্বস্তি যায়নি। রাতের ঘটনার স্মৃতি তাঁকে বিব্রত করছিল।

গত কুড়ি বছর ধরে তাঁর জীবনযাপন নিয়মিত—রুটিন মাফিক। প্রত্যূষেই ঘুম ভাঙে, মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করেন। ভোরের টাটকা হাওয়ার স্পর্শ কাজকর্মে উদ্দীপনার সঞ্চার করে, শরীর ভালো থাকে—এই রকম একটা ধারণা আছে মনে। প্রকৃতপক্ষে, অবসর বা একক সুখ বলতে তাঁর এইটুকুই। তার পরে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি মিলিয়ে ছ'সাতটি খবরের কাগজ দেখতে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বিশেষত স্টারলেট হিউমের রিলিজগুলো। হাতে লাল পেনসিল, রিপ্রোডাকসানের কোনো গণ্ডগোল চোখে পড়লেই দাগিয়ে রাখেন। এটা তাঁর কাজ নয়। গত কুড়ি বছরের কোনো-না-কোনো সময়ে যেসব কাজের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়েছে নিজেকে, এখন তার প্রায় কিছুই করতে হয় না। তবু অভ্যাস যায়নি। এই সব কাজের মধ্যেই বেলা যায়। ন'টা বাজল কি বাজল না, তিনি পৌঁছে গেছেন অফিসে।

আজ ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকলেন রামতনু। শুয়ে শুয়েই ঘড়িতে ছ'টা বাজতে শুনলেন, তবু কোনো রকম উৎসাহ বোধ করলেন না। ইতিমধ্যেই সকালের আলো দেওয়াল ছুঁয়েছিল, ঘরের মেঝেও আলোকিত। মৃদুলা বোধ হয় যাবার আগে জানলাগুলো খুলে দিয়ে গেছে।

শুয়ে শুয়ে গতরাতের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করছিলেন রামতনু। এখন ভাবলে বিশ্বাস হয় না কালকের রাতটা ছিল সত্য, হয়তো তাঁর জীবনের দীর্ঘতম গ্লানিময় রাত। ঘুম আসছিল না, পরিচিত সর্বস্বের মধ্যে থেকেও নিজেকে মনে হচ্ছিল নির্বাসিত। নিজেকে কখনো এতো ক্ষুদ্র, এমন অপচয়িত ও ব্যর্থ মনে হয়নি। এ-সংসারের সব বিশ্বাসই মিথ্যা অহং দিয়ে গড়া; স্ত্রী, পুত্র, পরিবার—যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে কেটে যায় দিনের পর দিন, কতো সহজে, কেমন অনায়াসে অগোচরের একটি তুচ্ছ ঘটনা বদলে দিতে পারে তার

সমুদয় অর্থ ! যেন প্রিয়জন সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম ফাঁক ছিল, সামান্যতম আলোড়নই তা ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য ব্যবধান হয়ে দেখা দিল।

ক্ষত পুরনো হলে যেমন যন্ত্রণার অনুভূতি শিথিল হয়ে আসে, তেমনি ধীরে ধীরে রামতনুর মন থেকে যাবতীয় বেদনার অনুভূতি মুছে আসছিল। এতোক্ষণে তাঁর মনে হচ্ছিল, গতকাল বাড়িতে পৌঁছুবার পর থেকে আজ খানিক আগে পর্যন্ত মৃদুলা, সুবীর প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে বড়ো বেশি ভেবেছেন তিনি। অথচ, হয়তো যেটা সবচেয়ে আগে চিন্তা করা উচিত ছিল—নিজের আচরণের কথা, দায়িত্বের কথা, আশ্চর্য, যেন পরিকল্পিতভাবে তিনি তা এড়িয়ে গেছেন !

এই চিন্তা রামতনুকে নতুন করে আড়ষ্ট করে ফেলল। যেন তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ একটি জানলা খুলে গেছে—নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে তাকালেন রামতনু। মৃদুলার কী দোষ, বা সুবীরের ! এমনও তো হতে পারে, এ-সংসারের ভঙ্গুর ও লজ্জাকর চেহারা রামতনু কিছু অনুমান করার আগেই তারা লক্ষ করেছে ; লক্ষ করে শঙ্কিত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে !

হতে পারে। সবই সম্ভব। হতে পারে তারা তোমার চেয়ে বেশি দায়িত্বপ্রবণ, সংসারের ভালো-মন্দ, সুখ-অসুখ সম্পর্কে তোমার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তিত। এবং কালকের ঘটনায় তারা যদি রুষ্ট হয়, ক্ষুব্ধ হয়, অপমান বোধ করে, তাতে তাদের দোষ কতোটুকু !

শুভাশুভ নানা চিন্তায় রামতনু কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় মৃদুলা এলো।

'কী হলো তোমার ? এতো দেরি করছ !'

মৃদুলার গলা স্বাভাবিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ। ইতিমধ্যে স্নান সেরেছিল, চুল ভিজে। পরিচ্ছন্ন সিঁথির মাঝখানে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল সিঁদুররেখা। ক' পলক রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সরে গেল, রেগুলেটর ঘুরিয়ে পাখাটা জোর করে দিয়ে আবার ফিরে এলো।

'উঠবে না ! সাতটা তো বাজে—'

মৃদুলার আচরণে কোনো আড়ষ্টতা নেই। মুহূর্তে কালকের ঘটনা মিথ্যা বলে ভাবতে ভালো লাগে।

'কাগজগুলো কোথায় ?' প্রায় অভ্যাসে কথা বললেন রামতনু, 'ওঃ, সাতটা বেজে গেল !'

'শুয়ে আছ দেখে আর ওঠাইনি।' আলগাভাবে হাসল মৃদুলা। তারপর একটু বা চিন্তিত গলায় বলল, 'তোমার কি শরীর খারাপ ! ঘামছ বেশ !'

'ও কিছু না—', রামতনু উঠলেন, বাথরুমে যেতে যেতে বললেন, 'মহাবীরকে বলো কাগজগুলো দিয়ে যেতে।'

দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখলেন রামতনু। খুঁটিয়ে দেখলেন রাতের অস্বস্তির কোনো চিহ্ন আছে কি না। প্রশস্ত কপালে শুকিয়ে আসা ঘামের দাগ, ঠোঁটে বিন্দুর মতো সিগারেটের কাগজ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

তা হলে আমি ঠিকই আছি, এক ও অপরিবর্তিত !

রামতনুর ভালো লাগছিল। চোখে-মুখে জল দিয়ে ভালো লাগল, মুখ ধোবার পর পেস্টের সুগন্ধ বিশিষ্ট অনুভূতির মতো জড়িয়ে থাকল নাকে, তোয়ালের চাপ দিয়ে ঘাড় গলা কপাল ঘষতে ঘষতে যেন দীর্ঘক্ষণের যন্ত্রণা নিঃশেষে মুছে দিলেন তিনি।

বেরিয়ে দেখলেন মৃদুলা অপেক্ষা করছে। তাঁকে বেরুতে দেখে টিকোসি তুলে পট থেকে কাপে চা ঢালতে শুরু করল।

রামতনু বসলেন, মৃদুলার মুখোমুখি। টেবিলের ওপর সকালের কাগজগুলো ভাঁজ করে রাখা। স্টেট্‌স্‌ম্যানটা হাতে তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে মুখ আড়াল করলেন রামতনু। জেনেশুনেই। বস্তুত কোনো বিশেষ সংবাদের ওপর তাঁর চোখ ছিল না, অন্যমনস্কভাবে দু' একটা সংবাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন—সময় কাটানোর জন্যে মানুষ যে-রকম করে।

'তোমার চা—', মৃদুলা বলল। তারপর রামতনুর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই যেন, সময় নিয়ে বলল, 'কাল তোমায় বলতে ভুলে গেছি। শ্যামুর বাচ্চা হবে—'

'কাল' কথাটার ওপর মৃদুলা কি একটু জোর দিল ? অন্তত রামতনুর তাই মনে হলো। প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগল। পরে, সহাস্য ও স্বাভাবিক হয়ে বললেন, 'ভালোই তো। কবে ?'

'দেরি আছে—', মৃদুলা থামল, কথা খুঁজল।

ততোক্ষণে চা শেষ করেছেন রামতনু। টিনের ঢাকনা খুলে সিগারেট বের করলেন, দেশলাই জ্বালালেন। গলা দিয়ে ধোঁয়া নামবার সময় এক রকম সুখ অনুভব করলেন তিনি। ভালো লাগছিল, তবু হঠাৎ মনে হলো তাঁর উত্তর যথার্থ হয়নি। শ্যামলীর সন্তানসম্ভাবনার খবরে তাঁর হয়তো একটু উল্লসিত হওয়া উচিত ছিল।

ঘর খুঁজে অ্যাশট্রে নিয়ে এলো মৃদুলা। টিপয়ের ওপর রাখতে রাখতে বলল, 'অংশু কাল বলছিল কিছু দিন বাঙ্গালোরে গিয়ে থেকে আসতে। ধরো মাসখানেক। শ্যামু খুশি হতো। একা একাই থাকে প্রায়।'

'বেশ তো, যাও না।' পরিষ্কার চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন রামতনু, 'কিছু দিন ঘুরে এলে তোমারও ভালো লাগবে।'

মৃদুলা বোধ হয় খুশিই হলো। খুশি হলে বা কোনো আনন্দের ব্যাপার ঘটলে ওর ঠোঁট কাঁপে, চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে আসে। এখনো তাই হলো।

'ভাবছি যাব। অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয়নি—।' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে চকিতে মুখ তুলে রামতনুকে দেখল মৃদুলা। 'তুমিও চলো না ?'

'আমি ?'

'কেন ! অসুবিধে কী ! পাঁচ বছর ছুটি নাওনি। বয়স হচ্ছে, এখন একটু-আধটু বিশ্রামের দরকার।'

'আমার বিশ্রাম !' রামতনুর গলায় তাচ্ছিল্য ফুটল। ঠোঁটের হাসিটুকু বিস্তৃত করে বললেন, 'এখন ছুটি কোথায় ! আরো দু'তিন বছর অপেক্ষা করো, আমি বরাবরের মতো ছুটি নেবো !'

রামতনুর কথার অর্থ মৃদুলা ঠিক বুঝতে পারল না। ঈষৎ সন্দেহের চোখে তাকাল। রামতনুর চোখ কাগজের পাতায়, মৃদুলার দৃষ্টি লক্ষ করেছেন কি না বোঝা যায় না।

মৃদুলা বলল, 'জোর খাটিয়ে অনেক কাজই করা যায়, তুমিও তাই করছ।' ঠিক অভিমান নয়, আক্ষেপের মতো শোনায় মৃদুলার কথাগুলো। 'এখন আর কী দায়িত্ব তোমার ! ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে গেছে, আর বছর খানেকের মধ্যেই শান্তনু পাশ করে বেরুবে, চাকরিতে ঢুকবে। যতো দিন দরকার ছিল করেছ। আমার নিজেরই এখন ক্লান্ত লাগে।'

মৃদুলার আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ বোধগম্য হলো না রামতনুর। কেমন খট্‌কা

লাগছিল। এ যেন আর এক মৃদুলা—হতাশ, বিরক্ত, নিস্পৃহ। খানিক আগে দেখা তৃপ্ত মুখের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

খানিক চুপ করে থেকে রামতনু বললেন, 'পুরনো অভ্যাস ছাড়তে সময় লাগে, মৃদুলা। তুমি আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

মৃদুলা জবাব দিল না। একইভাবে বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর উঠল।

'তোমার অফিসের সময় হয়েছে।'

'হ্যাঁ—', ঈষৎ নড়ে বসলেন রামতনু, কাগজগুলো সরিয়ে রাখলেন। 'দুপুরে আমার একটা লাঞ্চ আছে। বাড়িতে আসব না।'

মৃদুলা কথাটা শুনল কি না বোঝা গেল না। একটু দাঁড়াল। তারপর কিছু না বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ পাঁচ ॥

পাশাপাশি দুই মুখ সমান ও সমান্তরালভাবে রামতনুর চিন্তায় সারাক্ষণ ছায়া ফেলতে লাগল। মৃদুলা এবং নীরা।

একজন, যে তাঁর দীর্ঘ তিরিশ বছরের সঙ্গী, স্ত্রী, তিরিশ বছরের পুরনো নিঃশ্বাসের বিভিন্ন উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পর্কিত—যৌবনকাল থেকে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হবার পথে যার সমগ্র শরীরের প্রতিটি রোমকূপের গন্ধ, চেতনার গন্ধ, হৃদয়ের গন্ধ, এমনকি রক্তের গন্ধও তাঁর চেনা হয়ে গেছে। এতো বেশি পরিচিত যে মাঝে মাঝে মনে হয় মৃদুলা তাঁর অংশোদ্ভূত। আর একজন, নীরা, পরিচয় অপরিচয়ের কোনো এক অনির্দিষ্ট স্তরে উপস্থিত থেকে প্রায় অকারণেই যে তাঁকে আকর্ষণ করছে চুম্বকের মতো।

দুর্বোধ্য এই আকর্ষণ। মেঘ-বৃষ্টির সম্পর্কের মতন, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেও অপ্রতিরোধ্য!

যুক্তি দিয়ে রামতনু এর কোনো কারণ খুঁজে পান না। যেন একটা নালি ঘা, ওপর ওপর কোনো রূপবৈষম্য নেই, অথচ অস্পষ্ট যন্ত্রণার মতো সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে। আবার স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করলে মনে হয়, এর শিকড় চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত।

এই বয়সে কোনো যুবতীর প্রতি আকর্ষণবোধ এবং সেই সূত্র ধরে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি, পরিজনদের বিরাগভাজন হওয়া—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন কলুষময়, অসুস্থ। নিজেকে নির্ভুলভাবে বিচার করে দেখলে মনে হয়, অসম্ভব। এমন হতে পারে না।

একই সময়ে রামতনু নিজেকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস করলেন। ভিতরের দ্বন্দ্ব তাঁকে অস্থির ও আচ্ছন্ন করে রাখল।

রোজই অফিসে যাবার সময় সেই দিনের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের ফিরিস্তি সংক্ষেপে টুকে নেন ডায়েরিতে। বয়স হলেও তাঁর স্মৃতি এখনো প্রখর ; তবু, ব্যস্ততার মধ্যে অত্যন্ত জরুরী কিছু ভুলে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি তুলে রাখেন সযত্নে। আজ ডায়েরি খুলে তাঁর কিছুই মনে পড়ল না। মাথার ভিতরটা অসম্ভব শূন্য লাগল, চেষ্টা সত্ত্বেও একাগ্র হতে পারলেন না। গতানুগতিক চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ফাঁক সৃষ্টি

হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। সেই শূন্যতা ক্রমশ হারিয়ে গেল। নীরা ফিরে এলো আবার।

এই আকর্ষণ কেন, কিসের জন্যে, রামতনু বুঝতে পারলেন না। নীরা সুন্দরী, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল ও বুদ্ধিমতী—কিন্তু, রামতনুকে আকর্ষণ করার পক্ষে এই সব গুণই যথেষ্ট নয়। আর-কিছুও নয়। তাঁর জীবনে কোনো ক্ষোভ নেই, এমন কোনো দুঃখও নেই যাতে নিজেকে মনে হতে পারে বঞ্চিত। অর্থ, সম্মান, সুখ—এক জীবনে সার্থক হবার প্রতিটি হেতুই ইতিমধ্যে তাঁর অধিকারে। তবু দুর্বোধ্য এক আকর্ষণ নীরার প্রতি সারাক্ষণ তাঁকে কাতর ও উন্মুখ করে রাখল, অন্যায় জেনেও রামতনু নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না।

অথচ, নীরার সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তেও এই ধরনের কোনো সম্ভাবনার কথা মনে হয়নি। সেই সাক্ষাতে চাতুরী ছিল, বৈশিষ্ট্য ছিল না। নিতান্তই স্বার্থের জন্যে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে রামতনুর হঠাৎ মনে হয়েছিল নীরাকে তাঁর দরকার।

ফিডারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহু কালের। কুড়ি বছর আগে ছোটখাট যে ক'টি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখাশুনার সূত্রে স্টারলেট অ্যাডভার্টাইজিংয়ের পত্তন হন, ফিডার লিমিটেড তাদের অন্যতম। পরবর্তী কয়েক বছরে ছোট থেকে তাঁদের প্রতিষ্ঠান যেমন ক্রমশ বড়ো হয়েছে, মক্কেলরাও কেউ পিছিয়ে থাকেনি। শুধু পুরনো সম্পর্কই নয়, এই সম্পর্ক পরস্পরনির্ভর, পারস্পরিক উত্থান-পতনের এক ব্যাপক ইতিহাস।

এই বছরের গোড়ার দিকে বেবি ফুড তৈরির এক বিলিতি ফর্মুলা আমদানি করে ফিডার লিমিটেড তাদের নতুন পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিল। রামতনু আগেই আঁচ করেছিলেন ফিডাররা বড়ো কিছু করতে যাচ্ছে, কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার। ভারতবর্ষের মতো দেশে ওদের তৈরি ফুড হৈচৈ তুলবে। আর এই দ্রব্যটির কার্যকারিতা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে দরকার হবে প্রচুর বিজ্ঞাপনের। ঐ বাবদ ওদের বরাদ্দের পরিমাণও যথাসময়ে কানে এলো। প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা।

দিনের পর দিন গেল। রামতনু কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন, ফিডারদের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক স্মরণ করেই মোটামুটি তাঁর ধারণা হয়েছিল, 'বনিবেব্'-এর অ্যাকাউন্টটা স্টারলেট হিউমেই আসবে। কিন্তু, কখনো যা হয় না, এইবার তাঁর অনুমানে ভুল হলো। আর ভুলটা যখন ধরা পড়ল, তখন দেরি হয়ে গেছে।

বনিবেব্-এর নতুন কর্তারা দিল্লিতে বসেন। স্টারলেট হিউমের দিল্লি ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বুধি নায়ার তুখোড় লোক, এতো দিন সে-ই যোগাযোগ রাখছিল ওদের সঙ্গে। হঠাৎ একদিন দুপুরে ট্রাঙ্ককল করে নায়ার সর্বনাশ জানাল, বনিবেব্-এর অ্যাকাউন্টটা হয়তো স্টারলেট পাবে না। কয়েকটি এজেন্সিই এতো দিন গোপনে চেষ্টা করে যাচ্ছিল, আপাতত ধরনধারণ দেখে মনে হচ্ছে ইউরেকা-র সঙ্গেই ওরা বন্দোবস্ত করে ফেলবে। কলকাতা থেকে ওদের লোকজন ইতিমধ্যেই দিল্লিতে এসে বসে আছে। সেই প্রথম নীরার নাম শুনলেন রামতনু। সমস্ত শুনে নায়ারকে জানালেন, তোমার কাজকর্ম যেমন চলছে চলুক, আমি আসছি।

অসাধারণ ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে বিজ্ঞাপনের জগতে রামতনু সোম সুপরিচিত। নিজের কর্মস্থলে তো বটেই, এমনকি প্রতিযোগী এজেন্সিগুলিও তাঁকে সম্মান করে, ভয় পায়। তাঁর নানা গুণের একটি অসামান্য আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসই তাঁর মূলধন ; সত্যি বলতে, স্টারলেট হিউমের গত কুড়ি বছরের ইতিহাস রামতনু সোমের সেই অমোঘ

আত্মবিশ্বাসের সাক্ষ্য। তবু, নায়ারের কথাবার্তা শুনে রামতনু বিমর্ষ বোধ করলেন। চিন্তিত হলেন।

চিন্তার আর একটি কারণ ইউরেকা। অল্প দিনের এজেন্সি হলেও চমৎকার কাজের গুণে ইউরেকার নাম হয়েছে, গত দু' বছরে অনেক বড়ো বড়ো ফার্ম পুরনো এজেন্সি থেকে কাজ তুলে ইউরেকাকে দিয়েছে। মাত্র দু' বছরেই আশি লক্ষ থেকে ওদের অ্যানুয়াল বিলিং প্রায় পৌনে দু কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফিডার লিমিটেড যদি তাদের নতুন প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ইউরেকার ওপর ন্যস্ত করে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চিন্তার আরো কারণ ছিল। বিষয়টির সঙ্গে তাঁর মান-সম্মানও কিছুটা জড়িত। ফিডারদের সঙ্গে তাঁদের পুরনো সম্পর্কের কথা কারুর অবিদিত নয়। এরপর যদি বনিবেব্‌-এর অ্যাকাউন্টটা ইউরেকা পেয়ে যায়, তা নিয়ে বিজ্ঞাপন জগতে আলোড়ন উঠবে, কানাকানি ছড়াবে, একটি ব্যর্থতাই ভবিষ্যতে আরো অনেক ব্যর্থতা ডেকে আনতে পারে।

ইত্যাদি ভেবে তৎপর হলেন রামতনু। কেমন একটা জেদ চেপে গেল মনে। ভাবলেন, যেমন করেই হোক, এখনো যখন কন্ট্রাক্ট সই হয়নি, এই অ্যাকাউন্ট আনতেই হবে স্টারলেট হিউমে।

শ্যামলীরা তখন কলকাতায় এসেছে। রামতনু ভেবেছিলেন ক' দিনের ছুটি নিয়ে অফিসের নানা ব্যস্ত কর্মপ্রবাহের বাইরে শান্ত পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে কাটাবেন। কাজের চাপ ইদানীং তাঁকে ক্লান্ত করছিল, মাঝে মাঝেই অবসাদ বোধ করতে শুরু করেছিলেন। বিশ্রাম নেবার কথা ভাবলেও সুযোগ বা উপলক্ষের অভাবে এতো দিন তা হয়ে ওঠেনি। শ্যামলীরা আসায় একটা উপলক্ষ যদি বা সৃষ্টি হলো, নতুন উপদ্রব এসে তা বানচাল করে দিল।

কালক্ষেপ না করে দিল্লির প্লেনের টিকিট কাটলেন রামতনু। বুধি নায়ারের সঙ্গে আলোচনা করতে যেটুকু সময় লাগল, বিষয়টি বুঝে নিয়ে ছুটলেন ফিডার লিমিটেডে। হুইট্‌নার ওদের মার্কেটিং ডিরেক্টর, ভারতবর্ষে নতুন। মাত্র পাঁচ ছ' মাস হলো এসেছে, মুখ চেনা—কিছু দিন আগে গ্র্যাণ্ডের একটা পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল সামান্য।

দেখা হতে অমায়িক অভ্যর্থনা পেলেন রামতনু। কিন্তু কাজ এগুলো না। হুইট্‌নার বলল, 'উই হ্যাভন্‌ট ডিসাইডেড থিংস অ্যাজ ইয়েট্‌। নাথিং উড কাম আপ বিফোর দি নেক্সট্‌ উইক।'

এই ধরনের কথার অর্থ কী অভিজ্ঞতা দিয়ে রামতনু তা বুঝতে পারেন। সামনের সপ্তাহে যে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, এখনো সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ওঠেনি, হুইট্‌নারের এই বক্তব্য যে এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। শুধু এইটুকু বুঝলেন যে কন্ট্রাক্ট সই হয়নি এখনো।

ভারাক্রান্ত মনে হুইট্‌নারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন ভিজিটরস্‌ রুমে বসে আছে একটি যুবতী, চমৎকার উজ্জ্বল চেহারা, স্বাস্থ্যে নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন বেশবাস—সব মিলিয়ে প্রথম দর্শনেই চোখ টানে। হঠাৎ দেখে পাঞ্জাবী বলে মনে হয়।

এই কি নীরা প্রধান ? নায়ারের বর্ণনা মনে পড়ে গেল, সি ইজ ভেরি মাচ এ পাঞ্জাবী ইন লুক্‌। এক পলক দেখলেন রামতনু, কলকাতায় কোথায় যেন একে দেখেছেন মনে হলো। সন্দেহ নিয়েই বেরিয়ে এলেন তিনি।

ফিডারের চেয়ারম্যান এখন লণ্ডনে, তাঁর সঙ্গে রামতনুর খাতির আছে। এখন আর

সে-যোগাযোগের কোনো মূল্য নেই। এই রকম হবে জানলে আগেই তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ করে রাখতেন। রামতনুর মনে হলো, এ-ব্যাপারে সব ত্রুটি তাঁর নিজের, এতো দিন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। সেই গাফিলতির মূল্য আজ তাঁকে দিতে হচ্ছে।

অফিসে ফিরে নায়ারের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। সম্ভব অসম্ভব নানা উপায় মাথায় আসছিল, সবই খাপছাড়াভাবে, কোনোটাই দানা বাঁধছিল না। কলকাতায় থাকতে ধারণা হয়েছিল নায়ার হয়তো অ্যাপ্রোচে কোনো গণ্ডগোল করে ফেলেছে, যাকে 'ইম্প্রেস করা' বলে তা করতে পারেনি, সেই জন্যেই এই অসুবিধে। তিনি পৌঁছলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে এসে দেখলেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। হুইট্নারের নির্বাচন যেন কিছুটা খেয়ালী, যেন তার পছন্দের পিছনে আরো কোনো গূঢ় রহস্য কাজ করছে, বুদ্ধি বা ইম্প্রেসান দিয়ে তার মত পরিবর্তন করা যাবে না।

রামতনুকে অকৃতকার্য দেখে নায়ার কিছুটা মুষড়ে পড়েছিল। ওর চোখমুখ দেখেই রামতনু তা অনুমান করতে পারলেন। নায়ার তাঁর নিজের ছায়ায় গড়া ; বি. এ. পাশ করে যখন শিক্ষানবিশির জন্যে এসেছিল স্টারলেট হিউমে, তখন ওর বয়স বাইশ, তরুণ যুবা। কাদা ছেঁচে মূর্তি গড়ার মতো রামতনু তাকে গড়ে তুলেছেন একটু একটু করে, ধীরে ধীরে করে তুলেছেন দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী। নায়ারও তৈরি হয়েছে সেইভাবে। রামতনুর অসাফল্যকে আজ যদি সে ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবে ধরে নেয় তা হলে অবাক হবার কিছু নেই।

পারস্পরিক আলোচনায় অনেকটা সময় গেল, কোনো সূত্রই বের করা গেল না। তারপর বিকেল হলো, সন্ধ্যা উত্‌রে গেল। হোটেল পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে, যাবার আগে নায়ার শুধোল, 'স্যার, আর উই গোয়িং টু লুজ দি বনিবেব্ ?'

রামতনু হাসলেন। স্বাভাবিক হাসি। জবাব না দিয়ে পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি আশা ছেড়ে দিয়েছ ?'

'বুঝতে পারছি না। ইউরেকা আসার পর থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। পারহ্যাপ্‌স্ উই আর প্লেয়িং এ লস্ট গেম।'

'ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই।' আশ্বস্ত করার গলায় বললেন রামতনু, 'কী হয় দেখা যাক না। এনিথিং ক্যান হ্যাপেন ইন দি মিন টাইম।'

নায়ার খুশি হলো কি না বোঝা গেল না। ওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একটু বা হতাশ। ব্যাপারটা ওকে চিন্তিত ও বিষণ্ণ করে তুলেছে দেখে খুশিই হলেন রামতনু।

নায়ার চলে যাবার পর হোটেলের স্যুইটে বসে কিছুক্ষণ নিঃসঙ্গ কাটালেন। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে কাল কিংবা পরশু। কাজকর্মের ভার ছাড়াও ছিল শ্যামলীদের চিন্তা। ওদের জন্যে বরাদ্দ দিনগুলির অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেল বৃথা—দিল্লিতে এসেও কোনো কাজ হলো না। কাজ হলে, অন্তত এই অ্যাকাউন্টটা পাওয়া গেলে, এতোটা আক্ষেপ থাকত না। ইত্যাদি চিন্তায় রামতনু ক্ষুব্ধ ও বিমর্ষ বোধ করলেন। কিছুই ভালো লাগছিল না।

নিছক সময় কাটানোর তাগিদেই স্যুইট থেকে বেরিয়ে বারে ঢুকলেন তিনি। কৃত্রিম আলোয় হল্ জুড়ে মোহিনী-আড়াল সৃষ্টি হয়েছে ; নীলাভ, মৃদু, ছায়াচ্ছন্নতা দিয়ে ঘেরা সব কিছু। তেমন ভিড় নেই। যারা ছিল তাদের দেখে এই হোটেলেরই আবাসিক মনে হয়, ছিমছাম শেভ্-করা গালে ল্যাভেণ্ডারের মসৃণতা নিয়ে পুরুষ এবং পরিপাটি পোশাকে দুরন্ত মহিলাদের ঠাণ্ডা গলার অনুচ্চ আলাপ কেমন একটা দূরত্ব গড়ে তোলে।

নাকি এ-দূরত্ব তাঁর মনের মধ্যে। রামতনু ভাবলেন ; ভাবনাটা আলগা হয়ে ভাসতে থাকল। অদূরে ডায়াসের ওপর মাইক্রোফোনে এক বিদেশিনী মধুর বিষাদের গলায় গান গেয়ে চলেছে, 'ইউ লেফ্‌ট্‌ মি হোয়েন দি নাইট ওয়াজ স্টিল ইয়াং—'

রামতনু হঠাৎ উঠে পড়লেন। ঈষৎ নেশার মতো হয়েছিল, মাথার ভিতর একটা ঘন আবেশ ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমশ। উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঋজুতা ফিরে পেলেন।

হলের বাইরে টেলিফোন। রিসিভার তুলে ইতস্তত করলেন এক মুহূর্ত। রাত এখনো খুব বেশি হয়নি, মাত্র দশটা। তবু নায়ারকে এই সময় ডাকা উচিত হবে কি ! দ্বিধা থাকলেও প্রয়োজন তাঁকে উৎসাহিত করল।

ফোন ধরেছিল নায়ারের স্ত্রী লিলি। প্রথমেই ক্ষমা চাইলেন তার কাছে, 'অসময়ে বিরক্ত করছি। তোমার স্বামীকে কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি দিতে পার কি ?'

লিলি কী উত্তর দেবে জানাই ছিল। তবু ভদ্রতা করলেন, করতে ভালো লাগল।

ওদিকে নায়ারের গলা। কোনো জড়তা না রেখে পরিষ্কার গলায় বললেন, 'একবার আসতে পার ? আই হ্যাভ সামথিং ইন মাইণ্ড।'

'বাই অল মিন্‌স্‌, স্যার।' নায়ার বলল, 'আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম, এমন সময়ে ফোন পেলাম।'

'প্লিজ—'

কথা না বাড়িয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন রামতনু। স্যুইটে ফিরে গিয়ে মুখ ধুলেন, কপালে জল দিলেন, চুল আঁচড়ালেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এ-ও একটা ধরন, স্বভাবও বলা যায়, যেন চিন্তাগুলোকে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখলেন।

নায়ার এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। ভূমিকার সুযোগ নিলেন না রামতনু। যা বলবেন তা হয়তো ফোনেও বলা যেত, তবু তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যেই নায়ারকে টেনে আনলেন এখানে। আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল, নায়ারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা।

'ভেবে দেখলাম, বনিবেব্‌-এর অ্যাকাউন্টটা সহজেই আমরা পেয়ে যাই, যদি একটা কাজ করা যায়।' রামতনু একটু থামলেন, নায়ারকে তৈরি হতে দিলেন। 'দ্যাট ইজ দি ওনলি ওয়ে আউট। উই শুড্‌ ট্রাই ইফ উই মিন ইট্‌।'

নায়ার ভুরু কোঁচকাল। রামতনুকে সে চেনে। এই অসময়ে বাড়ি থেকে টেনে আনার প্রস্তাবেই সে অনুমান করেছিল ফলপ্রদ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। রামতনুর এই মুহূর্তের কথাবার্তায় অনুমান আরো জোরাল হলো।

'গেট নীরা ফার্স্ট। নীরাকে বশ করলেই আমাদের কাজ হবে। যে-কোনো অফার দিতে রাজি আছি।'

নায়ার বলল, 'ইট্‌স্‌ ওয়াণ্ডারফুল ! চমৎকার বুদ্ধি, স্যার !'

নায়ারের উৎফুল্ল ভাব রামতনুকে স্পর্শ করল না। এইভাবে কাজ হাসিলের পদ্ধতিতে তাঁর বীতরাগ প্রবল ; যেন নিজের দীনতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিশ্চিত এটা সেই রামতনুর কাজ নয়, যিনি স্টারলেট হিউমের সর্বময় কর্তা, ছোটবড়ো যে-কোনো কাজেই সততা যাঁর প্রধান শর্ত, সুনীতি যাঁর অস্ত্র। তবু মানতে হলো। বিকেল থেকেই ব্যর্থতাজনিত গ্লানি পীড়া দিচ্ছিল তাঁকে, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত একটা জেদ চেপে গেল মনে। বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্যে রামতনু যুক্তি খাড়া করলেন নিজের মতো করে।

তারপরের কাজটুকু করল নায়ার। হুইট্‌নার কন্ট্রাক্ট সই করার পর নায়ারকে বললেন

রামতনু, 'নোংরা কাজটা তোমাকে দিয়েই করাতে হলো, নায়ার। আমি দুঃখিত।'

দিল্লিতে থাকার কথা ছিল দু' দিন, থেকে গেলেন পাঁচ দিন। শেষের দুটো দিন নীরাকে নিঃশঙ্ক করার জন্যে। কলকাতায় ফিরলেন ট্রেনে, সঙ্গে নীরা। সারা রাত কাটল নির্ঘুম অস্বস্তির ভিতর। নীরার জেগে থাকা ও ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণ বোধবুদ্ধিহীন একটা বিকার তাঁর মাথার মধ্যে জ্বালার মতো ঘুরতে থাকল। এক শরীর থেকে উঠে এসে প্রায় অপরিচিত এই যুবতী, নীরা, যেন বহু ও বিবিধ হয়ে তাঁকে আকর্ষণ করছে! তখন জানতেন না, ভবিষ্যতের দিনগুলি অপেক্ষা করছে, সতর্ক থেকেও তিনি গভীরে তলিয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ।

॥ ছয় ॥

মাত্র ক'দিন আগের ঘটনা। তবু, এখন মনে হয় স্বপ্নের মতো, অবিশ্বাস্য ; শীতের দুপুরে বজ্রপাতের মতো আকস্মিক।

নিপুণ অস্ত্রোপচারে যকৃতে ভাসমান ছুঁচ বের করার মতো হুইট্‌নারের জাল থেকে নীরাকে বের করে আনল নায়ার। চমৎকার পরিকল্পনা তার—নিতান্ত অবুদ্ধি দিয়ে সম্ভব হতো না। না হলে, সন্দেহ কি, ব্যাপারটায় ঝুঁকি ছিল—নীরা বা হুইট্‌নার কেউই বুঝতে পারেনি ফাঁদ পাতা হয়েছে, তারা ধরা দিচ্ছে। বুঝবেও না কোনো দিন। হয়তো ভাববে মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, চালের ত্রুটি, তার বেশি কিছু নয়। নীরা ভাববে এটা আকস্মিকের যোগাযোগ। ফিডার লিমিটেডের অ্যাকাউণ্টটা হাতছাড়া হলেও দিল্লির একটি সন্ধ্যা তার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছে।

প্রাত্যহিকতা থেকে দূরে এই সব ভাবতে ভাবতে অফিসে পৌঁছুলেন রামতনু—আধ ঘণ্টার ওপর দেরি করে।

ইতিমধ্যে মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন তিনি। যা হয়েছে, আর নয় ; এখন থেকে তাঁকে সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। এই ক'দিনে যেন বড়ো বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেম, কিছুটা দুর্বলও ; তাঁর বাড়ানো হাত ধরে নীরা উঠে এসেছে অনেক উঁচুতে। সেটা ঠিক হলো না। হাজার হোক, আপাতত স্টারলেট হিউমের একজন কর্মী ব্যতীত নীরা আর কী! আর তিনি, রামতনু সোম, সংক্ষেপে আর. এস., স্টারলেট হিউমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বিজ্ঞাপন জগতের সেরা মানুষ বলে খ্যাত। দু'জনের মধ্যে একটু ব্যবধান, ঈষৎ অপরিচয়ের দূরত্ব থাকা উচিত ছিল না কি?

হতে পারে নীরা আলাদা ; এই প্রতিষ্ঠানের আরো পাঁচজন মহিলা কর্মীর চেয়ে নীরার স্থান একটু উঁচুতেই হবে হয়তো। সেটা তার প্রাপ্য। বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, ব্যবহার ও কর্মপটুতা—জনসংযোগ ব্যবসায়ে যেগুলো সাফল্যেব শর্ত, সবই আছে নীরার। এই প্রতিষ্ঠানে সে নিযুক্ত হলে কারুর বিচলিত হবার কিছু নেই। হয়তো কিছু কানাঘুসো হবে, কিঞ্চিৎ ঈর্ষা ও জ্বালা ছড়াবে—তরুণ নায়ারকে দিল্লি ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার করে পাঠানোর সময় যে-রকম ঘটেছিল। ইট্‌স্ এ ম্যাটার অফ পলিসি অ্যাণ্ড ডিসিসান, আই কান্ট্ হেল্‌প্। আমি যা করেছি বা করছি, সবই এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে। তোমরা আমার সমালোচনা করো, তবু আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে। আমি নিরুপায়।

কাজকর্মে আজ প্রথম থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রামতনু। ফিডার লিমিটেড সম্পর্কে একটা জরুরী খবর পাঠানোর ছিল দিল্লিতে, ড্রাফ্‌ট্ করে টেলেক্স পাঠালেন। বেলা চারটেয় ব্রিফিং, পি. এ-কে ডেকে কাগজপত্র গুছোতে বললেন। তারপর নজর পড়ল টেলিফোনের কল্ বুকে।

সকালের প্রথম টেলিফোন এসেছে জনৈক মিস্টার তরফদারের। রামতনুর ভুরু কুঁচকে উঠল। পি. এ-কে ধমক দিলেন, 'হোয়াই ডোণ্ট ইউ রাইট্ ইন ডিটেল! তরফদার তো অনেক আছে, কে ফোন করেছিল কী করে জানা যাবে!'

'ডিটেল কিছু বলেনি স্যার—'

'দ্যাট্স্ নো এক্সকিউজ।'

রামতনুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। গত সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ল আবার। নীরার ফ্ল্যাট, সেই পাত্‌লা চুলের ভদ্রলোক, মিস্টার তরফদার। বিরক্তিকর! রামতনু দ্বিতীয় নামটি দেখলেন। লুৎস ইনকরপোরেসানের রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর ডক্টর ব্যানার্জি। আজ তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ। অপারেটরকে বললেন লাইন দিতে।

যোগাযোগ হতে ব্যানার্জি বললেন, 'সোম, আর ইউ গেটিং ওল্ড্?'

'হোয়াই! হঠাৎ কী হলো?'

'দেরি দেখে ভাবলুম বয়সের চাপ। আর কী কারণ হতে পারে!'

রামতনু হাসলেন দরাজ গলায়, যতোটা সম্ভব চড়িয়ে।

'আই অ্যাম ফিফ্‌টি ফাইভ। কম আর কী! এবার রিটায়ার করলেই হয়।'

'গুড্‌নেস! হোয়াট দি হেল ইউ আর টকিং অ্যাবাউট!' ব্যানার্জি বললেন, 'সামনের ছাব্বিশে আমি ষাট পেরিয়ে যাব। অ্যাণ্ড মাই ওয়াইফ ইজ প্রিপেয়ারিং টুক মেক ইট্ এ হ্যাপি বার্থ্‌ডে। আমার অনুপাতে আপনি তো শিশু, মশাই—'

দু'পক্ষেই হাসাহাসি হলো। রামতনু হাসলেন কিছুটা চেষ্টা করে, অনায়াস হবার ভূমিকা. যেন গলা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বললেন, 'সকালেই তলব যে!'

'নাথিং সিরিয়াস। বেরিয়ে যাচ্ছি এখুনি। লাঞ্চে আসছেন কি না কনফার্ম্ করে নিলুম।'

'আসব। মনে আছে।'

ফোন ছেড়ে দিলেন।

তৃতীয়, চতুর্থ তেমন জরুরী নয়। পাঁচ নম্বরে এসে দ্বিধায় পড়লেন রামতনু। নীরা।

অবশ্য পুরো নাম নেই। কিন্তু, মিস প্রধান বলতে তিনি যাকে চেনেন, তার নাম নীরা। বিজনেস কলামের নিচে ত্বরিত অক্ষরে 'পার্সোনাল' লেখা, পরে 'রিং ব্যাক'। সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে কোথায় যেন একটু অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আছে—ঔদ্ধত্যও বলা যায়, অন্তত বিরক্ত মন নিয়ে রামতনু সেই রকম ভাবলেন। না হলে, যতোই ব্যক্তিগত হোক, আমি, রামতনু সোম, তোমাকে রিং-ব্যাক করব কেন! অসম্ভব! তরফদার ও নীরার দ্বৈত প্রহার রামতনুকে বিচলিত করল, ক্ষুব্ধ করল।

ক্ষোভটা থাকল অনেকক্ষণ। গভীর অসুখের আশঙ্কা যেমন মানুষকে হতাশ ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, তেমনি একটা হতাশা ও গ্লানি সারাক্ষণ মন ও মস্তিষ্কে দুর্ভাবনার মতো ছড়িয়ে রইল।

আমি কি খুব বেশি এগিয়েছি? বা, দেখিয়েছি এমন কোনো শৈথিল্য, যাতে নীরার সঙ্গে সম্ভ্রমের ব্যবধানটুকুও লুপ্ত হয়েছে!

এই প্রশ্ন, এই ধরনের দুশ্চিন্তা এক সময় ক্রোধে পরিণত হলো। আবশ্যিক কাজকর্ম থেকে পরিষ্কার অনেক দূরে চলে গেলেন রামতনু। মন বসল না।

দুপুরে লাঞ্চ। ব্যানার্জির সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে গল্পগুজব হলো। ব্যবসায়িক, পারিবারিক। দশ বছরের পরিচয়ে পরস্পরের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, এখন ব্যক্তিগত কথাবার্তা চলে বন্ধুর মতন, স্বচ্ছন্দে।

ব্যানার্জির প্রত্যেক কথাতেই আজ রামতনুর স্তুতি। বললেন, 'আপনার কৃতিত্ব আমাকে খুব অবাক করে। ইউ আর জাস্ট এ কমপ্লিট ম্যান।'

রামতনুর ভালো লাগছিল না। কেমন এক অস্বস্তি বারবার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। ব্যানার্জির কথা কখনো শুনছিলেন, কখনো বা অংশ-বিশেষ কানে আসছিল, পুরো অর্থের দিকে মনোযোগ ছিল না। শেষের কথাটা কেমন ঠাট্টার মতো শোনাল।

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'ও-কথাটা আমার মৃত্যুর পর বলবেন। এখনো জীবন পড়ে আছে। আই অ্যাম ইয়েট টু কমপ্লিট দি সার্কল।'

রামতনুর গলার স্বর ক্লান্ত ও অনিচ্ছুক। ব্যানার্জি হয়তো কিছু অনুমান করলেন।

'ইউ লুক আপসেট টু-ডে!'

'নো। আই অ্যাম ফাইন।'

রামতনুর মধ্যে হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। মুখে একটা উদ্ভাসিত ভাব। প্রসন্নতা জিইয়ে রেখে বললেন, 'উড ইউ মাইণ্ড অ্যানাদার ড্রিঙ্ক?'

'ওয়েল, ওয়েল—', অপ্রস্তুতভাবে কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি করলেন ব্যানার্জি, 'আই ডোণ্ট মাইণ্ড।'

রামতনু হুইস্কির অর্ডার দিলেন।

অন্যথায় ব্যস্ত মানুষ, টেবিল থেকে মাথা তোলবার সময় পান না। নিরলস কাজ ও দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে গোপনে প্রতিদিন তাঁর বয়স বেড়ে গেছে, গত কুড়ি বছর ধরে একইভাবে। অথচ, আজ, এই মুহূর্তে, তাঁর প্রধানতম সমস্যা সময় কাটানো। আর, শুধু সময় কাটানোর তাগিদে, শুধু একান্ত ও নিরপেক্ষ থাকার জন্যে এই দুপুরে তাঁর মদ্যপান, তাতে যদি অবসাদ আচ্ছন্নতায় পরিণত হয়—ভুলতে পারেন নিজেকে, নিজের জটিলতাকে।

বস্তুত, যতোক্ষণ পারলেন অফিসের বাইরে কাটালেন রামতনু। উদ্দেশ্যবিহীন।

ব্যানার্জি উঠলেন সময়মতো। তাঁর তাড়া ছিল।

রামতনু ততোক্ষণে একটু বা খাপছাড়া হয়েছেন, ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত। যাবার আগে ব্যানার্জি বললেন, 'যে-কোনো কারণেই হোক, আজ আপনি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছেন। আপনার রেস্ট নেওয়া দরকার।'

রামতনু জবাব দিলেন না। বুকের ভিতর অনাবেগ শূন্যতা, স্মৃতি সম্পর্কহীন অদ্ভুত এক অনুভব তাঁকে ক্রমশ চিন্তাহীন করে তুলল।

অফিসে ফিরলেন ক্যাম্পেন-মিটিংয়ের আগে। কনফারেন্স রুমে এক্সিকিউটিভরা জড়ো হয়েছিল। ফিডার লিমিটেড-এর নতুন প্রোডাক্ট 'বনিবেব্' সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত সাইক্লোস্টাইলড্ কপিগুলো তাদের হাতে। প্রাথমিক আলাপের পর কপি, ভিস্যুয়াল, মিডিয়া প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আলাদাভাবে ব্রিফ্ করলেন রামতনু। গ্রুপ ম্যানেজার নির্মল বোস ফিডার লিমিটেড-এর পুরো ইতিহাস জানে, বনিবেব্-এর কাজও হবে তার

তত্ত্বাবধানে।বোসকে বললেন, 'নতুন কিছু করা দরকার। মার্কেট ক্রমশ কমপিটিটিভ হয়ে উঠছে। আপনাদের ওপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। তবু দেখতে হবে, হাউ বেস্ট উই কুড পুট আওয়ার রিসোর্সেস টুগেদার।'

রামতনুর কথা শেষ হতে না হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলেছিল বোস। বলল, 'ইওর কল।'

রামতনুর ভুরু কোঁচকাল, 'হু ইজ ইট ?'

'জানি না। মহিলার গলা।'

অনিচ্ছায় হাত বাড়ালেন রামতনু। অপারেটরকে নির্দেশ দেওয়া আছে নিতান্ত জরুরী না হলে কনফারেন্স রুমে যেন লাইন না দেওয়া হয়। তার ওপর মহিলার গলা। এই পরিস্থিতিতে বিরক্ত হবার সঙ্গত কারণ ছিল।

সাড়া দিতে ওপাশ থেকে নীরার গলা পেলেন।

রামতনুর চোখে-মুখে বিরক্ত, অধৈর্য ভাবটুকু পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল, বিব্রত কপালে রেখা ফুটল। অনেকের সামনে বলেই অস্বস্তি আরো বেশি। এখন অস্বাভাবিকতা মানায় না ভেবেই কিঞ্চিৎ সহজ হবার চেষ্টা করলেন রামতনু। পরিবর্তে রূঢ় হলেন।

'আমি সাংঘাতিক ব্যস্ত', বললেন, 'কথা বলার সময় নেই।'

নীরা অপ্রস্তুত। হঠাৎ চুপ করে গেল। ক'মুহূর্ত। তারপর বলল, 'আপনি কি আমার বিষয়ে কিছু ভেবেছেন ?'

'ভেবেছি। কাল পরশুর মধ্যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যাবে।'

কথাটা ভাববাচ্যেই সারলেন রামতনু। তাঁর যা বয়স, যে-প্রতিষ্ঠা, তাতে যে-কোনো ব্যক্তিকে, সে মহিলাই হোক বা পুরুষ, 'তুমি' সম্বোধনে অসুবিধে নেই। তবু খটকা লাগল, সন্দেহ দেখা দিল নিজের সম্পর্কে। দ্বিতীয় কথা, নীরা যদি এর ফলে তাঁর প্রতি বিরূপ হয় হোক।

দ্বিতীয় ধারণাটি রামতনুকে প্ররোচিত করল। একটু থেমে, আগের কথার জের টেনে দ্রুত গলায় বললেন, 'উইল দ্যাট বি অলরাইট ফর ইউ ?'

নীরা ইতস্তত করছিল। বলল, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে ফোন করিনি। কী হয়েছে আপনার !'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আমি খুব ভালো আছি।'

ওদিক থেকে কোনো জবাব এলো না। অপেক্ষা না করে ফোনটা রেখে দিলেন রামতনু। রাখার পরই মনে হলো, কাজটা হয়তো ঠিক হলো না। এতোটা রূঢ় হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। নীরা ভাবতে পারে লোকটি অশালীন ও অভদ্র, আচরণে সমতা নেই।

রামতনু ক্ষুণ্ণ বোধ করলেন। আমি কি আর একটা অন্যায় করলুম ! অকারণে রূঢ় হলুম ? বা, অভব্য ? নিজের কাছে এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পেলেন না।

অন্যান্যরা শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল। ওদের আর আটকে রেখে লাভ নেই ভেবে ছেড়ে দিলেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ফিরে এলেন নিজের চেম্বারে।

তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে এই ঘরের পরিচ্ছন্ন কাচের জানলাগুলো সব সময়েই বন্ধ থাকে ; বাইরের আলো যদি বা ঢোকে, হাওয়া পারে না। শব্দ-নিরোধক। সাড়ে পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফুট বিস্তৃত ফ্লোর এরিয়া জুড়ে ছিমছাম কর্মব্যস্ততা। অথচ এই ঘরে, ষোল বাই বারোর নিখুঁত মাপের ভিতর শব্দহীন একাকিত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন

রামতনু, তিনি খুব একা ; একা ও বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্তের অভিজ্ঞতার চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই।

বিকেল পড়ে আসছিল। জুন মাস, পাঁচটা বাজতে এখনো দেরি আছে। এরই মধ্যে রোদ থিতিয়ে এলো। ঘরের ভিতর থেকে বাইরের ময়লা, অনুজ্জ্বল আলো দেখে রামতনু অনুমান করলেন আজও হয়তো বৃষ্টি হবে। বেয়ারাকে ডেকে এয়ারকুলার বন্ধ করে জানলাগুলো খুলে দিতে বললেন তিনি।

জানলা খুলতেই হাওয়া এলো চমৎকার। হাওয়ায় বিকেলের গন্ধ বুকের মধ্যে কেমন এক দূরত্ব সৃষ্টি করে। চারিদিক থেকে ছুটে আসছে কর্মব্যস্ত শহরের নানা রকম শব্দ। শব্দ ও গন্ধের মধ্যে কিছুক্ষণ ইন্দ্রিয় সচেতন রেখে চুপচাপ বসে থাকলেন রামতনু। উত্তেজিত স্নায়ুগুলিকে শিথিল হবার সময় দিলেন।

কিছুটা সময় এইভাবে নিরঙ্কুশ শূন্যতার মধ্যে কাটিয়ে ফোন তুলে নির্মল বোসকে নিজের চেম্বারে ডাকলেন রামতনু। নীরার সম্পর্কে গড়িমসি করে লাভ নেই। উপরন্তু, ভাবলেন তিনি, যা ঘটল, অভব্যতা বা দুর্ব্যবহার, এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নিজের। অকারণ নীরাকে আঘাত করার মধ্যে তখন এক ধরনের আত্মতুষ্টি বোধ করেছিলেন। যতো সময় যাচ্ছিল ততোই নিজের আচরণের অর্থহীনতা তাঁকে পীড়িত করছিল। নীরার কী দোষ ! বস্তুত, নীরা যা করেছে, ঐ পরিস্থিতিতে আর যে-কেউই তাই করত। অন্তরঙ্গতার স্বাভাবিক নিয়মে নীরা নিজেকে চালিত করেছে মাত্র। রামতনু তার জন্যে দুঃখ ও মমতা অনুভব করলেন। তাঁর মন ক্রমশ কোমল হয়ে আসছিল।

ফিডার লিমিটেড সম্পর্কে গতকাল আলোচনার সময়েই স্টারলেট হিউমে নীরাকে নেবার কথা বলেছিলেন রামতনু। এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাঁরই। তবু যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়িত্ববান কর্মীদের পরামর্শ নেন তিনি ; নিয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে। নীতি হিসেবে এটা যে ফলপ্রদ, তার প্রমাণ পেয়েছেন বহুবার। আর কিছু না হোক, এতে বিভ্রম সৃষ্টির হাত থেকে মুক্ত থাকা যায়।

নির্মল এলে আজ রামতনু আবার নীরার প্রসঙ্গ তুললেন। ইউরেকার পক্ষ থেকে বনিবেব্-এর ক্যাম্পেন সাবমিট করেছিল নীরা, এ-বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক তথ্যই তার জানার কথা। এইভাবে বিষয়টি প্রাঞ্জল করলেন রামতনু।

নির্মল সায় দিল। বলল, 'ওর বিষয়ে আমি আগেই শুনেছি। সি ইজ পারফেক্টলি এফিসিয়েন্ট।' তারপর, একটু বিরতি দিয়ে আবার, 'আমার মনে হয় এই অ্যাকাউন্টটা সে-ও হ্যাণ্ডেল করতে পারে।'

'না। এখন নয়। পরে দেখা যাবে—'

কথাটা অসম্পূর্ণ রাখলেন রামতনু। বনিবেব্-এর অ্যাকাউন্ট কী করে পাওয়া গেল, তিনি ও নায়ার ছাড়া সে-তথ্য কেউই অবগত নয়। ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া প্রয়োজন। আর, সে-জন্যে সবচেয়ে আগে দরকার নীরাকে আলাদা রাখা, দূরে রাখা।

নির্মল ভাবল, যতোই দক্ষতা থাকুক, নতুন কাউকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে আর. এস. রাজি নন। রামতনুর মনোভাবে খুশিই হলো সে।

রামতনু বললেন, 'দু'এক দিনের মধ্যেই মিস প্রধানকে আমরা জয়েন করতে বলছি।'

নির্মল চলে গেল। ও যাবার পর পি. এ-কে ডেকে নোট নিতে বললেন রামতনু। নীরার নিয়োগপত্র। আজকের মতো এইটেই তাঁর শেষ কাজ। টাইপ হয়ে ফিরতে ফিরতে মিনিট

দশেক লাগবে। অন্তত ততোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে।

তারপর বাড়ি, বাড়ি ফেরা। মৃদুলাকে বুঝতে দেওয়া উচিত, প্রিয়জন সম্পর্কে শেষ ধারণায় পৌঁছুনোর জন্যে একটি দিনই যথেষ্ট নয়।

॥ সাত ॥

বাড়ি ফেরার স্থির সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও ফিরতে পারলেন না রামতনু। ইতিমধ্যে নিশ্চিত কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটে গেল। আজও সন্ধেবেলায় তাঁকে দেখা গেল নীরার সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ।

রামতনুর নিজের কাছে এর একটা কৈফিয়ত ছিল। তাঁর প্রতিটি চিন্তাই যুক্তিনির্ভর, কার্যকারণের সম্পর্ক দিয়ে ঘেরা। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে সই দিয়ে ডেসপ্যাচে পাঠানোর আগেই তাঁর মনে হয়েছিল নীরার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। বিক্ষোভের মাথায় তখন যা করেছেন তা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়, হয়তো গর্হিতও। তখন যা বলেছেন, ভেবে বলেননি, নীরার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না। নীরা ভাবতে পারে পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে রামতনু তাকে তাচ্ছিল্য করলেন, দয়া দেখালেন।

আর একটি বিষয়ও রামতনুর সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করল। আগামী দিনগুলোয় যার সঙ্গে কাজ করতে হবে তার মনে কোনো সংশয় বা সন্দেহ রাখা উচিত হবে না। ভালো হয়, যদি পরিষ্কার নীরাকে বলে দেন, আমি দুঃখিত, আমাকে ভুল বুঝো না। এইভাবে বলায় কোনো দীনতা নেই, এটা নিতান্তই সৌজন্য ও ভদ্রতা ; একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এ-ক্ষেত্রে যেভাবে নিজেকে সংশোধন করে নিতেন, তিনিও তাই করবেন।

নীরার ফোন নাম্বার ছিল। হয়তো ফোন করলেই চলত, সেই রকমই ভেবেছিলেন প্রথমে। ডায়াল করতে গিয়ে মনে হলো, কী দরকার ! এমনও হতে পারে তাতে ভুল বোঝাবুঝি আরো বাড়বে। তা ছাড়া, এই কথা গুছিয়ে বলার জন্যে টেলিফোন যথেষ্ট নয়। অফিস থেকে গাড়িতে নীরার ফ্ল্যাটের দূরত্ব মাত্র পনেরো মিনিট ; অনায়াসেই চলে যাওয়া যায়।

চিন্তামাত্র নীরার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন রামতনু।

আজ তাঁর কোনো পিছুটান ছিল না। অভ্যস্ত, গতানুগতিক পথে ভ্রমণের মতো, বা, যেভাবে প্রতিদিন বাড়ি ফেরেন, তেমনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারলেন তিনি। মানসিকতার এই পরিবর্তন তাঁকে কিছুটা হাল্‌কা করে দিল।

পরিচ্ছন্ন বিকেল। খানিক আগেও মনে হয়েছিল বৃষ্টি হবে, ছায়াঘন আকাশ ক্রমশ নিচু হয়ে আসছিল। তারপর হঠাৎই আলো ফুটে উঠল। পরিষ্কার আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘ স্থির হয়ে আছে, হাওয়া বইছে অল্প। গতকালের তুমুল বৃষ্টির সব চিহ্ন মুছে খটখটে শুকনো হয়ে উঠেছে রাস্তা। এরই মধ্যে লক্ষ্য স্থির রেখে রামতনু তাঁর গন্তব্যে পৌঁছুলেন।

নীরা ঘরেই ছিল। বয়স্কা এক মহিলা এসে দরজা খুলল ; কালো, মিশমিশে রঙ, চুলে

পাক ধরেছে অল্প, চেহারা দেখে মনে হলো আয়া। রামতনুকে বসিয়ে নীরাকে ডাকতে গেল সে।

সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরালেন রামতনু। ধোঁয়া টেনে এই ঘরের আসবাব, দেওয়ালে ফ্রেমের ছবি, বুককেসের জাপানী পুতুল ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। নিতান্তই সময় কাটানোর জন্যে যে-ধরনের অভিনিবেশ দরকার, প্রায় তাই; অল্পকালের মধ্যেই তাঁর চোখ স্থির হয়ে গেল জানলার পর্দায়। আর কিছু দেখার ছিল না। রক্ত জুড়ে তরুণোচিত চাঞ্চল্য, শরীরের সর্বত্র একটা অস্থির ভাব—চেষ্টা সত্ত্বেও স্থির হতে পারলেন না। অপেক্ষা তাঁকে এক বিরাট পরীক্ষার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

নীরা এলো। চোখে মুখে একটা শাণিত ভাব, আটপৌরে পোশাক, এলো চুল আল্‌গা খোঁপায় জড়ানো। স্পষ্ট চোখে ওর শরীর, শরীরের প্রতিটি ভাঁজ লক্ষ করেলন রামতনু, নিজের শরীরে জ্বরের মতো উত্তাপ ঘন হচ্ছে অনুভব করলেন। যেন তাঁর বয়স কমতে শুরু

রামতনুর দৃষ্টি লক্ষ করে আঁচল তুলে গলা পর্যন্ত জড়িয়ে নিল নীরা। অসময়ে রামতনুর আবির্ভাবে সে কিছু বিস্মিত হয়েছে মনে হয় না। ঠোঁটের ভাঁজে ঠাণ্ডা হাসি। নীরাকে ঈষৎ শ্রান্ত লাগছিল।

নীরা বসার পরও খানিক চুপ করে থাকলেন রামতনু। তারপর কোনো ভূমিকা না করেই বললেন, 'তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম।'

'কেন!'

'আই থট আই ওয়াজ আননেসেসারিলি রুড টু ইউ।' অবিকৃত গলায় বললেন রামতনু, 'দুপুরের ঘটনায় তুমি নিশ্চয় হার্ট হয়েছ—'

'না—', নীরা হাসল। 'বোধ হয় আপনাকে ডিস্টার্ব করেছিলাম। আমি দুঃখিত।'

নীরা সম্ভবত অস্বস্তি বোধ করছে, দুপুরের ঘটনার অবতারণায় খুশি হয়নি। ওর আড়ষ্ট, অপ্রস্তুত ভাব দেখে রামতনুর তাই মনে হলো। হঠাৎ ভাবলেন, এসেই নিজের ত্রুটির কথাটা না তুললেই ভালো হতো। বা, আদৌ কি কোনো প্রয়োজন ছিল ক্ষমা প্রার্থনার? এই মুহূর্তে তাঁর সমগ্র আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটু শৈথিল্যের পরিচয় থেকে গেল, অকারণ প্রশ্রয় দেওয়া হলো নীরাকে। নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় নিজেই ক্ষুণ্ণ হলেন রামতনু।

নীরা চুপচাপ। এতোক্ষণে যেন তার খেয়াল হলো পাখাটা বন্ধ, ঘরটা গরম হয়ে উঠেছে। আস্তে উঠে গিয়ে স্যুইচ অন্ করল ও, জানলায় ঘুরে এলো। তারপর না বসেই জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবেন? ঠাণ্ডা কিছু?'

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই—', অগত্যা নিজেই সহজ হবার চেষ্টা করলেন রামতনু, 'খনিক আগে কফি খেয়েছি।' একটু থেমে, হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে বললেন, 'সেই ভদ্রলোক কোথায়? মিস্টার তরফদার?'

'বেরুলেন এইমাত্র—'

তরফদারের কথাটা এড়িয়ে গেল নীরা; যেন জানত, রামতনু নেহাত কথার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তরফদার সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো কৌতূহল নেই। অল্প হেসে বলল, 'কাল রাত্রে আপনাকে ফোন করেছিলুম বাড়িতে। তখনও ফেরেননি।'

'আই ওয়াজ লেট।'

ফোন নিয়ে অশান্তির কথাটা মনে পড়ে গেল রামতনুর। তখন মনে হয়েছিল নীরার

ফোন করা অকারণ ছাড়া কিছু নয়। বস্তুত ঐ ঘটনায় নীরা যেন কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছে, তাঁকে হাস্যকর করে তুলেছে ভেবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এখন ভাবতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটায় নিজের অহেতুক আশঙ্কা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেলেন না। লঘু মেজাজে, কৈফিয়ত দেবার মতো করে বললেন, 'একে বৃষ্টি, তার ওপর ট্রাফিক জ্যাম। ইট্ ওয়াজ এ হরিব্‌ল্ এক্সপিরিয়েন্স!'

স্টেশনে যাবার কথাটা কাল বলেননি, আজও কিছু বললেন না।

'আমি একটু ভাবনায় পড়েছিলুম।' নীরা বলল, 'এখান থেকে পৌঁছুতে এক ঘণ্টা সময় লাগার কথা নয়। ভাবলুম, হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন—'

'হয়তো। ভাবনাগুলো ঐভাবেই আসে।'

রামতনু কিছু বলতে চাইলেন, বলাটা অর্থবহ হলো না। বলার পরেই তাঁর মনে হলো কথাটা অর্থহীন, হেঁয়ালি ছাড়া আর কিছু নয়। নীরার ভ্রূ-কুঞ্চনে তাঁর অনুমান দৃঢ় হলো।

খাপছাড়া অনুভূতি থেকে তবু তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। চিন্তা ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে পড়ছিল, নিঃশ্বাস দ্রুত, নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘন ও আচ্ছন্ন হয়ে এলো। এমন কি চোখ নিচু করার পরও চুম্বকের মতো নীরার দু'টি পায়ের পাতা, পায়রার মাথার মতো পায়ের পুরু গোড়ালি ইত্যাদি তাঁকে আকর্ষণ করতে লাগল।

রামতনুর দৃষ্টি লক্ষ করে ঝুঁকে বসল নীরা, শাড়ির পাড় টেনে গোড়ালি ঢাকল। যেন হঠাৎ খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছে, এইভাবে হাসল। রামতনু ওর হাসি লক্ষ করলেন কি করলেন না—নীরার আঁচল খসে পড়েছিল হাতের ওপর, সেই মুহূর্তের অসাবধানতায় রামতনুর উৎসুক দৃষ্টি ওর বুকের অনাবৃত অংশ স্পর্শ করল, ছুঁয়ে থাকল, অনেকক্ষণ।

রামতনুর কপালে ঘাম ফুটে উঠল। সংযত হয়ে ভাবলেন তিনি, এ আমি কী করছি! যা করছি তা নিশ্চিত অন্যায়, অশালীন ও অভব্য ; বিশেষত নীরার সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক তাতে তাঁর এই মুহূর্তের আচরণ শুধু অশোভনই নয়, গর্হিত। নীরা ভাবতে পারে রামতনু তাঁর একাকিত্বের সুযোগ নিচ্ছেন, ধর্মাধর্ম, শোভনতার কথা ভুলে গেছেন।

ছি, ছি ; নিজেকে ধিক্কার দিলেন রামতনু ; নিজের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণায় শরীরে কম্পন শুরু হলো। এখানে আর বসে থাকার কোনো মানে হয় না, রামতনু ভাবলেন, নীরাকে কোনো ধারণা করার সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না, এখন তাঁর চলে যাওয়া উচিত।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন রামতনু। কোটের পকেট থেকে রুমাল বার করে চাপ দিয়ে কপাল মুছলেন, ঘাড়, গলা মুছলেন। সবই কিছুটা সময় নেবার জন্যে, যাতে কিছুটা স্বাভাবিক হওয়া যায়, হঠাৎ চলে যাওয়ার ভূমিকা প্রস্তুত করা যায়। গলার স্বরের শুষ্কতা কাটিয়ে বললেন, 'এক্সকিউজ মি। আমাকে এখন যেতে হয়।'

'কোথায়!'

নীরা অবাক হলো। ও নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

চট করে কোনো জবাব মুখে এলো না রামতনুর। যা হয়েছে হয়েছে, ভাবলেন, এভাবে উঠে গিয়ে অন্তত নিজেকে বাঁচানো যাবে না। নীরা কী ভেবেছে না ভেবেছে তা তাঁর জানবার উপায় নেই। এমনও হতে পারে নীরার লজ্জিত, বিব্রত ভঙ্গি তার নারীত্বের সাধারণ প্রকাশ মাত্র, ঐ পরিস্থিতিতে যে-কোনো মেয়েই কুণ্ঠা বোধ করত। আর, সত্যি সত্যিই যদি নীরা কিছু ভেবে না থাকে, তাহলে তাঁর সঙ্কুচিত হবার কী কারণ থাকতে পারে!

'কোথায় যাব তা এখনো ঠিক করিনি।' নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন রামতনু,

এখন তিনি অসঙ্কোচে তাকাতে পারছিলেন। বললেন, 'তোমার কি সময় আছে ? চলো, ঘুরে আসবে।'

নীরা তবু দ্বিধা করল। এই দ্বিধা রামতনুর প্রস্তাবে বা অন্য কোনো কারণে বোঝা যায় না। দু'এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'এখানেই বসুন। আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'আই হ্যাড নেভার বিন সো ফ্রেশ।' রামতনু হাসলেন। 'আজ আমি খুব ভালো আছি, অনেক দিন পরে ভালো আছি। তুমি যা বলছ, সেটা সত্যি নয়। তুমি আমাকে কতোটুকু জানো !'

প্রায় স্বগতোক্তির গলায় কথাগুলি উচ্চারণ করলেন রামতনু। নিজস্বতা থেকে বিচ্ছিন্ন এ যেন আর এক রামতনু ; নিজের কাছেই কথাগুলো পরিষ্কার প্রতারণার মতো শোনাল।

নীরা আর কোনো প্রশ্ন করল না। আস্তে উঠল, পর্দা সরিয়ে ভিতরে গেল, সম্ভবত পোশাক বদলাবার জন্যে।

এখন দিন বড়ো, সন্ধ্যা নামতে দেরি হয়। যাই যাই করেও আলোর রেশটুকু যেতে চায় না। জানলার বাইরে অন্যমনস্ক তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপরাহ্নের মলিন আলো আস্তে আস্তে মুছে যেতে দেখলেন রামতনু। এই পরিবেশে নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে হয়। যেন অস্তবেলার ওই ছায়াচ্ছন্নতায় আত্মগোপনকারী রহস্য ক্রমশ সংক্রামিত হয়ে পড়ছে চেতনায়। প্রকৃতিলোকে এই সব পরিবর্তন তাঁর বোধ-বুদ্ধি অনুভবের অগোচরে গাছ থেকে রস গড়িয়ে পড়ার মতো ঘটে যায় নিঃশব্দে ; তাঁর দিন ও রাত্রি ও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান তা রচিত হয় শুধু ঘড়ির কাঁটার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। বহু দিন পরে এবং হঠাৎ দেখা বলেই সম্ভবত আসন্ন সন্ধ্যার থমথমে মুহূর্তটি কেমন ইঙ্গিতবহ মনে হয়। আকস্মিকভাবে মনে পড়ে নিজের বয়সের কথা। ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন, এই দীর্ঘ দূরত্ব তিনি পেরিয়ে এসেছেন দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত, মেল ট্রেনের গতিতে, বিরামহীন অস্থিরতা নিয়ে—কোনো অলসতম মুহূর্তেও পিছনে তাকানোর সুযোগ হয়নি। বয়স তাঁকে কী দিয়েছে ! অভিজ্ঞতা ? বিত্ত, সংসার, খ্যাতি ? হয়তো। কিন্তু, কী প্রয়োজন ছিল এসবের ! বা, প্রয়োজন থাকলেও, ইত্যাকার পার্থিব প্রাপ্তির মধ্যে তাঁর গ্রহণের অংশ কতোটুকু ?

ভাবতে ভাবতে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো রামতনুর। চেতনা ও অবচেতনার অদ্ভুত এক অনুভবের মধ্যে নিজেকে উপস্থাপিত দেখলেন তিনি, যেখানে সব প্রাপ্তিই অর্থহীন, যেখানে পরিচিত প্রতিটি মুখই প্রত্যাশায় কাতর এবং সবই নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতা দিয়ে ঘেরা।

পোশাক বদলে ফিরে এসেছিল নীরা। ওর পরনের গাঢ় লাল রঙের শাড়ি, কনুই পর্যন্ত শাদা ব্লাউজের হাতা, মসৃণ, মার্জিত মুখ ও দামী শরীরের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকলেন রামতনু। তারতম্যহীন দৃষ্টি, মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মানুষ যেভাবে অন্ধকারের দিকে তাকায়। ভিতরের অবসাদ তাঁকে ক্রমশ ক্লান্ত করছিল। চিন্তা থেকে বয়সের ভার নামাতে সময় লাগল। পরে, সামলে নিয়ে বললেন, 'চলো।'

গাড়িতে ওঠার পরও অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকলেন রামতনু। হাতে স্টিয়ারিং, পাশে নীরা। এক ফুট দূরত্বে থেকে নীরার শরীরের প্রচণ্ড সুগন্ধ তাঁকে আচ্ছন্ন করছে, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের ভিতর, এই অবস্থায় প্রাণপণে নিজেকে শক্ত রেখে উদ্দেশ্যহীন এগিয়ে চললেন তিনি। প্রথমে তাঁর গাড়ি গেল ময়দানের দিকে, অকারণেই আবার পথ পরিবর্তন করলেন—সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে সোজা। এতোক্ষণে সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমেছে, আলোকিত চতুর্দিক ; ট্রাফিক সিগন্যাল ছাড়া সম্মুখে আর কিছুই অস্তিত্বময় নয়।

বিবেকানন্দ রোড়ের মুখে এসে থামতে হলো। জ্যাম। সামনে, পিছনে, পাশাপাশি অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। রামতনু দম নিলেন। হঠাৎ খেয়াল হলো অনেকক্ষণ ধূমপান করেননি, গলা শুকিয়ে আসছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে দেশলাইটা এগিয়ে দিলেন নীরার হাতে।

'জ্বালতে পারো ?'

পরপর দুটো কাঠি নষ্ট করল নীরা। তৃতীয় কাঠিটা কোনো রকমে জ্বেলে এগিয়ে ধরল ঠোঁটের কাছে। আগুন টেনে গলাভর্তি ধোঁয়া ছাড়লেন রামতনু। নীরাকে দেখলেন। নীরার মুখ হতচকিত, একটু বা বিব্রত।

'কী হলো! আর ইউ ফিলিং বোর্‌ড ?'

'ন্‌-না', নীরা তার বাঁ দিকে তাকাল, তারপর অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'ওই গাড়ির ভদ্রলোককে চেনেন ? অনেকক্ষণ থেকে ওয়াচ করছেন আপনাকে ?'

নীরার কথা অনুসরণ করে চোখ ফেরালেন রামতনু। পিছনে তখন হর্ন বাজতে শুরু করেছে, ট্রাফিক চালু হয়েছে। নীরা যে-গাড়ির কথা বলল, সেটি তখন এগিয়ে গেছে। ব্যস্ততার মধ্যে তবু নির্দিষ্ট লোকটির মুখ দেখার চেষ্টা করলেন রামতনু। মাথার পিছন ও ঘাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। রামতনু স্টার্ট নেবার আগেই গাড়িটা অনেক দূর এগিয়ে গেল।

'হতে পারে চেনা কেউ—'

রামতনু গা করলেন না। ডান দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে যেতে যেতে অতর্কিতে বাঁ হাতে নীরার একটা হাত ধরলেন, মৃদু চাপ দিয়ে কাছে টানার মতো করে টানলেন। নীরা একটু কাঁপল যেন, রামতনুর মুঠোর ভিতর ওর হাত শক্ত হলো। রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় নীরার মুখ-চোখ লক্ষ করার চেষ্টা করলেন তিনি। কোনো ভারান্তর চোখে পড়ল না।

হাতটা ছেড়ে দিলেন রামতনু। গাড়ির গতি স্লো করলেন। এখন সামনে অনেকগুলি রাস্তা, তিনি কোন দিকে যাবেন!

মাঝপথেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আবার পুরনো পথ ধরলেন রামতনু।

নীরা যেমন চুপচাপ ছিল তেমনিই থাকল। রামতনু বললেন, 'আজ ভেবেছিলাম তোমাকে কিছু বলব। এখন দেখছি, বলার কিছু নেই—'

কথাটা এমনই আকস্মিক যে নীরা অবাক না হয়ে পারল না। ধীর গলায় বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—'

'স্বাভাবিক।' রামতনু হাসলেন, 'আমার—আমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা কোরো। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। তা ছাড়া, এখনো তুমি আমাকে ভালোভাবে চেনো না। আমাকে ক্ষমা করতে অসুবিধে হবে না।'

নীরা যেন খুব অস্বস্তি বোধ করছে। একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর হাত বাড়িয়ে হঠাৎ রামতনুর হাত স্পর্শ করল।

'আপনার কিছু হয়েছে। কী হয়েছে, আমাকে বলুন—'

'লাভ কী!' অন্ধকারে বিষণ্ণ হাসলেন রামতনু। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'কখনো কখনো বয়সটা বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায় ; মানুষকে বোঝা যায় না।' রামতনু থামলেন, কিছু ভাবলেন যেন। আবার বললেন,'আমি কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গ পেতে চেয়েছিলাম। নাউ আই ফিল্‌ হ্যাপি।'

নীরা জবাব দিল না। অন্ধকারে কব্জি তুলে সময় দেখল ঘড়িতে।

'তোমার নিশ্চয় খুব দেরি হয়ে গেল!'

নীরা মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি তাড়া আছে?'

'কেন?'

'এখন আমরা কোথাও বসতে পারি। ইউ মে লাভ টু হ্যাভ এ কাপল অফ ড্রিঙ্কস্?'

'নো, থ্যাঙ্ক ইউ।' আলতোভাবে নীরার পিঠে হাত রাখলেন রামতনু, 'বরং কফি খাওয়া যেতে পারে—'

সিটের পিছনে গা এলিয়ে দিল নীরা। ওর চুলের গন্ধ, শরীরের গন্ধ রামতনুর নাকে লাগছিল। বুক ভরে ঘ্রাণ নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে গাড়ির মুখ ফেরালেন রামতনু।

॥ আট ॥

সত্যিই কি নীরা কোনো সমস্যা! সুস্থ মাথায় এসব চিন্তা করলে মনেই হয় না এই রকম একটা ব্যাপার বিব্রত করছে তাঁকে, কেড়ে নিচ্ছে তাঁর দিনরাতের সমস্ত উদ্যম। তখন হাসি পায়। হাসতে হাসতেই বিভিন্ন স্মৃতির মধ্যে দিয়ে আনাগোনা করেন রামতনু—মনে পড়ে সেই সব দিন, যখন তাঁর বয়স ছিল, স্বাস্থ্য ও যৌবন ছিল, ছিল ব্যক্তিগত ও জোরালো অন্যান্য গুণ, যা দিয়ে সহজেই মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা যায়। আকর্ষণও যে করেননি তা নয়; কিন্তু, নিজে কি কাতর হয়েছেন কখনো! মনে পড়ে না।

যে-বয়সে আকর্ষণ কাজ করে চুম্বকের মতো, প্রায় সেই বয়সেই এসেছিল মৃদুলা। রামতনু তখন চব্বিশ বছরের যুবক, সদ্য এম. এ. পাশ করে অধ্যাপনার চাকরি নিয়েছেন। সেই সঙ্গে চলছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার তোড়জোড়। এরই কিছু দিন আগে মারা গেছেন মা। মার মৃত্যুর পর প্রায় বছর দুয়েক একটা ঠাণ্ডা শূন্যতাবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত সারাক্ষণ; প্রত্যক্ষ স্নেহের সংস্পর্শ সত্ত্বেও বাবাকে মনে হতো অনেক দূরের মানুষ; কলেজ আর নিজের পড়াশুনো দুটোকেই মনে হতো অর্থহীন ভারের মতো। প্রবাহহীন, একপেশে জীবন! এক এক সময় অসহ্য লাগত, ইচ্ছে করত যা আছে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। এখন মনে হয় নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করার, নিজের ওপর অভিমান করার জন্যে ওই চব্বিশ বছর বয়সটা আদর্শ।

সম্ভবত মার মৃত্যুই রামতনু সম্পর্কে বাবাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। বেশি বয়সের ও একমাত্র সন্তান সম্পর্কে একটা কিছু করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এই সময়, প্রায় একই সঙ্গে, দু'টি ঘটনা রামতনুর জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন এনে দিল। এক, বিয়ে; দুই, তাঁর জীবিকার পরিবর্তন।

মৃদুলা এলো ছোট সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে। তখন কতো আর বয়স তার, ষোল কি সতেরো, সদ্য-অতিক্রান্ত কৈশোরের মানসিকতা কাটেনি তখনো। বাবার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে, কুচবিহার থেকে নিজেই দেখেশুনে মৃদুলাকে ঘরে এনেছিলেন বাবা। তখনকার হিসেবে স্বচ্ছন্দে সুন্দরী বলা যেত মৃদুলাকে—অদ্ভুত শান্ত আর নম্র, প্রায় চাঞ্চল্যহীন, পুতুল

যেন। মনে পড়ে বিয়ের পরেও বহু দিন পর্যন্ত মৃদুলা তার বাবা, মা ও কুচবিহারের পরিবেশের জন্যে কান্না জমিয়ে রাখত। সুবীর না জন্মানো পর্যন্ত তার সেই অভিমান যায়নি।

পুঁথিবদ্ধ অধ্যাপনার কাজে ইতিমধ্যেই ক্লান্তি এসেছিল রামতনুর। চাইছিলেন এমন একটা কিছু—একটা পরিবর্তন, যা আরো উত্তেজক, যার মধ্যে উৎসাহ আরো বেশি ; নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও যেখানে আরো বেশি উপার্জনক্ষম হওয়া যায়। তখনো এ-দেশে বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ ব্যবসার চল হয়নি তেমন ; এ-বিষয়ে রামতনুর নিজের ধারণাও ছিল ভাসাভাসা, অস্বচ্ছ। তবু, নিতান্তই অন্য কিছু করার ঝোঁকে, কাগজে স্টারলেট অ্যাডভার্টাইজিংয়ের বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করলেন তিনি। চাকরিটা হয়ে গেল। কাজ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, অর্থ—হ্যাঁ, সবই পাওয়া গেল ঠিকঠাক ; তবু এতোটাও কি আশা করেছিলেন! কোনো দিন ভাবেননি, চাকরি তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে এমনভাবে! কার্যত তাই হলো। এক একটি বছর কাটতে লাগল উল্কার বেগে। আর বছর তিনেকের মধ্যেই মৃত্যু হলো বাবার। রামতনু ততো দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত! সংসার মৃদুলার হাতে। ততো দিনে শ্যামলীও এসে গেছে।

মৃদুলা কি বলতে পারবে, এই দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে কখনো, কোনো এক মুহূর্তের জন্যেও দায়িত্বহীন হয়েছেন রামতনু! আজকের সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা তো তাঁদের যৌথ চেষ্টারই ফল! মৃদুলা কি তা অস্বীকার করবে!

সামান্য ধাক্কা খেলেন রামতনু। বিষয়টা মৃদুলার স্বীকার করা না-করা নিয়ে নয়। একটু বা অন্য ধরনের, রামতনুর নিজের অভিজ্ঞতাতেও যার কোনো পূর্বস্মৃতি নেই। প্রত্যক্ষভাবে কেউ কিছু না বললেও রামতনুর বুঝতে ভুল হয়নি, সেদিন রাতে বাড়িজোড়া স্তব্ধতার মূলে ছিল নীরা ; নীরার ফোন করার ব্যাপারটাকে এমনকি মৃদুলাও খুব খুশি মনে নিতে পারেনি। কেন তা বোঝা দুরূহ ; অনেক ভেবেও সম্ভাব্য কোনো কারণ খুঁজে পান না রামতনু। বয়স যতো বাড়ে ততোই ফিকে হয়ে আসে পারস্পরিক সম্পর্কের রহস্য ; শীতের নদীর মতো—দুই তীর যতো নিকটবর্তী হয় পরস্পরের, ততোই কমে আসে জল, জলের গভীরতা। একদিন তাঁর পৃথিবী ছিল মৃদুলাময় ; এখন, এই তিরিশ বছরে, মৃদুলার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আরো নানা সম্পর্ক—সন্তান, গৃহসুখ, সচ্ছলতা, আরো দূর এগিয়ে যাবার চিন্তা। কতো দূর, তা রামতনুও জানেন না। কোনো দিন জানবার চেষ্টা করেননি। নিশ্চিত বহু দূর। বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু মনে পড়ে যাত্রার শুরুতে মৃদুলাও ছিল তাঁর সঙ্গে। এখন আর কোথাও আলাদা করে খুঁজে পান না তাকে।

তাহলে! এমন কি হতে পারে, দূরত্ব থেকে আরো দূরত্বে যেতে যেতে রামতনু সম্পর্কে মৃদুলা তার পুরনো জোর হারিয়ে ফেলেছে!

বুদ্ধি দিয়ে এর কোনো হদিশ মেলে না। সঙ্কল্পহীন একটা অনিশ্চয়তা জন্ম নেয় বুকে। এই কি সেই রামতনু সোম, প্রখর আত্মবিশ্বাস নিয়ে এতোকাল যিনি গ্লানিকর সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই করেছেন তুচ্ছ, আত্মজিজ্ঞাসায় নিরুপায় হয়ে ওঠেননি কোনো দিন! এ-প্রশ্ন তাঁর নিজের কাছে নিজের। এটা এমনই একটা ব্যাপার যা থেকে মুক্তি পেতে হলে নিঃশেষে হাত পাততে হয় নিজেরই কাছে।

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস জড়িয়ে যায় রামতনুর। অ্যাশট্রের ওপর রাখা সিগারেটটা তুলে নেন ছন্দহীন দু' আঙুলে। আকারে একই আছে প্রায়, টানতে গিয়ে খেয়াল হলো আগুন নিবে

গেছে। অল্প বিরক্তি নিয়ে সিগারেটটা গুঁজে রাখলেন অ্যাশট্রের ভিতর। আর একটা ধরিয়ে নিলেন। দেশলাইটা যতোক্ষণ জ্বলে প্রায় ততোক্ষণই হাত কাঁপে রামতনুর, শিখার আঁচ লাগে নখে—তাড়াতাড়ি ধোঁয়া গিলে নিজের মনেই হেসে ওঠেন তিনি। মনে পড়ে 'ডোণ্ট বার্ন্‌ ইওর ফিংগার্‌স্‌', সহকর্মীদের উপদেশ দেবার ছলে এটা তাঁর প্রিয় কথা।

অবসাদের ভাবটা এতদ্‌সত্ত্বেও কাটল না। চোখের সামনে দর্পণ ধরা হলে এখন তিনি চকিত হাসির অর্থটুকু ধরতে পারতেন। অবিকল দুঃখী মানুষের মতো মুখ ; অভ্যস্ত হতে হতে একসময় যেমন দুঃখটাই আশ্রয় বলে মনে হয়, পূর্বাপর কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না অন্যতর আশ্রয়, তেমনি, দুঃখ বা অভিমান সবই যেন তাঁর রক্তে মিশে যাচ্ছে ক্রমশ।

রামতনু সময় দেখলেন। এগারোটা দশ। তার মানে প্রায় আধঘণ্টার ওপর আত্মচিন্তায় বিভোর হয়েছিলেন তিনি। আজ এই সময়টুকু যেন তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। না হলে গতানুগতিকভাবে এসে যেত ফোনের পর ফোন, অফিসের ভিতরেও কেউ-না-কেউ জরুরী কাজ নিয়ে আবির্ভূত হতো। এই তাঁর প্রাত্যহিক কর্মসূচী। একটা সময় ছিল—ঠিক কবে, কতো দিন আগে মনে পড়ে না, যখন তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন নিজের কর্মসূচী। দিনে দিনে প্রায় অগোচরে বদলে গেল তাঁর ভূমিকা, এখন শুধু কাজ, কাজ, দয়ামায়াহীন কাজই নিয়ন্ত্রণ করে তাঁকে। এর মধ্যে নিজের দিকে তাকানোর সময় কোথায় !

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল মিটিং ছিল সকালে; এই ঘরেই ; অপারেটর জানে বিশেষ জরুরী কল না হলে এইসময় তাঁকে লাইন দেওয়া যাবে না। জানে তেমন তেমন প্রয়োজন হলে পি. এ-ই সাড়া দেবে। মিটিং শেষ হবার পর সাধারণত তিনি পুনর্ব্যবস্থায় ফিরে আসেন। অন্যমনস্কতায় আজ কোনো খবর দিতেও ভুলে গেছেন !

জোরে টান দিলে সিগারেটের ধোঁয়া গলা বেয়ে নেমে যায় অনেক দূর অবধি ; অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারেন তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে নাভিমণ্ডল জুড়ে। স্নায়ু সঞ্জীবিত হচ্ছে আবার। এতোক্ষণ এলিয়ে বসেছিলেন চেয়ারে ; সোজা হয়ে, শ্যামলীর চিঠিটা তুলে নিলেন নিজের হাতে। সকালের ডাকে এসেছে চিঠিটা। তখন খুলে, শ্যামলীর চিঠি লক্ষ করেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—কথাগুলো লক্ষ করেননি। অতর্কিতে হানা দিয়েছিল সেই দিনটি, যেদিন শ্যামলী, অংশুরা চলে গেল। তারপর চিন্তাগুলো এলো একটা অন্যটাকে অতিক্রম করে—যেন অন্ধকার হাউসের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে সকলেরই বেরুনোর তাড়া, আগে পরের ধারাবাহিকতা নেই।

চিঠিটা পড়তে পড়তে হাসলেন রামতনু। 'বাবা, তুমি যেন কেমন বদলে গেছ,' লিখেছে শ্যামলী, 'যেন ঠিক আগের মতো নেই ! এবার তোমাকে দেখে মনে হলো পৃথিবীর যতো কাজ যেন তোমার ওপরেই চাপানো হয়েছে, যেন তুমি ছাড়া আর কেউ কাজ করতে পারে না ! তাই দু' দিনের জন্যে বাড়ি গেলে দু'দণ্ড কথা বলার সময় পাও না—'

এই পর্যন্ত এসে থামলেন রামতনু। হাসিটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত মুখে, শেষ দুপুরের গাছের ছায়ার মতো। বড়ো অভিমানী মেয়ে তাঁর শ্যামলী ! ছাব্বিশ বছরের যুবতী শ্যামলীর চিঠির ভাষা থেকে যেন তিন বছরের ছোট্ট, ইজের-পরা শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন রামতনু—অফিস থেকে ফিরতে দেরি হলে যে চোখে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো দরজার কোণে, তারপরেই তাঁব বাড়ানো দু' হাত ধরে উঠে আসতো কোলে, আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিত ! তখন প্রতিটি দেরির জন্যেই কৈফিয়ত তৈরি রাখতে হতো তাঁকে। সুবীর

বরাবরই মা-ঘেঁসা, শান্তনুও প্রায় তাই ; শ্যামলীর যতো প্রয়োজন সব বাবাকে নিয়ে। এমনকি বড়ো হয়ে শাড়ি পরার বয়সেও তার সে-আহ্লাদ যায়নি। বাবা, বাবা, বাবা ! মৃদুলা এ নিয়ে কম তিরস্কার করেনি ; রামতনু গায়ে মাখতেন না, 'আহা, থাক। মেয়ে তো ! দু' দিন বাদেই তো চলে যাবে !' মৃদুলা বলত, 'সেই জন্যেই বলা !'

সে-সব দিন এখন কোথায় !

বাল্‌বের ছিঁড়ে-যাওয়া তারের মতো অস্পষ্ট কিছু একটা দুলে গেল রামতনুর বুকে। চিঠিটা শেষ পর্যন্ত না পড়েই ভাঁজ করে তুলে রাখলেন পকেটে। টেলিফোন বাজছে। আর নয় ; এখন তাঁকে বর্তমানে ফিরে আসতেই হবে।

'হ্যালো' বলতেই উত্তর এলো, 'হোল্ড'ন প্লিজ। ট্রাঙ্ককল ফর ইউ।' রামতনু রিসিভ করলেন। দিল্লি থেকে, নায়ার। প্রথমেই প্রশ্ন, বনিবেব্ ক্যাম্পেনের কাজ ঠিকঠাক চলছে তো ? এটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, রামতনু ভাবলেন, কাজটার দায়িত্ব যখন নিজেই নিয়েছেন তিনি, সুষ্ঠুভাবে ও সময়ে গুছিয়ে তোলার দায়িত্বও তাঁর। আশ্বস্ত করলেন নায়ারকে, চিন্তিত হবার কিছু নেই, কাজ ঠিকই চলছে। প্রয়োজনীয় কথাটা জানলেন পরে। প্রেজেনটেসানের তারিখ ছিল সাতাশে, হুইট্‌নার সেটাকে পঁচিশে রাখতে চায়। তখনই কোনো জবাব দিতে পারলেন না রামতনু। নায়ারকে বললেন, আজই কন্‌ফার্ম করবেন, পরে। নায়ার বলল, প্রেজেনটেসানে কে কে উপস্থিত থাকবেন সেটাও ওরা জানতে চায়। রামতনু কথা দিলেন কালকের মধ্যেই সমস্ত বিষয়টা তাকে জানানো হবে।

'ডিসগাস্টিং !' রিসিভার রেখে অল্প ভাবলেন রামতনু। ঈষৎ বিরক্তির সঞ্চার হলো মনে।

এ-ধরনের কাজে দু' দিন অনেকটা সময় ; পুরো সময় থেকে দুটো দিন বাদ দিলে অনেকটাই যায়। টোটাল কাজের জন্যে এমনিতেই যে-সময় দরকার তার চেয়ে অনেক কম সময়ে কাজ হচ্ছে। গোড়াতেই যে ব্যাপারটা তাঁর মাথায় আসেনি তা নয় ; কিন্তু, কথা দিতেই হলো ওদের, না দিয়ে উপায় ছিল না। তখন যে-কোনোভাবে অ্যাকাউন্টটা পাওয়াই ছিল বড়ো কথা।

আর কিছুর জন্যে নয়, অসুবিধে ক্রিয়েটিভ কাজ নিয়ে। চিফ্ আর্ট ডিরেক্টর নয়ন সাধুখাঁ শুরুতেই আপত্তি জানিয়ে আরো কিছু দিন সময় চেয়েছিল, এতোগুলো আইটেম মাত্র আট ন' দিনে শেষ করা প্রায় অবাস্তব ব্যাপার। তার পরেও আছে স্লাইড রেডি করার ঝামেলা। শুধুমাত্র রামতনুর কথাতেই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল সাধুখাঁ। এখন আরো দু' দিন সময়ও কেড়ে নিতে হবে !

রামতনু এসব অসুবিধে বোঝেন। বাঁধা মক্কেলদের ক্ষেত্রে কখনোই তিনি এ-রকম ঝুঁকি নেন না। এখানে প্রয়োজনটা অন্য ধরনের এবং আবশ্যিক ; শরীরের লজ্জাকর ক্ষত গোপন করার মতো প্রয়োজনটাকে আড়াল করে রেখেছেন তিনি। রাখতে হবে। বিবেক দাঁত বসালেও হবে।

দীর্ঘ তিরিশ বছরের কর্মজীবনে কাজ নিয়ে এমন অসুবিধায় কমই পড়তে হয়েছে। নায়ার জানলেও, এ-ব্যাপারে দংশন যেটুকু তাঁকে একাই সহ্য করতে হবে। বিষয়টা নিয়ে এ ক'দিন মনে মনে অনেক ভেবেছেন ; মাঝে মাঝে মনে হয়েছে নীতি বিসর্জন দিয়ে নতুন ব্যবসাটা পাওয়া কি সত্যিই জরুরী ছিল ! এই কি রামতনু সোমের অনুরূপ কাজ ! এর চেয়ে ভালো হতো যদি ফিডারের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন তিনি ; এ-ব্যাপারে

তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য চাইতেন। সম্ভবত নিরাশ করতেন না তিনি। অন্তত প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকত, হুইট্‌নারের খামখেয়ালিপনার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া যেত। আর যদি এমনই হতো যে বনিবেব্-এর অ্যাকাউন্টটা সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে গেল, তাতেও কি কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল! এই প্রতিষ্ঠান প্রায় তাঁর নিজের উদ্যমে সৃষ্টি ; গত কয়েক বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্টই এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সাক্ষ্য—এর ভিত্ সহজে আল্‌গা হবার নয়। একটা কি দুটো অ্যাকাউন্ট পাওয়া, না-পাওয়া বা হারানোর ওপরেই কি নির্ভর করছে এর ভবিষ্যৎ। তাছাড়া, যৌবনকাল থেকেই কি তিনি উত্থান-পতন-নির্ভর উন্নতিতে বিশ্বাস করেননি!

ভাবতে গেলে এখন অনেক কথাই মনে হয়। সঙ্কুচিত হয়ে আসে স্মৃতি। ভূল, এটা ভুল ; জেদের বশে সেদিন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আজ তার জন্যে অনুতাপ বোধ করলেন রামতনু। এখন ফেরার পথও বন্ধ। আর, এক একটা ভ্রান্তি ও অসাবধানতার মজাই হলো এই যে ভিতরে ভিতরে আরো বহু দূর পর্যন্ত জের টানতে হয় তাদের, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে ওঠে বৃত্তাকার ধাঁধার মতো—বারবার ফিরে আসতে হয় সেই একই ভুলে, একই জায়গায়! বেরুনো যায় না।

এ নিয়ে নির্মলের সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। একবার ভাবলেন ঘরে ডাকবেন তাকে। মত পরিবর্তন করে ফোন তুললেন।

'নির্মল ?'

'ইয়েস, আর. এস.—'

'আর ইউ ফ্রি ?'

নির্মল একটু দ্বিধা করল যেন। তারপর বলল, 'আমি আসব ?'

'একটা ব্যাপারে ডিসকাস করার ছিল। আমিই আসছি।'

'ও-কে.।'

তেষ্টা পাচ্ছিল। ক্লান্তির জন্যেই সম্ভবত আজ তাঁর শরীর জুড়ে অস্বস্তি। এক নিঃশ্বাসে পুরো এক গ্লাস জল শেষ করলেন রামতনু, কিছুটা আরাম লাগল। এই রকম সময়ে বয়স মনে পড়ে। দু' যুগেরও বেশি দিন ধরে বিরামহীন পরিশ্রম করেছেন তিনি, এখনো করে যাচ্ছেন। স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়লেও, যাকে ক্লেশ বলে, বা অসুস্থতা, কখনো তা অনুভব করেননি। বছর পাঁচেক আগে ছোট একটা অপারেসান হয়েছিল, প্রায় দু'সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল নার্সিংহোমে ; সেই সময় কিছু দিন ছাড়া ছুটি নেননি আর কখনো। ছুটি মানেই তো মৃত্যু, নিজের স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তা থেকে ভাবতেন এক সময়ে, রামতনু সোম আর ছুটি আর বিশ্রাম—এরা কি পরস্পরের শত্রু নয়! বিশ্রাম নেবার অর্থ সেই অবধারিতকে মেনে নেওয়া ; তুমি ক্লান্ত, তুমি অশক্ত, দৌড় শেষ না হতেই থেমে পড়েছ! আসলে তা নয়। কাজই তাঁর অভ্যাস, নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যেই সহজ হয়ে থাকে নিঃশ্বাস। কিন্তু, গত কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছে বয়স হয়েছে, শরীর নিচ্ছে না আর। শুধু তাই নয়, মেজাজও আর তারতম্যহীন থাকছে না—অল্পেই রাগ হয়, কাজকর্ম বা কথাবার্তার একটু এদিক ওদিক হলেই বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে মনে। খানিক আগে নায়ারের ট্রাঙ্ককল পেয়ে যা হয়েছিল। অথচ, সত্যি কথাটা এই, নায়ার তো নিজের স্বার্থে কিছু করেনি!

অবেলায় বিমর্ষ বোধ করলেন রামতনু। 'ইট্‌স্ বেটার টু লিভ ইন ফ্যাক্ট্‌স্ দ্যান টু কন্‌সিল দেম'; লুৎসের ডক্টর ব্যানার্জি সেদিন বলেছিলেন, 'শিশু হওয়াটা যদি দোষের না

হয়, যুবক হওয়াটা যদি দোষের না হয়, তাহলে বুড়ো হওয়াটাই বা দোষের কেন ভাই। মৃত্যুভয় ? একবার মরে গেলে তো সেটাও থাকে না। তবে বাঁচার ইচ্ছে থাকলে সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভালো। দেখুন না পঞ্চাশে এসে এক বেলা খাওয়া ছেড়েছি, ষাটে এসে উইক্-এণ্ড হ্যাবিটস্ ছাড়লুম। আই ডোণ্ট ওয়ার্ক্ হোয়েন আই ফিল ব্যাড্। বিশ্রামের দরকার আছে, মশাই ; না চাইলেও আছে—'

ঠিক এভাবে না বললেও, একই কথা মৃদুলাও বলে। হয়তো ঠিকই বলে। হয়তো এবার তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে।

নির্মলের চেম্বারের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন রামতনু। নীরা বেরুচ্ছে। ফোন করার সময় সম্ভবত সে নির্মলের সঙ্গেই ছিল, তিনি আসছেন শুনে নির্মল তাকে সরিয়ে দিল। সেদিন সন্ধ্যার পর আর একদিনই দেখা হয়েছে নীরার সঙ্গে—ওর জয়েন করার দিন। নিতান্তই সৌজন্যের ব্যাপার, সামান্য দু' চারটে আলাপের পর নির্মলের হাতে ওকে সঁপে দিয়েছিলেন রামতনু। তারপর আজ। এখন এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

'কেমন লাগছে স্টারলেট ? স্বাভাবিক হাসি হেসে এইভাবেই শুরু করলেন রামতনু। 'খুব ওল্ড্ ফ্যাশানড্ ?'

'না, তা কেন !'

'কেউ কেউ তো তাই বলে শুনি। বোধ হয় তারা আমার সঙ্গে স্টারলেটকেও গুলিয়ে ফেলে !'

নীরার মুখে আরম্ভের আড়ষ্টতা নেই। সহজভাবে হেসে বলল, 'কিন্তু, আপনি তো বুড়ো নন—'

আরো কিছু হয়তো বলত, রামতনু থামিয়ে দিলেন। তাঁর কাজ আছে।

'ডোণ্ট আস্ক্ মি টু ডিসিভ মাইসেল্ফ্, প্লিজ্ !' হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমার মনে হয় এখানে তোমার ভালোই লাগবে—'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'গুড্।'

এতো তৎপরতা সত্ত্বেও চাঞ্চল্য লুকোতে পারলেন না রামতনু। ক্রমশ সরব হলো হৃৎপিণ্ড। আর একটু দাঁড়ালেই নীরা তাঁর কপালে ঘামের রেখা দেখতে পেত।

নির্মল অপেক্ষা করছিল। নায়ারের কথা বলে সোজাসুজি বনিবেব্ প্রসঙ্গে চলে এলেন রামতনু। ওরা দু' দিন আগে করতে চাইছে, আর হুইট্নারের সঙ্গে এটাই যখন আমাদের প্রথম কাজ, রামতনু বললেন, 'আমার মনে হয় এটা করা উচিত।'

নির্মল সায় দিল। ওর স্বভাবের একটা গুণ, যতো কথা বলে তার চেয়ে বেশি ভাবে। বলল, 'আপনি কি সাধুখাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলছেন ?'

'সম্ভব কি না সেটাও একবার ভাবা দরকার।'

'ঠিক।' একটু ভেবে বলল নির্মল, 'দেখি কী করা যায়।'

'তাহলে নায়ারকে ডিসিসানটা জানিয়ে দিই ?'

'হ্যাঁ।'

রামতনু বেরিয়ে এলেন। আপাতত আর কিছু ভাববার নেই। নির্মল দায়িত্ব নিয়েছে, উপায়ও নিশ্চয় একটা খুঁজে বার করবে। তবু অল্প ইতস্তত করলেন তিনি। আবার ফিরে গিয়ে বললেন, 'একটা সাজেসান চাই, নির্মল—'

'কী ?'

'দরকার হলে নীরাকেও ইনভল্‌ভ্‌ করতে পারো। সি ইজ দি পার্সন হু নোজ। তুমি অবশ্য আগেই বলেছিলে—'

'ও-কে, স্যার।' চাপা ঠোঁটে হাসল নির্মল। 'নীরা এসেছিল এইমাত্র। ওরও ইচ্ছে বনিবেব্‌ অ্যাকাউন্টে কাজ করে। আমি আপনাকে বলতাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ—'

নির্মলের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার সময় অনেকটা হাল্‌কা লাগছিল নিজেকে, অনেক দূর হেঁটে অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছুনোর মতো, এমনকি শরীরেও একটা নিশ্চিন্ত ভাব ছড়িয়ে পড়ছিল। যেন নীরাকে নিয়ে যে-বিড়ম্বনা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল তাঁকে, তা থেকে মুক্তি পাবার এটাও একটা উপায় ! নায়ারের ট্রাঙ্ককল্‌ পাবার পর থেকে আর একটা চিন্তাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল ক্রমশ : বনিবেব্‌-এর কাজে নীরাও জড়িত থাক এটা কি হুইট্‌নারও চাইবে না ! থাক, অন্তত কিছু দিন থাক, রামতনু ভাবলেন, সকলের কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ-রকমই চলুক। তারপর দেখা যাবে। আপাতত কোনো একটা জায়গায় এসে থামা দরকার।

বেলা বাড়ছিল। সাময়িক স্বস্তি সত্ত্বেও রামতনু বুঝতে পারছিলেন দুরূহ ক্লান্তি আজ তাঁকে অন্য কিছু করার থেকে বিরত রাখছে। এ কি বয়সের ভার ! এ কি অতিরিক্ত পরিশ্রমের দায় ! শুধু আজ বলে নয়, ক'দিন থেকেই এ-রকম হচ্ছে তাঁর—মন প্রস্তুত থাকলেও শরীর থেকে আর কোনো উৎসাহ পাচ্ছেন না। মনও কি ভালো আছে ! কেন এই ক্লান্তি আর রক্তে নিরুপায় হয়ে ওঠা—নিজের কাছেও তার কোনো পরিষ্কার উত্তর নেই। আস্তে আস্তে চুলের ভিতর আঙুল টানলেন রামতনু। যৌবনের শেষ দিকে, মনে পড়ে, একবার গিয়েছিলেন নীলগিরি বেড়াতে। সঙ্গে মৃদুলাও ছিল। তখন তাঁর স্বাস্থ্য অটুট, তেমনি আত্মবিশ্বাস—সেই নির্ভরতা নিয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন একটা পাহাড়ে। ঠিক পাহাড়ও হয়তো বলা যাবে না, টিলার মতো। অনেক উঁচু পর্যন্ত ওঠার পর মনে হলো লক্ষ্য তখনো অনেক দূরে, ক্রমশ অক্ষমতা জানান দিচ্ছে পায়ে, সমস্ত শরীরে। এমনও মনে হলো পাহাড়ের অভ্যন্তরে কোথাও শুরু হয়েছে অদ্ভুত এক প্রকম্পন, তাঁর পা ও মাথা টলছে। না, আর ওঠা নয় ; তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার নামতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামতে শুরু করলেন তিনি ; একটু বা দ্রুত, ভীতিকর একটা অস্বস্তি তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাঁকে। সূর্য তখন হেলতে শুরু করেছে পশ্চিমে। সূর্যের দিকে পিছন ফিরে থাকার জন্যেই সম্ভবত সামনে, বাঁ দিক ঘেঁসে, দীর্ঘ ছায়া পড়েছিল তাঁর। কখনো লক্ষ করেননি, তবু ছায়াটা হঠাৎ চোখে পড়তেই উপমাহীন বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল মনে। জীবন বড়ো বিচিত্র, হঠাৎ মনে হয়েছিল রামতনুর ; ঠিক বুঝতে পারছিলেন না অবতরণের ভূমিকা কেন এমন কাতর করে তুলছে তাঁকে ! এতো দিন পরে সেই ঘটনা মনে পড়ায় সামান্য বিচলিত বোধ করলেন তিনি। বিষণ্ণ হাসিতে কুঁকড়ে গেল ঠোঁটের কোণ দুটো।

লাঞ্চের আগেই আজ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন রামতনু। বেরুবার আগে পি. এ-কে ডেকে বললেন, 'শরীর ভালো নেই, আজ হয়তো অফিসে ফিরবো না।' একটু সঙ্কোচ হলো। নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করার ঘটনা এর আগে বড়ো একটা ঘটেনি।

জুন শেষ হয়ে এলো। এখন বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে, হাওয়া আছে, রোদ্দুরে তাপ নেই তেমন। এই রকম আবহাওয়া এক রকম তন্ময়তা সৃষ্টি করে মনে। গাড়ির এক কোণে

নিজেকে এলিয়ে দিলেন রামতনু। ঘুম, তাঁর ঘুম পাচ্ছে। হয়তো সত্যিই আজ ফিরতে পারবেন না অফিসে। এখন বাড়ি যাবেন। নিজে থেকে তাঁর এই বিশ্রাম নেবার চেষ্টায় মৃদুলা কি বিচলিত হবে ? হয়তো হবে। কিন্তু, এটা সত্যি, তাঁর বিশ্রামের দরকার। ঘুমের দরকার। একটানা ও নিরবচ্ছিন্ন ঘুমই হয়তো পারে এই ক্লান্তি দূর করতে। এই সব ভাবনায় অন্যমনস্ক হলেন রামতনু। হঠাৎ খেয়াল হলো, শ্যামলীর চিঠিটা তখন পুরো না পড়েই তুলে রেখেছিলেন পকেটে। এখনই সময়, এখনই চিঠিটা তিনি পড়ে ফেলতে পারেন।

॥ নয় ॥

সেদিন বিকেলে নয়। তার পরের দিনও নয়। রামতনু সোমের অভ্যস্ত দিনযাপনে এতো দিনে রীতিমতো ছেদ পড়ল। তেমন কিছু শারীরিক উৎপাত ছিল না, নিতান্তই ক্লান্তিবোধ—তবু ছুটি নিলেন তিনি। ইতিমধ্যে একটা চিন্তাই শুধু উত্তেজিত করছিল মাঝে মাঝে, বনিব্বে-এর কাজ ঠিকঠাক চলছে তো ! এ-প্রশ্ন নায়ারের মুখে শুনে বিরক্ত হয়েছিলেন রামতনু। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর নিজের চিন্তাও তাই ; ভাবতে ভালো লাগে, চিন্তাটা একমাত্র তাঁরই। স্টারলেটের নতুন করে গড়ে ওঠার দিনগুলোয় অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তার দায় প্রায় একাই বহন করেছেন তিনি। এমন একটা সময়ে, যখন পুরনো কর্মকর্তারা বিদায় নিয়েছেন একে একে, মনোমালিন্য হেতু একজন ডিরেক্টর বেরিয়ে গিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করলেন—সঙ্গে সঙ্গে গেল কোম্পানির পুরো ব্যবসার একটা মোটা অংশ। রামতনুর চাকরি-জীবনের প্রায় সন্ধিক্ষণ সেটা ; বিপর্যয় দেখা দিল মূল্যবান হয়ে। যেন এইভাবে, বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নিজেকে, নিজের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন তিনি। অভিজ্ঞতা একসময় পরিণত হয়েছিল অভ্যাসে। এখন কোম্পানি বড়ো হয়েছে অনেক, তাঁকে ঘিরে এখন অনেক দক্ষ লোকের ভিড়, প্রয়োজনে শক্ত হাতে হাল ধরবার লোকের অভাব হবে না। তা সত্ত্বেও ভিতরের একটা আবেগ এসে মাঝে মাঝে যুক্তি আড়াল করে দাঁড়ায়। ভাবতে ভালো লাগে নিজেকে নিজের সংক্ষিপ্ত নামে—এখনো আর. এস-ই স্টার্‌লেটে হিউমে সর্বময়।

সেদিন আর অফিস না গিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নিলেন রামতনু। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটল ঘুমিয়ে। মৃদুলার চোখে এটা ব্যতিক্রম ভিন্ন কিছু নয়। সত্যিই সন্ধিগ্ধ হলো সে ; রামতনুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ঈষৎ চিন্তিতও।

মনে মনে হাসলেন রামতনু। মৃদুলার উদ্বেগ এক রকম প্রাঞ্জলতা এনে দিল মনে। নিষ্পত্র অশত্থের ডালে নতুন পাতা গজানোর মতো—একটা তৃপ্তিকর সুস্বাদ ছড়িয়ে পড়ল শিরায়।

'অফিসের দিনে এমনভাবে অবেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ ! তোমার কি শরীর খারাপ ?' ঘুম থেকে ওঠার পর মৃদুলার এবংবিধ প্রশ্নের ইচ্ছে করেই অন্য রকম উত্তর দিলেন রামতনু, 'তুমিই কি চাওনি, মৃদুলা, আমি বিশ্রাম নিই ?'

'একে কি বিশ্রাম নেওয়া বলে !' অনুযোগ করল মৃদুলা, 'দেখেই তো বুঝতে পারছি তুমি ক্লান্ত।'

‘চিন্তা কোরো না। আমি ভালোই আছি—’

ভালো থাকার প্রমাণ দিলেন রামতনু। গার্হস্থ্য যেসব রীতি তাঁর জীবন থেকে দূরই হয়ে গিয়েছিল প্রায়, আজ বহু দিন পরে আবার তিনি তাদের ফিরিয়ে আনলেন। শুধু কর্তব্যবোধেই নয়, ক'দিনের অশান্তির পর স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় নিজেই প্রেরণা অনুভব করলেন তিনি। সুযোগও এসে গেল।

নিভা আজ বাপের বাড়ি যাবে। দু' দিন থাকবে। মৃদুলার সঙ্গে কথাবার্তাতেই বিষয়টা জানতে পারলেন তিনি। কথা ছিল অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলে সুবীরই পৌঁছে দেবে তাকে ; না হলে নিভা যেন নিজেই চলে যায়। সুবীর ফেরেনি। সন্ধে নাগাদ ফোন এলো সুবীরের, আসতে দেরি হবে। রামতনুর মাথায় আইডিয়া এসে গেল। নিভাকে ডাকলেন তিনি।

‘তুমি কি একাই যাবে ?’

প্রশ্নটা আকস্মিক। নিভা চুপ করে থাকল।

এসব ঘরোয়া ব্যাপারে কোনো দিনই বিশেষ মাথা ঘামান না রামতনু। এমনও হয়েছে অনেক দিন, নিভা বাড়িতে নেই—রামতনু সেটা জানলেন এক বা দু' দিন পরে। সত্যি বলতে, ব্যস্ততা মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রষ্ট করে রাখে তাঁকে ; বাড়ির অন্যান্যদের সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় নির্লিপ্তি বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়। ব্যতিক্রম যেটুকু তা মৃদুলাকে নিয়ে। একান্তে কখনো মনে পড়লে মাঝে মাঝেই ভেবেছেন রামতনু, একত্র রাত্রিবাসের ভূমিকাটুকু না থাকলে হয়তো মৃদুলা সম্পর্কেও তাঁর অনুরূপ ঔদাসীন্য এসে যেত !

নিভা কম কথার মেয়ে, প্রয়োজন ভিন্ন রামতনুর সামনে বড়ো একটা মুখ খোলে না। ক'দিন যেন আরো বেশি চুপচাপ ! ওকে নিরুত্তর দেখে মৃদুলা বলল, ‘রামভরস পৌঁছে দিয়ে আসুক গাড়িতে—’

‘তা কেন !’ রামতনু যেন এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। অনেক দিন যাই না ! তোমার বাবা-মার সঙ্গেও দেখা হবে—’

‘তুমি যাবে, সত্যি !’ মৃদুলা বিশ্বাস করতে পারল না।

রামতনু উঠে দাঁড়ালেন। চশমাটা চোখ থেকে খুলতে খুলতে বললেন, ‘তোমরা আমাকে কী ভাবো ! অসামাজিক !’

মৃদুলা জবাব দিল না। কৌতুক-মেশানো চোখে রামতনুকে লক্ষ করছিল সে। নিভা চুপচাপ থাকলেও ওর মুখের সপ্রতিভতা রামতনুর দৃষ্টি এড়াল না।

খুশিই হলেন রামতনু। এরাই তাঁর প্রত্যক্ষ চিরকালের লোক, ভাবলেন, মৃত্যুর মুহূর্তে, যতোক্ষণ আলো থাকবে চোখে, এদেরই মুখ দেখে যাবেন তিনি।

জলে ভাসমান তেলের আভার মতো বিষয়টা কিছুক্ষণ ভেসে থাকল মাথায়। স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে আকস্মিক গাম্ভীর্যে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি। গাড়ি চালাতে চালাতেও—মৃদুলা তাঁর পাশে, পিছনের সিটে নিভা—চিন্তাটা আচ্ছন্ন করে রাখল। আশেপাশের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শব্দ, মৃদুলার পরনে ঢাকাই শাড়ির গন্ধ, নিভার প্রসাধন থেকে বেরিয়ে আসা এসেন্সের দূরত্বময় সুবাস—এসব দূরে রেখে চলমান ঘড়ির শব্দ ও নিজের শরীরের গন্ধ সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে নিল তাঁকে। হঠাৎ কানে এসে বিঁধল এরোপ্লেনের দুই ডানার মতো তির্যক ও সূচিমুখ দু'টি ধাতব শব্দ, আচ্ছন্নতার মধ্যেই

রামতনুর মনে হলো, এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে জেট বিমানের অবতরণের তীক্ষ্ণ শব্দ শুনছেন। ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে উঠল কপাল। বুকের ভিতর নিঃশ্বাস নির্গমনের পথ রুদ্ধ হয়ে আসছে টের পেলেন তিনি, হঠাৎ অনুভব করলেন তাঁর হাতদুটো যেভাবে থাকার কথা সেইভাবেই আছে—স্টিয়ারিংটা চলে গেছে দূরে, নাগালের বাইরে।

সেই মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। কিন্তু ঘটল না। উল্টো দিক থেকে ছুটে আসা গাড়ির ড্রাইভার সতর্ক ছিল, কিছু অনুমান করে এই সময় মৃদুলাও তীব্রহাতে জানু চেপে ধরল তাঁর ; ঠিক সময়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে নিলেন রামতনু।

'ভয় নেই !' মৃদুলাকে বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্ট হতো না !'

ঠিক এ-কথার কোনো জবাব দিল না মৃদুলা। পরে বলল, 'তোমার শরীর ভালো নেই আমি আগেই বুঝেছিলাম। ড্রাইভারকে নিয়ে এলেই হতো !'

রামতনু কান দিলেন না। নিভার উদ্দেশে বললেন, 'তুমি কি ভয় পেয়েছিলে, নিভা ?'

'না, বাবা—'

'এক কালে আমি খুব র‍্যাশ-ড্রাইভ করতাম। মানে, লোকে তাই বলত। আজ পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্ট করেছি বলে তো মনে পড়ে না ! মৃদুলা, তোমার কিছু মনে পড়ে ?'

মৃদুলা বলল, 'করোনি। কিন্তু, করতে কতোক্ষণ—'

শব্দ করে হাসলেন রামতনু। নিভা বুঝবে না ; কিন্তু মৃদুলার আশঙ্কা তিনি অন্তত বুঝতে পারেন। তিরিশ বছরেও তার স্বভাবের সরলতা যায়নি—মৃদুলার প্রতিটি ভাবনারই আছে দুটো করে দিক, অহঙ্কার ও আশঙ্কায় মেশানো, রামতনু সম্পর্কে সে যেন কখনোই নিঃশঙ্ক হতে পারে না ! কী আশ্চর্য, অপরিবর্তনীয় মানুষের স্বভাব—শামুকের মতো, বেরিয়ে আসার সমস্ত আশ্বাস সত্ত্বেও নিজের আবরণকে কখনোই বিস্মৃত হতে পারে না !

সম্পূর্ণ আত্মস্থতা অর্জন করেও রামতনু ঠিক বুঝতে পারলেন না কী হয়েছিল তাঁর, অপরিচিত কোন শব্দে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল চেতনা, কেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন তিনি ! মৃত্যুভয় ? প্রিয়জন সান্নিধ্যের মধ্যে থেকেও কি আকস্মিকভাবে দুলে উঠেছিল হৃৎপিণ্ড ? এ-রকম মনে হওয়ার তো কোনো কারণ নেই !

বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন নিভাদের বাড়িতে। গত দু' বছরের মধ্যে এই বোধ হয় তৃতীয়বার এ-বাড়িতে এলেন রামতনু। এর মধ্যে একবার নিভার বোনের বিয়েতে, নিতান্তই সামাজিকতা রক্ষার তাগিদে। এবার একেবারেই না জানিয়ে আসা।

মৃদুলা চলে গেল ভিতরে। রামতনু থাকলেন মিস্টার বোসের সঙ্গে। নিভার বাবা। মিতভাষী ভদ্রলোক, ছিলেন সরকারী কাজে, আই. সি. এস., সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। বয়সে রামতনুর থেকে বেশ কিছু বড়ো, চিন্তার দিক থেকেও একটু অন্য রকমের। নানা কারণেই ঈষৎ সম্ভ্রমের দূরত্ব রেখে চলেন রামতনু। অবসরপ্রাপ্তি বোধহয় এক ধরনের বিষণ্ণতা এনে দেয় মনে—আত্মনির্ভরতা হারিয়ে স্মৃতিই তখন হয়ে ওঠে একমাত্র আশ্রয়। মিস্টার বোসের কথাবার্তা ও আচরণে একটা পরিবর্তনের আভাস পেলেন রামতনু। ছেলেরা কেউই সরকারী চাকরি নিল না, এ তাঁর বরাবরের আক্ষেপ। ভদ্রলোকের ধারণা, চাকরি করতে হলে সরকারী চাকরিই ভালো। কেন, এ-প্রশ্নের উত্তরে যা পেলেন তাতে মনে হলো সরকারী চাকরি ও জনহিত দুটোকে তিনি একই বিষয় বলে ভাবেন। এতোটা হলেও চলতো ; কিন্তু, এর পরের প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করলেন রামতনু। ভারতবর্ষের মতো

গরিব দেশে—যেখানে অধিকাংশ লোকেরই জীবনধারণ হাতেমুখে; শতকরা প্রায় নব্বুইজন লোকের অসুখে নিত্য চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, সেখানে বিজ্ঞাপন করে জনসাধারণকে বিলাসিতায় প্রলুব্ধ করা এক রকমের নৈতিক অপরাধ নয় কি ! 'ইট্‌স্ বাই অ্যাণ্ড লার্জ এ ক্যাপিটালিস্ট ফেনোমেনান', আমাদের উচিত ন্যূনতম প্রয়োজনগুলির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি ফেরানো, ইত্যাদি। রামতনুর কাছে এটা একেবারেই যুক্তিহীন বলে মনে হয়। অনুন্নত দেশে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু কাল আগে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি, ইচ্ছে হলো সেই তত্ত্বগুলিকেই আবার টেনে আনেন এখানে। প্রলুব্ধ ? হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন তা করে ; কিন্তু, তা কি আরো সমৃদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি মানুষকে সচেতন করে তোলে না ! আকর্ষণ কি শুধুই হতাশার সৃষ্টি করে, নাকি উন্নততর জীবনযাপনের জন্যে মানুষকে আরো পরিশ্রমমুখী ও উপার্জনক্ষম করে তোলার ব্যাপারেও তার, বিজ্ঞাপনের, কোনো ভূমিকা আছে ! সবই বলতে পারতেন ; তবু, এসব তত্ত্ব-আলোচনায় গেলেন না রামতনু। আজ তাঁর আসার উদ্দেশ্য নিছক সামাজিকতা, মৃদুলা ও অন্যান্যদের বুঝতে দেওয়া, তাঁর মানসিকতায় বিচলিত হবার মতো পরিবর্তন ঘটেনি কোনো ; তার চেয়ে বড়ো কথা, এইভাবে নিজের ক্লান্তিকর দ্বিধা থেকে যদি কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পাওয়া যায়।

কথাবার্তার মধ্যেই সুশান্ত এসে পড়ল। নিভার দাদা। রামতনুকে দেখে তার অবাক হবার কারণ ছিল। পরে বলল, 'এমনি দেখা না হলেও আপনাকে অবশ্য আমি প্রায়ই দেখি—'

'তাই নাকি !' স্বাভাবিক কৌতূহল প্রকাশ করলেন রামতনু, 'কোথায় ?'

'এই তো ক'দিন আগে—', একটু ভেবে নিল সুশান্ত, 'সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে, গাড়িতে যাচ্ছিলেন। একজন মহিলা ছিলেন আপনার সঙ্গে—'

অল্প নড়ে উঠলেন রামতনু। মাথার ভিতর থেকে একটা ছায়া এগিয়ে এলো কপালে, কাঁকড়ার দাঁড়ের মতো বিস্তৃত হলো রগের দু' দিকে। অস্পষ্টভাবে হাসলেন তিনি, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাত হলো। আজ চলি। সুশান্ত, তুমি একদিন বৌমাকে নিয়ে বাড়িতে এসো।'

'আসবো।' চটপট উত্তর দিল সুশান্ত। তারপর, রামতনু যখন মৃদুলাকে তাড়া দেবার কথা ভাবছেন, হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, ওই মহিলা ইউরেকায় আছেন না ?'

সাধারণত শান্ত ও স্থির স্বভাবের মানুষ রামতনু। তবু এই মুহূর্তে সুশান্তর কথায় পরিষ্কার বিরক্তি বোধ করলেন তিনি। স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি চেনো নাকি ?'

'ঠিক চিনি না। আমাদের সেল্‌স ম্যানেজারের সঙ্গে খাতির আছে। মাঝখানে আমাদের অ্যাকাউন্টটা পাবার জন্যে খুব ঘোরাফেরা করেছিলেন।'

'ও !' অল্প সময় নিয়ে বললেন রামতনু, 'উনি এখন আমাদের এখানে, রিসেন্টলি জয়েন করেছেন।'

রামতনুর কণ্ঠস্বরের স্পষ্টতায় সুশান্ত বোধ হয় কিছু অনুমান করল। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

গোটা ব্যাপারটা তবু থেকে গেল মাথায় ; বর্ষার মেঘের মতো পরোক্ষে ও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সমগ্র অস্তিত্বে। হয়তো তেমন কিছু নয়—অন্য যে কেউ এটাকে সাধারণ কৌতূহল বলে মেনে নিতে পারে। কিন্তু, তিনি জানেন বলেই একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিলেন সুশান্তর কথাবার্তায় ; শ্রদ্ধাহীন, সম্ভ্রমহীন একটা উদ্দেশ্য। ফেরার পথে গাড়ি

চালাতে চালাতে দৃঢ় হয়ে উঠল তাঁর চোয়াল, প্রতিশোধস্পৃহার মতো একটা প্রতিজ্ঞা দানা বাঁধল বুকে। পাশে মৃদুলা। মাঝে দু'একটা কথা বলবার চেষ্টা করলেও খুব এলোমেলোভাবে উত্তর দিলেন রামতনু। তারপর অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এসে হঠাৎ ভাবলেন, মৃদুলার প্রতি কোনো অন্যায় করছেন না তো! তখন বললেন, 'মৃদুলা, ছাব্বিশ তারিখে ডক্টর ব্যানার্জির সিকস্‌টিয়েথ বার্থ-ডে। ইন্‌ভাইট করেছেন। আমি হয়তো সেই সময় দিল্লিতে থাকব। তুমি যেও।'

মৃদুলা মাথা নাড়ল, আস্তে, যা থেকে হ্যাঁ বা না কিছুই বোঝা যায় না।

অনেক দিন পরে সেই রাতে মৃদুলার প্রতি প্রচণ্ড শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করলেন রামতনু। লজ্জাহীনভাবে ঢুকে পড়লেন তার শিথিল ও অপ্রস্তুত শরীরে। অনভ্যাস থেকে উঠে এসে প্রাণপণে সঙ্গ দিল মৃদুলা ; বহু দূরে নির্বাসিত দ্বীপের মতো, জানল না, এই বিস্ফোরণের ভিতর আছে রামতনুর আর কোন প্রস্তুতি!

॥ দশ ॥

ভবিতব্য ছাড়া আর কী বলা যাবে একে! না হলে আগাগোড়া সঙ্কল্পে স্থির থেকেও বোধবুদ্ধিজাত পরিকল্পনা থেকে কেন তাঁকে চলে যেতে হয় অনেক দূরে ; আর, মানতে হয় সেই উপস্থিতি—যা থেকে নিজেকে দূরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় এ ক'দিন শুধুই বিব্রত হয়েছেন তিনি!

চব্বিশ তারিখ সন্ধ্যায় দমদম থেকে দিল্লিগামী প্লেন যখন আকাশে উড়ল, পাশের সিটে নীরাকে দেখে রামতনু শুধু এই কথাটিই ভাবলেন ; তাহলে ভবিতব্য বলে সত্যিই কিছু আছে! এমন নয় যে এ-সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো আভাস ছিল না। এই বয়সে—প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি বয়সে—পৌঁছে নীরাকে নিয়ে যে অশান্তির সৃষ্টি হলো তার মূলেও যে ভাগ্য তা তিনি অস্বীকার করবেন কী করে! কিন্তু, ভবিতব্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করা মানুষেরই কাজ—এরই মধ্যে নিহিত আছে পুরুষকার, এতো দিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না তাঁর। প্রমাণ তিনি নিজে, প্রমাণ তাঁর কর্মজীবন। এই বিশ্বাস থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে যা যা করা উচিত, সবই করেছিলেন তিনি। নিজেকে সংযত করেছেন বারবার, কোথাও এতোটুকু ভুলের সুযোগ রাখেননি ; এবং সবই করেছিলেন এমন চুলচেরাভাবে—যেন প্রয়োজনে ব্লু-প্রিন্ট মেলে ধরতে পারেন। বনিবেব্-এর বাজি জেতার জন্যে নীরাকে টেনে আনলেন নিজের এজেন্সিতে, কিন্তু নীরার অভিজ্ঞতার প্রায় কিছুই কাজে লাগালেন না। এটা না করলে হয়তো কাজের সুবিধে হতো কিছু। নীরা থেকে গেল সম্পূর্ণ আড়ালে।

নীরা কি কিছু অনুমান করেছিল? সম্ভবত নয়। অন্তত তার আচরণে বা কথাবার্তায় এর সামান্যতম আভাসও পাওয়া যায়নি। ইদানীং মনে হচ্ছিল আর কোথাও কোনো দ্বিধা নেই, সমস্ত ব্যাপারটাই ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে সহজের দিকে। নিজেকেও আর তেমন দুর্বল মনে হতো না। তার ওপর ছিল অসম্ভব কাজের চাপ ; প্রেজেনটেসানের দিন যতো এগিয়ে আসছিল কাছে, ততোই অন্য সব প্রসঙ্গ ভুলে ডুবে যাচ্ছিলেন কাজে। প্রত্যেকটি বিষয়ের

খুঁটিনাটি বুঝে নিচ্ছেন নিজে—রিসার্চের ফলাফলের সঙ্গে ক্যাম্পেনের বক্তব্য ও পরামর্শ ঠিকঠাক মিলছে কি না, ক্রিয়েটিভ অ্যাপ্রোচ নির্দিষ্ট ক্রেতাদের ঠিকমতো আকর্ষণ করতে পারবে কি না, মিডিয়া ডিস্ট্রিবিউসান—সবই দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, এ-বিষয়ে সামান্য খুঁতও যেন না থাকে। এতো সতর্ক ও সাবধান হওয়ার আরো একটা কারণ ছিল। নিজের বিবেকের কাছে একটা জবাবদিহি প্রস্তুত রাখছিলেন রামতনু—আমি অসাধু নই ; গোড়ায় একটু গলদ হয়েছিল হয়তো, তবু, আমরা যোগ্যতম হিসেবেই এ-কাজ পাবার উপযুক্ত। এ শুধু তাঁর চ্যালেঞ্জই নয়, প্রত্যুত্তরও।

এতেই কাজ বাড়ল আরো। অনেকগুলো বিষয়েই নতুন ভাবনা জুড়তে হলো, তৈরি কাজে রদবদল করতে হলো প্রয়োজনমতো। মনে পড়ার ব্যাপারে শেষ মুহূর্তটিই সবচেয়ে মূল্যবান। ছাত্রবয়সে যেমন হতো, পরীক্ষার আগের দিন রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যেত সম্ভাব্য কোনো প্রশ্ন। আবার উঠতে হতো বিছানা ছেড়ে—উত্তরটা পরিষ্কার ঝালিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। সেই পুরনো, ম্যাড়ম্যাড়ে কথাটাই হয়তো ঠিক , জানার শেষ মৃত্যুতেও হয় না, বিভিন্ন চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায় উত্তরবিহীন। তখনই শুরু হয়ে যায় সন্দেহ ; নিজেকে—নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে, অনেকটা এগিয়ে গিয়েও ফিরে আসতে হয় আবার। এমনও হতে পারে বস্তুজগতে সব প্রশ্নের উত্তর মেলা সত্যিই দুরূহ। কোনো কোনো প্রশ্ন এসে দেখা দেয় স্বপ্নের ভিতর, উৎপাত করে ঘুমের মধ্যে—এ-রকম অনেক দেখেছেন রামতনু, ঘুম ভাঙার পর আর তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। রামতনু বস্তুবাদী, এই সব চকিত বিশৃঙ্খলাকে তাঁর বিষম ভয়।

বনিবে্‌-এর ক্যাম্পেন নিয়ে যে-রকম ঝামেলা হবে ভেবেছিলেন, তা হলো না। অসুবিধে সম্পর্কে সকলেই সাবধান ছিল, হয়তো সেই জন্যে হিসেবের একদিন আগেই কাজ শেষ হলো। রামতনু হাঁফ ছাড়লেন। শুধু কাজটা সময়মতো শেষ হয়েছে বলে নয়—বনিবেব্‌-এর চমৎকার কাজ অনেক দিন পরে তাঁর আত্মতৃপ্তিবোধের কারণ হলো।

সেদিন রাতে নির্মলকে ডেকেছিলেন ডিনারে। আলাদাভাবে নির্মলকে একটু বেশি পছন্দ করেন তিনি। মনে মনে জানেন, তাঁর উত্তরাধিকার তৈরি হচ্ছে নির্মলের মধ্যে। এখনো চল্লিশ পেরোয়নি, তবু পেশাগত বুদ্ধিতে মাঝে মাঝে তাঁকেও ছাড়িয়ে যায় নির্মল। আর, ওর এই পরিণতি লক্ষ করবার পর থেকে ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে নিজেকে ভুল যুক্তির পথে চালিত করেন রামতনু, সস্নেহে লক্ষ করেন নির্মলের প্রতিক্রিয়া।

এ-কাজটাও সম্পূর্ণ হলো নির্মলের তৎপরতায়। ওর সামনেই প্রশংসা করলেন রামতনু, 'ইউ রিয়েলি হ্যাভ ডান ইট্‌! আমি তো ভাবতেই পারিনি—। এখন থ্রু হলেই বাঁচি।'

'আমি এ নিয়ে ভাবছি না, আর. এস।' নির্মল বলল, 'আই'ম মোর দ্যান কন্‌ফিডেন্ট। মিস প্রধান বলছিল ইউরেকা এর ধারেকাছে যায়নি। অন্তত ক্রিয়েটিভ কাজ তো বটেই।'

রামতনু হাসলেন। নির্মলের প্রথম কথাটাই তাঁর কানে লেগেছিল, মনে পড়েছিল নিজের অতীত। তখন তাঁর কণ্ঠস্বর আজকের মতো গভীর ছিল না, কিন্তু বলার ধরনটা ছিল প্রায় একই, আই'ম মোর দ্যান কন্‌ফিডেন্ট! যেন বদ্ধ গুমোটের মধ্যে এক ঝলক উদ্দাম হাওয়া এসে লাগে চোখেমুখে। তখন উচ্চাশা ছিল, এখন সে-জায়গা নিয়েছে অভিভাবকত্ব। মাঝে মাঝে নিজেকে মনে হয় বিশাল এক গাছের মতো—চারিদিক থেকে ঝুরি নেমে গেছে মাটির ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত, একটার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে অন্যটা, তিনি নিজে ছাড়া হয়তো আর কেউই এর কাণ্ড খুঁজে পাবে না।

সার্থক পরিশ্রম এক ধরনের শান্তি এনে দেয় মনে। পূর্বস্মৃতির দোলায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন রামতনু। হয়তো এরই নাম সম্পূর্ণতা অর্জন, 'কম্প্লিট ম্যান' বলতে সেদিন ডক্টর ব্যানার্জি হয়তো এই রকমই কিছু বুঝিয়েছিলেন। এই সব ভাবনায় অলস হয়ে আসে রামতনুর চোখ। হঠাৎ মনে পড়ে না কী নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। পঁচিশ বছর, না তিরিশ বছর ? হিসেবটা গুলিয়ে যায় মাঝে মাঝে। মনে পড়ে সেই প্রথম কাজে যোগদানের দিনটি! তখন কি ভাবতে পেরেছিলেন আর কয়েক বছরের মধ্যেই ভাগ্য তাঁকে টেনে নিয়ে যাবে এমন এক ব্যস্ততা ও ধাঁধার মধ্যে—যেখানে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নেবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বিরল!

'ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, স্যার, আপনি কিন্তু বড্ড বেশি স্ট্রেন করছেন!' নির্মল বলল হঠাৎ, 'কিছু দিন থেকেই লক্ষ করছি আপনি খুব ক্লান্ত—সত্যিই আজকাল খুব ক্লান্ত লাগে আপনাকে—'

'সত্যি, মিস্টার সোম', নির্মলের স্ত্রী শমিতা বলল, 'আপনার চেহারা দেখে আজ আমি শক্‌ড্ হয়েছি। হোয়াট্ এ চেঞ্জ্!'

'বলো কী!' হাসিতে শব্দ তুললেন রামতনু, চেষ্টা করে, 'হ্যাভ আই! রিয়েলি! কিন্তু, আমি নিজে তো কিছুই বুঝতে পারি না। এখনো ইচ্ছে করলে আঠারো ঘণ্টা কাজ করতে পারি!'

'সে তোমার গায়ের জোরে!' মৃদুলা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। সমর্থন পেয়ে বলল, 'তোমরা বলো তো! আমি যে কবে থেকে বলছি রেস্ট নিতে, সে-কথা কে শুনছে!'

'এরা এই রকমই, জানেন!' ক্ষোভের গলায় বলল শমিতা, 'ও তো পরপর দু' রাত্তির বাড়িই ফিরল না!'

শমিতাকে অপ্রস্তুত করে সকলেই হেসে উঠল একসঙ্গে, এমনকি মৃদুলাও। হাসতে হাসতেই বললেন রামতনু, 'খুব অন্যায় করেছো, নির্মল! এখন তোমার উচিত শমিতাকে একটা দামী শাড়ি কিনে দেওয়া। অ্যাণ্ড সাম চকোলেট্‌স্!'

'ও-কে.।' গ্লাসসুদ্ধ হাতটা সম্মতির ভঙ্গিতে ওপরে তুলল নির্মল, 'গ্র্যাণ্টেড্—'

ঘরের আবহাওয়া ক্রমশ তরল হয়ে আসছিল। রামতনু ওর গ্লাসে আরো কিছুটা হুইস্কি ঢেলে দিলেন। নিজে নিলেন না। পরিবর্তে একটা সিগার ধরালেন। চশমাটা কোলের ওপর রেখে বাঁ হাতের উল্টোপিঠে চোখ রগড়ে নিলেন আস্তে আস্তে। এটা তাঁর গভীর হওয়ার ভূমিকা।

'হয়তো ঠিকই বলছ তোমরা, আমি সত্যিই টায়ার্ড।' একটু পরে, থেমে থেমে বললেন রামতনু, 'নট ফিজিক্যালি দো। এর বেশিটাই মানসিক— ।'

আলস্যে চোখ বুজে আসছিল রামতনুর। অন্যথায় তাঁর চোখে থাকে স্বাস্থ্যের জাদু, দীপ্তিমান ও প্রবলভাবে লক্ষ করেন প্রতিটি বস্তু। ক'দিনের উপর্যুপরি পরিশ্রম সেই দীপ্তির অনেকটাই নিয়েছে। নির্মল ও শমিতার উদ্বেগ তাঁর মনে আয়নার কাজ করল। তখনই আবার মনে হলো ওরা আমন্ত্রিত, ওদের সামনে এভাবে বিমর্ষ নিজেকে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। সব কিছুর পরেও এই ক্লান্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত ; এমনকি মৃদুলাকেও এর অংশ নিতে দেওয়া যায় না।

ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন রামতনু। চেষ্টা করে হাসলেন।

'তবে, নির্মল, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। পঁচিশ তিরিশ বছর একনাগাড়ে একই

প্রফেসানে থাকা মানেই এই। অ্যালকোহলিক হয়ে পড়ার মতো—ডুয়িং দি সেম থিং ওভার অ্যাণ্ড ওভার অ্যাগেন, অ্যাণ্ড ইউ উড্ স্টিল লাভ্ টু রিপিট ইওরসেল্ফ্। নেশা। অভ্যাস! আমার দিকে তাকাও, এতোটা বয়স পর্যন্ত সত্যিই আমি কী করেছি, কার জন্যে করেছি! যা করেছি সবই চাকরির জন্যে, প্রফেসানের জন্যে। কিন্তু আগাগোড়াই ভেবে এসেছি—এই পরিশ্রমের সবটাই নিজের জন্যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্যে, সংসারের জন্যে। ইল্যুসান ভেঙে গেলেই ক্লান্তি আসে।'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন রামতনু। আর কোনো কারণে নয়, নিজের কণ্ঠস্বরের আকস্মিকতা থামিয়ে দিল তাঁকে। হঠাৎই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বিরাট একটি ঘর—যেখানে কোনো জানলা নেই, দরজা নেই, যেখানে অবিশ্বাস্যভাবে একা অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাঁর, উন্মাদের মতো অর্থহীন চিৎকার করে যাচ্ছেন তিনি, প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসছে নিজেরই কানে!

কেউ কিছু বলল না। ইচ্ছে করলে এখন যে-কেউই মাটি থেকে সূচ খুঁটে তুলতে পারে। মৃদুলা হয়তো কিছু অনুমান করেছিল, চোখেমুখে দিশেহারা ভাব নিয়ে উঠে পড়ল। যাবার আগে বলল, 'খাবার তৈরি। নির্মল তোমার হাতেরটা শেষ করে নাও তাড়াতাড়ি—'

শমিতাও গেল মৃদুলার সঙ্গে সঙ্গে। যেন এই পরিস্থিতিতে সে হাঁফিয়ে উঠছিল।

'নাউ আই উড্ লাইক টু রিল্যাক্স।' নির্মলকে বললেন রামতনু, 'কিছু দিন অন্তত বিশ্রাম নেব। হয়তো বনিবেব্‌ই আমার শেষ বড়ো কাজ।'

পরের দিন দিল্লি চলে গেল নির্মল, সঙ্গে আর একজন অ্যাসিস্টাণ্ট। রামতনু যাবেন একদিন পরে। দিল্লিতে নায়ার আছে; ক্যাম্পেন অ্যাপ্রুভ হলে প্রয়োজনে দিল্লি থেকেই পরবর্তী কাজকর্ম হবে। প্রেজেনটেসান সম্পর্কে হুইট্‌নারকে সেই রকমই জানানো হয়েছিল।

অফিসে এসে প্রথমেই ডক্টর ব্যানার্জিকে লাইনে চাইলেন রামতনু। ছাব্বিশে তাঁর জন্মদিন, নেমন্তন্ন করেছেন, কিন্তু রামতনুর পক্ষে সেই সময় কলকাতায় থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাপারটা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন রামতনু। মৃদুলা যাবে।

'অ্যাজ ইউজুয়াল', বললেন ডক্টর ব্যানার্জি, 'ওঃ, মশাই, কী একটা চাকরি যে করছেন!'

'চাকরি! আপনি অনেক সফ্‌ট্! বেশ্যাবৃত্তি বলুন—'

ফোনের মধ্যেই হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর ব্যানার্জি।

'বুড়ি বেশ্যার এতো কদর পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না!' বলে থামলেন একটু। 'তা হঠাৎ নিজের ওপর এতো রাগ কেন! এতো বড় একটা অ্যাকাউন্ট পেলেন, এখন তো খুশি হওয়ার কথা!'

'তা অবশ্য। কিন্তু প্রসেসটা একই।'

ফোন ছেড়ে দেবার পর পি. এ.-কে ডাকলেন। ছাব্বিশ তারিখে স্টারলেটের পক্ষ থেকে উপহার নিয়ে যেতে হবে ডক্টর ব্যানার্জির বাড়ি, সে-সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন বারোটা। রোনাল্ডস-এর কারখানায় লক্-আউট ঘোষণা করা হবে শীঘ্রি; বিষয়টা গোপনীয়, কিন্তু খবর-কাগজের লোকেরা কোন সূত্রে খবর পেয়ে ফাঁস করে দিয়েছে—ওরা এ-নিয়ে খুব চিন্তিত। বাড়িতেই ফোন করেছিল সকালে। রামতনুকে যেতে হলো।

বেশ্যাবৃত্তি, তখন বলেছিলেন ডক্টর ব্যানার্জিকে। একটু বাড়িয়ে বলেছিলেন হয়তো। এ-কথা ঠিক নিজের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা থেকে এ-রকম কথা বলেননি তিনি; হয়তো

এটাই বলতে চেয়েছিলেন—এতো পরাধীনভাবে আত্মক্ষয় একমাত্র বেশ্যাদেরই মানায়। এই পরাধীনতা স্বীকার করে নিলে আর কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না ; দ্বন্দ্বহীনভাবে, শরীর ও চৈতন্য যতো দিন সহ্য করতে পারে ততো দিনই চালিত করা যায় নিজেকে। কিন্তু, বেশ্যাদের কি চৈতন্য থাকে, বা বৃত্তি সম্পর্কে শুভাশুভময় কোনো ধারণা ! রামতনুর আছে। আর, আছে বলেই, জীবিকার ক্লেদ মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। অনেকটা সার্কাসের বাঘের মতো—প্রতিবাদ থাকে, দাঁত ও থাবার জোরও কমে না এতোটুকু, তবু নিরুপায় !

তা না হলে কী হতে যাচ্ছে, কী করতে হবে তাঁকে—কোন ধরনের সাহায্য, জেনেও এখন তাঁকে ছুটতে হতো না রোনাল্ডস্-এ। আর কিছু দিনের মধ্যেই তাদের তিনটি কারখানাই বন্ধ হয়ে যাবে, কাগজের সমালোচনা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে না। এটাই পলিসি, বা নীতি ; এবং ব্যবসা মানেই তো পলিসি ! এরপর প্রায় আড়াই হাজার কর্মী বেকার হয়ে পড়বে, তাদের পরিবারসহ কম করেও দশ হাজার মানুষ ক্রমশ এগিয়ে যাবে নিরন্ন জীবনযাপনের দিকে। তালা খুলবে না। মিছিল, প্রতিরোধ, অনশন—সমবেত যুদ্ধের কোনো কৌশলই কার্যকর হবে না শেষ পর্যন্ত। তারপর দেখা যাবে তালপাতার দুর্বল ছাউনির নিচে চাটাই বিছিয়ে নির্জীব পড়ে আছে কয়েকটি মানুষ—ক্রোধহীন তাদের চোখে এখন শুধু ক্ষুধা আর প্রার্থনা, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ্দুর ঝল্‌সে দেয় তাদের শরীর, তবু নির্গত হয় না প্রাকৃতিক ঘাম ! অথচ, এসবই এড়ানো যেত যদি আর একটু নরম হতেন রোনাল্ডস কর্তৃপক্ষ, চেষ্টা করতেন একটা আপসরফায় আসতে—শুধুই পলিসি না ভেবে একটু মানবিক হতেন। কিন্তু, তা হবে না, কারণ কর্তৃপক্ষ জানেন শ্রমিকদের সাধ্য কতো দূর ! সেই একই, সার্কাসের বাঘের মতো, দাঁত ও থাবার সমূহ তীক্ষ্ণতা নিয়ে অবশেষে একদিন তারা থাবা তুলে নমস্কার করবে দর্শকদের !

আর, সব জেনেশুনেও, উদাসীন সঙ্গমে বেশ্যার মতো নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন রামতনু। সম্ভবত আজ, এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে গেল তাঁর কাজ। প্রেস হ্যাণ্ডআউট তৈরি করা, যতো দূর সম্ভব ভুল সংবাদ দিয়ে মধুর জনসংযোগ গড়ে তোলা ; সাংবাদিকদের তুষ্ট করার জন্যে ডেকে আনা মদ্যপানের আসরে ! এই সব, প্রায় সবই। মাঝে মাঝেই মনে হয় কী অসম্ভব ভুল পথে চালিত করছেন নিজের বিবেক ও নীতিকে—কথাগুলো একই থাকছে, কিন্তু অর্থ পাল্টে যাচ্ছে প্রত্যেকটি কথারই ! এই কি জনসংযোগ !

ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলেন রামতনু। যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল ; সুবিধে এইটুকু, কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি। কাল বোর্ডের জরুরী মিটিং আহ্বান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রামতনু যেন পরবর্তী ব্যবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকেন। এই অবস্থায় অফিসে ফিরে নায়ারের মেসেজ পেলেন রামতনু—নীরাও যেন তাঁর সঙ্গে দিল্লি রওনা হয়। হুইট্‌নার সেই রকমই চায়।

মেসেজটা ক্রমশ মুঠোর মধ্যে টেনে আনলেন রামতনু। অসম্ভব রাগ ও অপমানে দৃঢ় হয়ে উঠল তাঁর চোয়াল। আর একটা পরাজয় ! তবু এ-পরাজয়ও মানতে হবে তাঁকে।

॥ এগারো ॥

অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে বর্তমান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন রামতনু ; প্রকাশ্য সব স্মৃতিই অন্তর্হিত হলো অনুভূতি থেকে। তারপর, অন্ধকারে দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ক্রমশ ফিরে এলেন নিজেতে। এখন একটিই উপায় আছে, ভাবলেন, ইচ্ছে করলে এখন তিনি যাবতীয় পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে পারেন।

একটু খট্‌কা লাগল। সত্যিই পারেন কি ! পারলেও, কোন শর্তে ! বনিবেব্‌-এর শিকড় আজ শুধু তাঁর মধ্যেই ব্যাপ্ত নয়, তা ছড়িয়ে গেছে বহু দূর অব্দি। এখন অন্য কিছু করা মানেই আলোড়ন ডেকে আনা। এতো দিনের শ্রম, উদ্যম, সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি কি পারবেন সেই দায়িত্ব নিতে ! সব কিছুর পরেও, বলা যায়, এ-অপমান তাঁর নিজস্ব। পটভূমি প্রস্তুতই ছিল ; তিনি নিজেও কি প্রস্তুত ছিলেন না !

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো উত্তেজনা। এটা হঠকারিতার সময় নয়, চিন্তা করে দেখলেন, ক্যাম্পেন থ্রু না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। এমনও হতে পারে হুইট্‌নার সম্পর্কে তাঁর সমস্ত ধারণাই ভ্রান্ত। যে-কোনোভাবেই হোক, সেই সময় নীরা তাকে ইম্প্রেস্‌ করেছিল খুব—ব্যক্তিগত ধারণার জোরেই নীরাকে চেয়েছিল হুইট্‌নার। তিনি নিজেও কি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন না !

এইভাবে 'হয়তো' ও 'যদি' দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করলেন তিনি ; নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে।

সময় ছিল না। নীরাকে ডেকে দিল্লি যাবার কথা বললেন রামতনু। এমনভাবে বিষয়টা উত্থাপন করলেন যাতে নীরার সন্দেহ না হয়, যাতে ভাবতে পারে হঠাৎ কিছু নয়—সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল তাঁর মাথায়। এর মধ্যে একবারও নায়ারের মেসেজের উল্লেখ করলেন না।

'আমি চাই তুমি এই কাজটায় আরো বেশি ইনভলভ্‌ড্‌ হও। অসুবিধে হবে ?'

রামতনুর কথাবার্তার সম্পূর্ণ স্বাভাবকিতা সত্ত্বেও নীরা যেন একটু অবাক হলো। জবাব দিতে সময় নিল। পরে বলল, 'না।'

'সো— !'

অল্প হাসলেন রামতনু। এইভাবে যতোটা সংক্ষিপ্ত করা যায় নিজেকে।

কিন্তু, আপাতত সামলে নিলেও ঘটনাটা মুছতে পারলেন না মন থেকে। ইদানীং অল্পেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, অল্পেই ঘনীভূত হয়ে আসে নিঃশ্বাস। অভিমানময় একটা নৈর্ব্যক্তিতায় অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন তিনি ; ঠিক নীরা বা হুইট্‌নারের কারণে নয়—যেন তাঁর এই অভিমান এতো কাল ধরে অর্জিত সমূহ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে চুরমার হয়ে-যাওয়া খেলনার দিকে তাকানো শিশুর মতো, মূক অভিমানে ভেঙে যাচ্ছে তাঁর সমস্ত অহঙ্কার, আর বিশ্বাস, হয়তো আমৃত্যু এই শোক বহন করতে হবে তাঁকে। অনেক দিন পরে, একা, নিজস্ব দুঃখ বিষণ্ণ করে দিল তাঁকে।

কতোটা সত্য রামতনুর এই অনুভূতি, কতোখানি নির্মোহ ও নিরাসক্ত, শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের কাছেও ব্যাপারটা অস্পষ্ট থেকে যায়। তিমির পিঠকে দ্বীপ ভ্রমে উল্লসিত হওয়া নাবিকের মতো বারবার প্রতারিত হন তিনি ; আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে যতোই চেষ্টা করেন

এগিয়ে যেতে, বারবার ফিরে আসতে হয় সেই পুরনো রহস্যে ! স্মৃতি পর্যুদস্ত হয়, বিবেক যায় অন্ধ হয়ে, যাবতীয় গার্হস্থ্য চেতনা হয়ে পড়ে অবশ, পরিণামহীন। আর, সব কিছু অগ্রাহ্য করে শরীরময় আত্মার দুর্নিরীক্ষ্য কোণ থেকে উঠে আসে প্রবল, বিক্ষুব্ধ ঝড় !

দিল্লির প্লেনে উঠে পাশে নীরাকে দেখে, ভবিতব্যে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি। পরে, যতো সময় গেল, নীরার সান্নিধ্যে ক্রমশ জ্বরের মতো উত্তাপ সঞ্চারিত হতে লাগল তাঁর শরীরে—ভেঙে আসতে লাগল কেন'র দ্বিধা, শেষ পর্যন্ত ভবিতব্যই দেখা দিল আশীর্বাদ হয়ে। এই রামতনুর সঙ্গে মেলানো যায় না গত কয়েক দিনের রামতনুকে—যেন এরই মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে আত্মরূপ পরিবর্তন করে নিয়েছেন তিনি !

এয়ারপোর্টে নায়ার এসেছিল, সঙ্গে লিলি। রামতনু জানতেন নির্মল আসবে না। দিল্লিতে সে ওঠে নিজের কাকার বাড়িতে—কাল প্রেজেনটেসানের আগে সম্ভবত তার সঙ্গে দেখা হবে না। নির্মলকে না দেখে খুশিই হলেন তিনি।

গাড়িতে যেতে যেতেই প্রেজেনটেসান নিয়ে নায়ারের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। এটা ঠিক, এই মুহূর্তে এসব কথাবার্তায় বিশেষ উৎসাহ ছিল না তাঁর, কিন্তু আর কোন বিষয় নিয়েই বা কথা বলবেন নায়ারের সঙ্গে ! কিছুটা ভদ্রতা, কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ দিয়ে আলাপ চালিয়ে গেলেন তিনি। নীরা ও লিলি বসেছে পিছনে—এই প্রথম নীরাকে দেখল লিলি, প্রায় নীরবে যাচ্ছে তারা ; নায়ারের উৎসাহিত কণ্ঠস্বর ছাঁপিয়ে তাদের নীরবতাই বেশি করে কানে বাজতে লাগল।

নীরবতার কারণ কিছুটা অনুমান করে নিতে পারেন রামতনু। নীরা শেষ পর্যন্ত আসবে কি আসবে না এই অনিশ্চয়তায় নায়ার তার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করে রাখেনি ; শেষ পর্যন্ত, ভেবেছিল, নীরা তাদের সঙ্গেই থাকতে পারে। কথাটা সেইভাবেই তুলেছিল লিলি। তখনো অপরিচয়ের দ্বিধা কাটেনি নীরার, ওর ইতস্তত ভাব লক্ষ করে তৎপর হলেন রামতনু। যেন এই রকম একটা উপলক্ষেরই অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

'হোয়াই !' প্রায় অবিচল গলায় বললেন রামতনু, 'সি উড স্টে উইথ মি !'

কী ছিল রামতনুর কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গিতে ! নায়াররা, এমনকি নীরাও, হঠাৎ অবিন্যস্ত বোধ করল।

অবস্থাটা অনুমান করে নিজেকে সামলে নিলেন রামতনু। নীরার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'পরের বার এসে লিলির গেস্ট হয়ো। সি কুক্‌স্ এক্সট্রিম্‌লি ওয়েল !' তারপর বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই বললেন, 'ক্যাম্পেন নিয়ে কিছু কাজ বাকি আছে। আজকের সময়টা আমরা কাজে লাগাতে পারি—'

'অ্যাজ ইউ লাইক ইট্, স্যার।' কিছু বুঝতে না-পারা থেকেই রামতনুর কথাটা মেনে নিল নায়ার। কিন্তু আবহাওয়া তরল হলো না বিশেষ। রামতনু লক্ষ করলেন, লিলি এবং নীরা দু'জনেই যেন কেমন গুটিয়ে নিয়েছে নিজেদের। ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও এই মুহূর্তে দু'জনেই যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্যমনস্ক !

এয়ারপোর্ট থেকেই হোটেলে ফোন করে নীরার জন্যে রুমের ব্যবস্থা করল নায়ার। ভবিতব্য ! ভাবলেন রামতনু, যেটুকু সন্দেহ ছিল বুকিং পাওয়া নিয়ে তাও আর থাকল না—ভাগ্য সম্ভবত আজ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে ! মনে মনে নায়ারকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি।

হোটেলে পৌঁছে দিয়ে নায়াররা চলে গেল। লিলি তখনও খুব স্বাভাবিক হতে পারেনি।

যাবার আগে আড়ষ্ট গলায় বলল, 'শুনছিলাম পরশুই চলে যাবেন। এর মধ্যে কি আপনাদের আমার বাড়িতে আশা করতে পারি?'

'সেটা নির্ভর করছে কাল কী হয় তার ওপর। তাছাড়া—'

'ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই, স্যার।' রামতনু কথা শেষ করবার আগেই বলল নায়ার, 'ওটা রুটিন ব্যাপার। আজ আমি ফিডারে গিয়েছিলাম। আই থিংক দি ক্যাম্পেন ইজ অলরেডি সোল্ড্!'

'ওয়েল', আমল না দেবার ধরনে বললেন রামতনু, 'দেখা যাক—'

লিলির প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার সুযোগ হলো না।

দুটো রুমের দূরত্ব প্রায় এক মিনিট। নীরাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন রামতনু। ভিতরের একটা অস্থিরতা ক্রমশ তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আগুনের শিখার মতো এক জ্বলন্ত নীরা, ঘন ভুরুর নিচে তাঁর দুই চোখে এক্সরে যন্ত্রের অন্তর্ভেদী তীব্রতা—নিজেকে সংযত করার উদ্দেশ্যে বয়স স্মরণ করলেন রামতনু। ইতিমধ্যে ঘেমে উঠল তাঁর কপাল, মাটির ডেলার মতো অনুভূতিহীন একটা জিব নড়াচড়া করতে লাগল মুখের ভিতর। প্রায় করুণাপ্রার্থীর মতো বললেন তিনি, 'এই অ্যারেঞ্জমেন্টে তুমি খুশি হয়েছো তো!'

সম্ভবত রামতনুর উত্তেজনা নীরার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল কিছুটা। ঘন চোখে রামতনুর দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ার আগে বুকের ওপর শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিল সে।

'ফাইন!' দ্বিধাগ্রস্ত হাত তুলে হঠাৎ ওর কাঁধের ওপর রাখলেন রামতনু।

এখন আর নিজেকে সার্কাসের বাঘের মতো মনে হয় না। শুধু পরাধীনতার ক্লেদ ছুঁয়ে থাকে শরীর, সক্রিয়তার অভাবে থরথর করে কেঁপে ওঠে মেরুদণ্ড। পঞ্চান্ন বছর বয়সে পৌঁছে চকিতে মনে পড়ে যায় নিজের অতীত। মনে পড়ে মৃদুলার কপাল ও কানের পাশে সাদা হয়ে আসা বিবর্ণ চুলের আভাস, মনে পড়ে শ্যামলীকে লেখা তাঁর চিঠি—'চব্বিশ পঁচিশে আমি দিল্লি যাবো, অংশু যদি সেই সময় যায়, দেখা হবে। তুই তো লিখেইছিস যাবে!' প্রতিটি অক্ষর এমন আলাদা ও ছাড়া ছাড়া হয়ে কেন উঠে আসে স্মৃতি থেকে, নীরার শরীরে হাত রেখে কেন মনে পড়ে মৃদুলাকে—এই বয়সে কেন পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়, এই সব প্রশ্নে ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে তাঁর হাত। সেই একই হাত চলে যায় পকেটের রুমালের দিকে—শেষ অবলম্বনের মতো সেটাকে আঁকড়ে ধরলেন রামতনু। আস্তে হাতে ঘাম মুছে নিলেন কপালের। তারপর অত্যন্ত মৃদু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি তৈরি হয়ে নাও। তারপর এসো—'

রামতনু আর দাঁড়ালেন না। প্রায় নিঃশেষিত শক্তির ওপর নিজেকে স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে গতি দ্রুত করলেন শুধু।

॥ বারো ॥

কী পেয়েছেন রামতনু নীরার মধ্যে! গভীর নেশার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রবৃত্তি তাঁকে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করে আনল এমন এক জগতের মধ্যে, নীরার সান্নিধ্য ছাড়া যেখানে আর কিছু নেই।

আজকাল তিনি তাড়াতাড়ি অফিসে যান, আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি। ফেরেন অনেক দেরিতে। যখন ফেরেন, বাড়ি তখন প্রায় স্তব্ধ, সাংসারিক কাজকর্মের শেষে যে যার বিশ্রামে গেছে। শুধু মৃদুলা—অবসন্ন, ক্লান্ত, বিমর্ষ, জেগে থাকে। খাবার-টেবিলে সুবীর আসে না। নিভাও প্রায়ই থাকে না। শান্তনু হস্টেলে থাকে, সপ্তাহান্তে বাড়িতে আসে, আবার চলে যায়, তার আসা এবং যাওয়া সবই রামতনুর অগোচরে। শ্যামলী বা অংশু যোজন যোজন দূরের মানুষ।

রামতনুর মনে প্রশ্ন নেই, জিজ্ঞাসা নেই, স্মৃতি আছে কি না তাঁর আচরণ থেকে তা বোঝার উপায় নেই। বহু দিনের ব্যবস্থা, সম্ভবত সেই কারণেই মৃদুলাকে একই ঘরে শুতে হয়। ছেলেমেয়েরা বড়ো হবার সময় থেকেই বিছানা আলাদা হয়েছিল। অভ্যস্ত গতানুগতিকতা ভিন্ন এর মধ্যে আর কিছু নেই।

এই পরিবর্তন এক দিনে হয়নি। কিন্তু পরিবর্তন যে হয়েছে, বাইরে তার যতোই প্রকাশ থাকুক, রামতনুর অভ্যন্তরীণ জগতে তার কোনো ভূমিকা নেই। তিনি অবিচল! অটুট। যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তাঁকে ধীরে ধীরে যশ, বিত্ত, সংসার-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল, সেই একই চারিত্র্য ফুটে ওঠে নীরার প্রতি তাঁর আকর্ষণবোধে। বিরাট শহর কলকাতায় ছোট থেকে বড়ো হতে হতে একদিন তাঁর ও নীরার দুর্বোধ্য সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ জানাজানি হয়ে যায়, স্ক্যাণ্ডাল ছড়াতে দেরি হয় না। রামতনুর কানে আসে সবই, অফিসে কর্মচারীদের অভিব্যক্তি তা আরো স্পষ্ট করে দেয়। রামতনু তবু বধির, তবু অন্ধ, ভ্রূক্ষেপহীন।

এরই মধ্যে একদিন অঘটন ঘটে যায়। ভিতরে ভিতরে এর প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে, অদৃশ্যভাবে, বৃষ্টিপাত যেমন থাকে মেঘে। একটি দিনই যেন রামতনুকে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল।

অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি দেরি করেই সেদিন বাড়ি ফিরলেন রামতনু। নিশুতি শহরের জনবিরল পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতেই তাঁর মনে হয়েছিল, আজ খুব দেরি হলো। তিনি জানেন, দেরির জন্যে তাঁকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না; প্রায় অভ্যস্ত জীবনযাপনে এই বিলম্ব নতুন কিছু নয়। তবু সঙ্কোচ লাগছিল, মনের ভিতরে কোথাও একটু বিবেকের দংশন অনুভব করছিলেন। তাঁর দেরি মানেই মৃদুলার জেগে থাকা, লোকজনের অপেক্ষা করা। ব্যাপারটা শোভন নয়।

মৃদুলা আজ নিজেই দরজা খুলল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এটা সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম।

রামতনু অবাক হলেন!

'কী ব্যাপার! তুমি নেমে এলে?'

'একটা বেজে গেছে।' মৃদুলা হাসল, 'ওরা কতোক্ষণ জেগে থাকবে! আমি ওদের ছুটি দিয়েছি।'

মৃদুলার জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না রামতনু। বিরক্তির গলায় বললেন, 'একটা দিন দেরি করলে ওদের কী অসুবিধে হয় ! এতোই বাবু হয়েছে সব !'

'তা আমি জানি না। এটা এক দিনের ব্যাপার নয়।' মৃদুলা বলল, ওর গলার স্বর ভারী, 'ভেবে দেখ, নিজেই বুঝতে পারবে।'

কথা শুনেই রামতনু বুঝলেন মৃদুলা ক্ষুব্ধ, এই মুহূর্তে তাঁকে সহ্য করতে পারছে না। কথা না বাড়িয়ে গাড়িটা নিজেই গ্যারাজে তুললেন, দরজা বন্ধ করে ওপরে এলেন।

তারপর অনেকক্ষণ মৃদুলাকে দেখা গেল না। হয়তো নিচে গেছে বা বাথরুমে, এই রকম ভেবে নিয়ে রামতনু নিজের প্রতি মনোযোগ দিলেন। বাইরের পোশাক খুলে রেখে বাথরুমে গেলেন। মাথাটা ভার ভার লাগছিল, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত মদ্যপানজনিত ক্লেদ শরীরে অস্বস্তি শুরু করেছিল। স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধরে। এখন শরৎকাল, অল্প ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। রামতনুর শীত করছিল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে, পোশাক বদলে, বিছানায় এলেন রামতনু। মৃদুলা তখনো ঘরে নেই। হয়তো তার খোঁজ নেওয়া উচিত, ভাবলেন একবার। কিন্তু কেমন এক অপরাধের বোধ তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রাখল অনেকক্ষণ। চোখে আলো লাগায় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মৃদুলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন রামতনু।

মৃদুলা এলো বেশ পরে। অন্ধকারেই দরজা বন্ধ করল। পায়ের শব্দে বুঝলেন মৃদুলা নিজের বিছানার দিকে আসছে ; বসল। রাতের গাঢ় নৈঃশব্দ্যের ভিতর মৃদুলার নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এলো রামতনুর।

'তুমি কি ঘুমোলে ?'

'না—'

একটু চুপ করে থাকল মৃদুলা। তারপর বলল, 'আমার কিছু কথা ছিল—'

'এতো রাতে !'

'এতো দিন বলিনি, বলব বলব করেও বলিনি। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে—'

মৃদুলা যদিও গুছিয়ে বলছিল, তবু ওর গলার স্বরের আর্দ্রতায় সন্দেহ হলো রামতনুর। মৃদুলা কী বলতে চায়, কী এমন কথা যা এখুনি না বললেই চলবে না !

কিছুটা বিমূঢ়ভাবে বিছানার ওপর উঠে বসলেন রামতনু, মৃদুলার মুখোমুখি। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিন তুলে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজলেন। দেশলাই জ্বালতে হাত কাঁপছিল। আগুন জ্বলে ওঠা ও নিবে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে অস্পষ্ট আলোয় মৃদুলার দিকে তাকালেন তিনি। মৃদুলার মুখ নত, বসার ধরনে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো দেখায়।

'কী বলবে বলো ?'

মধ্যরাতে মৃদুলার ব্যস্ততায় বিরক্ত লাগছিল রামতনুর। তবু, মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

মৃদুলা সময় নিল। যেন গভীর কিছু বলার আগে শেষবারের মতো গুছিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। রাস্তা দিয়ে অতর্কিতে কোনো মোটর ছুটে গেল, গতির শব্দ খানিকক্ষণ জিইয়ে থাকল বাতাসে। রাতের অলস হাওয়ায় আরো কিছু শব্দ ছিল, দুর্বোধ্য অথচ সক্রিয়, যেন ওই শব্দ উঠছে মাটির খুব গভীর থেকে, ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে চরাচরের সর্বত্র। নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে অনেকক্ষণ সেই বিচিত্র, অননুভব্য শব্দের কুহকে কান স্থির রাখলেন

রামতনু।

'সুবীররা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়—', মৃদুলা হঠাৎ বলল, 'আজ আমাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে।'

'কেন ?'

'কেন তা তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো।' রুক্ষ, অনুতাপের স্বরে বলল মৃদুলা, দম নিল একটু। 'দিনরাত কানের কাছে লোকে কুৎসা করে গেলে কেউ সহ্য করতে পারে না।'

'তুমি কী বলতে চাও ?' রামতনুর নিঃশ্বাস আটকে আসছিল।

অন্ধকারে হাসল মৃদুলা।

'আমাকে কি আরো পরিষ্কার করে বলতে হবে ! এই বয়সে একটি মেয়ের লোভে তোমার বিবেকবুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি ভালোমন্দ বুঝতে পারবে না। কিন্তু, ওদের জড়াচ্ছ কেন ! বৌমার বাপের বাড়িতে পর্যন্ত এ নিয়ে কথা উঠেছে। ছি, ছি !'

মৃদুলার শেষের কথাগুলি অনুচ্চ ফোঁপানিতে ঢাকা পড়ল। রামতনু দেখলেন খুব কাতরভাবে বিছানার ওপর ঢলে পড়েছে মৃদুলা, অন্ধকারেই চাপা কান্নায় কেঁপে উঠল ওর শরীর।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়, বাক্‌শূন্য বসে থেকে মৃদুলার অস্থিরতা লক্ষ করলেন রামতনু। ক্ষোভে তাঁর গলা জ্বলছিল।

'তুমি কি এসব বিশ্বাস করেছ !'

'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছুই যায় আসে না। আমি তোমার ওপর নির্ভর করেছিলাম। তোমাকে ছাড়া কোনো দিন কিছু ভাবিনি। কিন্তু, এখন আমি কোথায় দাঁড়াবো !'

মৃদুলা যেন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। এতোক্ষণ নিজেকে সংবরণ করে রেখেছিল কোনো রকমে, আর পারল না। ওর কান্নার স্বর এবার সরব ও তীক্ষ্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রামতনুর মস্তিষ্কে।

'তুমি আমায় ভুল বুঝছ, মৃদুলা।' উঠে গিয়ে দু' হাতে মৃদুলাকে তুলে ধরলেন রামতনু, 'তোমরা আমার প্রতি অন্যায় করছ। কারুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মানেই খারাপ কিছু নয়।'

বহু দিন পরে স্বামীর স্পর্শে সহসা আরো কাতর হয়ে পড়ল মৃদুলা। পিঠে তাঁর হাত, মৃদুলার মাথা রামতনুর কোমরের কাছে। যেন ওই স্পর্শও এখন তার কাছে অসহ্য লাগছিল। ক্ষোভে ও অবজ্ঞায় রামতনুর হাতটা পিঠ থেকে সরাতে সরাতে বলল, 'আজ আমার বয়স হয়েছে, তোমাকে কিছু দিতে পারি না। এই বয়সে তুমি আমায় কী দিলে ! আজ সুবীর আমাকে স্পষ্ট গঞ্জনা দিল, তোমার এই মতির জন্যে আমিই দায়ী, সব দোষ আমার—'

ভিতরের অবরুদ্ধ আবেগ ও বেদনা মৃদুলাকে পর্যুদস্ত করে ফেলছিল ; কথা শেষ করতে পারল না।

রামতনু তাঁর ধৈর্যের সীমানায় পৌঁছে গেলেন। মাথার ভিতর জ্বালার মতো একটা অনুভূতি, নিঃশ্বাস মন্থর, ক্রোধ ও অপমান মেশানো একটা বোধ তাঁর সমগ্র শরীর কঠিন করে তুলল। তাঁর হাঁটু কাঁপছিল, বুকের ভিতর হঠাৎ কিছু পড়ে যাওয়ার মতো কেঁপে উঠল। অবলম্বন ভেবে অন্ধকারে হাত বাড়ালেন রামতনু। শূন্যতা ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না।

অনেকটা সময় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধীর গলায় বললেন রামতনু, 'সুবীর তোমায় অপমান করেছে, মৃদুলা ?'

মৃদুলা উত্তর দিল না। অন্ধকারে, বিছানার ওপর ওর শরীর প্রাণস্পন্দনহীন নিশ্চল মনে হলো রামতনুর। জানলা দিয়ে রাতের শীতল হাওয়া ছুটে এসে রামতনুর কপাল ও মুখ স্পর্শ করল। যেন মৃদুলা নয়, নৈঃশব্দ্য ও অন্ধকারের ভিতর দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

শেষে স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'বেশ, এর জবাব আমি দেবো।'

কথাটা মৃদুলার কানে গেল কি না খেয়াল করলেন না। রাত বাড়ছিল। অন্ধকারের ঘনতা বুকে নিয়ে আবার বিছানায় ফিরে এলেন রামতনু।

॥ তেরো ॥

রাতের বাকি সময়টুকু কাটল নির্ঘুম অস্বস্তির মধ্যে। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করলেন রামতনু ; শরীর ক্লান্ত, দুর্বোধ্য যন্ত্রণা মাথায়, গভীর শৈত্য-প্রবাহের মতো মাঝে মাঝে শিরা বেয়ে হিমতরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকল ; দুর্ভাবনা গেল না। শুয়ে শুয়েই রাতের এক একটি প্রহর পার হয়ে যেতে দিলেন তিনি। দেওয়ালঘড়িতে তিনটে ও চারটে বাজার ধ্বনি স্পষ্ট শুনলেন কানে, ঘুম এলো না। একটা বিষাক্ত মাছি যেন সমান বৃত্তে একই গুঞ্জন তুলে মাথার ভিতর ঘুরে চলেছে ক্রমাগত ; মৃদুলার কথাগুলি ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের প্রতি কণিকায়। বোধ-বুদ্ধি-অনুকম্পাজাত যে-সম্পর্ক রামতনু যেন তার সীমান্তে এসে পৌঁছলেন ; ফেরার সম্ভাব্য পথগুলি সব রুদ্ধ, একা ও সম্পর্কহীন শূন্যতায় আত্মনিক্ষেপ ছাড়া উপায় নেই।

অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। রামতনুর ভারদুষ্ট চিন্তার ভিতর এই দু'টি শব্দ ও শব্দার্থ ক্রমাগত আঘাত করে চলল। যেন এর বিকল্প কিছুই নেই, বা থাকলেও, তা মূল্যহীন, অসার। তিরিশ বছর ধরে তোমাদের সার্বিক মঙ্গলচিন্তায় আমি আমার রক্ত জল করেছি—প্রায় অন্ধের মতো, এই দীর্ঘ সময়কালের বিভিন্ন মুহূর্তের মধ্যে কোথাও আমি বর্তমান নেই, তার মূল্য তোমরা শোধ দিচ্ছ এইভাবে, আমার বিচার করে! কোন অধিকারে! কোন শর্তের জোরে!

বস্তুত, মৃদুলার অনুযোগের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত যে দুঃখবোধ তাঁকে মুহ্যমান করে রেখেছিল, যতো সময় যেতে লাগল ততোই তিনি তা থেকে দূরে সরে এলেন। ক্রমশ এমন হলো যখন তাঁর মনে কোনো দুঃখ নেই। পরিবর্তে এক ধরনের হৃদয়হীনতা, প্রতিশোধস্পৃহা তাঁর মাথার ভিতর জ্বলে উঠল আগুনের শিখার মতো। কার্যকারণ-সম্পর্করহিত এই স্পৃহা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল, অসহ্য অপমানে জ্ঞানশূন্য, নির্ভার হয়ে উঠলেন তিনি।

ভোর হয়ে আসছিল। দেখতে দেখতে অন্ধকার ফিকে হলো, রহস্যময় চাপা একটু আভা কিছুক্ষণ সুস্থির হয়ে থাকল আকাশে, প্রত্যূষের চঞ্চল এলোমেলো হাওয়া ছুটে এলো জানলা দিয়ে ; দু' একটি পাখির গলা ফুটল আস্তে আস্তে। অল্প শীত-মেশানো হাওয়ায় ঘাস মাটি শিশিরের সজীব গন্ধ নাকে এসে লাগল। প্রকৃতিলোকের এই নিঃশব্দ পরিবর্তন রামতনুর

চেতনায় কোনো তারতম্য সৃষ্টি করল না।

সারা রাতের চিন্তা এতোক্ষণে তাঁর মনে প্রতিজ্ঞার রূপ নিচ্ছিল। এর একটি বিহিত দরকার, রামতনু ভাবলেন, আমার ন্যায়, অন্যায়, অপরাধ-চিন্তা তোমাদের কারো চেয়ে কিছু কম প্রখর নয়। নীরাকে আমার ভালো লাগে ঠিক ; কিন্তু এর মধ্যে গর্হিত বা অন্যায় কিছুই আমি দেখি না। আমি উন্মার্গগামী হইনি, দায়িত্বে কোনো ত্রুটি রাখিনি, সুযোগ নিইনি কোনো ; তোমরা ভেবে দেখ আমার অতীত, আমার পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাস, গতানুগতিক জীবনযাপনে নিজেকে স্থির রেখে আমি শুধু তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করেছি। আর, যা-কিছু বলার, তোমরা অন্যভাবেও বলতে পারতে। কিন্তু, আজ তোমরা যা করছ তা অভিযোগ নয়—বিচার, সন্দেহ নয়—ধারণা। এই ধারণায় উপনীত হবার পথে তোমরা ভুলে গেছ আমাকে, ভুলে গেছ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা ; ভুলে গেছ আমাকে—যে আমি স্বামী, যে আমি পিতা, এই সংসারের ভিতরে ও বাইরে যে আমি তোমাদের অভিন্ন সূত্রে ধরে রেখেছি !

ভোরের প্রথম পরিচ্ছন্নতা ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকতে শুরু করেছিল। রামতনু উঠলেন। এ-বাড়িতে, এই সন্দেহের ভিতর, পরস্পরের কুটিল দৃষ্টির ভিতর আর থাকা যায় না। যেন এই ভেবে তৎপর হলেন তিনি। মৃদুলা তখনো বিছানায়, ঠিক গতরাতের ভঙ্গি, বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে। মূর্ছিত মনে হয়। যেন শোকের অভিঘাত শান্ত করে বিক্ষুব্ধ, আশাহত মৃদুলা এখন নিদ্রা যাচ্ছে। বা, নিদ্রাও নয়, নিতান্তই আচ্ছন্নতা, যে-আচ্ছন্নতা মানুষকে শূন্য করে দেয়। রামতনু হঠাৎ মৃদুলার জন্যে দুঃখ বোধ করলেন। আকণ্ঠ অনাত্মীয়তার ভিতর কোথাও এখনো আছে মৃদুলা ; রামতনু তার জন্যে অদৃশ্য টান অনুভব করলেন।

বৃথা। পরমুহূর্তেই মনে হলো তাঁর, বৃথা। মৃদুলা অন্তত তাঁকে বুঝতে পারত, মূল্য দিতে পারত তাঁদের দীর্ঘকালীন সম্পর্ককে। কিন্তু, কাল রাতে মৃদুলার কণ্ঠস্বরে যে অবিশ্বাস বেজেছে তারপর আর মৃদুলার জন্যে টান অনুভব করার কী মানে হয় !

অতি প্রত্যূষেই রামতনু আজ নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করার জন্যে প্রস্তুত হলেন। মুখ ধুয়ে শেভ করার উদ্যোগ করলেন। বাথরুমের আলো জ্বলছিল—মৃদু, আচ্ছন্ন, রাতের শেষে বলেই সম্ভবত আলোটা অনুজ্জ্বল, অকিঞ্চিৎকর মনে হলো। ভালোই লাগল। বেসিনের জল পড়ার শব্দও ট্যাপ কন্ট্রোল করে যতোটা সম্ভব মোলায়েম করে আনলেন। রাতের শেষ প্রহরে গোপনীয়তা রক্ষার অনাবশ্যক ধর্ম চঞ্চল করে তুলল তাঁকে। এখন তাঁর মধ্যে দুই অস্তিত্ব কাজ করছিল—একজন, যে শিশুর মতো খামখেয়ালি, অপ্রয়োজনীয় ভেবেও পবিত্রতা অর্জনের প্রাণপণ প্রয়াসে মগ্ন ; আর একজন, যার ভিতরে তুঁষের আগুন, ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণতায় অন্যমনস্ক।

শরীর থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে দুই পৃথক অস্তিত্বকে একই সঙ্গে সক্রিয় করে তুললেন রামতনু। আলোছায়ায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় ক্ষুর টানতে টানতে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলেন হঠাৎ, মুহূর্তের অপেক্ষার পর দেখলেন সরু কালো সুতোর মতো একটার পর একটা রক্তের দাগ ফুটে উঠছে। ক্ষুরটা হাতে রেখে অনেকক্ষণ সেই রক্তের প্রতি লক্ষ রাখলেন রামতনু। বিদ্যুচ্চমকের মতো হঠাৎ একটি চিন্তা উঁকি দিল মাথায় : ভূমিকা প্রস্তুত, এই অপমানের পর যদি আত্মহত্যা করি, ক্ষুরটা চেপে ধরি কণ্ঠনালীর ওপর আর একটু শক্তি দিয়ে, তাহলে কেমন হয় ! চমৎকার ; যেন প্রকৃতই একটা পথ খুঁজে পেয়েছেন—প্রত্যূষ

সমাগমে নিরুপদ্রব বাথরুমে আত্মহত্যা—আঃ ! রামতনুর ঠোঁটের কোণে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটল ।

এ-ভাবনাও সাময়িক ; চেতনায় ফিরতে সময় লাগল না । এখন আত্মহনন, আত্মহত্যার অর্থ ওদের ধারণাকে সত্য স্বীকৃতি দেওয়া । ওরা দুঃখিত হয়তো হবে, আকস্মিক বিপর্যয়ে হয়ে পড়বে হতবাক, সঙ্গে সঙ্গে রামতনুর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কেও আর সন্দেহ থাকবে না । তা হয় না, হতে পারে না ।

বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে বাইরে সকাল দেখলেন রামতনু । জানলাগুলো সব খোলা, বিছানার ওপর বেডকভার পাতা, এরই মধ্যে রোদ উঠে গেছে । মৃদুলা ঘরে ছিল না । সকালের খবরের কাগজ ইত্যাদি টেবিলের ওপর গুছিয়ে রেখে গেছে কেউ । আচ্ছন্ন মানসিকতায় আল্‌গাভাবে এইসব লক্ষ করতে করতে অফিসের পোশাক পরলেন রামতনু । গলার কাছে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, জায়গাটা জ্বালা করছিল । হাল্‌কা আঙুল ছোঁয়াতেই ফিকে রক্ত উঠে এলো । রামতনু উপেক্ষা করলেন ।

সকালের এই প্রস্তুতি কিসের জন্যে ! এই বাড়ির, সংসারের প্রধান পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও কেমন এক সঙ্কোচ দ্বিধান্বিত করে তুলল তাঁকে । ঘরটি মনে হলো খুব একা, এই একাকিত্বের ভিতর অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই, যেন তাঁর চতুর্দিকে নিষিদ্ধ সীমানা গড়ে উঠেছে—ঘরের মধ্যেই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন রামতনু । একা, অনেকক্ষণ ।

অনেকক্ষণ পরে নিভা এলো চা নিয়ে । কাঁগজ পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক চোখে একবার নিভাকে দেখলেন রামতনু । কিছু বললেন না ।

নিভা দাঁড়িয়ে থাকল ; যেন কিছু বলতে চায়, বলতে পারছে না, রামতনুর অনুমতির অপেক্ষা করছে ।

অনিচ্ছুকভাবে প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে মুখে দিলেন রামতনু । তারপর শুধোলেন, 'কিছু বলবে ?'

নিভার সঙ্কোচ তবু কাটল না । বলল, 'আপনি আজ তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছেন !'

'হ্যাঁ—'

'ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবো ?'

'না, দরকার নেই ।' একটু বা ক্ষুব্ধ স্বর রামতনুর । সামলে নিয়ে বললেন, 'রুচি নেই । আজ থাক । আমার তাড়াও আছে ।'

রামতনুর উত্তর নিভাকে সন্তুষ্ট করল না । দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়েই থাকল ।

এই মুহূর্তে নিভার উপস্থিতি রামতনুকে বিরক্ত করল । চায়ে চুমুক দিয়ে, নিভা কিছু মনে না করে এমন গলায় বললেন, 'আমার আর কিছু দরকার নেই, মা ।' বলে থামলেন একটু । তারপর হঠাৎই তাঁর কিছু মনে হলো, অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'সুবীর আছে ? ওকে একটু পাঠিয়ে দিও তো ।'

নিভা চলে গেল ।

গভীর শূন্যতা নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন রামতনু । ভিতরের ক্রোধ ও জ্বালা উত্ত্যক্ত করলেও এখন তাঁর মনে হচ্ছিল কাজটা হয়তো ঠিক হলো না । আরো চিন্তা, আরো সময় নেওয়ার দরকার ছিল । সুবীর রূঢ়, অবিবেচক হতে পারে, হঠকারিতার মাথায় কী বলতে কী বলেছে ; বা, যা বলেছে তার সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝেই বলেছে । তিনিও কি অধৈর্য

হবেন ! পিতা হিসেবে তাঁর কি কিছু করণীয় নেই ! সুবীরকে কি তিনি ক্ষমা করবেন !

অলীক, অসার চিন্তা ; রিপুর তাড়না রামতনুর মস্তিষ্কে ঠাঠা করে হেসে উঠল। আজ ক্ষমার অর্থ কাল সুযোগ দেওয়া ; বিশেষত, কাল রাত্রির ঘটনার পর সুবীরকে কিছু না বলার অর্থ নিজের দুর্বলতা আরো বেশি প্রশ্রয় দেওয়া। ইত্যাদি চিন্তায় ক্রোধের শিকড় রামতনুর বহু দূর ভিতর পর্যন্ত নেমে গেল।

সুবীর এলো খানিক পরে। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে ডেকেছিলে ?'

'হ্যাঁ, ভিতরে এসো—'

ঘরে ঢুকে বসল না সুবীর। কঠিন, উদ্যত ভঙ্গি, যেন রামতনুর ডাকে নয়, ও নিজেই একটা বোঝাপড়ার জন্যে এগিয়ে এসেছে। ওর অনমনীয় ভঙ্গি রামতনুকে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলল।

'তুমি নাকি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছ ?' ভূমিকা না করেই যতোটা সম্ভব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন রামতনু। সুবীর চুপ করে আছে দেখে আবার বললেন, 'তোমার মা কাল বলছিলেন—'

'ভাবিনি, ঠিকই করে ফেলেছি।'

সুবীর বলল। ওর গলার স্বর রীতিমতো রূঢ়, ঘৃণা মেশানো।

'কারণ কী ?'

'কারণ তুমি ভালো করেই জানো, বাবা। ঐ নোংরা ব্যাপারটা আমার মুখে আর না-ই বা শুনলে—'

রামতনু স্তম্ভিত, মূক দৃষ্টিতে তাকালেন সুবীরের মুখের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। যেন পিতা পুত্র নয়, এই মুহূর্তে বহু দিনের অবদমিত ক্রোধ নিয়ে দুই শত্রু পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে।

রামতনুর জবাব শোনার অপেক্ষা করল না সুবীর। বলল, 'এ-কথাটা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে ভাবতে পারিনি ! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। আজ তোমার জন্যে আমরা কেউই মাথা তুলতে পারি না, যেখানেই যাই লোকে হাসে। আর কিছু জানতে চাও ?'

এতোটা আশা করেননি রামতনু। সুবীরের কথাগুলো যেন তাঁর এতোক্ষণের সব সংযম ভেঙে দিল। তাঁর মাথা ঘুরছিল, সমগ্র শরীর কাঁপছিল। অনেকক্ষণ চোখের সামনে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তারপর আড়ষ্ট, কাঁপা, তীব্র ক্রোধের গলায় বললেন, 'বেশ। আমি দেখতে চাই, তোমরা আজই চলে গেছ—'

'তাই যাবো। আজই।' ক্রূর হাসল সুবীর, 'আমি মাকেও নিয়ে যাবো। তোমার মচ্ছব এবার তুমি ঘরে টেনে আনো।'

সুবীর চলে যাচ্ছিল, এই সময় কোথা থেকে ছুটে এলো মৃদুলা। এক হাতে সুবীরকে আটকে ধরে রামতনুর দিকে তাকিয়ে প্রখর অনুযোগের গলায় বলল, 'তুমি ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ! আমাকে কি এ-ও দেখতে হবে— !'

যেন নিতান্তই কথার কথা, হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে—মৃদুলা কথাটা শেষ করতে পারল না। রামতনু দেখলেন, কান্নার আবেগ সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে মৃদুলা।

পুরো ঘটনাটাই অবিশ্বাস্য লাগছিল রামতনুর। যেন স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নের ঘোরেই ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে এলেন তিনি। গাড়িতে উঠলেন। তারপর যান্ত্রিক হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরলেন।

॥ চোদ্দ ॥

উদ্দেশ্যবিহীনতায় এক ধরনের নেশা আছে তীব্র, তা গন্তব্যের কথা ভাবায় না। রামতনুও অনেকক্ষণ কিছু ভাবলেন না। গন্তব্য স্থির নেই, তবু যাওয়া—সম্মুখের পথ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল।

না গিয়েও উপায় ছিল না। তখন এমন একটা সময় যখন কলকাতা সবে মাত্র চঞ্চল হতে শুরু করেছে, ট্রামবাসে ভিড় নেই তেমন, মিটার তুলে ট্যাক্সিগুলো যাত্রীর আশায় ছুটছে মন্থর গতিতে। এখন অফিসে যাওয়া যায় না, তার জন্যে অন্তত আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে।

অবশ্য এটা ঠিক, বেরুতে হবে বা বেরুবেন এই রকম একটা চিন্তা নিয়েই খুব সকালে তৈরি হয়েছিলেন তিনি ; কিছুটা ঝোঁকের মাথায়, কিছুটা হয়তো অশান্তির ভয়ে, লজ্জায়। কিন্তু তারপর যা ঘটল তা যেন অবিশ্বাস্য, অসম্ভব এবং ভয়াবহ। নির্বেদ অনুভূতির মধ্যে পুনরায় ঘটনাটা চিন্তা করতে গিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল—নিজের দীনতার ছবিটাই ধরা পড়ল স্পষ্ট হয়ে ; আগাগোড়া ঘটনার স্মৃতি ছায়া বিস্তার করল মনে।

নিজের কথা ভেবে এক ধরনের উদ্বেগ ও অসহায়তা বোধ করলেন রামতনু। একটা আতঙ্কও সৃষ্টি হলো মনে। বড় দীন এই সংসার, আষ্টেপৃষ্ঠে স্বার্থ দিয়ে জড়ানো, কোথাও একটু চিড় খেলেই গোটা ইমারতটা ধসে পড়ে! তা না হলে যতো দোষই তাঁর থাকুক, আজকের বিবাদের ফল হতো অন্য রকম, হয়তো একটা মীমাংসায় পৌঁছুনো যেত। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা অকল্পনীয়, রামতনু যতো ভাবলেন ততোই ঘটনাটা অচিন্তনীয় ও অসত্য মনে হলো তাঁর কাছে। একে একে সব মুখগুলি মনে পড়ল—মৃদুলা, সুবীর, নিভা, সব। আশ্চর্য, সুবীর তাঁর সম্পর্কে ঐ ভাষা ব্যবহার করতে পারল এবং তাঁর সম্মুখেই! আশ্চর্য, মৃদুলার চোখেও শেষ পর্যন্ত রামতনুর রূঢ়তাই ধরা পড়ল! মৃদুলার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ; অথচ, একবারও ভেবে দেখল না, সুবীর কী আচরণ করল তাঁর সঙ্গে—কী জঘন্য, কুৎসিত ভাষায় অপমান করল তাঁকে! অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত!

ভাবনাগুলো ক্রমশ স্থির করে আনল রামতনুকে। এই আহত, ভঙ্গুর সম্পর্ক নিয়ে আবার ওই বাড়িতে ফেরা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দিনে দিনে বিশাল করে গড়েছিলেন সব কিছু, যাদের জন্যে এই আয়োজন তারাই ভোগ করুক। তিনি ফিরবেন না। বয়স হলেও এখনো তাঁর কিছু আছে, অখ্যাতি ও আঘাত সত্ত্বেও তাঁর কর্মক্ষমতায় এতোটুকু টান পড়েনি! উদ্বৃত্ত রসদ নিয়ে কেটে যাবে বাকি জীবন—একান্তে, নির্জনে।

অসম্ভব ফাঁকা লাগছিল রামতনুর, গভীর শূন্যতাবোধ তাঁর চিন্তার ওপর ধোঁয়ার মতো আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করছিল। একই সময়ে এক ধরনের জ্বালা তিক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল মনে।

তারপর, যতো সময় গেল, দুঃখ ও বেদনা ছাড়িয়ে ভীষণ তিক্ততা তাঁর মনের সবটুকু

অধিকার করে নিল। কেন নির্বাসন! ভাবলেন রামতনু। প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও যাদের চিন্তা নীরার প্রতি তাঁকে এতো দিন প্রতিহত করে রেখেছিল, নীরাকে ঘিরে নিষেধের আড়াল রেখেছিলেন তিনি, তারাই আজ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তা হলে আর বাধা কোথায়! এখন তিনি যথেচ্ছ হতে পারেন, নিছক বন্ধুত্ব ও সঙ্গসুখ আরো ঘনিষ্ঠতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সবই পারেন ইচ্ছেমতো, কোন আড়াল না রেখে। লোকচক্ষু? আর তো লজ্জিত হবার কিছু নেই! বিবেক? আমিই পৃথিবীর একমাত্র বিবেকবান নই! ধর্মাধর্মের কথা ভেবেছি ততো দিন, যতো দিন এসবের প্রয়োজন ছিল। এখন আমি নিন্দিত, ধিকৃত, জঘন্যতম মানুষ; স্বামিত্ব বা পিতৃত্ব যার কাছে একটা খোলস মাত্র। এখন আমি নিজের কথা ভাবতে পারি।

আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিগুলো আসছিল পরপর, অবিচ্ছিন্নভাবে। রামতনু আবার সেই জগতে ফিরে এলেন যেখানে নীরা, নীরা, নীরা ছাড়া আর কিছু নেই। হঠাৎ রক্তমাংসে প্রলোভনে সঞ্জীবিত এক নীরা উঠে এলো তাঁর চিন্তায় ও চেতনায়, গ্রাস করল তাঁর সমগ্রতা। নিজেকে বিকৃত ভূমিকায় চিন্তা করতে সামান্য দ্বিধা বোধ করলেন না রামতনু—মনে হলো এটাই স্বাভাবিক, সঙ্গত ও ন্যায়, এর বিকল্প কিছু নেই। সমস্ত শিরার মুখ খুলে দিলেন তিনি, দেহ মনের সর্বত্র ফিন্‌কি দিয়ে ছুটতে থাকল প্রবল ও তপ্ত রক্ত।

যেন হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনতা থেকে রেহাই পেয়েছেন; গন্তব্য সম্পর্কে এখন নিশ্চিন্ত। তাঁর গাড়ির মুখ ঘুরে গেল। এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরার দরজায় পৌঁছে গেলেন রামতনু।

তিনতলার ওপরে ফ্ল্যাট। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই প্রথম অবসাদ টের পেলেন রামতনু। শরীরের ভার দুর্বহ লাগল, হাঁটুতে জড়তা, যেন এক দিনেই তাঁর বয়স বেড়ে গেছে অনেক, উঠতে কষ্ট হচ্ছে, হাঁফ ধরে যাচ্ছে নিঃশ্বাসে।

দোতলা ও তিনতলার মাঝামাঝি জায়গায় দেখা হলো তরফদারের সঙ্গে। ঠোঁটে চুরুট, ব্যস্ত, কোথাও বেরুচ্ছিল হয়তো, অসময়ে রামতনুকে দেখে ভুরু কোঁচকাল। রামতনু অস্বস্তি বোধ করলেন, সঙ্কুচিত হলেন, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নীরার খবর নিলেন।

'ওপরে যান।' ঈষৎ অনিচ্ছুকভাবে বলল তরফদার, 'এনিথিং রং?'

'নো, নাথিং।' রামতনু এড়িয়ে গেলেন। তরফদার থাকছে না ভেবে খুশিই হলেন।

ওপরে গিয়ে বসার পর আরো কিছুটা সময় গেল। নীরা আসতে দেরি করছিল। কারণ বুঝলেন না। ন'টা প্রায় বাজে। এই সময় তিনি অফিসে পৌঁছে যান রোজ। নীরারও তৈরি হওয়া উচিত ছিল।

বাইরে শান্ত রোদ্দুর। যেটুকু আকাশ দেখা যায় এখান থেকে দেখলেন, স্বচ্ছ ও নির্মল, ইতস্তত স্থির হয়ে আছে দু' এক টুকরো মেঘ। ফুরফুরে হাওয়ায় দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের পাতা অল্প অল্প দুলছিল, চতুর্দিকের স্বাভাবিক সুদৃশ্যের মধ্যে একা রামতনু ব্যতিক্রম, শারীরিক ক্লেদ ও মস্তিষ্কের শূন্যতা নিয়ে স্থবিরের মতো বসে থাকলেন।

নীরা এলো অনেক পরে। রুক্ষ ও বিস্রস্ত, মুখের সর্বত্র অনিচ্ছা ছড়ানো, বসতে বসতে হাই তুলল।

'অফিস যাচ্ছ না?' স্বাভাবিকভাবেই কথা শুরু করলেন রামতনু।

নীরা মাথা নাড়ল, যার অর্থ 'না'। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি

এখন !'

'এলাম ।' রামতনু সহাস্য হলেন, 'ইনট্যুইসান পারহ্যাপ্‌স । ভালোই হলো তুমি আজ অফিসে যাচ্ছ না । আমিও যাবো না । বাট, লেট আস মুভ, বাইরে চলো । তোমাকে আমার দরকার, ভীষণ দরকার—'

ঠিক এইভাবে কথাগুলি বলতে চাননি রামতনু, এর মধ্যে কোথায় যেন ছেলেমানুষী আছে, যা তাঁর মতো মানুষের পক্ষে অশোভন । তবু, কথাগুলো বেরিয়ে এলো এইভাবে, নগ্ন হয়ে, রামতনু নিজেকে নিরস্ত করতে পারলেন না ।

নীরা জবাব দিল না । চোখ নিচু করে বসে থাকল । রামতনু ওকে আরো গম্ভীর ও উদাসীন হতে দেখলেন ।

আরো ক'মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন রামতনু ; তারপর পরিষ্কার, ঋজু গলায় বললেন, 'শোন, আমি আমার বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছাড়তে যাচ্ছি । শুধু তোমার জন্যে । আমি তোমাকে চাই নীরা, প্লিজ—'

গলার স্বর বুজে এলো রামতনুর । রক্তের প্রবল আলোড়ন মূক করে দিল তাঁকে । যেন সৌম্য, মার্জিত, রুচিমান ও কেতাদুরস্ত রামতনু নয়, তাঁর ভিতর থেকে উঠে এলো হ্যাংলা, জড়দগব এক বৃদ্ধ । রামতনু অনুভব করলেন প্রবল জ্বরের মতো শারীরিক বিপর্যয়ে কাঁপছে তাঁর সর্বাঙ্গ । নিজের উপলব্ধির ভিতর ছোট, অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলেন তিনি ।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল নীরা । যেন রামতনুর কথাগুলি তাকে স্তম্ভিত করেছে । পরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন । ইউরেকা ছেড়ে একটা ভুল করেছি । আর কোনো ভুল করতে চাই না ।'

নীরা একটু থামল, সাহস সঞ্চয় করল যেন । আবার বলল, 'আমাদের নিয়ে অনেক স্ক্যাণ্ডাল রটেছে, এতো দিন আমি আপনাকে কিছু বলিনি । আপনার ছেলে কাল আমাকে ফোন করেছিল । আমি জানতুম না আপনি আমার সম্পর্কে অন্য কিছু ভেবেছেন । আমার ভবিষ্যৎ আছে, আমি দুঃখিত ।'

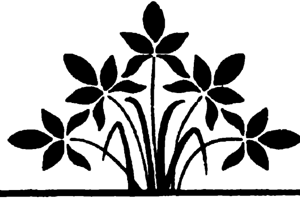
নীরা চুপ করল । ওর চোখ সজল হয়ে উঠেছিল, আলগোছে হাত তুলে চোখ ঘষে নিল । তারপর হঠাৎই বলে উঠল, 'আমার ভালো লাগছে না । আই ফিল সিক, প্লিজ এক্সকিউজ মি—'

একটু নাটকীয়ভাবেই রামতনুকে উপেক্ষা করে পর্দা সরিয়ে অন্তর্ধান করল নীরা ।

রামতনু এখন কী করবেন ! তাঁর চোখের সামনে ঘরের সাদা দেওয়াল ও যাবতীয় আসবাব মুহূর্তের জন্যে আবছা হয়ে উঠল, দিশেহারা শূন্য চোখে ক'পলক জানলার বাইরে অস্পষ্ট আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি । শরীর জুড়ে ঘাম তাঁর কপাল ও ভুরু ছুঁয়ে চোখের ওপর নামল । ঠোঁট কাঁপছিল । ঘরে কেউ ছিল না, তবু যেন কাউকে উদ্দেশ করেই উচ্চারণ করলেন তিনি,'স্যরি। আই'ম স্যরি।' গলা দিয়ে কোনো স্বর বা শব্দ বেরুল না।

আস্তে আস্তে উঠলেন রামতনু । চশমাটা কখন খুলে রেখেছিলেন খেয়াল করেননি । কম্পিত হাতে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিলেন । তারপর রাস্তায় ।

এখন তাঁর কোথাও যাবার নেই, কিছুই করার নেই । গাড়ি চালাতে চালাতে পাশ দিয়ে অনর্গল ট্যাক্সি, মোটর, বাস ছুটতে দেখলেন ; চতুর্দিকে সরব ব্যস্ততা, আত্মমুগ্ধ জনস্রোত—এসবের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই । জীবনের একটি বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ করে এখন তিনি একা, সম্পূর্ণ একা



আমরা

আমরা

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
অগাস্ট্‌ ১৯৭৩ (শ্রাবণ ১৩৮০)
প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৪·০০ । প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

উৎসর্গ :
শুভেন্দু পালিত-কে

॥ এক ॥

আমি তনুশ্রীকে ভালোবাসি, তনুশ্রী আমাকে ; একদিন আমাদের বিয়ে হবে—এইভাবেই শুরু করা যায়।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকে, কী হে, ঠিক তো ? ঠিক ভালোবাসা তো ? উত্তর পাই না। শুধু গভীর এক আবেশে ভরে ওঠে বুক, নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে এলোমেলো। তখন বুঝতে পারি, জলহাওয়ার স্বতঃস্ফূর্ততার মতোই ব্যাপারটা সত্যি—মানে আমাদের এই ভালোবাসাটা, অবর্ণনীয় বলেই বোঝা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় তার প্রয়োজনটুকু।

তনুশ্রীর ভালোবাসা আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয়। গত পাঁচ বছর ধরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে আমার প্রয়োজন সম্পর্কে বা তনুশ্রী সম্পর্কে সমস্ত ধারণা। সেতারের তারের মতো একটু **ছুঁলেই** এখন তা বেজে ওঠে টুংটাং শব্দে ; তার শরীর, মন আর গন্ধের মৃদু কোরাস সারাক্ষণ বেজে যায় আমার রক্তে।

বললাম পাঁচ বছর, ওটা ছ' বছর কিংবা পাঁচ বছরের কিছু কমও হতে পারে। হিসেব-নিকেশে আমি বরাবরই খুব কাঁচা ; আমার ঠিক মনে নেই। বয়স আর জন্মের দিনক্ষণটি মনে থাকে, কেন না, ওটা বাবা-মার দান। বাকি সবই ভুলে যাই। যেমন মনে নেই ঠিক কবে আমার চোখ খারাপ হলো আর চশমা নিলাম ; মনে থাকে না কবে ব্লেড ভরেছি রেজরে, বুধবার না বেস্পতিবার। মাসের শেষে ব্লেডে টান পড়লে বুঝতে পারি গণ্ডগোল হয়ে গেছে হিসেবে। ইনসিওরেন্সের কোয়ার্টারলি প্রিমিয়ামটা কি গত মাসেই দিয়ে দিইনি, বা সহকর্মী মধু বিশ্বাস যে বলেছিল জন্মদিনে নেমন্তন্ন করবে, সেটা কার জন্মদিন— মধুর স্ত্রীর, না তার মেয়ের ? এই রকম। মনে থাকে না। স্মৃতির কাছে বারবার হাত জোড় করে দাঁড়ালেও না।

আরো ভুল করি শব্দ নিয়ে। 'ইণ্ডিপেনডেন্স' আর 'রিপাবলিক' শব্দ দুটো সেবার অবলীলায় জায়গা বদল করে নিল আমার হাতে। ভুলটা ধরা পড়ল বুলেটিন ছেপে বেরুবার পর। খুব হাসাহাসি হলো। বস্ আমাকে আলাদা ডেকে বললেন, 'কী রকম মানুষ মশাই আপনি ! ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির এমন ইম্‌পট্যান্টি একটা দিন, তাও গুলিয়ে ফেললেন ! হোপ্‌লেস, আপনাকে দিয়ে কিস্‌স্যু হবে না !' আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কি আমাকে নিয়ে যে মনে থাকবে ! সাত-পাঁচ ভেবে আর বললাম না। সেদিন ছিল চোদ্দই অগাস্ট। তারিখটা মনে আছে, কারণ সেদিন আমি অপমানিত হয়েছিলাম।

অপমান আমার খুব মনে থাকে।

আমার নাম প্রিয়নাথ মজুমদার। বয়স চৌত্রিশ। ওজন আটান্ন কিলো। উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। রঙ আধময়লা—রবিবার দুপুরে ঘুমোলে বিকেলে ঈষৎ চকচকে দেখায় ; একটু

ঘষামাজা করলে হয়তো ফর্সায় দাঁড়াত। ওজন আর উচ্চতা মিলিয়ে দেখলে যে-কেউই বুঝতে পারবে এক মাস অসুখে ভুগলে আমি খুব তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে যাবো। রোগ-অসুখকে তাই একটু এড়িয়ে চলি। এম-এ। মাথায় চুল আছে এখনো, তবে পাতলা হতে শুরু করেছে। চোখে চশমার কথা তো আগেই বলেছি।

আমার সম্পর্কে জানবার মতো আরো দুটি বিষয়ের একটি চাকরি, অন্যটি আত্মীয়তা। ও দুটো এতোই সাধারণ যে উপলক্ষহীন। চাকরি করি একটা বেসরকারী অফিসে ; আট বছরে বেড়ে বেড়ে মাইনে দাঁড়িয়েছে চারশো সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা। হাতে পাই আরো কম। অর্থাৎ তেমন কিছু নয়।

আগে অর্থে পাঁচ-ছ' বছর আগে, তনুশ্রী আসবার আগে, এ নিয়ে খুব আক্ষেপ হতো মাঝে মাঝে : শালা কী একটা চাকরিই না করছি! মারো গোলি! একদিন ছেড়ে দেবো! ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে ছুটির কিছু আগে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম বহু দূর ; কিন্তু কার্জন পার্কের ভিতর দিয়ে বাঁয়ে মোহন বাগানের তাঁবু আর ডাইনে ইডেন গার্ডেন্স পেরিয়ে গঙ্গার দিকে নয় ; জাহাজের বাঁশি, নদীর জল বা সূর্যাস্তের লাল সম্পর্কে কোনো দিনই কোনো দুর্বলতা নেই আমার। হাঁটতাম সোজা রাস্তায়, চলমান ভিড়ের গায়ে গায়ে, ঘাম ও বেঁচে থাকার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে। নিজেকে বলতাম, প্রিয়নাথ, নামটার মতোই তুই একটা বর্ন বেঙ্গলি রয়ে গেলি, যাকে বলে জীবনটা নিয়ে হেগে-মুতে একাকার হয়ে থাকা, তোর কি কিছু হবে ? ধর, আজ না হোক, দু' বছর বা পাঁচ বছর পরে, উনচল্লিশ, চল্লিশে ? ওইটাই তো পুরুষমানুষের শেষ এফিসিয়েন্সি বার! নাকি চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত টাকি মহকুমার স্বর্গত শিবনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র ও অধুনা কলকাতার ভবানীপুর নিবাসী শ্রী প্রিয়নাথ মজুমদার হয়েই থাকবি ? এই সব প্রশ্নে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে আমার খুব পেচ্ছাপ পেত ও খেয়াল হতো অনেকটা হেঁটেছি ;তলপেট সিরসির করত, শরীর গরগর করত রাগে। রাগটা বিশেষত আশেপাশে তাকিয়ে। প্রিয়নাথ, নিশ্চিন্তে পেচ্ছাপ করার মতো একটা নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিস না! এতো বড়ো কলকাতা শহর বলে কথা, তুই একটা চিজ্ মাইরি! সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেত।

এই সময় একবার আমার ডায়বিটিস হবার উপক্রম হয়। ভালোভাবে ইউরিন ও ব্লাড পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'নাথিং মাচ্। সেরে যাবে।' তারপর, 'ওয়ারিজ বেশি নাকি! ভাবনাচিন্তা খুব বেশি করবেন না, ওতে রোগটা বাড়ে।' ডায়বিটিসের ভয়ে তারপর থেকে ভাবনাটা কম করতে লাগলাম। যেন পুরোপুরি একটা ইচ্ছাধীন ব্যাপার, কমাতে চাইলেই কমে যাবে।

আসলে তা নয়। রাস্তা দিয়ে পাগলা হাঁটতে দেখেছেন তো, হাতে থাকে ছিপ্‌টি বা বাখারি, রাস্তার কেলেকুলো ছেলেদের ক্ষেপানোর উপদ্রবে দেড় মিনিট অন্তর পেছন ঘুরে ছিপটি হাঁকে, ছেলেগুলো ছটকে যায় মাছির ঝাঁকের মতো ; তেমনি। মাছি তাড়াবার জন্যে আমি একটা অন্য উপায় বের করলাম। ছুটির পর চলে যেতাম সিনেমায় বা একটু আগে বেরিয়ে খেলার মাঠে। ফুটবল হয়তো সব সময় থাকত না, পরিবর্তে হকি। আমি কোনো দলের সাপোর্টার ছিলাম না। কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট, হতেও পারলাম না কোনো দিন কারও সাপোর্টার। অথচ মাঠে নামলে চেঁচাতাম উল্লুকের মতো, ফলে দলীয় সাপোর্টাররা পিঠ চাপড়ে দিত—অনেক খেলোয়াড়কে গোল মিস করলে এই সময় আমি চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়েছি। আর কী সব ভাষায়! বেশ বুঝতে পারতাম ছিপটিটা কাজে লাগছে,

ডাক্তারের নির্দেশ মতো ভাবনাগুলোকে আর কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছি না।

আমি বুঝলেও পাশের লোকটি তা বুঝত না। একদিন বৃষ্টিতে তার পাশের লোকটি—পরে তার নাম জেনেছি, বসন্ত দাস, মাঠ থেকে বেরুবার পর ছাতার তলায় টেনে নিল আমাকে। বেশ রগুড়ে লোক। এক ছাতার তলায় যে-রকম হয়, যেতে যেতে আলাপ হলো অনেক—মুখচেনা থেকে প্রায়-ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। প্যাচপেচে বৃষ্টির জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণে, অনেকক্ষণ ধরে আমি এই রকম একটা আড়ালের কথা ভাবছিলাম। সকালেই পেয়েছি নতুন যে-ইন্টারভিউটা দিয়েছি, তার রিগ্রেট লেটার ; মন ভালো ছিল না। এরপর বসন্ত দাস আর আমি রেস্তোরাঁয় ঢুকে চা খাব। চৌরঙ্গিতে পৌঁছে ফুটপাথের স্টল থেকে আমি একটা চকচকে মাসিক কিনলাম—প্রায় ছ' মাস আগে জমা-দেওয়া গল্পটা বেরিয়েছে। চা খেতে খেতে আমার নামের ওপর আঙুল রেখে বসন্ত জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ?' বললাম, 'হ্যাঁ।' কী জানি কেন, বসন্ত দাস হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'আপনি মাইরি লেখক হয়ে ফুটবল দেখতে যান কেন !' কথাটার অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম না। বস্তুত আমি শুনলাম, আপনি মানুষ হয়ে হাঁটেন কেন ! যাই হোক, বসন্ত দাস তারপর বলল, 'দাদা, বর্ষার দিনে একটু বিয়ার খেলে কেমন হতো !' ব্যাপারটা হওয়া না-হওয়া নিয়ে নয়। আমি সঙ্গ দিলে লোকটা খুশি হবে ভেবে সেদিন, সেই প্রথম, এক বোতল বিয়ার খেয়ে ঈষৎ হিমসিম ভাব নিয়ে রাস্তায় নামবার পর বসন্ত দাস আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখ নিয়ে এল কানের কাছে, 'ইন্টারেস্টেড ইন মেয়েমানুষ ?' তারপর আমাকে হ্যাঁ বা না, বা কী দরকার গোছের কিছুই বলতে না দেখে হাঁটতে শুরু করল সামনে। ওর ছাতাটা তখন আমার মাথায়। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে।

রাস্তাটা কর্পোরেসানের বাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে বাঁ-হাতি কোনো একটা গলি। ঢুকলে আলাদা হয়ে যায় কলকাতা থেকে। প্রথমেই চোখে পড়ে টিনের চালা ও কেরোসিনের কুপি, পান, বিড়ি, মুড়ির দোকান, তারপর মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে শাড়ি আর কেউ বা আঁটোসাঁটো ফ্রক পরে, খুঁটি ধরে বা দেওয়ালে হেলান দিয়ে—প্রত্যেকের শরীরে হাঁ-মুখ সাঁড়াশি। বসন্ত দাস হাঁটছে আগে আগে, ঠিক তার পেছনে আমি। একটু ভয় করছিল। বসন্ত দাস সম্ভবত ব্যাপারটা আঁচ করেছিল, আমার কব্জি ধরে টানল, 'শরৎ চাটুজ্জ্যের মতো একখানা নবেল লিখতে পারবেন !' বলে অন্য হাতে গলা চুলকে নিল, 'এসব বাজে মাল আমি ছুঁই না, জানেন। বাঁ দিক ঘুরে শেষের ঘরটা, ওখানে রানী থাকে। পার্টিসানের সময় চলে এসেছিল। তখন বয়স ছিল তিন, তা হলে এখন কতো হয়— ?' দেশ ভাগ হয়েছিল সাতচল্লিশে, তার থেকে তিন বাদ দিলে দাঁড়ায় চুয়াল্লিশ, এইভাবে হিসেবটা কষতে শুরু করেছি, বাঁ দিকে ঘুরে বসন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী ! রানী কোথায় গেল ! এইখানেই তো ছিল, রানীর ঘরটা কোথায় গেল !' দেখি, সামনে একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে, নিরেট দেওয়াল, শাড়ির পাড়ের মতো ওপরের দিকে কয়েক সারি ঘুঁটে—গোবর আর নানা রকম অচেনা গন্ধে থিকথিক করছে জায়গাটা। 'এক সেকেণ্ড', বলে দেওয়াল ঘেঁসে উবু হয়ে বসল বসন্ত। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সমানে ; আমার মাথায় ছাতা। উঠে দাঁড়িয়ে ফাঁকা গলায় বসন্ত বলল, 'রানী কোথায় গেল দাদা !' সেই সময় একটা ফ্রক-পরা বড়োসড়ো মেয়ে এগিয়ে এলো, তার ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়াচ্ছে পানের রস—এমনও হতে পারে তার একটি চোখ কাঁচের, পিক ফেলে বলল, 'এই হিজড়ে দুটো, কী করছিস ওখানে ?' শুনে পড়ি-কি-মরি করে দৌড় দিল বসন্ত। ছাতাটা ফেরত দিতে তারপর এক নাগাড়ে তিন দিন

আমাকে মাঠে যেতে হয়েছিল।

গল্পটা অবান্তর। আমাদের নিয়ে গল্পে আমার এবং জনৈক বসন্ত দাসের এই অসম বিহারের জায়গা নেই কোনো—খুবই কাঁচা ব্যাপার! আমি লিখলে এই অংশটুকু অনায়াসে বাদ দিতাম। তবু যে বলতে হলো কিছুটা বিস্তারিত করে, তার কারণ বেশ পরে একদিন তনুশ্রীকে আমি বলেছিলাম গল্পটা। আমাদের ভালোবাসার আনকোরা গন্ধটা কেটে যাচ্ছে ততো দিনে। আগাগোড়া শুনে তনুশ্রী বলল, 'সত্যি বলছো তো, ঘটনাটা ওইখানেই শেষ হয়ে গেল! তুমি আর কোনো রানীর খোঁজে যাওনি!' বললাম, 'বিশ্বাস হচ্ছে না?' হঠাৎ তার শরীরটা আমার দিকে বেঁকিয়ে আনল তনুশ্রী, আমার কাঁধটা খিমচে ধরে বলল,'গল্পটা ভুলে যেও। কিছু দিন অপেক্ষা করো, যা চাও আমার কাছেই পাবে—'

যেটুকু বুঝি তাতে মনে হয় মেয়েরা এইভাবেই বলে, এই সময় তাদের চোখ-মুখ অসম্ভব তীব্র ও ঘন হয়ে ওঠে। থার্মোমিটার দিলে হয়তো জ্বরও টের পাওয়া যায়। সেদিন আমরা খুব সরল ছিলাম, আমি আর তনুশ্রী। আমাদের আশেপাশে আর-কেউ বা আর-কিছু ছিল না বলে আমি ওর বুকের ভিতর পর্যন্ত অনেকটা দেখতে পাচ্ছিলাম, তার সমগ্র শরীরের গন্ধে ছেয়ে যাচ্ছিল আমার সারা শরীর। সেদিনও না, তারও বেশ কিছু দিন পরে আমি ওকে প্রথমবার চুমু খাই। তবে সেদিন বুঝেছিলাম, ভালোবাসা শুধু ভরিয়েই দেয় না, আস্তে আস্তে ক্ষইয়েও দেয়।

যাই হোক, তনুশ্রী আসবার পরপরই চাকরির দুঃখটা আমি ভুলে যেতে থাকি। তনুশ্রীর জন্যে যতোটা না, তার চেয়ে বেশি অভ্যাসে। বিয়ের সাত দিনের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর জিপ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল আমার পিসতুতো দিদি অমলার স্বামী; শোকে মুহ্যমান ও মূক হয়ে ছিল অনেক দিন, এই অমলাদিও ক্রমশ ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। শ্বশুরবাড়িতে তাকে আর নেয় না—জামাইবাবুর মৃত্যুর জন্যে তারা অমলাদিকে বা তার কূট কপালকে দায়ী করেছিল। দোষ দেবার, দায়ী করবার জন্যে আমি সে-রকম কোনো উপলক্ষ পাইনি বলেই সম্ভবত আরো সহনীয়ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম ব্যাপারটায়। তারপর থেকে এই চাকরিটা আমার আর খারাপ লাগত না; খারাপ লাগত অন্য এবং নতুন কোনো চাকরি কেন পাচ্ছি না এই ভেবে। এই ক'বছরে সবসুদ্ধ কতগুলো ইন্টারভিউ যে দিয়েছি মনে নেই। তবে সংখ্যায় তারা তনুশ্রীকে যতোবার চুমু খেয়েছি তার চেয়ে বেশি হবে কি! জানি না।

এসব নিয়ে আমি যে খুব চিন্তিত তাও নয়। শুধু একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ের কথা এখনো আমার মনে আছে। ইন্টারভিউটা দিতে পারিনি। আর কোনো কারণে নয়; চিঠিটা এলো যেদিন ইন্টারভিউ তার দু' দিন পরে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠি হাতে আমি গেলাম সেই অফিসে; খোঁজ করতে, যিনি হ্যাণ্ডেল করেন তাঁর কাছে পাঠানো হলো আমাকে। 'খামটা কোথায়?' চিঠিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'খামটায় পোস্টিংয়ের ডেট দেখলেই বুঝতে পারতেন ইন্টারভিউটা যাতে না দিতে পারেন সেই জন্যেই দেরিতে পোস্ট করা হয়েছে। এ-নিয়ে মশাই মন খারাপ করবেন না। ইন্টারভিউ দিলেও কি চাকরি হতো!'

ভদ্রলোককে মনে আছে তাঁর সততার জন্যে। এরকম সৎ লোক আমি কমই দেখেছি। মাসখানেক পরে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ট্রামে। সেদিন খুব ভিড়, প্রায় কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, তাঁর হাতের ঘাম আমার হাত ছুঁয়ে গেল; চোখে চোখ পড়লেও সন্দেহ কি তিনি আমায় চিনতে পারলেন না। চেনা কি সম্ভব ছিল! মনে মনে বললাম, ঈশ্বর, এই লোকটির ভুল তারিখে চিঠি পাঠানোর যাবতীয় অসাধুতা ক্ষমা কোরো। সহকর্মী মধু

বিশ্বাসকে একদিন লোকটির কথা বলায় খানিক চুপ করে থেকে সে বলল, 'কী জানি মশাই, আমি তো কোথাও এমন লোক খুঁজে পাই না ! আমার শ্বশুরমশাই মরার পর তিন শ্যালকে মিলে সম্পত্তি যা ছিল ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলে। আজকালকার আইন তো অন্য কথা বলে ! কী বলেন, বউকে দিয়ে একটা মামলা ঠুকিয়ে দেবো ?' আমি চুপ করে থাকলাম। কথাটা হচ্ছিল সততা নিয়ে, আইন নিয়ে নয়। কোনো উৎসাহ থাকলে ল' ক্লাশে ভর্তি হবার ছ' দিন পরেই কি আর ছেড়ে দিতাম !

অমলাদি এখন আমার সঙ্গে থাকে। জামাইবাবু মারা যাবার প্রায় ন' মাস পরে মাত্র তিন মাস আয়ু নিয়ে অমলাদির প্রথম ও শেষ সন্তান জন্মায়। মাত্র সাত দিনের মধ্যে নিজের ভিতর একটি জন্ম আর একটি মৃত্যু সঞ্চারিত করে নিয়েছিল সে—নিশ্চিত প্রবলভাবে বাঁচতে চেয়েছিল অমলাদি, আমি খুব অবাক হয়ে ভাবি। তার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান কম করেও দশ বছর। এই সব ঘটনার বয়স আরো পুরনো। ছুটির দিন বাদে অন্য সব দিনে সে আমার রুমাল, আণ্ডারওয়্যার, গেঞ্জি ইত্যাদি যত্ন নিয়ে কেচে দেয়—জানে তো, দু' জোড়ার বেশি ক্বচিৎ আমি ব্যবহার করতে পারি। এক একদিন রাত্রে পেঁপের ডালনা দিয়ে রেসানের গমে তৈরি রুটি চিবোতে চিবোতে বলে, 'প্রিয়, তুই কি সত্যিই বিয়ে-থা করবি না ? আমি আর কতো দিন টানব !' শুনে ওপর-ওপর হাসি। কিন্তু, 'সত্যিই' কথাটা গেঁথে যায় মনে, বিয়ে করব না, এ-কথা কবে তাকে বলেছি ! হঠাৎ খুব রাগ হয়ে যায়। মনে মনে বলি, মাইরি আর কী, তা হলে তুমিই আমায় টানছ ! নেহাত ফ্ল্যাট ভাড়াটা দাদা দিয়ে দেয়, না হলে তোমার পেছনেই আমার দু' আড়াই শো যেত ! এই ধরনের নীরব বাক্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে আমার আর অমলাদির সম্পর্ক পুরনো হতে থাকে।

ফ্ল্যাটটা নিয়েছিল দাদা। বিয়ের পর ঘরজামাই হতে হলো তাকে—শ্বশুরের পেল্লায় বাড়িতে সে থাকে নিজের ফ্যামিলি নিয়ে। ফ্যামিলি বলতে শাশুড়ি, বৌদি আর দুই ছেলে মেয়ে—জহর আর ইন্দিরা। ওদের নামকরণের মধ্যেই দাদার গভীর স্বদেশপ্রেম ধরা পড়ে। সেটা কিছু নয় ; আমার আশ্চর্য লাগে দাদার দূরদর্শিতা, ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসবার ঢের আগে দাদা কী করে মেয়ের নামকরণের তাৎপর্য আবিষ্কার করেছিল ! জহর আর ইন্দিরা কি ভাইবোন ছিল ! অনেক দিন পরে পরে ওদের ওখানে মাসোহারা আনতে গেলে জহর-ইন্দিরাকে বলি, 'হ্যাঁ রে, তোরা যাস না কেন ! অমলাপিসি তোদের কথা কতো বলে !' ওদের যে-কেউ তখন চটপট বলে, 'যাব কেন ! তোমাদের বাথরুমে কি শাওয়ার আছে ?' 'ছিঃ, ওভাবে বলতে নেই—', কাছেপিঠে থাকলে এইভাবে তিরস্কার করে আমার বৌদি, চমৎকার মধু মাখানো গলায়। বাড়িয়ে বলছি না, একমাত্র বৌদিকে দেখলেই 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন' কথাটার মানে স্পষ্ট হয় আমার কাছে।

সে যাই হোক, অমলাদিকে দাদাই টানছে। 'সত্যিই' কথাটা ব্যবহার করতে পারলে মনে বেশ জোর পায় অমলাদি, ধীরে ধীরে বুঝে ফেলেছি এটা—দাদা গাড়ির সহিস, আমি ঘোড়া, এই কম্বিনেসানে সুখে ফিটন চড়ে বেড়ায় অমলাদি। ঘোড়া বিগড়োলে কি আর আমার ঘরজামাই দাদা ওকে কাঁধে বয়ে বেড়াবে ! স্বামী-সন্তান গেলেও বুদ্ধি যায় না—রুটি আর পেঁপের ডালনা থেকে সংগ্রহ করে নেয় পর্যাপ্ত ভিটামিন ! সারা দিনের পর গেঞ্জিটা চামড়ার মতো লেপ্টে থাকে গায়ে। খুলতে খুলতে ভাবি, অমলাদির ধোয়া-কাচায় এর সমস্ত দূষিত গন্ধ দূর হবে ; ভাবি, আছে, থাক। কী আর এমন ভার ! তেমন কিছু হলে তনুশ্রীও কি ওকে ফেলে দেবে !

তনুশ্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটিও মনে আছে স্পষ্ট। মনে আছে, কেন না সেদিনই প্রথম তনুশ্রীকে আমি দেখি—অদ্ভুতভাবে ও নিজেরা না-জেনে এগোতে থাকি ভবিষ্যতের দিকে।

সেও এক বৃষ্টির দিন ; হয়তো নিঃসম্পর্কিত একটি যুবক আর একটি যুবতীর সাক্ষাতের জন্যে দরকার ছিল এমন একটি বৃষ্টির দিন। মনে হতে পারে বৃষ্টির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে—যেমন কারো কারো থাকে শীত বা গ্রীষ্মের প্রতি, এর আগেই বসন্ত দাসের সঙ্গে এক ছাতার নিচে ঘুরবার জন্যে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত আমাদের হিজড়ে বলা হলো! কিন্তু তা নয়, ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। দেখেছি আমার জীবনের নানা ঘটনার আগে আগে আসে বৃষ্টি। এটাকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি কিছু হেরফের হবে! আমি তো এটাকে সত্যি বলেই জানি ; আর তাই আকাশে মেঘ জমতে দেখলে কেমন একটা উত্তেজনা শুরু হয়ে যায় বুকে ; হয়তো কিছু একটা ঘটবে, কিছু একটা ঘটতে পারে। তখন নিজেকে ঠাণ্ডা করি ছড়া কেটে, 'ঘরপোড়া গরু এক প্রিয়নাথ নাম—'

আমার জন্ম শ্রাবণে ; এক বৃষ্টির রাতে। মাও মারা গিয়েছিল শ্রাবণ মাসে, কলকাতায়, বেশ কয়েক বছর আগে। মৃত্যুর আগে থেকেই খুব বৃষ্টি নামে। তখনো মা সজ্ঞান, বলল, 'প্রিয়, জানলা দরজাগুলো ঠিক ঠিক বন্ধ করেছিস তো। অসময়ে এ কী বৃষ্টি রে বাবা!' কিডনির অসুখে ইতিমধ্যেই তার শরীর ও কথাবার্তা এলিয়ে পড়েছিল—অমন গোটা গোটা করে নিশ্চয়ই বলেনি কথাগুলো, কিন্তু উদ্বেগটা ফুটে উঠেছিল পরিষ্কার। আষাঢ় আর শ্রাবণ এই দু' মাস নিয়ে বর্ষাকাল, পড়েছিলাম কোন ছেলেবেলায়, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে আবার অসময়ের কী আছে! পরে, মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে মনে হলো, এখানে অসময় শব্দটার বোধ হয় আলাদা কোনো অর্থ এসে যাচ্ছে। সেই আলাদা অর্থটা ধরা পড়ল পরে, সেই দিনই রাত্রে মার মৃত্যুর পর ; নিজেই ভাবলাম, বড়ো অসময়ে চলে গেল মা। পরের দিন সকালেও বৃষ্টি থামল না। সারা বর্ষাটা ভীষণভাবে খালি হয়ে থাকল আমার বুক, একটা হাত-পা-ছাড়া অনুভূতিতে ডুবে রইলাম কিছু দিন ; তখনই বুঝতে পারি নাড়িকাটার গল্পটা শেষ হয় দু'জনের যে-কোনো একজনের মৃত্যুর পর। কেমন অগোছালো হয়ে পড়ে সব কিছু! কলকাতার রাস্তা থেকে ট্রাম তুলে নেবার প্রস্তাব হলে রাস্তায় লাইনের দিকে তাকিয়ে এই রকম অগোছালো লেগেছিল নিজেকে, মার মৃত্যুরও অনেক দিন পরে। ট্রামের ঘট-ঘট-ঘটাং-ঘটাং শব্দে এখনো প্রত্যহ বুক ভরে ওঠে, এমনিতরো আরো অনেক শব্দে যেমন হয়। আমি প্রত্যহ বুক খালি হয়ে যাওয়ার কথা ভাবি।

তনুশ্রীর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কথা হচ্ছিল। সেও এক বৃষ্টির দিন—যে-সময় ডায়বিটিসে ধরেছিল তারই কাছাকাছি কোনো একটা দিন। রোগ সেরে এলেও সিনেমা দেখার অভ্যাসটা তখনো ছাড়তে পারিনি। ইভনিং শোয়ে লাইটহাউসে কোনো একটা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, বোধ হয় ডি-সিকার কোনো ছবি, শো ভাঙার পর বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ভিজতে মন্দ লাগে না। খানিকটা হেঁটে এসে আমি একটা পান খেলাম ও সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম চৌরঙ্গির দিকে। পান খাওয়ার ব্যাপারটা মনে থাকার কথা নয় ; মনে আছে এই কারণে যে মুখে পান থাকার জন্যে পরে তনুশ্রীদের সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। আর পানটা আমি বিশেষ খাই না, খেলেই সিগারেট ধরাতে হয়। চৌরঙ্গির ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিতে ফিরব কি না ভাবছি, একটা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ছুটে গিয়ে ধরে ফেললাম। প্রায় সেই সময়েই

তিনটি মেয়ে—'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি' করে ছুটে এলো। ড্রাইভার তখন মিটার ডাউন করছে, তাকিয়ে বলল, 'ভাড়া হয়ে গেছে।' মেয়েদের বিমর্ষ দেখতে আমার খুব খারাপ লাগে, তাই, না-উঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্‌ দিকে যাবেন ?' তিনজনের একজন বলল, 'সাউথে', আর একজন বলল, 'টালিগঞ্জে।' 'আমি ওদিকেই যাবো', বলতে গিয়ে পানের রসে জড়িয়ে এলো কথাগুলো, 'ইচ্ছে হলে আসতে পারেন।' বর্ষার রাস্তায় যুবতীদের সামনে কি পানের পিক ফেলা যায়! ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তখন যে-মেয়েটি আগে কোনো কথা বলেনি, দু'জনের পেছনে একটু তফাতে মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'ভালোই হলো। শেয়ারে যাওয়া যাবে।' এইভাবে পরপর তিনজন পেছনের সিটে গিয়ে বসল, আমি জুঁইফুলের গন্ধ পেলাম—অদৃশ্য থাকলেই বোধ হয় গন্ধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। একসময় ও অনেক কাল ধরে মা'র শরীরে আমি বিশিষ্ট এক গন্ধ পেয়েছি যার সঙ্গে আমার প্রায় একটা ছায়ার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, কোনো বড়ো গাছের ছায়াতে দাঁড়ালেও স্যাঁতসেঁতে, নরম এক রকম গন্ধ পাওয়া যায়। অমলাদির কাছে দাঁড়ালে কী জানি কেন মনে হয় বয়স বেড়ে যাচ্ছে, সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। এ-রকম আরো অনেক গন্ধের কথা বলা যায়। সত্যি বলতে, চশমা নেবার আগে মাত্র ক'দিনের মধ্যে ভিতরে রক্তক্ষরণের জন্যে আমার দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে এলো, ভবিষ্যতে হয়তো অন্ধ হয়ে যাবো এই ভয়ে আমি আমার ঘ্রাণশক্তি প্রখর করে তুলেছিলাম—বেশির ভাগ সময়েই চোখ বন্ধ করে আশেপাশের বস্তু ও মানুষকে বুঝবার চেষ্টা করতাম ঘ্রাণ দিয়ে। নাকটাই দেখতে দেখতে ঢেকে ফেলল শরীরটাকে, আহাম্মক আর কাকে বলে! তবে যে-গন্ধটার কথা এখন বলছি, জুঁইফুলের, মনে হয় তা একটা বয়সের পর বাইরে বেরুনো মেয়েদের প্রায় সকলের গায়েই কম বেশি ছুঁয়ে থাকে। যখন যেমন চলে।

একদিন অফিস ছুটির আগে সহকর্মী মধু বিশ্বাস আমাকে জুঁইফুলের ইংরিজি কী জিজ্ঞেস করে ও পরে বাড়িতে চা খেতে ডেকে নিয়ে যেতে যেতে এক ফাঁকে মনোহারী দোকানে ঢুকে জেস্‌মিন ট্যালকম কিনে বেরুবার সময় বলে, 'বুঝলেন, এই পাউডারের গন্ধটা আমার বউয়ের খুব প্রিয়!' বলবেই তো, ওটাই ফ্যাশান। আমার তখনো বিয়ে হয়নি, সুদূরে তাকিয়ে ভেবেছিলাম আমি বিয়ে করতে করতে হয়তো এই গন্ধটাও পুরনো হয়ে যাবে, আর একটা গন্ধের ফ্যাশান তৈরি হবে ততো দিনে। দিনের পর দিন নতুনকে নিতে পারছে বলেই তো এগিয়ে চলেছে পৃথিবী। পরে তনুশ্রীকে আমি এক শিশি পারফিউম উপহার দিয়েছিলাম। জিনিসটা ওর খুব পছন্দ হয়েছিল, না হলে বলত না, 'ঢেলে দাও।' ওর ঠিক গলার নিচে, হাড় যেখানে মাংসের আড়াল খোঁজে, দু' এক ফোঁটা ঢেলে দেবার পর ও চোখ বন্ধ করল, আমি ততোক্ষণে গন্ধে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছি। মুখ তোলবার পর আলতো গলায় তনুশ্রী জিজ্ঞেস করল, 'গন্ধটা কি সারা রাত থাকবে!' বললাম, 'থাকতে পারে।' তনুশ্রী বলল, 'আজ সারা রাত ঘুম হবে না।' ভালোবাসা হলে মেয়েরা অনেক কথা বলে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বলে ঘুমের কথা বা ঘুম না-হওয়ার কথা ; তনুশ্রীর সঙ্গে মেলামেশা করতে করতেই এই ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এসব ধারণাও দেখতে দেখতে কতো পুরনো হয়ে গেল। এই তো সেদিন, বাসে ওঠার আগে হাই তুলতে তুলতে তনুশ্রী বলল, 'এখন বাড়ি ফিরে ঘুমোতে পারলে বাঁচি!'

ট্যাক্সিতে সামনের সিটে আমি আর পেছনে তিনটি যুবতী। যেতে যেতে ভাবলাম, আমি কি ভবানীপুরে নামব, না শেষ পর্যন্ত যাব ? শেষ মানে যেখানে ড্রাইভার আর আমি ছাড়া

আর কেউ থাকবে না, স্বচ্ছন্দে নেমে যেতে পারব রাস্তার মাঝখানে। এসব ভাবতে পারলাম, কারণ আজ আমার পকেটে কিছু টাকা ছিল। আসলে এই তিনটি যুবতী, তাদের গায়ে জুঁইফুলের গন্ধ, ক্রমশ সম্মোহিত করে ফেলছিল আমাকে। ভাবতে ভালো লাগছিল এদের মধ্যে যে-কোনো একজন আমার নিজস্ব। ভাবতে ভাবতে এক রকম প্রকম্পন অনুভব করলাম শরীরে, শীত দিয়ে জ্বর আসার মতো এবং সেই অস্বস্তিটা কাটাতে একটা সিগারেট ধরাবার আগে কিছু ভেবে পেছনে তাকিয়ে বললাম, 'সিগারেট খেলে অসুবিধে হবে না তো?' বোধ হয় সিগারেট বলিনি, বলেছিলাম 'ধূমপান', 'ধূমপান করলে অসুবিধে হবে না তো?' শুনে মাঝের মেয়েটি বলল, 'না, না, অসুবিধে হবে কেন!' আর ডান দিকের মেয়েটি হঠাৎ খুক-খুক করে হেসে উঠে বাঁ দিকের মেয়েটিকে বলল, 'এই, তোর দিকের কাচটা নামিয়ে দে না!' সেটা এলগিন রোডের কাছাকাছি কোনো জায়গায়। দু' টান দেবার পর কেমন বিস্বাদ লাগতে লাগল মুখে। কিন্তু সিগারেটটা ফেলে দিতে পারলাম না; ভয় হচ্ছিল মেয়েগুলি হয়তো আবার হাসতে শুরু করবে, শব্দে না হোক মনে মনে এবং ভাবতে পারে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছি। বস্তুত, নিজের আচরণের রকমসকম নিয়ে আমার এই সব ছোটখাট দুর্ভাবনা নতুন কিছু নয়, হামেশাই হচ্ছে। বুক ফুলিয়ে কিছু করবার পরেই গরম লোহা যেমন আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হয়ে আসে, তেমনি ভিতরে ভিতরে ন্যুব্জ হয়ে পড়ি ক্রমশ।

যেমন সেবার, ক'দিনের জন্যে সপরিবারে পুরী যাবার সময় মধু বিশ্বাস আমাকে সঙ্গে নিল। একদিন সকালে মধুর বউ, সীমা, সমুদ্রে স্নান করছে, অল্প দূরে ছেলেকে নিয়ে মধু, আমি দেখছি তীরে দাঁড়িয়ে, এমন সময় উঠে এলো সীমা। ভিজেভুজে এক্সা শরীর, ব্রা পরেনি, আমাকে দেখে বুকের ওপর কাপড় টানতে টানতে বলল, 'কী, নামলেন না তো!' আমার পা তখন গেঁথে যাচ্ছে বালিতে, চোখ ফেরাতে পারছি না ওর শরীর থেকে। গলায় থুতু টেনে বললাম, 'স্বাস্থ্য তো বেশ ভালো দেখছি!' সীমা কিছু বলল না, অদ্ভুত ঘন চোখে একবার আমাকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে যেদিকে মধু তার ছেলেকে নিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে হিমসিম খাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল হোটেলের দিকে। আর তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের একটা বড়ো ঢেউ এসে ঢুকে পড়ল আমার বুকে। মনে হলো কথাটা এভাবে বলা ঠিক হয়নি; সীমা, আফটার অল, মধুর স্ত্রী; সে হয়তো অন্য কিছু ভাববে। বরং ভালো করতাম যদি 'স্বাস্থ্য তো বেশ ভালো দেখছি'র আগে 'পুরীতে এসে' কথাটা জুড়ে দিতাম; সীমা কিছু না ভেবেই তার পুরী ভ্রমণের সার্থকতা অনুভব করত! সে আর যা বলার বলে ফেলবার পর ভেবে কী হবে! ফলে চুপসে গেলাম। সীমা মধুকে কিছু বলবে এই ভাবনা থেকে একটা উপায় মাথায় এলো; যেখানে মধুরা স্নান করে উঠে আসছিল সেখানে গিয়ে সুযোগ পাওয়া মাত্র বললাম, 'পুরীতে এসে কিন্তু আপনাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে, মধুবাবু!' আমার দুঃসময়ে মধুর কপাল ফিরে গেল, না হলে তাকে তো আমি উঠতে-বসতে 'শালা' বলি। 'বলেন কী! দু দিনেই—', মধু তার বেঁটেখাটো, লোমে নুন-লাগা শরীরটা দেখে নিল এক পলক, 'বলুন স্যার, পয়সাটা উসুল হলেই বাঁচি।' এইভাবে হোটেলে ঢুকলাম। সীমা ততোক্ষণে গা থেকে সমস্ত জল মুছে ফেলেছে, শাড়িটাড়ি পরে চিরুনি চালাচ্ছে চুলে, যাকে বলে টপ-টু-বটম ব্রাইট, এসব জায়গায় 'গ্লাস উইথ্ কেয়ার' লেবেল লাগাতে হয়। মধু বলল, 'প্রিয়নাথবাবু বলছিলেন আমাদের স্বাস্থ্য নাকি ভালো হয়েছে!' আমার বলা বাক্যটি পুরোপুরি উদ্ধার না করায় ভীষণ রাগ হলো মধুর ওপর। তাড়াতাড়ি

বললাম, 'পুরীতে এসেই এটা হয়েছে— ।' বলে স্বস্তি হলো একটু, ভুরু ও গোঁফের তলায় ঘাম ছুটতে লাগল তিরতির করে। মধুর কথায় কান না দিয়ে সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল সীমা, হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার স্বাস্থ্যটা কিন্তু একটু খারাপ লাগছে— !' বললাম, 'রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি ।' 'পুরীতে এসে স্বাস্থ্য ভালো হয়, ঘুম কি আর হয় !' বউয়ের কথায় মধু বেটাচ্ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। হাসলে ওর কাতলা মাছের মতো বড়ো মাথাটাই শুধু ভেসে ওঠে চোখের সামনে। পরে একদিন তনুশ্রী আমাকে বলেছিল, শরীর স্বাস্থ্য রূপের প্রশংসা করলে মেয়েরা খুশিই হয়। শুনে আমি একটু স্মার্ট হয়ে যাই, মনে পড়ে সীমাকে—ততো দিনে সীমা মধুর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

যা বলছিলাম, সিগারেটটা মাঝে মাঝে টেনে ও বেশির ভাগ সময়েই না-টেনে আমি বসে থাকি স্তব্ধ হয়ে ; অস্পষ্টতা থেকে বেরিয়ে এসে তিন যুবতী ক্রমশ কথা বলতে শুরু করে এবং কথার চেয়ে বেশি হাসে। আমি কিছু করি না, শুধু ভাবি। ডান দিকে তাকালে ড্রাইভারের নির্বিকার মুখ দেখতে হবে বলে বাঁ দিকে তাকিয়ে আমি ক্রমাগত রাস্তা দেখি, একসময় টুক করে ফেলে দিই প্রায়-নিবন্ত সিগারেটটা। তাদের একজন নেমে পড়ে হাজরায় এবং দ্বিতীয় জন কালীঘাটে—পরপর যে-রকম অর্ডারে বসেছিল সেইভাবে। হাতে রইল এক। এই মেয়েটি সম্ভবত টালিগঞ্জে যাবে। একা হওয়ায় আমার কিঞ্চিৎ সাহস হলো, 'আপনি কোথায় নামবেন ?' মেয়েটি তখন রাস্তা দেখছে, জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখার মতো করে, 'এই তো ব্রিজের কাছে।' তখন বৃষ্টিটা চেপে নামল। ব্রিজ পেরিয়ে মেয়েটি বলল, 'বাঁ দিকের রাস্তায় একটু নামিয়ে দেবেন ? কাছেই— ।' ট্যাক্সি বাঁ দিকে ঘোরার পর মেয়েটি আমার দিকে হাত বাড়াল,'এই নিন, আমাদের শেয়ারটা ।' আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালাম, 'কী দরকার ! আমি তো যেতামই— ।' 'আপনি একা দেবেন কেন ! ব্যস, ব্যস, এইখানে— ।' মশার মতো, নীরবে আমার শরীরে চলে আসছে তার রক্ত। মেয়েটি বলল, 'টাকাটা নিয়ে আঙুলটা ছেড়ে দিন ।' বললাম, 'সরি ।' তারপর, সামলে নিয়ে, 'টাকাটা থাক ।' তাড়াহুড়ো করে নামতে নামতে মেয়েটি বলল, 'ধন্যবাদ ।' তারপর ট্যাক্সিটা যখন ব্যাক করছে, দেখলাম বৃষ্টির মধ্যে দরজার আড়ালে চলে যাচ্ছে সে।

তিনজনের মধ্যে সেদিন তনুশ্রীই শেষে নেমেছিল। না হলে যে শেষে নামত তার সঙ্গেই আমার ভালোবাসা হতো। এইভাবেই ভাবি, বৃষ্টি না পড়লে কি প্রিয়নাথ মজুমদার আরো কয়েক বছর বুড়ো হয়ে যেত না !

॥ দুই ॥

পাঁচ বছরের পুরনো ভালোবাসায় 'প্রেম করছি' ভাবটা আর থাকে না, ভালোবাসা তখন পরিষ্কার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ ও আলাদাভাবে তনুশ্রীর কথা কিছু বা সব সময় যে মনে থাকে তা নয়, নিজের হাত-পা চোখের কথাও কি মনে থাকে। তবে সকালে ঘুম ভেঙে উঠে যদি দেখি আমার একটা হাত অদৃশ্য কিংবা চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তা হলে খুব কষ্ট হবে। সেই রকম। কবে যে এটা হলো বলতে পারি না। তবে মোটামুটিভাবে একটি দিনের কথা আমার মনে আছে।

সে-বছরের একদিন সকালে অফিসে বেরুবার আগে অমলাদি হঠাৎ বলল, 'ভাবছি আজ একবার দক্ষিণেশ্বর যাবো। তুই চালিয়ে নিতে পারবি না!'

'চালিয়ে নিতে!'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অমলাদি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল 'যাবো' ও 'তুই'-এর মধ্যবর্তী একটা পুরো সেনটেন্স বলা হয়নি। ওর মনের খবর কবে আর আমি রাখি। বলল, 'সেখান থেকে বীণাদের বাড়ি যাবো ; অনেক দিন যাওয়া হয় না। রাতটা কাটিয়ে ফিরবো।'

'বেশ তো, যেও। আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।'

হোটেলে খাবার কথাটা অবশ্য বলেছিলাম অমলাদিকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে, সে-রকম কিছু মাথায় ছিল না। রাস্তায় বেরিয়ে, কিংবা, বলা ভালো, ভিড়ের জন্যে দুটো বাস মিস করবার পর বিরক্ত হতে হতে হঠাৎই আমার তনুশ্রীর কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ল তনুশ্রীর সঙ্গে ভালোবাসা হবার এতো দিন পরেও কোনো দিন দক্ষিণেশ্বর যাবার মনে হয়নি অমলাদির। বাড়ি থেকে যে একেবারে বেরোয় না তা নয়, আমি জানি না-জানি অমলাদি নিশ্চিত বেরোয় রোজ। অল্প বয়সে বিধবা হলে দুপুরে ঘুম হয় না, বিশেষত একা, নির্জন বাড়িতে। তখন চারিদিক থেকে প্রেতরা এসে শরীরের মাংস খুবলোতে থাকে—কোনো একটা গল্পে পড়েছিলাম। ওই সময়টা অমলাদি খবর সংগ্রহ করতে বেরোয়। সতীশবাবু হেডমাস্টারের মেয়ে শান্তির যে গর্ভপাত করতে হলো এই খবরটা আমাকে সে দিয়েছিল উল্টো করে, অর্থাৎ, 'মেয়েটার কী কপাল দ্যাখ', এইভাবে শুরু করে। বাকিটা বুঝে নিতে হলো। খুব নিরাসক্তভাবেই অমলাদির এই সব কথা আমি কানে তুলি—কোনো রকম দুর্বলতা অনুভব না করে। গর্ভধারণের উপায় থাকলে গর্ভপাত যে কেন হবে না, এটাই বুঝতে অসুবিধে লাগে। একটা সাপ্তাহিকে পড়েছিলাম আমেরিকায় প্রতি বছর মহিলারা যতো গর্ভধারণ করেন, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয় গর্ভপাতে। খুব অন্যমনস্কভাবে এক-একদিন আমি সেই সব অভূমিষ্ঠ শিশুর কথা ভাবি ; জীবনের কতো কাছাকাছি এসে তারা আবার ফিরে যায় নিরাকার মৃত্যুর দিকে ; কখনো মনে হয় তাদের প্রতিভা হয়তো আমাদের জীবন বদলে দিতে পারত। যাই হোক, দীর্ঘ দিন ওই বিষয় নিয়ে—আসলে সতীশবাবু হেডমাস্টারকে নিয়ে—একটা গল্প লিখব-লিখব করেও লেখা হয়ে ওঠেনি। অন্য একটা লিখেছিলাম অমলাদিকে নিয়ে, পরে :বলব।

আপাতত অমলাদিকে নিশ্চিন্ত করে রাস্তায় বেরিয়ে আমার হঠাৎ তনুশ্রীকে মনে পড়ল। চকিতে আমি ওর পা দুটো মুঠো করে ধরে ঝুলিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে নিলাম, ফুঁ দিয়ে রোম উড়িয়ে ভিতরের চামড়া দেখলাম—ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়—খুব কম মুহূর্তেই

এইভাবে আমার মেরুদণ্ড কেঁপে ওঠে। চারিদিকে ইলেকসানের পোস্টার ছাড়া চোখের সামনে বেশ কিছুক্ষণ আর কিছুই থাকে না। দক্ষিণেশ্বরে যাবে বলে অমলাদি নিশ্চয়ই আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বে, ভাবি, বীণারা থাকে সোদপুরে—আগে ওদের ওখানে গেলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া থেকেই শুরু হবে তার দিন, তা হলে হাতে বিশেষ সময় থাকার কথা নয়। আমি অফিসে যাবো কি না বুঝতে পারি না। সর্বাঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে উত্তাপ, আগুনে পোড়া বাসের জ্বলন্ত বিমের মতো মেরুদণ্ডটা আলগা হয়ে আসে শরীর থেকে ; এ-সময় অফিসে না গিয়ে তনুশ্রীকে ফোন করব কি না তাও বুঝতে পারি না। এই সব ভাবনা নিয়ে পরবর্তী একটা বাসে কোনো রকমে শরীরটাকে সেঁধিয়ে দিতেই প্রচণ্ড ভিড় ও বিভিন্ন ঘামের গন্ধ সাদরে আমাকে টেনে নিল ভিতরে। নিঃশ্বাস নেবার আগে মনে পড়ে এ-মাসের মধ্যেই আরো কুড়িটা নতুন বাস চালু হবে, কাগজে পড়েছিলাম। গতবারেও পড়েছিলাম। কিন্তু তনুশ্রীর রোমের গন্ধ তখনো আমার নাকে লেগেছিল বলে ঘাম থেকে সরে আসতে দেরি হয় না। খুব শিথিল ও সম্পর্কহীনভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে এ, ও, সে কথা বলে, আমি ঠিক শুনি না। কানের পাশেই একজন খুব উত্তেজিত হয়ে বলে, 'কবরটা খুব ডিপ করে খুঁড়তে হবে মশাই, না হলে আবার কবে মাথা চাড়া দেয় ঠিক কী !' আমি শুনি না। শুনে কী হবে, বিধানচন্দ্র রায় বলতে এখন তো আমি শুধু বিধান সরণী ভাবি, আর কিছুই নয়। তেমনি এটাও—এই যে নতুন একটা পরিবর্তন হবে বলে শুনছি, লোকমুখে অন্তত প্রায় কুড়ি বছর নিয়ে একটা যুগ চলে যাচ্ছে কবরের তলায়, এও আমাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে না। বাঁ হাতের তর্জনীতে প্রায় উঠে-যাওয়া কালো দাগটার দিকে অন্যমনস্ক তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি তনুশ্রীর কথা ভাবি—মেরুদণ্ডটা জ্বলন্ত বাসের স্ট্রাকচারের মতো আলাদা হয়ে লেগে থাকে পিঠে।

অবশ্য এমন নয় যে এটা নতুন কিছু বা এই ধরনের অনুভূতি আগে কখনো হয়নি। সেবার হর্টিকালচার থেকে বেরিয়ে ন্যাশানাল লাইব্রেরির মাঠে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বজ্র ও বিদ্যুতে আকাশ ফালা-ফালা হয়ে যাবার আগে আমি আর তনুশ্রী বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল ; কিছু দূর এসে বৃষ্টি নামল। শর্টকাটের জন্যে ততোক্ষণে আমরা জেলখানার পেছনের রাস্তা ধরেছি। খালের পাশের পিছল রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গভীর ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে তনুশ্রী হঠাৎ বলল, 'সাঁতার জানি না। যদি হঠাৎ ডুবে যাই !' আসলে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব কি না—এটাই ওর জানার ইচ্ছে। ব্যাঙের মতো পেছনে কয়েক পা ছোঁড়া ব্যতীত যাকে সাঁতার বলে আমিও তা জানি না—সেটা কিছু নয়, তনুশ্রী যতোক্ষণ প্রশ্নটা ঝুলিয়ে রাখল প্রায় ততোক্ষণই আমি ভাবলাম, এতো অল্প ভালোবাসায় কি এতো বড়ো রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে ! তবু, প্রকৃত প্রেমিকের মতো ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, 'ভয় কী !' এটাও আমার নিজের গলা, এই গলাতেও প্রায়ই কথা বলতে হয় আমাকে, কান পেতে শুনলে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরটার মতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই। উপমাটার দোষ নেই ; নিজের সঙ্গে নিজের এই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটা আছে বলেই বলা। সে যাই হোক, 'ভয় কী' বলবার পর সচেতনভাবে তনুশ্রী আগের চেয়ে ব্যবধানটা কমিয়ে আনল। প্রথমে আলগোছে, তারপর ঈষৎ চাপ দিয়ে আমি ওর পিঠ থেকে কোমরে হাত নিয়ে এলাম। আমাদের ভালোবাসা তখনো শিশুকাল পেরোয়নি। আসন্ন বৃষ্টির জন্যে তৈরি হয়ে আছে চারিদিক, ইচ্ছে সত্ত্বেও এইভাবে বেশিক্ষণ হাঁটা গেল না। কালীঘাটের পোল পেরিয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম একটা

চায়ের দোকানে। বেশ বৃষ্টি। দেখতে দেখতে উপুড় হয়ে এলো আকাশ, টিনের চালার ওপর বৃষ্টিপাতের একটা বিরক্তিকর শব্দ শুরু হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো কানে, দেখতে দেখতে বৃষ্টি-বাঁচানো মানুষের ভিড়ে আড়াল হয়ে গেল সামনের রাস্তা। আড়াল থেকেই কে একজন বলল, 'দে মা কালী, পাপ ধুইয়ে দে মা!' সেই শব্দে তনুশ্রী আমার কাছে ঘেঁসে এলো আরো। কাপড়-চোপড় বেশ ভিজে। বসেছিলাম কাঠের বেঞ্চিতে পাশাপাশি, সামনে চায়ের দাগধরা নড়বড়ে টেবিল। কারুর চোখে না পড়ে এইভাবে আমি ওর জানুতে হাত রাখলাম ; যেটাকে বাহু বলে তার পেছনে একটা বেড়ালের মাথা ঘষে যাচ্ছে মনে হলো, নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারি ভিতরে ভিতরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে ও। রক্ত চলাচলের যদি কোনো ধ্বনি থাকে, একটানা বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে এখন তা অনুভব করা যায় স্পষ্ট—নিজের শরীরেই এখন জিব বুলোতে ইচ্ছে করে। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমার কোমরে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে ফিসফিস গলায় তনুশ্রী বলল, 'যাবে না?' অসম্ভব নিভৃত তার গলা, কণ্ঠস্বরের সামান্য তারতম্যে এইভাবে চারপাশের ভিড় ও কথাবার্তা ও বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ থেকে নিজেদের আলাদা করে নিল তনুশ্রী। সেবার যখন এলাহাবাদে তার মামার বাড়ি থেকে বৌদিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম—ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিল দাদা, গভীর রাতে ওপরের বার্থে শুয়ে থাকতে থাকতে কানে এলো এক যুবতী তার স্বামীকে বলছে, 'শোবে না?' আমরা তিনজন ছাড়া সেই কম্পার্টমেণ্টে আর কেউ ছিল না। আর, অবিকল তনুশ্রীর গলায়। ক্রিয়াপদের পার্থক্যটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।' বললাম, 'একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি পাওয়া যায় কি না দেখি।' কথাটা একটু জোরেই বলা হলো, নিজের কানেই কেমন বেখাপ্পা লাগে এবং যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আমাদের দেখার চেষ্টা করে। ভিড় সরিয়ে আমি বেরিয়ে এলেও তনুশ্রীর প্রতি সকলেই একাগ্র, চাপের মুখে ওকে শিশুর হাতে আঁকা দু' দিকে ছিত্‌রে-পড়া নারী-শরীরের মতো লাগে ; 'টাইম' ম্যাগাজিনে পিকাসোর ওপর স্পেশাল ফিচার ছাপা হয়েছিল—তাতেও এমন একটি নারী-শরীর দেখেছিলাম। পিকাসোর কথাটা অবশ্য মনে পড়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আমি যখন অর্থহীনভাবে ট্যাক্সির জন্যে এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করছি তখন, হঠাৎ। না হলে আমার স্মৃতি অত্যন্ত দুর্বল, আগেই বলেছি।

ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। জেলখানার পেটা ঘড়িতে ন'টা বেজে যায়, ল্যাম্প-পোস্টের কাছ ঘেঁসে ঘড়ির দোকানের সাইনবোর্ডের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে যায় তনুশ্রী। তারপর ঘাড়ে প্যাচ-প্যাচে বৃষ্টি নিয়ে প্রায় একই সময়ে আমি আর তনুশ্রী ছুটে যাই তখুনি এসে দাঁড়ানো একটা রিক্সার দিকে। ব্রিজ পর্যন্ত তিন টাকা দর উঠল। বিশেষ আপ্যায়নের গলায় রিক্সাওয়ালা ডেকে নিল আমাদের, 'আসুন না বাবু! নতুন পর্দা লাগিয়েছি, আরাম করে যাবেন।' পর্দা ফেলার পর মনে হয় কথাটা সে ভুল বলেনি। প্রায় হাঁটু সমান জলের ছলাত ছলাত শব্দ ছাড়া তখন আর কিছুই কানে আসছে না। সম্ভবত আমি আর তনুশ্রী একই সঙ্গে সেই ছলাত ছলাত শব্দ শুনতে পেলাম। বাঁ হাতের পুরো বেড় দিয়ে আমি তাকে বুকের কাছে টেনে নিতে নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দেবার আগে ও বলল, 'ভীষণ দেরি হয়ে গেল! কী হবে!' 'হবে' কথাটা আমার কানে পৌঁছল 'অবে' হয়ে। রাত ন'টা আর এমন কী রাত চাকরি করা মেয়ে তনুশ্রীর কাছে! বুঝি না। জীবনের প্রথম চুম্বনের স্বাদ গ্রহণের আগে হয়তো সে ফিরে যেতে চেয়েছিল তার শৈশবের অসহায়তায়—এক

ভারসাম্যহীন, অনাব্য অন্ধকারে।

দক্ষিণেশ্বর যাবার নামে অমলাদি আমাকে এই সব মনে পড়িয়ে দিল। সে একটা সময় গেছে, সত্যি!

তারপর থেকে বেশ কিছু দিন তনুশ্রী বলতে আমি শুধু বুঝতাম তার ঠোঁট ও জিব ও দাঁত, দাঁতের গন্ধ। মুখে এলাচ দিয়ে ঘুরে বেড়াত তনুশ্রী ; হাসত মেপে, ঠোঁট আগের চেয়ে অল্প ফাঁক করে, তা হলেও ওর দাঁতের ঝকঝকে রূপ আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রত্যহ একবারের জায়গায় দাঁত মাজত দু'বার এবং সময় নিয়ে ; 'তুমি কোন্ পেস্টে দাঁত মাজো ?' একদিন জিজ্ঞেস করেছিল। সন্দেহ কি, সেও আমার মতো করে ভাবত। বাংলা খবরের কাগজে সেই পেস্টের বিজ্ঞাপন বেরুলে আমি খানিক অপলকে সেদিকে চেয়ে থেকে লে-আউট, শ্লোগান ইত্যাদি আমূল পাল্‌টে দিয়ে ভাবতাম : এই দু'জন, তনুশ্রী ও প্রিয়নাথ—চুম্বনের পুরো স্বাদ উপভোগের জন্যে এঁরা এই পেস্ট ব্যবহার করেন। কিন্তু সেই পেস্টের এমফ্যাসিস ছিল অন্য দিকে, দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে, চুম্বনের পুরো স্বাদের সঙ্গে পেস্টের যে একটা গাঢ় সম্পর্ক আছে, সেটা আমি বা তনুশ্রী ছাড়া আর কেউ ভাবত কি! 'বা'-এর ব্যবহার এখানে ইচ্ছে করেই, সেই সব সময়ে দুটো শরীরই এক হয়ে যেত—আমি আমার পুরো শরীর নিয়ে ঢুকে পড়তাম তনুশ্রীর ভিতরে বা তনুশ্রী চলে আসত আমার ভিতরে ; আমি ও তনুশ্রী আমি বা তনুশ্রী হয়ে যেতাম। এইভাবে, প্রায়ই ; কিন্তু খুব বেশি আর কোথায়। তনুশ্রীর সব কথা বলতে পারি না ; এটা ঠিক, এক এক জায়গায় কিংবা বেশির ভাগ সময়েই আমি আর তনুশ্রী আলাদা আলাদা। ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত দু'টি নামের মধ্যে ব্যবধান সম্ভবত কয়েক হাজার পৃষ্ঠার ; একই সময়ে চুমু খেলেও ভাত কি আর খাই, নাকি ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরি একই সঙ্গে। আমি—প্রিয়নাথ মজুমদার, আর তনুশ্রী—তনুশ্রী সরকার, ডাকনাম তনু, বয়স ছাব্বিশ, ওজন পঞ্চাশ কি বাহান্ন কিলো, রঙ নিশ্চিত কালো নয়, শ্যাম, মাথায় চুল আছে প্রচুর, স্বাস্থ্য বেশ টান-টান, বি-এ, মাতৃপিতৃহীন, থাকে দাদার সংসারে, চাকরি করে একটা সরকারী অফিসে—ইত্যাদি ইত্যাদি। আর প্রিয়নাথ মজুমদারকে যে ভালোবাসে, সেটা কি এখানে বলা যায় ? হয়তো যায়—এই জন্যে যে, মাঝে মাঝে যেমন আমার মনে হয়েছে, সেদিন তিনটি মেয়ের মধ্যে তনুশ্রী শেষে না নামলে, যে শেষে নামত তার সঙ্গেই আমার ভালোবাসা হতো ; তেমনি দৈবাৎ সেদিন আমার ট্যাক্সিতে না উঠলে তনুশ্রী আর কারও ট্যাক্সিতে উঠত ও শেষে নামত, ফলে তাদের ভালোবাসা হতো। সেদিনটা এইভাবেই তৈরি হয়েছিল। এ-রকম হয়। যেমন তনুশ্রীর বৌদি সুধার সঙ্গে পরে একদিন আমার যে-ব্যাপারটা হয়ে গেল—তার জন্যে আমি কি কখনো প্রস্তুত ছিলাম, বা সুধাও কি এই রকম কিছু একটা হবে ভেবেছিল! নিশ্চিত তা নয়। কিন্তু, এগুলো হয়ে যায়। কেন, কীভাবে, কার কারসাজিতে, বলা আমার পক্ষে অন্তত সম্ভব নয়। ঘটনা ঘটে যায়, তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে পটভূমি। ঘটবার আগে কী ঘটবে বলা মুশকিল। যেমন একদিন—সে অনেক দিন আগের ব্যাপার, আকাশে প্রচণ্ড সূর্য উঠেছিল, এমন প্রখর ও ঝাঁঝালো রোদ আমি কমই দেখেছি, দুপুরে প্রায় নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাথা ও চোখ ও সমগ্র শরীর ছটফট করছিল উত্তাপে, সেই সময় একটা বুড়ো ভিখিরি হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাত পেতে দাঁড়াল। আমি লোকটাকে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু লোকটা আমাকে ছাড়ল না, কানের পাশে ক্রমাগত তার 'কিছু দিয়ে যান, কিছু দিয়ে যান' ডাক বাজতে লাগল। তারপর কী হয়েছে জানি না। যখন হুঁস হলো দেখি খানিক

আগেকার নির্জন রাস্তায় ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে আমাদের ঘিরে, কেউ কেউ মাটিতে বসে-থাকা বুড়ো লোকটার শুশ্রূষা করছে, একজন আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'ভিক্ষে চেয়েছিল বলে মারবেন !' আমি হাত জোড় করে বললাম, 'খুব অন্যায় হয়ে গেছে', এবং পকেট থেকে একটা পুরো টাকা বের করে লোকটিকে দিতে দিতে প্রকৃত অপরাধীর মতো তাকে বললাম, 'খুব অন্যায় হয়ে গেছে— ।' তখন লোকটি টাকাটা নিয়ে নিল এবং তার ফুলে-ওঠা চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কপাল বাবুমশায়, না হলে কি আর—', ইত্যাদি । অথচ, কাউকেই বলতে পারলাম না যা ঘটল তার জন্যে আমার কোনো দায়িত্ব ছিল না, আমি নির্মম নই—আসলে রোদ্দুর সেদিন খুব বেশি ছিল, ফলে আমি খুব নিরুপায় হয়ে পড়ি এবং ঐ লোকটির চেয়ে কম অসহায় বোধ করিনি ।

তনুশ্রী ও আমার মধ্যে এই রকম একটি ব্যাপার ঘটে যাবার পর আমরা আমি বা তনুশ্রী হয়ে যাই । সেদিন রিক্সার মধ্যে এবং তার পরেও কয়েকবার নানা জায়গায় চুম্বন থেকে চুম্বনে আমার (নাকি আমাদের ? তনুশ্রী তো বিয়ে করার কথা ছাড়া প্রায়ই আর কিছু প্রকাশ করত না !) অতৃপ্তি বেড়ে ওঠে ক্রমশ, বুঝতে পারি শরীর শুধু ওষ্ঠ নয়, শরীর মানে সমগ্রতা—প্রখরভাবে সূর্যালোক ঢুকে পড়ে আমার মধ্যে । আমরা একটা ঘর খুঁজতে থাকি । প্রায় এই সময়েই তনুশ্রী ও আমাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । অর্থাৎ, তনুশ্রী আমাদের বাড়িতে আসে, অমলাদির সঙ্গে আলাপ করে । আমিও তনুশ্রীদের বাড়িতে যাই—এমন একটা সময়ে, যখন ওর দাদা বাড়ি ছিল না, ওর বৌদি সুধা ছিল—বসার ঘর বলে কিছু না থাকায় সে আমাকে সোজা টেনে নিয়ে যায় শোবার ঘরে । কিছুক্ষণ পরেই 'গা ধুয়ে আসছি' বলে তনুশ্রী উঠে যায় । সুধা তার দশ বছরের মেয়ে টুনিকে চা করতে পাঠিয়ে বিছানার ওপর বসে অল্প পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'শুধুই বন্ধু, না বিয়ে করবেন ?' আমার উত্তরটা তার কাছে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না, কারণ তার পরেই বলে, 'বিয়ে মানেই তো ঝামেলা । সংসার, ছেলে-পুলে, কী বলবো ভাই, একঘেয়েমি ঘেন্না ধরিয়ে দিল !' বলেই চমৎকারভাবে হাসল, 'আমার কথায় আবার পেছিয়ে যাবেন না যেন !' আমি ওর কোনো কথারই জবাব দিই না ; শুধু ওর অদ্ভুত ফর্সা গায়ের রঙ ও আলতার দাগ মুছে-আসা দু'টি সজীব পায়ের দিকে তাকিয়ে তনুশ্রীর কথা ভাবি । টুনি চা নিয়ে এলে সে কেন তার মায়ের রঙ পায়নি তাই নিয়ে ভাবি । আমাদের বিয়ে হলে যে সন্তান হবে তার কথা ভাবি—সে নিশ্চিত আমার বা তনুশ্রীর মতো হবে । তখনই ঘরের কথাটা মনে পড়ে যায়—আমি ক্রমাগত ভাবতে থাকি । ভাবনাগুলো সব আসে পরপর, কিন্তু পৃথক হয়ে, একটার সঙ্গে অন্যটা জড়িয়ে গেলেও আলাদা করে নিতে অসুবিধে হয় না কোনো । তখন, 'নতুন কী সিনেমা এসেছে বলুন তো ?' বলতে বলতে সুধা তার কোলের ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । সম্ভবত সে এই প্রশ্নেরও উত্তর চায় না কোনো । আমি চুপ করে থাকি । এইভাবে, কিছুক্ষণ পরে, তনুশ্রী আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল । বেরুবার আগে আমি ওর গায়ে সাবানের ভুরভুরে গন্ধ পেলাম, আর রোমের গন্ধ, পেস্টের চমৎকার গন্ধ—তারপর একা একা নেমে এলাম রাস্তায় ।

ঘর পাওয়া যায় না । অমলাদিও বেশ ভালো করে জানে আমি কখন বাড়িতে আসব এবং থাকব, সেই সময়টা ওর বাড়িতে থাকা চাই । না হলে কি আমার অসুবিধে হবে ! কে বোঝাবে । সেদিন তনুশ্রী বাড়িতে এলে এমন আন্তরিক ব্যবহার করল যেন মা'র পেটের বোন । আলাদা হবার জন্যে আমি তখন ছটফট করছি, 'কিছু খাবার-টাবার আছে ?' শুনে

উঠে গেল অমলাদি এবং তনুশ্রীর নাকের পাটা ঘেমে ওঠবার আগেই ময়দামাখা হাতে ফিরে এসে বলল, 'চলো, লুচি বেলতে বেলতে গল্প করি।' তনুশ্রী উঠে গেল, ঘর খালি হলো না।

সত্যি বলতে, তনুশ্রী থাকা সত্ত্বেও তারপর বহু দিন পর্যন্ত আমার এই একা ভাবটা কাটে না। আমাদের বিয়ে হয় না—তেতে-ওঠা মাংস শিথিল হয়ে আসে ক্রমশ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমরা বিয়ের কথা বলি না বা ভাবি না। বলতে বলতে পাশপাশি হেঁটে যাই আমরা, অনেক দূর পর্যন্ত। এক একদিন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় একাই হাঁটছি ; এক একদিন গভীর ডুব-সাঁতারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তনুশ্রী, পাশাপাশি যেতে যেতে অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বলে, 'কিছু বলছিলে ?' তখন মনে হয় প্রিয়নাথ মজুমদার বলে সত্যিই কেউ নেই, আসলে সে আর ল্যাম্প-পোস্ট আর ট্রামের লাইন ইত্যাদি এক এবং অভিন্ন—হৃৎপিণ্ডহীন এক গণতন্ত্রের অংশ। বুক চিরলে গড়িয়ে পড়বে মরচের গন্ধময় অদ্ভুত এক তেল, আর কিছু কাচের টুকরো, বিস্কুটের টিনের ঢাকনা কিংবা অকেজো ট্রানজিস্টরের পুরো যন্ত্রপাতি। এই রকম, ভাবতে ভাবতেই তো পুরনো হয়ে যাচ্ছি, গ্রীষ্ম থেকে এসে পড়ছি কনকনে শীতে।

কিন্তু, ভালোবাসার ব্যাপারটা আলাদা। এক রকমভাবে শুরু হয়ে মাঝখানে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে। টানা কোনো রেলপথ নেই যে উঠলাম, বসলাম, সুতরাং চলে যাওয়া যাবে—মাঝখানে একটা চওড়া নদী এসে গোলমাল করে দেয় সব, যদিও গন্তব্যটা মনে থাকে স্পষ্ট। অর্থাৎ, প্রেম করছি বা যাচ্ছি, এগোচ্ছি ভাবটা আর থাকে না। আর সবই থেকে যায় ঠিক ঠিক।

যা বলছিলাম, অমলাদি দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে। বাস থেকে নেমে আমি সোজা চলে এলাম অফিসে, জ্বলন্ত স্ট্রাকচারটা তখনো লেগে আছে পিঠে। চেয়ারে বসে প্রথমেই এক গ্লাস জল খেলাম, মাথাটা ভরে গেল ধোঁয়ায়। মাথায় ভোঁ ভোঁ এক রকম শব্দ হচ্ছে টের পাই, যেন কাছেই কেউ ছুরি কাঁচি শান দিচ্ছে মেশিনে, আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে আমার গায়ে। ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে কান। অফিস ভর্তি লোকজন, তাদের কথাবার্তা, চেয়ার ঠেলা ও টাইপরাইটারের ক্রমাগত শব্দ চলে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তনুশ্রী তার অফিসে পৌঁছে যাবে, ভাবলাম, যে-কোনোভাবেই হোক খুব তাড়াতাড়ি তার কাছে পৌঁছতে হবে আমাকে। কখন ও কীভাবে যদিও তা আমি এই মুহূর্তেই স্থির করতে পারছি না। সময়টা যদি বা ধরা যায়, উপায়টা কিছুতেই মাথায় আসে না। খুব অনাবশ্যকভাবে টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল টেনে নিই আমি এবং কিছু-একটা করা দরকার এই দুশ্চিন্তা থেকে কাজে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করি—এরই মধ্যে নিশ্চিত একটা উপায় পেয়ে যাব। উপায় ধরা দেয় না, বা নিকটে এসেও ফের চলে যায় দূরে—কৌশিকের রেকর্ড-প্লেয়ারে গান বাজানোর মতো। এই সময়, মানে যখন আমি যে-কোনো উপায়ে তনুশ্রীর কাছাকাছি পৌঁছে তার শরীরে সংশ্লিষ্ট হবার কথা ভাবছি, তখন যে কৌশিকের কথা মনে পড়ল, সেটারও কারণ আছে।

কৌশিক আমার কলেজের বন্ধু, হ্যাণ্ডসাম চেহারা—একটা মার্কেনটাইল ফার্মের এক্সিকিউটিভ। চুম্বনে অতৃপ্ত হতে হতে যে-সময় আমি হন্যে হয়ে ঘর খুঁজছি, প্রায় সেই সময়, একদিন অফিসে ফোন করল কৌশিক, 'প্রিয়নাথ বলছিস ?···শোন, খবর আছে। বিয়ে করছি।' তার একটু আগেই আমি বেরিয়েছি ল্যাভেটরি থেকে, পায়ের পেশীতে টান ধরেছে হঠাৎ ; তনুশ্রীর কথাটাও মনে ছিল। বললাম, 'ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিবি ?' 'তো এই

দেড়ঘরের ফ্ল্যাট রেখে কী করব। নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট নিয়েছি।' নিউ আলিপুর কথাটা এমন মোলায়েম করে উচ্চারণ করল যে আমার মনে হলো বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে আস্ত একটা ট্রেন ঢুকে পড়ছে—গভীর মধ্যরাতে ঘুমিয়ে পড়েছে সকলে, একা প্ল্যাটফর্মে লণ্ঠন হাতে দূর থেকে দূরে যেতে যেতে একটা আবছা মানুষ হেঁকে গেল, নি-উ-আ-লি-পু-র। প্রিয়নাথের সঙ্গে তার দূরত্ব অনেকখানি। কৌশিককে বললাম, 'তোর সঙ্গে কথা আছে, জরুরী।' বলল, 'চলে আয় না। আজ সন্ধেবেলায় আয়—', ইত্যাদি।

, আমি তো বলেই ছিলাম যাব, দরকারটা জরুরী। বস্তুত, একটা ঘরের দরকার। কৌশিক বিয়ে করতে গেলে আমি সেই ঘরে থাকব—আমি আর তনুশ্রী—কৌশিকের ফ্ল্যাটে। চারিদিক থেকে এই সময় সুগন্ধী বাতাস এসে ছেঁকে ধরে আমাকে। সম্ভবত প্রার্থনা পূরণ হতে চলল, ভাবি, কৌশিকের দেড়ঘরের ফ্ল্যাটের বিছানায় আমি আর তনুশ্রী ঢুকে পড়ি পরস্পরের মধ্যে—মাংসময় এক আহ্লাদ ছুটোপুটি করে রক্তে। এইভাবে বিকেল হতে না হতেই চলে যাই কৌশিকের ডোভার লেনের ফ্ল্যাটের দিকে। আমার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে গম্ভীর এক কলকাতা। ট্রাম বা বাস পাওয়া যায় না, এমনকি ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না। সুতরাং পায়ে হেঁটে। দূরত্ব আর এমন কী! আমার সর্বাঙ্গ ফুঁড়ে ঘাম বেরুতে থাকে। চমৎকার সাদা এক আণ্ডারওয়্যার পরে কৌশিক এসে দাঁড়াল দরজায়, তার ফর্সা বুকে ও বাহুতে তখনো ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে আছে; বুঝি এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরুল।

'কী রে, তোর চোখ দুটো অমন গর্তে ঢুকে গেছে কেন!' কৌশিকের এই কথায় নিজের খোঁড়া গর্তের ভিতরে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ি আমি, ওপর থেকে মাটি ছড়াতে থাকে কৌশিক, 'মনে হচ্ছে তিন মণ বোঝা পিঠে নিয়ে এলি! আয়, আয়, ভেতরে আয়।' কৌশিকের সব কিছুই অসম্ভব সাদা, এমনকি তার দেড়ঘরের ফ্ল্যাটের ফার্নিচার পর্যন্ত, ঘরের ভিতরে ঢুকে মেরুন কভারে ঢাকা সোফায় বসতে বসতে আমার মনে হলো, সাদা জানলার পর্দার মৃদু হলদে ক্রেপ, দেওয়ালের হাল্‌কা সবুজ, রেকর্ডপ্লেয়ার, বইয়ের আলমারি, সবই সাদা। প্রবল সাদা রক্তহীন দুটো ঠোঁটের মতো চেপে বসে আমার বুকে। কৌশিক, তুই বিয়ে করতে গেলে দু' একদিনের জন্যে এই ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দিস, এই কথাটা নাড়িভুঁড়ির মতো অজস্র সুতোয় জড়িয়ে যায় আমার বুকে, অসম্ভব সাদা পরিচ্ছন্নতায় মূক হয়ে যাই আমি। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল কৌশিক, নিজে একটা ধরাল। তারপর হঠাৎই রেকর্ডপ্লেয়ারে একটা গান চাপিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই বোস। লেট মি ড্রেস-আপ প্লিজ।' বলে পার্টিসানের ওদিকে চলে গেল। তখন পৃথিবী জুড়ে গান বেজে চলল, 'এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও...' কী? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে আছে গায়কের কণ্ঠ থেকে-থেকেই মোটা থেকে সরু, সরু থেকে মোটা হয়ে যাচ্ছিল, কোথাও স্থির থাকছে না, আগেই তো বলেছি আমার উপায়হীনতার মতো! 'বাস্টার্ড', বলে বেরিয়ে এসে কৌশিক হঠাৎ রেকর্ডটা তুলে নিল, 'বুঝলি, স্পিডটা খারাপ হয়ে গেছে, সিফ্‌ট্‌ করে যাচ্ছে—', মেপে হাসল, 'আই ডোণ্ট মাইণ্ড। এ সবই বেচে দেবো ভাবছি। কী হবে রেখে! আই'ম গোয়িং টু গেট এভরিথিং নিউ, ইনক্লুডিং দ্যাট গার্ল!' আমি বুঝতে পারছি না ফ্ল্যাটের কথাটা কখন ও কীভাবে বলব কৌশিককে, কারণ সবই তো কৌশিক বলছে! সম্ভবত আমার আরো কিছু সময় লাগবে, এইভাবে পরিশ্রান্ত হতে হতে একসময় ঠিক বলে ফেলব। 'দ্যাখ', বলে কৌশিক আমার দিকে একটা ছবি ছুঁড়ে দিল, 'ক'দিন পরে এই মেয়েটো আমার বউ হবে। সি ইজ্‌ ওন্‌লি নাইন্‌টিন। তুই শালা মুখ

দেখছিস শুধু, ফিগারটা দ্যাখ। এসব মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে না নিলে ফিল্মের হিরোইন হয়ে যায়।'

ফ্ল্যাটের কথাটা শেষ পর্যন্ত আর বলা হয় না, কারণ কৌশিকই সব বলে যায়।

বালিগঞ্জ পার্কে বিয়ে হলো কৌশিকের, আমি বরযাত্রী গিয়েছিলাম এবং যতোক্ষণ পারলাম কৌশিকের বউয়ের মুখ থেকে ফিগারে ক্যামেরার মতো লাগিয়ে রাখলাম দুটো চোখ—বিয়ে না হলে এই মেয়েটি সম্ভবত ফিল্মের হিরোইন হতো! তার কথা মনে পড়ল আবার সেদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে, বাসে বা ট্রামে উঠতে না পেরে আমি আর তনুশ্রী তখন হাঁটছি পাশাপাশি। খুব মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনল তনুশ্রী ; বলল, 'সত্যি, পৃথিবীতে অনেকেই এখনো বেশ সুখে আছে— !' খুব শান্ত, আবেগহীন গলা তনুশ্রীর, ঠিক যেভাবে এই সংলাপটি উচ্চারণ করা উচিত, তেমনি, ঠাণ্ডা সিরাপের মতো ওর কণ্ঠস্বর নেমে গেল আমার গলা দিয়ে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি মেয়ে তার প্রেমিককে বলছে, পৃথিবীতে অনেকেই এখনো বেশ সুখে আছে, এটা কি চমৎকার একটা গল্পের বিষয় হতে পারে না!

অমলাদিকে নিয়ে আমি যে-গল্পটা লিখেছিলাম সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়। আসলে ঝামেলা হয়েছিল অমলাদিকে নিয়ে। সম্পাদক বলল, 'বিধবা-টিধবা নিয়ে গল্প মশাই আজকাল আর চলে না। তার ওপর যে-বিধবাটিকে আপনি এনেছেন তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, তার কী হলো না-হলো তাতে কেউ ইন্টারেস্টেড হবে না। একটা রোম্যান্টিক কিছু লিখুন আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে।' গল্পটা পকেটে নিয়ে আমি হাঁটছিলাম ফুটপাথ ধরে। তখন গ্রীষ্ম বা বর্ষাকাল ; শীতকাল হলেও কী আর এমন তফাত হতো! বস্তুত আমার মধ্যে তখন তিরতির করে ঢুকে পড়ছে শীত, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হাত-পা। ঠিক কেন, আমার সমস্ত বোধবুদ্ধি জুড়ে মৃগী রুগীর মতো কেন এমন অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ছে বুঝতে পারি না। অমলাদিকে নিয়ে গল্পে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না, যা ছিল তাকে বলা যায় আমার অনুভূতি, যতো দূর সম্ভব নিরপেক্ষ থেকেও নিশ্চিত সহানুভূতি এড়াতে পারিনি। গল্পটার নাম 'মাছ', ওতে বঁড়শি-বেঁধা একটা ছটফটে মাছের উপমা ব্যবহৃত হয়েছিল—মাছ তার জলের জীবনেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়, কিন্তু, কে না জানে, তার ভবিতব্য শুয়ে থাকে খাবার টেবিলে সুস্বাদু আহার্যরূপে! কিন্তু, যে-বিষয়টা সেই সময় আমি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলাম এবং ওই গল্পে অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়েছিল, তা হলো, ভবিতব্য জীবনকে ছাঁচে ফেলবে, না জীবনই নির্ধারণ করবে ভবিতব্য! অমলাদি মাছ খায় না, মাছ খাওয়া তার জন্যে নিষিদ্ধ, কিন্তু বাজার থেকে আমি যে-মাছের টুকরো আনি পাতে পড়লে তা প্রায়ই ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে—এটা আমার কাছে কোনো রহস্য নয়। তেমনি একপো মাংসের অনেকটাই রান্নার সময় গলে যায় চর্বি হয়ে—এটাও আমার কাছে কোনো রহস্য নয়। আক্ষেপ করে মাঝে মাঝে বলে অমলাদি, 'দেখছিস তো, কোনো কিছুই আজকাল আর আয় দেয় না!' আমি চুপচাপ খেয়ে যাই আর ভাবি বঁড়শি-বেঁধা এক মাছের কথা। তার মুখ-নিঃসৃত রক্তে গভীর বিস্তৃত জল এতোটুকু লাল হয় না! কেন হয় না, কেন রক্ত এতো বেশি তরল আর অর্থহীন, কিছুই বোধগম্য হয় না। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রবল শীত ঢুকে পড়ে আমার শরীরে, পাঞ্জাবির পকেটে খড়খড় করে কাগজ—হাঁটতে হাঁটতে আমি তাকিয়ে থাকি পরপর, সামনে ও পিছনে ধাবমান অজস্র মানুষের মুখের দিকে, বিষণ্ণ, কাতর, অস্ফুট ও বয়স্ক অসংখ্য পুরুষ ও নারীর মুখের দিকে, বর্তমানে থেকেও তারা

আশ্চর্যভাবে হারিয়ে গেছে বর্তমান থেকে বা আজকাল থেকে। আমি নিজেও কি তার মধ্যে আছি! প্রত্যাখ্যান থেকে সন্দেহ, সন্দেহ থেকে ভীষণ অপমানবোধ শুয়োরের মতো ফুঁসে ওঠে বুকের মধ্যে—গল্পহীন সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে হাঁটতে থাকি নীরবে।

তনুশ্রীকে নিয়ে গল্পটা অবশ্য এরও অনেক পরে লেখা। সেটা ছাপা হয়েছিল।

যা বলছিলাম, কৌশিকের রেকর্ড-প্লেয়ারের গানের সুরের মতো অনেকক্ষণ ধরে তনুশ্রীর কাছাকাছি পৌঁছবার যে-কোনো উপায় ক্রমাগত কাছ থেকে দূরে যাওয়া-আসা করতে থাকে, ক্রমশ বুঝতে পারি স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে। তখন, একসময়, নিজেকে 'বাস্টার্ড' সম্বোধন করে উঠে পড়ি—এইভাবে কৌশিকও বলেছিল। একবার ঘুরে আসি ল্যাভেটরি থেকে। তখন সাড়ে এগারোটা, অমলাদি বীণাদের বাড়ি না পৌঁছুলেও নিশ্চিত মধ্যপথে। আমি মনঃস্থির করে ফেলি। প্রথমত তনুশ্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলব এবং তারপর যা যা করার করব। কী করব সেটা অবশ্য নির্ভর করছে তনুশ্রী কতোটা কাছাকাছি আসতে চায় তার ওপর। সম্ভবত সে খুব দ্রুত আসতে চাইবে। যদি না আসে বা ইতস্তত করে...কিন্তু আসবে না এটা ভাবা কি এই মুহূর্তে সঙ্গত! বস্তুত মুখ ফুটে কোনো দিন কিছু না বললেও দিনের পর দিন ও বারংবার ওর চোখ, মুখ ও নিঃশ্বাসে লক্ষ করেছি বন্ধ ঘরের স্পৃহা—যেখানে শুধু আকর্ষণ আর অন্ধকার, যেখানে দৃশ্য জেগে ওঠে স্পর্শে। আমি এইভাবে ভাবতে থাকি, নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে চঞ্চল আর বুদ্ধি একাগ্র। ল্যাভেটরির আয়নায় তাকিয়ে খানিক আগে নিজেকে খুনীর মতো মনে হয়েছিল, আমার সমস্ত শরীর ঢুকে পড়েছিল চোখের মধ্যে। কথাটা কি খুব ভুল বলা হলো! মানে, এই সময় যে আমার মধ্যে খুনীর সতর্কতা ও একাগ্রতা ফুটে উঠছে—এটা কি খুব ভুল ভাবছি! সম্ভবত নয়।

নানা সময়ে ভেবে দেখেছি সব রকম স্বাভাবিকতার মধ্যে একমাত্র খুনীরাই পারে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে—কচ্ছপ যেমন করে ঝড় জল দুর্যোগে নির্বিকার লুকিয়ে রাখতে পারে নিজের মুখ। এটা মনে হয়েছিল বিশ্বম্ভরকে দেখে, বিশ্বম্ভর বাগচী তার স্ত্রীকে খুন করার পর। যখনকার কথা বলছি তার কিছু দিন পরেই তনুশ্রীর সঙ্গে আমার ভালোবাসা হবে। পরিপার্শ্ব থেকে আমার অনুভূতি সরে গিয়ে তখনো তনুশ্রীময় হয়ে ওঠেনি। যে-গলিতে আমাদের ফ্ল্যাট সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে রাস্তার ওপর ইঁটরঙের বিবর্ণ বাড়ি, চওড়া সদর দিয়ে ভিতরে ঢুকলে আর দেখা যেত না বিশ্বম্ভরকে। তার সঙ্গে দেখা হতো ট্রামে, বাসে, রাস্তা পারাপারের সময়, কিংবা গলি ও বড়ো রাস্তার সংলগ্ন রেস্টুরেন্টে ; রথের মেলায় একদিন তাকে স্ত্রী ও দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে পাঁপড়ভাজা খেতে দেখেছিলাম। অদ্ভুত নিরাসক্ত চেহারা ছিল বিশ্বম্ভরের—ফর্সা, লম্বা, রোগা, ছোট কপালের ওপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত নেমে-যাওয়া ঘন কালো চুল, হাসলে হাসিই ফুটত, অর্থাৎ তার সব কিছুই ছিল দ্ব্যর্থহীন—সচরাচর আমরা যাকে সারল্যের প্রতিমূর্তি বলে থাকি। অফিস যাতায়াতের রাস্তায় কোনো-না-কোনো বই থাকত তার হাতে—একদিন তারই পাশে, ট্রামে, ডালহৌসি পর্যন্ত যেতে যেতে বিবেকানন্দের লেখা একটা বই পড়তে দেখেছিলাম তাকে। বইটার নাম মনে নেই। আমার কৌতূহল হলো ও হাসি পাচ্ছিল। তাই দেখে, সম্ভবত কিছু ভেবে বিশ্বম্ভর বলল, 'চারদিকে এতো অশান্তি, মাঝে মাঝে তাই মন ফিরিয়ে নিই।' অশান্তি অর্থে সে কী বোঝাতে চেয়েছিল অনুমানে কুলোয়নি, তবে কথাটা গেঁথে গিয়েছিল মনে। কথাটা সত্যিই ভারী অদ্ভুত, মন ফিরিয়ে নিই—তাই না! সেদিনই আমি ওর সঙ্গে একটু রগড় করার কথা ভেবেছিলাম—ধর্মের দূরত্বে গিয়ে অশান্তি থেকে সত্যিই

রেহাই পাওয়া যায় কি না জিজ্ঞেস করলে হতো। সন্দেহ কি, বিশ্বম্ভর সে-প্রশ্নের জবাব দিত না কোনো, কারণ, আমার ধারণা জবাব যারা দেয় তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দেয়, বই তাদের এ-বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে পারে না। শুধু ধর্ম বিষয়ে কেন, যে-কোনো ব্যাপারেই এটা সত্যি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। খবরের কাগজের মলাটে মুড়ে মধু বিশ্বাস যে অফিসে বসেই এক নিঃশ্বাসে 'ওয়ান হানড্রেড টেক্‌নিকস্ অফ মেকিং লাভ' বইটা পড়ে ফেলেছিল, তাতে কী এমন হাতিঘোড়া লাভ হয়েছিল তার! 'বুঝলেন প্রিয়নাথবাবু', পরে একদিন আমাকে বলে, 'ছ্যাকড়া গাড়ি বোঝেন, চললেও শব্দ হয়, না চললেও হয়—সেই ছ্যাকড়া গাড়ি, লাইফ হলো তাই। ঘটছে না কিছুই, শুধু শব্দ হয়ে যাচ্ছে, শালার কোনো বৈচিত্র্য নেই!' তার কিছু দিন পরেই বৈচিত্র্যহীনভাবে জন্মগ্রহণ করে মধুর দ্বিতীয় সন্তান, একটি মেয়ে। তা বিশ্বম্ভর বাগচী যেদিন তার স্ত্রীকে খুন করে—খুনটা রাত্রেই করেছিল, জানা যায় পরের দিন বেলায়—সেদিনও সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার, রেস্টুরেন্টে একা বসে চা খাচ্ছিল। 'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করতে ঠিক যেমন করে হাসা উচিত তেমনিভাবে হাসল, 'চলে যাচ্ছে। অনেকেই তো আরো খারাপ আছে।' শুনে ভেবেছিলাম, এই তৃপ্ত বৈরাগ্য তার ধর্মগ্রন্থ পাঠের ফল, হতে পারে ধর্ম তাকে এক রকম আশ্রয় দিচ্ছে। আশ্চর্য, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি তখনো, একবারও মনে হয়নি এই লোকটির হাতের ফর্সা ও নমনীয় আঙুলগুলিতে ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে হাড়—শুধু হাড়—নিশ্চুপ শিরার ভিতর মিহি পিঁপড়ের মতো জমতে জমতে ক্রমশ হিংস্র ও আক্রমণশীল হয়ে উঠছে রক্ত। কিছুই বোঝা যায়নি। এমনকি, যারা দেখেছিল তারাই পরে আমাকে বলে, পুলিস এসে গ্রেপ্তার করার পরও নাকি সে নির্বিকার ছিল। এইভাবে খুন করা ও না-করার মধ্যে সে কোনো পার্থক্য রাখেনি। এটাই কি একাগ্রতা ও বুদ্ধির পরিচয় নয়, এই যে বিশ্বম্ভর বাগচী পূর্বাপর উপমাবিহীন হয়ে থাকল!

খবরটা কাগজে বেরোয়নি। বিশ্বম্ভরের জীবন ও কাজে কোনো গল্প ছিল না—তার চেহারা খুব সাদাসিধে ও সরল, সে অফিসে যেত ট্রামে-বাসে, বই পড়ত, বাজারে যেত, চা খেত রেস্টুরেন্টে একা বসে, একদিন বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে রথের মেলায় পাঁপড়ভাজা খেয়েছিল, সে ভাবত তার চেয়ে অনেকেই আরো খারাপ আছে, খুন করার আগে কোনো আতঙ্কজনক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি সে—না, তাকে নিয়ে গল্প হয় না কোনো। গল্প হবার জন্যে দরকার আলাদা চরিত্র ও পরিবেশ, অর্থাৎ ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময় কোনো অবলম্বন—জন ও যানের গতানুগতিকতার মধ্যে দিয়ে সে ছুটবে পুষ্পক রথের মতো। তারপর থেকেই বেশ কিছু কাল ধরে আমি স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতাম বিভিন্ন মানুষের মুখের দিকে, প্রায় প্রতিটি মুখেই চোখে পড়ত বিশ্বম্ভরের আদল এবং অবিকল তার মুখের সাদৃশ্য। তাদের অনেকেই পাঁপড়ভাজা খেত না, কিন্তু বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে বেগুনের দর করত, মাছ কিনতে গিয়ে মেছুনিকে অনুযোগ করত কেন সে আগের দিন ঠকিয়েছে, তারপর মাছ না কিনে অন্য কিছু কিনত। সন্দেহ কি, তাদের অনেকেরই সময়মতো ছেলেমেয়ে হতো। বেশ বুঝতে পারতাম ক্রমশ গল্প থেকে সরে যাচ্ছে এই সব মানুষ, মনে হতো এদের মধ্যে কেউ কেউ খুন করার বা খুন হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আসলে আমার মধ্যে তখন প্রকৃত খুনীর একাগ্রতা ফুটে উঠেছিল। তিনবার চেষ্টার পর তনুশ্রীর অফিসের লাইন পাওয়া যায়। 'ওমা, তুমি!' গলা পেয়ে বলল, 'ফোন শুনে আঁতকে উঠেছিলাম!' তনুশ্রী এইভাবেই বলে, 'কী আশ্চর্য!', 'কী কাণ্ড!' এই সব তার

প্রিয় উক্তি—কখনো-সখনো ফোনে আমার গলা পেলে এইভাবে শুরু করে। আমাকে আর কবে সে ফোন করেছে!

একবার করেছিল, আমি ছিলাম না তখন। 'কে, প্রিয়— ?', লাইন পেয়ে তনুশ্রী এই বলে শুরু করেছিল, প্রিয় সম্বোধনে এদিকে যে ধরেছিল সে ভেবে নেয় রং নাম্বার এবং রগড় করে বলে, 'এখানে কি আপনার প্রিয় আছে !' ঘাবড়ে গিয়ে ফোন ছেড়ে দেয় তনুশ্রী। পরে অবশ্য অনাদি বোসের খেয়াল হয় তার সহকর্মীদের মধ্যে একজনের নাম প্রিয়নাথ মজুমদার ; আমাকে বলে, 'কী করে জানব মশাই আপনার একজন লেডিবার্ড আছে ! তা দেখুন একবার ট্রাই করে, মহিলা হয়তো রাগ করেছেন।' তনুশ্রী বলেছিল, 'নামটা বদলে নাও।' তারপর, 'ইস্, কী একটা নাম !' আমি বলতে পারিনি প্রিয়নাথের পরিবর্তে মধু বিশ্বাস বা বিশ্বম্ভর বাগচী বা অনাদি বোস হলে একমাত্র ফোন করার সুবিধে ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না—ধড়-মুণ্ড অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি থেকে যাব একই রকম।

সে যাক। এই মুহূর্তে তনুশ্রীর কথাটাকে খুব যে আমল দিলাম তা নয়, কারণ আমি তখন ধাবমান বাসের পেছনে পেছনে অনুসরণ করছি অমলাদিকে। তবু বললাম, 'কেন !' তনুশ্রী বলল, 'দাদার অসুখটা কাল রাত থেকে বেড়েছে। ডাক্তার এসেছিল সকালে, হাসপাতালে যেতে হতে পারে।' তনুশ্রীর উদ্বেগ আমি তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করলাম। তখন পর্যন্ত কখনো চোখে না দেখলেও অনুমান করা কী আর এমন শক্ত আলসারে আক্রান্ত সেই রোগীকে—তেলচিটে বালিশের ওয়াড় বদলে দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী, সুধা, যার মুখের বিকৃতি ঘোচাতে পারেনি ! বস্তুত, চোখে না দেখলেও, তনুশ্রীর দাদা নয়নাংশু সম্পর্কে আমি এতো শুনেছি যে মাত্র অনুমান নির্ভর করেই তার সম্পর্কে অনেকটা এগোতে পারি। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অনুভব যতোই ক্ষীণ হয়ে আসে, ততোই এরা—যারা নয়নাংশুর মতো—সচেতন হয়ে ওঠে অন্যদের অস্তিত্ব সম্পর্কে, ক্রমশ শুরু হয় তাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ ! তনুশ্রীই তো বলেছিল নয়নাংশুর ঝাল রান্না খাওয়া বারণ হবার পর থেকে তারাও পারতপক্ষে ঝোলভাত খাচ্ছে। এটা আক্রমণের প্রথম ধাপ। আলসারটা ক্রনিক রূপ ধারণ করার পর থেকে মাঝে মাঝেই অফিস কামাই করে নয়নাংশু—কারণ, অসম্ভব যন্ত্রণায় এই সময় তার পেটের ভিতর নাড়িভুঁড়িগুলো নীল রূপ ধারণ করে। সেই সব সময় সংসারের সমস্ত অনুরাগ ছুটে যায় তার দিকে অথবা তার সমস্ত অনুরাগ সংসারের দিকে, ঠিক বোঝা যায় না। সকালে ঘুম ভাঙার পর গরম ওভালটিন খায়, বাথরুম থেকে বেরিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। মাত্র এই দিনগুলিতেই পৃথিবীর বিভিন্ন উত্থান-পতনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে ওঠে তীব্র, চারিদিকের অদ্ভুত বিশৃঙ্খলায় ত্রস্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে নয়নাংশু, স্ত্রী ও বোনকে ডেকে বলে, 'ইস্, কতো লোক যে খুন হচ্ছে !' এরপর আকস্মিক যন্ত্রণায় বিছানায় এলিয়ে পড়বে নয়নাংশু এবং গরম জলের বোতল ফ্লানেলে মুড়ে ওর পেটের ওপর চেপে ধরবে সুধা—একটি চেনা দৃশ্য। 'কেমন যেন ন্যাওটা হয়ে পড়ে বৌদির !', তনুশ্রী বলেছিল। তার পরবর্তী অনেকটা সময় নয়নাংশুর জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হয়ে পড়ে তনুশ্রী, তাকে অফিসে যেতেই হয়। হাসপাতালে যেতে হতে পারে, এ-রকম সম্ভাবনার কথাও নতুন শুনছি না। এই মুহূর্তে আমার সমস্যা আরো বড়ো—যতো দূর সম্ভব আমি তনুশ্রীর কাছাকাছি পৌঁছতে চাচ্ছি। বললাম, 'তুমি কি আজ পুরো অফিস করবে ?' 'কেন ?' 'মানে, বেরুতে পারবে— ?' তনুশ্রী সময় নিচ্ছে, সম্ভবত আমার প্রশ্নের মধ্যে একটা কেন খুঁজে নিল। 'ম্যাটিনি শো নয় তো ?' সঙ্গে সঙ্গে

কোনো উত্তর দিলাম না আমি, যদিও আমার গোটা শরীরের রোমকূপগুলো তখন ফেঁপে উঠছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়, ব্লটিং পেপারের প্রতিভায় শুকিয়ে আসছে জিব—যেন রিসিভারের মধ্যে দিয়েই আমি ছুঁতে পারছি তনুশ্রীকে। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রেমের। আমি তনুশ্রীকে ভালোবাসি, তনুশ্রী আমাকে—একদিন আমাদের বিয়ে হবে, এ-কথা কতোবার বলব ! আর, সম্পর্কটা যেখানে এই রকম, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমের, সেখানে কি ফ্ল্যাটলি বলা যায় অমলাদি আজ বাড়ি থাকছে না, সুতরাং— ! না, যায় না।

এথিকস বা এটিকেট থেকে দূরে যাওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ, বা, যদিবা কখনো গিয়ে থাকি, চট করে ফিরে আসতে দেরি হয়নি। সেবার পুরীতে গিয়ে মধু বিশ্বাসের স্ত্রী সীমাকে একটা জেলি মাখানো কথা বলে ফেলে কী ঝামেলায় পড়েছিলাম এবং তারপর কী করেছিলাম, সে তো আগেই বলেছি। এটা একটাই দৃষ্টান্ত মাত্র, এ-রকম আরো অনেক আছে। এটাকে বিবেক বা নীতিবোধ যা-হোক কিছু বলা যেতে পারে এবং এসব নিয়ে প্রায়ই ভাবি, ভাবতে ভাবতে নিজের প্রতি প্রশংসায় বুকের মধ্যে টের পাই বসন্তের হাওয়া, তা হলে প্রিয়নাথ এখনো মানুষ হয়েই আছে !

বা, আর একবার যে-রকম হলো—চাকরিতে জয়েন করার পরপরই ঘটনাটা ঘটেছিল। লিফ্‌টে উঠতে যাচ্ছিলাম আমরা ক'জন, বুড়ো নিমাই বেয়ারাও ছিল সঙ্গে, সেই সময় বড়ো সাহেব পি· কে· ডাট এলেন। তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল নিমাই, আমি ফুট করে বললাম, 'চলে এসো, জায়গা আছে।' বস্তুত একজন মানুষের মতো জায়গা তখনো ছিল বলেই বলেছিলাম। নিমাই সম্ভবত কী করবে মনঃস্থির করতে পারছিল না, ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলা, তিনতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত ডাটসাহেব উর্ধ্বমুখ হয়ে থাকলেন এবং তাঁর গায়ে গায়ে, গলার কাছে কাঁচাপাকা চুলঅলা মাথা নিয়ে প্রায় গেঁথে থাকল নিমাই—যেন একই ধড়ে দুটো মাথা। দৃশ্যটা মজার নয় কি ! উপভোগ করে নিজের অগোচরেই হেসে ফেললাম আমি। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম হাসা উচিত হয়নি। বিকেলের দিকে ডিপার্টমেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে আলাদা ডেকে নিচু গলায় বলল, 'কাজটা ভালো করেননি মশাই !' আমি বললাম, 'কেন !' লোকটি দুঁদে, ভাব প্রকাশের জন্যে পুরো তিনটি সেনটেন্সের দরকার হলে শুধু মাঝেরটা বলেই চুপ করে যায়। 'অতো তো এক্সপ্লেন করা যায় না।' বলল, 'অফিসটা তো আর মাছের বাজার নয় যে মনিব চাকরে তফাত থাকবে না ! একটু সামলে-সুমলে চলবেন।' কোনো সচেতনতা থেকে নয়, নিছক মানবিক হবার তাৎক্ষণিক উৎসাহ থেকে আমি যে একটা ঘোরপ্যাঁচে পড়ব, তখনো বুঝতে পারিনি। বুঝলাম, যখন আট মাস পেরিয়ে যাবার পরও আমাকে কনফার্ম করা হলো না। তো সুপারিনটেনডেন্টই একদিন বলল দত্তসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। 'আমি তো রিপোর্টে লিখেইছি আপনি ইজ এ হার্ডওয়ার্কিং ইউজফুল ম্যান।' বলতে বলতে আমার প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে আগুন ধরাল, 'দেখবেন ? দেখাচ্ছি রিপোর্টের কপি। না হলে তো বিশ্বাস হবে না।' তারপরও আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয় এবং সুযোগ বুঝে শেষবেলায় স্লিপ পাঠিয়ে আমি পি· কে· ডাট-এর চেম্বারে ঢুকে পড়ি। তখন আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়, যেমন—যেগুলো মনে আছে সেগুলোই শুধু বলতে পারি, 'ড্যু ইউ অ্যাপোলোজাইস ফর হোয়াট ইউ হ্যাড ডান ?' এটা যে সেই লিফ্‌টের ঘটনার সঙ্গে জড়িত বুঝতে অসুবিধে হয় না। তনুশ্রীর সঙ্গে ভালোবাসা হতে তখনো অনেক দেরি, না হলে হয়তো মেরুদণ্ড খাড়া

করে দাঁড়ানো যেত। আসলে তখন পরপর দুটো ঘটনা ঘটেছিল—মা'র মৃত্যু ও দাদার আলাদা হয়ে যাওয়া। দত্তসাহেব তখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং অবিলম্বে আমার কিছু বলা দরকার, এই অবস্থায় চেম্বারের মধ্যে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে, আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্যার।' তার পরের কথাটা যেন কী ছিল! মনে পড়েছে। 'ড্যু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দি রিলেশন বিটুইন দি বস্ অ্যাণ্ড দি সাবোর্ডিনেট্স্?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, স্যার।' তারপর, 'চাকরি গেলে না খেয়ে মরতে হবে এটা বুঝতে পারেন?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, স্যার।' দত্তসাহেব এরপর কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সেই সময় হঠাৎ কেন জানি না আমার ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ল্যাভেটরির আয়নায় নিজের মুখটা দেখে আসি : কী-রে শালা, কী বুঝছিস! বস্তুত, আমার খুব পেচ্ছাপ পায়, যে-রকম পেয়েছিল প্রথমবার ইণ্টারভিউ দিতে এসে। সেটা কিছু নয়; দামাল ছেলের মতো ছোটখাট এই সব শারীরিক উপদ্রব প্রায়ই আমাকে বিব্রত ও উত্ত্যক্ত করে, অভিভাবকের মতো আমি চেষ্টা করি তাদের শাসনে রাখতে। এমনও হতে পারে দত্তসাহেব সেদিন আমাকে হিপনোটাইজ করেছিলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ বললেন, 'তুমি কি কম্যুনিস্ট?' বোধগম্য হলো না, সুতরাং চুপ করে থাকলাম। 'গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে অফিসে আসো কেন?' ইত্যাদি শেষের এই প্রশ্নগুলোয় আমি দিশেহারা বোধ করি। অবশ্য উত্তর যে ছিল না তা নয়। দত্তসাহেব অমলাদিকে চেনেন না, নতুবা বলতে পারতাম হকার্স কর্নারে অমলাদির জন্যে সেমিজের কাপড় কিনতে গিয়ে এই কাপড়টা আমার পছন্দ হয়ে যায়, সস্তায় দুটো পাঞ্জাবি করাতে পেরে তখন খুব ভালো লেগেছিল।

সেদিন পি· কি· ডাট-এর ঠাণ্ডা চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাঞ্জাবিটা এঁটে থাকল আমার গায়ে। ছুটির পর মধু বিশ্বাস ও অন্যান্যরা ছেঁকে ধরল চতুর্দিক থেকে। 'কী হলো?' 'কিছু হলো?' উত্তরে গম্ভীর গলায় আমি বললাম, 'কম্যুনিস্ট কি না জিজ্ঞেস করছিল।' এখন সব মুখগুলিই দেখাচ্ছে এক রকম। আমি কী বললাম সেটা জানা তাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। 'আই সেড্, দ্যাট মেক্স্ নো ডিফারেন্স। কনফার্ম করার জন্যে কম্যুনিস্ট কি না তা জানার কোনো দরকার নেই।' 'তারপর— ?' 'কী আর! এক মাস সময় চাইল!' খুব ভুল বললাম কি? একটু আগেই তো দত্তসাহেব বললেন, 'নেকস্ট্ মান্থে আপনার কেসটা কনসিডার করব।' শুনে মধু বিশ্বাস বলল, 'আপনার মশাই গাট্স আছে— ।'

সম্ভ্রম নিয়ে কথা হচ্ছিল। যতো দূর সম্ভব আমি সেটা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করি। যেমন এখন। তনুশ্রীকে বললাম, 'তিনটে নাগাদ তোমার অফিসের সামনে দাঁড়াব।' তনুশ্রী বলল, 'আচ্ছা।' সুপুরি মুখে কথা বললে এ-রকম এলানো গলা হয়। ওর সম্মতিতে আমার গায়ে ডানা গজাল। চারিদিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি সুসময় আসছে, তার প্রমাণ আমার আদ্যন্ত আহ্লাদে, তার প্রমাণ আমার ঘন হয়ে আসা রক্তে। ভারসাম্যহীন অদ্ভুত এক উত্তেজনা ওপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে ওপরে আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে ওঠানামা করতে থাকল। যখন খেয়াল হলো, দেখি, তনুশ্রীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হবার অনেকক্ষণ পরেও আমি দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়—চারিদিক জুড়ে শব্দ, হাসি ও গতানুগতিক বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের রেষারেষি, নামহীন বিভিন্ন শব্দের পুনরাবির্ভাব হঠাৎ নাড়িয়ে দিল আমাকে।

চলে যাচ্ছি, অনাদি বোস ডাকল। 'তিনটের সময় অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা পাকা তো?' 'হ্যাঁ,

মানে— ।' ইতস্তত করতে দেখে হাসল অনাদি বোস, 'একটা দেশলাই কাঠি দিন দেখি, কানটা বড়োই চুলকোচ্ছে !' তারপর কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, 'অবশ্য অন্যরাও আজ থাকছে বলে মনে হয় না । শুনছেন তো গরম ! আর ক'টা সিট বাকি ?' আমি কিছু বলতে পারলাম না । অনাদি বোসের সঙ্গে তনুশ্রীর গলার কোনো তফাত করতে পারছি না বলেই বিপত্তি । সেই সময় মধু বিশ্বাস এসে জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়নাথবাবু, যুক্তফ্রন্ট জিতলে কি স্টেট হলিডে হবে ?' উত্তর দিলাম না । কিন্তু, মধু বিশ্বাসকে দেখেই আমার যুগপৎ সীমার মুখ ও প্রিকসান নেবার কথা মনে পড়ল । আমাদের বিয়ে হতে তখনো অনেক দেরি ।

বারোটার কিছু পরে আমি আর মধু বিশ্বাস একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে । বারোটা থেকে একটা, একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে তিনটে—না, আড়াইটে, আমি এইভাবে ভাবলাম । অমলাদি নিশ্চিত পৌঁছে গেছে এতোক্ষণে। তনুশ্রী সিটে । তিনটের কিছু আগে থেকেই সে নিশ্চিত চাঞ্চল্য অনুভব করতে শুরু করবে । তারও আগে, যেখানেই থাকি, ঠিক আড়াইটেয় আমি হাঁটতে শুরু করব তনুশ্রীর দিকে । এইভাবে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে আমি হাঁটতে শুরু করলাম তনুশ্রীর দিকে । পাশে মধু বিশ্বাস । চতুর্দিকে কলকাতা । পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে তিনজন উৎসাহী চেঁচিয়ে গেল, 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ ।' মধু সম্ভবত খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, ওর টাকের ওপর শিশিরবিন্দুর মতো বিজবিজ করছে ঘাম, এমনও মনে হলো আমার যে ওর শরীর কাঁপছে, বলল, 'চারিদিকে কী থ্রিল লক্ষ করেছেন !' বলে, উত্তর না শুনেই, বাঁ দিকে মোড় ঘুরল দ্রুত, 'চলুন, স্টেটস্‌ম্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়াই । লেটেস্ট রেজাল্টটা জানা যাবে ।' কথা না বলে ওকে অনুসরণ করলাম আমি—খানিক আগেই ও ছুটি হবে কি না জিজ্ঞেস করেছিল । কী জানি কেন, এই মুহূর্তে মধু বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব দূরত্বময় মনে হলো ওকে—নামটা চেনা লাগল, কিন্তু পরিচয়ের গভীরে চেনা যে-মানুষটি, তাকে আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না । বা, চিনতে পারলেও, চারিদিক থেকে ছুটে আসা ভিড়ের অন্যান্য মুখগুলির থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না তাকে । এমনও হতে পারে, আমার হঠাৎ মনে হলো, ভিড়ে মিশে-যাওয়া, রোদ্দুর আর উৎসাহে ভ্যাপসা মানুষগুলির অনেকেরই নাম মধু বিশ্বাস, আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় যদি প্রত্যেকেই হয়ে পড়ে স্মৃতিভ্রষ্ট, আর মুছে যায় নাম, যদি প্রত্যেককেই নিয়ে যেতে হয় মর্গে—পোস্টমর্টেম কাউকেই আলাদা বিশেষত্ব দিতে পারবে না । ঠিক জানি না, এদের অনেকেরই নাম হয়তো প্রিয়নাথ মজুমদার—যুক্তফ্রন্ট নামক এক অমূর্ত সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে যারা শুধুই প্রিকসান নেবার কথা ভেবে যাচ্ছে । পরপর শীত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে । খানিক আগে পর্যন্তও যে-স্ট্রাকচারটা জ্বলছিল দাউ দাউ করে এখন তা নিছক ভস্মশেষে পরিণত । এমনও হতে পারে ভিড় আমাকে ক্রমশ ব্যক্তিত্বহীন করে ফেলেছে । দূর থেকে মধু বিশ্বাস আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল—এইমাত্র যুক্তফ্রন্ট তিনটে সিট জিতে এগিয়ে গেল—একদিন নিশ্চিত ছুটির দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে মধু । ইশারায় আমি ওকে কাছে ডাকলাম । 'হেসেখেলে বেরিয়ে যাবে'—মধু এইভাবে শুরু করতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, 'আচ্ছা, মধুবাবু, বার্থ কন্ট্রোলের সব মেজার্সগুলোই কি এফেক্টিভ ?' খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হো হো করে হেসে উঠল মধু বিশ্বাস, এমন শব্দে যাতে সমবেত জনতার অনেকেই তার দিকে তাকাতে পারে । 'হ্যাঁ মশাই, আপনি কি ফ্যামিলি প্ল্যানিং মিনিস্টার হবার কথা ভাবছেন নাকি ?' মধুর কথায় রীতিমতো রসিকতা ছিল, বস্তুত অন্য সময় হলে আমিও হাসতাম । কিন্তু এই মুহূর্তে বিষয়টা জেনে নেওয়া

আমার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী এবং মধু আদৌ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না অনুভব করে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। মধুর নিরাসক্ত ব্যবহারে যতোটা না তার চেয়ে ঢের বেশি প্রিকসান সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু স্থির করতে পারছি না ভেবে। অথচ, এটা তো সত্যিই, অমলাদি দক্ষিণেশ্বরে গেলেও এবং এতো দিনে আমার ও তনুশ্রীর জন্যে নিরুপদ্রব ঘর ও সময় পাওয়া গেলেও আমাদের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন আড়াল থাকা দরকার। মধু কিছু না বলুক, বিরক্ত হয়ে ভাবলাম আমি, প্রিকসান সম্পর্কে যাবতীয় দায়িত্ব আপাতত নিজেকেই নিতে হবে। এটা সেই সময়ের কথা বলছি, যখন মাথার ওপর প্রখর দ্বিপ্রাহরিক সূর্য, তখনো লাল ত্রিভুজের বা সাবসিডাইজ্‌ড প্রাইসে 'নিরোধ' ব্যবহার করুন-এর এতোটা চল হয়নি।

নিজেকে নিয়ে গল্প লেখার ব্যাপারটা কোনো দিন মাথায় আসেনি। নাকি একটু ভুল বলা হলো? বলা উচিত, আমাকে নিয়ে কোনো গল্প হয় না, কারণ, এই মুহূর্তে প্রিকসান নেওয়া সম্পর্কে যেসব কথা ভাবছি এবং ভেবে উত্তেজিত বোধ করছি, সে-রকম দু' একটি অসচারচরের ঘটনা ছাড়া আমার প্রাত্যহিক জীবনযাপনে কোনো উত্তেজনা নেই, উত্থান পতন তো নেই-ই। আমাকে নিয়ে কি কোনো গল্প হয়। তনুশ্রীকে নিয়ে পরে যে-গল্পটা লিখেছিলাম তার নাম ছিল 'আমরা'—সেটা ছাপা হয়েছিল; সেই গল্পে কাঁধ নুইয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমি কিছুটা ঢুকে পড়েছিলাম। আসলে তার নায়ক ছিল কৌশিক, যে ইনক্লুডিং দ্যাট গার্ল সব কিছুই নতুন করে পেতে অভ্যস্ত, যে বস্তু-নির্বস্তু, প্রাণ-অপ্রাণ সব কিছুকেই সমান গলায় বাস্টার্ড সম্বোধন করতে পারে। সে সমাজ-সচেতন, আমার মতো ল্যালাক্ষেপা নয়। বিয়ে হবার ঢের আগেই সে জেনে যায় কোন মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে এবং তার শরীরের গড়ন ও গায়ের রঙ কী রকম হবে এবং বিয়ে না হলে সেই মেয়ে ফিল্মের হিরোইন হবে কি না। অর্থাৎ তার ধারণাগুলি সবই নিজস্ব, বিবেচনাপ্রসূত ও পূর্বকল্পিত। যে-মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে তাকে শো-রুম থেকে নতুন গাড়ি বের করার মতো ব্যবহারের জন্যে ড্রাইভ করে আনবে সন্তর্পণে। এ-সবই সে জানে পুরোপুরি ও নির্ভুলভাবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব কিছু জেনেশুনেও অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তার ভালোবাসা হবে না বা গড়ে উঠবে না কোনো শারীরিক সম্পর্ক। সে খুব ভালো করেই জানে মানুষের ক্লাশ আছে, শরীরের কোনো ক্লাশ নেই—শরীর শ্রেণীহীন। প্রায় এই জায়গা থেকেই আমার সেই গল্পটা শুরু হয়েছিল। গল্পের নায়ক নায়িকার নাম অবশ্য কৌশিক বা তনুশ্রী ছিল না। তাতে কী যায় আসে। তনুশ্রীর সঙ্গে হঠাৎ-পরিচয়ের বেশ কিছু দিন পরে কৌশিক একদিন তাকে ব্যবহার করার কথা ভাবে। চিন্তা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তার খুব দেরি হয় না। নিজের অফিস থেকে তনুশ্রীকে তার একান্ত ফ্ল্যাটে আসতে বলে গাড়ি হাঁকাল কৌশিক, মাঝে চৌরঙ্গির কোনো দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চকোলেট ও কনট্রাসেপ্টিভ কিনে রওনা দিল ফ্ল্যাটের দিকে। প্রিয়নাথের সঙ্গে কৌশিকের তফাতটা এখানে স্পষ্ট। প্রিয়নাথ চৌরঙ্গিতে যায়নি, ধর্মতলা স্ট্রিটের কাছাকাছি এক গলি ও রাস্তায় পারাপার করেছিল কয়েকবার—একটা চায়ের দোকানে বসে অপেক্ষা করেছিল। অনেকক্ষণ, ঠিক আড়াইটেয় তার যাত্রা শুরু হয় তনুশ্রীর দিকে। তারপর তনুশ্রীর অফিসের উল্টো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার পর অপেক্ষা। প্রিয়নাথকে নিয়ে গল্প হয় না। কারণ, সে অপেক্ষায় অভ্যস্ত। অথচ, কৌশিককে দেখুন, কেমন সহজে সে তনুশ্রীকে টেনে আনতে পারল নিজের ফ্ল্যাটে। তারপর যা যা করার করল। তার পরেই তার মনে পড়ল

ককটেল পার্টির কথা ; তনুশ্রীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না। মাঝপথে ব্যবহৃত জিনিসের মতো তনুশ্রীকে সে নামিয়ে দিল গাড়ি থেকে, মুখে হাসি—'বাস্টার্ড' বলল না, বলল, 'আবার দেখা হবে।' গাড়িটা চলে যাবার পর পোড়া পেট্রোলের গন্ধ এসে লাগল তনুশ্রীর নাকে, বুঝতে পারে সে ব্যবহৃত—তীব্র অসহায়তা ও অপমানবোধের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে দেখা হবে কথাটার মানে কী। খুব জোলো লাগছে ! তা হলে হবে কী, গল্পটা ছাপা হবার পর খুব হৈ চৈ পড়ে যায়—সেক্স, ক্লাস কনফ্লিক্ট এবং শেষ অব্দি ট্র্যাজেডি—কী ছিল না সেই গল্পে ! তবে সে-গল্পের নাম 'আমরা' কেন হবে আজও আমি তা বুঝতে পারি না।

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যায় একলা বাড়ি পেয়ে সেই প্রথম আমাদের জানাজানি হলো। আমি তৈরি ছিলাম। বেলা আড়াইটে কেন তারও ঢের আগে থেকে একটু একটু করে ধাবিত হচ্ছিলাম তনুশ্রীর দিকে। প্রতিদিনের সব যাত্রার কথা বর্ণনীয় নয়, বস্তুত কিছু থেকে যায় অস্ফুট, বীজের মতো। ভাষা প্রবঞ্চনা করে। সে একটা বিশেষ দিন। জোর মিটিং হবে বলে চারিদিকের জনস্রোত যেমন পড়ি-কি-মরি করে ছুটে যায় মনুমেণ্ট ময়দানের দিকে, তেমনি, সেদিন, আমার সমস্ত রক্ত, অনুভূতি, প্রতিভা ও বোধ ছুটে যাচ্ছিল তনুশ্রীর দিকে। আশেপাশের সমস্ত রাস্তা তনুশ্রীকে নিয়ে ধাবিত হচ্ছিল আমার বাড়ির দিকে। কারণ, অমলাদি ছিল না। তো সেদিনই আমি বুঝতে পারি তনুশ্রীর বয়স ছাব্বিশ নয়, কমবেশি তিরিশও হতে পারে। তাতে কিছু যায় আসে না। আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় সে ঈষৎ অবিন্যস্ত হয়ে পড়ছে লক্ষ করি—তার পরেই শুরু হয়ে যায় তার প্রবল প্রতি-আক্রমণ। খেলোয়াড়হীন সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর সুন্দর বল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে ; মনে হয় হাততালির শব্দ তুলে আমার সর্বশরীরে ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা বিক্ষুব্ধ পাখি। তনুশ্রীর চোখের কোণে জল দুলতে থাকে, ঠোঁটে আলগা হাসি, গোটা শরীরে ঘুম ভেঙে জেগে-ওঠার প্রফুল্লতা। বাক্যহীন সে চেয়ে থাকে আমার দিকে, আমাকে ছাড়িয়ে আরো দূরে, কথা বলে না কোনো। তার বয়স ছাব্বিশ কি তিরিশ এই মুহূর্তে সেটা আদৌ ভাববার বিষয় নয় ; আসল কথা, বোধ হয় সেদিনই প্রেম করছি ভাবটা অন্তর্হিত হয়ে যায়, তনুশ্রী আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। গুছিয়ে বললে বলতাম সে আমার সত্তার অংশ হয়ে উঠল। কিন্তু ওসব গোলমেলে কথায় আমার আস্থা নেই খুব—মধু বিশ্বাসের মতো একটা লোক মাঝে মাঝে উঠে আসে আমার ভিতর থেকে এবং জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ মশাই, প্রিয়নাথবাবু, সত্তা ব্যাপারটা কী ! সেই সব সময় কেমন অধস্তন মনে হয় নিজেকে, সত্তা কী বুঝি না ! এক সময় নিজেই বিছানা ছেড়ে উঠে যায় তনুশ্রী। বিছানায় আধশোয়া বসে ও সিগারেট ধরিয়ে আমি ওর চলা, হাঁটা, ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ানো, আঁচলে মুখ মোছা, চুল আঁচড়ানো সমস্তই দেখি ; বয়স ছাব্বিশ কি তিরিশ সেটা কিছু নয়—দেখি তার সমগ্র রূপ জুড়ে ছেয়ে আছে বন্যার জল-সরে-যাওয়া মাটির আভা। তনুশ্রী আমাকে ছাড়ে না। রাস্তায় নামার আগে সে হঠাৎই আমার কাছে ঘেঁসে আসে—প্রায়ান্ধকার সিঁড়িপথ, 'তুমি খুশি তো ?' আলাদাভাবে খুশি হবার কী আছে বুঝি না, অন্ধকার বলেই আমার আলতো হাত ছুঁয়ে যায় ওর পিঠ। রাস্তায় নেমে তনুশ্রী আমাকে এক প্যাকেট ভালো সিগারেট কিনে দেয় ; মাসের গোড়া নয়, তবু—তনুশ্রী ঈষৎ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। বলে, 'আমার সঙ্গে বাড়িতে চলো।' এভাবে কোনো দিন যাইনি। বললাম, 'তোমার দাদা থাকবে।' 'সেই জন্যেই—।' কথাটা ঘুরিয়ে নেবার আগে তনুশ্রী ট্রাম দেখে, 'এতো দিন

ভুগছে। গেলে আলাপটা হয়ে যাবে।' প্রতিরোধ থেকে বশ্যতায় নেমে আসে তনুশ্রী। ট্রাম আসে, বাস আসে, আমাদের যাবার তাড়া থাকে না। তনুশ্রী ঘড়ি দেখে না। একটা প্রসেসান চলে যায় স্লোগান দিতে দিতে। মনে পড়ে যুক্তফ্রন্ট—যে-রাস্তায় আমরা হেঁটে যাচ্ছি একদিন সেই রাস্তায় খুব সাবলীলভাবে হেঁটে যেত বিশ্বম্ভর বাগচী, খুন না করলে বা পুলিস তাকে ধরে নিয়ে না গেলে এখন সে ওই রেস্টুরেন্টে বসে থাকত একলা, চুপচাপ ; মনে পড়ে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে অমলাদি, দু'টি ঘোড়ার ছবি সারাক্ষণ তাকে নিশ্চিন্ত করে রাখে। মধু বিশ্বাস জিজ্ঞেস করেছিল স্টেট হলিডে হবে কি না। যদি হয়, সেদিন আমরা সিনেমা দেখতে যাবো। অমলাদি কি রোজই এমন দক্ষিণেশ্বর যাবে!

আমি একটা ট্যাক্সি ডাকি। হাঁটা-চলায় কেমন নরম হয়ে থাকে তনুশ্রী, খুব আস্তে, অন্যমনস্কভাবে ট্যাক্সিতে ওঠে। শরীরের শিকড় নেমে গেছে তার ভিতর দিয়ে—সম্ভবত সে এখন নিজেকে প্রোথিত দেখতে চায়।

॥ তিন ॥

'আমাদের নিয়ে একটা ভালো ফিল্‌ম্ হতে পারে—'

'যাঃ!'

'হ্যাঁ। পারে। অবশ্য তার কোনো নায়ক নায়িকা থাকবে না।'

'আমরা?'

'কেন!'

'তা হলে আমাদের নিয়ে কেন!'

'আমাদের নিলে ছবি চলবে না। আমাদের গতানুগতিকতা আছে, ক্যারেক্টার নেই। লোকে ক্যারেক্টার চায়, অর্থাৎ চরিত্র, আর ঘটনা। তুমি বা আমি—আমাদের যে-কেউ একজন বড়োলোক হলে এটা হতে পারত।'

'কীভাবে!'

'কীভাবে? বলছি। আসলে নায়কের চেয়ে নায়িকা বড়োলোক হওয়াই ভালো। আমাদের মধ্যে প্রথমে কোনো চেনাশোনা থাকত না। নায়িকার একটা গাড়ি থাকত। সে কলেজে, না ইউনিভার্সিটিতে, পড়ত, একদিন গাড়ি নিয়ে পিকনিক করতে যেত। তার সঙ্গে থাকত তার সহপাঠী বড়োলোক বন্ধুরা। গরিব নায়ককেও তার সহপাঠী করতে পারলে ল্যাঠা চুকে যায়—যদিও প্রথম প্রথম নায়িকা তাকে পছন্দ করবে না তেমন—'

'তারপর?'

'নায়িকা সাঁতার জানে না। পিকনিক করতে গিয়ে সে একটা পুকুরে ডুবে যাবার মতো হবে। তার বড়োলোক বন্ধুরা লেকে রোয়িং শিখলেও সাঁতার জানে না। নায়ক সাঁতার জানে, কারণ সে গাঁয়ের ছেলে, শহরে এসেছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং নায়িকাকে উদ্ধার করবে। সমস্ত ব্যাপারটা আউটডোরে ঘটলেই ভালো হয়—সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে উদ্ধারপ্রাপ্ত নায়িকার প্রায়-নগ্ন শরীরের একটা সামঞ্জস্য ঘটতে পারে। নায়িকার আত্মোপলব্ধির পক্ষে এ-রকম সিকোয়েন্স দরকার। যদিও নায়কের প্রতি তার

কৃতজ্ঞতা—মানে, ভালোবাসা আর কি, প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবে—'

'শেষ হলো না !'

'শেষ ! না, শুরু হলো মাত্র । এটা টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ ভাগ—এখন লোকে এইমাত্র ঘটনায় চমকায় না । ইতিমধ্যে কিছু মহৎ ব্যাপার আনতে হবে । নায়ককে তার ক্লাশের মধ্যে রেখেই ক্লাশের ওপরে নিয়ে যেতে হবে, একটা সংগ্রাম-টংগ্রাম কিছু দরকার । শেষ দৃশ্যটা এ-রকম হতে পারে— । নায়ক একটা মিছিল পরিচালনা করতে করতে এগিয়ে যাবে, তার ওপর হামলা হবে, ভাড়াটে গুণ্ডাদের হামলা—গুরুতর আহত হয়ে সে হাসপাতালে পৌঁছে যাবে । এ-খবর যখন নায়িকার কাছে পৌঁছুবে তখন সে বন্ধু পরিবৃত হয়ে হাসি-মস্করায় মশগুল । হঠাৎ টেলিফোন তাকে বিপর্যস্ত করে দেবে । উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে আসবে সে, তাদের দুটো গাড়ির একটাও তখন বাড়িতে থাকবে না, কারণ বাবা ও মা দু'জনেই বেরিয়ে গেছে, সুতরাং পায়ে হেঁটে —না, এখানে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাওয়া ভালো । কারণ, আহত অজ্ঞান নায়ক চোখ খুলেই যাতে নায়িকাকে দেখতে পারে—'

'এ তো সাজানো ব্যাপার !'

'তাতে কী ! পাবলিক এ-রকমই চায় । অগোছালো বলেই সাজানো দেখতে তার লোভ !'

'আমাদের নিয়ে ছবিটা তা হলে কী হবে !'

'হয়তো হবে না । হলেও খুব কষ্টকর ব্যাপার—'

'কেন !'

'কারণ তার কোনো নায়ক নায়িকা থাকবে না । ঘটনা থাকবে না । শুধু গতানুগতিকতা থাকবে, ট্রাম থাকবে, বাস থাকবে, নানা রকম শব্দ থাকবে—'

কথাটা ওই, শব্দ । চারপাশে শব্দ উঠছে নানা রকম, প্রায় সব সময়েই, বিরতিহীন শব্দের পর শব্দ । শুধু গভীর ঘুমে অচেতন হলেই যা বিরতি । শব্দ ঘুমোয়, না আমি ঘুমোই এবং যেহেতু অচৈতন্য হয়ে পড়ি, আমার সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলিও ঘুমিয়ে পড়ে । বোধ হয় ভুল বললাম একটু—সেটা খুব অস্বাভাবিক কিছু কি ! আমার কথাবার্তা, অভিজ্ঞতা ও জীবনযাপনের ছকটা কি প্রায়ই ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে না ! না হলে ঘুমের ভিতর যে শব্দ তা এমন কিছু অবহেলাযোগ্য নয় যে একেবারেই আমল দেব না । এই সেদিন, রাত্রে বিছানায় শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হলো দরজায় কেউ খুব জোরে কলিং বেল টিপছে ! তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল । তখন শুধু অন্ধকার, অন্ধকারে লেপ্টে-থাকা শরীর জুড়ে প্রবল ঘাম, শুকিয়ে এসেছে জিব । কেন বা কী জন্যে এ-রকম হলো তা অবশ্য তখনই বোঝা যায় না, কোনো দিনই যায় না—ঘুমের মধ্যে অতর্কিত ভয় পাইয়ে দিয়েই মিটে যায় শব্দের কাজ, ত্রস্ত শরীরের রোমকূপ চুম্বন করে একটা জাগ্রত আরশোলা নেমে যায় গা থেকে । সত্তার কথা তো বলেছি, কখনো কখনো মনে হয় আমার এই রোগা শরীরে পুরো তাকে ধরে রাখতে পারিনি, তার পরিত্যক্ত অংশ এখনো প্রবিষ্ট হবার পথ খুঁজছে ; মাঝে মাঝে গভীর ঘুম ও অচৈতন্যের মধ্যে সে চলে আসে আমার খুব কাছাকাছি, ডাকে, প্রিয়নাথ আছো ? থাকা না-থাকার অনিশ্চিতি মুহ্যমান করে ফেলে আমাকে ।

আজ তনুশ্রী নেমে যাবার অনেকক্ষণ পরেও নানাবিধ শব্দের ভিতর আত্মগোপন করে

আমি চলে যাই বহু দূর পর্যন্ত ; সংলাপ শেষ হয় না। আমাদের নিয়ে গল্প হয় না কোনো। নির্জনতাহীন শব্দই মাঝে মাঝে ডেকে আনে নৈঃশব্দ্য, যেমন আজ, বাসে যেতে যেতে যেমন হলো। আমি প্রায়ই একটা গল্পের মধ্যে চলে যাবার কথা ভাবি, কিংবা মহৎ কিছু করার কথা—উপলক্ষ কোথায় ! অমলাদির দু'ঘোড়ার একটি হয়ে, তনুশ্রীর প্রেমিক হয়ে, মধু বিশ্বাসের সহকর্মী হয়ে সহজ একানুবর্তিতায় এগিয়ে যাচ্ছে জীবন, অর্থাৎ বয়স বেড়ে যাচ্ছে—একেই যদি এগিয়ে যাওয়া বলা যায় ! যেতে যেতে আমি নয়নাংশুর কথা ভাবি, নয়নাংশুকে নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবি। কেউ কি সে-গল্প প্রকাশ করবে ! বাস্তবিক নয়নাংশু এলেবেলে গোছের মানুষ ; তফাত এই যে তার পেটে আছে আলসার, আর সেই জন্যেই মাঝে মাঝে নিয়মবহির্ভূতভাবে তার চোখ ক্ষুরধার হয়ে ওঠে।

প্রথম যেদিন আমি নয়নাংশুকে দেখি, ওর চোখে চোখ রাখতে গিয়ে আমার সর্বাঙ্গ সিরসির করে উঠেছিল ; আর কোনো কারণে নয়, শুধু এই ভেবে যে নয়নাংশু তার রোগে ন্যুব্জ, অক্ষম শরীর থেকে চোখ দুটো পরিষ্কার আলাদা করে নিয়েছে। সেদিন যতোক্ষণ ওর সামনে ছিলাম—প্রায় পনেরো মিনিট, মুখোমুখি, তনুশ্রী শুধু পরিচয়টা দিয়েই সরে গিয়েছিল, সুধা একবার ঘরে ঢুকে চা দিয়েছিল শুধু, সারাক্ষণই প্রায় আমার সামনে শরীর থেকে আলাদা করে চোখ দুটো ভাসিয়ে রাখল নয়নাংশু। কথা বলেনি তেমন, কিন্তু চোখ দিয়েই যেন কিছু একটা বলতে চেয়েছিল, ভেবেচিন্তে যার এই রকম একটা অর্থ বের করা যায়, আমি অসুস্থ, আমার কোনো ক্ষতি করো না। অবশ্য নয়নাংশুর সঙ্গে আর-আর লোকের তফাত করা যায় সুধাকে দিয়ে। সুধা এক অদ্ভুত জিনিস, সত্যি ! বেরুবার সময় হাতে একখিলি পান গুঁজে দিয়ে বলল, 'কী ঝক্কি দেখেছেন তো আমার ! এ-রকম অসুস্থ একটা লোককে নিয়ে ঘর করতে হয় !' বলে, কিন্তু থামে না, পরবর্তী কথার জন্যে ওর মুখের রেখাগুলো জায়গা বদলাতে থাকে—আমি শুনি বা না-শুনি সেটা সত্যিই সুধার কাছে কোনো ব্যাপার নয়। হাওড়ায় নাকি এক ডাক্তার আছে, এক মাসে আলসার সারিয়ে দেয়। বলল, 'ঠাকুরঝিকে বলেছি তো একদিন নিয়ে যেতে—', ইত্যাদি। সুধা পাশে থাকলে নয়নাংশুকে তবু দাঁড় করানো যায়, গল্পের খাতিরে একতাল ময়দার মতো ঠেসে ধরতে হয় নয়নাংশুর বুকে, ঘড়ির ভিতরের এঞ্জিনের মতো, না হলে নয়নাংশু অচল। বুঝি, সুধাই চালাচ্ছে। মেয়েমানুষের চরিত্রে ঘোড়ার স্বভাব নেই ; তবু, নয়নাংশু চোখ ভাসালে অমলাদিকেই মনে পড়ে। একদিন ভুল করে সে রওনা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের দিকে, আর যায় না।

যা বলছিলাম, তনুশ্রী নেমে যায়। নয়নাংশু ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে, তাকে দেখে অফিসের দিকে যাবে। আজ ছুটির দিন। তা হোক, আমার চেয়ে ওভারটাইম তার কাছে লোভনীয় মনে হচ্ছে। নানাবিধ শব্দের ভিতর আত্মগোপন করে বহু দূর পর্যন্ত চলে যেতে কোনো অসুবিধে হয় না আমার। পাশের সিটটা যতোক্ষণ খালি থাকে এবং তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তনুশ্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ চলে, চারিদিক জুড়ে শব্দের অরাজকতার মধ্যে নিঃশব্দে—ভাবনাগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না। আমাদের ভালোবাসা হবার পর দিন গড়িয়ে চলে, আর কিছু হয় না। বাসটা চলেছে ঢিকুতে ঢিকুতে, দাঁড়িয়ে-থাকা একটি লোক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, 'গরুর গাড়ি নাকি দাদা !' উত্তর আসে না। তখন লোকটার খেয়াল হয় আমার পাশের সিটটা খালি পড়ে আছে, ছুটে এসে ধুপ্ করে বসে পড়ে এবং গজগজ করে, 'আজকাল সবই এমন হয়েছে। শালার ছাগলকে পেট্রোল

খাওয়ালে এর চেয়ে জোরে ছোটে !'

বলে, ব্যস্তভাবে, আমার কব্জির দিকে তাকায়, মুখ দেখে না। 'ক'টা বাজল দাদা ?' আলগোছে সময়টা জানিয়ে দিই আমি। এই সময় রোদটা খুব তীব্র হয়ে ওঠে। লোকটা বোঝে না সে যেখানে বসে আছে খানিক আগেও সেখানে তনুশ্রী ছিল। সব কেমন থিতিয়ে আসছে ধীরে ধীরে,পেট্রোল খাওয়ালেও আমি এখন ছুটব না। বাসটা তেমনিই চলে, আস্তে আস্তে, ঢিকুতে ঢিকুতে। আজ সকালেই আমার হাতের একটি রোম পেকে উঠেছে। খুব মমতায় আমি তাকিয়ে থাকি নিজের দিকে—ভালোবাসা পুরনো হয়ে গেল !

আপাতত তিনশোটা টাকার খুব দরকার। তনুশ্রী বলেছিল, 'পারবে না ?' কোনো দিন তো কিছু চায় না, এই রকম একটা আবেগ থিতোতে থাকে বুকের মধ্যে, তেইশ তারিখের বিকেলবেলায় সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবার মতো যথেষ্ট উন্মুক্ত হতে পারে না ঠোঁট। তারিখটা মনে আছে, কারণ, পরে জেনেছিলাম, সেদিন অমাবস্যা ছিল। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলল, 'একশিরা হয়েছে। অমাবস্যা, পূর্ণিমায় একটু বাড়বে ব্যথা। আজ তেইশ তারিখ না ?' ফলে তারিখটা ভুলিনি। তনুশ্রীর পাশে হাঁটছিলাম একটু পা টেনে-টেনে, কুঁচকিতে ব্যথা হলে যা হয় ; বললাম, 'পড়ে গেছি বাথরুমে।' একশিরার কথাটা কী করে বলব ! তনুশ্রী যাকে বলে খুব মাইন্যুটলি লক্ষ করল আমাকে, 'খুব বেশি লাগেনি তো ?' 'না, সেরে যাবে।' 'একটু সাবধানে থেকো।' কথাটা বলার সময় ওর গলার স্বর আশ্চর্য নরম হয়ে এলো—বর্ষার দুপুরে হঠাৎ বেলা পড়ে আসার মতো, বলল, 'আমাদের সময় এখন খুব খারাপ যাচ্ছে।' বোধ হয় কথা দেওয়ার পক্ষে এইটেই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, তনুশ্রীর মুখে 'আমাদের' শুনে গভীর আহ্লাদ উঠে আসে আমার গলা পর্যন্ত। বলি, 'ভেবো না, দেবো। অপারেসানের তো এখনো ক'দিন দেরি আছে !' তখন, খানিক চুপচাপ হেঁটে এসে, তনুশ্রী বলল, 'সত্যি, দাদার যদি হুট করে কিছু একটা হয়, সংসার দেখবে কে !' পরে বলল, 'টাকাটা পেলে বৌদির হাতে দিও, খুশি হবে।' কথাটা তেমনভাবে স্পর্শ করল না আমাকে। আমি ভাবছিলাম অমলাদিকে কে দেখবে ! চাকরিটা তনুশ্রীকে নিজেকে নিয়ে ভাবতে দেয় না, তার সমস্ত ভাবনা সুধাকে জড়িয়ে। সুধা ভাবে তো ! যেতে যেতে এইভাবে ক্রমশ আক্রান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের মধ্যে একজন বড়োলোক হলে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যেত। অন্তত এই প্রায়দুপুরে রোদ্দুর মাথায় আমাকে ছুটতে হতো না কৌশিকের কাছে। হতো কি !

একদিন গভীর রাতে একা প্ল্যাটফর্মে লণ্ঠন হাতে দূর থেকে দূরে যেতে যেতে একটা আবছা মানুষ হেঁকে যায়, নি-উ-আ-লি-পু-র। প্রিয়নাথের সঙ্গে তার দূরত্ব অনেকখানি। এই দূরত্ব থেকে কথাটা কীভাবে বলব ভেবে পাই না। যদিও কৌশিকের সঙ্গে কালই কথা বলেছিলাম ফোনে ; শুনে বলল, 'কিসে নিবি ? চেক্ অর ক্যাশ ?' আমি ইতস্তত করছি—কৌশিক তো দূরের কথা, দাদার কাছে মাসিক বরাদ্দ পেতে দেরি হলেও তো চুপচাপ থাকি ! কৌশিক দু'বার 'হ্যালো, হ্যালো' করল, 'ক্যাশ নিলে কাল সকালে বাড়িতে আয়। বিয়ার খাওয়াব।' এই ভেবে রুমাল বের করে শক্ত হাতে ঘাড় মুখ নাক কপাল মুছে নিলাম আমি, কৌশিকের জন্যে নয়—কৌশিক আর আমি কতো দিন একসঙ্গে গোলদিঘির পাড়ে বসে কোকশাস্ত্র গিলেছি, কৌশিক নিশ্চয়ই সেই সব দিন ভুলে যায়নি ! সেই সময়েই একদিন, শীতের একটি দিনে ক্লাস না করে মনীষাকে নিয়ে আমি আর কৌশিক মেট্রোয় ম্যাটিনি শো দেখতে গেলাম। ব্যাপারটা কৌশিকেরই প্রথম মাথায় আসে। মনীষার কোনো

প্রেমিক আছে বলে জানতাম না, আর, বিশেষ করে সেদিন তো ও খুব খোলামেলা, চোখটানা পোশাকে ছিল—এতেই ভীষণ উত্তেজিত বোধ করে কৌশিক। দেখা গেল তিনটে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু দুটো এক জায়গায় পাশাপাশি, তৃতীয়টি আলাদা। কৌশিক ক্ষেপে গেল, 'তুই সঙ্গে থাকলেই শালার যতো ঝামেলা বাধে!' মনীষাকে আড়াল করে বলল, 'তুই আলাদা বোস। আর একদিন চান্স্ দেবো।' এইভাবেই বলত ও, একটুও দ্বিধা না করে নিজেরটা বুঝে নিত আগে। আজ না হোক আর একদিন চান্স্ পাব এটাই বড়ো কথা আমার কাছে; আমি ওদের বসতে দিলাম। ইনগ্রিড বার্গম্যানের ছবি ছিল কি? হবেও বা। আর একজন আছে, অড্রে হেপবার্ন—শুধু বুক নেই তেমন এই যা, থাকলে মেরে বেরিয়ে যেত! 'রোমান হলিডে' ছবিটা ভালো লাগায় দু'বার দেখেছিলাম। তারপর ইন্টারভ্যালে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে লবিতে এসে কৌশিক বলল, 'কী চিজ মাইরি তোর এই মনীষা, এক্কেবারে ঝাণ্টু দি গ্রেট!' 'কেন!' 'একটা চান্স্ নিতে গিয়েছিলাম, প্র্যাকটিক্যালি হাফ চান্স্, বলে কিনা গায়ে হাত দিতে ভয় পাচ্ছেন, দিন না! তবে বেশি-বেশি দেবেন না, হাউসফুল তো!' 'অ্যাঃ!' 'মাইরি, কোন শালা মিথ্যে বলে: দ্যাখ, সেই থেকে হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে!' কৌশিক নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। আমার এমনিতে মনে পড়ে না, কিন্তু কৌশিককে দেখলে পড়ে। এক-একটা ঘটনা কেমন মনে পড়ে যায় না, যেন মোটা খড়ির দাগ, এক পোঁচ জল-ন্যাকড়া বুলিয়ে দিলেও স্লেটের ওপর ফুটে ওঠে। এ-রকম আরো কিছু কিছু মোটা খড়ির দাগ থেকে গেছে বুকে। যেমন, কালই তো, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পরও অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না চোখে—জানলা দিয়ে আমাকে পেরিয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্নার আলো, হঠাৎই মনে পড়ল কার্জন পার্কের ফুটপাথে বসে-থাকা এক ফেক্‌লু জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল, 'তোমরা জীবন খুব একার হবে।' কেন বলেছিল জানি না। কথাটা ফলেছে কি না, বা না ফললেও, ভবিষ্যতে ফলবে কি না বুঝতে পারি না। শব্দের ভিতর যে অর্থ থাকে—গাঢ়, গভীর অর্থ, সে কখনোই ধরা দেয় না। যখন নিঃশ্বাস পড়ে থেমে থেমে, স্পষ্টই অনুভব করি নিঃশ্বাস পড়ছে, কখনো মনে হয় না যে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই ধরনটাও অন্য রকম হতে পারত। আমার জীবন কি সত্যিই একার? ঠিক বুঝি না। নাকি এসব কাঠখোট্টা ফিলসফিক্যাল ব্যাপার বোঝার জন্যে জ্যোতিষীর কাছে দৌড়তে হয়!

সে যাক গে। কৌশিকের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল টিপে প্রায় শূন্যে আর ভ্যাপসা গরমে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি আমার বাঁ হাতের পাকা রোমটির দিকে তাকাই, যদি ইতিমধ্যে আর একটি রোম পেকে ওঠে। এ-রকম দেখেছিলাম একদিন, দুপুর দুটো থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে হঠাৎ পেকে উঠল কানের পাশে আমার একটি চুল— । সেদিন ঘন ঘন ল্যাভেটরিতে যেতে হয়েছিল। এখন চুল পাকে নিজের ইচ্ছেমতো, খাপছাড়াভাবে, যেভাবে বেড়ে ওঠে আগাছা, দেওয়ালে নাড়ি ছড়িয়ে ঘর বাঁধে উই। এই অবস্থায় খুব দূর আকাশ দিয়ে একটা চিল ককিয়ে ককিয়ে উড়ে যায়। এটা 'নিউ আলিপুরের আকাশে চিল' গোছের কোনো কবিতায় দাঁড় করানো যাবে কি না ভাবছি, একটা মিষ্টি শব্দ করে দরজা খুলল, আকস্মিক রূপে ঝলসে যায় ক্যামেরার লেন্সের মতো আমার দু'টি চোখ। চট করে স্মৃতিতে ফেরা যায় না। শালা, আহাম্মক! মনে পড়ে আমিই সেই, প্রিয়নাথ মজুমদার—কাল যে টাকার জন্যে ফোন করেছিল কৌশিককে, কৌশিক বলেছিল বাড়িতে আসতে, তা হলে বিয়ার খাওয়াবে। আর কিছু মনে পড়ে না—সুধা ও তনুশ্রী ক্রমাগত

পিছলে পিছলে যায়। 'কৌশিক আছে?' 'ও-ও', অর্গানের প্রথম রিডের মতো মৃদু, তমসাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর, সরে গিয়ে বলল, 'আপনিই কি মিস্টার মজুমদার! আসুন, আসুন।' কৌশিকের বৌ-এর নাম রীনা-টিনা হবে। ঠিক কী নাম ভাবতে গিয়ে আমি ওদের বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠিটা আগাগোড়া পড়ে ফেলার চেষ্টা করি, আটাকলের বেল্টের মতো চটচটে শব্দ ওঠে বুকে—সুধা, নয়নাংশু আর তনুশ্রী, তিনশোটা টাকা আর 'পারবে না?' গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে যায় চারপাশে। ভদ্রলোক হবার চেষ্টায় বললাম, 'খুব অসুবিধে করলাম না তো!' 'নট অ্যাট অল।' রীনা-টিনা বলল, 'আপনি বসুন, কৌশিক আসছে।' হাসির সম্ভাবনা নিয়ে আমি যার-পর-নাই হাসি। দেখি, রীনা-টিনার পায়ের পাতার সঙ্গে মোজেইকের রঙ একাকার হয়ে যাচ্ছে। চোখ অব্দি নিঃশব্দ হাই উঠে আসে আমার। একদিন ছিল যখন কৌশিক একটা সাদা বর্ণ ভিন্ন আর কিছু ছিল না, এমনকি রেকর্ড-প্লেয়ারে যে-গান সেও সাদা হয়ে উঠত। হলদে কি এখন ওর প্রিয় রঙ, নাকি রীনা-টিনার! ভাবি ; বসে থাকতে থাকতে আমার বয়স বেড়ে যায়। কতো বলেছিলাম, ছত্রিশ? এই যে এতো কথা বলছি, এটা আমার কোন্ বয়সের কথা! এমনও হতে পারে, বয়স বাড়ে না, একই জায়গায় থেমে থাকতে থাকতে পুরনো হয়ে যায়! কী রকম এক গন্ধ বেরোয়। তনুশ্রীর পাশে বসে বাসে যেতে যেতে কোমরে কোমর ও জানুতে জানু লাগিয়ে ব্যাপারটা যখন অনুভূতিহীন হয়ে গেল—এ-রকম প্রায়ই হয়, মনে হয়েছিল অখণ্ড পাহাড়ের গায়ে দুটো পাথর পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে। তারা একই রকম ছিল, পাথর হয়ে, থেকে যাবে একই রকম। অনুভূতিহীন, নিরাকার—যেমন আমি আর তনুশ্রী, আর পাথরের উপমা তো দিয়েইছি ; অন্ধকার মশারির ভিতরে হঠাৎ জেগে উঠে যেমন নিরাকার মনে হয় সব কিছু, নিজেও হয়ে উঠি অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের অংশ।

তো, সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে কৌশিককে আমি ঈর্ষা করব না কেন? কৌশিকের হাত থেকে বিয়ারের গ্লাসটা নিতে নিতে বুঝি আমার হাত-পা অসমান হয়ে উঠছে। 'চিয়ার্স' শব্দটা চৌয়া ঢেঁকুরের মতো সমস্ত শরীরে শীত জানিয়ে নেমে যায় গলা দিয়ে—হঠাৎ ভাবি কেন ও কিসের জন্যে! কোন শৈশবে আঙুলে পিন ফুটিয়ে জিবে স্বাদ নিয়েছিলাম আত্মরক্তের, সেই স্বাদ আজ অতর্কিতে পুনরায় লোনা করে দিল মুখ। বুঝি, বুকের ভিতর টুপটাপ ঝরে পড়ছে একটা কিছু ; কী, তা কী করে জানব! এটুকু বুঝি তার সঙ্গে তনুশ্রীর সম্পর্ক নেই কোনো, সুধার নেই বা নয়নাংশুরও নেই। অমলাদির কিংবা মধু বিশ্বাসের নেই। আছে শুধু আমার সঙ্গে। আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে আর-এক আমি, কিংবা আরো দূর ভিতর থেকে আরো একজন। আমার প্রয়োজন ও তিনশো টাকার দায়িত্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এর। লিপ-ইয়ারের মতো আমার অনুভূতি হঠাৎ ছাড়িয়ে গেল আমাকে।

সাদা ট্রাউজার্সের ওপর বুশশার্ট, কৌশিক আমাকে টাকা দেবে ও কথা বলবে বলে তৈরি হয়ে ছিল। ঘর ঠাণ্ডা বলে বাইরে কী অসম্ভব ঝাঁঝালো রোদ্দুর সে খেয়াল করে না। আমার কান ঝাঁঝাঁ করে। 'বুঝলি প্রিয়নাথ, তুই কেমন ঝাপ্সে যাচ্ছিস!' থেমে চুমুক দিয়ে নিল গ্লাসে, 'আজকাল আর লিখছিস-টিখছিস না?' আমি ওর কপালে ছোট ছোট ঘাম ছড়িয়ে পড়ছে দেখি। 'অফকোর্স, আমিও আজকাল পড়ি-টড়ি না। ইন দোজ ডেজ তুই ছিলি আমাদের প্রাইড।' বলে তাকায় মীনার দিকে—ওর স্ত্রী, আমি শেষ অব্দি নামটা স্মরণ করতে পারিনি। চোখাচোখি হতে আমি একটু হাসি ও পরক্ষণেই সতর্ক হয়ে পড়ি, কেন না, তখনই

নড়াচড়ায় মীনার ব্রেসিয়ারের ফিতে ও বুকের কিয়দংশ বেরিয়ে পড়ে। কৌশিক নিজেকে এগিয়ে দেয়, 'হি ওয়াজ এ ওয়াণ্ডারফুল রাইটার।' 'সত্যি! কী লেখেন আপনি?' মীনা বেরিয়ে আসে নিজের ভিতর থেকে—ঠিক যতোটা না হলে নয়, মেপেজুপে, 'ইট মাস্ট বি ভেরি ইন্টাররেস্টিং!' বিয়ে না হলে ও ফিল্মের হিরোইন হতো। তনুশ্রী একদিন বলেছিল, পৃথিবীতে অনেকেই বেশ সুখে আছে! আমি একটু হাসি, হয়তো যে-কোনো উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, ভাবি, থ্যাঁতা লেবুর কোয়ার মতো জুড়ে আসে ঠোঁট। এখন শরীরে ঘাম ভিন্ন আর কিছুই ক্রিয়াশীল নয়। নাকি ভুল ভাবছি, মীনা ও মীনার শরীর আশ্লিষ্ট হয়ে আসে আমার শরীরে। অদ্ভুত ক্লেদ নিয়ে বুঝতে পারি প্রবল ও ক্রমাগত ক্ষরণে ছিঁড়ে আসছে রক্তে টইটুম্বুর শিরাগুলো। এ-জন্মে হলো না—মীনার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিকর অনুভূতিগুলো ক্রমশ শিথিল হতে থাকে, ভাবি পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে, মীনা তোমাকে একান্ত করে পাবার চেষ্টা করব। আজ ছুটির দিন, হয়তো টাকাটা নিয়ে এইবার আমার উঠে পড়া উচিত।

মীনাকে নিয়ে গল্পটা এইভাবে জন্ম নেয় বুকে। সুধাকে নিয়ে যে-গল্পটার কথা ভেবেছিলাম, সেটা আর লেখা হয়নি, তার নায়ক ছিল প্রিয়নাথ মজুমদার। তাতে যে-দৃশ্য পেরিয়ে এলাম তার বর্ণনা ছিল, তনুশ্রী ছিল না। ব্রেসিয়ারের হুক্ খুলে দিতেই একদিন রাতে মীনার দু'টি স্তন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার মতো লাফিয়ে পড়ে আমার বুকে, চোখ খুলে দেখি অন্ধকার,প্রবল ঢেউয়ে আমি ভিজে গেছি। স্তব্ধ হাওয়ায় শুধু ভেসে আসে অমলাদির বয়স্ক নিঃশ্বাসের শব্দ। রাত নিঝুম হওয়ার শব্দ। রক্ত ক্রমাগত নীরব হওয়ার শব্দ। বুঝি, বেঁচে আছি।

॥ চার ॥

বেঁচে থাকা, আঃ, যেন কতো প্রয়োজনীয় ব্যাপার! এমন নয় যে বিষয়টা নিয়ে আমি সারাক্ষণই ভাবি। যে-রক্ত নাভিমূল সঞ্জীবিত করে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখে দু' পায়ের ওপর, তৎপর করে হাত, পা ও জিব নাড়ায়, তার ভাবনাই কি মনে থাকে সর্বক্ষণ! থাকে না। কিন্তু এ হলো সেই ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠার মতো, শব ও মৃত্যু থেকে জীবনের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার মতো—বেঁচে থাকা ও রক্তের অভিপ্রায় জানাজানি হলে সমস্ত অনুভূতি হয়ে ওঠে একাগ্র, ঝম্‌ঝম্ করে বেজে ওঠে সমগ্র শরীর!

বেঁচে থাকার এই অনুভূতিটা প্রখর হয় তনুশ্রীর সঙ্গে আমার ভালোবাসা হবার পর, এ-কথা বলতে বলতে পুরনো হয়ে গেল। তা হোক, আমি যতো পুরনো, তনুশ্রীও প্রায় ততোটা, জন্ম ও সম্ভবত মৃত্যুহীন আমাদের ভালোবাসা নিয়ে তেমন কোনো গল্প তৈরি হয় না। তনুশ্রীকে নিয়ে আমি যে-গল্পটা লিখেছিলাম, তাতে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। সে-গল্পে কৌশিককে আনতে হয়েছিল স্পষ্ট দুটো কারণে ; এক, কৌশিকই (বা যারা তার মতো) পারে অভ্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে, আব, তনুশ্রীর জীবনে যদি কোনো শোক আর অভিমান থেকে থাকে কৌশিকই পারে তা জাগিয়ে তুলতে। এটা আমার অক্ষমতা নয়, তনুশ্রীরও নয়। কিংবা, এমনও হতে পারে, দু'জনেই ডুবে আছি

এক গভীর গন্ধহীনতায় ; চলা ও দাঁড়িয়ে পড়ার মধ্যে শুধু নড়ে ওঠে আমাদের শরীর। আর কিছু নয়।

যখন এসব মনে পড়ে, বাঁচার বা বেঁচে থাকার ভাবনাটা দুলিয়ে যায় আমাকে। ওভারহেড তারে ফিঙের মতো—তনুশ্রী কি দোলে ! হয়তো। তনুশ্রীর বিষয়ে এখনো সব কিছু আমার জানা হয়নি।

সেদিন কৌশিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক গনগনে দুপুরে অন্যমনস্কভাবে অনেকটা রাস্তা শূন্য হেঁটে আসি আমি। এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টের ভৌগোলিক দূরত্ব স্পর্শ করে না তেমন ; চুলের ভিতর থেকে ঘাড়ের পিছনে ঘাম নেমে যেতে খেয়াল হয় অনেকক্ষণ হাঁটছি। তখনই দাঁড়িয়ে পড়ি। মনে পড়ে কৌশিকের দেওয়া করকরে তিনশোটি টাকা আমার পকেটে, তনুশ্রী চেয়েছিল। আমার পাশ দিয়ে শব্দ করে চলে যায় দুপুরের ট্রাম ও বাস, বহু মানুষ তাদের অপরিচিত মুখ থেকে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে চেয়ে থাকে অনির্দিষ্ট ; আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেই রাস্তার ধারে একটি যুবতী ভিখিরি বাঁ হাতের মুঠোয় তার স্তন তুলে নিয়ে ডান হাতের নখে ঘামাচি খোঁটে। একটা খোঁড়া কাক উড়ে আসে তার কোলের কাছে। কৌশিকের ড্রইংরুমের নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা হঠাৎ ছুঁয়ে যায় আমাকে—আবার শুরু হয় চলার, এক উদাসীন যাত্রার সঙ্গী হয়ে হাঁটতে থাকি আমি।

নয়নাংশু এখন হাসপাতালে। তনুশ্রী অফিসে। 'সত্যি, দাদার যদি হুট্ করে কিছু একটা হয়, সংসার দেখবে কে !' তনুশ্রী বলেছিল সেদিন, তেইশ তারিখের বিকেলবেলায়, 'টাকাটা পেলে বৌদির হাতে দিও, খুশি হবে।' সেদিন, তখন, ঠিক বুঝতে পারিনি তনুশ্রীর কাছে কোন ব্যাপারটা বেশি জরুরী, নয়নাংশুর অপারেসানের জন্যে বাড়তি টাকাটা জোগাড় করা বা সুধাকে খুশি করা। যদিও, সবাই বুঝবে, একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক খুবই কাছাকাছি—টাকাটা জোগাড় হলেই অপারেসান সম্ভব হবে নয়নাংশুর, সুধা খুশি হবে ; কিন্তু, তা হলে তো তনুশ্রীর হাতে টাকাটা দিলেই চলত। অথচ, ঠিক তা নয়। বিষয়টা হঠাৎ ঢুকে পড়ল আমার মাথায়, এই টাকাটা পাওয়া ও দেওয়ার মধ্যে তনুশ্রী যেন অন্য একটা মানে করতে চেয়েছিল। তনুশ্রীই কি বলেনি টাকাটা পেলে সুধার হাতে দিতে ! যেতে যেতে সূর্যরশ্মি ক্রমশ নিকটবর্তী হবার সময় ভাবলাম আমি, তনুশ্রী স্পষ্টই চেয়েছে আমি টাকাটা জোগাড় করি এবং তাকে নয়, সুধার হাতে দিই। কিন্তু, সুধা যতোই অসুবিধেয় পড়ে থাকুক, কোনো দিন কিছু চায়নি আমার কাছে, তো টাকা, তার সঙ্গে এ নিয়ে আমার ছয় কি সাতবার দেখা হয়েছে মাত্র ! এই চেনাশোনায় কেউ টাকা চাইতে পারে না, এমন কি বেশ্যারাও নয়—সহকর্মী মধু বিশ্বাস একদিন বলেছিল আমাকে, সে-কথা কি বলেছি ? ঘটনাটা অবশ্য মধুকে নিয়ে নয়, মধু শুনেছিল অনাদি বোসের কাছে। সেবার বৃষ্টিতে খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে বসন্ত দাসের সঙ্গে আমার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা বলতে মধু আমাকে আর একটা গল্পের মধ্যে টেনে আনল ; সেই প্রথম আমি জানতে পারি অনাদি বোস মাঝে মাঝে বেশ্যাবাড়ি যায়। বেফাঁস বলে ফেলে মধু অবশ্য খুবই চেষ্টা করেছিল ব্যাপারটা সামলে নিতে, 'যায়' ক্রিয়াপদটিকে 'যেত' করে—যাতে আর কিছু জানাজানি না হয় ; অনাদি তখন অফিস ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা। বেফাঁস বলা আমার স্বভাবে নেই, বস্তুত মধু মিথ্যেই ভাবনায় পড়েছিল। সুধার সঙ্গে পরে আমার যে-ব্যাপারটা হয় আমি ছাড়া আর কেউই তা জানতে পারেনি কোনো দিন, এমনকি তনুশ্রীও কোনো আভাস পায়নি।

আসল ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। আমি তখন ঘুরছিলাম একটা গল্পের পিছনে—কেউ

আমাকে একটা গল্প দিক, ভাবতাম, প্রবল উত্তেজনায় জ্বালা করত আমার প্রতিটি রোমকূপ। বলব কী,আমার জীবন থেকে তখন সমস্ত গল্প চলে যাচ্ছে একে একে ! যেসব মানুষকে আমি চিনতাম ও যারা ঘুরত আমার আশেপাশে, তাদের নিয়ে গল্প হয় না কোনো, এটা ততো দিনে আমি বুঝে গেছি স্পষ্ট। আদ্যন্ত নিরুৎসাহ থেকে কোনো বীজ জন্ম নিত না চিন্তায়। মধু বিশ্বাসকে আমি সেই জন্যেই চেপে ধরি, যদি অনাদি বোসকে নিয়ে কোনো গল্প হয়। অনাদি বোস বেশ্যাবাড়ি যেত, এটা নিয়ে গল্প হয় না কোনো, আসল প্রশ্ন কেন যেত এবং কীভাবে ফিরে আসত। মধু তখন আমাকে টাকা না-নেওয়ার গল্পটা বলে।

দীনেন্দ্র স্ট্রিটের একটা বাড়িতে থাকত সেই মেয়েটি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স যখন,মেয়ে না বলাই ভালো, বরং মহিলা, মধু বলেছিল 'মাগী'—'বেশ জাঁদরেল চেহারার মাগীটা'—এইভাবে, সন্দেহ কী, টাকার পরিবর্তে অনাদি বোস তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করত। প্রায় নিয়মিত। 'শালা অনাদি যে-রকম মুস্‌কো তাতে ওই দিনগুলোও ছাড়ত বলে মনে হয় না। হ্যাঁ মশাই, প্রিয়নাথবাবু, বেশ্যার আবার দিন অদিন কী, বলুন !' মধু বলেছিল। 'তো একবার মাগীটার কী অসুখ হয়', পরপর জ্বর হতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে শরীর-টরিরের কথা ভুলতে হলো তাকে। অনাদি তখন তাকে টাকা দিতে গিয়েছিল সাহায্য হিসেবে, নেয়নি। 'প্রেস্টিজ, প্রেস্টিজ, হাঃ হাঃ—', মধু তার কাতলা মাছের মতো বিরাট মাথাসুদ্ধ মুখের হাঁ যতোটা সম্ভব বিস্তৃত করে হেসে ওঠে সশব্দে। অফিসে ওর টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল নিচু গলায়। ওরই মধ্যে শুধু হাসিটাকে তীব্র করে ছুঁড়ে দেয় মধু ; অনেকে, এমনকি অনাদি বোসও পিছন ফিরে তাকায়। মধুর কথা অনাদির কান অব্দি পৌঁছুনোর কথা নয়, তবু কেন জানি অনাদির শূন্য ও অপ্রস্তুত চোখের দিকে তাকিয়ে ছ্যাঁত করে ওঠে আমার বুক, যেন বৈদ্যুতিক সংস্পর্শের প্রভাবে বুঝে নেয় অনাদি মধুর কটকটে হাসির মধ্যে নিরপেক্ষভাবে জড়িয়ে আছে সে বা তার প্রসঙ্গ। গল্পটা জমে না। কিন্তু, তারপর থেকেই আমি ক্রমাগত বুঝতে পারি বাড়ির ভিতর ঘর ও তার পরেও ঘরের মতো অনাদির আপাত আহ্লাদের ভিতরেও আছে আরো এক অনাদি, মধু শুধু দরজা পর্যন্ত এসেই থেমে গিয়ে হাসতে শুরু করেছিল।

ব্যাপারটা ওই রকমই, বাড়ির ভিতর বাড়ি, স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন, স্মৃতির ভিতর স্মৃতি। যেন এক পরম্পরাহীন সূর্য চলে গেছে অদৃশ্য বহু দূর অব্দি, মাটির স্তরভেদের মতো বেঁচে থাকা ও অস্তিত্বের স্তর থেকে স্তরে, কে পারে তার রহস্য আবিষ্কার করতে !

আমি পারিনি। তনুশ্রীর সঙ্গে পরিচয়ের পরও অনেক দিন পর্যন্ত। আমি তার দরজায় এসে থেমে দাঁড়িয়েছি, একটা ভুল স্বপ্ন ক্রমাগত কুরে খাচ্ছিল আমাকে। তারপর আমি ও তনুশ্রী একদিন আমি বা তনুশ্রী হয়ে যাই—স্বপ্নের ভিতর জেগে ওঠার মতো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম নিজেকে, ক্লান্ত, বিছানায় শুয়ে, আর একজন প্রিয়নাথ হেঁটে যাচ্ছে এবং তারও ভিতরে হাঁটছে একজন তনুশ্রী। অস্পষ্ট আর নির্জন, তাদের হাঁটায় শব্দ হয় না কোনো।

কৌশিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সুধাকে দিতে যাবার রাস্তায়, মধ্যপথে, এই সব মনে পড়ে আমার। ঠিক বুঝতে পারি না তনুশ্রী কেন সুধাকে দিতে বলেছিল টাকাটা, সুধাই বা নেবে কেন ! এতো স্বল্প আলাপে কেউ নেয় না ; এমনকি বেশ্যারাও না, মধু বলেছিল একদিন। বলেছি তো, সে-কথা বিশ্বাস করিনি আমি। অনাদির সেই ফিরে তাকানোর তীব্রতায় বুঝেছিলাম এটা গল্প নয়, এর মধ্যে গল্প নেই কোনো। প্রায় তখন থেকেই

শো-কেসের ডামির মতো অনাদি বোস লেগে যায় আমার চোখে, এক রকম অবিশ্বাস্য অনুভূতিতে কথাবার্তা কমে যেতে থাকে আমার। অনাদির মুখোমুখি হলেই চোখ দুটো ছুঁয়ে থাকত তাকে, কথা ফুটত না, ক্রমশ অধৈর্য হতে হতে এক একদিন এমন হতো যে আমি প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলেছি কথাটা। অদ্ভুত রোমাঞ্চে ছেয়ে যেত শরীর। কিন্তু এইভাবে কি জিজ্ঞেস করা যায়, এই রকম ব্যক্তিগত একটা কথা ! কেউ কেউ পারে—যেমন মধু, যারা পারে তাদের শরীরে আছে সহজাত মেদ, উত্তরে কঠিন কিছু পেলে মেদ ফুটো করে গায়ে আঁচড় লাগতে লাগতে সহজ হয়ে যায় ব্যাপারটা। একদিন যেমন হলো : আমি ও তনুশ্রী হেঁটে যাচ্ছি চৌরঙ্গি দিয়ে, তখন সন্ধ্যা, হঠাৎ চোখে পড়ে উল্টো দিক থেকে ঠোঙায় তেলেভাজা নিয়ে মুখ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে মধু বিশ্বাস। দেখামাত্র এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় দ্রুত হলাম আমি। তনুশ্রী কি কিছু অনুমান করেছিল ? হয়তো নয়। যদিও, দেখাদেখি সেও দ্রুত হলো। কিন্তু, মধু হঠাৎ ছুটে এসে ধরে ফেলল আমাকে, 'হ্যাঁ মশাই, পালিয়ে যাচ্ছেন কেন !' মধুর তেলা হাত মাখামাখি হয়ে যায় আমার কব্জিতে। 'একটু তাড়া আছে— ।' আমার বিব্রত কণ্ঠস্বর মধুকে কিছু স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। একটেরে তনুশ্রীর দিকে তাকাতে হাতটা কোনো রকমে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'চলি। পরে দেখা হবে।' মধুর রিঅ্যাকসান দেখার জন্যে অপেক্ষা করি না। কিছু দূর হেঁটে যাবার পর পিছনে তাকিয়ে তনুশ্রী বলল, 'এখনো তাকিয়ে আছে। লোকটা কে !' 'কাজ করে আমাদের সঙ্গে— ।' 'কী সব লোক ! অসভ্য !' দেখি তনুশ্রীর মুখে একটা ছায়া পড়েছে দুঃসহ। আর কিছু না বলে আমরা হাঁটতে থাকি, যেভাবে হাঁটি, প্রতিদিন। হাঁটতে হাঁটতে ছায়াটা ক্রমশ সঞ্চারিত হয়ে পড়ে আমার মনে—মৃদু ও আরক্ত, ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ক্রমশ ধুলো থেকে উঠতে থাকে পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে। আমি একটা প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবি।

পরদিন নিশ্চিন্ত গাম্ভীর্য আড়ষ্ট করে রাখে আমাকে। খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে সোজা আমার টেবিলে চলে আসে মধু, 'না হয় একটা মেয়েমানুষ জোগাড় করেছেন এতো দিনে ! হ্যাঁ মশাই, তা অতো গরম কিসের !' শুনে আমার মাথা পর্যন্ত ছুটে যায় অসহিষ্ণু রক্ত ; ঠিক তনুশ্রীকে মেয়েমানুষ বলার জন্যে নয়—পরোক্ষে আমিও তো এ-রকম ভেবেছি কতোবার। আসলে গতকাল সন্ধ্যা থেকে এ-পর্যন্ত সময়ের একটা সামগ্রিক চাপ ছিঁড়ে ফেলছিল আমাকে, আমার মুঠো শক্ত হয়ে এলো। কিন্তু, মধুর চকচকে কপালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে রাখতে দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে এলো চৈতন্য ; দেখি থেঁতো হয়ে গেছে মধুর নাক—চিবুকের ডৌল অব্দি পৌঁছে নির্মল রক্তধারা দিকনির্ণয় করতে পারছে না। এ-রকম হয় আমার মাঝে মাঝে, সক্রিয় হয়ে ওঠার আগেই টান-করে-বাঁধা রক্তের উত্তেজনা হয়ে পড়ে শিথিল। এই যে ব্যাপারটা, একে কি কাপুরুষতা বলব ? ঠিক বুঝি না। তবে এ-রকম হয়। পরে, অনন্যোপায় আমি হাসতে থাকি, যেন তেমন কিছু হয়নি। আমাকে হাসতে দেখে মধু বলল, 'মালটি বেশ ভালো। ঝুলিয়ে না রেখে বিয়ে করে ফেলুন ; না হলেই তো স্বাস্থ্য খারাপ—'

যাই হোক, অনাদি বোস সম্পর্কে সেই বেশ্যাটিকে নিয়ে মধু যা বলেছিল তা বিশ্বাস না হলেও আমি অপেক্ষা করতে থাকি এবং প্রকারান্তরে ক্রমশ এগোতে থাকি অনাদির দিকে। হয়তো একদিন আমাদের জানাজানি হবে। বলতে কী, এরপর অনাদিকে দেখলেই সচেতন ও একাগ্র হয়ে উঠত ইন্দ্রিয়গুলি, গল্পের প্রয়োজন ভুলে আমি ততো দিনে একটা নতুন খেলায় মেতে উঠেছি। খেলাটা অনাদিকে নিয়ে। অনাদি বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল যে-কোনো কারণে আমি তার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে পড়েছি, সুযোগ খুঁজছি

একটা কিছুর। তো সে-সুযোগও এসে গেল একদিন। ইউনিয়নের ইলেকসানে হেরে গিয়ে ক্ষিপ্ত, বিমর্ষ অনাদি 'নিমকহারাম, সব শালা এক-একটা শুয়োরের বাচ্চা—' ইত্যাদি কথাবার্তায় খানিক গরম হয়ে থাকার পর আমাকে একান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'দশ-বিশটা টাকা আছে মশাই ? ধার নিতুম। থাকলে দিন।' আমার কাছে টাকা ছিল, তবু ইতস্তত করছিলাম সাতপাঁচ ভেবে, অনাদি বলল, 'আমি কারুর টাকা মারিনি আজ পর্যন্ত। বিশ্বাস না হলে দেবেন না।' কিছুটা রাগ নিয়ে চলে যাচ্ছিল অনাদি, কী ভেবে ফিরে এলো। 'কী করবেন মশাই অফিসে ধুনি জ্বালিয়ে ! চলুন, মাল খাবো।' তখন যেতে হলো। কারণ প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বুঝলেও আমার সর্বাঙ্গে, হাড়ের ওপর দিয়ে, গ্লিসারিনের মতো তরল ও থিকথিকে একটা কী গড়িয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি, বসে থাকলেও যা আমাকে স্থির থাকতে দিত না। এটাকে শুধু গল্পের আকর্ষণ বলা যায় না। এমনও নয় যে গল্পহীনতার তীব্র গতানুগতিকতা ক্রমশ মুহ্যমান করে ফেলছিল আমাকে—ততো দিনে ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি প্রায়। আসলে তখন, সেই মুহূর্তে, অনাদি বোসের অভিপ্রায় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ঠিক কেন জানি না, এক একসময় এক একজন এমনিভাবে সংক্রামিত হয়ে পড়ে আমার রক্তে, এড়াতে পারি না।

সে যাই হোক, অফিস থেকে বেরিয়ে আমি ও অনাদি হাঁটতে থাকি নীরবে, প্রায় সম্পর্কহীনভাবে। যেতে যেতে চোখ পড়ে আকাশে, বুঝতে পারি আজকের বিকেলটা খুব মনোরম হবে—সে-জন্যে দুপুর থেকেই চলেছে প্রস্তুতি। রোদ্দুর আছে কিন্তু উত্তাপ নেই, মাথার চুল ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে এলোমেলো হাওয়া, দুপুরের মধ্যেই চমৎকার সেজে আছে বিকেলটা। লোকজন কম। কিছু দূর গিয়ে প্রথম কথা বলার সূত্রে অনাদি একটা ট্যাক্সি নেবার কথা বলে ; আমি প্রথমে উৎসাহিত হই, পরে দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলি, 'কী দরকার ! এই ওয়েদারে হাঁটতেই ভালো লাগছে বেশ।' আসলে এ-ক্ষেত্রে ট্যাক্সিভাড়াটা আমাকেই দিতে হবে কি না ভাবি। আমার কাছাকাছি সরে এসে চাপা গলায় অনাদি বলল, 'বুঝলেন, আপনাদের ওই সেক্রেটারি, প্রমথ গুপ্ত, একটা লোচ্চা। ও-শালা ম্যানেজমেন্ট-এর লোক। ৬-এ'র ইস্যুটা ও-ই পিছিয়ে দিয়েছে, নেক্সট্ ইয়ার একটা প্রোমোসান নেবে। আমি বাগড়া দিতাম, তাই—', বলতে বলতে থেমে গেল হঠাৎ এবং খানিক আমাকে লক্ষ করে বলল, 'আপনি মশাই একটা ক্যালাস !' তারপর, 'আপনার মুখে কোনো এক্সপ্রেসান নেই ! আপনারাও এক ধরনের এনিমি, স্ট্রাগল পিছিয়ে দিচ্ছেন !' অনাদি এইভাবেই বলে, কোনো আড়াল না রেখে। আনমনে ঠোঁট কেঁপে যায় আমার, বুঝি এখন চুপচাপ হেসে যাওয়া ভালো। আমার ভিতর থেকে কুঁজো হয়ে তৎপর গোয়েন্দার মতো নেমে যায় একজন প্রিয়নাথ ; চুপচাপ অনুসরণ করে অনাদিকে। তার প্রতি অবিচারের একটা মৌখিক প্রতিবিধান অন্তত প্রত্যাশা করে অনাদি, না হলে এতো লোকের মধ্যে এই বিকেলে আমাকেই কেন তার একক যাত্রার সঙ্গী বেছে নেবে ? একদিন, অনেক দিন আগে, ঠিক কবে মনে নেই, তবে তনুশ্রীর সঙ্গে ভালোবাসা হবার আগেই নিশ্চিত, সে আমাকে লেনিনের আদর্শ বুঝিয়েছিল, বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে তফাতটাও তার কাছেই প্রথম বুঝি। 'কমরেড, রাগ করলেন ?' মনে পড়ার মুহূর্তে অনাদির এই ভেঙে-পড়া গলা আদ্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাকে, চকিত শীতে ঘাম দেয় শরীরে। 'না, রাগ করব কেন।' দ্রুত বললাম আমি। অনাদি বলল, 'পৃথিবীতে কারুর ওপর রিলাই করা যায় না, জানেন। দুনিয়াটাই স্বার্থপর—। মাঝে মাঝে মনে হয় স্যুইসাইড করি।' ঠিক এইভাবে না হলেও,

প্রায় এইভাবে অমলাদিও বলেছিল একদিন, ‘সংসারে কে আর অন্যের মুখের দিকে তাকায় ! যে যার নিজের স্বার্থ নিয়ে আছে !’ স্যুইসাইড করার কথাটা অবশ্য সে বলেনি। তো সেদিন আমি ও অনাদি অনেকক্ষণ একসঙ্গে থাকি। রাত ন'টার পর শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপরেই উবু হয়ে বসে বমি করে অনাদি ও মুখনিঃসৃত সেই পিত্তময় দুর্গন্ধ জলের দিকে তাকিয়ে ঘুনঘুন করে কাঁদে। ‘টাকাটা কি আপনি ভালো মনে দেননি, প্রিয়নাথবাবু ! তা হলে এমনিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন !’ অনাদির কথা শুনতে বিস্তর লোক জমে যায় আশেপাশে। ব্যাপারটা লক্ষ করে চেঁচিয়ে ওঠে অনাদি, ‘টাকা ভেসে যাচ্ছে, কুড়িয়ে নাও, কুড়িয়ে নাও।’ সেই কথায় সমবেত লোকজন হাসতে থাকে হো হো করে।

কোনোক্রমে তাকে নিয়ে বেরিয়ে আসি দূরে, ‘চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।’ ‘বাড়ি ! কোন শালা এখন বাড়ি যায় ! আমি এখন বেশ্যাবাড়ি যাব, রাণ্ডির কাছে।’ ‘দীনেন্দ্র স্ট্রিটে—’,এইভাবেই কথাটা বেরিয়ে যায় আমার মুখ ফস্‌কে। ঘোলাটে শূন্য চোখে খানিক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দু' পায়ের ভারসাম্য রক্ষা করে অনাদি, তারপর হঠাৎই দু' হাতে কাঁধ চেপে ধরে আমার, ‘কী বলেছে মধু বিশ্বাস আপনাকে ! কী বলেছে !’ তখন আবার ভিড় জমার উপক্রম হতে শুকনো জিবটাকে টানা-হেঁচড়া করতে করতে কোনো রকমে ওর হাত দুটো ছাড়িয়ে নিলাম আমি, ‘বাড়ি চলুন। আপনার নেশা হয়েছে।’ অনাদি কী বুঝল কে জানে, ওকে বিমূঢ় দেখাল, তারপর হঠাৎই হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। খুব দ্রুত হাঁটার ফলে তার নেশাগ্রস্ত শরীর টলতে থাকে অল্প-অল্প, তবু দিনান্তের ভিড়ে সকলের গা বাঁচিয়ে দ্রুত ও নিঃশব্দে হেঁটে যায় সে। আমার স্তব্ধ চোখের সামনে সূর্য দুলে যায়। হাঁটার এই ধরনটাকে আমি চিনি, অনাদির অপমানিত শরীর আকস্মিকভাবে ছুঁয়ে যায় আমাকে তখন, প্রায় দৌড়ে, চঞ্চল অনাদির খুব কাছে পৌঁছে যাই আমি। চলন্ত বাসের সামনে রাস্তা পেরুবাব জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে অনাদি বলে, ‘বিয়ে করার পর জানতে পারি মেয়েটা বেশ্যা। তবু, বউ তো ! তাড়িয়ে দিয়েছি, তবু বউ তো ! থাকতে পারি না, মাঝে মাঝে যাই। তাতে কোন শালার কী !’ বলতে বলতে দ্রুত রাস্তা পার হবার চেষ্টা করল অনাদি। তখন বিদ্যুৎবেগে একটা ট্রামকে ছুটে আসতে দেখে ওর হাত চেপে ধরলাম আমি। ‘আপনি কেন আসছেন আমার সঙ্গে—’, এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল অনাদি, ‘লিভ মি অ্যালোন। আমি একাই যেতে পারব—।’ আমার ও অনাদির মধ্যে অতর্কিতে ছুটে আসে গাড়ির পর গাড়ি—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর, দিনশেষের ব্যস্ততা নিয়ে যাবজ্জীবন কলকাতা। প্রায় ঘুম থেকে ওঠার পর আর দেখা যায় না অনাদিকে।

কৌশিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সুধাকে দিতে যাওয়ার মধ্যে অনাদি বোসকে টেনে আনার মানে নেই কোনো। তবু যে আনতে হলো তার কারণ, মধু বিশ্বাসের সেই কথাটা—‘বেশ্যারাও নেয় না’—গেঁথে গিয়েছিল আমার মনে। বস্তুত ওই ঘটনার পর দু' দিন কামাই করে তৃতীয় দিনে খুব স্বাভাবিক হয়ে অনাদি যখন অফিসে এলো, আর কিছু মনে না পড়ে অনাদিকে দেখে মধুর কথাটাই মনে পড়ল আমার। এক-একটা কথা থাকে এমন, পুরনো রুমালের হারিয়ে-যাওয়া গন্ধের মতো যার সংস্পর্শ থেকে যায় মনে, যথেচ্ছ ধোয়া-কাচার পরও সে থেকে যায় অম্লান। স্যুইসাইড করার কথায় যেমন মনে পড়েছিল অমলাদিকে, যেমন ‘ধূমপান’ কথাটি কোথাও ব্যবহৃত দেখলে মনে পড়ে তনুশ্রী ও আমার পরিচয়ের দিনটি। সেদিন, সেই বৃষ্টি ও ট্যাক্সিতে, সিগারেট না বলে ‘ধূমপান’ বলেছিলাম

আমি, 'ধূমপান করলে অসুবিধে হবে না তো ?' এ-রকম আরো অনেক কথা। অনেক শব্দ। মুহূর্ত ও ঘটনাগুলির ক্রমাগত বিনিময় চলেছে শব্দের সঙ্গে, গল্পহীন অস্তিত্ব নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ, থেকে যাচ্ছে শব্দ। অন্তহীন, প্রলম্বিত বিভিন্ন শব্দ, পাখির রোমের মতো তাদের শরীর থেকে ঝরে যাচ্ছে অর্থের ভার ও ব্যঞ্জনা, শুধু শব্দ অননুবর্তিত। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার এই বেঁচে থাকা, চলা, কথা বলা—সবই জড়িয়ে আছে শব্দের উত্থান-পতনের সঙ্গে ; একদিন অতর্কিতে সব শব্দ থেমে গেলে আমিও দাঁড়িয়ে পড়ব নিশ্চিত। কোথায় ? কোন ভূমিতে ? কোন সংস্পর্শের ভিতর ! আকস্মিক প্রশ্নে চমকে ওঠে শরীর। আবার শব্দের মধ্যে হেঁটে যাই দ্রুত।

দূরত্ব এমন আর কী বেশি, এক-দেড় মাইল বই তো নয়, তবু মনে হয় যেন হাঁটছি বহু কাল ধরে। হাঁটছি, থামছি না, অথচ এগিয়েও যাচ্ছি না। নিয়মিত একানুবর্তিতায় আমার এই হেঁটে চলা গতকাল ছিল, থাকবে আগামীকালও ; আজ যেমন আছে। মজা এইটুকু, গতকাল ও আগামীকালের অভিন্নতার কথা ভাবছি আমি আজকে, গতকাল ভাবিনি, আগামীকাল কি ভাবব ! জানি না। আর, আগামীকাল যদি দৈবাৎ মনে পড়ে ব্যাপারটা, ততোক্ষণে 'আজ' নিশ্চিতভাবে 'গতকাল' হয়ে যাবে ! তার মানে কি এই, অতীত ও ভবিষ্যৎহীন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এক অনির্দিষ্ট বর্তমানে—যেখান থেকে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ কোনোটিকেই ছোঁয়া যায় না স্পষ্ট, স্মৃতি ও স্বপ্ন হয়ে পড়ে এলোমেলো। এমনও হতে পারে, আমাদের সব ধারণাই ভুল, সময় সত্যিই বিভাজ্য নয়। কখনো মনে হয় জন্ম থেকে আজ অব্দি আমি যতো হেঁটেছি, যতো দূর, তার যোগফল হয়তো একটা মোটরগাড়ির সমগ্র মাইলেজের চেয়ে বেশি। কে তার হিসেব রাখছে ! ডেপ্রিসিয়েসানহীন মানুষ তবু হেঁটে যাচ্ছে। যেমন আমি। যেমন মধু বিশ্বাস এবং অন্যান্যরা, যেমন তনুশ্রী। ইচ্ছে করে চলমান প্রতিটি মানুষকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করি, খবর রাখো ? বয়স বাড়ছে, পাক ধরছে চুলে, পুরনো হয়ে যাচ্ছে শরীর—হাঁটার উদ্দেশ্য শেষ হচ্ছে না তবু ! খবর রাখো ! কৌশিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সুধাকে দিতে এসে তনুশ্রীদের বাড়ির প্রায় দরজায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হলো আমার, আচ্ছা, তনুশ্রী কি কখনো ভাবে আমরা একইভাবে হেঁটে যাচ্ছি কতো দিন ধরে, হয়তো বিভিন্ন রাস্তায়, বাস্তবিক পৌঁছুচ্ছি না কোথাও ! হয়তো ভাবে, আমি ঠিক জানি না।

বস্তুত, তনুশ্রী যতো কথা বলে তার চেয়ে বেশি বলে না, প্রায়ই চুপ করে থাকে। এমনও হয়, একটা কথা থেকে অন্য কথার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে হঠাৎ থেমে যায় তনুশ্রী, সহসা কিছু মনে পড়ার মতো করে গুটিয়ে নেয় নিজেকে ; ফলে, পরের কথাটি শুরু করতে হয় 'কী যেন বলছিলাম' দিয়ে। এসব সময় খুব মুশকিলে পড়তে হয় আমাকে, বলেছি তো আমার স্মরণশক্তি তেমন জোরালো নয়। তবু যতোটা সম্ভব একাগ্র হয়ে এই সব সময় আমি অনুসরণ করি তনুশ্রীকে, তার কথাগুলিকে, খেয়াল রাখি ঠিক কোনখানে এসে থেমে যাচ্ছে কথাগুলো। ফলে কথাগুলো থাকে, কিন্তু তাদের অর্থ যায় হারিয়ে !

নয়নাংশু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথায় যেমন হয়েছিল। সেদিন ছুটির পর আমি সোজা চলে আসি দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে। তনুশ্রী ফোন করেছিল অফিসে, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছি, দাদার এক্স-রে রিপোর্টটা নিতে হবে। ছ'টা নাগাদ তুমি দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে চলে এসো।' তো সময়মতো পৌঁছুনোর জন্যে তৎপর হই আমি। যদি বাস না পাই, ট্রামে উঠব ; যদি ট্রামও না পাই অন্য কিছু ভাবতে হবে। এইভাবে, তনুশ্রীকে ঘিরে, ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমি। একটা বাস আসার পর লোকজনের গুঁতোগুঁতিতে ছটকে যাই

দূরে, মনুষ্যহীন অন্ধকারে। খানিকটা সময় যায়। তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাসটি আসে। তৃতীয় বাসটিতে ব্যর্থ হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাই দ্বিতীয় বাসটির দিকে—পোড়া মোবিলের গন্ধে চোখ-মুখ ভাসিয়ে সেটিও ছেড়ে দেয় দ্রুত। কয়েক মুহূর্ত কিছুই দৃশ্য হয় না। চোখ খোলার পর দেখি পরপর দু'টি বাস এক-ভিড় মানুষের কাউকেই নিয়ে যায়নি ; দেখি, ভিড়ের মধ্যে দু'টি শূন্য চোখ নির্ভুল চেয়ে আছে আমার দিকে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা ও মায়াময় সেই দৃষ্টি আমার চোখ ছুঁয়ে নেমে যায় নাভির দিকে, ক্লান্ত করে দেয় আমার সমস্ত উদ্যম। বাস ছেড়ে দিয়ে আমি ট্রামের দিকে যাবার কথা ভাবি। ট্যাক্সি পাব না। আর তখন, ঠিক তখন, টায়ারে চটপট শব্দ তুলে ছুটে আসে চতুর্থ বাসটি। প্রবল ভিড়ে ভিতু মানুষের মতো যখন এ-বাসটাও ছেড়ে দেবার কথা ভাবছি, তখন, ঠিক তখন, কানের পাশে একটি গম্ভীর কণ্ঠ নির্দেশ দেয় কণ্ডাক্টরকে, 'দাঁড়ান, ঘণ্টি দেবেন না।' আর, প্রায় তৎক্ষণাৎ, একটি হাত এসে পড়ে আমার পিঠে, 'আয়, উঠে আয়।' সরল মমতায় আমাকে ওপরে ওঠার সুযোগ করে দেয় লোকটি, নিজে ওঠে। বাস ছেড়ে দেবার পর ঘর্মাক্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। 'চিনতে পারলি না, আমি শম্ভু! শম্ভু সরকার। তুই প্রিয়নাথ তো ?' 'আরে— !' ব্যাকগিয়ারে চব্বিশটা বছর পরপর নোটের তাড়ার মতো লাফিয়ে আসে আমার কাছে। 'সেই টাকি ইস্কুলের— ?' 'যাক, মনে পড়েছে! আমি দেখেই চিনেছিলাম!' এস্‌প্লানেডে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওপরতলায় কতকগুলো সিট খালি হয়। পাশাপাশি বসে শম্ভু বলে, 'যাচ্ছিস কোথায় ?' 'বালিগঞ্জ। তুই ?' 'কালীঘাট— । দাঁড়া, টিকিটটা কাটি।' 'দাঁড়া, আমিই কাটছি—', শম্ভুর আগে টাকা বের করে কণ্ডাক্টরের হাতে এগিয়ে দিতে শম্ভু বলল, 'একটা টিকিট হবে। আমার লাগবে না।' আমি 'কেন ?' বলাতে শম্ভু ও কন্ডাক্টরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয় ; শম্ভু বলল, 'একটাই।' কথা না বলে টিকিট ও চেঞ্জ দিয়ে চলে গেল কণ্ডাক্টর। শম্ভু সম্ভবত কৌতূহল টের পেয়েছিল, ফিসফিস করে বলল, 'পুলিসে কাজ করি তো, লাগে না।' শম্ভুর বিশাল ও মজবুত শরীরের মধ্যে থেকে দু'টি উদাসীন চোখ আলাদা ও আলগা হয়ে ছুঁয়ে যায় আমাকে—চব্বিশ বছরের ব্যবধান থেকে পুনরায় শৈশবে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায় প্রাণপণে স্মৃতি হাতড়াতে থাকি। প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে বাস ছুটে চলে সেই দিকে, যেখানে তনুশ্রীর জন্যে অপেক্ষা করব আমি। 'তোকে আর চেনা যায় না, শম্ভু', তেমন কিছু না পেয়ে অবশেষে বললাম, 'কালাজ্বরে ভুগতিস তুই, মনে আছে!' শুনে হা-হা করে হাসতে গিয়ে নিঃশব্দ হয়ে গেল শম্ভু, 'শরীরটাই পেয়েছি রে, আর কিছু না।' থেমে বলল, 'তোর কথা বল, তুই কোথায় আছিস ? চাকরি করছিস নিশ্চয়! বিয়ে করেছিস ?' আমি বলি, 'না— ।' 'কোনটে না ?' তার নির্মোহ বিষণ্ণতা মেলে ধরে হাসে শম্ভু, 'বিয়ে করিসনি! সে কী রে, এতোটা বয়স হলো!' আমি বললাম, 'তুই ?' 'আমাকে কে বিয়ে করবে রে! পুলিসকে! তার ওপর তোদের মতো লেখাপড়া শিখিনি তো!' কথাটা এখানেই চাপা পড়ে। প্রতিদানে কিছুই বলতে পারি না আমি ; চব্বিশ বছরের দূরত্ব ছড়িয়ে পড়ে আকাশের ব্যাপ্তি নিয়ে বহু দূর, একা বেলুনের মতো ঘোরাফেরা করি সেখানে। খুব আবছাভাবে মনে পড়ে টিনের চালার নিচে শুয়ে-থাকা কালাজ্বরগ্রস্ত একটি রোগা ছেলেকে, পেটের খোল ছাড়া যার শরীরের অন্য সব অঙ্গই রোগে পাণ্ডুর, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু' মুঠো মুড়ির জন্যে সারা দিনমান যার ঘুনঘুন কান্না। একমাথা বিস্মৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে স্কুলে আসে ছেলেটি, সারা দিন ঝিমোয়, রোগে ভুগে ভুগে শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়ো হয়ে যাওয়ার কারণেই সম্ভবত ঢুলুনি আসে তাড়াতাড়ি। আড়াআড়ি দু'টি হাতের ওপর মাথা

রেখে একসময় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে সে। ব্যাকরণ পড়াতে পড়াতে ব্যাপারটা চোখে পড়ে অম্বুজ মাস্টারের—গাঁট্টা মেরে টেনে তোলেন তাকে ; চোখ-ভর্তি ঘুম আর মুখ-নিঃসৃত একদলা লালা নিয়ে ছেলেটি তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। 'তোর কিস্‌স্যু হবে না', খেদ ও ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলেন অম্বুজবাবু, 'তুই একটা গবেট !' প্রতিবাদহীন, কথাটা মেনে নেয় সে, নির্বোধ ও বিষণ্ণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় কিছু না-হওয়া সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি নিশ্চিত আর কেউই নয়। শম্ভুকে নিয়ে এই সবই মনে পড়ে আমার, বহু দিন পরে গোটা একটা স্মৃতি পুনরুদ্ধার করে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—কে বলে আমার কিছু মনে পড়ে না ! আকস্মিক তৃপ্তিবোধে সাড়া পড়ে শরীরে। শম্ভু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, 'চলি রে, নামতে হবে।'. তবুও তার একটুখানি হাত ছুঁয়ে থাকে আমার কাঁধ। দেখি হাজরা রোড পেরিয়ে গেছে বাসটা। শম্ভুকে একটা কিছু বলতে ইচ্ছে করে, যে-কোনো কথা, অন্তত 'আমিও কিছু ভালো নেই' বলে চলে যাওয়া যায় তার বুক অব্দি। তখন, 'ছোটবেলার অনেক বন্ধুকেই দেখতে পাই, জানিস। কারুর সঙ্গেই দেখা হয় না। চলি', বলতে বলতে নেমে যায় শম্ভু। চোখে পড়ে দশাসই একটা চেহারা উঠে যাচ্ছে ফুটপাথে—চব্বিশ বছরের দূরত্ব থেকে দেবদূতের মতো যে এগিয়ে আসে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় ; বিশাল শরীর তার, তুলনায় বেশ ছোট মাথাটা, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। মাথার ওদিকে আমি তার বিষণ্ণ চোখ দু'টিও দেখতে পাই। দোতলার জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখি, আর বলি, শম্ভু, তুই কালাজ্বরকে জয় করেছিস—অন্য একটা শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াস এখন, তবু এতো বিষণ্ণ কেন ! অম্বুজ মাস্টারের ভবিষ্যদ্বাণী কি তবুও ব্যর্থ করতে পারিসনি ! তুই কোন ধরনের পুলিস ! ক্রমশ ভিড় এসে আড়াল করে দেয় শম্ভুকে।

শম্ভুকে মনে আছে, কারণ সেদিন ও না থাকলে আমার বাসে ওঠা কিংবা তনুশ্রীর সঙ্গে দেখা হতো না। কিংবা দেরি হতো। হয়তো ওকে একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল, ভাবি। তনুশ্রীর সঙ্গে দেখা হবার অনেকক্ষণ পরেও কথাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমার। ঠিক ছ'টায় আসে সে, হাতে এক্স-রে'র প্যাকেট ও স্বাচ্ছন্দ্যহীন উদ্ভাসিত মুখে। 'ভেবেছিলাম দেরি হবে তোমার ! এতো তাড়াতাড়ি যে ?' তনুশ্রীর প্রশ্নে গলা পর্যন্ত সুখ উঠে আসে আমার। বলতে কী, এসে পৌঁছুনোর পর থেকে ছ'টা পর্যন্ত শম্ভু ছাড়া আমি আর কারুর কথাই ভাবিনি। শম্ভুর কথাটা তনুশ্রীকে বলা দরকার নয় কি ! চব্বিশ বছরের দূরত্ব থেকে শম্ভুর সঙ্গে হঠাৎ-দেখা মনে পড়িয়ে দেয় নাভির নিচে আমার জন্মদাগ ; হয়তো এটাই ঠিক, ভাবি, জন্মলগ্নের চিহ্নিত সত্য থেকে মানুষ বেরুতে পারে না এক পা, বয়সের আগে আগে এগোয় তার ভাগ্য। এইভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে ছুটে চলে, যে-রকম ঘড়ির কাঁটা, গ্রিনিচমাফিক। না হলে যে-শরীর ছিল শম্ভুর পক্ষে সবচেয়ে হন্তারক, সেই শরীরের দুঃখ জয় করেও কেন শম্ভু এগোতে পারে না কিছু হওয়ার দিকে। আমিও কি পারি !

সে যাই হোক, তনুশ্রীর বিস্ময়ের উত্তরে শম্ভুর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বলবার চেষ্টা করলাম আমি। খানিক শুনে ভুরু কোঁচকাল তনুশ্রী। 'পুলিস ! পুলিস আবার কারো বন্ধু হয় নাকি ?' 'হয় না !' 'কী জানি বাপু, তোমার মতিগতি ভালো বুঝছি না।' ছটফটে গলায় বলল তনুশ্রী, 'এই সেদিন মায়াদির হাজব্যাণ্ডকে পাবলিক কী মারধোর করল, সেও তো পুলিসে কাজ করে। দেড় মাস হাসপাতালে ছিল !' সেই ঘটনা থেকে আরো বহু দূরে চলে যায় তনুশ্রী, আমি ঠিক শুনি না। তবে কথাগুলো কানে আসে পরপর, সে-সবই

নয়নাংশুকে নিয়ে। এইভাবে কিছু দূর। পরে, হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বলল, 'কী যেন বলছিলাম ?' বললাম, 'নয়নাংশু— ।' তনুশ্রী বলল, 'না। হাসপাতালে দেওয়ার কথা হচ্ছিল। বললে না তো, কোন হাসপাতাল ভালো !' হঠাৎই কেঁপে উঠল মেরুদণ্ড, ধরা পড়ে-যাওয়া থেকে প্রাণপণ মুক্তির চেষ্টায় বললাম, 'হাসপাতালে যেতেই হবে ?' তনুশ্রী দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কী ভাবো বলো তো সারাক্ষণ, আশ্চর্য ! শুনলে না ডাক্তার বলেছে একবার ওপেন করা দরকার !' তখন মনে পড়ে, বলেছিল। তখন দেরি হয়ে গেছে।

হাঁটার শেষ হয় না তবু। স্মৃতিবাহিত একটি যুবক, আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি তনুশ্রীদের দরজায়। আমাকে ঘিরে থাকে অব্যবহিত থেকে বহু দূর অব্দি বিভিন্ন স্মৃতি। প্রখর সূর্যতেজ শিকড় নামিয়ে দেয় গোড়ালি পর্যন্ত, শরীর থেকে বিচ্যুত লবণের স্বাদে ছেয়ে থাকে শরীর। নয়নাংশু হাসপাতালে, মনে পড়ে, ছুটির দিন সত্ত্বেও ওভারটাইম সংবরণ করতে পারেনি তনুশ্রী। বাস থেকে নামার আগে কাঁধের ওপর আবৃত বুকের মৃদু আঘাত হেনে সে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের সম্পর্ক—তার প্রতি আমার অধিকার। বাস যতোক্ষণ না ছাড়ে ততোক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে মনে হয় এসব আজ ও এখনকার কথা নয়, এই সবই সংঘটিত হয়েছে বহু দিন আগে ; শুধু একটি ঘটনার জন্যেই এই মুহূর্তটি অপেক্ষমাণ—তনুশ্রীর কথামতো সুধার হাতে টাকাটা দেব ও চলে যাব। তবু হাত সরে না। জানি, সুধা ঠিক আছে ভিতরে ; দরজা খোলার পর পিপাসার্ত আমাকে ন্যাড়া হাতে জল এনে দেবে তার দশ বছরের মেয়ে টুনি। কোলের ছেলেটা হয়তো ঘুমোবে, নামটা যেন কী— টুবুল না টুব্‌লু ? যাই হোক, এই অসময়েও সুধা কি আর এক কাপ চা খেয়ে যাবার কথা বলবে না ! দরজার মাথায় টিকটিকি ডেকে ওঠার শব্দে সম্বিৎ ফিরে আসে আমার, চকিতে চোখের ওপর দুলে যায় কৌশিকের ঘরের দেওয়াল ও রঙ, বিয়ারের ঢেঁকুর উঠে জড়িয়ে যায় বিশুষ্ক জিবে।

দরজা খোলার শব্দে বুঝতে পারি, সুধাই। কারণ ছিট্‌কিনি যতো ওপরে টুনির হাত ততো দূর যাবে না। বেশ সাবলীল হাত, অর্থাৎ টুনির নয়। আগে একদিন সে টুল টেনেছিল এবং দরজার কাছে এসে বলেছিল, 'ও মা, টুলটা একটু ধরো না !' তখন সুধাই দরজা খুলে দেয়। অবশ্য ছিট্‌কিনি ছাড়াও খিল আছে ; তো সেই খিল তোলার বা নামানোর শব্দ এ-বাড়িতে শুনিনি কখনো, যাতে মনে হয় খিল তোলার সামান্য ঝুঁকে-পড়া পরিশ্রম থেকে এরা—সুধা বা তনুশ্রী—দূরে দূরে থাকে। ছিট্‌কিনি নামানো ও দরজা খোলার মধ্যবর্তী সময়ে খুব দ্রুত ভাবি এই সব। দরজা খুলে 'ও-মা !' বলার আগে দু'-এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে সুধা—এতোক্ষণ চেপে রাখা ঘামের বিন্দুগুলিকে ফুটিয়ে দেয় কপালে। তখন, পকেট থেকে রুমালসুদ্ধ হাতটা বের করতে, সুধা বলল, 'ও মা ! দেখুন তো, আমি ভাবলুম কে এলো ! ওমা, দাঁড়িয়ে কেন ! আসুন !'

সুধা বলে, খুব ব্যস্ত হয়ে, 'বাব্বা, এই রোদে দাঁড়াতে পারে মানুষ !' এইভাবে, তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। এ-কথায় দ্বিগুণ রোদ ছড়িয়ে যায় আকাশে। ভঙ্গি ও নিজস্বতার কথাটা অবশ্য ভাবি অনেক পরে, ঘরে ঢুকে, ততোক্ষণে সুধা দরজা বন্ধ করতে উদ্যত। খিল না ছুঁয়ে ছিট্‌কিনির দিকেই উঠে যায় তার হাড়ের মতন সাদা হাত, গলা অব্দি মেলা-দেওয়া শাড়ির আঁচলের নিচে চোখে পড়ে শিশুর গালের মতো তার অস্পষ্ট স্তন, হাতটা নেমে না-আসা পর্যন্ত আমার চোখ তার খোঁজ নেয়। সেটা একই সঙ্গে তনুশ্রী ও স্মৃতি থেকে উঠে-আসা মধুর স্ত্রী সীমাকে মনে পড়ার সময়। স্মৃতি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে

যতোটা সময় লাগে তার আগেই ফিরে তাকায় সুধা, তেমনি হাসে। 'এখানে কোথায় বসবেন! ভেতরে আসুন— ।'

সুধা এগিয়ে যায়। আমিও। প্যাসেজের প্রায়ান্ধকারে আবার মুখোমুখি দেখা হয় আমাদের। সে পাশ কাটিয়ে গেলে শোবার ঘরের ছুঁড়ে দেওয়া পর্দাটা ছুটে আসে মুখোমুখি। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকবার আগে দেখি বাঁ দিকে, তনুশ্রীর ঘরে, সুধা ঢুকে যাচ্ছে দ্রুত। আমি ঘরে ঢুকি। রোদের কারণেই সম্ভবত দু'টি জানলাই বন্ধ ; ফ্যানটা কেন বন্ধ কে বলবে! নিশ্চিত সুধা আমাকে এ-ঘরেই আসতে বলেছিল। পরিচিত মোড়াটা টেনে বসবার আগে বিছানায় অকাতরে ঘুমন্ত শিশুটির সাদা গালের দিকে তাকিয়ে খানিক আগে মনে-পড়া উপমাটি মিলিয়ে নিই ; সত্যি, কেমন যথার্থভাবে চলে আসে এক-একটা উপমা। অসম্ভব চওড়া খাটটিকে এ-সময় সুধার শরীরের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করে, জড়োসড়ো শিশুটি তখন সম্পূর্ণ গাল হয়ে ওঠে ।

এই খাটে একদিন নয়নাংশুর জায়গা ছিল। 'এই রোগটা সম্পর্কে কি আপনার কোনো আইডিয়া আছে ?' একদিন, সম্ভবত নয়নাংশুর সঙ্গে পরিচয়ের পর দ্বিতীয় দিন, এ-ঘরে ঢোকার অনেকক্ষণ পরে কথা বলতে গিয়ে বলেছিল নয়নাংশু, 'গ্যাসট্রিক আলসার নয় তো!' কোনো উত্তর দেবার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কী শুনতে চায় নয়নাংশু। 'মনে তো হয় না'. বলতেই হলো, 'আসলে এটা ভোগান্তি। আমারও হয়েছিল একবার— ।' 'হয়েছিল!' পিছনে বালিশটা টেনে নিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসল নয়নাংশু, 'কী হয়েছিল বলুন তো!' শুনে দ্বিধায় পড়ি, তনুশ্রীর দাদা নয়নাংশুর দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য একটা গল্প জন্ম নিতে থাকে আমার ভিতরে। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, একটা অসুখের কথা ভেবে নিয়ে ক্রমশ নয়নাংশুকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করি আমি—সে-অসুখ থেকে সেরে ওঠার উপায় থাকে না কোনো। যে-সব উপসর্গ নিয়ে জ্বালাতন হয় নয়নাংশু, হুবহু সেগুলো রূপ নেয় কথায়। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে নয়নাংশু, চোখ দুটো ক্রমশ সরু ও লম্বা নলের মতো হয়ে ডুব দেয় আমার শরীরের সেই একদা-অনাদৃত কাল্পনিক অংশে—যেখানে কোনো দিন যন্ত্রণা ও জ্বালা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গল্প শেষ হবার পরও পলক পড়ে না। 'তারপর ?' 'এই তো, ভালো হয়ে গেছি— ।' শুনে হাসল নয়নাংশু, 'ঠিক কি আর সারে! সারে না। রোগটা আগে টের পেলে বিয়ে করতুম না, কী বলুন! এসব রোগ কি একেবারে যায়! না মশাই, বিয়ে-টিয়ে করার আগে ভেবে দেখবেন।' এইভাবে, রোগ থেকে অনাবশ্যক বিয়ের প্রসঙ্গে সহজ পারাপার চলে নয়নাংশুর, পাণ্ডুর মুখের ক্ষয়া দাগগুলো আঙ্কিক রেখার মতো হয়ে ওঠে স্পষ্ট। 'আর, বিয়েটা কি এমন বড়ো ব্যাপার বলুন! কতো লোক তো না করেই দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন। কতো মেয়েও তো আজকাল— ।' জিবের নড়াচড়ায় নয়, অন্ত্রের ঘা থেকে ক্রমশ পুঁজ বের করতে থাকে নয়নাংশু, বুঝি রোগগ্রস্ততা থেকে আমার চারিধারে প্রাণপণে যুক্তির দেওয়াল তুলে যাচ্ছে সে— দ্যাখো, আমাকে দ্যাখো, তনুশ্রীর প্রয়োজন আমার জীবনে অনেকখানি। কাল্পনিক অসুখের ওপর আরো অসম্ভব একটা নিষেধ আরোপ করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে আস্তে আস্তে বালিশের ওপর জাগ্রত মাথাটা নামিয়ে রাখে নয়নাংশু।

আমি বেরিয়ে আসি। মেরুদণ্ড থেকে মৃদু ও সিরসিরে একটা যন্ত্রণা উঠে আসে ঘাড় পর্যন্ত, মাথার ভিতর কেউ ক্রমাগত ডেকে যায় 'প্রিয়নাথ', 'প্রিয়নাথ'। ধর্মহীন, স্বাধীনতাহীন সেই সম্বোধন, জলে ডুবে-যাওয়া মানুষের আত্মীয় কণ্ঠস্বরের মতো বেজে যায়

বহু দূর বিস্তৃত নিঃশব্দ নদীর ওপর। কোথাও বুদ্বুদ ওঠে না কোনো। যে-রাস্তায় হাঁটি অন্যান্য মানুষও হেঁটে যায় তার ওপর দিয়ে, তবু সে আমার একারই রাস্তা—জনমানুষহীন, অসম্ভব নির্জন ও প্রকৃতিস্থ। মনে হয়, পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে দিন, পৃথিবীতে কোনো দিন রাত্রি ভিন্ন আর কিছু ছিল না। যেতে যেতে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি থেকে ক্রমশ কুয়াশা ছড়িয়ে আসে বুকে—পূর্বাপর এতো কালের স্মৃতি এসে ভিড় করে, একা রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবি, সত্যিই কি দরকার আছে বিয়ের! মুমূর্ষু একটি লোকের প্রার্থনা পূরণ করার চেয়ে মহত্তম আর কোন কাজ! সেই মুহূর্তে মালাবদল হয় আমাদের, আমার আর নয়নাংশুর; প্রতিপক্ষ থেকে দলবদ্ধ ভ্রমণের দিকে এগিয়ে যাই আমরা; আমি ও নয়নাংশু ও তনুশ্রী ও অমলাদি ও অনাদি বোস ও হয়তো বিশ্বম্ভর বাগচীও—পরিত্রাণহীন বন্দিত্ব নিয়ে সে চলে গেছে সময়ের আগে আগে। সর্বাঙ্গ হারিয়ে মানুষ তার চোখ নিয়ে জেগে থাকে শুধু। নয়নাংশুকে নিয়ে গল্প হয় না কোনো, একা-একা ভাবি, তা হলে আমাকে নিয়েও হতো।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রুটির থালা সামনে নিয়ে জেগে থাকে অমলাদি। কারণ প্রিয়নাথ খায় না। রাত আরো গভীর হলে আমি বাথরুমে যাই ও বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাই নিঃশব্দে, আমার যাতায়াত টের পায় না অমলাদি। রান্নাঘরে চৌকাঠে হাঁটুতে মাথা পেতে চুপচাপ বসে থাকে সে, হয়তো বা ঘুমিয়েই থাকে। 'তুমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো না—।' দূরাগত সেই কণ্ঠস্বরে হাঁটু থেকে মুখ তোলে অমলাদি, 'তুই আগে খেয়ে নে।' আর এগোয় না। শুয়ে পড়ি। ক্রমশ একান্ত হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস, হাই ওঠে ক্লান্তিতে, ঘুম ও তন্দ্রা পালা করে আসে আর যায়। বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে! বুঝি না। শব্দটা তবু লেগে থাকে কানে—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্। অনেক রাতে অমলাদির ঝুঁকে-পড়া মুখের নিঃশ্বাস লাগে আমার কপালে। 'আমি কি কোনো দোষ করলুম, প্রিয়!' উত্তর দেবার আগে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় আমার, আর কোনো কারণে নয়, বস্তুত অমলাদি ও নয়নাংশুকে আলাদা করতে পারি না বলে। পরে বলি, 'না। সে-সব কিছু নয়।' প্রবল অবিশ্বাস নিয়ে মাথার কাছে বসে পড়ে অমলাদি, চুলের ভিতর উইয়ের মতো শব্দহীন চলাফেরা করে তার খড়খড়ে আঙুল, সারা দিন পরিশ্রমের হলুদ মিশে যায় চুলের গোড়ায়, 'উপায় থাকলে কি আর তোদের বোঝা হয়ে থাকতুম!' সেদিন নয়, তারও অনেক দিন পরে তনুশ্রী বলেছিল, 'ঝামেলা কি কেউ সাধ করে নেয়! উপায় থাকলে কবেই চলে আসতুম!'

সুধা এসব জানে না। আমাকে বসিয়ে রেখে সে চলে যায় সবুজ রঙের ব্লাউজ পরতে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢোকার পর এটাই প্রথম লক্ষ করি আমি; চকিতে চোখ চলে যায় বিছানায় ঘুমন্ত শিশুটির গালে। নিশ্চিত সুধার মনে কখনো এ-উপমা আসেনি।

চায়ের কাপটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল সুধা, তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। 'কী গরম বলুন তো!' আলগোছে আঁচল তুলে কপাল রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'আজ আবার কারেণ্ট অফ্। ছুটির দিনেই মানুষ বাড়িতে থাকে, আপনাদের ইলেকট্রিক কোম্পানির কী যে ব্যবস্থা! ভালো দিনেই এসেছেন—।' ইতিমধ্যে দুলে উঠল তার পা, সুধা লক্ষ করেনি শাড়ির কিছুটা বিছানায় চাপা পড়ায় বেরিয়ে পড়েছে তার ডান পায়ের উর্ধ্ব গোড়ালি ও গোছ, আলোর স্বল্পতা সত্ত্বেও মৃদু রোমগুলি চিকচিক করছে বালির মতো। 'যার জন্যে আসা সে-ই তো বাড়ি নেই!' সুধা হাসল, 'ও-মা, বসে থাকলেন কেন, চা-টা খেয়ে নিন!' সুধার হাসিই মনে পড়িয়ে দিল আমি কী জন্যে এসেছি এবং খানিক

আগে, বাইরে দাঁড়িয়ে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসার মুহূর্তে টুনির কথা মনে হয়েছিল—টুনি তার ন্যাড়া হাতে জলের গ্লাস নিয়ে আসবে। পরিবর্তে চা এলো। কাপে চুমুক দিয়ে আমি শরীর থেকে নির্গত এক প্রাকৃতিক গন্ধ টের পেলাম—তীব্র অথচ চাপা, অস্বস্তিকর সেই গন্ধ সুধাকেও স্পর্শ করার ভয়ে সংযত করলাম নিজেকে। একটা পুরনো চিন্তা এসে ধাক্কা দিল মাথায়, নয়নাংশু হাসপাতালে, সুধা অফিসে। ঠিক জানি না, সম্ভবত এরই মধ্যে নয়নাংশু সম্পর্কে দু' চার কথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আমার। ইত্যাদি মনে করে দ্রুত চা-টা শেষ করে হাত দিলাম পকেটে, তনুশ্রী বলেছিল বৌদি খুশি হবে। বলেনি কীভাবে দেওয়া উচিত। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত একটা ভূমিকার দরকার হয়, যেমন, 'অমুক আসবে, টাকাটা দিয়ে যাবে', বা, 'অমুককে বলেছি টাকার কথা, হয়তো আসবে', এমনি বা এই ধরনের পজিটিভ বা সেমি-পজিটিভ কিছু বলা থাকলে কাজ এগিয়ে থাকে কতকটা, যে দেবে এবং যে নেবে, উভয়ের মধ্যে একটা প্রত্যাশা গড়ে ওঠে। আপাতত সুধার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না টাকাটার বিষয়ে সে কিছু জানে, এমনকি মনে হচ্ছে না নয়নাংশু খুব খারাপ আছে বা আদৌ বাড়িতে নেই।

খাটে বসলেই অল্প অল্প পা দোলে সুধার, মুখে ফুটে থাকে অকৃত্রিম হাসি, যেন করায়ত্ত সব কিছুর আড়ালে সে ধরে আছে সম্পূর্ণ ও নিজস্ব এক পৃথিবী। সুধা ক্ষয় জানে। ফলে আমি খুবই দ্বিধায় পড়ি, টাকাটা নিয়ে কী করে পৌঁছুনো যায় সুধার কাছে এই চিন্তায় নানা দিক থেকে আক্রমণ করি নিজেকে। 'তনুশ্রী বলেছিল টাকাটা দিয়ে যেতে—', আমি কি এইভাবে শুরু করতে পারি ? প্রার্থনার চোখে সুধার দিকে তাকাতেই এলোমেলো হয়ে যায় প্রশ্নটা, আচমকা বেরিয়ে আসে প্রস্তুতিহীন অন্য একটা কথা। 'টুনিকে দেখছি না, সে কোথায় !' 'আজ ওর মামা এসে নিয়ে গেল। বাড়ির পাশেই নাকি ফাংসান ; কোথাও তো যেতে পারে না !' থেমে বলল, 'রোগ রোগ করেই জীবনটা গেল ! তাই আর আটকালুম না।' সম্ভবত এতোক্ষণে আমার চোখের তীব্র আন্তরিকতা টের পেল সুধা। চোখের সাদা অংশ ঘোলাটে হয়ে উঠল হঠাৎ। এই তো সময়, ভাবলাম, টাকার কথাটা এখনই বলা দরকার সুধাকে। সুতরাং বসে থাকা থেকে দাঁড়াতে হলো। পায়ের গোছ আড়াল করতে সুধা যতোক্ষণ ব্যস্ত থাকল, তারই মধ্যে পকেট থেকে টাকাটা বের করে যতোটা সম্ভব ওর নিকটবর্তী হলাম আমি। 'তনুশ্রী বলেছিল—', বলার কথাটা চটপট চলে এলো মুখে। সুধা কি শুনল ? এসব সময় যা হয়, ঈষৎ অপ্রস্তুত কিংবা দ্বিধার ভাব দেখা দেয়, সুধার আচরণে সে-রকম কিছুই প্রকাশ পেল না। 'ওমা, কেন !' বলতে বলতে টাকাটা হাতে নেওয়া বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলো সে, 'দেখুন তো, আবার আপনাকে বিরক্ত করা !' দেখি টাকাটা চলে যাচ্ছে বালিশের নিচে। সুধা এমনভাবে হাসল যাতে মনে হবে দেওয়া-নেওয়ার এই ঘটনাটা প্রত্যাশিত ছিল। হাসতে হাসতেই বলল, 'ফেরত দেবার তাড়া নেই তো ?' 'না, না—', আমি বললাম, ঠিক কোন কথার উত্তরে ততোক্ষণে তা গুলিয়ে গেছে। বস্তুত, কিছুক্ষণ আগে হারিয়ে যাওয়া সেই বিচিত্র গন্ধটা ফিরে আসছিল আমার মধ্যে। মধ্যরাতের স্বপ্নে বিচরণশীল মাছের মতো রক্তে ঘাই মেরে সুধা চলে যাচ্ছে জল থেকে জলে, তার শরীরের পিচ্ছিল ও আমিষ গন্ধে থরথর করে কেঁপে উঠল মেরুদণ্ড। সুধা সম্ভবত আমার অস্থিরতা টের পেয়েছিল। বিছানায় ঘুমন্ত শিশুটির দিকে তাকিয়ে অসাবধান হাসিতে কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট। 'কী ঘুমই ঘুমোতে পারে !' বলল, 'পাঁচটার আগে আর উঠবে না।' ঠিক যে শুনলাম তা নয়। বস্তুত, সুধার কণ্ঠস্বরের শারীরিক টান আপ্লুত করে দিচ্ছিল আমাকে ;

মুখের ভিতরে থার্মোমিটার ধরলে এখন নিশ্চিত জ্বর পাওয়া যেত। সুধা সম্ভবত এসব ভাবে না। ক্রমশ বিছানায় ঢলে-পড়া তার শরীর থেকে আমার চোখ চলে যায় শিশুটির গালে। 'কী গরম বলুন তো!' সুধার গলার নিচে ভরাট মাংসে সবুজ ব্লাউজের মায়াবী আলো পড়ে, 'দেখুন না ঘামাচি হয়েছে কতো!' অপার্থিব জ্যোৎস্নায় চোখ ধাঁধিয়ে যায় আমার। একে আকর্ষণ বলা যাবে কি না জানি না। তবু, চুম্বকের মতো আমার শরীর ছুটে যায় তার দিকে। সুধা তার দুর্ভেদ্যতা থেকে বেরিয়ে এসে ফিসফিস করে আমার কানে, 'এটা পাপ নয় তো!' বন্ধ ঘরের অসহ্য উত্তাপে ছুটে আসে গুঁড়িয়ে যাওয়া থার্মোমিটারের শব্দ। আর কিছু নয়।

॥ পাঁচ ॥

একদিন মিছিলে আমি ও অনাদি বোস পাশাপাশি হাঁটি। অফিস থেকে শুরু করে একটা গোটা রাস্তা ঘুরে মনুমেন্ট যাবার সময় পিছন থেকে এগোতে এগোতে ক্রমশ আমাদের মধ্যে চলে আসে মধু বিশ্বাস, 'হ্যাঁ মশাই প্রিয়নাথবাবু, ভিয়েতনাম জায়গাটা কোথায়?' এই একটা জায়গায় তার মাথাটা ছোট হয়ে আসে, গলার স্বর নিচু। বস্তুত, কবে আর এমন গলায় কথা বলেছে মধু বিশ্বাস! আমি একটু চমকে যাই। মুখে 'কেন?' বললেও তার প্রশ্ন এবং আমার প্রশ্নের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না কোনো। আমাদের পিছনে, প্রায় ঘাড়ের ওপর, সমস্বর একটা চিৎকার আছড়ে পড়লে পুরীর সমুদ্র ও ঢেউ ভেসে ওঠে চোখে। বলেছি তো, একবার মধু বিশ্বাসের সঙ্গে গিয়েছিলাম সেখানে। খুব উঁচু একটা ঢেউ ভেঙে যায় আস্তে আস্তে। মধু কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সম্ভবত কথাটা বলবে কি না ভাবে, তারপর হঠাৎ বলে, 'এতোটা রাস্তা চেঁচিয়ে এলাম। হঠাৎ মনে হলো ভিয়েতনামটা কোথায়! তারপর থেকেই, মশাই, কেমন একটা হচ্ছে—এভাবে চ্যাঁচানো কি ঠিক হচ্ছে!' 'কেন, হচ্ছে না কেন', এই রকম একটা কথা এসে গিয়েছিল মুখে; পরিবর্তে বললাম, 'সাউথ-ইস্ট এশিয়ায়।' শুনে আচমকা হো-হো করে হেসে উঠল মধু বিশ্বাস, 'কুমীর কী, না ক্রোকোডাইল! এভাবে তো নিজের ছেলেকে ধাপ্পা দিই! হ্যাঁ মশাই, এটা কি কোনো উত্তর হলো! আমি কি ভূগোল জানি!' একবার হাসতে শুরু করলে দেখা যায় ক্রমাগত হেসে যাচ্ছে মধু—স্যুইচ্ অফ্ করে দেবার পরেও যেমন পাখার টেনসান থিতোতে সময় লাগে, তেমনি।

উপমাটা কি ঠিক হলো। আকস্মিকভাবে চিন্তাটা হানা দেয় মনে। পৃথিবীতে বসবাসের দিন স্বল্প হয়ে আসছে ক্রমশ, আমি কি নিঃশেষিত! এখন আমার ডায়বিটিস নেই। একবার সতর্ক হবার পর থেকে চিনি কম খাই, মিষ্টি ছুঁই-ই না প্রায়, দিনের অনেকটা সময় রুটি বেলতে বেলতে কড়া পড়ে যায় অমলাদির আঙুলে। আর, সে-সব রুটি কী! গভীর রাতে একাকী আসনে বসে আমি যখন রুটি চিবোই ও রুটির শুষ্কতা নিজের গাত্রত্বকের কর্কশতার মতো আটকে যায় গলায়, মনে হয় বর্তমান ও অতীতের সঙ্গে অনুভবযোগ্য কোনো সম্পর্ক আর নেই। দোষটা অমলাদির নয়; আমার অনুভূতির। ক্লান্তির। খণ্ড সময় তখন দেখা দেয় বৃহৎ হয়ে। ছবিটা এই রকম: প্রায়-চল্লিশ একটি লোক বসে বসে রুটি চিবোচ্ছে। তার গোটা দিনের সমস্ত উদ্যম পরিণত হচ্ছে অদ্বিতীয় একটি ক্রিয়ায়। ব্যতিক্রমহীন; আর

কিছু নয়।

একদিন অবশ্য তপোবনবাসী নবীন সন্ন্যাসীর মতো মনে হয়েছিল। সেটা জুলাই মাস ও ছুটির দিন। বলা যায় শ্রাবণ মাস, তা হলে প্রাকৃতিক অবস্থা কিছুটা পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। দুপুর থেকেই আকাশ ঘোর করে নেমেছিল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। আমি ও তনুশ্রী সিনেমা যাব বলে বেরিয়ে বাসে উঠি—বাসটা ছুটে যায় হাওড়ার দিকে। একটু ভুল বলা হলো, ছুটে কি আর যায়! হেলতে দুলতে, দু' পাশে জল ছিটিয়ে—কিন্তু, মোটানুটি গাধাবোটের মতো। বেশি লোক ছিল না। ছুটির দিন বলেই সম্ভবত যারা ছিল তাদের কোনো তাড়া থাকে না, জানলার বাইরে তাকিয়ে তারা ক্রমাগত নেমে-আসা বৃষ্টি দেখে। দেখতে দেখতে, কোনো একসময়, বৃষ্টি ও তাদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না কোনো। প্রকৃতি ও মানুষের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বহু কাল দেখিনি—বহু কাল এমন নৈঃশব্দ্য শুনিনি। দোতলায়, বাসের সিটে, আমার শরীর সংলগ্ন হয়ে বৃষ্টি দেখে তনুশ্রী। বস্তুত, আমার ও তনুশ্রীর এই একত্র বৃষ্টি দেখা একজনেরই দেখা, কিংবা আরো বহুজনের দৃষ্টিতে এক হয়ে দেখা, বিষণ্ণ ভোরে শোনা নমাজের ধ্বনির মতো মাত্র একটিই ধ্বনি ছুঁয়ে যায় সকলকে। মনে হয় বৃষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না কোনো দিন, আর কিছু থাকবে না। এতো সমাহিত ও বিপন্ন যে বহু দূর শৈশবে দেখা উত্তরাধিকারহীন প্রস্তরখণ্ডের ওপর অবিরাম বৃষ্টিপাতের মতো এই সব মুখে ক্রমশ লেখা হয়ে যাচ্ছে পতন ও ক্ষয়ের চিহ্ন। আমি চিনতে পারি। হয়তো সকলেই পারে। হয়তো সেই শৈশবস্মৃতির নিয়তিময় পুনরাবির্ভাব সকলকেই মূক করে রাখে।

সেদিন বৃষ্টি পেরিয়ে চোখ আর বেশি দূর যায় না। সামনে বা আশেপাশে গোচর নয় কিছু, শুধু মাঝে মাঝে বাসের দুলুনি—এমনকি বোঝা যায় না আমরা সামনে এগোচ্ছি বা পিছনে। কিন্তু এই বৃষ্টি পড়ে—পড়ে যায়—বহু কাল ধরে। আকস্মিক মেঘের শব্দে এক নৈর্ব্যক্তিক আতঙ্কে কেঁপে ওঠে বুক। সচকিত হয়ে দেখি একটি হাত পড়ে আছে আমার হাতের ওপর। অন্যান্য শরীরহীন শুধুই নিঃসঙ্গ সে-হাতের দিকে তাকিয়ে পলক পড়ে না। অথচ এমন নয় যে আমি বুঝি না কী চায় সেই হাত, আস্তে আস্তে কিন্তু অব্যর্থভাবে তার শীত ছড়িয়ে পড়ে আমার শরীরে। এরও বেশ কিছুক্ষণ পরে তনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি সে বসে আছে স্থির, কোনো দিকে না তাকিয়ে, আমি তাকানো মাত্র পরপর ঝরে পড়ে দীর্ঘশ্বাস। প্রবল বৃষ্টিতে মূক ও অন্ধ বাসের যাত্রীরা লক্ষ করে না প্রিয়নাথ নামে একটি লোক তনুশ্রী নামের একটি মেয়ের হাত তুলে নিচ্ছে আস্তে আস্তে, সহমরণের আলোয়—দুপুরেই নেমে এসেছে সন্ধের অন্ধকার। 'আজ না বেরুলেই ভালো হতো', ডুবে-যাওয়া গলায় বলল তনুশ্রী, 'এতো বৃষ্টি!' তনুশ্রীর ভয় ছুঁয়ে গেল আমাকে। 'মন্দ কী', বললাম, 'বেশ থ্রিলিং।' 'থ্রিলিং! দুর্যোগ এতো ভয় ধরিয়ে দেয়! মনে হয় যা ভাবতে চাই না তাই হবে।' 'কী?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না তনুশ্রী। আমার ঘাড়ের পিছন দিয়ে বৃষ্টিতে ঝাপসা কঠিন কাচের বাইরে কিছু দেখার চেষ্টা করল সে, পিঁপড়ের বিচরণের মতো আমার তালুতে ঘষে গেল তার আঙুলের ডগা। 'দাদাকে নিয়েই যতো ভয়। একটা কিছু হয়ে না যায়!' মনে মনে, সম্ভবত, এই উত্তরটিরই অপেক্ষা করছিলাম আমি। 'কেন', বললাম, 'অপারেসান তো ভালোই হয়েছে।' 'হয়েছে। তবু—', কথাটা শেষ করে না তনুশ্রী। চকিতে মনে পড়ে নয়নাংশুকে। ঠাণ্ডা করা ঘন হরলিক্‌সে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, 'যা খাই মনে হয় দেওয়াল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। পেটের ভিতরে কিছু কি কেটে বাদ দিল!' একটা বিষণ্ণ আর্তি ফুটে ওঠে নয়নাংশুর চোখেমুখে। বুঝি সে কী জানতে চায়। সুধা তার

পাপ নিয়ে সরে থাকে দূরে। এই বৃষ্টিতে, বাসের মধ্যে, বুঝি কোন. সংশয় আড়াল করে দিচ্ছে তনুশ্রীকে। আকস্মিক বজ্রপাতে চাপা পড়ে আমাদের সেই মুহূর্তের সর্বস্ব।

'সিভিল ম্যারেজ খারাপ কেন ?' করব-করব করেও কথাটা অনেক দিন জিজ্ঞেস করা হয়নি তনুশ্রীকে। সেদিন, সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও না। অথচ, অনেকক্ষণ পরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে এই কথাটিই প্রথম মনে আসে আমার, 'যতো দিন যাচ্ছে দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো, রেজিস্ট্রি করে নিই।' তনুশ্রীর হাঁ করার মধ্যে ছ' সাতটা বৃষ্টির দানা ঝরে পড়ে। হাসতে গিয়ে ঠোঁট বন্ধ করে সে, বৃষ্টিতেও ঘন হয়ে আসে চোখ। সম্ভবত লক্ষ করেছিল আমি তার বুক দেখছি। 'কীভাবে তাকাও !' বলল, 'যেন কখনো দ্যাখোনি !' বলতে বলতে আঁচল বিছিয়ে দিল গলায়। 'এসবের জন্যেই তো তাড়া !' একটা ট্যাক্সি এসে আলাদা করে দেয় আমাদের। বিব্রতভাবে আশেপাশে তনুশ্রীকে খোঁজবার আগেই আমার চোখ আটকে যায় অন্য একটা মুখে, দেখি এক হাতে সরলরেখা তৈরি করে অন্য হাতে ব্যাটনের সঙ্কেত ছুঁড়ে যাচ্ছে শম্ভু—তার নির্দেশে একটার পর একটা গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এই মুহূর্তে শম্ভুর বৃষ্টিতে বিগলিত আর্ত মুখের সঙ্গে শ্মশানকাঠের অনম্য আগুনে ক্রমশ গলে যাওয়া মুখের তুলনা চলে। মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আমার দু'টি চোখ। একটি চোখ নদীর অন্য পারে দাঁড়ানো তনুশ্রীকে লক্ষ করে, অন্য চোখে ভেসে ওঠে শম্ভুর মুখ। আমি চেঁচিয়ে ডাকবার কথা ভাবি, 'শম্ভু, আমাকে দ্যাখ। তোর হাতটা নামা !' স্বর বেরোয় না কোনো। 'পুলিস কি কারো বন্ধু হয় !', মনে পড়ে, এমনকি তনুশ্রী এপারে আসার পর, ছুটতে ছুটতে এনকোয়ারি কাউণ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার পরও।

এতোক্ষণে আঁচল নিঙড়ে ভিজে ওঠা শাড়ির জল ফেলে দেয় তনুশ্রী—এক বৃষ্টির দাপটেই কৈশোর ফিরে আসে তার বুকে। হি-হি করা হাসিতে বেরিয়ে পড়ে তার কাল্‌চে মাড়ি ও বয়স। আমার প্রায় চল্লিশ হলো। তখন, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো প্রায় ফাঁকা বর্ধমান লোকালের একটা কামরায় বসে জনশূন্য বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমার হাতে নিঃশব্দ আঙুল ঘষতে ঘষতে তনুশ্রী বলল, 'ভালো হতো যদি এইভাবে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারতুম।' 'পালিয়ে ?' 'সে জানি না।' থেমে বলল, 'তোমার সঙ্গে।' 'আমি যেতাম না।' 'আ-হা !' তারপর আর কথা থাকে না। শরীর থেকে উঠে-আসা মাংসের গন্ধে চোখমুখ ফুলে উঠতে তীব্র রাগে আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিলাম আমি। তনুশ্রী কি কিছু বুঝল ! জানি না। বৃষ্টিতে নরম মাটির মতো কাদাটে হাতে সে আমার কব্জি চেপে বলল, 'একজন হাত দেখে বলেছে আমার বিয়েতে খুব জাঁকজমক হবে।' বলল, 'রেজিস্ট্রি করলে কি তা হবে ! বিয়ে তো একবারই হয়— ।' কথাটা আমার কান অব্দি পৌঁছবার আগেই 'অ্যাটেনসান প্লিজ'-এর গম্ভীর ধাতব ধ্বনি ছুটে আসে দ্রুত। 'অনুগ্রহ করে শুনুন। শ্যাওড়াফুলী ও ব্যাণ্ডেলের মধ্যে ওভারহেড্‌ তারের গোলযোগের জন্যে আপ ও ডাউন ট্রেনের— ।' এই পর্যন্ত এসে উঠে দাঁড়ায় তনুশ্রী। 'যাওয়া হলো না !' কথাটা আর কেউ শোনে না। ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে পা দেবার সময় মনে হয় জীবন খুব একা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফেরার পর অনেক দিন আগেকার ফুলতোলা আসনটা বের করে আমাকে বসতে দেয় অমলাদি। বড়ো কাঁসার থালায় সাজিয়ে ফুলকো লুচি পরিবেশন করতে করতে বলে, 'ঠিক আজকেই দুধ পাওয়া গেল না ! বিকেলে বেরিয়ে খাটাল থেকে নিয়ে এলাম। কী বৃষ্টি বল তো ! উঁহুঁ, আগে পায়েসটা মুখে দে— ।' এ-কথায় অবাক, আমার চোখ চলে যায় অমলাদিকে খুঁজতে। মাত্র সাত দিনের মধ্যে একটি জন্ম ও একটি

মৃত্যুকে ধারণ করেছিল সে নিজের মধ্যে—স্বামীপুত্রহীন তার একান্ত জীবনে এখনো বৃষ্টিতে ভেজার ক্লেশ শেষ হয়নি। বললাম, 'হঠাৎ এসব কেন ?' 'ও-মা !' মেঝেয় বসতে বসতে বলল অমলাদি, 'আজ তোর জন্মদিন না ! হঠাৎ মনে পড়ল— ।' শুনে হাসলাম আমি। আর কিছুর জন্যে নয়, অমলাদির ভ্রান্তির কথা ভেবে। শ্রাবণ মাসের এক রবিবারে জন্ম হয়েছিল প্রিয়নাথ মজুমদারের। আজও রবিবার, আজ নয়। অমলাদি শ্রাবণ মাস ও রবিবার মনে রেখেছে, মনে মনে একটা হিসেব করে নিলাম আমি, গত সোমবার আমি জন্মদিন পেরিয়ে এসেছি। আমারও কি মনে ছিল। পায়েসের মধুর গন্ধে আপ্লুত জিবের অস্তিত্ব অনুভব করতে করতে আমি সেই সব মানুষের কথা ভাবি, আজ যাদের জন্মদিন। তোমাদের কি স্মরণ ছিল, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, মৃত্যুহীন বয়স কি তোমাদেরও টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ আত্মবিস্মৃতির দিকে ! 'মাংসের দাম আজ আট আনা বেশি নিল— ।' কথাটা তেমন প্রয়োজনীয় মনে হলো না। বলেছি তো, নিজেকে তখন তপোবনবাসী সন্ন্যাসীর মতো মনে হচ্ছিল—বস্তুপৃথিবী থেকে বহু দূরে সে চলে যাচ্ছে গভীর নির্বাসনে। অদৃশ্যলোক থেকে সরবরাহ হচ্ছে তার খাদ্য, অন্য কোনো লোকের ভাষা ও দৃষ্টি তার বোধগম্য হয় না।

যাই হোক, উপমা নিয়ে কথা হচ্ছিল। একদিন মিছিলে যেতে যেতে মধু বিশ্বাসের হাসি দেখে স্যুইচ্ অফ্ করা পাখার টেনসানের উপমা মনে এসেছিল। উপমাটা কি ঠিক হলো ! বস্তুত, সেদিন, এই রকম একটা খট্‌কা ভিয়েতনাম বা মধু বিশ্বাস থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যায় বহু দূরে—অনেকটা সময় আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না। কিছু দিন থেকেই হচ্ছে এ-রকম ; নিজের উদ্ভাবন-ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ছি ক্রমশ।

নিজের সম্পর্কে অস্বস্তি প্রবল হলেই সিরসির করে ওঠে সারা গা—তীব্র শীতে নষ্ট হয়ে যায় ফল। এই ঘটনাটা, এই যে অনুভূতি জুড়ে একটা প্রচণ্ড শীতময় আলোড়ন, কীভাবে বর্ণনা করলে যথাযথ হবে বুঝি না। আমার অগোচরে, সম্ভবত, ধীরে ধীরে ও ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার সব উপলব্ধি। শুধু আজ বা সেদিন বলে নয়, এ-রকম চলছে অনেক দিন ধরে। শম্ভুকে নিয়ে আমি যে-গল্পটা লিখি, তাতে এমনি নষ্ট হয়ে যাওয়া অনুভূতির কথা ছিল। শম্ভু ছিল না ; আসলে সেই গল্পে শম্ভুর নামটা বদলে দেওয়া হয়েছিল যাতে সে একটা আধুনিক রূপ পায়। লেখার আগে বিষয়টা নিয়ে আমাকে ভাবতে হয় অনেক, ভাবতে ভাবতেই এলোমেলো অনেক নামের ভিতর থেকে অরিন্দম নামটা বেছে নিই—যে যাই বলুক, নামটা বেশ গালভরা ও আধুনিক। এসব নাম আজকাল খুব চলে, যেমন মেয়েদের বেলাতেও চলে স্বাতী, শুচিস্মিতা, দেবশ্রী এই সব। তখনই, অর্থাৎ গল্পটা কিছুটা এগিয়ে যাবার পর, পড়তে হয় বিপদে, দেখি অরিন্দম নামে যতোটা আধুনিক, ব্যবহার, কথাবার্তা বা কাজকর্মে ঠিক ততোটা হয়ে উঠতে পারছে না। আসলে সে শম্ভুই থেকে যাচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় হয়ে—কখনো ডান দিকে কখনো বাঁয়ে যান্ত্রিক হাত তুলে বিভিন্ন গাড়ির প্রবাহ সচল রাখছে শুধু, নিজে নড়ছে না। এইভাবে দিনের পর দিন, দিনের পর দিন, দিনের পর দিন, হৃৎপিণ্ডহীন, ক্রমাগত ডান হাত ও বাঁ হাতের উত্থান-পতন সক্রিয় রাখতে রাখতে ক্রমশ বিশেষ একটি কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে অরিন্দম, মাত্র এই বিষয়টি ছাড়া আর-কিছুতেই সে আর কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। অরিন্দম সম্পর্কে আরো দু' একটি কথা বলা যায় এইখানে, যেমন একটি মেয়েকে সে ভালোবাসত প্রাণপণে। তারপর এমন হয় যে তার মনে ভালোবাসার ইচ্ছেটাই শুধু থাকে, মেয়েটি আর থাকে না। বলা

উচিত, প্রত্যক্ষভাবে মেয়েটি সম্পর্কে তার কোনো উপলব্ধি থাকে না। কখনো ডান হাত এবং কখনো বাঁ হাত তুলতে তুলতে সে কথা বলে মেয়েটির সঙ্গে, দু' পক্ষের পারস্পরিক আলাপ সে একাই সেরে নিতে পারে। আরো আছে, যেমন প্রত্যহ সকালে খবর জানার লোভে সে কাগজ কিনত, এখনো সে আগের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে কাগজ কেনে, কিন্তু খবর পড়ে না। কখনো ডান বগলে কখনো বাঁ বগলে কাগজটা সারাক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এমনিভাবে, নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধিহীন হতে হতে সে পৌঁছে যায় একটি দিনে—একটা হরতালের দিনে, এবং একইভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গল্পটা কি শেষ হলো ? সে যাই হোক, বহু দিন পরে লেখা এই গল্পটি কাগজের অফিসে পৌঁছে দিয়ে আমি বসে থাকি চুপ করে এবং আশা করতে থাকি সামনের যে-কোনো একটি সংখ্যায় গল্পটি বেরুবে। তারপর, অরিন্দমের মতো—যদিও হাত না তুলে, আমি ও তনুশ্রী হেঁটে যাই কলকাতার রাস্তায়, ট্রাম ও বাসের ক্রমাগত আসা-যাওয়া চলে আমাদের পাশ দিয়ে, বিকেল, সন্ধ্যা ও রাতের তারতম্য ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠে স্নায়ুমণ্ডলে। যেতে যেতে এক একদিন রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিস দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি আমি ; না, শম্ভু নয়। কৌশিক টাকাটা ফেরত চায় না, কিন্তু ক্রমশ উধাও হয়ে যায় কলকাতা থেকে—আমার সান্নিধ্য থেকে। কৌশিকের স্ত্রীর নাম মীনা। একদিন, সে অনেক দিন আগের কথা, হলদে দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আকণ্ঠ প্রলোভনের মধ্যে। যেতে যেতে এসব সময় মনে পড়ে সুধাকে, ঘামাচিসহ তার নীলাভ সাদা স্তন পিষ্ট হয়ে যায় আমার বুকে। বুঝতে পারি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আঠালো হয়ে উঠছে জিব। ইচ্ছে করে তনুশ্রীকে নিয়ে যাই ঘরে—জেলিমাখানো পাঁউরুটির মতো সেই মুহূর্তের চটচটে স্মৃতি উত্তপ্ত করে তোলে আমাকে। ঘর খালি হয় না। একান্তে বয়স বেড়ে যায় অমলাদির ; তেমন কোনো কথা হয় না। পরের দিন অফিস ছুটির পর আবার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি তনুশ্রীর। তনুশ্রী আসে। আমরা হেঁটে যাই। গল্পটা ছাপা হয় না তখনো।

তিন চার মাস পরে একদিন সেই কাগজের অফিসে গিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করি আমি। রীতিমতো দুরন্ত চেহারা ভদ্রলোকের—হাসি, গাম্ভীর্য ইত্যাদি বিভিন্ন অভিব্যক্তি তাঁর মুখের ওপর ঘোরে চক্রাকারে, একটির সঙ্গে অন্যটির ব্যবধান অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনে হয়। তো সেদিন, দরজা ঠেলে মুখ বাড়াতেই 'আরে ! আসুন, কী খবর' বলে একচোট হেসে আমাকে আপ্যায়ন করেন তিনি, যাতে এ-রকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে গল্পটা মনোনীত হয়েছে এবং সামনের যে-কোনো একটা সংখ্যায় ছাপা হবে। অনেক দিন আমার কোনো লেখা বেরোয়নি ও কিছু লিখিনি। শেষ যে-গল্পটা বেরিয়েছিল এখানে তার নাম ছিল 'আমরা', তার নায়ক ছিল কৌশিক ; সে-গল্পের নাম কেন 'আমরা' হবে আজও তা বোধগম্য হয় না আমার, এ-কথা তো বলেছি ! তবে গল্পটা ছাপা হয়েছিল এবং যাকে প্রশংসা বলে, পেয়েছিল। এখন এই গল্পটা যদি ছাপা হয়—এই পর্যন্ত ভেবে হঠাৎ এসে পড়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে, সাহস করে বললাম, 'লেখাটা কি ছাপবেন ?' সম্পাদক নস্যি নিচ্ছিলেন, একটা পাকানো রুমালের দুই কোণ ধরে নাকের নিচে ঘষতে ঘষতে বললেন, 'কোন গল্প বলুন তো ?' তখনই, থেমে-থাকা বাসের স্টার্ট নেওয়ার মতো মৃদু উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল আমার মধ্যে। সম্পাদকের ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে গল্পটার নাম বললাম। শুনে হাসলেন তিনি,'ও-ও-ও, সেই ট্রাফিক পুলিসের গল্প !' বলে ত্বরিতে ড্রয়ার খুলে খাম বের করে ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের ওপর, 'না, মশাই, ছাপতে পারলুম না। আপনি অন্য একটা

লেখা দিয়ে যাবেন।' অপ্রতিভভাবে খামটা টেনে নিলাম আমি, হাত বুলোলাম স্নেহচ্ছলে। তখন সম্পাদকের সঙ্গে এই রকম কথাবার্তা হলো :

'লেখাটা পছন্দ হলো না আপনার ?'

'পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয়। এ-ধরনের লেখা আমরা ছাপি না। বোঝেন তো, রিডারশিপ কমে যাবে—'

'কী ধরনের লেখা ছাপবেন ?'

'সেটা বলা মুশকিল। লেখা তো অনেক ধরনেরই হয়। তবে, মশাই, আপনার যেসব ব্যাপার—পুলিস, বিধবা, এসব কী ! প্রেম-ট্রেম নিয়ে লিখুন, বেশ জমিয়ে, রগরগে করে—'

'প্রেম তো এতেও ছিল— । মানে, লোকগুলো তো বিষয় নয়, এরা বিষয়কে সিম্বলাইজ করছে ! তা ছাড়া—'

'ফুটনোট দিয়ে ছাপতে বলছেন ? এটা কি ফ্রান্স ! তা ফরাসি উপন্যাস যেগুলো আজকাল বেরুচ্ছে পড়ে দেখুন না, ওই ধাঁচেও যদি ফেলতে পারেন। তবে, ও-রকম খোলাখুলিভাবে লিখলে চলবে না। এমনভাবে লিখবেন যাতে মা আর মেয়ে দু'জনেই পড়তে পারে, আবার দু'জনেই যাকে বলে—ইয়ে, বেশ পুলকিত হয়। আর মশাই, ক্যারেকটারগুলোকে একটু ইয়াং, একটু পয়সাওলা করবেন। রাস্তা হাঁটিয়ে কি আজকাল প্রেম জমানো যায় ! ধরুন ইয়ের লেখা—'

'চলি—'

'যাবেন ? দিয়ে যাবেন একটা লেখা। আপনার হাত ভালো—'

সেদিন রাস্তায় পা দেবার পরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত নস্যির কড়া গন্ধ লেগে থাকে আমার নাকে, স্নায়ুগুলো টান-টান, অর্থহীনভাবে বেরিয়ে আসে চেপে-থাকা নিঃশ্বাস। সিগারেট আমার তেমন পছন্দ হয় না—পান খাবার পর একটু-আধটু ভালো লাগে, কিন্তু সেই মুহূর্তে খুব ইচ্ছে করছিল একটা সিগারেট খেতে। আর খুব পেচ্ছাপ পাচ্ছিল।

প্রিয়নাথ মজুমদারকে নিয়ে সত্যিই কোনো গল্প হয় না, তনুশ্রীকে নিয়েও না। ভালোবাসা বস্তুটি গাড়ির অভাবে থেমে থাকে, কিংবা, দাঁড়িয়ে থাকে একই জায়গায়। চলে না। 'আমরা' গল্পে কৌশিকের গাড়ি ছিল, গাড়ি থাকার জন্যেই একই সময়ে কনট্রাসেপটিভ ও চকোলেট কিনে খুব দ্রুত সে এগোতে পেরেছিল তনুশ্রীর দিকে। তার একটা ঘরও ছিল, সুতরাং সেই ঘরের মধ্যে তনুশ্রীকে নিয়ে গিয়ে সে যা যা করার করেছিল। এই সব ভাবতে ভাবতে এসপ্লানেডের পেচ্ছাপ-ঘরে খুব মন দিয়ে এবং অনেকটা সময় নিয়ে পেচ্ছাপ করি আমি—মনে হয় অর্থহীন, ঠাণ্ডা মাংসপিণ্ডের মুখ দিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে যাচ্ছে রক্ত ও শরীর, আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাচ্ছে মাথা। পেচ্ছাপখানার দূষিত, প্রায়-রাসায়নিক গন্ধে মিশে যাচ্ছে পোড়া পেট্রলের গন্ধ। প্রায় তখনই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই আমি। ফুটপাথের দোকান থেকে সিগারেট কিনে আগুন জ্বালতে কী আর এমন সময় লাগে, কাঠিটা জ্বলন্ত থাকতে থাকতেই পকেট থেকে গল্পসুদ্ধ খামটা বের করে চেপে ধরি আগুনে ; ফুটপাথে পড়ে খামটা জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। মনে পড়ে হাওড়া স্টেশনের চত্বরে আমাদের যাওয়া-আসা আর বৃষ্টিতে বিগলিত শম্ভুর মুখ। অনেক দিন দেখা হয় না।

স্মৃতি এক একসময় প্রতারণা করে অদ্ভুতভাবে। যেমন সেদিন, মিছিলে যেতে যেতে মধু বিশ্বাসের প্রশ্নে বিচলিত আমি পরপর ও একসঙ্গে পেরিয়ে যাই অনেকগুলো স্মৃতি—পিছল ও অবলম্বনহীন, এর কোনোটাই ছুঁয়ে থাকে না আমাকে। বা থাকলেও, খুব

আবছাভাবে —অমাবস্যার মধ্যনদীতে একা দাঁড় টেনে এগিয়ে যাওয়ার মতো, কানে আসে দাঁড়ের শব্দ, কিন্তু জল মিশে থাকে জলে। স্মৃতি মিশে যায় স্মৃতিতে। একবুক অন্ধকার বড়ো ও গোল টাবের মতো নেমে আসে মাথার ওপর। খুব এলোমেলোভাবে আমার পা পড়ে পৃথিবীর ম্যাপে, 'মেকং' 'মেকং' একটা শব্দ ঝন্ ঝন্ করে কানে—একলা ট্রেন ঝড়ের শব্দ তুলে পেরিয়ে যায় অন্ধকার সেতু। 'ভিয়েতনাম জায়গাটা ঠিক কোথায় ?' মধু জিজ্ঞেস করেছিল এইভাবে ; আমি জিজ্ঞেস করি নিজেকে। তারও অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হয় আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, মিটিং চলছে পুরোদমে, একজন খুব উঁচুতে উঠে চেঁচিয়ে যাচ্ছে : 'এ-সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম, আমাদের সকলের সংগ্রাম, সুতরাং এ-লড়াই জিততে হবে। মনে রাখবেন আমাদের প্রত্যেকের বুকেই আছে ভিয়েতনাম— ।' শুনে সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম' বলে, চিৎকার শেষের ধ্বনিতে 'আ-আম' যুক্ত হলো, শব্দটা হাওয়ায় প্রতিধ্বনিত হলো অনেকক্ষণ। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি মধু নেই, সে কি অন্তর্হিত হলো ! আমার তাকানোর অর্থ কি এই নয় যে ওই সমবেত শব্দের মধ্যে আমি মধুর গলাও শুনেছি !

তখন ভিড় থেকে দূরে হাঁটতে শুরু করি অন্য দিকে। দূরে জ্বলে ওঠে দাউ দাউ আগুন, সম্ভবত কোনো কুশপুত্তলি দাহ করা হচ্ছে। আগুনের আভা যতো দূর যায় ঠিক ততো দূর অব্দি মানুষগুলিকে দেখায় তীব্র ও আবদ্ধ। হঠাৎ আলোর জন্যেই সম্ভবত পরবর্তী সবই থমথম করে অন্ধকারে। আরো কিছুটা এলোপাথাড়ি হেঁটে দেখি অনাদি বোস দাঁড়িয়ে আছে একা ; তার পাশে ফুচ্‌কাওলা, ফুচ্‌কার টুকরো গলায় আটকে বিষম খায় একটি লোক। বলতে গেলে লোকটির কাশিই চিনিয়ে দেয় অনাদি বোসকে। আমার আবির্ভাব সম্ভবত লক্ষ করল না সে, তখনো তার চোখ মঞ্চের দিকে। বক্তৃতা চলে, ভিয়েতনাম থেকে মানবাধিকারের দিকে।

পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর বেশ কিছুক্ষণ পরে অনাদি বলল, 'চলুন, ফেরা যাক।' 'কোন দিকে ?' অনাদি একটু ভাবল ও হাসল, তারপর হাত ধরে বলল, 'চলুনই না মশাই, ভয় পাচ্ছেন কেন ? মাল-টাল খাওয়া অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি।' আমি বললাম, 'চলুন।' তখন, তাৎক্ষণিক বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অনাদি বলল, 'চলুন, চা খাওয়াবেন। আপনার আবার সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই তো !' বললাম, 'না, কেন ?' 'থাকলেও একদিন ছাড়ুন', অনাদি হাসল, 'একটা সন্ধেবেলা না হয় আমার সঙ্গেই কাটালেন।' বলে হাসল হ্যা-হ্যা করে। বোধ হয় অনেক দিন পরে অনাদির দাঁত দেখা গেল।

অনাদি এ-রকম বলতে পারে। অফিসে আমার কাছাকাছি ফোনটা এখনো তার টেবিলে আছে ; 'বুঝলেন, গলা শুনলেই বুঝতে পারি কে।' একদিন বলেছিল রগড় করে, 'সেদিন স্বপ্নের মধ্যে বেজে উঠল টেলিফোন। উঠে চোখেমুখে জল দিয়ে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলে শুয়ে পড়লাম আবার। পরদারেষু মাতৃবৎ।' শুনে আমাকেও হাসতে হলো। বিপরীত-গতি দুটি বাসের মধ্যে দিয়ে আমি ও অনাদি রাস্তা পার হলাম। সত্যি বলতে, প্রথম প্রথম 'প্রিয়নাথবাবু' বলে অনাদির ঠকাস্ করে ফোনটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার শব্দে ঈষৎ বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করতাম আমি ; আফটার অল এটা অফিস, এটা কি ঠিক হচ্ছে ! পরে, যতো দিন যেতে লাগল, কেমন রপ্ত হয়ে গেল ব্যাপারটা। এমনকি, একটা বিশেষ সময়ে, দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ফোন বাজলেই কেমন প্রস্তুত হয়ে পড়ত পা দুটো।

একদিন সে-জন্যে হাসতে হাসতে অনাদি বোস বলল, 'সাপ্লায়ার মশাই, পাওনাদার। কথা বলবেন ?' শুনে, বলব কী, প্রকৃতই মুখ চুন-করা অবস্থা হলো আমার। তখন বলল, 'যান, সিটে গিয়ে বসুন গে। ঠিক ডেকে দেব।' তো, যা বলছিলাম, তারপর থেকেই ক্রমশ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল ব্যাপারটা। যেমন তনুশ্রীর সঙ্গে আমার নিয়মিত দেখা হওয়াটা—অভ্যাস ছাড়া একে আর কী বলা যাবে! অনাদি এসব বলতে পারে।

সে যাক্‌গে। রাস্তা পেরিয়ে পুবমুখো হেঁটে আমি ও অনাদি চলে এলাম একটা চায়ের দোকানে। অনাদি বলল, 'এখানেই ভালো।' বলে, সিগারেট চাইল। 'নেই' বলাতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসছি। আপনি একটা ফিশফ্রাই খেতে পারেন। আমি শুধু চা—।' অনাদির পিছনে পিছনে তার কণ্ঠস্বর চলে যেতে আবার একা হলাম আমি। একা—একা ; বিশেষত আজকাল কথাটা বিষমভাবে বেজে যায় বুকে, প্রায়ই। কেন এমন হয় জানি না, বস্তুত আমি কি একা! তবে হয়। তনুশ্রীরও হয়। ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নয়নাংশু, বুঝতে পারি আমি, হয়তো তনুশ্রীও পারে। 'সব সময় কেন যে এতো একা লাগে—', বলেছিল একদিন। সেদিন বৃষ্টি ছিল না, কিন্তু অবেলায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল আকাশ। একেকটা অবেলা প্রাণমনের অজান্তেই কেমন চিরস্মৃতি হয়ে যায়। সেদিন কি রবিবার ছিল ? হলেও হতে পারে, আমার ঠিক মনে নেই। তবে তনুশ্রী বাড়িতে ছিল এবং আমাকেও খুব ভাবতে হয়নি। বলতে কী, সেদিনই বিকেলে ওদের বাড়ি গিয়ে আমি প্রথম মৃত্যুর আগমন টের পাই। নিঃশব্দে দরজা খুলে তনুশ্রী চলে যায় ভিতরে, অনেক দিন পরে এ-বাড়িতে আমার এসে উপস্থিত হওয়ায় অস্বাভাবিকতা থাকে না কোনো। একটু খটকা লাগলেও পরে বুঝতে পারি আমার আগেই এসে পড়েছে সে। অদ্ভুত মসৃণ, প্রায় ঋষিতুল্য আবির্ভাব তার, মনে হয় এমনকি মেঝেয় ছড়ানো সংসারের ন্যূনতম শব্দগুলিও সে তুলে নিয়েছে খুঁটে। এতো শান্ত, এতো নিরুপায়, এমন কর্মকোলাহলহীন ও প্রকৃতিস্থ! স্বাভাবিক কারণেই অনুগত হয়ে পড়ি আমি, এমন অনুভবের কাছে খুব সহজে নত হয়ে আসে জানু। পাছে শব্দ হয় এই ভয়ে চটিটা এক পাশে খুলে রেখে ভিতরে ঢুকি, খুব আস্তে—শব্দ থেকে নৈঃশব্দ্যে যাবার অদ্ভুত খেলা শুরু হয়ে যায় আমার মধ্যে। নয়নাংশুর ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখি বিছানায় পড়ে আছে বিকৃত শবদেহের মতো—বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ক্রমাগত নড়ে যাচ্ছে মাথা, চোখ বন্ধ, শরীরটা কেঁপে উঠছে থেকে থেকে এবং এসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাঝে মাঝে শব্দ উঠছে, আঃ—আঃ—। সঙ্গতির কথাটা মনে হয়েছিল, কারণ সে-শব্দ নয়নাংশুর ছিল না—হতে পারে মৃত্যুর। দূষিত আত্মারও হতে পারে। তখন অতোটা গুছিয়ে ভাবিনি। দেখি তার মুখনিঃসৃত জ্যোতিতে মলিন হয়ে উঠেছে ঘরের দেওয়াল ; এমনকি পায়ের কাছে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সুধা, সে-ও। এই পর্যন্ত দেখে, সুধা তখনো আমাকে লক্ষ করেনি অনুমান করে, চেষ্টা করি যতো দ্রুত সম্ভব চলে যেতে। তখনই বেরিয়ে আসে সুধা—আরো দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত গলায় বলে ওঠে, 'ও কি সত্যিই বাঁচবে না!' ছিটকে-আসা থুতু এসে লাগে আমার হাতে। আমি শুনি, 'এটা পাপ নয় তো!'

আমার স্মরণশক্তি তেমন প্রবল নয় এ-কথা কতোবার বলব! কিন্তু, ব্যাপারটা বোধ হয় এই, এসব ঘটনা ঠিক স্মৃতিতে থাকে না—থেকে যায় মস্তিষ্কের বিপরীতে, কোনো আশ্লিষ্ট বস্তুতে, আমি একা হলেই তারা ঘিরে ধরে চতুর্দিকে। তখন টান পড়ে শিরায়, নুয়ে পড়ে মেরুদণ্ড, রোগা শরীর থেকে উত্থিত বাষ্পে ভরে ওঠে চতুর্দিক। চশমাটা খুলে, আবার পরে,

রুমালে মুখ মুছে এবং রুমাল পকেটে ভরে, আমি চাই এসব আবির্ভাব থেকে দূরে যেতে—যেখানে হৃদয় নেই, স্মৃতি কিংবা মস্তিষ্ক নেই—যেখানে শুধুই খেলা করে যায় নির্বিকার সুখ। এসব সময়ে বুকের ভিতর ছটফট করে ওঠে বেঁচে থাকার আর্ত নিঃশ্বাস। বুঝতে পারি হয় আমি, নয় তো আমার পায়ের তলায় যে মাটি, সে, বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে ক্রমশ।

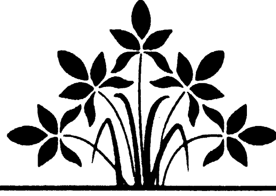
'কী, এতো চুপচাপ কেন ?' অনেকক্ষণ পরে অনাদি বোস বলল, 'চা খান। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' আচ্ছন্নতা থেকে উঠে এসে বললাম, 'কিছু নয়, এমনি।' শুনে হাসল অনাদি, চায়ে চুমুক দিল, নিজে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে আরেকটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আগুন জ্বলে ওঠার পর বলল, 'সংগ্রাম কথাটা কতোভাবে ব্যবহার হয় শুনছিলাম। আগে তো এসব ভাবিনি। আমি নিজেই তো কতোবার—যাক্ গে—', এইভাবে হঠাৎ চুপ করে গেল সে। আমি অনাদিকে দেখলাম, অদ্ভুত কঠোর তার মুখ, এই মুহূর্তে যতোটা সম্ভব সিগারেটের ধোঁয়া থেকে আস্থা টেনে নিচ্ছে বুকে।

তারপর, চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে, আমি ও অনাদি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি রাস্তায়। আজ তনুশ্রীর সঙ্গে দেখা হবে না, হয়তো কালও হবে না। হয়তো তার পরের দিন হবে। এইভাবে, ভাবতে ভাবতে, আরো তিনটি দিন খুব সহজে অতিক্রম করি আমি। বুঝি, এর মধ্যে অন্তত পাঁচ ছ'টা চুল পেকে যাবে আমার, কিন্তু ঠিক কোনগুলি বুঝতে পারব না। দেখা হলে তনুশ্রী কি বলবে মত্যুর দিকে আরো তিনটি দিন এগিয়ে গেছে নয়নাংশু ? যদি বলে, আমি কি বলব, 'সুধাকে আরো শক্ত হতে বলো। ভেঙে পড়ার কিছু নেই। কে জানে, ভালোও তো হয়ে যেতে পারে !' এইভাবে, বর্তমানে দাঁড়িয়ে, রিহার্সাল দেবার মতো করে ভবিষ্যতের কথা ও শব্দগুলিকে প্রাণপণে চিনে নিই আমি। দেখি, যা ঘটার, ঘটনার আগেই তা ঠিক ঠিক ঘটে যাচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের পাশ দিয়ে ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছে শব্দ—গাড়ির শব্দ, মানুষজনের নিরন্তর হাঁটাচলার শব্দ, ট্র্যাফিক পুলিসের হুইসিলের শব্দ—একগতি সমস্ত ছুটে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে প্রায় স্পষ্ট ভিয়েতনামের প্রতিরোধের শব্দ, সংগ্রাম সম্পর্কিত অঙ্গীকারের শব্দ, অনাদি বোসের নিঃশ্বাস, আমার নিঃশ্বাস, হয়তো বা তনুশ্রী, সুধা, অমলাদি, নয়নাংশু, মধু বিশ্বাসের নিঃশ্বাসের শব্দ। এসব ভাবনায় হঠাৎ হাসি পায় আমার, হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে—কী অসীম কল্পনার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছি আমি ! কিন্তু, এসব নিয়ে কি গল্প হয় কোনো ?

তো, একসময় চলে যায় অনাদি। 'বেল পাহাড়ে একটা চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছি', যেতে যেতে বলে, 'পেলে চলে যাব। আর ভালো লাগে না।' 'কেন', বলতে গিয়ে থেমে যাই আমি ; সেই মুহূর্তে অন্য একটা কথা এসে পড়ে মুখে, 'সেই মেয়েটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন—।' বলা হয় না। বস্তুত, কিছু বলার আগেই ভিড়ে মিশে যায় অনাদি, মনে পড়ে স্খলিত পায়ে তার হেঁটে যাওয়া আর 'আমি একাই যেতে পারব', সে-কথা কি বলেছি ? অনাদি চলে যায়।

আমার কিছু করার থাকে না। অনাদি যেদিকে যায়, ঠিক তার বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করি আমি। একা। আমার নাম প্রিয়নাথ মজুমদার, বয়স চল্লিশ। একটু কমও হতে পারে। আমি তনুশ্রীকে ভালোবাসি, তনুশ্রী আমাকে, এ-কথা বলতে বলতে পুরনো হয়ে গেল। কিন্তু, আমি কি পুরনো হয়েছি, কিংবা তনুশ্রী ? ঠিক বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে প্রকৃতই গুলিয়ে যায় সব কিছু, তখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসা কী ? তখন,

তনুশ্রীর গা থেকে বেরুনো ঘাম ও পাউডারের গন্ধে গুলিয়ে ওঠে নিঃশ্বাস ; কোনো রকমে নিজেকে সংবরণ করে জিজ্ঞেস করি, প্রিয়নাথ, এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ? কিংবা, অমলাদির সঙ্গে ? সুধার সঙ্গে ? নয়নাংশুর সঙ্গে ? ভয় হয়, বড়ো ভয় লাগে, এসব প্রশ্ন থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণে হাঁটতে শুরু করি আমি, দ্রুত ও অবিন্যস্তভাবে। ক্রমশ নির্জন হয়ে আসে রাস্তা। মধ্যরাতে ঘুম থেকে হতচকিত জেগে ওঠার পর যেমন হয়, হঠাৎ থেমে-পড়া থেকে আস্তে আস্তে পুনরাবির্ভূত হয় নিঃশ্বাস। দূর বেতারে সংযোগ স্থাপনের মতো একান্ত হাওয়ায় একটিমাত্র শব্দ ভেসে আসে আমার কানে, আস্তে আস্তে ঘুমের মতো ছড়িয়ে পড়ে রক্তের সর্বত্র। আছি, আছি।



বৃষ্টির পরে

বৃষ্টির পরে

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ (ফাল্গুন ১৩৮০)
প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৬·০০ । প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ

উৎসর্গ :
শ্রী সাগরময় ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ এক ॥

বর্ষার আগেই সে-বছর বৃষ্টি নামল তোড়ে। এমন প্রবল বর্ষণ সচরাচর কেউ দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। এক নাগাড়ে সাত দিন চলার পরও যখন থামবার লক্ষণ দেখা গেল না, মনে হলো শহরটা বুঝি ভেসে যাবে এবার। প্রবল থেকে প্রবলতর হতে হতে বৃষ্টির জের যদি বা একটু কমে, মানুষজনের নিঃশ্বাস প্রকৃতিস্থ হবার আগেই চেপে আসে আবার। আশ্বস্ত হবার সুযোগটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় না। নিঃশ্বাস ভিজে ওঠে, আর বেশ বোঝা যায়, শিরার ভিতর ক্রমশ নিশ্চুপ হয়ে আসছে রক্ত।

বৃষ্টির শুরুটা ঠিক ঠিক মনে করতে পারে অশোক। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। অফ-ডে। এফ-এ লিগের খেলা ছিল মাঠে। খেলার শেষ দিকে—প্রতাপের দেওয়া গোলে টাউন ক্লাব তখন জিতছে এক গোলে—চকিতে নিবে এলো আলো। গুরগুর করে উঠল আকাশ। অন্ধকার আর মেঘের অতর্কিত আবির্ভাবে হঠাৎ ঘন আর সতর্ক হয়ে উঠল চারিদিক। যেন বহু দূর থেকে অনিচ্ছুক একটা পাহাড় এগিয়ে আসছে ক্রমশ, তার সরোষ চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সরল ঘাসমাটি ; সেই শব্দ। সেই সঙ্গে আকস্মিক প্রতিবাদে উন্মুখর গাছপাতার আলোড়নের শব্দ। কিছু ভেবে ওঠার আগেই বিদ্যুতে ফালা-ফালা আর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল খেলোয়াড়দের মুখ। অশোক বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা হতে যাচ্ছে, কী, তা না জানলেও, সেই সম্ভাবনাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। খেলা ভুলে দর্শকরা তখন পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে শুরু করেছে। এমন ব্যাপ্ত, বিশাল আর পরিকল্পিত রূপ নিয়ে দুর্যোগের আবির্ভাব বড়ো একটা ঘটে না।

যতো দ্রুত সম্ভব সাইকেল চালাতে চালাতে অশোক ভেবেছিল বৃষ্টিটা ঠিকমতো নামবার আগেই পৌঁছে যাবে। শর্টকাটের জন্যে বাঁক নিয়েছিল বাদামতলার দিকে।এদিকটা খুব ফাঁকা। খোয়া-ওঠা, সরু, এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ; দু'পাশে ঘর-বাড়ি থাকলেও সেগুলো এতোই স্তব্ধ ও নির্জন যে মনেই হয় না এখানে কেউ আছে, এখানে কেউ কোনো দিন ছিল। এককালের বনেদিয়ানা থেকে শহর এখন ছড়িয়ে পড়েছে দূরে। এককাল—সে কতোকাল আগে কে বলবে! তেমনি কোলাহলও। এখন এই অঞ্চলটাকে চড়ায় আটকে-পড়া পরিত্যক্ত জাহাজের মতো লাগে। যতো দিন যাচ্ছে ততোই চুরি হয়ে যাচ্ছে তার গৌরব ; কপাটহীন জানলা-দরজা দিয়ে চলে দিনে সূর্য আর রাতে অন্ধকারের অবিরাম খেলা। নির্জনতায় ভেসে বেড়ায় বনতুলসীর বিষণ্ণ গন্ধ। খুব দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মতো স্তব্ধতা থেকে পরপর ও ক্রমাগত উঠে আসে এক রকম নীরব ধ্বনি—দুইয়ের মিশ্র সংস্রবে নিজের ভিতর ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠে এক মন-খারাপ-করা অনুভূতি।

রাস্তাটা শেষ হয়েছে নদীর দিকে। রাস্তা যতো এগোয় ততোই জোরালো হয়

অনুভূতিটা। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল অশোকের এই মিশ্র সংস্রবের একটা অর্থ যেন সে খুঁজে পাচ্ছে। বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে পাড় ভাঙার শব্দ। কিংবা, সত্যিই হয়তো এটা কোনো শব্দ নয় ; ভেবেছিল, অভিজ্ঞতা আছে বলেই ভাবনাগুলো এসে যাচ্ছে পরপর। সত্যি বলতে, এই রাস্তায় যেতে-আসতে কেমন একটা আশঙ্কায় ছমছম করে বুক। প্রায়ই ভাবে আর আসবে না এদিকে, এড়িয়ে যাবে। পারে না।

সেদিনও পারেনি। বৃষ্টির ভাবনা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল এই রাস্তায়। কিছু দূর যেতে না যেতেই নেমে এলো জোরে। সেই সঙ্গে ঝড়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাস্তায় চেষ্টা করলেও চোখ যায় না বেশি দূর। খোদলে পড়ে থেকে-থেকেই লাফিয়ে উঠছে সাইকেলটা। তখন বাধ্য হয়েই সে থেমে পড়ার কথা ভেবেছিল। ভেবেছিল শ্যামশ্রীর কথা ; গায়ত্রীদি, শিখা আর রাজবালার কথা। ডানহাতি পিছল মাঠ পেরিয়ে একশো গজ এগোলে মাথা বাঁচাবার মতো একটা আশ্রয় সে পাবে। আট বছর আগে এ-শহরে আসার পর একদিন এই বাড়িটাই ছিল তার আশ্রয়। এখন যদিও মনে হয় খুব দূরত্বময়। একটু বা রহস্যময়। হয়তো সব সম্পর্কের ভিতরেই আছে এই রহস্য—সেটা বুঝবার জন্যে চলে যেতে হয় দূরে। অন্তত সেইটুকু দূরত্বে, নিঃশ্বাস যেখানে ছুঁতে পারে না অবাধে।

সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে শ্যামশ্রীদের বাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে এই সব ভেবেছিল অশোক। তবু, সাইকেলের ঘণ্টি শুনে কেউ বেরিয়ে আসার আগে হঠাৎ মনে হয়েছিল, বৃষ্টি নয়, হয়তো এইখানে আসবার জন্যেই মনে মনে তৈরি হচ্ছিল সে। বৃষ্টি তার সুযোগ করে দিয়েছে। না হলে খেলার শেষে সে নিশ্চিত চলে যেত সাহেবের রেস্তোরাঁয়। সকালেই কথা হয়েছিল—হয়তো বিজন, সুশান্তরা এসে অপেক্ষা করবে। বিকেল হলেই এখন পুজোর থিয়েটারের রিহার্সাল চলে পুরোদমে। সেখানেও যেতে পারত।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসেছিল গায়ত্রী।

'আরে! ভিজে গেছ যে! দাঁড়াও, একটা তোয়ালে নিয়ে আসি।'

'কী দরকার!' আড়াল-করা গলায় বলেছিল অশোক, 'সামান্যই ভিজেছি।' তারপর গায়ত্রীর ফেলে যাওয়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, এদের তিনজনের গলার স্বরই এক রকম। তিনজনেরই চেহারা প্রায় একই রকম। বয়স কখনো কখনো সম্ভ্রমের দেওয়াল তুলে দাঁড়ায় ; না হলে একদিন না একদিন সে ইচ্ছে করেই ভুল করত।

বৃষ্টির শব্দের মধ্যে নিঃশব্দে সাইকেলটা নিয়ে ততোক্ষণে বারান্দায় উঠে পড়েছে অশোক। ফিরে এসে গায়ত্রী বলল, 'মঙ্গলের বৃষ্টি! দ্যাখো তিন দিনের আগে থামবে না।'

তিন দিন গেল। চার দিন গেল। প্রবাদের মুখ ছাই দিয়ে আরো চার-পাঁচ দিন এগিয়ে গেল বৃষ্টিটা। আজ সকাল থেকেই অবশ্য ধরবে ধরবে করছিল। ধরল দুপুরে এসে। বিকেলের শেষে রোদও উঠল। মেঘভাঙা টাটকা রোদ্দুরে টান ধরল ভিজে রাস্তায়। বহু দিন পরে মুমূর্ষু শহরটা আবার যেন জেগে উঠল। ইভনিং শো'র যাত্রী নিয়ে এই কিছুক্ষণ আগে অনেকগুলো রিক্সাকে সে পাল্লা দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছে। রাস্তায় বসে কাপ-ডিস ধুতে ধুতে সাহেবের দোকানের ছোকরাটা হঠাৎ সোৎসাহে বলে উঠেছিল, 'লুটে নে, লুটে নে। যে কদিন আছিস লুটে নে।' বৃষ্টির একঘেয়েমি ক'ঘণ্টার মধ্যে যেন ভুলে গেছে সকলে।

সন্ধে হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। অশোকের সামনে এখন জল আর জল ছাড়া কিছু নেই। জায়গাটা নদীর পাড়। একা এসে দাঁড়ালে পৃথিবীর নির্জনতম জায়গা বলে চেনা

যায়। জলের পর জলের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সহজেই এলোমেলো করে দেয় ভাবনাগুলো। গুছিয়ে ভাবতে পারে না কিছু। গত ক'দিনে সুযোগ পেলে আর বৃষ্টি একটু ধরলেই সে এসে দাঁড়াত এই নদীর ধারে। ঠিক কেন তা বুঝতে পারে না ; শুধু বুঝতে পারে নদীটা তাকে টানে। নির্জনতা তার খুব প্রিয় নয়, নিঃসঙ্গতায় বরং একটু ভয়ই লাগে। তবু আসে, দাঁড়িয়ে থাকে, দ্যাখে। দেখতে দেখতে একসময় ক্লান্ত হয়ে আসে চৈতন্য। দুধে সর পড়ার মতো, বুঝতে পারে, ঘোলাটে জলের তারতম্যহীন, একটু বা বিষণ্ণ গন্ধ ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে তার ওপর ; বর্তমান থেকে ক্রমশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে অতীতের দিকে—যে-অতীতের কোনো স্পষ্ট ছবি তার স্মৃতিতে নেই। একসময় জলের ছলছল আর পাড় ভাঙার অবিশ্রান্ত ঝুপঝুপ শব্দ ছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর কিছুই থাকে না। সামনে যতো দূর দেখা যায়, উদাসীন আকাশের তলায় ঘূর্ণি তুলে এগিয়ে যাচ্ছে তীব্র স্রোত। ডান দিকে আরো অনেকটা এগিয়ে নদীটা মিশে গেছে বড়ো গঙ্গায়। সেখানে সারা বছর স্টিমার পারাপার করে। প্রতিদিনই সে টের পায় পাড়ের অনেকটা খসিয়ে নিয়ে গেছে নদী। প্রতিদিনই মনে হয় একটু একটু করে নদী একদিন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নেবে শহরটাকে। যদি সে ততো দিন বেঁচে থাকে, একদিন চলে গিয়ে যদি সে আবার ফিরে আসে, হয়তো তার চেনাজানা মানুষগুলোর কাউকেই আর খুঁজে পাবে না ! বড়োই নিঃশব্দ এই ভাঙার ধরন ! ওপর-ওপর বোঝা যায় না কিছুই—তবু সে আছে, আসছে।

অশোক উঠে পড়ল। এই পরিবেশে বেশিক্ষণ একা থাকা নিরাপদ নয়। বাঁ দিকের উঁচু পাঁচিল-ঘেরা দুর্গের মতো বাড়িটা অনেকক্ষণ থেকেই সাবধান করছে তাকে। থমথমে বাড়িটা। কোনো কালে ওখানে এক জমিদারের আবাস ছিল। বেশ বড়ো পরিবার ছিল তাঁর। গঙ্গা পেরিয়ে একদিন রাতে ডাকাতরা চড়াও হয়—ছ'সাত জনকে খুন করে, সোনাদানা, টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে যায় লুঠ করে। এসব কতো দিন আগেকার কাহিনী ঠিক ঠিক জানা নেই তার। তবে নিশ্চিত অনেক দিনের, অন্তত যতো দিনে অনেক মিথ্যাও সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ পরিষ্কার ওটাকে ভূতুড়ে বাড়ি বলে চেনে—মাঝরাতে এক-একদিন বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে আসে নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার। শব্দটা অনেকক্ষণ জিইয়ে থাকে হাওয়ায়। শ্যামশ্রী বলেছিল, সেও শুনেছে একদিন। অমাবস্যার গভীর রাতে রণ-পায়ে ভর করে দৈত্যাকার ছায়াগুলি চকিতে হারিয়ে যায় নদীর ওপারে। এসব গল্পও অনেক শুনেছে অশোক। ভয় অবশ্য ভূত নিয়ে নয় ; তার ভয় মানুষকে। তার ওপর সাপখোপ আছে, আছে নানা রকমের বিষাক্ত পোকা। বৃষ্টিতে টান ধরায় গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

এলোমেলো ভাবটা কাটাতে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল অশোক। এমনও হতে পারে উত্তাপ থেকে খুঁজে নিল কিছুটা আত্মবিশ্বাস। যতো দূর মনে করতে পারে এটা সে চিরকাল খুঁজছে। তারপর মাটি থেকে সাইকেলটা তুলে নিয়ে রাস্তার দিকে এগোতে লাগল।

রাত খুব বেশি হয়নি। তবু মনে হচ্ছে অনেক রাত। সিগারেট ধরানোর সময়েই দেশলাইয়ের আলোয় ঘড়ি দেখেছিল অশোক, সাড়ে সাতটা। আর দেরি করা ঠিক হবে না। পরশু থেকে শুরু হয়েছে নাইট ডিউটি ; ন'টা সোওয়া ন'টার মধ্যেই অফিসে পৌঁছুনো দরকার। সম্ভবত কাজের চাপ বাড়বে আজ। বৃষ্টিতে ক'দিন লাইনের গণ্ডগোল চলছিল, বিকেলে শুনেছে আবার সব ঠিকঠাক চলছে। নতুন কাজের সঙ্গে পেণ্ডিং বুকিংগুলোরও ব্যবস্থা করতে হবে একে একে। দেরি করা যাবে না। অফিসে যাবার আগে শ্যামশ্রীদের

ওখানে ঘুরে যাবে একবার। বিকেলে সাহেবের রেস্তোরাঁয় চা খেতে খেতে রাজবালার চিরকুট পেয়েছিল ; 'সময় হলে একটু এসো'। লেখাটা শ্যামশ্রীর, দেখেই চিনতে পেরেছিল অশোক।

অনেক দিন পরে আজ আকাশে তারা ফুটেছিল। হাল্‌কা মেঘের ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মৃদু জ্যোৎস্না। আপাতত হয়তো আর বৃষ্টি হবে না। এ ক'দিন কে কেমন ছিল, কে কেমন আছে কিছুই জানে না। নিশ্চিত সকলেই ভালো আছে। আজ, এই মুহূর্তে, জাগ্রত নদীর সান্নিধ্য থেকে উঠে এসে অন্তত সেটাই ভাবতে ভালো লাগল অশোকের। ভাবল, কাল রোদ্দুর উঠলে সকলের খোঁজ নিতে বেরুবে।

কংক্রিটের রাস্তাটা এখান থেকে ইশানচক, মিশনারি রোড হয়ে টানা চলে গেছে স্টেশন আর বাজারের দিকে। নামেই কংক্রিট। ভাঙতে ভাঙতে এখন অনেক জায়গাতেই বেরিয়ে পড়েছে আদিমাটি। গড়ে ওঠার আগে রাস্তাটা হয়তো এ-রকমই ছিল। গাড়িটাড়ি বড়ো একটা ঢোকে না আজকাল। দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্প-পোস্টগুলোর প্রায় কোনোটাতেই আলো নেই। টিমটিমে আলোর মধ্যে দিয়ে আধ মাইলটাক হেঁটে গেলে দুর্গামণ্ডপ আর বারোয়ারি পুজোর মাঠ, সেইখানে আলোর শুরু। তাও খুব বেশি নয়। কোনো রকমে সদর হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে পারলে কিছুটা ঝলমলে ভাব চোখে পড়ে। একে একে চোখে পড়ে গির্জা, কোর্ট, ইনকামট্যাক্স অফিস আর সরকারী বাড়িগুলো। চাইলে কেউ এখানে এসে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

অশোক ওদিকে যাবে না। বাঁ দিকে মোড় নিয়ে তাকে যেতে হবে অস্পষ্ট আঁধারের ভিতর দিয়ে, নদীর স্রোত বরাবর। চেনা বলেই হাল্‌কা জ্যোৎস্নায় পথ করে এগোতে অসুবিধে হবে না কোনো। নিতান্ত আগন্তুক হলে দু' পাশের ঘন ঝোপঝাড়, মনসা আর বিছুটির জঙ্গল ভয় দেখাতো। ভাবতে অবাক লাগে, নদীর স্রোত বরাবর জঙ্গলময় এই অবাধ ভূখণ্ডে দাবি নেই কারো। জমাট স্তব্ধতার ভিতর থেকে এমনকি দিনেও উঠে আসে ঝিঁঝি আর তক্ষকের ডাক, অন্ধকার গন্ধে থমথম করে চারিদিক। এরই মধ্যে দিয়ে এগোলে ক্রমশ চওড়া হবে রাস্তা—আস্তে আস্তে চোখে পড়বে জবুথবু বাড়িগুলো, অশত্থতলা আর শিবমন্দির, আমবাগান আর শ্যামশ্রীদের বাড়ি। আজ রাতে জ্যোৎস্না পরিস্ফুট হলে ছাদের জাফরি-কাটা পাঁচিলের ছায়া পড়বে মাঠে। চিরকুট পাঠিয়েছিল, তবু কেউ কি অপেক্ষা করবে ?

এসব ভাবনায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অশোক। হঠাৎ মনে হলো সামনের রাস্তা থেকে কেউ যেন সরে গেল আমবাগানের আড়ালে। একটু দ্বিধা করল সে, ঠিক দেখেছে তো ? তারপর সতর্ক হয়ে এগোতে লাগল।

হ্যাঁ, ঠিক দেখেছে। উল্টো দিকে, জঙ্গলের গা ঘেঁসে, খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল লোকটা। তাকে পেরিয়ে যাবার সময় থেমে দাঁড়িয়ে অশোক ডাকল, 'শঙ্করলাল না ?'

'কৌন ?' থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল লোকটি। একটু থেমে দু'পা সামনে এগিয়ে এলো।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছো ?'

'এই তো, ইধরে—', ইতস্তত করে বলল শঙ্করলাল, 'ভূষণদাসের দোকানে খৈনি লিয়ে বাড়ি যাবো।'

আলো খুব অস্পষ্ট, চোখমুখ দেখা যায় না ভালো করে। তবু অনুমান করল অশোক, খুব ঘামছে লোকটি। তার সামনে একটু বা বিব্রত বোধ করছে। আর সময় নষ্ট না করে সে

চলে যেতে উদ্যত হলো।

'কল্যাণদারা কেমন আছেন ?'

'বাবু ? বাবু তো পাটনায় গেছে মিটিংয়ে।'

'তাই নাকি ? কবে ?'

'এই তো—পরশু গেল। আজই ঘুরে আসবে।'

'ঠিক আছে। আমি কাল আসব।'

'জী।'

অশোকের যাবার তাড়া ছিল ; দেখল, তারও আগে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে শঙ্করলাল। হাঁটার ধরন দেখে মনে হয় এই অন্ধকারটা সে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পেরিয়ে যেতে চায়। মনে হয় ভয় পেয়েছে ; ঘামছে সেই জন্যে। লোকটি যে ভীতু সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। কল্যাণদাদের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই লোকটিকে ওদের বাড়িতে দেখছে অশোক—কাজ করে, বাজার-হাট করে দেয়, টুসিকে আগলায়, এমনকি দরকার হলে সংসারে খবরদারি পর্যন্ত করে। খুব বিশ্বাসী লোক। মুঙ্গের থেকে কাজের সন্ধানে এসেছিল এখানে ; তিন কুলে কেউ আছে বলে জানা যায় না। বছরে একবার অবশ্য দেশে যায়, ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে আসে ঘি-টা, তরমুজটা—চাষ-আবাদ ভালো হলো না-হলো সে-খবর সকলকে ডেকে ডেকে শোনায়। এ-বাড়িতে থেকে থেকে বাংলাটাও শিখে নিয়েছে মোটামুটি। এমনিতে চুপচাপ, কথা বলে কম ; কিন্তু বেশ ভদ্র। এক একদিন সন্ধেয় অফিস থেকে ফেরার সময় চোখে পড়ে টুসিকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে শঙ্করলাল। ছ-সাত বছর বয়স হলো, টুসি এখন আর একেবারে ছোটটি নেই ; তবু শঙ্কলালের কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর শখ এখনো তার মেটেনি।

টুসির কথায় বাণীদিকে মনে পড়ল। কল্যাণদার স্ত্রী। খুব সাদাসিধে, একটু বা খেয়ালি স্বভাবের মানুষ—খুব হাসে আর কথা বলে, হাবেভাবে মনে হয় বাণীদির পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু নেই। একেবারে কল্যাণদার উল্টো। অশোক শুনেছে কলেজে পড়ানোর সময় নাকি ভীষণ গম্ভীর হয়ে থাকে বাণীদি। শুনে বিশ্বাস হয়নি। বাণীদির ঘরোয়া রূপটিকেই সে দেখেছে উল্টেপাল্টে অনেকবার—সন্ধের দিকে ওদের বাড়িতে গিয়ে। ইউনিভার্সিটি কাউন্সিলের মেম্বার হবার পর থেকে অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কল্যাণদা। বাড়িতে থাকলেও প্রায়ই লোকজন আসে। ছাত্ররা আসে। একা তাঁকে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। কল্যাণদার বাড়িতে যেতে হলে এখন বাণীদির কাছেই যেতে হয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় আসন পেতে দিয়ে সংসারের কাজ করতে করতে গল্প করে বাণীদি ; তার রাগ, দুঃখ, অভিমানের কথা বলে। বলতে বলতে হাসে। হাসতে হাসতেই পরতে চায় একটা গাম্ভীর্যের মুখোশ। 'হ্যাঁ রে, অশোক, তোর সঙ্গে নাকি বাদামতলার ওই মেয়েটার খুব ভাব ? ওই যে, শ্যামশ্রী না কী নাম—', বলেছিল একদিন, 'ওদের কাছে গিয়ে আমার কথাগুলো বলিস না তো ! দেখিস বাপু। মেয়েদের কাছে আমার খুব প্রেস্টিজ, ওটা গেলেই গেছি !' এবার দ্বিতীয়ায় ফোঁটা দিয়েছিল তাকে, দু বেলা খাইয়েছিল আদর করে। তাঁতের ধুতি দিয়েছিল। একটা নতুন স্বপ্নের মতো এই ব্যাপারটা চোখে জল এনেছিল অশোকের। সেদিন রাতে একা বিছানায় শুয়ে ক্রমশ আরো একা হয়ে পড়েছিল সে। বাণীদি এদিককার মেয়ে ; কখনো কলকাতা যায়নি। অনেক দিন থেকেই বলছে একবার মেয়েকে নিয়ে যাবে। অশোক বলেছে নিয়ে যাবে। এই গ্রীষ্মেই ছুটি নিয়ে মার কাছে যাবে ভেবেছিল।

যাওয়া হলো না।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস পাশ কাটিয়ে গেল বুকে। একা হলেই স্মৃতি পর্যুদস্ত করে তাকে, আটটি বছর বঙ বদলে বদলে ক্রমাগত আসে আর যায়। আট বছর আগে একদিন যখন হাওড়া স্টেশন থেকে লুপ লাইনের ট্রেনে চড়ে রওনা হয়েছিল এই অজ শহরের দিকে চাকরি করতে, তখন মনে হয়েছিল জীবন এরপর অর্থহীন হয়ে পড়বে। ভাগ্যকে দোষ দিয়েছিল সে। অব্যক্ত অভিমানে ইচ্ছে হয়েছিল আত্মহত্যা করতে। এখনও তার মন পড়ে রয়েছে কলকাতার দিকে। তবু, একান্তে যখন ভাবে, মনে হয় না খুব ব্যর্থ হয়ে গেছে জীবন। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, সত্যিই কি একা তুমি ? সত্যিই কি ক্লান্ত ?

অশোক ঠিক বুঝতে পারে না কী জবাব হতে পারে এ-সবের। এক রকম অন্ধকার গন্ধে ছেয়ে আসে অনুভূতি। শুধু বুঝতে পারে শহরটা টানছে তাকে, ক্রমাগত টানছে।

॥ দুই ॥

দরজা খুলে শ্যামশ্রী বলল, 'আসুন। এতো দেরি হলো যে !'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না অশোক। ঘরের ভিতরে লণ্ঠনের আলো, দরজা গলিয়ে তার ছিটেফোঁটা বারান্দায় এসে পড়লেও অস্পষ্টতা যায়নি। সামান্য জ্যোৎস্না আছে বলেই সে চিনে নিতে পারে শ্যামশ্রীকে ; আর ওই 'আপনি' দিয়ে। না হলে এদের তিন বোন মিশে থাকে একজন আর একজনের মধ্যে—হঠাৎ নতুন কেউ এসে পড়লে নিশ্চিত ভুল করবে। নিজের মনে এমন ভুল এর আগে অশোকও করেছে—যদিও ধরা পড়েনি। সে-সব অনেক পুরনো ব্যাপার। সুবিধে এইটুকু, গায়ত্রীদি 'তুমি' বলে, শিখা বলে 'তুই', আর শ্যামশ্রী 'আপনি'। যেন নিজেদের মধ্যেই সম্বোধন নিয়ে ওরা একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে।

এমনিতেই অবশ্য সে ভেবে নিয়েছিল প্রথম দেখা শ্যামশ্রীর সঙ্গেই হবে। চোখের জড়তা কেটে গিয়ে শ্যামশ্রীর আদল স্পষ্ট হতে বলল, 'কেন ! তুমি অপেক্ষা করছিলে বুঝি ?'

'আমি কেন অপেক্ষা করবো শুধু শুধু !' শ্যামশ্রী বলল, 'আপনি তো মার কাছে এসেছেন।'

অন্ধকারে হাসল অশোক। তার ও শ্যামশ্রীর মধ্যে ব্যবধান এখন সামান্য। একটা গন্ধ পাচ্ছিল, মৃদু ও জড়ানো, ঠিক কীরকম বোঝানো যায় না। নদী, ঘাস, মাটির সংস্পর্শ পেরিয়ে এসে এই প্রথম তার অন্য রকম লাগছে। শ্যামশ্রীর শরীরের গন্ধ সে চেনে—গত আট বছর ধরে একটু একটু করে চিনে আসছে ক্রমশ। এটা তাও নয়। একটু আলাদা। তখন পুরোপুরি চোখ তুলে শ্যামশ্রীর দিকে তাকাল।

'তাই না হয় এলাম।' অশোক অন্য কথায় চলে গেল, 'তোমার চুলে ওটা কী ? ফুল ?'

'গন্ধরাজ। পিছনের বাগানে অনেক ফুটেছে। একটা পরলাম। নিজে তো আর টানতে পারি না, ভাবলুম ফুলের গন্ধ যদি টানে !'

একটা নিঃশ্বাস চাপল অশোক।

'শ্যামশ্রী, তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।'

'আ-হা ! আর মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে না।'

সম্ভবত এই মেয়েটি তাকে ভালোবাসে। শ্যামশ্রীর পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অশোক ভাবল, সম্ভবত এ-বাড়ির সঙ্গে তার এখনো সম্পর্ক থাকার কারণ এই মেয়েটি। সেদিন, সেই প্রথম বৃষ্টি নামার দিনেও এই কথা মনে হয়েছিল তার ; আগেও মনে হয়েছে। বাণীদি একদিন বলেছিল, 'ও-বাড়িতে থাকতে থাকতে মেয়েটা একদিন বখে যাবে। ভালো লাগলে বিয়ে করে নে না !' অশোক কিছু বলতে পারেনি। এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল কথাটা। মনে পড়ল, ইচ্ছে করলেও সে এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। এখান থেকে সাহেবের রেস্তোরাঁয় যাবে, খাবে ; তারপর ডিউটিতে। এখনই আটটা। কানে কব্জি লগিয়ে টিকটিক শুনল। না বন্ধ হয়নি।

শ্যামশ্রী চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'মা বাথরুমে। আপনি এ-ঘরে আসুন না ! দিদি আছে।'

'চলো। আজ বেশিক্ষণ বসতে পারব না। ডিউটি আছে।'

'ওমা, তাই নাকি ! তা হলে সকালে এলেই পারতেন।' শ্যামশ্রী বলল, 'আজ অবশ্য আমি কলেজে গিয়েছিলাম।'

'এ ক'দিন কলেজ বন্ধ ছিল ?'

'বন্ধেরই মতো। কেউ যায়নি। কী বৃষ্টি বলুন তো ! আমাদের ছাদের একটা দিকের পাঁচিল ধসে গেছে—'

'কোথায় ?'

'ওই তো, নদীর দিকটায়।'

বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল অশোকের। খানিক আগেই সে প্রায় এই রকম ভেবেছিল। সামলে নিয়ে বলল, 'পুরনো দেওয়াল। ধকল সইতে পারেনি বোধ হয়। দাদাকে বোলো একটা ব্যবস্থা করতে।'

লণ্ঠনের আলোয় আবছা হয়ে আছে ঘরটা। ভিতরের ঘরে যাবার দরজার মাথায় ফ্রেমে বাঁধানো রঙিন সুতোয় তোলা 'গড ইজ গুড' লেখাটায় চোখ আটকে গেল অশোকের। এ-বাড়িতে যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিনও চোখে পড়েছিল। এখন অবশ্য ধুলো জমে, রঙ চটে অনেক বিবর্ণ দেখায় ; মাকড়শার ঝুল জমতে জমতে শেষের অক্ষরগুলো প্রায় আড়াল হয়ে গেছে। রাজবালার ছোট বয়সের কাজ। তখন হয়তো এর একটা মানে ছিল ; বোঝাই যায় খুব যত্নে সূচ বিঁধে অক্ষরগুলো ফুটিয়ে তুলেছিলেন রাজবালা। আজ হয়তো তাঁর নিজেরও ঘটনাটা মনে নেই।

এই বর্ষাতেই উল-কাঁটা নিয়ে কী একটা বুনছে গায়ত্রী। খাটের ওপর অশোকের বসার জায়গা করে দিয়ে বলল, 'মা ডেকে পাঠিয়েছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ। কী দরকার আছে নাকি !'

'দরকার আবার কী ! দ্যাখো, আবার কী কাঁদুনি গায় !'

'আবার কিছু হয়েছে বুঝি ?'

'নতুন করে আর কী হবে !' ক' লাইন তোলা ঘর টেনে টেনে খুলে ফেলল গায়ত্রী, 'সবই তো পুরনো ! তোমাকে আবার শুধু শুধু বিব্রত করা। আমার এতো খারাপ লাগে !'

কথাটা শেষ করে পশমের ডিজাইনটা সামনে তুলে ধরল গায়ত্রী।

'দ্যাখো তো, ডিজাইনটা কেমন ? ভালো না ?'

'চমৎকার !' অশোক বলল, 'কার জন্যে বুনছেন ?'

'সে বলা বারণ।' মাথা নিচু করে কথা বলছিল গায়ত্রী। হঠাৎ চোখ তুলে বলল, 'কেন ? তোমার একটা দরকার ?'

'না, না। এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।'

গায়ত্রী বলল, 'তোমাকেও এবার একটা বুনে দেব। আমি আগেই ভেবে রেখেছি। এখন তুমি অনেক দূরে চলে গেছ। না হলে, মনে আছে, প্রথম এসে এ-বাড়িতেই উঠেছিলে ? তখন তুমি অনেক ছেলেমানুষ ছিলে দেখতে, একটু মোটাও ছিলে।'

বোনাটা সরিয়ে রেখে বুকের আঁচল টানল গায়ত্রী।

'রোগা হয়ে যাচ্ছো কেন ? শরীর ভালো নেই ?'

'না, শরীর ভালোই আছে—'

গায়ত্রী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'শ্যামার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল ?'

অশোক বুঝতে পারল গায়ত্রী তার সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু ভাবছে অন্য কিছু। কথাগুলো পরস্পর সংলগ্ন হয়ে আসছে না। এ-ধরনের এলোমেলো কথাবার্তায় সহজেই উৎসাহ চলে যায়। সত্যি বলতে, অপেক্ষা ভালো লাগছিল না তার ; গায়ত্রীর সামনে বসে থাকতে অস্বস্তিও লাগছিল একটু। অসুবিধে হলেও অস্বস্তিটা প্রকাশ করা যাবে না ; ইচ্ছে না থাকলেও কথার উত্তরে বলে যেতে হবে কথা। শ্যামশ্রীকে খুঁজল সে। দেখতে পেল না।

'আপনাদের ছাদের রেলিং নাকি ভেঙে গেছে ?'

'কে বলল ? শ্যামা ?' সোজাসুজি তাকাল গায়ত্রী। একটু থেমে বলল, 'ভাঙবেই তো। এই সবে শুরু হলো। দেখবে আস্তে আস্তে আরো কী কী হয় !'

বাইরে রাজবালার গলা পাওয়া যেতে চুপ করে গেল গায়ত্রী। অশোক হাঁফ ছাড়ল। এতোক্ষণ ধরে অনেক কথাই বলেছে গায়ত্রী ; আপাত-সহজ কথাগুলোর ভিতরে কী আছে তার একটি বর্ণও বোধগম্য হয়নি। শুধু এটুকু বুঝতে পারছিল, কিছু একটা ঘটেছে, কিছু একটা বলতে চাইছে গায়ত্রী। সে-সব কথার সঙ্গে তার সম্পর্ক কাছের নয়। এমনও হতে পারে, সে আসবে গায়ত্রী সেটা জানত না। হঠাৎ আবির্ভাবে খুশি হতে পারেনি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন খাপছাড়া ! এ-বাড়িতে তার যাতায়াত নতুন নয় ; কিন্তু আজকের দিন, আজকের অবস্থাটা নতুন।

রাজবালা ঘরে ঢুকতেই গায়ত্রী উঠে গেল। যেতে যেতে বলল, 'একদিন তোমার মাপটা নিয়ে নেব।'

দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি কথা শেষ করার জন্যে অশোক বলল, 'আমাকে ডেকেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, বাবা।' গলার স্বরে নিঃশ্বাস মিশিয়ে রাজবালা বললেন, 'আমার বড়োই বিপদ। কী করব বুঝতে পারছি না।'

এটুকু বলেই হাঁফাতে লাগলেন রাজবালা। হাত তুলে ইশারায় থামতে বললেন অশোককে, যাতে সে একটু সময় দেয়। বুড়ো শরীরে এখন আর তাঁকে চেনা যায় না। রুগ্ণ, ভাঙাচোরা, লালিত্যহীন। হাঁফানোর ধরনটা অবশ্য নতুন।

অসুবিধে হলো রাজবালা নিজে যতোক্ষণ কিছু না বলবেন, ততোক্ষণ তাকেও চুপ করে থাকতে হবে। অথচ চুপচাপ থাকার মতো অস্বস্তিকর ব্যাপার অন্তত এই বাড়িতে এই মুহূর্তে

আর কী হতে পারে ! তখন চতুর্দিক থেকে ঘিরে আসে স্মৃতি, মশার মতো নীরবে শুষে নেয় এই মুহূর্তের ভাবনাগুলো।

তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, একটু মোটাও হয়তো ছিল। সব কিছু হুবহু মনে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া, শরীরের অভিমান কখনো ভোগায়নি তাকে, অভিমানের সবটুকুই ছিল মন নিয়ে। বিষণ্ণ মনে ট্রেন থেকে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মে। পকেটে একটা খাম। খামের ওপর পরিষ্কার হরফে নামটা লিখে দিয়েছিল কাকা ; শ্রী হরবিলাস ভাদুড়ী। যাত্রীদের ওঠানামার তাড়া কমতে যখন একটু ফাঁকা হলো চারিদিক, ঠিক তখনই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ভদ্রলোককে এগিয়ে আসতে দেখেছিল। লম্বা, টান-টান চেহারা, মাথা ভর্তি কাঁচা পাকা চুল। কাছে এসে বললেন, 'তুমি কি কলকাতা থেকে এলে ? শ্রীশের ভাইপো ? আমি হরবিলাস ভাদুড়ী।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খামটা এগিয়ে দিয়েছিল অশোক।

'কাকা এই চিঠিটা দিয়েছেন—'

'চিঠি পরে হবে। আমি তো সব জানিই—। এই যে, আমার ছোট মেয়ে, শ্যামা।'

অস্বস্তি থেকে এতোক্ষণে ফ্রক-পরা ছিপছিপে চেহারার মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল অশোক। তখন জানত না একদিন সে শ্যামশ্রী হবে ; এতো রাতেও বাড়ি জুড়ে কোথাও খুঁজে পাবে না শিখাকে ; কিংবা গায়ত্রীদি তার পুরনো চেহারার বিবরণ দেবে। তখন সে দূরে ছিল। সম্ভবত গায়ত্রীদির কথাই ঠিক ; এখন চলে গেছে আরো অনেক দূরে।

চোখের ওপর দিয়ে পরপর দুটো সাইকেল রিক্সা দ্রুত ছুটে গেল। তার পাশে বসে আছে ফ্রক-পরা একটি মেয়ে—হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া ফ্রকের ঝুল সামলাতে সামলাতে কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল। এতো কথা সেই প্রথম দিনেই বলতে পেরেছিল শ্যামশ্রী।

'বিষাণের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল এর মধ্যে ?'

হঠাৎ বলেই অপরিচিত শোনাল রাজবালার গলা। অশোক ঘাড় নাড়ল। পরে বলল, 'না।'

'তিন দিন হলো বিষাণ বাড়ি আসছে না। শুনছি কালীটোলায় নতুন বাড়ি নিয়ে থাকছে—'

'কেন ?'

'সে আর কী করে জানব, বাবা ! পোড়াকপাল আমার, সকলকে নিয়ে ঘর করার সুখ কি দিয়েছে !' রাজবালা যেন এতোক্ষণে ঠিক কথাটি খুঁজে পেয়েছেন। উত্তর না চেয়েই বললেন, 'এক মেয়ে তো বেজাতে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপে উঠেছে। কী জ্বালা যে শুরু হলো আমার। ছেলেটাকে ঘর-ছাড়া করল। আমি যে কোথায় যাই ! এরপর কি অন্য মেয়েদের বিয়ে হবে। জাত গেলে কে বিয়ে করবে !'

ক্রমশ চড়ছিল রাজবালার গলা। একটু চুপ করে থানের খুঁটে চোখ মুছলেন।

'তুমি একটা কিছু করতে পারো না, অশোক ?'

কথাগুলো এবং প্রশ্নটা এতোই আকস্মিক যে বিমূঢ় করে দেয়। তাকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্যটা এখন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে সে কী করতে পারে ! সে এ-বাড়ির কেউ নয়। আট বছর আগে মাত্র সাত দিন একসঙ্গে থাকার সূত্রে এতো বড়ো দায়িত্ব সে নিতে পারে না।

বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় নিল অশোক।

'আপনি শিখাকে বোঝাচ্ছেন না কেন ?'

'কে শুনছে বাবা আমার কথা ! মেয়ে তো নয়, এক একটা গলার কাঁটা—হাড়মাস জ্বালাবে বলে পেটে ধরেছিলাম—'

রাজবালা হয়তো আরো কিছু বলতেন। তার আগেই গায়ত্রী এসে দরজা জুড়ে দাঁড়াল।

'তুমি ভেবেছো কী বলো তো ! বাড়িতে লোক ডেকে এনে আমাদের গালমন্দ করছ কেন !'

'তুই—তুই আবার এখানে কেন !' চেয়ার ছেড়ে গায়ত্রীর দিকে এগিয়ে গেলেন রাজবালা, 'দু' দণ্ড কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে দেবে না আমাকে !'

'না, দেবে না। তোমার খাই-পরি না তো—'

'কী বললি ! আবার বল, বল দেখি আবার— ।' ঘরের মাঝখানে দু' হাতের মুঠো শক্ত করে কাঁপতে লাগলেন রাজবালা। 'ছেলেটাকে ঘরছাড়া করেও শান্তি হয়নি, আবার কথা বলতে এসেছিস !'

'রাখো, রাখো !' গায়ত্রী চেঁচিয়ে বলল, 'অমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। কী করেছে সে আমাদের জন্যে ? বাপের টাকাগুলো মদ খেয়ে, জুয়ো খেলে উড়িয়ে এখন আমাদের শাসন করবে !'

'করবে, করবে। তোর নিজের চরিত্র কী, আমি জানি না ! ওই আই-এ পাশ বিদ্যে নিয়ে কোত্থেকে পাস তুই এতো টাকা ? বল, চুপ করে আছিস কেন ? বল না—'

গায়ত্রী সত্যিই চুপ করে গিয়েছিল। বিভ্রান্ত অশোক দেখল ক্ষিপ্ত রাজবালার মুখের ওপর নিবদ্ধ গায়ত্রীর চোখ দুটোর নিচে ঠোঁটসুদ্ধ গাল দুটো অবর্ণনীয়ভাবে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। এটা আর এক যুদ্ধের প্রস্তুতি কি না বুঝতে পারল না। রাজবালা তখনো মুঠো খোলেননি। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী-সব বলে যাচ্ছেন, যার একটিরও অর্থ উদ্ধার করা যায় না।

স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়ছিল অশোকের। যুদ্ধের শুরুতেই সে ভেবেছিল মধ্যস্থতা করবে ; সেই ভেবে উঠেও দাঁড়িয়েছিল। সঠিক মুহূর্তটি খুঁজে পায়নি। এখন হঠাৎ গায়ত্রীকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। চেনা রাস্তায় সদরের দিকে পা বাড়াল। বলতে কি চাপা উত্তেজনায় তার নিজের শরীরও কাঁপছিল। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক নয়, ভাবল, যেমন করেই হোক এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার।

সদরে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে শ্যামশ্রী। ভ্রূক্ষেপ না করে চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ পুরনো একটা ভাবনা এসে দুলিয়ে দিল তাকে ! ভিতর থেকে তখনো গায়ত্রীর কান্নার শব্দ আসছে। আর সব নীরব বলেই শব্দটা সময়হীন ধ্বনির মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাজতে লাগল কানে।

কী ভেবে একটা হাত তুলে শ্যামশ্রীর কাঁধের দিকে বাড়িয়ে দিল অশোক। এই প্রথম।

'আমি চলি—'

শ্যামশ্রী তাকাল না। সরে গিয়ে বলল, 'চা করেছিলাম। দেখুন, বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে !'

'কোথায় ?'

শ্যামশ্রী নড়ল না। ওর একান্ত দৃষ্টি লক্ষ করে নিজেই টেবিল থেকে কাপটা তুলে নিয়ে

চুমুক দিল অশোক। সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আড়াল-করা লণ্ঠনের আলোয় দীর্ঘ ছায়া পড়েছে শ্যামশ্রীর। ছায়া তার মুখেও। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। ভঙ্গি দেখে মনে হয় না অশোকের সম্পর্কে তার আর কোনো আগ্রহ আছে।

দু'তিন চুমুকে চা-টা শেষ করে, কিছু না বলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো অশোক। সাইকেলটা টেনে নিল হাতে। নিঃশব্দে মাঠে নেমে পিছনে তাকিয়ে দেখল শ্যামশ্রী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'চলি তা হলে—'

'একটু দাঁড়ান।' অনেকক্ষণ পরে খোলা গলায় কথা বলল শ্যামশ্রী। বলতে বলতে নেমে এলো। 'আপনার রুমালটা সেদিন ফেলে গিয়েছিলেন। কেচে দিয়েছি।'

এক হাতে সাইকেল, অন্য হাতে রুমালটা নিয়ে নাকের ওপর চেপে ধরল অশোক। তারপর পকেটে ভরে সোজাসুজি তাকাল শ্যামশ্রীর দিকে।

'ফেরত তো দিলে! কিন্তু এটা কি আর ব্যবহার করা যাবে!'

নিজের ধরনে 'আ-হা' বলল না শ্যামশ্রী। অশোক ততোক্ষণে প্যাডেলে পা রেখেছে।

'আর বোধ হয় আসবেন না!'

'আসব। যদি মনে পড়ে আবার কিছু ফেলে গেছি—'

মাঠ পেরিয়ে বাদামতলার রাস্তায় বাঁক নেবার আগে আর একবার ফিরে তাকাল অশোক ; খোলা মাঠের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে শ্যামশ্রী। পরিষ্কার আকাশ। জ্যোৎস্নার আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে পুরনো বাড়িটা, তার সামনে শ্যামশ্রী—ওকে পরীর মতো দেখাচ্ছিল। কথাটা হঠাৎ মুখে এসে গিয়েছিল বলেই বলা। তবু, অশোক ভাবল, মেয়েটা হয়তো অনেকক্ষণ ধরে ভাববে।

যেতে যেতে ঠিক তার বিপরীত দিকে পরপর দুটো রিক্সাকে ছুটে যেতে দেখল অশোক। প্রায় এমনি সময়ে, কিংবা কিছু আগে, সিঁড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমেছিল সে। হরবিলাস ভাদুড়ীর বাড়িতে তখন ইলেকট্রিক আলো জ্বলত। ঠিক মনে পড়ে না, তবে বাদামতলা দিয়ে বোধ হয় লোকজন হাঁটত। হৈ-চৈ করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল সকলে। নতুন লোকজনের ভিড়ে আর আপ্যায়নের বহর দেখে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি অশোক। রাত্রে খেয়ে-দেয়ে তাকে নিয়ে লুডো খেলতে বসেছিল তিন বোন। শিখা সেদিনই তাকে 'তুই' বলে। 'কলকাতার ছেলে, তুই এতো লাজুক কেন রে!' বলতে বলতে কিল বসিয়েছিল পিঠে। তাকে আনতেই শেষবার স্টেশনে গিয়েছিলেন হরবিলাসকাকা।

স্মৃতি বলতে এই সব। সাইকেল চালাতে চালাতে অশোক যতো দূর যায়, তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে গায়ত্রীদি, শিখা, শ্যামশ্রী। তিন বোন দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজ হয়ে, মাঝখানে অশোক, অবস্থানের দৈর্ঘ্যে তিনজনের মিল নেই কোনো। এটুকু জানে, শৃঙ্খলা ভেঙে প্রথম যদি কেউ বেরিয়ে আসে, সে শিখা। হয়তো রাজবালাও তা জানেন। আর, জানেন বলেই অশোকের উপস্থিতি ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গায়ত্রীর ওপর। তখন মনে হয়নি ওরা মা আর মেয়ে। গায়ত্রীদি কেঁদেছিল। শিখা কি কাঁদত ? শিখাকে কি ফেরানো যাবে ?

সম্ভবত যাবে না। ব্যাপারটা সে মোটামুটি জেনে নিয়েছিল এ-বছর দোলের দিন। সন্ধেয় গিয়েছিল শ্যামশ্রীদের বাড়ি। রাজবালা গেছেন কীর্তন শুনতে। গায়ত্রীদিও নেই।

শ্যামশ্রীর জ্বর। বারান্দায় চেয়ার পেতে পাশাপাশি বসেছিল শিখা আর সেই ছেলেটি। ছেলে বলা ঠিক হবে না, বড়োসড়ো চেহারার একজন পুরুষ—মুখ ভর্তি শুকনো ব্রণর দাগ নিয়ে সোজাসুজি তাকিয়েছিল তার দিকে। অশোকের বিব্রত দৃষ্টি লক্ষ করে শিখা বলল, 'এ আখতার। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস কে ?'

শিখা লুকোতে জানে না। অনেকবারই লক্ষ করেছে অশোক, তার সব শুরু আক্রমণ দিয়ে। অন্য সময় হলে এড়িয়ে যেত ; কিন্তু সেই মুহূর্তে অপরিচিত লোকটির সামনে শিখার এই বাঁকিয়ে বলার ধরনটি ভালো লাগেনি। এমনও হতে পারে, এমন পরিবেশে লোকটিকে সে আশা করেনি। এখন আর ঠিক মনে নেই ; তবে কিছু একটা ঘটেছিল। একটু বা নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, 'কী করে বুঝব ! আগে কখনো দেখিনি তো !'

'সে কী !' শিখা বলল, 'চোখে না দেখলেও কানে নিশ্চয়ই শুনেছিস। গোটা শহরের লোক জানে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।'

বেশ ঝাঁঝ ছিল শিখার গলায়। অশোক কিছু বলার আগেই লোকটি ওর হাত ধরে টেনে নিল কাছে।

'খামোশ রহো না। তুম্ বহুত্ বোলতি হ্যায় !'

'লে হালুয়া !' আখতারের প্রায় কোলের ওপর পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল শিখা, 'ম্যয় কব কুছ্ বোলা !'

কবে সে এসব শিখল ! কবে সে এতোটা নির্লজ্জ হয়ে উঠল ! অশোকের ধারণায় গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল সব কিছু।

শিখা বলল, 'ভাঙের প্যাঁড়া আছে, অশোক। আখতার এনেছে। খাবি নাকি একটা ?'

স্মৃতি মানেই এই সব। অতীত জড়িয়ে যাচ্ছে বর্তমানে। অন্ধকার, নির্জন বাদামতলার রাস্তাটা ক্রমশ ভরে উঠছে খোদলে। আজকের ঝগড়াটার কথা সে আরেক দিন ভাববে, ক্লান্ত পা দুটো প্যাডেলে ছুঁইয়ে রেখে অশোক ভাবল. হয়তো কাল কিংবা পরশু—হরবিলাস ভাদুড়ীর পরিবার ততো দিনে নতুন অধ্যায়ে চলে যাবে।

সাহেবের রেস্তোরাঁয় পৌঁছুতে পৌঁছুতে ন'টা বাজল। বাইরের বেঞ্চিতে সাইকেলটা হেলিয়ে রেখে ব্যস্তভাবে ভিতরে ঢুকল অশোক।

'রান্না হয়ে গেছে ?'

'এতো তাড়া আজ !' কাগজ পাকিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে সাহেব বলল, 'ডিউটি নাকি ?'

'আর বলেন কেন ! এখুনি ছুটতে হবে—'

'তা যাও না। আমার সব রেডি !'

বেসিনে ঝুঁকে চোখেমুখে জল দিল অশোক, খানিকটা মাথায়। বৃষ্টিতে ক'দিন ঠাণ্ডা হয়েছিল বেশ, আজ সন্ধে থেকেই আবার গরম পড়েছে একটু। মাথাটা ভারী ভারী লাগছিল। হাতে সময় থাকলে স্নান করে বেরুত। এখন আর সময় নেই।

রুমালে মুখ মুছতে মুছতে চোখে পড়ল ডান দিকের টেবিলের কোণে প্রতাপ বসে আছে। এতোক্ষণ খবরের কাগজের আড়ালে ছিল বলেই খেয়াল করেনি। অদ্ভুত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখ ছেলেটির। হাসলে হাসি ছাড়া আর কোনো উপসর্গ থাকে না। অশোক ওর মুখোমুখি বসল।

'আজকের কাগজ ?'

'হ্যাঁ। সাত দিন পরে এলো।'

কাগজটা টেনে নিল অশোক। প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইনগুলোয় চোখ বোলাতে লাগল। তারপর, কী ভেবে, চলে এলো খেলার পৃষ্ঠায়।

'তোমার টিম তো জোর খেলছে হে। ক'টা গোল দিয়েছে দেখেছো ?'

প্রতাপ হেসে বলল, 'এবার কম্বিনেসান খুব ভালো। লিগ পাবে, কী বলুন ?'

'পাওয়া তো উচিত—'

খাবার এসে গিয়েছিল। তৎপর হাতে রুটি ছিঁড়ে মুখে ভরতে ভরতে অশোক বলল, 'সেদিন তোমার খেলা দেখলাম। তুমিও তো দারুণ খেলছ ! যা একখানা গোল দিলে !'

প্রতাপ হাসল। নিঃশব্দে। বয়সে তরুণ, সতেরো কি আঠারো হবে, এখনো গোঁফের রেখা ওঠেনি ভালো করে। ক'মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'দারুণ আর কী ! কতোগুলো থ্রু দিলাম সেদিন, কারুরই অ্যান্টিসিপেসান নেই—'

অশোক কিছু বলল না। কাছেই ঘোড়ার আস্তবল, সেখান থেকে প্রায় চাপা একটা রাসায়নিক গন্ধ উঠে আসছে। নিঃশ্বাস গুলিয়ে ওঠে। মুখের খাবারটা কোনো রকমে গিলে নিল অশোক। এই মুহূর্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে কেউ। আগে তেমন বোঝা যায়নি ; 'রাম নাম সত্ হ্যায়' ধ্বনিটা কাছে আসতে বাইরে তাকাল সে। মড়া কাঁধে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে শবযাত্রীরা। এখনো অনেক দূর যেতে হবে—সেই বড়ো গঙ্গায়। সেখানে এখনো রোজ ভোঁ দিয়ে স্টিমার ছাড়ে। উত্তর থেকে যাত্রীরা এসে মিটার গেজের ট্রেনে চড়ে। সেই ট্রেন তাদের নিয়ে আসবে শহরে। অকারণ বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল হঠাৎ।

'কী প্রতাপ, বাড়ি ফিরবে নাকি ?'

'চলুন যাই।' দু'দিকে হাত ছড়িয়ে, একবার সামনে ও একবার পিছনে বেঁকে আড়মোড়া ভাঙল প্রতাপ। 'প্রায় এক হপ্তা পরে আজ বেরুলাম। লাইফটা যেন কেমন ডাল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।'

'এই বয়সেই—'

প্রতাপ বেরিয়ে গেছে, সাইকেল বের করছে স্ট্যাণ্ড থেকে। মাটির খুরি থেকে কয়েক দানা মৌরি তুলে নিয়ে সাহেবের মুখের সামনে ঝুঁকে এলো অশোক।

'বিষাণের খবর রাখেন ?'

সিকি, আধুলি গুনে গুনে ক্যাশ মেলাচ্ছিল সাহেব। থতমত খেয়ে বলল, 'কেন, কী হয়েছে !'

'হয়নি কিছু। দেখা হয় কি না জিজ্ঞেস করছিলাম।'

সাহেব মাথা নেড়ে বলল, 'দেখা করবে ? আমার সঙ্গে ? তিরিশ টাকা ধার পড়ে আছে, এক মাস আর টিকিটি দেখায় না ! হুঁ, ও মালকে আমি চিনি না ! ভাবছি ছোকরাটাকে একবার পাঠাব গ্যারাজে—।'

'তা হলে বলবেন, আমি খুঁজছি।'

ক'মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কাউন্টারের ওপরেই ওর হাতটা চেপে ধরল সাহেব। 'টাকাটা আদায় করে দাও না, ভাই। দু'বেলাই তো যাচ্ছো ওদের বাড়ি !'

'দু' বেলা !' অনিচ্ছেয় হাসল অশোক। তারপর বলল, 'খবরটা দেবেন ওকে।'

শবযাত্রীরা এতোক্ষণে চলে গেছে অনেক দূর। যেতে যেতে খই আর পয়সা ছড়িয়েছিল ; পয়সার সন্ধানে দুটো হাভাতে লোক এখনো ঘুরঘুর করছে রাস্তায়।

আধ-শুকনো পিচের চকচকে ভাবটা কাটেনি। কাল হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোদল আর ভিজে মাটি। তার আগেই আজ রাতে আকাশ অবাধ হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্নায়। শ্যামশ্রী কি এখনো দাঁড়িয়ে আছে!

পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দু'জনে। প্রতাপ কথা বলছে; একটু অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে হাঁ-হুঁ করে জবাব দিচ্ছিল অশোক। স্তব্ধ গির্জাটা পেরিয়ে মিশনারি রোডের মুখে এসে দু'জনেই গতি কমিয়ে আনল। এখান থেকে আলাদা রাস্তায় যেতে হবে দু'জনকে। প্রতাপ বলল, 'আপনার কী মনে হয়, অশোকদা, কলকাতার কোনো ফার্স্ট ডিভিসান টিম নেবে না আমাকে? তা হলে একবার চেষ্টা করতাম।'

একটা পা রাস্তায় নামিয়ে অশোক ওর পিঠ চপড়ে দিল।

'তুমি অতো ভাবছ কেন! তুমি খুব বড়ো খেলোয়াড় হবে! যাও এবার, রাত হয়েছে—'

প্রতাপ এগিয়ে গেল। সেইভাবে দাঁড়িয়ে অশোক দেখল হাওয়া কেটে আস্তে থেকে ক্রমশ তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতাপ। একদিন সে বড়ো খেলোয়াড় হবে। হোক, ভাবল অশোক, তাই যেন হয়।

॥ তিন ॥

রাত্রের দিকে রোজই একটু ব্যায়াম করে প্রতাপ। শোওয়ার আগে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ। পি-টির ধরনে গোটা তিনচার ফ্রি-হ্যাণ্ড, কয়েকটা আসন, কোমর মুড়ে বার তিরিশেক বুড়ো আঙুল ছোঁয়া। এতে বেশ ফিট থাকে শরীরটা, টানা ঘুম হয় রাতে—ভোরে উঠে আলস্য লাগে না এতোটুকু। খুব ভোরবেলায় উঠে চোখমুখ ধুয়ে এক মুঠো অঙ্কুর গজানো ছোলা চিবিয়ে বেরিয়ে পড়ে সাইকেল নিয়ে। গায়ে গেঞ্জি, খাটো প্যাণ্ট, পায়ে কেড্‌স্। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বুটজোড়া আর বলটা। এফ-এ মাঠের ঘুম ভাঙে না তখনো—দু' দিকের নিরীহ দু'টি গোলপোস্ট দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তাদের সাক্ষী রেখে শুরু হয় তার বল পায়ে দৌড়। আর মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে কখনো ডান পায়ে কখনো বাঁ পায়ে বলটা ছুঁড়ে দেয় গোলপোস্ট লক্ষ্য করে। এভাবে ক্রমশ রপ্ত হয়ে ওঠে সে, আত্মবিশ্বাসে বুকটা ফুলে ওঠে অর্জুনের মতো—স্বপ্নটা ভুল নয়, ভাবে, একদিন সত্যিই সে বড়ো খেলোয়াড় হবে। এইভাবে দিনেরাতে চলে তার নৈপুণ্যের পরীক্ষা। এ-বছর না হোক আগামী বছর, আস্তে আস্তে, একটু একটু করে এগিয়ে যায় কলকাতার দিকে। শুনতে পায় হাজার হাজার দর্শকের চিৎকার—মধ্যমাঠ থেকে বল ধরে সে ছুটে যায় গোলের দিকে। এক একদিন স্বপ্নের মধ্যে জার্সি বদল হয় তার; দেখে ছবি বেরিয়েছে কাগজে—দুরন্ত হাফভলির ভঙ্গি, বল ঢুকে যাচ্ছে বার আর পোস্টের কোণ ঘেঁসে! ক্যাপসানটাও সাজিয়ে নেয় মনে মনে।

রাতের ব্যায়াম সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল প্রতাপ। মেদহীন চমৎকার স্বাস্থ্য; এই শরীর আর অফুরন্ত দম নিয়ে দু' আড়াই ঘণ্টা এক নাগাড়ে ছুটোছুটি করতে পারবে। অনায়াসে। আজ বৃষ্টি থেমে গেছে; ওয়েদার ভালো থাকলে কাল থেকে আবার শুরু হবে লিগের খেলা। এ পর্যন্ত আঠারোটা গোল দিয়েছে সে—সেক্রেটারি

বিমানদার বড়ো আশা তিন বছর পরে এবার লিগ জিতবে টাউন ক্লাব। সামনে ইস্টবেঙ্গলের খেলা আছে বিহার ইলেভেনের সঙ্গে। পাটনা, জামসেদপুর যেখান থেকেই প্লেয়ার আসুক, সে বাদ যাবে না। সেদিন সে খুব ভালো খেলবে। এইভাবে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলে তিন বছর আগে কলকাতার ট্রেনে চড়েছিল নুরুল—ইয়ং লায়ন্‌সের লেফট্‌ ব্যাক। সে স্ট্রাইকার, তার পায়ে আছে মর্ডান ফুটবল। সে কেন পারবে না।

আস্তে আস্তে আয়নার সামনে থেকে সরে এলো প্রতাপ। তোয়ালেয় ঘাম মুছে শার্ট আর পাজামা পরে নিল। নিবিয়ে দিল আলোটা। তারপর খোলা ছাদে এসে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় প্রায় সাদা হয়ে আছে অশত্থ গাছের পাতাগুলো। দূরে গির্জার মাঠে শেয়াল ডাকছে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো। ক্লান্ত লাগছে শরীর, আলস্যের মতো একটা সুখ সুড়সুড়ি দিচ্ছে ঘাড়ের পিছনে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে যাবে।

শুতে সাধারণত এতো রাত হয় না প্রতাপের। সন্ধের পর খেয়ে-দেয়ে একটু বেরিয়েছিল সাহেবদার রেস্টুরেন্টের দিকে ; খবরের কাগজ এসেছে কি না দেখতে। গত কয়েক দিন একে বৃষ্টি তার ওপর কাগজ না পেয়ে কেমন যেন হাঁফ ধরে গিয়েছিল বুকে। ওয়েদারের জন্যে রেডিওটাও বাজত না ঠিক মতো। আজ কাগজটা পেয়ে স্বস্তি হলো একটু। তারপর অশোকদার সঙ্গে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল।

খোলা ছাদে পায়চারি করতে করতে প্রতাপ টের পাচ্ছিল ঘুম আসছে। এরই মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অশোকদার কথাগুলো বেজে যাচ্ছিল কানে। হঠাৎ সিঁড়ির মুখ থেকে রমার গলা পেল।

'প্রতাপ, শিগগির একবার নিচে আয় তো !'

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে একবার চিলেকোঠার ঘরে উঠে এলে নিচের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। রমার গলা পেয়ে তাই একটু অবাক হলো প্রতাপ। চটিটা পায়ে গলিয়ে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে তাড়াতাড়ি নেমে এলো নিচে।

'কী হয়েছে, মা !'

'বুঝতে পারছি না। বোধ হয় কল্যাণবাবুদের বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে।'

'কী হবে ? বাণী বউদির সঙ্গে তো সন্ধেবেলায় দেখা হয়েছিল বললে !'

'হ্যাঁ, সেই তো ! মিশিরজীর বাড়ির সামনে দেখা হয়েছিল। এখন দেখলাম মিশিরজীকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যাচ্ছে ওদের সেই লোকটা—কী যেন নাম— ?'

'শঙ্করলাল ?'

'সদরের জানলা লাগাতে গিয়ে দেখলাম। কিছু একটা হয়েছে। মিশিরজীর বউ, বড়ো ছেলে, ওরাও দেখলাম ছুটে গেল তারপর। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে বাপু—'

চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল প্রতাপের। কী হতে পারে, অনুমান করার চেষ্টা করল। হিসেবে এলো না। তবু একবার দেখা দরকার।

'তোর বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন।' ছুটে গিয়ে ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে এলেন রমা, 'যদি কিছু হয় একবার জানাস। টর্চটা নে, সাবধানে যাস—'

বাইরে বেরিয়েই চারিদিক ফাঁকা লাগল প্রতাপের। রাস্তায় আলো নেই একটাও, সম্ভবত জ্যোৎস্না আছে বলেই নেই। না হলে ঘুটঘুটে লাগত। অবশ্য রাস্তা বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়। ফাঁকা মাঠের মধ্যে অগোছালভাবে বাড়ি উঠেছে দশ-বারোটা—আরো কয়েকটা উঠলে হয়তো একটা সুষমা আসবে। দূর থেকে দেখলে কোন বাড়িটা আগে, কোনটা কার

পরে বোঝা যায় না। মোটামুটি ঘন বসতি না-হওয়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা হবে বলেও মনে হয় না। আপাতত কোথাও সুরকি বিছানো, কোথাও পায়ের চাপে ঘাস শুকোতে শুকোতে একটা রাস্তার রূপ নিয়েছে। এখান থেকে কল্যাণদের বাড়ি যেতে তিনবার বাঁক নিতে হয়। অশত্থ গাছের আড়াল না থাকলে তাদের ছাদ থেকেই দেখা যেত বাড়িটা। হাঁটা পায়ে মিনিট পাঁচ ছয়ের বেশি লাগে না।

ফাঁকা লাগার কারণটা অবশ্য অন্য। হঠাৎ, অভাবিত কিছু শুনলেই তার এমন হয়—মনে হয় সে জানে না, অথচ তার আড়ালেই ভীষণ কিছু একটা ঘটে গেছে, ঘটে যাচ্ছে ; প্রবল মন-খারাপের অনুভূতি হঠাৎ অবসন্ন করে ফেলে তাকে। ঠিক ভয় নয়, কিন্তু ভয়ের মতো কিছু একটা ঢুকে পড়ে বুকে। নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে এলোমেলো। খেলার শুরুতেই প্রতিপক্ষ হঠাৎ গোল করে ফেললে যেমন হয়। আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও দুর্ভাবনার জের টানতে হয় অনেকক্ষণ।

এখনো তেমনি লাগছিল। ফাঁকা, শূন্য, খাপছাড়া। টর্চের আলো ফেলে ফেলে, কখনো দ্রুত হেঁটে, কখনো দৌড়ে মিনিট তিনেকের মধ্যেই কল্যাণদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল প্রতাপ। উত্তেজনায় তখনো স্বাভাবিক হয়নি নিঃশ্বাস।

গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল অযোধ্যাপ্রসাদ, মিশিরজীর বড়ো ছেলে। প্রতাপকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখে নিজেও এগিয়ে এলো।

'টুসিকো কঁহী তুম দেখা হ্যায়, প্রতাপ ?'

'টুসিকো। না তো।' শুকনো গলায় বলল প্রতাপ, 'কিঁউ ?'

'কেয়া মালুম।' অযোধ্যাপ্রসাদ বলল, 'টুসি নাপাত্তা হো গয়ী।'

টুসি হরিয়ে গেছে। টুসিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডটা কেউ যেন চেপে ধরল মুঠোয় ; অসম্ভব শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় ঝাপসা হয়ে এলো চোখ। চিন্তিত মুখে অযোধ্যাপ্রসাদ তখনো দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সামলে নিয়ে প্রতাপ জিজ্ঞেস করল, 'কখন থেকে ?'

'হাম তো এহি কুছ দের হুয়া শুনা।'

খুব দূরের দিকে দৃষ্টি অযোধ্যাপ্রসাদের। মনে হলো সে চেষ্টা করে ভাবছে কিছু, ভাবনাটাকে গুছিয়ে উঠতে পারছে না। একটু থেমে বলল, 'যাও না, ভিতর যাও—'

ঘরে ঢুকে আরো অনেককে দেখতে পেল প্রতাপ। মিশিরজী, পাশের বাড়ির তারকবাবু, নীলু বোস ; আর একজনকে সে ঠিক চিনতে পারল না। থমথমে, ক্লিষ্ট কয়েকটি মুখ। ওদের দেখেই প্রতাপের মনে হলো ব্যাপারটা পুরনো, যা ঘটার ঘটে গেছে অনেকক্ষণ আগে। তারা কিছুই টের পায়নি। ভিতর থেকে চাপা মেয়েলি কণ্ঠের কথাবার্তা কানে এলো—অস্পষ্ট, ধ্বনি ছাড়া শব্দগুলির আর কোনো অর্থ বের করা যায় না। রমা মিশিরজীর স্ত্রীকেও আসতে দেখেছিলেন, সম্ভবত তিনি এখন বাণী বউদির কাছে। প্রতাপ একবার ভিতরে যাবার কথা ভাবল। সাহস হলো না। দুঃখের দৃশ্যে সে সহজেই কাতর হয়ে পড়ে।

থমথমে ঘরের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে প্রতাপ জিজ্ঞেস করল 'কল্যাণদা ফিরেছেন ?'

'না, কোথায়।' জবাব দিলেন তারকবাবু, 'সন্ধের ট্রেনেই ফেরার কথা ছিল। হয়তো এক্সপ্রেসে আসবে। বৃষ্টিতে লাইন-টাইনও নাকি খারাপ হয়েছে—'

তারকবাবুর কথার মধ্যেই ভিতর থেকে আর্তনাদের মতো বাণী বউদির গলা শোনা

গেল। তারকবাবু উঠে চলে গেলেন ভিতরের দিকে। ঘরের এককোণে উবু হয়ে চুপচাপ বসেছিল শঙ্করলাল। প্রতাপ তার দিকে তাকাতেই কেঁদে উঠল ভেউ-ভেউ করে।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল প্রতাপ। ধমকের গলায় মিশিরজী বললেন, 'শুনো জী, জেরা চুপচাপ রহো। চিল্লানে সে কেয়া ফায়দা! আভি শোচ-বিচারকে সময়—'

কথাটা ঠিক। এখন বুঝেসুঝে চলার সময়। শঙ্করলাল চুপ করতে পরিষ্কার বাংলায় মিশিরজী বললেন, 'একটা কাজ করো, প্রতাপ। তোমার বাবাকে একটু আসতে বলো—'

মিশিরজী এখানকার পুরনো বাসিন্দা, সকলেই চেনে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন কিছুকাল। প্রবীণ আর ভালো লোক বলে লোকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। বলতে গেলে তিনি এ-পাড়ার সকলের অভিভাবক।

প্রতাপ চলে যাচ্ছিল। নীলু বোসও বেরিয়ে এলো।

পুরো ঘটনাটাই কেমন অবিশ্বাস্য লাগছিল প্রতাপের। আরো অস্বস্তি লাগছে পুরো ঘটনাটা জানতে পারছে না বলে। সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে টুসি, কল্যাণদা আর বাণী বউদির মেয়ে। বয়সের তুলনায় একটু বড়োই লাগত। কথা বলত তড়বড় করে। এ-পাড়ায় সে ছিল সকলের আদরের—প্রিয় বলেই থাকত চোখেচোখে। সে হঠাৎ হারিয়ে যাবে কেন।

খানিকটা হাঁটল পাশাপাশি। চুপচাপ। ফাঁকায় এসে নীলু বোস বলল, 'তোমার কী মনে হচ্ছে, প্রতাপ?'

'বুঝতে পারছি না।' প্রতাপ বলল, 'কী হয়েছিল বলুন তো? কখন জানা গেল?'

'তুমি শোননি পুরো ব্যাপারটা?'

'না। এতো রাত্রে মিশিরজীদের আসতে দেখে ছুটে এলাম। এসে শুনি এই ব্যাপার!'

'ও—'

ঘটনাটা বর্ণনা করল নীলু বোস।

বিকেলে, রোদ ওঠবার পর, বাণী গিয়েছিল বাজারে, সেখান থেকে মিশিরজীর বাড়ি। টুসিকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল সঙ্গে। টুসি গেল না। শঙ্করলাল বলেছিল বেড়াতে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গেই যাবে। বেরুবার আগে বাণী বলে গিয়েছিল টুসি বায়না করলে তাকে মিশিরজীর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে। দিল্লি থেকে এসেছে মিশিরজীর ছেলে আর বউ—আরো কেউ কেউও এসেছিল ওদের বাড়ি; বাণীর তাই ফিরতে দেরি হয়। বাড়ি ফিরে শঙ্করলাল, টুসি কাউকে না দেখে স্বভাবতই বিচলিত হয়েছিল একটু। তখন মনে হয়, কল্যাণের ফেরার কথা আছে, হয়তো টুসিকে নিয়ে শঙ্করলাল স্টেশনে গেছে—

দশটা নাগাদ ফিরে আসে শঙ্করলাল, একা। টুসির কথা জিজ্ঞেস করতেই আকাশ থেকে পড়ে সে—সন্ধেবেলাতেই নাকি মিশিরজীর বাড়ি দিয়ে এসেছে তাকে। দরজা খোলা ছিল, আলো জ্বলছিল, গেট থেকেই ছুটতে ছুটতে ভিতরে ঢুকে যায় টুসি। এ-রকম তো প্রায়ই যায়। ক'দিন বৃষ্টিতে কোথাও বেরুনো হয়নি; শঙ্করলাল তারপর একটু ঘুরে আসতে গিয়েছিল। টুসির তো বাণীর কাছেই থাকার কথা!

'অন্য কারুর বাড়ি যায়নি তো?'

'তা হলে খবর পাওয়া যেত। ওইটুকু মেয়ে বাড়ির বাইরে গেছে, এতো রাত হয়ে গেল—কারুর বাড়ি গেলে নিশ্চয়ই খবর দিত বা পৌঁছে দিত।'

গির্জার মাঠে এই সময় শেয়াল ডেকে উঠল তারস্বরে। এই জায়গায় গাছ-গাছালির

সংখ্যা বেশি—ঝাঁকড়া উঁচু-মাথা গাছে গাছে আড়াল হয়ে গেছে আকাশের আলো। ডোবায় জমা বৃষ্টির জল শুকোয়নি এখনো। কটর-কটর শব্দে দল বেঁধে ব্যাঙ ডাকছে, শব্দ বলতে ওইটুকু। কাছেই কোনো গাছের আড়াল থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠেই চুপ করে গেল আবার।

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।' নীলু বোস বলল, 'পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। মিশিরজী বলছেন কল্যাণদা যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে—আর একটু অপেক্ষা করতে—'

প্রতাপ বলল, 'আমি বাবাকে ডেকে আনছি।'

নীলু বোস একটা সিগারেট ধরাল। ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'অশোককে একটা খবর দিলে হতো। বাণী অনেকবার ওর নাম করেছে।'

একটু ভাবল প্রতাপ ; গলার কাছে আটকে-থাকা নিঃশ্বাসটা নেমে যেতে দিল।

'অশোকদার নাইট ডিউটি। পুলিস-টুলিস যা করার আপনারা করুন। আমি অশোকদাকে ডেকে আনছি।'

'হ্যাঁ। আমি বিনয়বাবুকে ফোন করছি, যদি আসতে পারেন।'

তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে রমাকে খবরটা দিল প্রতাপ। এক্ষুনি যেতে হবে কল্যাণদের বাড়ি ; বলল, নিকুঞ্জও যেন সঙ্গে যান। তারপর সাইকেলটা নিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল আলো-অন্ধকারের অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে।

এ সেই একই রকম অবস্থা। ভালো করে খেলা শুরু হবার আগেই গোল খেয়ে গেছে টিম—স্নায়ু বেয়ে গ্লিসারিনের মতো গড়িয়ে পড়ছে অসহায় উত্তেজনা। ঠিক কী করলে এখন পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে বোধগম্য হয় না। বড়ো দুরূহ এ-কাজ। দু'টি পোস্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব সঙ্কুচিত হয়ে আসে ক্রমশ। যেতে যেতে আঠারো বছরের অটুট স্বাস্থ্য কোনো ভরসা দেয় না প্রতাপকে। টের পায় আচ্ছন্ন একটা ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে ডান পা-টা, হাঁটুর সন্ধি থেকে খুলে ছড়িয়ে পড়ছে হাড়গুলো। চরাচরের নিস্তব্ধতায় এখন রাত্রি ভিন্ন আর কারো অবকাশ নেই ; নেই ঘুম ভিন্ন আর কোনো স্থিতি। নির্দেশ অমান্য করে সে শুধু এগিয়ে যাচ্ছে একা। টুসি এখন কোথায় ?

টুসি ছিল সকলের। আদরের। তার জন্ম থেকে এতো কাল পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস বলে দেওয়া যেতে পারে। পাঁজকোলা করে অনেক দিন তাকে কল্যাণদার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে প্রতাপ—রবারের বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করেছে গির্জার মাঠে। বাণ্টি জুতো পরা ছোট ছোট পায়ে সমানে দৌড়ত তার সঙ্গে ; ইদানীং ডাকত 'পোতাপ' বলে। জার্সি পরে মাঠে যাবার সময় অনেক দিন দেখেছে বাণী বউদির সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে টুসি। তখন সে আরো ছোট ছিল, হাত বাড়িয়ে বলত, 'বল কই ?' প্রতাপ হেসে বলত, 'দেব। খেলে আসি।' সেই টুসি। এলোমেলো ভাবনায় চোখে জল এসে যায় প্রতাপের। এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে টুসির নাম ধরে ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উঠতে। রাগ হয়। ঘৃণা হয়। সে যতো এগোয় ততোই দূরে দূরে সরে যায় গোলপোস্ট দুটো।

রাত বারোটার কিছু পরে টেলিগ্রাফ অফিসে অশোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রতাপ।

কাজকর্মের তখন প্রায় শেষ। অফিসের ভিতরেই টেবিল জুড়ে ঘুমোচ্ছে দু'জন। ট্রাঙ্ক-ডিউটির লোকটি বোর্ডের সামনে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। ভিতরে একজনের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে কথা বলছিল অশোক। হঠাৎ প্রতাপকে দেখে

চমকে উঠল।

'কী ব্যাপার, প্রতাপ, এতো রাতে!'

প্রতাপ তখনো হাঁফাচ্ছিল। ঘামে চিক চিক করছে কপাল, বলার আগে কী বলবে সেটা গুছিয়ে নিল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'একটা খারাপ খবর আছে, অশোকদা!'

'কী!'

'টুসি হারিয়ে গেছে—'

'টুসি!' চকিতে ফ্যাকাশে হয়ে গেল অশোকের মুখ। সামনে অ্যাশট্রে থাকা সত্ত্বেও হাতের সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতো ঘষতে ঘষতে বলল, 'হারিয়ে গেছে! বলো কী! কী করে!'

সামনের চেয়ারটা প্রতাপের দিকে ঘুরিয়ে দিল অশোক। কাঁধ ধরে বসিয়ে দিল ওকে। আস্তে আস্তে, কিন্তু সংক্ষেপে, প্রতাপ তখন নীলু বোসের মুখে শোনা কাহিনীটা বর্ণনা করল।

মাটির দিকে তাকিয়ে খুব মন দিয়ে ঘটনাটা শুনল অশোক। শুনতে শুনতেই একসময় বর্তমান থেকে চলে গেল চার-পাঁচ ঘণ্টা পিছনে; নদীর পাড় থেকে সাবধানে সাইকেল চালিয়ে এগোতে লাগল বাদামতলার দিকে। নদীর অবিশ্রান্ত চ্ছলচ্ছল শব্দ আর ঝিঁঝির ডাক বাজতে লাগল কানে। অন্ধকারে কুলকুল করে ঘামছে শঙ্করলাল। চোখের সামনে হুবহু সেই দৃশ্যটা ফিরিয়ে আনল অশোক। উদ্দেশ্যহীন চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল প্রতাপের মুখের দিকে।

'শঙ্করলাল বলেছে মিশিরজীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল?'

'তাই তো শুনলাম—'

সন্ধের ঘটনাটা প্রতাপকে বলবে কি না এক মুহূর্ত ভাবল অশোক। কী ভেবে বলল না। ঘটনাটাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিল সে—টুসিকে পাওয়া যাচ্ছে না, বাণীদি ভেঙে পড়েছে, কল্যাণদা ফেরেনি এখনো। এর পরেই স্তব্ধতা। হাজার চিন্তা করেও সে অন্য কোনো ভাবনায় রূপান্তরিত হতে পারল না। মাথাটা ক্রমশ বোধশূন্য হয়ে উঠল।

কিন্তু, এভাবে বসে থাকলেও চলে না। সময় চলে যাচ্ছে। কিছু করার থাকলে এখনই তা করা দরকার। তার চোখের সামনে আবার ফিরে এলো নদীটা—একটার পর একটা ঘূর্ণি তুলে দ্রুত ছুটছে জল, একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে টুসির দেহটা! এমন কি হতে পারে!

আকস্মিক শীতে জ্বর আসার মতো কেঁপে উঠল অশোকের সর্বাঙ্গ। মনে মনেই বিড়বিড় করল সে, না, না। তারপর সঙ্গের লোকটিকে সম্বোধন করে বলল, 'গুপ্তাজী, হাম চলতে হেঁ—'

'হাঁ, আইয়ে আপ।' সঙ্গে সঙ্গে বলল লোকটি, 'ঘাবড়াইয়ে মত্। ভগবান হ্যায়, মিল জায়গি। লেকিন পুলিস মে খবর দেনা চাহিয়ে।'

অশোক ভাবল, ভগবান আছে। আছে কি? তারপর প্রতাপের হাত ধরে টানল।

'এসো।'

আবার সেই রাস্তা। সাইকেল। মিশনারি রোড ধরে এগিয়ে চলল দু'জনে।

কিছু দূর এসে অশোক বলল, 'কী একটা খবর আনলে, প্রতাপ! টুসিকে পাওয়া যাচ্ছে না, কল্যাণদা নেই। এখন বাণীদিকে ফেস করাই তো মুশকিল হবে।'

কথাটার জবাব দিল না প্রতাপ। ভিতরে ভিতরে ডুবতে শুরু করেছিল সে। অশোকদাকে বোঝানো যাবে না, বাড়ি থেকে এতোটা রাস্তা ক্রমাগত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ছুটে এসেছিল সে। এখন মনে হচ্ছে বৃথা, যা হবার হয়ে গেছে। টুসিকে আর পাওয়া যাবে না।

এ-কথা উচ্চারণ করা ঠিক নয়। খানিক পরে বলল, 'আপনার কী মনে হয়, অশোকদা ? কী হতে পারে ?'

'কী করে বলি ! কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে এটাও তো ভাবতে পারছি না। আগে কখনো এ-রকম হয়েছে শুনেছো ?'

'না।'

'বৃষ্টিটা নামার পর থেকেই আমার কেমন একটা ফিলিং হচ্ছিল।' বিষণ্ণ গলায় বলল অশোক, 'খালি মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, একটা কিছু ঘটবে। জানি না কী ঘটতে যাচ্ছে !'

প্রতাপ হঠাৎ বলল, 'পাওয়াও তো যেতে পারে।'

অশোক ওর মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

একটু একটু করে ভোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সময়। চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিমে, অন্ধকার থাকলেও তেমন ঘন নয়। আকাশে আলো আছে। গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সিরসিরে হাওয়া এসে ঘিরে ধরল চতুর্দিক থেকে। টুসিকে যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, টুসি যদি সত্যিই হারিয়ে যায়, অশোক ভাবল,তা হলে আর কোনো দিন সে বাণীদির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এখন ঠিক ঠিক ভাবা যাচ্ছে না—হয়তো তাই হবে। টুসির সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্রয়ও হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে একে একে। দোলনার ভিতর টুসি। ঘুম পাড়াচ্ছে বাণীদি। টুসি ঘুমোবে না—দোলনা যতো দোলে ততোই হাসতে থাকে সে। কথা বলতে বলতে আপন মনেই তখন গুনগুন করে উঠল বাণীদি। গুনগুন ক্রমশ রূপ দিল শব্দে—

'টুসিরে টুসি
খাচ্ছে চুষি
হাসছে মুখে খিলিখিলি—
ফুটছে তারা ঝিলিমিলি।'

'বাঃ, চমৎকার তো !' শুনে বলেছিল অশোক, 'একেবারে মেয়ের নামের সঙ্গে মেলানো ! ছড়াটা কার ?'

'কার আবার ?' বাণীদি বলেছিল, 'মেয়ে যার, তার। কেন, খারাপ লাগল ?'

'খারাপ কেন হবে ! ভাবছি, এ-প্রতিভার কথা তো জানা ছিল না—'

'প্রতিভা-টতিভার ব্যাপার নয়। ওটা হয়ে যায়। বিয়ে হোক, ছেলেমেয়ে হোক, তখন দেখবে আপনা-আপনিই এসে যাচ্ছে।' বলে মেয়েকে তুলে নিল কোলে। 'এ-ছড়া তো ছাপবার জন্যে নয়। এর মানে শুধু আমি বুঝব, আর বুঝবে টুসকিরানী।'

আসে, বাণীদি যেমন বলেছিল, অনায়াসে। তখন জায়গা করে দিতে হয়; কিংবা, করেও হয়তো দিতে হয় না, আপনা-আপনিই জায়গা করে নেয় সে। আর যদি হঠাৎ চলে যায় !

নিঃশব্দ ভাবনায় ভেসে যাচ্ছিল অশোক। দূরে রেল এঞ্জিনের তীব্র হুইসিল শোনা

গেল।

'মনে হচ্ছে এক্সপ্রেসটা এলো।' প্রতাপ বলল, 'কল্যাণদা হয়তো এই ট্রেনেই আসবে।'

'আমার মনে হয় আমাদেরও একটু খুঁজে দেখা উচিত ছিল।'

'কোথায় ? যদি কারুর বাড়িতে থাকত এতোক্ষণে জানা যেত।'

'আমি সে-খোঁজার কথা বলছি না— ।'

কল্যাণের বাড়ির কাছাকাছি এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল অশোক ; দেখাদেখি প্রতাপও। এখান থেকে আলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, মনে হচ্ছে আরো কেউ কেউ এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। গেটের কাছে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। আরো কাছে এসে অশোক চিনতে পারল অযোধ্যাপ্রসাদকে। আগে এখানেই হিন্দি পড়াত কলেজে ; বছর দুয়েক হলো চাকরি নিয়ে দিল্লি গেছে। প্রতাপের কাছে শুনেছিল খবর পেয়ে সবচেয়ে আগে ওরাই ছুটে এসেছিল।

পুরনো কথার জের টানল অশোক, 'ধরো, নদীর ধারেটারে—'

'আপনি কী ভাবছেন বলুন তো ?' প্রতাপ অবাক হয়ে তাকাল। 'শঙ্করলাল তো বলছে মিশিরজীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। আমার কেমন মনে হচ্ছে ভিতরে না গিয়ে টুসি আবার বেরিয়ে এসেছিল। তখনই কেউ— । নির্জন পাড়া, কে আর লক্ষ রাখছে সব সময় !'

সন্ধের দৃশ্যটা কিছুতেই মাথা থেকে নামাতে পারছিল না অশোক। চাপা গলায় বলল, 'শঙ্করলালের কথায় বিশ্বাস কী !'

'অশোকদা !'

'যাক, এসব নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা কোরো না। যাই হয়ে থাকুক, শঙ্করলাল খুব দায়িত্বের পরিচয় দেয়নি। মেয়েটা ঠিক জায়গায় পৌঁছল কি না ওর দেখা উচিত ছিল।'

'তা ঠিক।' প্রতাপ বলল, 'লোকটা বোধ হয় নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। খুব কাঁদছে। এতো দিনের পুরনো লোক, টুসিকে জন্মাতে দেখেছে।'

বসার ঘরটা প্রায় ভরে গেছে লোকে। এতোক্ষণ প্রতাপের কাছে শুনে ও আসতে আসতে যা বোঝেনি, লোকগুলির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে তাই বুঝতে পারল অশোক—সঙ্কটের চেহারাটা খুব স্বাভাবিক নয়। বাড়ির কেউ মারা গেলে সাধারণত এ-রকম ভিড় হয়, সংখ্যায় নির্জনতা বেড়ে ওঠে আরো। অবিশ্বাস সত্ত্বেও এতোক্ষণ মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা জিইয়ে রেখেছিল সে। মিশিরজী, তারক বিশ্বাস, নিকুঞ্জবাবুদের মুখের দিকে তাকিয়ে আকস্মিক উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল বুক। সম্ভবত টুসি আর ফিরবে না।

কিন্তু তাকে ভিতরে যেতে হবে। দেখা করতে হবে বাণীদির সঙ্গে। কথাটা বলেছিল প্রতাপ, বাণীদি অনেকবার খুঁজেছে। খুবই স্বাভাবিক। দেখা হলে কী বলবে সে বাণীদিকে, টুসি ফিরে আসবে। ভাবনার কী আছে ; দেখুন না, কাল ভোর না হতেই ফিরে পাবেন মেয়েকে ? বলবে কি, টুসি ছিল আমাদের সকলের প্রিয়, ও হারাতে পারে না ?

কোনোভাবেই প্রস্তুত হতে পারছিল না অশোক। দরজার আড়ালে, সোফার পিছনে সে টুসিকে খুঁজল। কল্যাণদা লোক নিয়ে ব্যস্ত, বাণীদি কাঁদে। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে টুসিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অশোক। ধরা পড়ার আগেই ছুটে এসে হাত ধরল টুসি।

'কী রকম ! পারলে না তো !'

'বাব্বা, সত্যিই তো ! কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি ?'

'ওই তো, দরজাটার পেছনে। ঠিক আছে, আবার খোঁজো—'

এইমাত্র সেখানে টুসির হাতের স্পর্শ পেয়েছিল। হাতটা গালে ছুঁইয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল অশোক।

বালিশে পিঠ দিয়ে বিছানায় বসে আছে বাণীদি। তার দু' পাশে দু'জন মহিলা। একজনকে চিনতে পারল সে, প্রতাপের মা। মুখ দেখেই বোঝা যায় উদ্বেগ একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে বাণীদিকে। চোখ দু'টি বন্ধ। ঘরের সমস্ত আলো যেন তারই মুখের ওপর এসে পড়েছে। মনে পড়ে, বাবা মারা যাবার পর শ্মশান থেকে ফিরে মাকে এই রূপে দেখেছিল। সে অনেক দিন আগেকার কথা। মনে পড়ল, কল্যাণদা এখনো ফেরেনি।

'বাণীদি !' ডাকবে না ভেবেও শব্দটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

'কে !' চোখ খুলে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল বাণীদি। তারপর থেমে থেমে বলল, 'অশোক, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে খুঁজছিলাম তোমাকে। এতো রাতে কি কখনো এ-বাড়িতে এসেছো তুমি ? দ্যাখো, এতো রাতেও আমার ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, কতো লোকজন এসেছে— !'

অশোক নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। প্রায় ছুটে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে ফেলল।

'খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, ওকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে, বাণীদি।'

'যাবে না।' বাণী মাথা নেড়ে বলল, 'বাড়ি ফিরে দেখলাম ঠাকুরের ছবিটা পড়ে ভেঙে গেছে। তখনো কিছু জানি না। তবু ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। তখন বুঝিনি আমার বুকটাই খালি হয়ে যাবে—'

চোখ অনেক আগেই বন্ধ করেছিল। এখন সেখান থেকে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ডান পাশের মহিলা আঁচল দিয়ে জলটুকু মুছিয়ে দিতে দিতে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'চুপ রহো বেটী।'

আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিল অশোক। বাণীদির মুখের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে একটা আশঙ্কা হলো তার। বাণীদি সম্ভবত কল্যাণদার জন্যে অপেক্ষা করছে। তখনই ভাঙবে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে ভাবল, সে-দৃশ্য যেন না দেখতে হয়।

কিন্তু, সত্যিই সে এতো দূর ভাবছে কেন ! কিংবা অন্যরাও ! পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। যারা যায়, তাদের কেউ কেউ ফিরেও আসে। তেমনি করে টুসিও যে আসবে না ফিরে, তার নিশ্চয়তা কী ! ছোট্ট মেয়ে টুসি, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আশপাশের সমস্ত মানুষ তার জন্যে অপেক্ষা করছে ভালোবাসা নিয়ে—এর মধ্যে থেকে কে নিয়ে যেতে পারে তাকে !

অভিমান থেকে অভিমানে একা চলে যাচ্ছিল অশোক। রাত এখন প্রায় একটা। হিসেবমতো অনেক রাত—তবু অনেকগুলো বাড়িতেই আলো জ্বলছে এখন, অনেকেই জেগে আছে। এ সবই টুসির জন্যে। হায় মানুষ ! অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। তারপর খোলা রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

'পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ।' নীলু বোস এগিয়ে এসে বলল, 'আমি নিজে গিয়েছিলাম অযোধ্যার সঙ্গে। বলল এসে স্টেটমেণ্ট নেবে—'

সামনে মোড়ের মাথায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে প্রতাপ। সেদিকে তাকিয়ে অশোক বলল, 'আমরা কি খুঁজেছি ভালো করে !'

'কিছুই বাদ যায়নি, অশোক। থানায় বলল আউটপোস্টগুলোতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে। তোমার কী মনে হয় ?'

'কিছুই ভাবতে পারছি না— ।'

'বিনয়বাবু এসেছিলেন, প্রিন্সিপাল। স্টেশনে গেছেন। কল্যাণকে একটু সামলে নিয়ে আসবেন।'

অশোক সিগারেট বের করল, প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল নীলু বোসের দিকে। দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে জিজ্ঞেস করল, 'শঙ্করলাল কোথায় ?'

'ছিল তো— ।' এদিক ওদিক তাকাল নীলু বোস, 'ব্যাটাচ্ছেলে এখন কাঁদছে। আই থিংক হি শুড্ বি মেড্ রেসপন্‌সিব্‌ল্ !'

কথাটা কানে তুলল না অশোক। দেখল প্রতাপ ছুটে আসছে। তখনই অনুমান করে নিল ব্যাপারটা। সিগারেটটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

কাছে এসে প্রতাপ বলল, 'কল্যাণদা আসছে।'

ঠিক তখনই বাঁকের মুখে দেখা গেল রিক্সাটাকে। পাশাপাশি বসে দু'জন, কল্যাণদা আর বিনয়বাবু। আর কিছু ভাবার আগেই একেবারে সামনে এসে পড়ল।

অশোক এগিয়ে যাচ্ছিল। রিক্সায় বসেই দু' হাত নেড়ে কল্যাণ বলল, 'নো। আই ডোণ্ট বিলিভ।'

গলা শুনে তখন সকলেই বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ব্যস্ত হয়ে নামতে যাচ্ছিল কল্যাণ, বিনয়বাবু ধরে ফেললেন।

'কল্যাণ, এমন করে না। কী বোঝালাম এতোক্ষণ তোমাকে !'

কথাটা তার কানে গেছে বলে মনে হলো না। রিক্সা থেকে নেমেই ভাঙাচোরা মুখে মিশিরজীর হাতদুটো চেপে ধরল কল্যাণ।

'মিশিরজী, হাম বিসোয়াস নহী করতা।'

'শান্ত হোও বেটা,' মিশিরজী ওকে জড়িয়ে ধরলেন, 'থিংক অফ ইওর ওয়াইফ্। হাম সব খোঁজ রহেঁ হেঁ। টুসিকে পাওয়া যাবে, ভগবান থাকলে পাওয়া কেন যাবে না ?'

'নো, ইট কান্ট বি লাইক দ্যাট। বাণী কোথায়—বাণী—'

মিশিরজীর হাত ছাড়িয়ে দ্রুত ঘরের দিকে ছুটে গেল কল্যাণদা। পিছনে পিছনে আরো অনেকে।

অশোক অনুমান করল, পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম দৃশ্যটির মহড়া শুরু হবে এখন। এ যেন কাউকে দেখতে না হয় !

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখটা মুছে নিল সে। তার সামনে প্রতাপ আর নীলু বোস। অল্প দূরে বিনয়বাবু। রিক্সা থেকে নেমে তিনি আর যাননি ভিতরে। ভিড় ফাঁকা হলে ক্ষীণ হাসিমুখে এগিয়ে এলেন কাছে। তারপর প্রতাপের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'কী ইয়ংম্যানরা, তোমরা ভেঙে পড়লে কী করে চলবে !'

বিস্ময়ে লক্ষ করল অশোক, এই দুর্যোগেও বিনয়বাবুর মুখের একটি রেখাও কাঁপেনি !

॥ চার ॥

সারা রাত ঘুম আসে না রাজবালার। নির্ঘুম যন্ত্রণার মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুধু অপেক্ষা করেন কখন ভোর হবে, জীর্ণ, অস্বস্তিকর শরীরটা নিয়ে কখন যেতে পারবেন নদীর দিকে। কখন পুবমুখো তাকিয়ে বলতে পারবেন, মঙ্গলময় হে সর্বশক্তিধর, তুমি আমাদের দেখো !

প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নান করা তাঁর পুরনো অভ্যাস—নিতান্ত শরীর অকেজো না হলে গত আট বছরে এই প্রাত্যহিকতায় ছেদ পড়েনি কখনো। ইতিমধ্যে আকাশ উপুড় করে নামল সর্বনাশা বৃষ্টি। চলছে তো চলেইছে, যেন সব কিছু ধুয়ে মুছে নিঃশেষ না করে দিয়ে ক্ষান্ত হবে না। বৃষ্টি বলবে একে, না প্রলয় ? তিন কুড়ি বয়স পেরিয়ে গেল, এর মধ্যে কখনো এমন বৃষ্টি দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। শুধু যে স্নানেই বাদ সাধল তা নয়—বৃষ্টিটা যেন নাড়া দিচ্ছে মাটির মূল ধরে।

ঘুম আসে না। অস্বস্তি বেড়ে চলে। এতো দিন যেমন তেমন করে চলে গেলেও, মনে হয় শেষরক্ষা আর হবে না। সংসার ভেসে যাচ্ছে, একদিন সত্যি সত্যিই ভেসে যাবে হুস্ করে। ছেলেমেয়েগুলোর একটারও সদ্গতি হলো না এখনো। যে যার মতো করে চলছে ! ভাবগতিক দেখে মনেই হয় না ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ কিছু ভাবে। এমনকি চারটেই যে তাঁর পেটে ধরা তাও মনে হয় না। হাজার চেষ্টা করেও ওদের এক সুতোয় বাঁধা গেল না। 'আমি চোখ বুজলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না রাজু', মরার আগে প্রায়ই বলতেন তিনি, 'মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সন্তান। ওরা ভালো হয়েছে, আরো ভালো হবে। তোমার ভাবনা কী ?' এখন মনে হয়, তাঁর সে-সব কথায় ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু ছিল না। না হলে, আর কিছু না হোক, বেঁচে থাকতেই বিষাণটার কথা ভাবতেন। তখনই তো সে ফি-ক্লাশে ফেল করে, টো-টো করে পাড়া চষে বেড়ায় ভ্রূক্ষেপহীন, আড়ালে বিড়িটিড়িও খেতে শিখেছিল। নিজের চোখে দেখেও তখন যে কেন রাশ টেনে ধরেননি ! আজ তার জের টানতে হচ্ছে রাজবালাকে। লেখাপড়া না শিখুক, রোজগার না করুক, বাড়ি বসে বোনগুলোর ভালো মন্দ পাহারা দিতে পারত। তা না করে একেবারে বাড়ি ছেড়ে গেল ! লোকে যে কতো কী বলে সে কি কানে যায় হতভাগার !

ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন রাজবালা ; থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস জমে ওঠে বুকে। খুব আস্তে সেগুলো ছড়িয়ে দেন অন্ধকারে। পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে শ্যামা। কনুই ভর করে উঠে একবার তার মুখের দিকে তাকান, শ্যামার নিঃশ্বাসের গন্ধ ছুঁয়ে যায় তাঁকে। অন্ধকারেও চোখে পড়ে তার মায়াময় মুখ, চোখ, নিস্তব্ধ অবয়ব। কেন পড়বে না, মনে মনে ভাবেন, এ-অন্ধকার কি গর্ভের অন্ধকারের চেয়ে বেশি ! এ-মুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তো শ্যামার বয়সের চেয়ে বেশি দিনের। এতো দূর সম্পর্ক সত্ত্বেও এরা যে কেন হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে—অপরিচিতের মতো চলে যায় দূরে, বোধগম্য হয় না। তবু এদের ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে ভাবলে এতো খারাপ লাগে !

উত্তর দিকের জানলার খড়খড়ি দিয়ে ঢুকে পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। মশারির বাইরে গুনগুন করছে মশা। আজ আর বৃষ্টি নেই ; তবু, কেন যেন মনে হচ্ছে বাইরেব অবস্থা ভালো নয়। বহু দূর ব্যাপ্ত নির্জনতা থেকে অপার্থিব কিছুকে ডেকে আনছে বর্ষণক্ষান্ত পৃথিবী ! রাজবালা বুঝতে পারেন না সে কেমন ; শুধু অনুমান করতে পারেন চরাচরের ওপর তার নিঃশব্দ আবির্ভাব। চারিদিক থেকে ঘন ঘন উঠে আসে শেয়াল আর কুকুরের

ডাক। নদীর ধারের এই বাড়িতে এক নাগাড়ে তিরিশটা বছর কেটে গেল তাঁর, রাতের এই সব শব্দের সঙ্গে অপরিচয় নেই। তবু আজ যেন সবই কেমন নতুন নতুন লাগছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় তিনটি আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে এ-বাড়িতে তিনি একা ; কাছাকাছি বাড়িগুলোর কোনোটাতে লোক আছে, কোনোটাতে নেই ; এই রাতে হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায়, কেউ কি এগিয়ে আসবে তাঁদের সাহায্যে। মনে পড়ে, বৃষ্টিতে ধসে গেছে ছাদের একদিকের পাঁচিল। সামনে পড়ে রয়েছে পুরো বর্ষা ; তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে আরো যে কী হবে না-হবে বলা যায় না।

না-ঘুমনোর অস্বস্তি থেকে বিছানায় উঠে বসেন রাজবালা। উদ্‌ভ্রান্ত কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে বুক। পা দুটো সামনে ছড়িয়ে আবেগ সামলাতে নখের আঁচড় কাটেন তিনি। চোখ কচলে জড়তা কাটান। অন্ধের মতো দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে পেরিয়ে যান একের পর এক স্মৃতি।

কে জানত এতো তাড়াতাড়ি শ্রীহীন হয়ে পড়বে সব কিছু। হরবিলাস যাবার সময়েও এদিককার অবস্থা ছিল অন্য রকম। পথঘাট মসৃণ, রাস্তায় আলো ছিল, আম জামের অবাধ রাজত্ব সত্ত্বেও আশপাশের বাড়িগুলো গমগম করত লোকে। রাতের বেলায় ঘুরে ঘুরে শেয়াল তাড়াত চৌকিদার। 'নদীর ধারে বাড়ি', কেনার সময় বলেছিলেন তিনি, 'খুব ভাগ্যে এ-রকম পাওয়া যায়। ভূ-ভারতে খুঁজেও এমন একটি জায়গা পাবে না। দেখছ না, কীরকম দাম বাড়ছে জমির, কতো নতুন নতুন লোক আসছে রোজ।'

মিথ্যে বলেননি। তাঁর বুদ্ধি ছিল, সুনাম ছিল, একডাকে চিনতে পারত লোকে। যখন রাজনীতি করতেন কলকাতা, মেদিনীপুর, ছাপরা থেকে কম লোক এসেছে এ-বাড়িতে! আসত, দু' দশ দিন থাকত, চলে যেত আবার। বড়ো একটা বেরুত না বাড়ি থেকে। একদিন রাত্রে পুলিস এলো। চরণদাস নামে একটি লোক তখন বাড়িতে। কর্তা বললেন, 'রাজু, পিছনের দরজা দিয়ে ওঁকে পার করে দাও। বটতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো।' অনভ্যস্ত, বোঝেনও না কিছু, তবু কী যেন হয়েছিল রাজবালার সেদিন—চরণদাসকে ঠিক এগিয়ে দিয়েছিলেন বটতলা পর্যন্ত। তারপর নদীর ধার দিয়ে অতো রাতে ফিরে এসেছিলেন একা, ভয় লাগেনি এতোটুকু। বছর খানেকের মধ্যে পুর্নিয়ায় পুলিসের গুলি খেয়ে মারা গেল চরণদাস। খবরটা এসে পৌঁছুতেই গম্ভীর আর কঠিন হয়ে গেল তাঁর মুখ। সেদিনই সকালে এসেছেন আর একজন ; রাজেন্দ্রবাবু। বললেন, 'হরবিলাস, ব্যস ঔর কুছ দিন। আংরেজকো ইয়ে দেশ ছোড়না হি পড়েগা।' স্বাধীনতার পর পরই খবরের কাগজে ছবি বেরুল রাজেন্দ্রবাবুর। কাগজের একটা কপি এনে সামনে মেলে ধরেছিলেন কর্তা, 'রাজু, চিনতে পারো?'

বাইরে একইভাবে চিৎকার করছে শেয়াল আর কুকুরে। এক নাগাড়ে নয়, কিছুক্ষণ থেমে থাকে—সে-সময় আলমারির মাথায় রাখা টাইমপিসটার শব্দ কানে আসে। তারপর আবার। এভাবে পরপর চলে জন্তুগুলোর ঝগড়া। মাঝেমধ্যে শোনা যাচ্ছে দু' একটা পাখির গলা ; জ্যোৎস্নার আলোটাও কখন সরে গেছে জানলা থেকে। সারা রাত জেগে কাটিয়ে রাত টের পাওয়া যায়নি। বোধ হয় ভোর হয়ে আসছে এখন।

বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গিয়েছিল রাজবালার। এতোক্ষণ স্মৃতি ছিল, ব্যথাটা টের পাননি। ঘুমন্ত শ্যামার একটি হাত এসে পড়েছিল কোলে। খুব সাবধানে সেটা সরিয়ে দিয়ে, কী ভেবে মশারির বাইরে বেরিয়ে এলেন রাজবালা। সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলে

বারান্দার কোণ থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিলেন হাতে। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন ছাদের সিঁড়ির দিকে।

সম্ভবত বাইরে এখন খুব হাওয়া। ছাদের কাঠের দরজাটা নড়ছে অল্প অল্প, পুরনো কব্জাগুলো থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠছিল। লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে খিল খুললেন রাজবালা, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে গেল দরজাটা, একরাশ হাওয়া এসে আক্রমণ করল তাঁকে। আবছায়ার মধ্যে, মনে হলো, কী যেন একটা উড়ে গেল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে। সম্ভবত একটা চিল, ভোরের অপেক্ষায় মুখ গুঁজে বসেছিল দরজায়। একটু অপেক্ষা করলেন রাজবালা, অন্ধকারটা সইয়ে নিলেন চোখে। তারপর লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়ালেন ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে আর পাঁচিল নেই—চুনবালি-ইঁটসুদ্ধ অনেকটা জায়গা ধসে পড়েছে বৃষ্টিতে। ঘটনাটা শোনার পর এই তাঁর প্রথম ছাদে আসা। দিনের আলোয় নদীটা এখান থেকে দেখা যেত স্পষ্ট, দূরত্ব হয়তো একশো গজেরও কম। অন্ধকার গাছপালা আর অপ্রকৃতিস্থ ছায়া নিয়ে এখন সবই চলে গেছে আড়ালে। শুধু শোনা যাচ্ছে জলের চ্ছলচ্ছল, অবিশ্রান্ত পাড় ভেঙে-ভেঙে বয়ে চলার শব্দ, কুকুরের চিৎকার, মাঝে মাঝে অদৃশ্য কোণ থেকে এক-আধটা পাখির ডাক। লণ্ঠনের আলোয় রহস্যময় সেই ভগ্নাবশেষের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাটিতে বসে অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লেন রাজবালা। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন ঘুনঘুন করে।

কতোক্ষণ ওখানে এইভাবে বসেছিলেন খেয়াল ছিল না। সম্বিৎ ফিরল ডাক শুনে। দেখলেন শ্যামশ্রী এসে দাঁড়িয়েছে কাছে, ঘুমের মধ্যে এতোক্ষণ যাকে ছোটবেলার শ্যামা বলে ভাবছিলেন তিনি।

'অন্ধকারে একা একা ছাদে কেন এসেছ, মা! তোমার একটুও ভয় করল না!'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসলেন রাজবালা। ভোর হয়ে আসছে, মাথার ওপর দিয়ে এক এক করে উড়ে যাচ্ছে পাখিরা। জলের নরম গন্ধ নাকে এলো।

'ভয় করবে কেন, মা! তিরিশ বছর হয়ে গেল এ-বাড়িতে—'

'সে-কথা আলাদা।' শ্যামশ্রী বলল, 'খুব অন্যায় করেছ। এভাবে আর এসো না। কখন কী বিপদ হবে! আমার যা ভয় লেগেছিল!' একটু চুপ করে আবার জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলো তো, কেন এসেছিলে?'

রাজবালা হেসে বললেন, 'তুই মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস। ঘরে গুমোট ছিল, তাই এলাম।'

'কাল রাতে কি বিশ্রী শেয়াল ডাকছিল, শুনেছ?'

'কুকুরও ডাকছিল।' বলে নিঃশ্বাস নিলেন রাজবালা, 'কতোটা ভেঙে গেছে দেখেছিস!'

'দেখছি তো! এ-বাড়িতে আর থাকা চলবে না দেখছি—'

'কোথায় যাবি!' হতাশ শোনাল রাজবালার গলা। খুব দূর দিয়ে তাকালেন আকাশের দিকে। ক্রমশ আলো আসছে, সত্যি ভোর হতে এখনো কিছুটা সময় লাগবে। ঠিক এই সময়, আট বছর আগে বিদায় নিয়েছিলেন একজন। তখনও ভবিষ্যতের রূপ ছিল আলাদা। আশ্রয় ছিল। আর আজ!

লণ্ঠনের কাঁচ তুলে ফুঁ দিয়ে আগুনটা নিবিয়ে দিলেন রাজবালা।

হয়তো ঠিকই বলেছে শ্যামা—এখান থেকে চলে যেতে পারলেই ভালো হতো সবচেয়ে। একে একে অনেকেই গেছেন। দাশমশাই, কানুবাবু, ত্রৈলোক্যনাথ। সেদিন গোটা পরিবার নিয়ে অমরবাবুরাও চলে গেলেন বর্ধমানে। যাবার আগে এসেছিলেন দেখা

করতে। 'কী হবে বউদি এখানে থেকে!' বললেন, 'দিনকাল পাল্‌টে গেছে, সে-আবহাওয়াও কি আছে আর! দেখছেন তো শহরের অবস্থা। কারুর সঙ্গে কারুর সদ্ভাব নেই, লোকের পেছনে লাগা ছাড়া আর কাজ নেই। বাঙালী জাতটাই মুছে যাবে এখান থেকে!'

রাজবালা বুঝতে পারেন সবই। বুঝেও চুপ করে থাকেন। হরবিলাস ভাদুড়ীর স্মৃতি যতো পুরনো হচ্ছে ততোই ঝিমিয়ে পড়ছে দিনগুলো। চারিদিকে যেন মড়কের আবহাওয়া! এক-একবার ভাবেন বাড়িটা বেচে দেবেন, চলে যাবেন। তখনই মনে হয়, কোথায়? এই নদী, এই শূন্য চরাচর, পুরনো এই বাড়িটা ছাড়া অন্য কোনো ঠিকানা কি জানা আছে তাঁর!

দক্ষিণের ছাদে ডানা-ভাঙা চিলটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে শ্যামা। যতোবার দু' হাতে তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশে, ততোবারই ঘুরতে ঘুরতে মুখ থুবড়ে পড়ছে নিচে। দৃশ্যটা কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন রাজবালা। ডানা ভেঙে গেছে, ও কি আর উড়তে পারবে!

'শ্যামা, শোন।'

মেয়েকে ডাকলেন রাজবালা। কাছে আসতে বললেন, 'অশোক কি কিছু মনে করল কাল?'

'কী আর মনে করবে!' মুখ ঘুরিয়ে চিলটাকে দেখতে থাকল শ্যামশ্রী। 'অশোকদা তো আর নতুন দেখছে না তোমাদের। মাঝে মাঝে একেবারে মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়ে যাও!'

'সত্যি, কী যে করলাম!' কথাটা মেয়ের উদ্দেশে বা নিজেকে, ঠিক বোঝা গেল না। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললেন, 'আমার মাথায় বোধ হয় গণ্ডগোল শুরু হয়েছে!'

শ্যামশ্রী কথাটা শুনল বলে মনে হয় না। ক্রমশ ফর্সা হয়ে-আসা আকাশে সবুজ ডানা মেলে একটা টিয়া উড়ে যাচ্ছিল, তার পিছনে পিছনে উড়োজাহাজের ভঙ্গিতে তিনটে কাক। নদীর দিক থেকে দমকে দমকে ছুটে আসছে ভোরের হাওয়া। কুকুরগুলো এখনো ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। এ-সবের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। 'যদি মনে পড়ে আবার কিছু ফেলে গেছি—,' বলেছিল অশোকদা। ওটা কথার কথাও হতে পারে।

'হ্যাঁ রে, চিঠিটার কথা গায়ত্রীকে কিছু বলিসনি তো?'

'আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' সোজাসুজি রাজবালার দিকে তাকাল শ্যামশ্রী, 'একটা কোথাকার উড়ো চিঠি নিয়ে দিদিকে যা করলে কাল! কে না কে পাঠিয়েছে, তাতেই ধরে নিলে দিদি খারাপ! আশ্চর্য, মা, কী করে ভাবলে তুমি ওসব কথা! চাকরি করে একার কাঁধে সংসারটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে দিদি। হঠাৎ যদি কিছু করে বসে!'

'দোষ আমারই।' আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন রাজবালা। উঠতে উঠতে বললেন, 'গায়ত্রী খেল না, অমন করে কাঁদল সারা রাত! আমার চোখে ঘুম আসেনি—'

শ্যামশ্রী চুপ করে থাকল।

সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে রাজবালা বললেন, 'আমি একটু ঘাট থেকে ঘুরে আসছি। ভোর হয়ে গেল। ক'দিন যাইনি, মনে হচ্ছে সেই জন্যে—। তুই ওদের চা-টা করে দিস। আমি এখুনি ফিরব।'

'ঘাটে জল বেশি। আজকের দিনটা বাদ দাও না, মা!'

'আমার কিছু হবে না।' সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসলেন রাজবালা, 'এতো দিন ঘর করছি একসঙ্গে। নিত্যিকার চেনা। নদী আমাকে নেবে না।'

হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, কাঁধে গামছা, আমবাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেন

রাজবালা। এদিকে রাস্তা কম পড়ে। এতোক্ষণ শ্যামার সঙ্গে কথা বলে একটু হাল্কা লাগছে মনটা। লাল পুবদিক থেকে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে আলো। সাইকেলে দুধের ড্রাম বেঁধে ভজন গাইতে গাইতে রাস্তা পার হচ্ছে ঝগড়ু গয়লা—রাজবালার মতোই নিয়মিত সে।

বড়ো নালাটার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন রাজবালা। ঝোপঝাড়ে ওদিকটা এখনো অন্ধকার। ছ'সাতটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে। অল্প দূরে দুটো, না তিনটে শেয়ালও দেখতে পেলেন। নদীর দিক থেকে উঠে আসছিল শেয়ালগুলো, চেঁচাতে চেঁচাতে সামনের কুকুরগুলো তাড়া করল তাদের। রাতের রহস্যটা এতোক্ষণে পরিষ্কার হলো—এই শেয়াল-কুকুরগুলোই তবে সারা রাত ডেকেছে, জ্বালিয়েছে! রাজবালা আরো একটু এগোতে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করতে করতে ছুটে এলো তাঁর দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ে রাজবালা বললেন, 'আমি কি শেয়াল নাকি রে! পুরনো লোক, চিনতে পারিস না!' কুকুরটা পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল তখন, কিন্তু ডাকতে লাগল মাঝে মাঝে, পিছন ঘুরে মাঝে মাঝেই তাকাতে লাগল তাঁর দিকে। ততোক্ষণে অন্য কুকুরগুলোরও চোখে পড়েছে তাঁকে। দু' তিনটে এগিয়ে এলো কাছে, দেখলেন, অন্যগুলো নেমে যাচ্ছে নালার দিকে।

কুকুরগুলোর ভাবভঙ্গি দেখে কেমন একটু সন্দেহ হলো রাজবালার। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে ওখানে! কী হতে পারে! প্রথম কুকুরটা তখনো ঘুরঘুর করছে পায়ের কাছে, পা শুঁকছে, মাঝে মাঝে গর্-র্, গর্-র্ শব্দ করছে মুখের দিকে তাকিয়ে। এক মুহূর্ত ভাবলেন রাজবালা, ভোর হয়ে গেছে—এখন আর ভয় পাবার কিছু নেই। তারপরেই বিছুটি, মনসার ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন, কুকুরগুলোকে লক্ষ রেখে। ওপর থেকেই ঝুঁকে তাকালেন নালার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে এলো বুকের রক্ত।

দু'দিকে ঢালু হয়ে পাড় নেমে গেছে নালার দিকে। সেখানে, গভীর জলের আধ হাতটাক ওপরে মনসার ঝাড়ে আটকে আছে একটি শিশু। নালাটা গিয়ে পড়েছে নদীতে, আর একটু হলেই সম্ভবত ভেসে যেত। ফর্সা, টুকটুকে রঙ, পরনে ইজের নেই, ফাঁক-করা দু'টি পায়ের একটির পাতা নালার জল ছুঁয়েছে। মুখটা লুকিয়ে আছে ঝাড়ে, সে-জন্যে চেনা যায় না ঠিক। কুকুরগুলো নানা দিক থেকে পৌঁছুবার চেষ্টা করছে শিশুটির দিকে। বেশ দূর থেকে একটু বা ঝাপ্সা চোখে দেখা। তবু মেয়ে বলে চিনতে অসুবিধে হলো না।

খানিক স্তব্ধভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে উল্টো মুখে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন রাজবালা—ঘটিটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে।

'ও শ্যামা, ও গায়ত্রী, ও শিখা, দ্যাখ কী কাণ্ডটা হয়ে গেছে!' যেতে যেতেই চিৎকার করতে লাগলেন রাজবালা, 'হে ভগবান, কাদের এমন সর্বনাশ হলো রে—'

ওদিকের রাস্তা দিয়ে ছিপ্ হাতে হেঁটে যাচ্ছিল দুটো লোক। চিৎকার শুনে ছুটে এলো তারা।

'কী হলো মাইজী, চিৎকার করছেন কেন?'

একটি নিঃশব্দ হাত নালার দিকে তুলে ইঙ্গিত করলেন রাজবালা। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে বেরিয়ে আসবে বুক থেকে। তিনি দাঁড়ালেন না।

॥ পাঁচ ॥

পৃথিবীর পবিত্র জল, হাওয়া, ভালোবাসায় নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিল নিষ্পাপ একটি শিশু। সাতটি বছর চেনাজানা সকলের বিস্তর আদর-আহ্লাদ কেড়েছিল সে। ক্রমশ মুহ্যমান হয়ে-আসা এ-শহরের মানুষগুলির কোনো কোনো বুকে এনে দিয়েছিল একটুখানি স্বস্তি, একমুঠো খুশি। এর বেশি আর কিছু দেবার ছিল না তার। মৃত্যুর পরও রুক্ষ ফণি-মনসার কাঁটা মমতাময় বুকে আঁকড়ে ধরেছিল তাকে, সারা রাত আড়াল করে রেখেছিল ক্রুদ্ধ জলের হাতছানি থেকে। সারা রাত শেয়ালের আক্রমণ পাহারা দিয়েছে ছন্নছাড়া কুকুরগুলো। পরিশ্রান্ত, এখন তারা ছড়িয়ে পড়েছে দূরে দূরে। ফুটফুটে মেয়ে টুসি—এখন তাকে দেখতে চারিদিক থেকে নদীর ধারে ছুটে আসছে মানুষ—মানুষের পর মানুষ, অসংখ্য মানুষ। বহু দিন পরে এ-শহরে চাক্ষুষ করার মতো একটা ঘটনা ঘটল!

এখনো সেই একই জায়গায়, একইভাবে পড়ে আছে টুসি। অশোকরা তুলে আনার কথা ভেবেছিল, গণেশ ডাক্তার বারণ করলেন। পুলিস কেস, পুলিস না আসা পর্যন্ত কিছু করা ঠিক হবে না।

কী হয়েছে এখন তা মোটামুটি সকলেরই জানা। গণেশ ডাক্তার এসেই নীলু বোস আর অশোককে নিয়ে নেমে গিয়েছিলেন নিচে। দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর মুখ। 'আমার মনে হয়,' থেমে থেমে বললেন, 'রেপ্ করা হয়েছিল, সি কুড্ নট বিয়ার ইট্। দেখে তো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে। তারপর এখানে এনে ফেলে দিয়েছে। ভেসে যাবারই তো কথা—'

পুলিস হয়তো এখুনি এসে পড়বে। বিনয়বাবু নিজে পুলিস-সুপারকে খবর দিয়েছেন। নালার ধারে আমগাছের গুঁড়িতে বিষণ্ণ মুখে বসেছিল ক'জন। নীলু বোস অনেকক্ষণ থেকেই একটা সিগারেট ধরাবো ধরাবো করছে, ধরাচ্ছে না। এখন বলল, 'অশোক, খাবে নাকি একটা?'

অশোক মাথা নাড়ল। গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছিল না সে—অথচ অনেকক্ষণ থেকেই ভাববার চেষ্টা করছে একটা কিছু; টুসি নয়, মনে পড়ছে বাণীদি আর কল্যাণদার মুখ। সে-দু'টি মুখও অস্পষ্ট, পুরু কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন হয়। কল্যাণদাকে আসতে দেওয়া হয়নি। কাল রাত থেকেই ঘন ঘন ফিট হচ্ছে বাণীদি। সম্ভবত খবরটা এখনো জানে না। অন্যমনস্কতা থেকে একবার চোখ তুলে অশোক দেখতে পেল আমতলায় দাঁড়িয়ে আছে শ্যামশ্রীরা তিন বোন। খুব আবছাভাবে গতকালের ঘটনা মনে পড়ল তার।

'তুই তা হলে ঠিকই সন্দেহ করেছিলি।' সুশান্ত হঠাৎ বলল, 'ভাবছি লোকটা হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল কী করে! পালাতে চাইলে আগেই তো পালাতে পারত!'

নীলু বোস বলল, 'আগে হয়তো ভেবেছিল কেউ সন্দেহ করবে না—'

'পালিয়ে যাবে কোথায়! পুলিস ঠিকই খুঁজে বার করবে।' নীলু বোসের হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল বিজন। ঠোঁটে সিগারেট গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'পালিয়ে অবশ্য ভালোই করেছে। না হলে আমার হাতেই খুন হতো!'

'তুমি যখন শঙ্করকে দেখেছিলে এদিকে, বুঝলে অশোক, তার আগেই তা হলে বাস্টার্ডটা সব কাজ সেরে ফেলেছে!'

এসব আলোচনা ভালো লাগছিল না অশোকের। নীলু বোসের কথায় সাড়া না দিয়ে

প্রতাপকে খুঁজল। প্রতাপ বসে আছে একটু দূরে, মাথা নিচু ; দু' হাতে চেপে রেখেছে ডান পায়ের হাঁটুটা। মুখ দেখেই বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে ছেলেটা।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পায়ের ব্যথা কেমন ?'

একটু বা অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল প্রতাপ, যার অর্থ ; না। মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।

'ডাক্তার দেখিয়ে নিও। তোমার তো পা-ই সব—'

লোকজন এখনও আসছে একটি দু'টি করে : কেউ কেউ চলেও যাচ্ছে। ঠিক এতোগুলো লোকের একত্র সমাবেশ ভাসানের সময় ছাড়া হয় না এদিকে—শহরের নির্জনতম অংশটি তখন বিশ্রাম পায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে ; ঢাকিদের উদ্দাম ও একাগ্র ছড়ি পেটানোর শব্দে গাছগাছালির নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে পাখিরা ক্রমাগত উড়ে যেতে থাকে আকাশে। ধুনো আর গুগ্‌গুলের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে হাওয়া। কাশবন যতো দূর যায় প্রায় ততো দূর অব্দি অন্যমনস্ক হয়ে থাকে দৃষ্টি। সন্ধে হয়। ফেরার রাস্তায় স্মৃতি জুড়ে বেজে চলে বিসর্জন।

ভাঙা, শুকনো একটা গাছের ডাল তুলে মাটিতে পরপর কয়েকটি আঁচড় কাটল অশোক। ভালো হতো যদি এইভাবে আটকে না থেকে জলে ভেসে যেত টুসি। এইভাবে থেকে, ধনুকের মতো বেঁকে-ওঠা জঙ্ঘার রক্তের চিহ্ন দেখিয়ে সে যেন বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে এও মানুষেরই কাজ। তোমরা এর প্রতিবাদ কোরো ! কী-রকম প্রতিবাদ ? শঙ্করলাল নিশ্চিত ধরা পড়বে, নিশ্চিত শাস্তি পাবে—হয়তো ফাঁসিও হবে তার, একজন খুনীর : অবোধ একটি বালিকাকে বলাৎকার করে হিংস্র নদীগর্ভে ছুঁড়ে দিতেও যার বুক কাঁপেনি ! কিন্তু কী হবে সেই মানুষটির—জন্ম থেকে হয়তো মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দিনের পর দিন পরম যত্নে যে আগলে রেখেছিল টুসিকে, নির্বিকার হাসিমুখে বারবার তুলে নিয়েছিল কাঁধে !

একসঙ্গে দু'টি মৃত্যু জড়িয়ে যায় পরস্পরের সঙ্গে। কিছুতেই মেলানো যায় না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জিপটা এসে পড়ল। আমতলা ঘুরে চলে এলো নালার ধারে। পিছনে একটা ভ্যান। জিপ থেকে নেমে ভিড় সরাতে সরাতে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে এলেন সুপার। ঠিক জায়গাটায় এসে পাড়ে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।

'পুওর চাইলড্ !' গণেশ ডাক্তার পাশেই দাঁড়িয়ে। তাঁর দিকে তাকিয়ে সুপার বললেন, 'আই ক্যান সি ইট ! হাও ওল্ড ওয়াজ সি ?'

'কতো বয়স হয়েছিল হে ?' অনির্দিষ্টভাবে অশোকদের দিকে তাকালেন গণেশ ডাক্তার, 'সাত-আট হবে ?'

নীলু বোস বলল, 'সাত।'

হাতের ছড়িটা বগলে চেপে, পকেট থেকে নোট বই বের করে কী টুকলেন সুপার। তারপর সঙ্গের লোকগুলিকে ইশারা করলেন বডি তুলে নিতে। দু'টি লোক সাবধানে নেমে গেল নিচে।

অশোক ভেবেছিল তাকাবে না। তবু পাঁজাকোলা করে টুসির দোমড়ানো শরীরটাকে যখন ভ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, চোখ ফেরাতে পারল না। ঊর্ধ্বে তাকানো একটা স্থির চোখ দেখতে পেল সে, সম্ভবত কাঁটার আঘাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মুখের একটা

দিক, ফ্রক, হাত ও পা কাদায় মাখামাখি। নাক ও মুখের কষ বেয়ে তখনো গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

দৃশ্যটা নতুন করে ভাবান্তরিত করল না তাকে। টুসির পিছনে পিছনে প্রায় গোটা ভিড়টাই মন্ত্রপূতের মতো এগোতে লাগল গাড়ির দিকে।

সুপার বললেন, 'আপলোগো সে কোই সাথ মে আ সকতে হেঁ। বডি মর্গ মে যায়েগা, উস্‌কে বাদ রিলিজ হোগা।'

বিনয়বাবু নীলু বোসকে যেতে বললেন। অশোক বিজন, সুশান্তকেও ইশারা করল। প্রতাপ যাবে না। সে তখনো বসে আছে দূরে, এতোক্ষণের ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে—মাঝে মাঝে হাঁটু চেপে ধরছে, কখনো হাত বোলাচ্ছে পায়ে। অশোক ভাবল, প্রতাপকে একটা রিক্সায় তুলে দিয়ে সেও যাবে মর্গের দিকে। ইতিমধ্যে একবার কল্যাণদার বাড়ি ঘুরে যাওয়া দরকার।

বাদামতলা ধরে ভ্যানটা চলে যাচ্ছে ; লোকজনও ফিরতে শুরু করেছে। সুপারও যাবার মুখে। কী ভেবে সামনে এগিয়ে গেলেন বিনয়বাবু।

'সুপারিন্‌টেনডেন্ট্‌ সাব, আই হ্যাভ এ রিকোয়েস্ট—'

'জী ?'

'ইয়ে পোস্টমর্টেম অ্যাভয়েড নহি কিয়া যাতা ?' ইতস্তত করে বললেন বিনয়বাবু, 'উস্‌কি পেরেণ্টস্‌ কা বাত শোচিয়ে, দে উইল হ্যাভ অ্যানাদার শক্‌।'

'বাত তো ঠিকই হ্যায়। লেকিন, অ্যাজ ইউ নো, পোস্টমর্টেম ইজ এ ফর্মালিটি। ইয়ে ডিসিসান সিভিল সার্জনই লে সকতে হেঁ—'

'কেস্‌ তো সিধাই হ্যায়—', গণেশ ডাক্তার বললেন, 'উই ক্যান রিকোয়েস্ট দি ডক্টর।'

'আই'ল অলসো রিকোয়েস্ট।' আশ্বস্ত করার গলায় বললেন সুপার, 'মেরে খেয়াল, ইস্‌মে কোই প্রবলেম নহি হোগা। ডাক্তারসাব, আপ সাথ আইয়ে না !'

'সেই ভালো, ডাক্তারবাবু। আপনিও সঙ্গে যান।' গণেশ ডাক্তারের পিঠে হাত রাখলেন বিনয়বাবু, 'কল্যাণ আর বাণীকে একটু রিলিফ যদি দিতে পারি এইভাবে। আর কী করতে পারি, বলুন !'

অশোক লক্ষ করল, বিনয়বাবুর ঠোঁটে এখনো সেই ক্ষীণ হাসিটুকু লেগে আছে, কাল রাতে যেটা তাকে অবাক করেছিল। ভদ্রলোক কি কখনও ভাঙেন না ? নাকি ক্রমশ অভ্যস্ত হতে হতে ওই হাসিটুকুও আজ তাঁর শরীরের অংশ !

গণেশ ডাক্তারকে নিয়ে পুলিস-সুপার চলে যেতে আবার নির্জনতায় ফিরে এলো বাদামতলা। নদীটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, সূর্যের আলোয় ঘোলাটে জলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে মাছের আঁশের মতো টুকরো টুকরো আভা। নদীর তীর ঘেঁসে বহু দূর ব্যাপ্ত সবুজের মধ্যে থেকে প্রায়ই ডেকে উঠছে এক-একটা পাখি ; জিপটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে নেমে এসেছে কয়েকটা গাঙশালিক—কিচির-কিচির শব্দ তুলে ঘুরছে চক্রাকারে। কে বলবে একটু আগেই এখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল ; মানুষের পর মানুষ ছুটে এসেছিল সরল একটি শিশুর মৃত্যুর মধ্যে নিজেদের প্রত্যক্ষ করতে।

'অশোক, যাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ। চলুন।'

আমতলা দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে শ্যামশ্রীরা ; পরপর তিনটি বোন। শাড়ির রঙ

ছাড়া পিছন থেকে ওদের প্রায় একই রকম দেখায়। কাল রাতে গায়ত্রীকে কাঁদতে দেখেছিল সে ; বাণীদি এখন অনেক দিন ধরে কাঁদবে—হয়তো নির্জনে, নিঃশব্দে, একা একা। তবু কাঁদবে। হঠাৎই মনে পড়ল অশোকের, গত ক'দিনের বৃষ্টি আশঙ্কায় ভরে তুলেছিল তাকে। সম্ভবত এখনো তার জের চলছে।

জায়গা থেকে সরে এসে নালার ধারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতাপ। আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল অশোক। নরম মাটি এখনো ধরে আছে টুসির পুরো শরীরের ছাপ। শক্ত মুঠোয় প্রতাপের হাতটা চেপে ধরল সে।

'চলো—'

প্রতাপ কিছু বলল না। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো। অশোক দেখল ছেলেটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

'স্প্রেনট্রেন হয়নি তো ? কিছু না হলে ব্যথা হবে কেন ?'

অল্প দূরে বিনয়বাবু। কথাটার জবাব না দিয়ে প্রতাপ বলল, 'আপনারা কি হাসপাতালে যাচ্ছেন ?'

'দেখি। ভাবছি, কল্যাণদার ওখান হয়ে যাবো। তুমি একটা রিক্সায় ওঠো।'

'আপনারা এগোন, আমি এক বন্ধুর বাড়ি হয়ে যাবো। কাছেই—'

কলেজের প্রিন্সিপাল, সম্ভবত বিনয়বাবুকে এড়িয়ে যেতে চাইছে প্রতাপ। ব্যাপারটা অনুমান করে নিল অশোক। তার নিজেরও কিছুক্ষণ থেকে সিগারেট ধরানোর কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু বিনয়বাবু সঙ্গে থাকায় সেটা আর পারা যাবে না। বয়সে অনেক বড়ো ভদ্রলোক। তার সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা নেই, তবু সম্পর্কে আরো বড়ো। খানিক দূর চুপচাপ এগিয়ে এসে অশোক বলল, 'স্যার, রিক্সায় যাবেন নাকি ?'

'কেন ? হাঁটাই তো ভালো। তুমি কি টায়ার্ড ফিল করছ ?'

বিনয়বাবুর কাদামাখা জুতো ও আধময়লা খদ্দরের ধুতির দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, 'আমি আপনার কথা ভাবছিলাম। কাল রাত থেকেই ছুটোছুটি করছেন।'

'তাতে কী। টায়ার্ড হইনি।' নিঃশব্দ, প্রাণখোলা হাসিতে ভরে গেল বিনয়বাবুর মুখ। 'ডোণ্ট আণ্ডারএস্টিমেট মি। আমি তোমাদের চেয়ে কম ইয়াং নই।' একটু থেমে বললেন, 'বেশ তো ফ্রেশ এয়ারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ওয়েদারটা বেশ ভালো হয়েছে হে—'

'হ্যাঁ। যা বৃষ্টি গেল—'

এরপর কথা বললেই টুসির কথা উঠবে ; এসে পড়বে কল্যাণদা আর বাণীদির কথা। পরপর কথা সাজিয়ে এখন তারা অনেক দূর যেতে পারে। কিন্তু, সত্যিই কি আর কোনো মানে আছে এসব কথার। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, মর্গের অন্ধকার টেবিলে তার বিকৃত শরীর নিয়ে হয়তো এখন শুয়ে আছে টুসি। আর এসব ভাবতে ভালো লাগে না। এই শহরে চাকরি নিয়ে আসার পর থেকেই এই হাসিখুশি পরিবারটার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল সে—আদ্যন্ত শোকের মধ্যে এখন থেকে তাকেও নিঃশ্বাস নিতে হবে মাঝে মাঝে। এর মধ্যে নতুন করে দুঃখের কথা তুলে লাভ নেই কোনো।

অশোক একটা নতুন প্রসঙ্গ খুঁজে নিল। জানার ইচ্ছেও ছিল।

'স্যার, হরেন ঘোষের ছেলেকে নিয়ে যে গণ্ডগোলটা হচ্ছিল কলেজে, সেটা মিটে গেছে ?'

'না। কোথায়।' ঈষৎ অবাক ভাব নিয়ে তাকালেন বিনয়বাবু, 'তুমি কোথায় শুনলে ?'

'কল্যাণদার কাছে—'

'ঠিকই শুনেছ। ছেলেটা মহা পাজি হে। লেখাপড়া করে না, তার ওপর নানা রকম কমপ্লেন্‌ট্‌ আছে। ল্যাবোরেটরি থেকে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ইনসট্রুমেন্ট সরিয়েছে। পুলিসে দেওয়াই উচিত ছিল। ভাবলাম, ভদ্রলোকের ছেলে—। আমি শুধু রাসটিকেট করেছি।'

'হরেন ঘোষ আপনাকে শাসিয়েছে শুনলাম ?'

'শাসিয়েছেন মানে! একেবারে থ্রেট করে গেছেন। বললেন, তিনি নাকি লোক্যাল বাঙালী, এখানকার লোকদের সঙ্গেও খাতির আছে। বাইরে থেকে এসে আমি যেটা করছি সেটা ভালো নয়। অর্ডার তুলে না নিলে ফল খারাপ হবে। কল্যাণ তো ছিল সে-সময়—'

'আপনি কিছু বললেন না!'

'বললাম, আমার যা বলার বললাম।' শব্দ করে হাসলেন বিনয়বাবু। ওপরে হাত ছুঁড়ে ঢোলা পাঞ্জাবির হাতাদুটো কনুই পর্যন্ত নামিয়ে এনে গোটাতে গোটাতে বললেন, 'আমি বললাম—ঠিক হ্যায়। আপনি বাঙালী, আমিও বাঙালী—শুধু বাঙালীই নই, আমি ঢাকার বাঙাল। আই নো হাউ টু ফেস্‌ ইট্‌। আপকা যো ভি ইচ্ছা কর সক্‌তে হেঁ।'

অশোক বলল, 'আশ্চর্য!'

'না, দ্যাখো তুমি ভেবে, দি ফাদার ইজ স্টিল প্রাউড অফ হিজ সান। ছেলে যে অন্যায় করেছে সেটা একবারও স্বীকার পর্যন্ত করলেন না!'

'বেশির ভাগ লোকই ওই রকম—'

অশোক কথাটা শেষ করতে পারল না। ঢালু কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল উল্টো দিক থেকে দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে নেমে আসছে বিষাণ। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে মোটরের কালিঝুলি মাখা খাকি পোশাক, একটা জ্বলন্ত বিড়ি কামড়ে রেখেছে দু' দাঁতের ফাঁকে। ওদের কাছাকাছি এসে ঝোঁকের মাথায় ব্রেক কষল।

'কল্যাণবাবুর মেয়েকে নাকি রেপ্‌ করে মেরে ফেলেছে ?'

একটু বিব্রত হলো অশোক। তারপর শান্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ—'

'বডিটা কোথায় পাওয়া গেল ?'

'তোমাদের বাড়ির কাছে, বড়ো নালায়।'

'তোমরা ফিরছ বুঝি! ইস্‌, মাল খেয়ে আমি শালা ন'টা পর্যন্ত ঘুম মারলাম। দেখা হলো না!'

বিনয়বাবু একটু সরে দাঁড়িয়েছেন। ইশারায় বিষাণকে চুপ করতে বলল অশোক।

'তুমি নাকি কালীটোলায় ঘর নিয়ে আলাদা থাকছ ?'

'আরে সে অনেক ব্যাপার। পরে বলব।' সম্ভবত ভুলটা বুঝতে পেরেছিল বিষাণ ; এখন নিজে থেকেই যাবার জন্যে তাড়া দেখাল। 'কিছু হেলপ্‌-টেলপ্‌ দরকার হলে বলো। ইস্‌—'

চলে গিয়েও বারবার পিছনে তাকাচ্ছিল বিষাণ। বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটি কে হে ?'

'আপনি কি চিনবেন ?' অশোক বলল, 'হরবিলাস ভাদুড়ীর ছেলে—'

'হরবিলাস ভাদুড়ী! তিনি তো একটা মিথ্‌ হে! তো, তাঁর ছেলে এ-রকম ?'

অশোক হাসতে হাসতে বলল, 'বিষাণদা ছেলে খারাপ নয়। একটু পাগলাটে, এই যা—'

হাঁটতে হাঁটতে কখন মিশনারি রোডেরও অনেকটা চলে এসেছে খেয়াল হয়নি। কল্যাণদের বাড়ি খুব দূরে নয় ; এখান থেকে বাঁ দিকে ঘুরতে হবে। এতোক্ষণ প্রায় ভুলে ছিল ঘটনাগুলো, আবার তারা ফিরে এলো একে একে, একসঙ্গে। অশোক দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ভেবে বলল, 'স্যার, আপনি তো কল্যাণদার বাড়ি যাবেন। আমি একটু অফিসে ঘুরে আসছি। আজ আসব না—খবরটা দিতে হবে।'

'বেশ তো। তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো।'

অশোক কয়েক পা এগিয়েছিল, বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পিছু ডাকলেন বিনয়বাবু, 'ও হে, শোন, শোন—'

'কিছু বলবেন ?'

'এখানে তুমি থাকো কোথায় ?'

অশোক বলল, 'ঘোড়া আস্তাবল চেনেন ? সাহেবের রেস্টুরেন্ট ? ওরই কাছাকাছি একটা ঘর নিয়ে থাকি।'

'তুমি তো কলকাতার ছেলে।' সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখলেন বিনয়বাবু, 'কল্যাণরা একটু সেটেল হয়ে নিক, তারপর একদিন আমার বাসায় এসো। গল্প করা যাবে। আমার লাইফের টোয়েন্টিএইট ইয়ারস্ কেটেছে ওই কলকাতায়—'

'আসব স্যার, নিশ্চয়ই আসব।'

বিনয়বাবু চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল অশোক। এতো দুঃখের মধ্যেও চোখে কৌতূহল নিয়ে ভদ্রলোককে দেখছিল সে। শুধু বাঙালীই নন, ঢাকার বাঙাল ! মানুষ এখনো তবু নিজের বুক থেকে জোর পায়, ভাবল অশোক. কল্যাণদা এঁরই ছাত্র ছিল। মানুষের সঙ্গ যদি কিছুও দেয়, তা হলে এই মানুষটির সান্নিধ্যে হয়তো কল্যাণদা আর বাণীদি কিছুটা সান্ত্বনা পাবে।

॥ ছয় ॥

একদিন বৃষ্টি এসেছিল ভাসিয়ে দেওয়ার রূপ নিয়ে। তারপরে মৃত্যু। দুই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হয়ে গোটা শহরটাই ঝিমিয়ে থাকল কিছু দিন। আপাতচোখে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়তো হয়নি, তবু কেন যেন মনে হয়, রাস্তার আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়েছে আরো ; রোদ্দুরে দাঁড়াতে লোকজন আর তেমন করে বেরিয়ে আসে না বাড়ি থেকে, সন্ধে হতে না হতেই ঘুম আর আচ্ছন্নতায় ঢলে পড়ে পুরনো, রঙচটা বাড়িগুলো।

ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হলো নীলু বোসের বোনের বিয়েতে। প্রচুর আয়োজন সত্ত্বেও দেখা গেল প্রায় অর্ধেক লোক আসেনি ; বিশেষত কল্যাণদার পাড়ার কেউই এলো না। অযোধ্যাপ্রসাদের ছেলের অন্নপ্রাশন হবার কথা ছিল, কোন দিল্লি থেকে ওরা বাড়িতে এসেছিল সেই জন্যে—সব উৎসব বন্ধ করে দিলেন মিশিরজী। কল্যাণ অনেক অনুনয় করেছিল, বিনয়বাবুও। মিশিরজীর সেই এক কথা : না।

ইতিমধ্যে আরো কিছু কিছু ঘটনায় স্তব্ধ শহরের জীবনে চাঞ্চল্য এলো একটু।

স্টেশনের রাস্তায় থাকে হরিদাস কবিরাজ। শহরের চেনাজানা লোকগুলিকে ফাঁকি দিয়ে গেল বছর কলকাতায় গিয়ে বিয়ে দিয়েছিল বড়ো ছেলের। লোকে কানাকানি করেছিল, হরিদাস কবিরাজের পুত্রবধূ নাকি খুব বড়োলোকের মেয়ে। টুসি মারা যাবার দিন দশেক পরে হাসপাতালে একসঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসব করল সে। সকলেই মজা পেল খুব। হরিদাস গিয়েছিল মাছের বাজারে। কে নাকি শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, 'শুধু মেয়েই বড়োলোকের নয়, পেটের খোলটাও বড়ো। বুঝুক এবার ঠেলা! তিনটের মুখের অন্ন জোগাতেই ভিটেমাটি বিকোবে!'

তার পরের ঘটনা বঙ্কিম দাসের স্ত্রীর স্পিরিট খাওয়া। বঙ্কিম দাস নিরীহ লোক। বাজারে তার অনেক দিনের পুরনো কাপড়ের দোকান, চলেও খুব। আগে ধুতি পরত, পসার হবার পর ধুতি ছেড়ে প্যান্ট ধরেছে; তবু ক্যাশবাক্সটা বদলায়নি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দেখা যায় ক্যাশবাক্সের আশেপাশে ধূপ জ্বালিয়ে চুপচাপ বসে আছে বঙ্কিম দাস, খদ্দেররা আসছে যাচ্ছে; তিনটি সেলসম্যান তাদের দেখাশোনা করতে ব্যস্ত। বঙ্কিমের বাড়ির পাশে থাকে এক মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ; বঙ্কিমের বউয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে কানাকানি চলে উৎসুকদের মধ্যে—তবু ব্যাপারটা ঠিক ঠিক ধরতে পারে না কেউ। স্পিরিট খাওয়া নিয়ে রটনা হলো। সে-খবর সাহেবের রেস্তোরাঁতেও পৌঁছুলো। আড্ডায় বসে বিজন বলল, 'খাক আর যাই করুক, যাই বলিস, মহিলা খুব স্পিরিটেড্। বঙ্কিমের মতো ন্যালাক্ষ্যাপা নয়।' গুরুতর কিছু না ঘটায় সেইখানেই চাপা পড়ে যায় ব্যাপারটা।

শ্যামশ্রী একদিন বলল, 'দিদির নামে কে উড়ো চিঠি পাঠাচ্ছে বলুন তো?'

বেশ চিন্তিত মুখে কথাটা বলল শ্যামশ্রী। পোস্টাপিসে টাকা তুলতে এসেছিল। অনেক দিন যাওয়া হয় না ওদের বাড়ি।

'ও নিয়ে ভেবো না। নিশ্চয়ই কোনো চেনাশোনা লোকের কাজ।' ওকে আশ্বস্ত করে বলল অশোক, 'তোমরা এখনো মরোনি. লোকের কাছে হাত না পেতে গায়ত্রীদি এখনো টেনে নিয়ে যাচ্ছে সংসারটাকে, এটা হয়তো অনেকেরই সহ্য হয় না!'

শ্যামশ্রী কাঁদতে ভালোবাসে। কাঁপা গলায় বলল, 'আমাদের যে কী হবে, অশোকদা!'

অশোকের ভাবান্তর ঘটে না তবু। খুব নিরপেক্ষভাবে সে তাকিয়ে থাকে এই শহরটার দিকে, শহরের মানুষগুলির দিকে। মাঝে মাঝে ভাবে এদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী! কাজ নিয়ে এসেছিল একদিন, অনেক দিন থাকাও হলো। একদিন চলেও যাবে হয়তো, বিক্ষত রাস্তা আর জীর্ণ বাড়িগুলো তাদের বিক্ষিপ্ত মানুষগুলিকে নিয়ে পড়ে থাকবে পিছনে! ভাবে, দ্যাখে; দেখতে দেখতে একসময় তাৎক্ষণিক নিরপেক্ষতা থেকে ঢুকে পড়ে প্রাণের মধ্যে, স্মৃতি আর সক্রিয়তার মধ্যে। হঠাৎ খেয়াল হয় সে হাঁটছে এদেরই সঙ্গে—নাকে এসে লাগছে এদেরই শরীরের সুখদুঃখস্মৃতিময় পুরনো গন্ধ!

রবিবার সকালে সুশান্ত, বিজনরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল রিহার্সালে। ক'দিন চুপচাপ থাকার পর আবার নতুন উদ্যমে মেতে উঠেছে সকলে। পুজোর আর মাত্র দেড় মাস বাকি। অন্যান্যবার সে খানিকটা দায়িত্ব নেয়। এবারও নিয়েছিল; এখন আর তেমন উৎসাহ দেখায় না।

আজ তবু গিয়েছিল। ফেরার পথে কল্যাণদার বাড়ি ঘুরে এলো। বাণীদিকে দেখে মনে হলো কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে—রোজই নতুন নতুন লোক আসে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেটে যায় সময়। খবর পেয়ে পাটনা থেকে ছুটে এসেছিল বাণীদির ছোট বোন, সে

এখনো আছে ; হয়তো আরো কিছু দিন থাকবে। কল্যাণদা চাপা মানুষ—সেই প্রথম দিনই ওকে যা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হতে দেখেছিল অশোক। এখন আর কিছু বোঝা যায় না। স্মৃতির যতো কাছে আসে, ততোই ক্রমশ দূরে চলে যায় টুসি।

বিকেলে ঘরের সামনে বারান্দায় বসে সাইকেলের চাকা ঠিক করছিল অশোক। ক'দিন ধরেই একটু একটু টাল খাচ্ছে চাকাটা। স্পিড নেয় না, হ্যাণ্ডেল ছাড়লেই ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যায়। চেনা দোকান থেকে যন্ত্রপাতি চেয়ে এনে আজ সে নিজেই বসে গিয়েছিল সারাতে। এমন সময় বিষাণ এলো। সেই একই রকম কালিঝুলি মাখা পোশাক, রুক্ষ চেহারা। তফাত বলতে দাড়িটা কামানো।

'আরে, বিষাণদা!' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল অশোক, 'কী মনে করে!'

'আঃ! বড়োই সন্দেহবাতিক তোমার!' অশোকের হাসি দেখেও হাসল না বিষাণ। 'তা তুমি হঠাৎ এসব নিয়ে পড়লে যে! এ তোমার কাজ নাকি?'

'কেন? দোষ হয়!'

'আমাকে বলো, করে দিচ্ছি। এসব আমাদের মতো মিস্ত্রি-টিস্ত্রিরা করবে। তুমি হলে গিয়ে—'

বিষাণ বসতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে অশোক বলল, 'থাক, থাক। হয়ে গেছে। এসো, ঘরে এসো।'

চটি খুলে তক্তপোশের ওপর জুত হয়ে বসল বিষাণ। পকেট থেকে নতুন ক্যাপস্টানের প্যাকেট বের করে হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলল, 'খাবে নাকি?'

'কী ব্যাপার বলো তো, ক্যাপস্টান খাচ্ছো!'

'ব্যাপার আবার কী! কিছুই না।' সিগারেটে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বিষাণ, 'ভুসিবাবু ডেকেছিল, গাড়িতে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে। শালা একেবারে মক্ষীচোষ! তিন ঘণ্টা খাটিয়ে মোটে দশ টাকা দিলে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল—ভাবলাম তোর এখানে আসি, অনেক দিন দেখা হয় না। সিগারেটটা শখ করে কিনলাম। খা না একটা—'

বিষাণ সম্বোধন ঠিক রাখতে পারে না ; কখনো 'তুমি' বলে, কখনো 'তুই'। বসে বসে হাঁটু নাচায়। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে ওর মুখের ওপর চোখ রাখল অশোক। রঙ একটু ফর্সা হয়তো, তবু সেই একই আদল। চওড়া কপালে আর তীক্ষ্ণ নাকে অদ্ভুত মিল। বিষাণের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হতে শুরু করল অশোক।

'বিষাণদা, খেয়েছো কিছু?'

'খেয়েছি।' ধোঁয়া মুখে হাসল বিষাণ, 'ওভাবে তাকাচ্ছিস কেন! সত্যিই খেয়েছি ; রাস্তায় মুড়ি খেলাম। তোর এখানে জল আছে? তেষ্টা পাচ্ছে—'

কুঁজো থেকে গ্লাসে জল গড়িয়ে বিষাণের হাতে দিতে দিতে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী! তুমি আলাদা থাকছো! বাড়ি যাচ্ছো না কেন?'

'ও বাড়িতে প্রেস্টিজ নিয়ে থাকা যায় না। বোনের রোজগারে খাবো, কথা শুনবো! তা ছাড়া—', খেই হারিয়ে গ্লাসের তলানিটুকু উপুড় করে গলায় ঢেলে নিল বিষাণ, মুখ মুছল হাতের উল্টোপিঠে। 'ওরা বাপের নাম ডোবাচ্ছে।'

'আর তুমি বুঝি খুব তুলে ধরছো!' রুক্ষ গলায় বলল অশোক, 'কিসের প্রেস্টিজ তোমার! অর্ধেক দিন তো মদভাঙ খেয়ে পড়ে থাকো রাস্তায়। কী করেছো তুমি বোনেদের জন্যে?'

বিষাণ মিনমিন করল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

মুখ দেখে মনে হয় কথাগুলোয় আঘাত পেয়েছে বিষাণ। সম্ভবত এতো খোলাখুলি বলা উচিত হয়নি। লোকটা সত্যিই একদিন ভালোবাসত তাকে। হরবিলাস ভাদুড়ী তখনো বেঁচে—বলতে গেলে বিষাণদাই তাকে এই শহরের রাস্তাঘাট চিনিয়েছিল। অনেক ছুটির দিন দুপুরে নদীর ধারে ছিপ্ ফেলে পাশাপাশি বসে থাকত মাছের আশায়। পুরনো দৃশ্যগুলো মনে পড়ে গেল অশোকের।

বিষাণ বসে আছে মাথা নিচু করে। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'তুমি কী সাজেস্ট করছো ? যাবো ?'

'সেটা তুমি ভেবে দ্যাখো।' বিষাণের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল অশোক, 'বাড়িতে একটা বেটাছেলে থাকলে লোকে সমীহ করে। তুমি নেই, এদিকে লোকে তো যা পারছে বলছে—'

'কে কী বলেছে !' বিষাণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যারা বলছে তাদের বলে দিস বিষাণ ভাদুড়ী এখনো মরে যায়নি ! জিব খুলে নেব শালাদের !'

অশোক বুঝতে পারল কাজ হয়েছে ; বিষাণ এখন ভাববে। এখন আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না। হাসতে হাসতে বলল, 'তা হলে যাচ্ছো বাড়িতে ?'

'দেখি—'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিষাণ। অশোক ডাকল।

'তাড়া আছে নাকি ? চা-টা খেলে না ?'

'না।' বাইরের দিকে মুখ করে খানিক তাকিয়ে থাকল বিষাণ। যেন গভীর কিছু ভাবছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোর কাছে একটা দরকারে এসেছিলাম, অশোক—'

'বলো না ?'

'সাহেব আজ গ্যারাজে এসে খুব খিস্তি করে গেল। গোটা তিরিশেক টাকা পায়। আমার যা হাতটান—। তুই একটু বলে দিবি ?'

দুঃখে ম্লান মুখ বিষাণের। বসে-যাওয়া চোখের কোলে ধূসর মণিদুটো জ্বলজ্বল করছে অনুনয়ে। এই মুহূর্তে ওর ভিতর পর্যন্ত দেখতে পেল অশোক, শিকড়গুলোয় ঘুণ ধরেছে, ক্রমশ উঠে আসছে ওপরের দিকে। একদিন আচমকা ঝরে পড়বে হয়তো।

'ঠিক আছে। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না—'

'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

বিষাণ আর দাঁড়াল না। লাফিয়ে সাইকেলে উঠে স্পিড নিচ্ছিল, অশোক চেঁচিয়ে বলল, 'মাসিমাকে বলে দেব তুমি আসছো।'

এই বিকেলেই যোগসূত্রগুলো হারিয়ে ফেলে অশোক। বিমর্ষতা থেকে এক রকম ক্লান্তি আসে, যার কোনো নাম নেই। স্মৃতিও নেই। সিগারেটটা এতোক্ষণে ধরাল সে। ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে বিকেল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধে হবে। আরো কিছু কিছু দৃশ্য চোখে পড়ে। আস্তাবলে ঘোড়া ধুচ্ছে মকবুল মিঞা। ছুটির দিন বলেই হয়তো আজ সে আগেভাগে ফিরেছে। আগে দু'তিনটে ছিল, এখন ঘোড়া মাত্র একটি, তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে মকবুল। আজকাল বেশির ভাগ লোকই সাইকেল রিক্সায় চড়ে।

অশোক বেরিয়ে পড়ল। বিষাণদার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ফিরে আসার ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে মোটামুটি, এ-খবরটা রাজবালাকে দেওয়া দরকার।

বাদামতলার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আবার সে সমস্ত পুরনো গন্ধ ফিরে পায়—বৃষ্টি না হলেও মাটির, পুরনো দেওয়ালগুলোর, আর নির্জনতার। অদৃশ্য থেকে গুনগুন করে মশা। দুধ ফেরি শেষ করে ডেরায় ফিরছে ঝগড়ু গয়লা, এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ক্রমাগত লাফিয়ে ওঠে তার সাইকেল, ঝাঁকুনিতে শব্দ করে খালি ড্রামগুলো। শব্দটা অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে অশোককে। ভাবতে দেয় না কিছু। প্যাডেলের ওপর পা দুটো সক্রিয় থাকে শুধু। তারপর, ড্রামের শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেলে, হঠাৎ মনে হয়, সে বোধ হয় একটু বেশি ভাবছে আজকাল ; অকারণ প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। কেন, তার হদিশ মেলে না।

দেওয়ালের গায়ে সাইকেলটা ঠেসিয়ে রেখে নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে এলো সে। অন্ধকার থাকলেও অন্য দিন লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ে, আজ সে-রকম কিছু নেই। এমনকি শব্দও নেই। তবে কি কেউ বাড়িতে নেই !

খানিক অপেক্ষা করে জড়ানো গলায় অশোক ডাকল, 'শ্যামশ্রী আছো ?'

'কে ? অশোক ?'

'হ্যাঁ—'

'দরজা খোলা আছে। ভেতরে আয়।'

'অশোক' শুনে দ্বিধা হয়েছিল, 'আয়' কথাটা নিশ্চিন্ত করল। গায়ত্রীদি হলে 'এসো' বলত ; এ শিখা।

দরজাটা খুলে আবার ভেজিয়ে দিল অশোক। বারান্দায় তবু একটা লণ্ঠন জ্বলছে, সেই আলো দেখে ভিতরে ঢুকল। বিছানায় চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে শিখা ! এতো নিঃশব্দ চারিদিক যে বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। এমন হবার কথা নয়। বস্তুত শিখাকে আশা করেনি সে, ভেবেছিল রাজবালা অন্তত বাড়িতে থাকবেন। শ্যামশ্রীও থাকে।

'ভর সন্ধেয় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছো ! আর সবাই কোথায় ?'

'ওরা বেরিয়েছে। বোস না, এখুনি ফিরবে সবাই। চেয়ারটা টেনে নে।'

অশোক বসতে চাদরের ভিতর থেকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে শিখা বলল, 'আমার বোধ হয় জ্বর এসেছে। দ্যাখ তো ?'

অশোক ওর হাতটা ছুঁয়ে দেখল, তারপর হাত রাখল কপালে।

'বোধ হয় নয়। বেশ জ্বর আছে।' অশোক বলল, 'একা বাড়িতে দরজা খুলে শুয়ে আছো এভাবে। চোরটোর ঢুকে পড়তে পারে তো ?'

শিখা চুপ করে থাকল।

বিষাণের খবরটা শিখার কাছে দিয়েই চলে যাওয়া যায়। এখানে থাকা মানেই মন-খারাপ থেকে আরো মন-খারাপের দিকে যাওয়া। ভালো লাগে না। তবু, চলে যাবার কথা ভেবেও, উঠতে ইতস্তত করল অশোক। শিখা একা ; এইমাত্র সে তার হাত ও কপাল ছুঁয়ে প্রবল জ্বর টের পেয়েছে। যাওয়া কি ঠিক হবে ?

'তুই আসায় ভালো হলো।' অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে শিখা বলল, 'কতো দিন দেখিনি রে তোকে !'

'আমি ঠিকই আসি। সকলের সঙ্গে দেখা হয়, তুমিই থাকো না। লোকের মুখে শুনি এখানে সেখানে দেখা যায় তোমাকে !'

'আর যাবে না।' শিখা বলল, 'আমি হয়তো খুব শিগগির চলে যাবো।'

শিখার ঠিক মাথার দিকে দেওয়ালে টাঙানো হরবিলাস ভাদুড়ীর শেষ-যাত্রার ছবি—সে নিজেও আছে সেখানে। অনেকবার দেখা বলেই অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। সবচেয়ে ভাঙাচোরা মুখটি শিখার ; এমনিতে হাসিখুশি, চঞ্চল মেয়েটি পাগল হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বারণ না শুনে শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিল বাবার সঙ্গে সঙ্গে। এখন তার মুখের সম্পূর্ণ আদলটি ধরবার চেষ্টা করছে অশোক। সেখানে অন্ধকার বড়ো বেশি, ধরা যায় না।

'তুমি কি ঠিক করে ফেলেছ ?'

এতোক্ষণ মুখোমুখি ছিল। এবার পাশ ফিরতে ফিরতে ধরা গলায় শিখা বলল, 'তোকে বলছি, কাউকে বলিস না। আমার আর ফেরার পথ নেই।'

কথাটা চলে গেল মাথার মধ্যস্থল পর্যন্ত। অশোক টের পেল শিখার জ্বর ক্রমশ সংক্রামিত হচ্ছে তারও শরীরে। কিছু না বলেই সে উঠল, বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনের মাঠটা ছেয়ে গেছে অন্ধকারে ; রাশ রাশ জোনাকি উড়ে উড়ে ক্রমাগত জ্বলছে আর নিবছে। এখন বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ ; না হলে একটু আলো অন্তত থাকত। ডানদিকে আমতলা, আর একটু এগোলে নদী—এখন সবই নিরাকার। টুসির মৃত্যুর পর সে আর ওদিকে যায়নি। সেদিন রাতে শঙ্করলালের মুখোমুখি হবার পরও বুঝতে পারেনি সে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ঘাতকের সামনে! হয়তো অন্ধকারই সেদিন বিভ্রান্ত করেছিল তাকে। অন্ধকার না থাকলে হয়তো সে ঘাম ভিন্ন আরো কিছু দেখতে পেত। আজ আর বিভ্রান্ত হলো না।

'কী, চলে এলি যে!'

শিখা কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি। হঠাৎ গলা পেয়ে ওর চাদরে জড়ানো শরীরটার দিকে তাকাল অশোক।

'জ্বর হয়েছে, তুমি ঘরে যাও—'

'ভীষণ ভয় করছে, জানিস!'

শিখার কিছুবা অসহায় গলার স্বরটা আড়াল করার জন্যে ব্যস্ত হাতে সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বালল অশোক। দূর থেকে একটা রিক্সার এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। শিখাকে কিছু বলার আগেই অশোক দেখল প্রচণ্ড বেগে বাঁক ঘুরে পরপর দুটো রিক্সা মাঠে ঢুকছে। শিখা চলে গেল। সিগারেটে দ্রুত কয়েকটা টান দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল অশোক। রাজবালা নামলেন, সঙ্গে শ্যামশ্রী। পরের রিক্সাটায় গায়ত্রীদি ছিল।

'ও মা! তুমি কখন এলে ?' বারান্দায় উঠে রাজবালা বললেন, 'শ্যামা অবশ্য বলছিল তুমি আজ আসতে পারো।'

শ্যামশ্রী এখনো দাঁড়িয়ে আছে মাঠে ; মুখ ফিরিয়ে রিক্সাগুলোর চলে যাওয়া দেখছে। রাজবালাকে পাশ কাটিয়ে 'আসছি' বলে গায়ত্রী ঢুকে গেল ভিতরে। শ্যামশ্রীকে লক্ষ করে হাল্‌কা গলায় অশোক বলল, 'তুমি আজকাল হাত গুনছ নাকি, শ্যামশ্রী ?'

'শুধু হাত কেন, অনেক কিছুই গুনতে পারি।' শ্যামশ্রী উঠে এলো। তারপর যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে এমনভাবে বলল, 'আমরা বাণীদির বাড়ি গিয়েছিলাম।'

গায়ত্রী বোধ হয় লণ্ঠন জ্বালছে। একটা তুলে এনে কাছাকাছি রাখলেন রাজবালা।

'চেনাশোনা নেই তেমন। তবু ভাবলাম, এতো বড়ো বিপদ গেল—একবার যাই। উনি থাকলে সবার আগে যেতেন।'

ভিতর থেকে গায়ত্রীর গলা পেল অশোক, শিখার সঙ্গে কথা বলছে। একটু অপেক্ষা

করে সে বলল, 'একটা খবর আছে। বিষাণদা এসেছিল, কথা শুনে মনে হলো দু'একদিনের মধ্যেই বাড়ি আসবে।'

'আসবে ?' রাজবালা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন, 'গায়ত্রী, ও গায়ত্রী, অশোক কী বলছে শোন!'

গায়ত্রী বেরিয়ে এসে বলল, 'কী হলো মা!'

'বিষাণ ফিরে আসবে বলেছে! খুব ভালো খবর আনলে, বাবা!'

'দেখছো অশোক ?' রাজবালাকে লক্ষ করতে করতে পরিচ্ছন্নভাবে হাসল গায়ত্রী, 'বিষাণ বলতে মা একেবারে অজ্ঞান!'

' তা কেন হবো না, মা। তোমরা তো চলে যাবে একে একে, সে-ই থাকবে।'

রাজবালার গলা আবেগে বুজে এলো। শ্যামশ্রী বলল, 'তুমি মা আমাদের তাড়াতে পারলেই বাঁচো!'

এখন সব মুখগুলিই প্রায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মান অভিমান ছাড়িয়ে সব মুখগুলিতেই ফুটে উঠেছে অকৃত্রিম খুশি। খানিকক্ষণ আগেকার ঘটনা মনে পড়ল অশোকের। সংসার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা কম, আরো কম সুখ-দুঃখ সম্পর্কে। তবু, একটা নিঃশ্বাস চাপতে চাপতে ভাবল, তার জ্বরগ্রস্ত শরীর আর অন্ধকার মুখ নিয়ে যতো দিন না চলে যাচ্ছে শিখা, অন্তত ততো দিন বিষাণের আবির্ভাব এই পরিবারটিকে আরো এক প্রস্ত আশা দেবে, ভরসা দেবে।

অশোক ঠিক করল, ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্যে কালই আর একবার বিষাণের সঙ্গে দেখা করবে সে।

॥ সাত ॥

একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কল্যাণের। ভৌতিক নিঃশ্বাসের মতো একটা স্তব্ধতা নেমে এলো বুকে, মুখের ভিতর আড়ষ্ট হয়ে এলো জিব।

ঠিক ঘুমিয়েও যে ছিল তা নয়। অল্প তন্দ্রার মতো এসেছিল—বহু দিন হলো ক্লান্ত শরীর তাকে এর বেশি দেয় না। যে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ক্রমশ ঢলে পড়ে ঘুমে—ঘুমের মধ্যে তারাই আবার ফিরে চায় পুরনো সঙ্গ, পুরনো পরিবেশ। তন্দ্রার ঘোরে কল্যাণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে তাদের অর্থ আর ধ্বনি। এতোটুকু ব্যঞ্জনা থাকে না কোথাও। এইভাবে, আস্তে আস্তে, এগিয়ে যায় ভোরের দিকে।

আজ তার ঘুম ভাঙল অদ্ভুত একটা শব্দে। পাশে বাণী। স্তব্ধতা কেটে যেতে বুঝতে পারল বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছে সে, কান্নাটা ধরে রাখতে চাইছে শুধু নিজের শ্রুতির মধ্যে। ধ্বনিটা তাই এমন অদ্ভুত লাগে।

মশারির শূন্যে তাকিয়ে ক্রমশ সেই ধ্বনি নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করে নিল কল্যাণ। ক্লান্ত হাত তুলে রাখল বাণীর গায়ে।

'এতো দিন হয়ে গেল, তবু ওকে ভুলতে পারছি না কেন!'

কথাগুলো চলে যায় বহু দূর অব্দি। ঠিক এই কথাটিই প্রতিদিন নিজেকে জিজ্ঞেস করে

কল্যাণ। কী উত্তর দেবে! নিরুত্তর থেকে অনুভব করে বাণীর ঠাণ্ডা শরীরের আলোড়ন। কল্যাণের কথা ভেবেই সম্ভবত এতোক্ষণ নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল সে। শব্দময় হয়ে কান্নাটা এবার ছুটে যায় ঘরের দিকে দিকে।

'এভাবে পারব না। তুমি একটু বিষ এনে দাও আমাকে—'

'বাণী, চুপ করো।'

স্বরটা স্পষ্ট হলো না। হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিল কল্যাণ। উত্তাপহীন, মৌন শরীর। তবু, ভাবল কল্যাণ, বুকের যদি কোনো ভাষা থাকে বাণী তা বুঝবে। এর বেশি আর কিছুই সে দিতে পারবে না এখন। কোনো দিনই কি পারবে!

দু'টি শোকার্ত মানুষের নিঃশ্বাস অন্ধকারে ছুঁয়ে থাকে পরস্পরকে। ছুঁয়ে থাকে অনেকক্ষণ। দূরে, জেলখানার পেটা ঘড়িতে রাত দুটোর শব্দ বাজে ; সেই শব্দে আহ্লাদ জানাতে ছুটে আসে শেয়াল, জেগে ওঠে পাড়ার বিরক্ত কুকুরগুলো। মিটার গেজ দিয়ে উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছে মালগাড়ি—এঞ্জিনের শব্দটা কিছুক্ষণ লেগে থাকে কানে। সাময়িক চাঞ্চল্যের পর আবার সব কিছু ঢলে পড়ে নৈঃশব্দ্যে।

বাণী চুপ করে গিয়েছিল। স্বামীর বুক থেকে সরে গিয়ে চিত হয়ে শুলো।

'সেই জায়গাটায় একদিন নিয়ে যাবে আমাকে?'

'কোথায়?'

'যেখানে ও পড়েছিল সারা রাত!'

'যাবো। একদিন যাবো দু'জনে একসঙ্গে—'

বাণী শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না ; চুপ করে থাকল। দীর্ঘশ্বাসের শব্দে বোঝা যায় সে জেগে আছে। হঠাৎ একসময় বলল, 'অন্য কোথাও চলে যাবে বলেছিলে! কী হলো?'

'দেখি।' পাশ ফিরতে ফিরতে কল্যাণ বলল, 'রাত ভোর হতে চলল, এবার ঘুমিয়ে পড়ো।'

'ঘুম আর আসবে না—', বলতে বলতে হাই তুলল বাণী, 'দেড়টা মাস যে কোথা দিয়ে চলে গেল!'

বাণী ঠিক সেই কথাগুলো বলছে যেগুলো সে নিজেও বলতে চায়। কাকে বলবে? বাণীকে? শিশুর অভিমান নিয়ে এই মুহূর্তে বাণী উঠে এসেছে তার কাছে। অনেকবার বলা কথাগুলোই বলে যাচ্ছে একে একে। কে বোঝাবে তাকে এসব কথার অর্থ নেই কোনো!

কল্যাণ উঠে পড়ল। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমের ওষুধটা কি খেয়েছ আজ?'

বাণী সাড়া দিল না। অনুমানে বুঝে নিল কল্যাণ, খায়নি। খাট থেকে নেমে আলো জ্বালল ঘরের। বাণী শুয়ে আছে চোখে হাত চাপা দিয়ে—এতোটুকু ঘুমের ভঙ্গি নেই শরীরের কোথাও। দূরত্ব থেকে ক' মুহূর্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর ফাইল খুলে ট্যাবলেট বের করল একটা, গ্লাসটা তুলে আনল কাছে।

'ওষুধটা খেয়ে নাও।'

বাণী বাধা দিল না। বড়িটা মুখের ভিতর ফেলে দিয়ে জল খেল, গ্লাসটা আবার ফিরিয়ে দিল কল্যাণের হাতে। শুতে শুতে বলল, 'ওর ছবি আঁকার খাতাগুলো নীলা আজ খুঁজে বের করেছে। অশোককে বোলো, বাঁধিয়ে দেবে।'

'বলব। তুমি ঘুমোও—'

গলা পর্যন্ত আবেগ উঠে এলো কল্যাণের। বাণী আজ ক্রমাগত খুঁড়ে চলেছে তাকে।

নিজেকে সামলাতে তাড়াতাড়ি নিবিয়ে দিল আলোটা। বাণীর মাথার কাছে এসে বসল। আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল কপালে। বাণী চোখ বন্ধ করেছে। বুঝতে পারে ঘুম আসছে ক্রমশ। বাণী ঘুমোয়। ঘুমিয়ে পড়ে।

কল্যাণ ঘুমোতে পারে না। বুকের মধ্যে চেপে বসে আছে একটা অভিমান, পাখির মতো ডানা মুড়ে, মনে মনে হাজার কথা বলেও ওড়াতে পারে না তাকে। অভিমান থেকে দুঃখে চলে যায় সে, দুঃখ থেকে অস্বস্তিতে। বোঝে, বস্তু-পৃথিবী থেকে ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূরে—মানুষের পক্ষে অসহনীয় অন্ধকারে, এক ফাঁকা ভূমিতে, ছুটে-আসা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যেখানে শুধুই ছড়িয়ে পড়ে রূপহীন বিষাদ। এর থেকে মুক্তির উপায় নেই কোনো। আর কোনো দিন সে ফিরে যেতে পারবে না তার পুরনো সংস্পর্শে আর ঐশ্বর্যে—যেখানে আলো ছিল, হাসি ছিল, ছিল ক্লেশহীন মাধুর্য! ফেরা সম্ভব নয়।

তবু বল আনতে চায় মনে, বাণীর কথা ভেবে শক্ত করতে চায় নিজেকে। ভাবে, স্থৈর্যই মনুষ্যত্ব ; সহনশীলতাই তার বেঁচে থাকার আধার। ব্যক্তি হিসেবে তার সুনাম আছে। একটি ছোট্ট মেয়ের অভাব তবু তাকে সাধারণ করে রাখে। ভাবে, চলে যাবে। টুসির স্মৃতিময় এই স্তব্ধ শহরে থেকে আর কোনো দিন সে সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারবে না।

ঘুমের মধ্যে অস্ফুট শব্দ করে পাশ ফিরল বাণী। চারিদিকের শব্দহীনতায় বাণীর নিঃশ্বাসই এখন একমাত্র শব্দ। খুব মমতায় স্ত্রীর কপালে নিজের গালটা নামিয়ে আনল কল্যাণ। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এলো বিছানা ছেড়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

একটু আগেই সময়ের হিসেব দিয়েছিল বাণী, বলেছিল, দেড়মাস। তবু মনে হচ্ছে মাত্র গতকালের ঘটনা। এক্সপ্রেসটা লেট করেছিল সেদিন। ট্রেন থেকে নেমে তাড়াহুড়ো করে ে এগিয়ে যাচ্ছিল গেটের দিকে ; দেখল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বিনয়বাবু। সেই মুখ, সেই হাসিতে উজ্জ্বল দু'টি চোখ।

কল্যাণ কিছু বলবার আগেই হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন বিনয়বাবু।

'কী, হলো তোমার মিটিং ?'

স্বভাবতই একটু অবাক হয়েছিল কল্যাণ। বিনয়বাবুর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায়নি। পরে ভেবেছিল, হয়তো এই ট্রেনেই আসছেন কেউ, নিতে এসেছেন।

'আপনি স্টেশনে !'

'এই, এসেছিলাম।' এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হতে দেখেছিল তাঁকে। তারপরেই বললেন, 'কাজ হয়ে গেছে। চলো, বাইরে যাই।'

রিক্সায় উঠেছিল দু'জনে। কথা হলো বৃষ্টি নিয়ে। খানিক দূর এসে বললেন, 'কল্যাণ, আমি তোমাকেই নিতে এসেছিলাম। টুসিকে হঠাৎ পাওয়া যাচ্ছে না।' বলে তাকালেন আবার, একটা হাত চেপে ধরলেন মুঠোয়। 'বাণী একটু আপসেট হয়ে পড়েছে। হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাবে। ইউ থিংক অফ বাণী, একদম স্টেডি থাকবে—'

তখনই মনে হয়েছিল রিক্সাটা ছুটে যাচ্ছে পিছন দিকে। চৈতন্য জুড়ে নেমে আসছে শৈথিল্য। কী বলেছিল সে, বিশ্বাস করি না !

একটা সিগারেট মুখে দিল কল্যাণ। আগে খেত না ; ক'দিন হলো শুরু করেছে। যখন ঠোঁট কাঁপে, ভারী হয়ে ওঠে চোয়াল দুটো, তখন মাঝে মধ্যে এক-আধটা খায়। বুক ভরে টেনে নেয় কড়া তামাকের গন্ধ।

ভোর হয়ে আসছে। পায়চারি করতে করতে কল্যাণ দেখল, প্রায়ান্ধকার বাগান থেকে উড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা মথ্। শিউলির গন্ধ নিয়ে এলোমেলো বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। প্রতাপদের বাড়ির পিছনে ঝাঁকড়া গাছটায় অচেনা শব্দে ডেকে উঠল কাক, সম্ভবত ভোর সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত নয়। মনে পড়ল প্রতাপকে। কী যে হলো ছেলেটার! পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বারান্দার চেয়ারে বসে থাকে চুপচাপ! মাঝে মাঝে স্বাভাবিক হয়, তখন আসে দেখা করতে, কথা বলে না কোনো। থমথমে মুখ। মনে হয় গভীর দুঃখে ডুবে আছে সারাক্ষণ। বহু দিন কল্যাণ তাকে খেলার মাঠের দিকে যেতে দেখেনি। গণেশ ডাক্তার এসে দেখে যান মাঝে মাঝে। কল্যাণ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল। বললেন, 'নার্ভের গণ্ডগোল, তবে বেশিটাই মনের। সাইকোলজিক্যাল পেন্!' কেন? অশোক বলেছিল, টুসির হারিয়ে যাওয়ার দিন থেকেই এ-রকম হচ্ছে প্রতাপের। তবে কি টুসির জন্যে!

নিঃশ্বাস গুলিয়ে উঠল কল্যাণের। মাত্র সাত বছরেই পুরো ভালোবাসা কেড়ে নিয়ে গেছে টুসি—সকলের, মানুষের। সে তো একা নয়! তবু এতো নিরস্ত্র মনে হয় কেন!

এই সময় দেখতে পেল, বাঁকের মুখে হেড্লাইট জ্বেলে একটা গাড়ি এদিকেই আসছে। ঠিক তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

কল্যাণ একটু অবাক হলো। জিপটা পুলিসের। সে কিছু ভাববার আগেই ড্রাইভারের পাশে বসে-থাকা ইউনিফর্মপরা লোকটি গেট খুলে ঢুকে পড়ল। হাতের টর্চ থেকে তীব্র আলো এসে মুহূর্তে চোখ ধাঁধিয়ে দিল তার।

'এ কী, কল্যাণবাবু! এখানে?'

কল্যাণ চিনতে পারল, রতন ঘোষ। পুলিসে কাজ করে। কিছু দিন তাদের কলেজে পড়েছিল। রতন ঘোষের কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, ভাই!'

'আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে।' রতন ঘোষ বলল, 'শঙ্করলাল ধরা পড়েছে। আপনাদের একটু দেখা দরকার।'

কল্যাণ একটা ঘা খেল। সময় নিয়ে বলল, 'এখনই যেতে হবে?'

'আমি অপেক্ষাও করতে পারি। ভোর তো হয়ে এলো! সকালেই সেন্ট্রাল জেলে চালান দিতে হবে।' একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে থামল রতন ঘোষ। এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'রঘুনাথ মিশ্রও তো কাছেই থাকেন? তাঁর বাড়িটা কোথায়?'

মিশিরজীর বাড়িটা বুঝিয়ে দিল কল্যাণ।

'ওঁকেও দরকার?'

'একজন উইট্নেস চাই।' রতন ঘোষ বলল, 'আপনি তবে তৈরি হয়ে নিন। আমি মিশিরজীর কাছে যাচ্ছি।'

গাড়িটা চলে যাবার পর ভিতরে এসে দ্রুত জামাকাপড় বদলে নিল কল্যাণ। বাণী ঘুমুচ্ছে অকাতরে। ওষুধের ক্রিয়া চলছে, এখন দু'তিন ঘণ্টার আগে আর জাগবে না। স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়ছিল তার। ভাবল, যেতে হলে এখনই যাওয়া ভালো।

দরজায় টোকা দিয়ে নীলাকে তুলল কল্যাণ।

'শঙ্করলাল ধরা পড়েছে। আমি থানায় যাচ্ছি—'

বাণীর বোন, খবর পেয়ে পাটনা থেকে এসেছিল। সদ্য ঘুম-ভাঙা নীলার হতচকিত মুখের দিকে ক'পলক তাকিয়ে থেকে কল্যাণ বলল, 'ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি দিদিকে বোলো না কিছু। আমি এখুনি ফিরে আসব।'

গাড়িটা ফিরে এসেছে ততোক্ষণে। উঠতে উঠতে কল্যাণ দেখল মিশিরজী বসে আছেন ভিতরে। উদাসীন মুখ। বললেন, 'খবর শুনা, কল্যাণ?'

এই মুহূর্তে মিশিরজীর কথায় কোনো উৎসাহ খুঁজে পেল না কল্যাণ। শেষ রাতের অস্পষ্ট আলোর ভিতর দিয়ে জিপটা ছুটে চলল থানার দিকে।

রতন ঘোষ নিজেই বর্ণনা করল ব্যাপারটা। মুঙ্গের স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছিল শঙ্করলাল, দেখে সন্দেহ হয় জি আর পি'র লোকেদের। প্রথমে অন্য নাম বলেছিল। মারধোর করার পর স্বীকার করেছে। তবু একবার আইডেন্টিফাই করা দরকার।

শরীরময় চাপা উত্তেজনা নিয়ে চুপচাপ বসেছিল কল্যাণ। রতন ঘোষের কথার কিছুটা শুনল, কিছুটা শুনল না। দুটো ঘটনাকে মেলাবার চেষ্টা করছিল সে—টুসি নেই, শঙ্করলাল ধরা পড়েছে। দুই প্রধান সত্যের মাঝখানে কোথাও থেকে যাচ্ছে একটা বিরাট ফাঁক, যা সে জোড়া দিতে পারছে না। সেই অবস্থাতেই অনুভব করল হাতের আঙুলগুলো শক্ত হচ্ছে ক্রমশ। আর একটু পরেই সে মুখোমুখি হবে সেই লোকটির, যে তাদের দিনের কাজ, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে! যে তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছে! আক্রোশে মুঠো শক্ত হয়ে এলো কল্যাণের।

রতন ঘোষ তাদের নিয়ে গেল থানার ভিতরে। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল চা খাবে কি না। মিশিরজী না বললেন। তখন হাবিলদার গোছের একটি লোককে সম্বোধন করে বলল, 'লে আও জী—'

অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকাল কল্যাণ। ভোর হচ্ছে। গুমটি ছেড়ে একে একে রাস্তায় বেরুচ্ছে স্টেটবাসগুলো। গলায় বিশ্রী শব্দ তুলে কুলকুচো করছে কেউ। এতো ধরনের শব্দ আর ব্যস্ততার মধ্যেও তার মনে হলো সময় থেমে আছে, স্মৃতি বলতে আর কিছু নেই। শুধু তার অস্তিত্ব জুড়ে বেজে চলেছে ধক্-ধক্-ধক্-ধক্ একটা শব্দ।

এই অবস্থায় হঠাৎ তার চোখ পড়ল সামনে। পরনে ছেঁড়া ধুতি, গায়ে সবুজ রঙের ময়লা শার্ট—একজন সেই শার্টের কলার ধরে এবং আর-একজন একটা হাত ধরে নিয়ে এলো লোকটিকে। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়েছে, চোখমুখ বসা, রুক্ষ মুখের কিছুটা আড়াল হয়েছে দাড়িতে। তবু, এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়েই নির্ভুল চিনতে পারল কল্যাণ।

'এ হি তো হ্যায়—।' রতন ঘোষকে বললেন মিশিরজী, 'সেম পার্সন!'

কল্যাণ উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে, মাত্র পাঁচ ছ' হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে টুসির আততায়ী। এই লোকটিকে সে বিশ্বাস করেছিল, দীর্ঘকাল ধরে পালন করেছিল একে! এ-সবের যদি কোনো তাৎপর্য থাকে, শঙ্করলাল তা পূরণ করেছে! অন্ধ আক্রোশে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল কল্যাণের নাক চোখ মুখ। আকস্মিকভাবে শরীরে ঢুকে পড়ল এক লক্ষ মানুষের হিংস্র চিৎকার—ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে লোকটির টুঁটি চেপে ধরতে। তবু কিছুই করতে পারল না কল্যাণ। স্তব্ধভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়, একইভাবে। ভিতর থেকে উদ্গত তার নিজস্ব চেতনা ফিরে আসছিল ক্রমশ—তুমি খুনী নও, তুমি মানুষ! তোমার আর শঙ্করলালের মধ্যে আছে হাত ছয়েকের দূরত্ব। এই দূরত্বটাই সব। ভাঙা চোখমুখ নিয়ে আবার সে বসে পড়ল চেয়ারে।

সেই জিপেই ফেরার ব্যবস্থা করে দিল রতন ঘোষ। যেতে যেতে মিশিরজী বললেন, 'ব্যস, এক চ্যাপটার তো ক্লোজ হো গয়া! আব তুম লোগকো হোঁস মে আনে পড়েগা কল্যাণ। লাইফ তো বহুত বড়া হ্যায় না!'

কল্যাণ সাড়া দিল না। হয়তো ঠিকই বলেছেন মিশিরজী, সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ জীবন। তবু তাঁর হিসেবে ভুল থেকে গেছে একটু। এতো দিন অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আক্রোশও ছিল, হয়তো একটু জ্বালাও। আক্রোশ কিংবা জ্বালা, এখন আর কিছুই থাকল না। বুকের একটা বড়ো জায়গা এখন থেকে শুধুই ফাঁকা পড়ে থাকবে।

॥ আট ॥

তিন দিন আগে থেকেই চাঞ্চল্য পড়ে গেল শহরে। ইস্টবেঙ্গল আসছে, খেলবে বিহার ইলেভেনের সঙ্গে। অ্যাসোসিয়েসান মাঠের চারিদিক ঘিরে ফেলা হলো টিনের বেড়া দিয়ে। টিকিট করে খেলা। মরশুমের শুরুতেই ঠিক হয়েছিল যে-টিম লিগ জিতবে, অনুমতি পেলে তারা কলকাতায় যাবে শিল্ড খেলতে। সে-জন্যে টাকার দরকার।

আপাতত খেলা ছাড়া কেউ আর কিছু ভাবছে না। কে কে আসছে, কে কে খেলবে—এই নিয়ে জল্পনা চলে অফিসে, সাহেবের রেস্তোরাঁয়, কালীটোলার রোয়াকে। ব্যাকে খেলানোর জন্যে নুরুলকে আনানো হচ্ছে কলকাতা থেকে ; আগে সে এখানেই খেলত। পাটনা থেকে আসছে দুই ভাই বংশী আর বিনোদ, খেলবে ফরোয়ার্ড লাইনে ; চমৎকার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং তাদের মধ্যে। এক জামসেদপুরই পাঠাচ্ছে টেলকো টিমের পাঁচজনকে। প্রগতি সংঘের মেঘনাদও খেলতে পারে। কিন্তু, প্রতাপ কি পারবে খেলতে ! এ-শহরের সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড় প্রতাপ, তার পায়ে আছে ফুটবলের জাদু। এমন একটি খেলোয়াড় এর আগে কেউ দেখেনি। কিন্তু তার পায়ে চোট আছে, হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—ইদানীং তেমন খেলতে পারছে না। দুটো খেলা বাদ দিয়ে লিগের শেষ খেলায় নেমেছিল মাঠে। কোনো রকমে দশ মিনিট খেলেই বেরিয়ে আসে বাইরে।

বিমান মিস্তির আসছিল কালীটোলা দিয়ে। মোড়ের মাথায় ছেলেরা ঘিরে ধরল তাকে। প্রতাপ কি খেলছে ?

ফুটবল মাঠের পুরনো লোক বিমান মিস্তির। এখন টাউন ক্লাবের সেক্রেটারি। চেষ্টা করে করে ক্লাবকে লিগ জিতিয়েছে এবার। প্রতাপ সম্পর্কে টাটকা খবর একমাত্র সে-ই দিতে পারে।

ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরটা খুঁজে পেল বিমান মিস্তির। জোর গলায় বলল, 'খেলবে, নিশ্চয়ই খেলবে। একটু চোট আছে, তবু খেলবে। প্রতাপ আমাদের প্রাইড !' বলতে বলতে হাত দুটো ছুঁড়ে দিল শূন্যে। 'তোরা স্লোগান দে, নো প্রতাপ নো ম্যাচ !'

বিমান মিস্তিরের কথা শেষ হতে না হতেই পাড়া কাঁপিয়ে স্লোগান উঠল—নো প্রতাপ, নো ম্যাচ। ধ্বনিটা থিতোতে একটি ছেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'স্লোগান কতোবার দিতে হয়, বিমানদা ?'

'এখন একবারই।' বিব্রতভাবে বলল বিমান মিস্তির, 'কী, এখন বল পাচ্ছিস না একটু ?' বলে ঘাড় চুলকে নিল। 'সেদিন মাঠে খুব চ্যাঁচাবি। ফুটবল এগারো জনের খেলা, কিন্তু খেলে হাজার হাজার লোক। কলকাতার খেলা দেখিসনি তো ! সাপোর্টাররা চেঁচিয়েই জিতিয়ে দেয় টিমকে। হোক একজিবিসান ম্যাচ, ইস্টবেঙ্গলকে হারালে আমাদের প্রেস্টিজ

বাড়বে।'

টাকে আলো পড়ে বিমান মিত্তিরের। চকচকে হাসিতে ভরে যায় মুখ।

'আচ্ছা, বিমানদা—', সেই ছেলেটি আবার বলল, 'শৈলেন মান্না নাকি আপনার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল ?'

সন্দেহ হতে তেরছা করে তাকাল বিমান মিত্তির এবং চিনতে পারল। ভুসিবাবুর ছেলে মণ্টু। আগে কাকা বলত, এখন কলেজে ঢুকে দাদা বলে। কানাঘুসোয় শুনেছে বিমান, আড়ালে মণ্টু তাকে শালাও বলে ! এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়। তখন, 'তোরা তা হলে আসিস—'বলতে বলতে সাইকেলটা নিয়ে দৌড় দিল বিমান মিত্তির।

ভুসিবাবু ফুটবল অ্যাসোসিয়েসানের প্রেসিডেণ্ট। বিমান টাউন ক্লাব করবার পর ইয়ং লায়ন্স্-এর পেট্রনও হয়েছে। এ-বছর লিগ শুরু হবার আগে প্রতাপকে নিতে চেয়েছিল টিমে। প্রতাপ যায়নি ; বিমানই যেতে দেয়নি। সেই থেকে রাগ। লিগের প্রথম খেলায় টাউন ক্লাবের কাছে পাঁচ-এক গোলে হেরে গেল ইয়ং লায়ন্স্। তার মধ্যে চারটি গোলই প্রতাপের। গত কয়েক বছরে ইয়ং লায়ন্স্ এতো বড়ো হার হারেনি। লোকে টিটকারি দিয়ে বলেছিল, 'ওই ভুসি মালটিকে না সরালে কিস্স্যু হবে না। !' শুনে মুখ চুন হয়ে গেল ভুসিবাবুর। এতো দিন তক্কে তক্কে ছিল ; প্রতাপ ইন্‌জিওরড্ হতেই সুযোগ পেয়ে গেল। সিলেক্সান কমিটির মিটিংয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলল,'শখ করে ইনজিওরড্ প্লেয়ারকে নামানো যাবে না। টিম স্পিরিট নষ্ট হয়ে যাবে। প্রতাপ একাই টিমটাকে ঝুলিয়ে দিতে পারে—'

বিমান ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'ভুসিবাবু, ইস্টবেঙ্গল জিতলে কি আমাদের হাঁড়ি চড়বে না !'

'প্রতাপকে না নামিয়ে তুমি নিজেই নেমে পড়ো না হে !' রাগ দেখিয়ে বলল ভুসিবাবু, 'ফার্সটা তা হলে পুরোপুরি জমবে !'

আজকাল এই ভাষাতেই কথা বলে ভুসিবাবু। রাগ চেপে রাখতে পারে না। অপমানটা জ্বালা ধরিয়ে দিল মাথায়। বিমান বেরিয়ে যাচ্ছিল মিটিং থেকে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টেনে আনল নীলু বোস।

'লেট আস ডিসাইড, প্রতাপ মাঠে নামবে। যদি না পারে, ওকে রিপ্লেস করা হবে—'

নীলু বোসের প্রস্তাবে ভুসিবাবু ছাড়া আর সকলেই মাথা নাড়ল।

যুদ্ধে জিতলেও এখনো ভয় কাটেনি বিমান মিত্তিরের। ভয় প্রতাপকে নিয়ে। কী যে হয়েছে ছেলেটার কিছু দিন থেকে ! সারাক্ষণ থাকে মনমরা হয়ে, বল ছুঁতে চায় না ; জোরজার করে নামালেও মনে হয় শরীরটাই খেলছে শুধু,মন খেলছে না ! সারাক্ষণ চেয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। একদিন ওর চোখে চোখ রেখে বিমান মিত্তিরের মনে হয়েছিল, সে তাকিয়ে আছে একজন অন্ধের চোখের দিকে—দৃষ্টি থেকে দূরে যে শুধু দেখছে অনুভূতি দিয়ে। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। একদিন শুধু বলেছিল, 'বল ধরলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। কী সব দেখতে থাকি !'

'কী দেখিস, প্রতাপ ?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল বিমান মিত্তির, 'বল, কী দেখিস !'

'সে আমি বোঝাতে পারব না।' হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে প্রতাপ বলেছিল, 'আমি খেলতে চাই, বিমানদা ! বিশ্বাস করুন, আমি আবার খেলতে চাই—'

গোটা ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময় লাগে বিমান মিত্তিরের। যে-কোনো কারণেই হোক আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে প্রতাপ। কারণটা খুঁজে পাওয়া যায় না। রহস্যময় লাগে ওর পায়ের চোটটাও। ডাক্তার, ওষুধ, ইঞ্জেকসান, কিছুই বাদ যায়নি এ-পর্যন্ত ; তবু সারেনি।

যন্ত্রণাটা যে সব সময় থাকে তাও নয় ; মাঝে মাঝে কমে যায়, তখন হাঁটে সমানভাবে পা ফেলে। হঠাৎই একসময় শুরু হয়ে যায় আবার, বিশেষত যখন খেলতে নামে। শরীরটা কাঁপে, দৃষ্টি হয়ে পড়ে এলোমেলো। সব মিলিয়ে একটা ভয়-পাওয়া মানুষ। মনে হয় কোনো অদৃশ্য আড়াল থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে একটা অশুভ শক্তি ক্রমশ ভর করছে প্রতাপের ওপর, শরীর থেকে ক্রমশ শুষে নিচ্ছে সমস্ত উদ্যম আর সাহস!

একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ে বিমান মিত্তির। সে নিজে খেলোয়াড় নয়। কোনো দিন ছিলও না। কিন্তু এই নিয়ে প্রাণপাত করেছে গত কুড়িটা বছর। কী পেয়েছে সে! এই শহরের জল হাওয়ায় আছে ক্লেদ, মাটিতে জরার বীজ ; কিছুই বাঁচে না বেশি দিন। বুঝতে পারে, জন্মের আগেই মৃত্যু হয়েছে তার। ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ছোট চাকরি আর কায়ক্লেশের জীবন থেকে যেদিন মুক্তি পাবে, সেদিন আর একবার মরবে। আর উঠবে না। তার আগে যার জন্যে যেটুকু করার করে যাবে।এটা ঠিক, ভুসিবাবুরা যতো দিন আছে অন্তত ততো দিন সে এগোতে পারবে না বেশি দূর। সম্ভব নয়। আড়ালে এখন থেকেই তাতানো হচ্ছে নীলু বোসকে। এমনিতে ভালো মানুষ নীলু বোস। কথা বলে সোজাসুজি, অপ্রয়োজনে সমীহ করে না কাউকে—ভাঙা অবস্থা থেকে টাউন ক্লাবটাকে গড়ে তুলতে অনেক সাহায্য করেছে তাকে। অসুবিধে হলো, ইদানীং নীলু বোসেরও একটু-আধটু খ্যাতির লোভ দেখা দিচ্ছে। ভুসিবাবুর ফাঁদে নীলু বোসের পা দেওয়া মানেই বিমান মিত্তিরের একা হয়ে যাওয়া—সামনের বছর ইলেক্সানে একজনও কথা বলবে না তার পক্ষে। ইয়ং লায়ন্স্-এ থাকতে যেমন হয়েছিল। তখন টাউন ক্লাবের সেক্রেটারি হবে নীলু বোস। পুরো মাঠ চলে যাবে ভুসিবাবুর দখলে!

দৃশ্যটা এখন থেকেই চোখে ভাসে বিমান মিত্তিরের। সে দাঁড়িয়ে আছে সাইড লাইনের ধারে, হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল—মাঠের ভিতর ছুটে যাচ্ছে নীলু বোস, কথা বলছে খেলোয়াড়দের সঙ্গে। সে দাঁড়িয়ে আছে, একা, চুপচাপ! ভাবতে ভাবতে দুঃখে কুঁজো হয়ে যায় পিঠ। পয়সা না থাকলে কেউই খাতির করে না আজকাল। ভাবে, প্রতাপই সম্ভবত তার শেষ কাজ। নুরুলকে নিয়ে গিয়েছিল ; একদিন এই ছেলেটিকেও সে নিয়ে যাবে কলকাতায়—খেলাবে ঘেরা মাঠে, হাজার হাজার দর্শকের সামনে!

এতো দিন সেইভাবেই ভেবে এসেছিল। এখন মনে হচ্ছে পারবে কি! প্রতাপের ভাবভঙ্গি রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল তাকে।

পরপর দুটো দিন বিশ্রী অস্বস্তিতে কাটাল বিমান মিত্তির। নিরুপায় উত্তেজনায় টান-টান হয়ে থাকল স্নায়ুগুলো। এই দু'দিন ক্রমাগত উৎসাহ দিয়েছে প্রতাপকে। সকালের দিকে দশ পনেরো মিনিটের জন্যে হলেও নিয়ে গেছে মাঠে। দৌড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। জায়গামতো বল ছুঁড়ে দিয়ে বলেছে, 'মার দেখি একটা হাফ-ভলি—সেকেণ্ড বারে মারবি।' হাফ-ভলির পরে থ্রু। প্রতাপ দৌড়চ্ছে, পাশে পাশে ট্যাকল করতে করতে বিমান মিত্তির। ধুতিটা হাঁটু পর্যন্ত তোলা, শার্টটা গুঁজে নিয়েছে কোমরে, ঘামে চকচক করছে মাথা। শূন্য মাঠে প্রতাপের সেই বিপজ্জনক থ্রু কাজে লাগাবার জন্যে কোনো প্লেয়ারই ছুটে আসে না।

বলটা কুড়িয়ে এনে মাটিতে বসে পড়া প্রতাপের মুখের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থাকে বিমান মিত্তির। তারপর প্রতাপের পা-টা কোলের ওপর তুলে নিয়ে দক্ষ হাতে ম্যাসাজ করতে করতে বলে, 'এই তো, বেশ পারছিস! তোর এতো ট্যালেন্ট—তুই না পারলে কে পারবে! চোট্টা ভুলে যা। ঐ চোট-লাগা পায়ে কতো প্লেয়ার কতো বিগ গেম খেলে

গেল। আমেদ খাঁ খেলেনি।'

বিমানদার ক্লান্তিহীন মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে প্রতাপ। কথা বলে না। মনে হচ্ছে তার ভিতর থেকে উঠে আসছে আঠারো বছরের অদম্য শক্তি ; এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে পারবে। আস্তে আস্তে বিমানদার কোল থেকে পা-টা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এখন তার পায়ে যন্ত্রণা নেই কোনো। এতো কালের স্বয়ংক্রিয়তা থেকে পা ছুঁড়তে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। অকারণে সামনের দিকে কয়েক পা দৌড়ে গেল সে, দৌড়তে দৌড়তে থেমে দাঁড়াল। হঠাৎই আবার মনে হলো, ব্যথাটা আসছে—এসে যাবে, অল্প অল্প করে টেনে ধরবে হাঁটু থেকে গোড়ালি অবধি তার সমগ্র পা। বিমানদাকে এ-কথা বলা যাবে না।

খেলার দিন সকালে ইঞ্জেকসান দিয়ে গেলেন গণেশ ডাক্তার।

'কম্পাউণ্ডার না পাঠিয়ে নিজেই এলাম। যেটুকু ব্যথা আছে চলে যাবে।' ইঞ্জেকসানের জায়গাটা ডলে দিতে দিতে বললেন, 'মাঠে যাই না ; সময় কোথায়। আজ যাবো তোমার খেলা দেখতে। এতো নাম শুনেছি তোমার। একেবারে নির্ভয়ে খেলো—'

ডুবন্ত অবস্থা থেকে নিজের মনেই ক্রমশ ভেসে উঠল প্রতাপ। মনে মনে বলল, পারব।

বিকেলের আগেই গাড়ি নিয়ে এলো বিমানদা। ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পরেছে, গায়ে সিল্‌কের শার্ট। অনেক দিন পরে বের করা বলেই সম্ভবত জামাকাপড়গুলোয় ইস্ত্রি নেই কোনো। প্রতাপের গায়ে সাদা জার্সি, পায়ে কেড্‌স্। বুট জোড়া বিমানের হাতে। নিকুঞ্জবাবু আর রমা দু'জনেই বেরিয়ে এসেছেন। ওরা গাড়িতে উঠতে যাবে, নিকুঞ্জবাবু হঠাৎ বললেন, 'মন দিয়ে খেলিস, খোকা—'

প্রতাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। নিকুঞ্জবাবু আর রমা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল, খেলা নিয়ে এ-পর্যন্ত একদিনও কথা বলেননি বাবা। একটু থেমে, গাড়িতে উঠতে উঠতে মনে জোর আনার চেষ্টা করল প্রতাপ—পারবে, সে পারবে। মোটরটা স্টার্ট নেবার সময় গলা বাড়িয়ে বিমানদা বলল, 'গাড়িটা ফেরত আসছে নিকুঞ্জকা। আপনারা রেডি হয়ে নিন।'

গোটা শহর ছুটছে মাঠের দিকে। ভিড় ভেঙে পড়েছে। ভিতরে, বাইরে ছেয়ে গেছে পুলিসে। গতবার মোহনবাগানের খেলার সময় শেষ দিকে দর্শকরা ঢুকে পড়েছিল মাঠে, খেলা শেষ হয়নি। এবার সে-রকম কিছু হতে দেওয়া হবে না। সাইড লাইন ধরে দু' হাত তফাতে তফাতে পুলিস বসেছে। সার সার বেঞ্চিগুলোয় মানুষের পর মানুষ, খেই হারিয়ে অনেকেই ছুটোছুটি করছে এদিক-ওদিক। নীলু বোস মাইকে। মাঝে মাঝে সকলকে শান্ত হয়ে জায়গা নিতে বলছে। সেণ্টার বরাবর একজিট গেটের আগে খানিকটা জায়গা কাঁটাতারে ঘেরা—বল নিয়ে সেখানে নড়াচড়া করছে বিহার ইলেভেনের খেলোয়াড়রা। ইস্টবেঙ্গল টিমও এসে পড়বে এখুনি। কাঁটাতারের পাশে গেস্ট্‌ এন্‌ক্লোজার—সেখানে পরপর বসে আছেন নিকুঞ্জ, বিনয়বাবু, মিশিরজী, গণেশ ডাক্তাররা। কল্যাণ আসতে চায়নি, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে অশোক। বিজন, সুশান্তদের সঙ্গে তারা বসেছে উল্টো দিকে। খেলা শুরু হতে আর সামান্যই বাকি।

বুটের ফিতে বেঁধে দিয়ে বিমান মিত্তির বলল, 'খেলা বুঝে খেলবি, স্ট্রেন করার দরকার নেই। ওরা কলকাতার খেলোয়াড়, বেশি ড্রিবল করতে যাসনে। ফার্স্ট টাইম শট্‌ নিবি গোলে। বিনোদ, বংশী আর তুই—ফার্স্ট ক্লাস কম্বিনেসান।' বলে একটু থামল, তাকাল প্রতাপের দিকে, 'তোকে গার্ড করবে প্রশান্ত সিন্‌হা। ও তোর খেলা বোঝবার আগেই

গোল করবার চেষ্টা করবি ।'

নুরুল দাঁড়িয়েছিল পাশে । বিমান মিত্তির কথা শেষ করতেই বলল, 'বিমানদা, আমার লিয়ে কোনো ইনস্ট্রাকসান নেই ?'

নুরুলকে দেখল বিমান । কলকাতায় থেকে বাংলাটা ভালোই শিখেছে, খেলছে আরও ভালো । সম্ভবত মারডেকায় যাবে এবার । গর্বে বুক ফুলে উঠল বিমান মিত্তিরের । বলল, 'তোকে আর কী বলব রে ? তুই তোর মতো করে খেলিস ।'

'তব্ আমি কিছু বলি পরতাপকে ।' নুরুল হাত রাখল প্রতাপের কাঁধে, 'ঘাবড়াও মৎ পরতাপ, হাম্ বল দেগা তুমকো ।'

প্রতাপ বুঝল, সবাই তার ব্যাপারটা শুনেছে, সবাই তাকে নিয়ে চিন্তিত । হয়তো সবাই ভাবছে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে । চোয়াল শক্ত করে বুট পায়ে দু'বার স্কিপ করে নিল সে ; চোয়াল শক্ত করে ভাবল, পারবে, পারবে ।

ইস্টবেঙ্গল নেমে পড়েছে মাঠে । বিহার ইলেভেনও নামতে শুরু করল । সকলের শেষে নুরুল আর প্রতাপ । গেস্ট এনক্লোজারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন বিনয়বাবু, 'ঐ তো, নেমেছে প্রতাপ !'

চোখে ঝাপসা দেখছিলেন নিকুঞ্জবাবু । চশমাটা মুছে বললেন, 'কোথায় ?'

'আ-রে ! তুম তো আজব আদমি হ্যায়, নিকুঞ্জ !' ঠাট্টা করে বললেন মিশিরজী, 'আপনে বেটেকে ভি নহি পহচান্তা !'

খেলা শুরু হয়ে গেছে । শুরুতেই চেপে ধরল ইস্টবেঙ্গল, একের পর এক ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বিহার ইলেভেনের ওপর । সেন্টারের পর বিনোদ থ্রু দিয়েছিল আচমকা, শটটায় গতি ছিল ; প্রতাপ পৌঁছুবার আগেই চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে । থ্রো হয়ে গেল । বলটা পড়েছিল বংশীর পায়ে, বংশী কিছু করার আগেই নঈম ঠেলে দিল প্রশান্তকে । প্রশান্ত এগিয়ে গেল মেঘনাদকে কাটিয়ে ; বল পেল পরিমল দে, তার কাছ থেকে সারামাদ । সারামাদের প্রচণ্ড শট্ পোস্টে লেগে ফিরে এলো । বিহার দাঁড়াতে পারছে না—প্রতাপ পিছিয়ে এলো—নঈম, শান্ত মিত্র সব উঠে এসেছে সেণ্টার লাইনের কাছে । চাপের মুখে একা নুরুলই খেলে যাচ্ছে বাঘের মতো ; কখনো মাথা দিয়ে, কখনো পা দিয়ে । হঠাৎ দেখলে মনে হবে এগারোজন কলকাতার বিরুদ্ধে একা কলকাতা হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে সে, কিছুতেই হার মানবে না । এমনও হতে পারে—কলকাতা নয়, হঠাৎ মনে পড়েছে নুরুলের, এই মাঠই তার জন্মভূমি, একে বাঁচানোর পুরো দায়িত্ব তার ! নিঃশব্দ মাঠ । সাইড লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে বিমান মিত্তির । হোক একজিবিসান ম্যাচ, এভাবে খেললে আজ নিশ্চিত দশটা গোল খাবে !

বল ক্লিয়ার হলো প্রায় দশ মিনিট পরে । নুরুলের হেড থেকে বল পেয়ে ফাঁকায় বিনোদকে ঠেলে দিল শ্যামসুন্দর । জামসেদপুরের ছেলে । বিনোদ ছুটছে ; মাঝে বংশী, এদিকে প্রতাপ । ডিফেন্সে নেমে আসছে ইস্টবেঙ্গল । এতোক্ষণে মাঠে চিয়ার-আপ্ শোনা গেল । উঁচু করে সুন্দর ক্রস দিয়েছে বিনোদ, প্রায় পেনাল্টি বক্সের মাথায় । প্রতাপ ছুটে এলো । হেড করার জন্যে লাফিয়ে উঠেছে একই সঙ্গে নঈম আর বংশী । কেউই পেল না । বলটা মাটিতে পড়ে ড্রপ্ খাবার আগেই রুদ্ধ বিস্ময়ে মাঠভর্তি লোক দেখল, উৎক্ষিপ্ত রকেটের মতো শূন্যে ভেসে উঠেছে প্রতাপ । এক মুহূর্ত ! তারপরেই মাঠ জুড়ে চিৎকার উঠল, 'গো-ও-ল, গো-ও-ল, গো-ও-ল—'

গোল দিয়েছে, সেই প্রতাপই গোল দিয়েছে ! আবেগে আত্মহারা বিমান মিত্তির ছুটে যাচ্ছিল মাঠের ভিতর, পুলিস ফিরিয়ে দিল। তখন এনক্লোজারের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলতে লাগল, 'কমপ্লিটলি বিটিন ! থঙ্গরাজ কেন, লেভ ইয়াসিনেরও সাধ্য ছিল না ও-বল আটকায়। বলেছি না, ও একটা জিনিয়াস— !'

সেন্টারের পর ক্ষেপে উঠল ইস্টবেঙ্গল। আক্রমণ দেখে বোঝা গেল, আগের চাপটা কিছুই ছিল না। মিনিট দু' তিনের মধ্যেই গোলটা শোধ করে দিল তারা। রাখতে না পেরে সারামাদকে ফাউল করল শ্যামসুন্দর ; ফ্রি-কিক থেকে সোজা গোলে বল পাঠাল পরিমল। তাতেই থামল না। ঝড়ের মতো আবার এগিয়ে আসছে তারা। নুরুল এক-একটা ঝাপ্টা সামলায় আর দলের খেলোয়াড়দের ইশারা করে পজিসান নিতে। মাঠ জুড়ে স্তব্ধতা। প্রতাপ পিছিয়ে এসেছে নিজেদের হাফ লাইন বরাবর। বিমানদা ঠিকই বলেছিল, গোলটা দেবার পর থেকেই প্রশান্ত লেগে আছে গায়ে গায়ে। মাঠে ইস্টবেঙ্গলই খেলছে। এমন সময় সেই বলটা এলো। ফ্রি-কিক থেকে সোজা তার কাছে বল পাঠাল নুরুল। রিসিভ করেই চকিতে প্রশান্তকে ডজ্ করে বেরিয়ে এলো প্রতাপ, তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল সাইড লাইন ধরে। পিছনে ছুটে আসছে প্রশান্ত, একটু দূরে নঈম অপেক্ষা করছে বাধা দেবার জন্যে। মাঠ জুড়ে আবার চিৎকার উঠল, 'প্রতাপ—প্রতাপ !' নঈমকে এড়িয়ে কোনাকুনি ঢুকতে লাগল প্রতাপ, সামনে আর একটিই বাধা।

ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটল। মাঠসুদ্ধ লোক দেখল, বল ছেড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে প্রতাপ। ছটফট করছে এপাশ-ওপাশ ঘুরে। সামনে, পিছনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা নিয়েই ছুটছিল সে, কেউ চার্জ করেনি—তা হলে হঠাৎ কী হলো ! প্লেয়াররা ছুটে আসছে একে একে, রেফারিও ছুটে এলো। নীলু বোস, বিমান মিত্তিরও ততোক্ষণে ছুটে এসেছে মাঠের ভিতরে। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ প্রতাপের, হাঁটুটা দু' হাতের মুঠোয় ধরে কাতরাচ্ছে। বিমান মিত্তিরকে দেখেই ভেঙে পড়ল, 'আর কোনো দিনও আমি খেলতে পারব না, বিমানদা !'

নীলু বোস দেখল বিমানও ভাঙছে। তাড়াতাড়ি স্ট্রেচার ডেকে প্রতাপকে তুলে আনল মাঠের বাইরে। অ্যাসোসিয়েসানের ডাক্তার ছিল সেখানে, গণেশ ডাক্তারও এলেন। হাঁটুটা নেড়েচেড়ে গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'মনে হচ্ছে জয়েন্টটাই গেছে ! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

ততোক্ষণে বদলি খেলোয়াড় নেমে গেছে মাঠে। কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর আবার শুরু হয়েছে খেলা। প্রতাপ হাসপাতালে চলল।

॥ নয় ॥

চাকরি নিয়ে এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করছে কল্যাণ ; এর মধ্যে দিন দুয়েকের জন্যে ঘুরেও এলো কলকাতা থেকে। সম্ভবত চলে যাবে। আর, হাঁটুতে প্লাস্টার নিয়ে বিষণ্ণ মুখে দিন কাটছে প্রতাপের। এখন আর সে ফার্স্ট ডিভিসানে খেলার কথা বলে না।

দুটোই এক ব্যাপার নয়। তবু কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে উভয়ের মধ্যে। একা ভাবলে অশোক সেই মিলটা খুঁজে পায়। তখন মনে হয়, নির্দিষ্টভাবে না হলেও বৃষ্টির সূচনাতেই এ-সবের আভাস সে পেয়েছিল। তখনই মনে হয়েছিল বৃষ্টিটা শুভ নয়।

বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা ধরা যায় না ঠিক। হয়তো উদ্বেগ থেকেই ধারণাটা জন্ম নিয়েছিল একদিন ; ধারণাটাই পরে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক সঙ্কেতে আকাশ ছেয়ে যায় মেঘে, বৃষ্টি নামে উপুড় হয়ে, পাড় ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসে নদী। বানে ভেসে যায় ঘর বাড়ি মাটি। তখন মনে হয় কিছু একটা হবে, হতে পারে।

রাজবালার বাড়ির ছাদের পাঁচিল ধসে যাওয়ায় একদিন চিন্তিত হয়েছিল অশোক। সেদিন ভাবেনি শহরের গা-ঘেঁসা নদী আর বড়ো গঙ্গা—দুই স্রোতের মধ্যবর্তী চড়ায় চাষীদের ঘর ছিল, নদী যখন এতোটা ভয়াল হয়ে ওঠেনি তখন শহরের মানুষের চোখের আড়ালে কিছু লোক খেয়া পারাপার করত নিঃশব্দে। তারা গেল কোথায় ? দুঃখী সেই মানুষগুলির মুখের চেহারা কি মনে আছে কারো ? ঘরবাড়ি গেছে, কিন্তু মানুষগুলি কি বেঁচে আছে ? নাকি বিপর্যয়ের আগেই তারা সরে গেছে দুঃখ থেকে দূরে, কোনো নিরাপদ জায়গায় ?

বর্ষা শেষ না হতেই শহর ছেয়ে যায় ন্যাংটো মেয়ে, পুরুষ আর শিশুর ভিড়ে। তারা কোথা থেকে আসে কেউ জানে না। কিন্তু যেভাবে ভিক্ষের আশায় দরজায় দরজায় ঘোরে, তাতে মনে হয় শহরের মানুষজন ও বাড়িগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় অনেক পুরনো। স্টেশন চত্বর, পোস্টাপিস, ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের অফিস আর যেখানে যেখানে একটুও ফাঁকা জায়গা ছিল—সব ভরে যায় মানুষে, তাদের হাঁড়িকুড়ি, সংসার আর অস্নাত শরীরের গন্ধে। নীল, সবুজ মাছিরা ওড়ে। হাসপাতালে কলেরা রুগীর সংখ্যা বেড়ে ওঠে রোজই। রাত্রে গভীর ঘুমে শুয়ে অশোক শুনতে পায় বাতাস ভারী করে কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে 'রাম নাম সত্ হ্যায়' ধ্বনি। শব্দটা মিলিয়ে যাবার পরও তার রেশ যায় না। চোখে পড়ে শিব মন্দিরের পাশে অশ্বত্থ গাছের নিচে পড়ে আছে বাঁশের মাচায় বাঁধা জোড়া মড়া——গুটিকয় স্তব্ধ শ্মশানযাত্রী বসে আছে গোল হয়ে ; এ ওর হাত থেকে বিড়ির আগুন নিয়ে জিরোতে জিরোতে সেঁক নিচ্ছে বুকে। শুকনো মুখগুলি। দূরান্তের গ্রাম থেকে সম্ভবত রাত থাকতেই বেরিয়েছিল তারা, ক্লান্ত, এখনো যেতে হবে অনেকটা। ঘটনা থেকে ক্রমশ স্মৃতিতে যাবার মতো—মধ্যের এই পথটুকুই সবচেয়ে ক্লান্তিকর।

ক'দিনের মধ্যেই জানা গেল ব্যাপারটা। রিক্সায় স্পিকার বেঁধে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঘুরে বেড়াল শহরের রাস্তায়—কলেরা দেখা দিয়েছে মহামারী হয়ে। কেউই বুঝতে পারল না কাদের উদ্দেশে বলা হলো এগুলো। তবে এটুকু বুঝল, মহামারীর ফল শহরের রাস্তার ওপর দিয়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে শ্মশানের দিকে এগোলেও বীজ কোনো দিনই ঢুকবে না শহরে। সাবধান হবার কী আছে !

মহামারীর পর এলো বন্যার খবর। উত্তরে কোথায় ঢল নেমেছে নদীতে, খরস্রোতে

ভেসে যাচ্ছে. গ্রামের পর গ্রাম। কমিশনার বন্যাত্রাণ তহবিলে সাহায্য করার আবেদন জানাতেই আনন্দে মেতে উঠল সকলে। বহু দিন পরে করার মতো একটা কাজ পাওয়া গেছে।

শিল্ড খেলতে শেষ পর্যন্ত কোনো টিমই কলকাতা যায়নি। সুতরাং, ফুটবল অ্যাসোসিয়েসানের মিটিং-এ প্রস্তাব নিল নীলু বোস, একজিবিসান ম্যাচে যে-টাকা উঠেছে তার অর্ধেক অন্তত বন্যাত্রাণে দিয়ে দেওয়া হোক। চাপে পড়ে ভুসিবাবুও রাজি হলো। বলল, 'বেশ তো! তা টাকাটা কীভাবে দেবে ভেবেছ?'

নীলু বোস বলল, 'কেন, চেক্ দিয়ে দিলেই তো হয়!'

'আঃ, নীলু, তুমি কিছুই বোঝ না দেখছি!' ভুসিবাবু বলল, 'কমিশনার তো টাকা পেলেই খুশি; কিন্তু অ্যাসোসিয়েসানের কী হবে। এই যে একটা কাজ আমরা করছি, এটা তো পাঁচজনের জানা দরকার। বরং একটা ফাংসান-টাংসান করে, কমিশনারকে ডেকে—'

নীলু বোস বলল, 'এ আর এমন কী কথা! আমি অর্গানাইজ করব।'

বিমান মিত্তির এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। ত্রাণ ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি, কীভাবে দান করা যায় তাও নয়। তবে দানের ব্যাপারটা মন্দ নয় ভেবে সায় দিয়ে যাচ্ছিল। মিটিং শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে বলল, 'ভুসিবাবু, প্রতাপের চিকিৎসার জন্যে কিছু অ্যালট করার কথা ছিল— ?'

'তুমি বড়োই ন্যারো মাইণ্ডের লোক হে! আমরা ডিসকাস করছি একটা প্রব্লেম নিয়ে—', বলতে বলতেই যেন অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল ভুসিবাবুর। দম নিয়ে বলল, 'নিকুঞ্জ ঘোষ বাড়ি হাঁকাচ্ছে, ছেলের চিকিৎসা করাতে পারে না?'

'নিকুঞ্জ ঘোষ আপনার চিকিৎসাও করাতে পারে, সেটা কোনো কথা নয়।' বিমান মিত্তির ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'কথা হয়েছিল বলেই বলছি।'

'দিতে হলে তুমিই দাও। তুমিই তো যতো নষ্টের গোড়া। কে বলেছিল ওকে নামাতে! তুমি! তুমিই ছেলেটার ফিউচার নষ্ট করেছ!'

বন্যাত্রাণ থেকে কথাগুলো আকস্মিকভাবে চলে এলো প্রতাপের দিকে। বিমানের মুখ সাদা। কথা ফুটল না। এইমাত্র সে একটা বড়ো ঘা খেয়েছে; এখন সোজা হতে সময় লাগবে।

মিটিংয়ে আর যারা ছিল তারা কেউই কোনো কথা বলছে না। ভুসিবাবু আর বিমান মিত্তিরের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন তা মোটামুটি সকলেই জানে। এর আগে বিমান মিত্তির একটা যুদ্ধ জিতেছিল। সকলেই বুঝল, ভুসিবাবু শোধ নিচ্ছে এখন। ঝগড়াটা চলবে।

খানিক দু'জনকেই লক্ষ করে নীলু বোস বলল, 'ভুসিদা, এভাবে বলা ঠিক নয়!'

'ঠিক বেঠিক বুঝি না।' ভুসিবাবু বলল, 'লোকটার কাজই হলো আমার পেছনে কাঠি দেওয়া।'

আর এগুলো না। বিমান ডুবে গেছে নিজের মধ্যে; মুখ নয়, এখন ওর টাকটা'ই দেখা যাচ্ছে শুধু। পুরোপুরি একটা ভয়-পাওয়া মানুষের চেহারা। নীলু বোস ওকে ডেকে নিল; বাইরে এনে সাইকেলটা ধরিয়ে দিল হাতে।

'বিমানদা, প্রতাপকে নিয়ে অতো ভাবছেন কেন আপনি! আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওর ইনজিউরি খুব সিরিয়াস নয়। একটা সিজন হয়তো সাবধানে থাকতে হবে। তারপর তো ও আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে!'

একটা সিজন একটা খেলোয়াড়কে ধসিয়ে দিতে পারে, বিমান ভাবল। আর বিমান মিত্তিরও কি থাকবে ততো দিন! সে-কথা কে বলবে!

'দ্যাখো তোমরা।' যেতে যেতে বিমান বলল, 'আমি খেলা বুঝি। তোমাদের মহৎ ব্যাপার বুঝি না।'

এইমাত্র একটা বড়ো ঘা খেয়েছে বিমান। ভুসিবাবুর কথায় দ্বিধা ছিল না, পরিষ্কারই বলল, সে প্রতাপের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে। সে, বিমান মিত্তির। আর প্রতাপ—যার ভবিষ্যৎ ভেবে পরপর ক'দিন ঘুমোতে পারেনি সে, যাকে নিয়ে এই জিরজিরে শরীরেও প্র্যাকটিস করিয়েছে সে, দৌড়েছে পাশাপাশি, দূর পর্যন্ত ছুটে গিয়ে বল কুড়িয়ে এনেছে, ম্যাসাজ করে দিয়েছে পা—একা লড়েছে সকলের হতাশা আর অর্থহীন সহানুভূতির বিরুদ্ধে। যার ভবিষ্যৎ ভেবে নিজের পঞ্চাশ বছরের সমস্ত ক্লেশ ভুলে শরীরে আনতে চেয়েছে আঠারো বছরের উৎসাহ। আজ ভুসিবাবু বলল, কথাটা চাপা থাকবে না, কাল থেকে হয়তো আরো কেউ কেউ বলবে!

অপমানটা জ্বালা ধরিয়ে দিল শরীরে। পিঠ থেকে একটা ব্যথা উঠে এলো ঘাড়ের পিছনে, ছড়িয়ে গেল মাথায়, এসে জমতে লাগল কানের দু' পাশে। গলায় অস্বস্তি। পুরো শরীরটা ঝুঁকে এলো সাইকেলের ওপর। অপমান আজ পা দুটোকেও যেন অতিরিক্ত সক্রিয় করে তুলেছে। পিছনে ভুসিবাবুর ছায়া। প্রাণপণে সাইকেল ছোটাতে লাগল বিমান।

খুব দূরে দূরে ল্যাম্প-পোস্টের আলোগুলো জ্বলছে প্রায় না-জ্বলার মতো করে। আজকালের মধ্যেই শেষ হয়েছে কৃষ্ণপক্ষ, মহালয়া হয়ে গেল ; আকাশে এখনো আলো ফোটেনি তেমন। পুজো এবার একটু তাড়াতাড়িই এসেছে। মাত্র সেপ্টেম্বরের শেষ ; তবু এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে হাওয়া। খোলা জানলা দিয়ে ভোরের দিকে গলা বাড়িয়ে দেয় ছিমছাম শীত। ভোর হয় দেরিতে।

দৃশ্যটা হুবহু তুলে আনল বিমান মিত্তির। নুরুলের শট্ রিসিভ করে প্রশান্তকে কাটিয়ে নিল প্রতাপ, ছুটতে শুরু করল। নঈম অপেক্ষা করছে ট্যাকল করার জন্যে। প্রতাপ এগিয়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে কোনাকুনি ঢুকতে। সাইড লাইনে দাঁড়িয়ে তখনই সন্দেহ হয়েছিল তার, তখনই বুঝতে পেরেছিল, ভুল পায়ে বল টেনেছে, এ-বল গোল অব্দি পৌঁছুবে না। নঈমও কি বুঝতে পেরেছিল! হয়তো পারেনি, হয়তো সেই মুহূর্তে এমন একটা কিছু ঘটে, যাতে সেও পা বাড়াবার সুযোগ পায়নি। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল তখনই, এতো দিনের অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তখনই বুঝতে পেরেছিল বিমান—গোল হারিয়ে গেছে, চোখের সামনে এখন আর কিছুই দেখছে না প্রতাপ ; কিন্তু এমন কিছু দেখছে যার রহস্য আজও বিমান ছুঁতে পারেনি। মাঠ জুড়ে 'প্রতাপ—প্রতাপ—', যারা চিৎকার করছে তারা জানে না, গোল নয়, আর একটা বিপদ এগিয়ে আসছে সামনে। এবং তাই ঘটল।

সেদিন মাঠের মধ্যে ছুটে আসার আগে বিমান কি ভাবেনি, এর জন্য সে-ই দায়ী! এই দুর্ঘটনার দায়িত্ব তার একার! যন্ত্রণায় কাতর মুখ তুলে প্রতাপ যখন তাকাল তার দিকে, তখনই কি মনে হয়নি—প্রতাপ উপলক্ষ, আসলে জয়ের নেশায় পঞ্চাশ বছরের সমস্ত উদ্বেগ নিয়ে সে নিজেই ঢুকে পড়েছিল প্রতাপের শরীরে। কী করে বোঝাবে লোককে, সেই মুহূর্তে প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে বিমান মিত্তিরও মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে!

ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের সামনের রাস্তার দিকে যেতে যেতে হঠাৎই বুকের মধ্যে একটা হাহাকার উঠল বিমানের। একটু হাওয়ার জন্যে সে মুখ তুলল খোলা আকাশের দিকে।

এবং ভাবল, যার নিজেরই ভবিষ্যৎ নেই কোনো, সে অন্যের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে কী করে !

রাস্তা মেরামতের জন্যে দু' দিকে সুরকি আর পাথরকুচি ডাঁই করা, রাস্তাটা ঢালু হয়ে গেছে দু' পাশে—সেখানে খাদ আর ইঁটের পাঁজা ; ডানহাতি আর একটু এগোলে গোয়ালটুলি, ঘুঁটে আর গোবরের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে সারাক্ষণ। সামনে প্রায় দুশো গজের মধ্যে ঘরবাড়ি নেই কোনো ; আবার বসতি শুরু হয়েছে চৌরাস্তা থেকে—পরপর অনেকগুলো দোকান। হ্যাজাক জ্বলছে মিষ্টির দোকানের সামনে, গ্রাম থেকে কাজ করতে আসা দলছুট দেহাতী লোকেরা ওখানে দু'বেলা খায়। সামিয়ানার নিচে বেঞ্চি পাতা, আর ছোট ছোট টেবিল—রাতের খদ্দেররা এরই মধ্যে পাতা পেড়ে খেতে বসে গেছে। ওদেরই একজনের প্রথম চোখে পড়ল, একটু দূরে, নির্জন রাস্তার ওপর একজন সাইকেল আরোহী হঠাৎই টাল খেয়ে পড়ছে। দু'এক মুহূর্ত সতর্ক চোখে তারা লোকটির উঠে পড়ার অপেক্ষা করল, তারপর হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে গেল সেদিকে। ঠিকই, সাইকেল নিয়ে সুরকি গাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটি লোক। পরনে ধুতি আর শার্ট, মাথায় টাক, মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

ধরাধরি করে লোকটিকে টেনে তুলল তারা। তখনো টলছে। তবে, মনে হচ্ছে চোট লাগেনি তেমন ; সুরকি-গাদায় পড়েছিল বলেই বেঁচে গেছে। গা মুখ জেবড়ে আছে সুরকির গুঁড়োয়। একজন সেগুলো ঝেড়ে দিতেই আদলটা স্পষ্ট হলো। পানের দোকানের ছোকরা বলল, 'এ তো ফুটবলবালা বাবু !' লোকটির কানে সে-কথা ঢুকল বলে মনে হলো না। দু'জন দু'পাশে ধরে তাকে নিয়ে যেতে লাগল দোকানের দিকে।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে ঘোর কাটিয়ে উঠে বসল বিমান মিত্তির। ঝাপসা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে এলো দৃষ্টি। কতগুলো অপরিচিত মানুষ ঘিরে রয়েছে তাকে, তালপাতার পাখা নেড়ে হাওয়া করছে একজন। সম্ভবত মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল সে, এখন ঠিক মনে পড়ছে না। লোকগুলির মুখের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে রইল সে।

'কেয়া বাবু, জাদা চোট্ তো নহি লাগা ?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বিমান। মাথা ঘাড় সব জলে ভিজে, সুরকির গুঁড়োয় জল লেগে ছোপ ছোপ দাগ ধরেছে জামায়। বাঁশের খুঁটিতে সাইকেলটা লাগানো। উঠতে গিয়ে টের পেল কোমর থেকে পা পর্যন্ত সমগ্র অংশটা টান-টান হয়ে আছে, মাথাটা ভারী লাগছে, বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছটা জ্বালা করছে বেশ। সম্ভবত ছড়ে গেছে। এই অবস্থায় এখন আর সাইকেল চালানো সম্ভব নয়। লোকগুলির হতভম্ব চোখের সামনে সাইকেলটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সে। ঈশানচক এখান থেকে বেশি দূর নয়। এই পথটুকু হেঁটেই যেতে পারবে।

এইমাত্র খবরের কাগজ এসেছে। সাহেবের রেস্তোরাঁর বাইরে বেঞ্চিতে বসে কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে একটু অন্য দিকে তাকিয়েছিল অশোক, দেখল, ঘোড়া আস্তাবলের পাশের রাস্তা দিয়ে সাইকেল হাঁটিয়ে খুব মন্থর ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে একটি লোক। লোকটির হাঁটার ধরন খুব স্বাভাবিক নয়। কাছে আসতেই চিনতে পারল। বিমান মিত্তির।

আজ সন্ধে থেকেই মন ভালো নেই। অফিস থেকে ফেরার সময় কল্যাণদার বাড়ি হয়ে এলো, প্রতাপকেও দেখতে গিয়েছিল। বাণীদি আজও একচোট কাঁদল। নিঃশব্দ কান্না, যাতে শরীরটা দোলে, মুহূর্তে বদলে যায় মুখের আদল—তবু শব্দ হয় না কোনো। মনে হয়

কান্না ছাড়া ওর শরীরে আর কিছু নেই, একটু নড়লেই ঝরে পড়ে। উপলক্ষহীন শূন্যতা থেকে উঠে আসে কান্নাটা। সহ্য করা যায় না। প্রতাপ অবশ্য ভালো মেজাজেই ছিল ; অনেক দিন পরে হেসে বলল, 'ভালো আছি— ।' হাসিটা খারাপ। বেরিয়ে আসার পর অশোকের মনে হয়েছিল, আলাদা হলেও, বাণীদি আর প্রতাপ—দু'জনের ব্যবহারে কোথাও মিল আছে একটু, হঠাৎই যা অস্থির, এলোমেলো করে দেয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

হাওয়ায় পুজোর আমেজ। অন্যবার এই সময় সে বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করে। এবার যেতে পারবে না। রোজই নতুন নতুন জায়গা থেকে বন্যার খবর আসছে ; ঘরবাড়ি সামলাতে অফিসের অনেকেই ছুটে গেছে দেশে। ছুটি পাবার উপায় নেই। আগেও অবশ্য ভেবেছিল এবার পুজোটা এখানেই কাটাবে, বাণীদিদের সঙ্গে। তবু, ছুটি না-পাওয়ায় থেকে থেকেই একটা বন্ধ্যাত্বের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে মনে—মাকে মনে পড়ছে, মনে পড়ছে বিলু আর চান্দ্রেয়ীকে। ওরা এখনো আশা করে আছে।

বিমান মিত্তির হাঁটছে রাস্তার একেবারে ধার দিয়ে। জামাকাপড় নোংরা, মুখটাও তেমন পরিচ্ছন্ন নয়।

দেখেই কেমন মায়া হলো অশোকের। তেমন পরিচয় নেই, তবু ডাকল, 'বিমানবাবু, ও বিমানবাবু—'

বিমান মুখ ফেরাল। অশোককে দেখে সাইকেল ঘুরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ডাকছিলেন ভাই ?'

সামনে থেকে খুঁটিয়ে দেখে অশোক বলল, 'কী, পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। মাথাটা বোধ হয় ঘুরছিল, আগে খেয়াল করিনি।' লজ্জিতভাবে একটু হাসল বিমান, 'কী অবস্থা হলো জামাকাপড়ের, দেখছেন তো !'

প্রায় টেনেই ওকে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দিল অশোক।

'লাগেনি তো মশাই ! দেখে তো মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়ে গেছেন !'

'না, তেমন কিছু লাগেনি। তবে—', ধুতিটা হাঁটুর ওপর তুলে আনল বিমান, 'এই—এইখানটায় একটু—'

'ইস্, এ তো বেশ কেটে গেছে মশাই !' ব্যস্ত হয়ে সাহেবকে ডাকল অশোক, 'সাহেবদা, আয়ডিন-টায়ডিন আছে কিছু ? নিয়ে আসুন তো।'

বাইরে এসে একবার ব্যাপারটা দেখে নিল সাহেব। তারপর কাউন্টারের পিছনের আলমারি খুলে ডেটলের শিশি আর তুলো বের করে আনল।

বিমান হেসে বলল, 'এতোর কী দরকার ছিল ! পোড়-খাওয়া মানুষ, এসবে আমার কিছু হয় না।'

ডেটলে তুলো ভিজিয়ে কাটা জায়গা ধুয়ে দিচ্ছিল অশোক। মুখ তুলে দেখল বিমানকে।

'জার্ম কি আর বিচার করে আসে !'

'তা ঠিক।'

বিমান ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছিল না। ইতিমধ্যে চা বলেছিল অশোক। কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'খেলা দেখলেন ?'

'দেখেছি— । প্রতাপ আজই আপনার কথা বলছিল।'

'বলছিল !' প্রতাপের কথায় একটু উজ্জ্বল দেখাল বিমানকে, 'গোলটা দেখেছিলেন ? ব্রিলিয়ান্ট ছাড়া কেউ পারে ওই গোল দিতে ? বলুন ?'

অশোক হেসে বলল, 'সব তো আপনারই জন্যে—'

'আমার জন্যে ! কে বলেছে !'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল বিমান মিত্তির। ভুরুর ওপর চিকচিক করছে সুরকির গুঁড়ো ; নাকের পাটায় ছড়ে-যাওয়া দাগটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'লোকে বলছে আমিই ওর সর্বনাশ করেছি ! নিজে নাম কেনার জন্যে আমি ওকে খেলতে নামিয়েছিলাম !'

'সে কী !'

'হ্যাঁ, বলেছে। নিজের কানকে কি অবিশ্বাস করব !'

উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল বিমান। দেখে মনে হলো রাগটা চাপার চেষ্টা করছে। ক' মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, 'চলি ভাই—'

অশোক লোকটিকে দেখছিল। ওর উত্তেজিত কথাবার্তার সঙ্গে পড়ে-যাওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কি না ভাবছিল। প্রায় দৌড়নোর মতো করে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল বিমান।

'বিমান মিত্তিরের মাজার জোর নেই, বিমান মিত্তির মরে যাবে। কিন্তু দেখবেন, ওই ছেলে ঠিক উঠে দাঁড়াবে—ওই পায়ের জোরেই নাম করবে, লাথি মারবে সকলের মুখে।'

লোকটা চলে যাবার পরও ওর কাঁপা, ভাঙা-ভাঙা গলার স্বর বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ করে রাখল অশোককে। সাহেব দাঁড়িয়ে আছে কাছে। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝলেন ? লোকটা হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন !'

'দূর ! ও তো বরাবরের ক্ষ্যাপা !' সাহেব বলল, 'বিয়েথা না করলে যা হয়। সারা জীবন কেউ ফুটবলের সঙ্গে ঘর করতে পারে নাকি !'

অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট মুখে দিল অশোক। আর এক প্রস্ত চা খাবে কি না ভাবল।

রাত এখনো বেশি হয়নি। যাত্রী নিয়ে কয়েকটা রিক্সা চলে যাচ্ছে কালীটোলার দিকে। বোধ হয় ইভনিং শো ভাঙল। সাহেব খবর এনেছে পুজোর ক'দিন বাংলা ছবি দেখানো হবে। যদি হয়, একদিন জোর করে নিয়ে যাবে বাণীদিকে। সময় ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ ; কমে যাচ্ছে ভালোবাসার মানুষ। কল্যাণদারা যদি সত্যি সত্যিই চলে যায়, স্বস্তিহীন এই নিঝুম শহরে সে কি আরো একটু একা হয়ে পড়বে না !

অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অশোক। নড়ছে ভাবনাগুলো। ঠিক বোঝা যায় না কোনটা আগে, কোনটা পরে। একাগ্র মনে চিন্তা করলে দুর্বল হয়ে আসে স্নায়ুগুলো।

হঠাৎ মনে হলো চেনা গলায় কেউ ডাকল তাকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল ঘোড়া আস্তাবলের কাছে বিষাণ দাঁড়িয়ে। অশোকের চোখ পড়তেই হাতছানি দিল।

'এখানে দাঁড়িয়ে কেন !' কাছে গিয়ে বলল অশোক, 'ধার তো শোধ হয়ে গেছে !'

'টাকাটা তুই দিয়ে দিয়েছিস, অশোক। তোকে তো দিতে পারিনি এখনো ! ওখানে যেতেই লজ্জা করে কেমন।'

বোকা বোকা হাসল বিষাণ। পাজামার ওপর স্যাণ্ডো গেঞ্জি, পায়ে রবারেব চটি—ওই পরেই বেরিয়ে এসেছে। অশোক আর কিছু বলার আগেই ডান হাতের হলুদ-মাখা চেটোটা চেপে ধরল তার নাকের ওপর।

'দ্যাখ তো, গন্ধ পাচ্ছিস ?'

হাতটা একটু শুঁকে অশোক বলল, 'মাংস রেঁধেছো ?'

'কিসের মাংস বল তো ?'

অশোক একটু ভাবল, গন্ধটা আবার ফিরিয়ে আনল নাকে। কোনো তারতম্য করতে পারল না।

'হাঁসের রে, বুঝতে পারছিস না !'

'হাঁসের ! হাঁস পেলে কোথায় ?'

'বালিহাঁস নয়, পাতিহাঁস—'

রহস্যময়ভাবে হাসল বিষাণ।

অশোক বলল, 'ব্যাপারটা কী, খুলে বলো না ?'

'দুপুরে হরেন ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিলাম। দেখলাম তিনটে চরছে। একটা পালিয়ে গেল, দুটো ধরেছি। ফাস্ ক্লাস রেঁধেছি। ভাবলাম তোকে ডাকি। চল, খেয়ে দেখবি—'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল বিষাণ। এই লোকটি একদিন তাকে নিয়ে ছিপ ফেলত নদীতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত মাছের আশায়। জেলেডিঙি নিয়ে চলে যেত মাঝগঙ্গায় শুশুক শিকারে—একদিন সত্যিই জলে রক্তের আভা দেখিয়েছিল তাকে।

সে-সব অনেক বছর আগেকার কথা। কে বলবে বিষাণদার বয়স বেড়েছে !

'কাজটা ভালো করোনি !' অশোক বলল, 'হরেন ঘোষ লোক কেমন জানো তো ! জানতে পারলে পেটাবে তোমাকে !'

'য্যা য্যাঃ !' বিষাণ কথাটা গায়ে মাখল না, 'বিষাণ ভাদুড়ীর গায়ে হাত দেবে এমন মাস্তান এখনো পয়দা হয়নি !'

বিষাণ যেন তাকে হাল্‌কা করার জন্যেই আবির্ভূত হয়েছে আজ। অশোককে হাসতে দেখে বলল, 'বাড়ি গিয়ে যেন আবার চাউর করিস না কথাটা। মাকে বলেছি ছ' টাকা দিয়ে কিনে এনেছি মুরগীহাটা থেকে। বুড়ি তো খুব খুশি, ভাবছে ছেলে রোজগার করছে। ছেলে যে কী মাল বোঝে না তো !'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'শুধুই হাঁসের মাংস ? না আরো কিছু করেছ ?'

'তুই কী রে ! আমাদের ভিখিরি ভাবিস নাকি ?'

'আরে ছি, ছি !' হেসে বলল অশোক, 'তুমি একটু দাঁড়াও। আজ খাব না সেটা বলে আসি সাহেবদাকে—'

খানিক আগেই অশোক একা হয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিল। এখন মনে হচ্ছে ধারণাটা ভুল। তার এতোক্ষণের সমস্ত ভাবনায় চিড় ধরিয়ে দিয়েছে বিষাণ।

॥ দশ ॥

দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের শব্দ। অনেকক্ষণ একটানা বাজার পর শব্দটা ঢুকে যায় স্মৃতিতে ; বাজতে থাকে ক্রমাগত। ধ্বনিটা যায় না।

গত তিন দিন ধরে শব্দটা শুনছে অশোক। শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কান। তবু আজ, বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পর, অভ্যস্ততার মধ্যেও কেমন বিচিত্র শোনাল ; শব্দের অন্তর্নিহিত বিষাদটুকু অনুভব করতে পারল পরিষ্কার। পুজোমণ্ডপে নয় ; শব্দটা উঠছে স্মৃতি থেকে—পুরনো দিনগুলি থেকে, যখন সে অনেক ছোট ছিল।

আজ নবমী। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে মাকে চিঠি লিখছিল অশোক। ইচ্ছে আছে আজই ডাকে দেবে। দশমীর দিনেই মার বেশি মন খারাপ হওয়ার কথা। কাল সময় মতো চিঠিটা হাতে গেলে হাল্‌কা হবে একটু।

লিখতে বসার আগে ভেবেছিল বড়ো হবে চিঠিটা ; লেখার মতো অনেক কথা ভেবেও নিয়েছিল। তবু, দু' লাইন লেখার পরই কলম থেমে এলো। ঢাকের শব্দটা থেকে থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। হঠাৎই মনে হলো, এই জায়গাটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই : এখানে এমন কিছু নেই যা নিয়ে সে তার এই মুহূর্তের একাকিত্ব দূর করতে পারে।

বাইরে ঝলমল করছে রোদ। যেটুকু হাওয়া আছে তাতে এখনই টান অনুভব করা যায়, সামান্য শীতের ছোঁয়াও। এবার শীত পড়বে তাড়াতাড়ি, কে যেন বলছিল সেদিন। হতে পারে ; এবার সবই আসছে সময়ের আগে আগে এবং প্রবল হয়ে। হয়তো শীতটাও পড়বে জাঁকিয়ে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল অশোক। ঠুক ঠুক শব্দ হলো দরজায় ; প্রথমে ভেবেছিল কুকুর-টুকুর হবে, তাড়া খেয়ে উঠে এসেছে রাস্তা থেকে। আবার শুনে শোয়া অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করল, 'কে ?'

জবাব পেল না। পরিবর্তে শব্দটা ফিরে এলো আবার।

একটু অবাক হলো অশোক। অবস্থাটা সত্যিই ভারী অদ্ভুত ; সে সকলের কাছে যায়, কিন্তু কেউই তার কাছে আসে না। মাঝে মাঝে বিজন, সুশান্তরা আসে আড্ডা দিতে ; ওরা আসবে না—আপাতত ওরা পুজো আর থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত। এই অবেলায় কে হতে পারে তা হলে। পুনরায় শব্দ হতে বার দুয়েক 'কে' 'কে' করল ; তারপর আলস্য থেকে দরজার দিকে এগোতে এগোতে প্রায় বিরক্ত গলায় বল, 'বোবা নাকি রে বাবা !'

দরজা খুলে অবশ্য সত্যিই অবাক হলো অশোক।

'তুমি ! এসো—'

শ্যামশ্রীর মুখে চাপা হাসি। ঘরে ঢোকার পর দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল অশোক।

'হঠাৎ এলে যে ! কোনো খবর-টবর আছে নাকি ?'

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল শ্যামশ্রী। কথা বলল না।

'কী হলো ! একেবারে চুপচাপ !'

শ্যামশ্রী হেসে ফেলল এবার। বলল, 'বোবা কথা বলবে, এটা আশা করেন কী করে !'

'ও ! তা হলে কথাটা তুমি শুনে ফেলেছ !' অশোক বলল, 'কী করে জানব যে তুমিই আসবে ?'

'এখন তো জানলেন। জানলে যা করতেন সেটা করুন।'

'দাঁড়াও তবে। কী করা যায় ভেবে দেখি।' অশোক হাল্‌কা হবার চেষ্টা করল, 'দু' মিনিট সময় দেবে? মাকে চিঠি লিখছি, শেষ করে নিই। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

'ঠিক আছে।' শ্যামশ্রী বলল, 'আপনি চিঠিটা শেষ করে নিন।'

বালিশটা আবার বুকের তলায় টেনে নিল অশোক। প্রায় সারা দুপুর চুপ থাকার পর আবার হিন্দি গান শুরু হলো মাইকে। ঘোড়া-আস্তাবলের পাশে ছোটখাট পুজো হয় একটা, সেখানেই বাজছে। এখন রাত না হওয়া পর্যন্ত চলবে।

'সঈয়া, তু পহলি ছোড়ি—', গানের কলিটা চেনা লাগল শ্যামশ্রীর। চটুল সুর; মেয়ে আর পুরুষের গলা পালা করে আসছে, যাচ্ছে; যতো দূর মনে পড়ে কোনো নাচের দৃশ্যে ছিল গানটা। ছবিটা সে দেখতে গিয়েছিল শিখার সঙ্গে, মনে পড়ল। ছবির নামটা মনে করতে পারল না। এ-রকম অনেকবার তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে শিখা। 'বাড়িতে বসে বসে তো মুটকি হয়ে যাবি,' একদিন বলেছিল, 'ফিগার ভালো আছে, তুই সিনেমায় নামার চেষ্টা কর না! নাকি ভাবছিস অশোক তোকে বিয়ে করবে?'

ঠাট্টা করেই বলেছিল। অশোকদার সঙ্গে সে কোনো দিনই প্রেম করেনি, তবু কীভাবে যেন বুঝে গিয়েছিল শিখা, অশোকের ওপর তার টান আছে। শুধু শিখা কেন, আগে আগে দিদিও বলত। অশোকদার সঙ্গে প্রথম ভাব হয় তার, সেই স্টেশন থেকে ফেরার পথেই—তাকে আর অশোকদাকে একই রিক্সায় তুলে দিয়েছিল বাবা। ভীষণ লাজুক ছিল অশোকদা, প্রায় কারুর সঙ্গেই কথা বলত না। ভাবটা প্রথম হয়েছিল বলেই বোধ হয় তার সঙ্গেই যা একটু বলত। দিদি আর মেজদি হাসাহাসি করত। একদিন রান্না ঘরে চায়ের তাড়া দিতে গেছে, তার সামনেই তরকারি কুটতে কুটতে মাকে বলল দিদি, 'যা দেখছি, তোমার ছোট মেয়েকে দিয়েই বাড়িতে বিয়ে শুরু করতে হবে মা।' মা প্রথমে বুঝতে পারেনি কথাটা। পরে হেসে ফেলল। বলল, 'মন্দ কী! ছেলেটা ভালো রে—'

দূরত্ব থেকে অশোকের দিকে তাকাল শ্যামশ্রী। উদাস হয়ে গেল একটু। এসব কথাও বাড়িতে হতো কোনো দিন!

একটা গান শেষ হয়ে আর একটা শুরু হলো। রাস্তায় বেশ ভিড়। গরুর গাড়ি সাজিয়ে গাড়িভর্তি মেয়ে পুরুষ বাচ্চারা নতুন পোশাকে যাচ্ছে বারোয়ারী মণ্ডপের দিকে। গরুর গলায় রঙ বেরঙের বড়ো পুঁতির মালা, তাতে বাঁধা ঘণ্টিতে চলার ছন্দে শব্দ হচ্ছে টুং-টাং করে। বাড়তি চেয়ার টেবিল পড়েছে সাহেববাবুর রেস্টুরেন্টের সামনে, কাঁচের তাকে ফ্রাই, কেক, বিস্কুট সাজানো। দশেরায় লোকজন বেশি হবে, এসব তারই আয়োজন। মানুষ কেমন আছে দ্যাখো, চারিদিকে উৎসব-উৎসব ভাব—কেউ যে ভালো নেই, কারুর যে মন খাবাপ, এসব দেখে কি বোঝা যায় কিছু!

জানলা থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের ভিতরটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল শ্যামশ্রী।

এর আগে কখনো না এলেও অশোকের ঘর সম্পর্কে মনে মনে একটা ধারণা করে নিয়েছিল সে। ধারণটা তৈরি হয়েছিল অশোককে দেখে, অশোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। চাপা স্বভাবের মানুষ অশোকদা; যতো কথা বলে তার চেয়ে বেশি চুপ করে থাকে, ভাবে, ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় প্রায়ই। এক একসময় মনে হয়, নিজের চেনাশোনা প্রাত্যহিক পরিবেশের বাইরেও মানুষটার আছে একটা আলাদা জগৎ—কাছাকাছি মুহূর্ত আর ঘটনা থেকে যেখানে সে চলে যেতে পারে অনায়াসে। এটাই ওর স্বভাব। শ্যামশ্রী এর ভালোমন্দ বোঝে না। মাঝে মাঝে শুধু মনে হয়, তার দয়া মায়া নির্লিপ্তি নিয়ে একদিন সত্যি

সত্যিই হারিয়ে যেতে পারে মানুষটা। কোথায় সে জানে না ; তবে সেই অন্য জগতেও হতে পারে। বড়ো ভয় করে শ্যামশ্রীর। মনে হয় মানুষটাকে একটু আড়াল দেওয়া দরকার, দরকার একটু আগলে রাখা। অশোকদা কি বোঝে এসব ? শ্যামশ্রী জানে না। মুখ দেখে, হাবভাব দেখে, কিংবা যখন ঠাট্টা করে কথা বলে অশোকদা, একটু-একটু ধরা গেলেও, সেটা খুবই মাঝে-মধ্যের ব্যাপার। পুরোপুরি ধরে রাখা যায় না। শ্যামশ্রী বোঝে না কেন তার মন কেমন করে, সংসারে এতো অশান্তি আর দুশ্চিন্তার মধ্যেও কেন সে তাকিয়ে থাকে বহু দূর সম্পর্কের এই মানুষটির দিকে। আজ সকাল থেকেই যেমন হচ্ছিল। সারা দিন মনে মনে যুদ্ধ করেছে নিজের সঙ্গে, যাবে ? যাওয়া কি উচিত হবে ? কিছু ভাববে না তো ? অবশেষে এলো।

নিজের ধারণার সঙ্গে ঘরটাকে মেলাতে পারছিল না শ্যামশ্রী। এমনিতে অপরিচ্ছন্ন নয় ; কিন্তু কোনো জিনিসটিই ঠিক জায়গায় নেই। ঘরে একটা আলনা থাকা সত্ত্বেও জামাকাপড়গুলো এদিকে ওদিকে ছড়ানো, কুঁজো থেকে জলের গেলাসটা পড়ে আছে অনেকটা দূরে, টেবিলের ওপর। অ্যাশট্রে থেকে উপচে পড়ছে পোড়া সিগারেট। বোধ হয় চা আনিয়ে খেয়েছিল কোনো সময় ; বাসি কাপটা এখনো পড়ে আছে টেবিলের নিচে।

প্রথমেই অ্যাশট্রেটা তুলে নিল শ্যামশ্রী। সিগারেটের টুকরোগুলো ফেলে দিল জানলা দিয়ে। অশোক এখনো ঝুঁকে আছে চিঠিতে ; এই ফাঁকে অনায়াসে ঘরটা একটু গুছিয়ে দিতে পারে সে। চেয়ারের মাথা, দেওয়ালের পেরেক থেকে শার্ট, ট্রাউজার্সগুলো তুলে আলনা গোছাতে লাগল শ্যামশ্রী।

'একদিন এসে ঘর গুছিয়ে লাভ কী ? এর পরেও তো ওগুলো ওইভাবেই থাকবে !'

চিঠি লেখা শেষ হয়েছিল। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল অশোক।

শ্যামশ্রী অশোককে দেখল না। কাজ করতে করতেই বলল, 'রোজ রোজ আসতে বলছেন ?'

কণ্ঠস্বরে জড়তা নেই এতোটুকু। পিছন থেকে শ্যামশ্রীর ঋজু ও পরিপূর্ণ শরীরটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে কী ভাবল অশোক। তারপর বলল, 'খবর পাঠালে আমি নিজেই যেতাম। তুমি শুধু শুধু আসতে গেলে কেন ! কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে !'

ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যামশ্রী বলল, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন ?'

'আমার ভয় পাবার কী আছে ! ভয় তোমাকে নিয়ে। কতো রকমের লোক আছে, তোমার নামেই নিন্দে রটাবে।'

শ্যামশ্রীর চোখ মাটির দিকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাকে জড়িয়ে নিন্দে করলে ভয় পাব কেন !'

ঠিক এই উত্তরটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না অশোক। সোজাসুজি তাকাল শ্যামশ্রীর দিকে। সম্ভবত এই মেয়েটি তাকে ভালোবাসে, অনেকবারই এ-কথা মনে হয়েছে তার। এই মেয়েটির কথা ভেবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায়ই সে বেঁকে গেছে বাদামতলার দিকে। তবু এতো দূর স্পষ্টতা আশা করেনি কোনো দিন—একটি কথার মধ্যে দিয়েই শ্যামশ্রী যেন চলে গেল আভাস থেকে অধিকারের দিকে।

কিছু না ভেবেই উঠে দাঁড়াল অশোক। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দু' হাতে কাছে টেনে আনল ওকে। আকস্মিক একাগ্রতায় ছেয়ে এলো শরীর। লুকোনো একটা গন্ধ পেল সে, গভীর জলের গন্ধের মতো। ডুবে যেতে ইচ্ছে করে।

নিজেকে সংযত রেখে অশোক বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয়, শ্যামশ্রী !'

ঘটনার আকস্মিকতায় একটু বিহ্বল দেখাল শ্যামশ্রীকে। ঘন হয়ে এলো দৃষ্টি। তারপর, যে-হাতে অশোক তাকে ধরে রেখেছিল, হাত তুলে তারই একটুখানি আঁকড়ে ধরে চাপা গলায় বলল, 'মেজদি কাল রাত্রে চলে গেছে অশোকদা। খবরটা আপনাকে দিতে এসেছিলাম।'

শ্যামশ্রীর অতর্কিত স্বর মাথা পর্যন্ত চলে গেল অশোকের। এই খবরটা সে এতোক্ষণ চেপে রেখেছিল কী করে। ভাবল, কী জবাব হতে পারে এ-কথার !

সরে এসে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজল অশোক। টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছে শ্যামশ্রী, পাশাপাশি দেশলাইটাও। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে জ্বেলে নেওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত যা ভাবার ভেবে নিল। শিখা চলে যাবে এটা কি সে আগেই জানত না ? শিখা নিজেই কি বলেনি একদিন, তার আর ফেরার উপায় নেই ! শিখার কি ফেরার উপায় ছিল ?

'বোধ হয় ভালোই করেছে।' ধোঁয়া গিলতে গিলতে দূর থেকে বলল অশোক, 'তোমাদের সংস্কারে লাগবে। তবু, শিখা তো অনেকটাই এগিয়েছিল—'

কথাটা শেষ করল না অশোক। বাকিটুকু শ্যামশ্রী বুঝে নিতে পারবে।

'আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। কাল সবাই থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম একসঙ্গে, মেজদি গেল না। ভোর রাতে ফিরে দেখলাম নেই। একটা কাগজ লিখে গেছে মার কাছে। আখতারের সঙ্গে নাকি আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল !'

অশোক বলল,'তা হলে তো আরো ভালো। বিয়ে করেই গেছে—'

শ্যামশ্রী বলল, 'আমাদের এতো মন খারাপ ! সারা দিন কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলিনি ! আমার আর ভালো লাগছিল না, ভাবলাম আপনার কাছে আসি। মাকে বলে এলাম। কেমন পুজোর আনন্দে আছি দেখুন !'

শান্ত, মায়াময় মুখ শ্যামশ্রীর। রঙ আর একটু ময়লা হলে দুঃখী বলা যেত। কেমন সরল ভাষায় বর্ণনা করে গেল সব কিছু, এটুও দ্বিধা না রেখে ! মনেই হয় না ঘটনাটা ঘটেছে তাদেরই বাড়িতে ; ধর্মান্তরিত যে-মেয়েটি হয়তো চিরদিনের মতো চলে গেল সংসার থেকে, সে তারই বোন ! নাকি ঘটনাটা সম্পূর্ণ নির্বোধ করে দিয়েছে শ্যামশ্রীকে—অনুভূতি দিয়ে এখন আর কিছুই ধরতে পারছে না। ঘটনা পুরনো হয়ে গেলে একদিন হয়তো শিখার অভাব টের পাবে—তখনই প্রকৃত একা হয়ে যাবে সে, আজকের মতো অশোকের কাছে ছুটে আসার কথাও মনে পড়বে না !

এই মুহূর্তে অশোক নিজেও ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। হরবিলাস ভাদুড়ীর মেয়েদের মধ্যে শিখাকেই তার মনে হতো সবচেয়ে খোলামেলা। এখন মনে হচ্ছে, ভুল, সমস্ত দিয়েও কোথাও সে একটু আড়াল করে রেখেছিল নিজেকে—সেই দুর্বোধ্যতা অশোক কোনো দিনই ছুঁতে পারেনি। এখনো কি পারছে ? সংস্কার মানুষকে বড়ো দূরে ঠেলে দেয় !

শ্যামশ্রীকে বসিয়ে রেখে পোশাক বদলে নিল অশোক। ফিরে এসে বলল, 'তুমি সেদিন বলেছিলে এক জায়গায় বেড়াতে যাবে। বলেছিলে নিয়ে যেতে, মনে পড়ছে ?'

'স্টিমারঘাটায় ?'

'হ্যাঁ।'

শ্যামশ্রীর মুখের ভাব লক্ষ করল অশোক। মনে হয় দুঃখ থেকে খানিকটা সরে এসেছে সে, একফাঁকে মুখটাও মুছে নিয়েছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক লাগছিল। এই

মেয়েটির প্রতি তার কিছু দায়িত্ব আছে, অশোক ভাবল।

'যাবে ?'

শ্যামশ্রী ঘাড় নাড়ল। বাইরে তাকিয়ে আকাশ খুঁজল। বোধ হয় দেখল বেলা আছে কি না।

'এখন পাঁচটা।' অশোক বলল, 'যেতে হলে এখনই যেতে হয়—'

বলতে বলতে জুতোটা পরে নিল সে।

আট বা ন' বছর পরে আবার একদিন তারা সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনটিকে অনুসরণ করছে। দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে এলো রিক্সাটা। ঘরবাড়ির দৃশ্য হাল্‌কা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল এক সময়। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে শ্যামশ্রীর আঁচল, ধরে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই সামলাতে পারছে না। কাঁচা রাস্তার দু'দিকের ঘন গাছপালা আর কখনো বা ন্যাড়া মাঠের পর মাঠের দিকে তাকিয়ে অশোক ভাবল, আট বা ন' বছর আগে একদিন তারা নিশ্চিন্তে এমন একটি দিনের কথা ভাবেনি। তখন শ্যামশ্রী ফ্রক পরত, হাঁটুর চামড়া ঢাকবার জন্যেই ব্যয় করেছিল অনেক উদ্যম। ইতিমধ্যে বয়স বেড়েছে। বয়স কিছু দিয়েছে, নিয়েছে তার চেয়েও বেশি। হয়তো আজও কিছু দিয়ে গেল।

শ্যামশ্রী কথা বলছে না। প্রায় যান্ত্রিক হাতে শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে তাকিয়ে আছে সামনের রাস্তা আর দু' পাশের দৃশ্যের দিকে। সামনে, বহু দূর অব্দি রাস্তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। রিক্সা যতোই নদীর দিকে এগোয়, ততোই তীব্র হয়ে ওঠে জলের গন্ধ। বুক ভরে হাওয়া টেনে নিল অশোক।

ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের মতো এখন সে আর একটা গন্ধও পাচ্ছিল। শ্যামশ্রী দেখছে, দেখুক। ওকে বলা যাবে না এই রাস্তা দিয়েই একদিন হরবিলাস ভাদুড়ীকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা। আজ শিখাও গেল। দুই যাওয়ার মধ্যে মিল নেই কোনো ; তবু শ্যামশ্রীর কাছে ঘটনাটা শোনবার পর থেকে অনুভূতি তাকে একই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

॥ এগারো ॥

পুজোর ছুটির পর সেদিনই প্রথম কলেজ খুলেছে। কল্যাণ রিজাইন করল।

বিকেলে প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে চিঠিটা দিল সে। বিনয়বাবুর হাতে। মুহূর্তের জন্যে বিচলিত দেখাল তাঁকে, এমন পরিবর্তিত মুখভঙ্গিতে কল্যাণ তাঁকে বড়ো একটা দেখেনি। কোনো রকমে পড়লেন কাগজটা। তারপর কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিকই আছে। দিস্ ইজ অ্যাকসেপ্‌টেড। আর কী বলব ?'

যেভাবে বললেন তাতে মনে হবে এ-কথাগুলোও তিনি বলতে চাননি। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আবার স্বচ্ছ স্বাভাবিক হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ।

'কলেজ তোমাকে খুব মিস করবে। আমরা সবাই তোমাকে মিস করব—'

কল্যাণের মনে হলো এই ব্যর্থ মুহূর্তের সব দায়িত্ব বিনয়বাবু একাই নিতে চাইছেন। নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে একটা কথা, যে-কোনো কথা, খুঁজল সে। কিছু না পেয়ে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল বিনয়বাবুকে।

'আরে, আরে, এখনই কী !' কাঁধ ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন বিনয়বাবু, 'আজই তো চলে যাচ্ছ না !'

স্পর্শ মনে পড়িয়ে দিল এই লোকটি তার পিতৃবন্ধু। ক' মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে কল্যাণ বলল, 'তবু স্যার, কলেজ তো ছেড়ে যাচ্ছি ! আজই আমার শেষ দিন—'

'কবে যাবে ঠিক করেছ কিছু ?'

'এখনো ঠিক করিনি।' কল্যাণ বলল, 'একটা চিঠির অপেক্ষা করছি। ভবানীপুরে একটা ফ্ল্যাট পাবার কথা আছে। খবরটা পেলেই চলে যাব।'

'তোমার কলেজ তো হাওড়ায় ?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল। বলল, 'ভবানীপুরে বাণীর আত্মীয়স্বজনরা আছেন। এখন কিছু দিন কাছাকাছি থাক।'

'ঠিক আছে', বিনয়বাবু বললেন, 'আজ এসো তবে। আমি আজকালের মধ্যেই আসব তোমার বাড়িতে।'

একটি সম্পর্কের শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত দশটি বছরে পুরনো সংস্পর্শ থেকে নতুন করে গড়ে উঠেছিল এই সম্পর্ক, আজ তা ছিন্ন হয়ে গেল। এই দশ বছরে কোনো না কোনো কাজে প্রায় প্রতিদিনই এই ঘরটায় এসেছে কল্যাণ, এই মানুষটিকে দেখেছে। বিনয়বাবুর সঙ্গে হয়তো আবার দেখা হবে ; কিন্তু আর কোনো দিনও এই ঘরটিতে সে আসবে না।

ঝাপ্‌সা চোখে কল্যাণ একবার ঘরটার চারিদিকে তাকাল। একটু দাঁড়াল, একটু ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

খোলা দরজাটির দিকে কিছুক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকলেন বিনয়বাবু। পর্দা আছে, তাই বাইরেটা দেখা যায় না। সময় বুঝেই এসেছিল কল্যাণ, ছুটির পরে, যখন আর কেউ থাকবে না। একাই গেল। গভীর একটা বিষাদ এলোপাথাড়ি শব্দ তুলল বুকে। মনে মনে প্রার্থনা করলেন বিনয়বাবু, তোমাদের ভবিষ্যৎ সুখের হোক। বলবেন ভেবেও তখন কল্যাণের সামনে বলতে পারেননি কথাটা।

বাইরে বিকেল পড়ে এলো। খোলা জানলা দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছে। হাওয়ায় এখনই কনকনে ভাব ; মনে হয় শীতটা এবার জাঁকিয়েই পড়বে। বিশেষ কিছু না ভেবেই কিছুক্ষণ জানলার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বিনয়বাবু। চোখে পড়ল খেলার মাঠ ; উইকেট তুলে, হাতে ব্যাট দোলাতে দোলাতে ফিরে যাচ্ছে কয়েকটি ছেলে। মাঠ পেরিয়ে সারি সারি তাল আর আমগাছ। তারও ওদিকে ঘন লাল হয়ে আছে আকাশটা, চিকচিক করছে দিনান্তের আলো। সন্ধে হয়ে এলো।

হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। উঠে গিয়ে কাচের জানলা দুটো বন্ধ করে দিলেন বিনয়বাবু।

কল্যাণ চলে যাবে এটা জানাই ছিল। সেদিক থেকে আজকের ঘটনা অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। তবে রেজিগনেসানটা একটু তাড়াতাড়িই এলো। জয়েন করতে এখনো মাস দেড়েকের মতো দেরি আছে ; ইতিমধ্যে পাওনা ছুটিটাও নিয়ে নিল সে। বোঝা যায় যতো দ্রুত সম্ভব চলে যেতে চাইছে এখান থেকে। টুসির জন্ম হয়েছিল এই শহরে—মৃত্যুও ; মধ্যবর্তী সাতটি বছরে সে ছিল রূপকথার মতো আশ্চর্য হয়ে। দুঃসহ সাতটি বছরের স্মৃতি নিয়ে কল্যাণ বা বাণী কারুর পক্ষেই আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। একবার ভেবেছিলেন বিনয়বাবু, দূরে গেলেই কি ভুলে যাবে ? তখন কি আরো বেশি করে মনে পড়বে না টুসিকে ! পরে ভেবেছেন, হয়তো তাঁর ধারণা ঠিক নয়। মানুষ দূরে যাবার জন্যেই দূরে

যায়। অতো কি আর ভাবে!

অনেকক্ষণ পরে আর একবার কল্যাণের রেজিগনেসানের চিঠিটা হাতে তুলে নিলেন বিনয়বাবু। ভারী অদ্ভুত চারটি কথা দিয়ে চিঠিটা শুরু হয়েছে; ফর ভেরি পার্সোনাল রিজিন্‌স্‌...। শব্দ যে কখনো এতো দূর তাৎপর্য বয়ে আনে জানা ছিল না। এতো চেনা কথাগুলি, তবু যে লিখেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে প্রতিটি শব্দের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আলাদা অর্থ, এক অব্যক্ত হাহাকার নিয়ে। ঠিকই লিখেছে কল্যাণ। গত তিন-চারটি মাসে এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন টুসিকে মনে পড়েনি তাঁর, মনে পড়েনি বাণী ও কল্যাণের কথা। এমন দিন যায়নি যেদিন আচ্ছন্ন হননি শোকে। কিন্তু একবারও কি মনে হয়েছে, জীবন অসহ্য—দুঃসহ স্মৃতি থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া! বহুবার ব্যবহৃত চারটি পুরনো শব্দের মধ্যে নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করলেন বিনয়বাবু। দুঃখ মাত্রই ব্যক্তিগত। হাজারটি মানুষের সহানুভূতি আর দীর্ঘশ্বাসেও ব্যক্তির শূন্যতা ভরে ওঠে না!

তাঁর প্রিয় ছাত্রদের একজন কল্যাণ, এই কলেজে সহকর্মীদের মধ্যে বিশেষ একজন। বছর দশেক আগে কলকাতা থেকে প্রিন্সিপালের চাকরি নিয়ে এখানে আসার পর কলেজের উন্নতির জন্যে যেসব অধ্যাপককে আনার কথা ভেবেছিলেন তিনি, সে ছিল তাদের প্রথমে। একটি মাত্র চিঠি লিখে শিলিগুড়ি থেকে এখানে এনেছিলেন তাকে। পড়াশুনোয় বরাবরই উজ্জ্বল, চমৎকার মিশুকে ছেলে; কিছু দিনের মধ্যেই জয় করে নিয়েছিল সকলকে। এখানে থাকতে থাকতে বিয়ে করল। বছর পাঁচেকের মধ্যেই হেড্ অফ দি ডিপার্টমেন্ট হলো। ধাপে ধাপে উঠছিল। এ-বছর ইউনিভার্সিটি কাউন্সিলের মেম্বারও হয়েছিল। ভাইস প্রিন্সিপালের পদের জন্যে যে দু'জনের নাম রেকমেণ্ড করে কমিটিতে পাঠিয়েছেন, কল্যাণ জানে না, তারও নাম আছে সেখানে। তাঁর রিটায়ার করতে আর বছর তিনেক বাকি। ভেবেছিলেন, যাবার আগে আরো উঁচুতে দেখে যাবেন ছেলেটিকে। কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল!

নিয়তি আর বয়ঃসীমা দিয়ে ঘেরা মানুষের জীবন, একান্তের চিন্তায় অনেক দিনই এই সত্য উপলব্ধি করেছেন বিনয়বাবু। সেই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ আর একবার অসহায় বোধ করলেন তিনি। আদর্শহীন এই শহর; যতো দিন যাচ্ছে ততোই বুঝতে পারছেন মানুষ এখানে সহজে উদ্দীপ্ত হয় না কাজে; ক্রমশ ডুবে যায় পাপে, আত্মকলহে, দুর্নীতিতে। ওরই মধ্যে অল্প একটু আদর্শ নিয়ে এসেছিল কল্যাণ, প্রকৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল ছাত্রদের। দূর থেকে এই সব দেখেছেন তিনি আর হেসেছেন মনে মনে। গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেছে বুক। দিকে দিকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে উত্তরাধিকার—শিকড় পুষ্ট হচ্ছে আরো: ভেবেছেন, আর তিনি একা নন। আজ আবার তিনি একা হয়ে গেলেন!

টুসির মৃত্যুও যাঁকে টলাতে পারেনি, আজ তাঁর চোখ ভিজে এলো। দু' হাতে চোখ চাপা দিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ বসে থাকলেন বিনয়বাবু। একটা পর্ব শেষ হলো। কাল থেকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

এই মন নিয়ে এখন আর কাজ করা সম্ভব নয়। রাতও হচ্ছে। খানিক আগেই শুনেছেন হস্টেলে খাবার ঘণ্টা পড়ার শব্দ। কলেজে এখন আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। ইত্যাদি চিন্তা করে উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু। চাপরাশিকে ডেকে ঘরে তালা দিতে বললেন। তারপর আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে ক্লান্তভাবে নেমে এলেন নিচে। চারিদিকের শব্দহীনতায় নৈঃশব্দ্যই এখন একমাত্র শব্দ। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে-আসা শীতের

হাওয়া সেই নৈঃশব্দ্য ঘন করে তোলে। ডান দিকে কমনরুম, লাইব্রেরি আর বাঁ দিকে খেলার মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সুরকির রাস্তা। ওইটুকু হেঁটে গেলে কম্পাউণ্ডের শেষ, বড়ো রাস্তা। সেখানে গেটের বাইরে রিক্সা নিয়ে অপেক্ষা করবে আবদুল। দু' বছর ধরে এই লোকটি তাঁকে নিয়মিত বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে।

শহর এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে। কলেজ থেকে মীরপুরের আগে পর্যন্ত মাইলখানেক রাস্তার দু' দিকে শুধু আম আর লিচুর বাগান ; মাঝে মাঝে দু'একটি বাগানবাড়ি ছাড়া ইঁটকাঠ চোখে পড়ে না। মীরপুরে পৌঁছেই অন্ধকার থেকে শহরটা যেন জেগে ওঠে আস্তে আস্তে। দশ বছর ধরে এই একই রাস্তায় প্রতিদিন যাতায়াত করছেন বিনয়বাবু। এখান থেকে মীরপুর হয়ে বাড়ি পৌঁছুতে কম করেও মিনিট পঁচিশেক লাগবে।

গেটের উল্টো দিকে পানের দোকানের সামনে চার-পাঁচটি স্বাস্থ্যবান যুবক দাঁড়িয়ে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। অস্বচ্ছ আলোয় মুখগুলি দেখা যায় না ভালো করে। রিক্সার ভিতর জড়োসড়ো হয়ে ঘুমোচ্ছে আবদুল। তাকে ডেকে তুললেন বিনয়বাবু। তারপর উঠে বসলেন। আজ যেন একটু বেশি ক্লান্ত লাগছে।

রিক্সাটা চলতে শুরু করার পর ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন বিনয়বাবু। মীরপুর অব্দি এইভাবেই যেতে পারবেন।

কিছু দূর যাবার পরই কেমন অস্বস্তি হলো তাঁর। রিক্সাটা যেন ঠিক ঠিক এগোতে পারছে না, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে গতি। চোখ খুলতেই দেখলেন, অন্ধকার রাস্তায় দু' পাশ থেকে দুটো সাইকেল ঠেলে আসছে রিক্সাটার গায়ে—মুহূর্তের মধ্যে তৃতীয় একটি সাইকেল এসে গতিরোধ করে দাঁড়াল। বিনয়বাবুর মনে হলো এই যুবকগুলিকেই খানিক আগে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

'রোকো—'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আবদুল। বিনয়বাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। হঠাৎই সন্দেহ হলো, সামনে বিপদ, তিনি আক্রান্ত। থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর।

যুবকগুলি ততোক্ষণে নেমে পড়েছে। একজন এগিয়ে এসে আলোয়ানসুদ্ধ তাঁর পাঞ্জাবিটা মুঠোয় ধরে নিচের দিকে টানতে টানতে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'শালা সাচ্চা আদমি !'

'ইয়ে কেয়া হো রহা হ্যায় !' দু' হাতে দু' দিকের ফ্রেম আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন বিনয়বাবু, 'ছোড়িয়ে—ছোড় দিজিয়ে—'

তারপরেই টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লেন রাস্তায়। প্রচণ্ড একটা লাথি এসে লাগল কোমরে। ক্রুদ্ধ, অশ্রাব্য ভাষায় যুবকগুলি তখনো গালাগালি করে যাচ্ছে। চোখ তুলে দেখলেন, রিক্সা নিয়ে মীরপুরের দিকে উধাও হয়ে যাচ্ছে আবদুল।

টলতে টলতে কোনো রকমে ওঠবার চেষ্টা করলেন বিনয়বাবু। তিনটি যুবক তাঁকে ঘিরে ধরেছে তিন দিক থেকে—একজনের হাতে ছোরা, একজনের হাতে রড। কোমরটা ভেঙে যাচ্ছে। দু' পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই উদ্যত খড়্গের মতো লম্বা একটি রড এগিয়ে এলো তাঁর মাথা লক্ষ্য করে।

'মাত্ মারিয়ে—নেহি—মাত্ মারিয়ে—', হাত তুলে মাথাটা আড়াল করতে করতে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। আর তখনই প্রচণ্ড আঘাত তাঁকে শুইয়ে দিল মাটিতে।

মুখটা একটু তোলবার চেষ্টা করলেন বিনয়বাবু। মৃত্যু আসছে, বুঝতে পারলেন, কপাল

আর ভুরুর ওপর দিয়ে ঠোঁটের ওপর তির তির করে নেমে আসছে তরল স্রোত ; হাঁ করতেই লোনা রক্তে ভরে গেল মুখ। আচ্ছন্নতার মধ্যেই অনুভব করলেন ছুঁচ-বেঁধানোর মতো তীব্র একটা কিছু বিধে যাচ্ছে ঘাড়ের পিছনে। মাথাটা একবার নাড়বার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তখন আস্তে আস্তে কপালটা ছুঁইয়ে দিলেন মাটিতে।

মীরপুর অব্দি প্রাণপণে রিক্সা ছুটিয়ে এনে খবরটা ছুঁড়ে দিল আবদুল। গুণ্ডারা হামলা করছে প্রিন্সিপাল সাহেবের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ছুটল কলেজের দিকে। যারা ছুটল না তাদের মুখ থেকেই খবরটা ছড়াতে শুরু করল ক্রমশ। তবে সঠিক খবর কেউই জানে না। কেউ শুনল গুণ্ডাদের আক্রমণে মারা গেছেন বিনয়বাবু ; অন্যরা ভেবে নিল, এখনো না মরলেও মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হবে না। বিনয়বাবুর রক্তাপ্লুত ও অচৈতন্য শরীরটা হাসপাতালে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই গোটা শহরের লোক জেনে গেল কী হয়েছে।

অশোক খবর পেয়েছিল দেরিতে। কলকাতা থেকে সুশান্তর এক ভাই এসেছে, কবিতা-টবিতা লেখে। তাকে নিয়ে রেস্তোরাঁর ভিতরে বসে গল্প করছিল। সাহেব বোধ হয় বাজারে গিয়েছিল, হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে বলল, 'তোমরা এখানে ! ওদিকে একটা কাণ্ড ঘটে গেল !'

'কেন ! কী হয়েছে ?'

'বিনয়বাবু প্রিন্সিপাল খুন হয়েছেন—'

'বলেন কী !' অশোক উঠে দাঁড়াল, 'সত্যি !'

'একটা লোক মরছে, আমি বাজে কথা বলব কেন ! হাসপাতালে গিয়ে দ্যাখো—'

তখনো মুখ কাঁপছে সাহেবের। একটু থেমে ত্রস্ত গলায় বলল, 'কলেজ থেকে ফিরছিলেন রিক্সায়, মীরপুরের আগে গুণ্ডারা হামলা করেছিল। রাস্তায় বডি পাওয়া গেছে—'

সাহেব কথাটা শেষ করার আগেই বিজন চেঁচিয়ে বলল, 'এ নিশ্চয়ই হরেন ঘোষের কাজ ! ওকে অ্যারেস্ট করা উচিত।'

ততোক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছে অশোক। বিনয়বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয় ; মুখচেনা মাত্র। সেই টুসির মৃত্যুর দিনেই যা কয়েকটা কথা হয়েছিল। তবু, সাহেবের মুখে খবরটা শুনেই রক্ত দ্রুত হয়ে উঠল তার ; মনে হলো, পরপর যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে তাতে এই নতুন ঘটনাই বা অপ্রত্যাশিত হবে কেন ! ঘোড়া আস্তাবলের কাছে একটা খালি রিক্সা পেয়ে উঠে বসল সে।

উত্তেজনায়, কিছুটা আতঙ্কেও, এই শীতেও ঘামছিল অশোক। যেতে যেতে মনে পড়ল বিজনের কথাটা, এ নিশ্চয়ই হরেন ঘোষের কাজ ! অস্বাভাবিক নয়। সত্যি বলতে সাহেবের মুখে খবরটা শুনে প্রথমে এই সন্দেহটা তারও মনে উঁকি দিয়েছিল। হরেন ঘোষের সঙ্গে বিনয়বাবুর মন কষাকষির ব্যাপারটা মোটামুটি সকলেই জানে এখন। কিন্তু, যে-ব্যাপারটা ও কিছুতেই ধরতে পারছিল না—ক্রোধ কি মানুষকে সত্যিই এতোটা অন্ধ করে দিতে পারে ! প্রাণের দাম কি সত্যিই এতো তুচ্ছ হয়ে গেছে ! তখনই আবার মনে হলো, ভালোবাসা যদি পেরে থাকে ক্রোধ কেন পারবে না ! শঙ্করলাল তো পেরেছিল !

ভিড় জমে গেছে হাসপাতালে। ভিতরে গিয়ে অশোক দেখল সকলেই এসে গেছে প্রায়। ছোট ছোট ভিড় ছেয়ে আছে এখানে ওখানে। এমারজেন্সি ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে গোলাপ বাগানের দিকে তাকিয়ে আছেন মিশিরজী। এক মুহূর্তের জন্যে কল্যাণকেও দেখতে পেল—একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে

ভিতরে। আউটডোরের সামনে হাত নেড়ে কয়েকজনকে কী বোঝাচ্ছে নীলু বোস। অশোককে দেখেই বলে উঠল, 'কী হে, এতো দেরি!'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল অশোক। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা— ?'

'এখনো সেন্‌স্ ফেরেনি।' নীলু বোস বলল, 'সেন্‌স্ না ফিরলে কিছুই বলা যাবে না। তবে, বেঁচেও যেতে পারেন। সিভিল সার্জন তো তাই বলছেন।'

কথা না বলে সেখান থেকে সরে এলো অশোক। এতোক্ষণ ধরে প্রবল মৃত্যু-ভাবনা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে। নীলু বোসের কথা শুনে অনুভব করল একটা পাষাণভার যেন বুক থেকে নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ভিড় থেকে সরে এসে রাস্তায় দাঁড়াল অশোক। পিছন ফিরে তাকাল হাসপাতাল বাড়িটার দিকে। ঠিক কোথায়, কেমন ভঙ্গিতে জানে না, তবে এই বাড়িটারই কোনো এক জায়গায় অচৈতন্য শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে একজন ঢাকার বাঙাল! একদিন খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতেই বলেছিল লোকটি, আই নো হাউ টু ফেস্ ইট্! অচৈতন্য শরীরে এখনো কি তার মনে পড়ছে সেই কথা!

শীতে আচ্ছন্ন চারিদিক। হাল্‌কা ধোঁয়ার মতো কুয়াশা দূর থেকে দূরে ক্রমশ আড়াল করে দিচ্ছে রাস্তা। লোকজন এখনো আসছে ; মোটরে, রিক্সায়, পায়ে হেঁটে, সাইকেলে। বেশির ভাগ মুখই অপরিচিত। ওরই মধ্যে কুয়াশার ভিতর থেকে সাইকেল ছুটিয়ে বেরিয়ে এলো একটি লোক। বাঁক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল হাসপাতালের ভিতরে, অশোককে দেখে ঘুরে এলো কাছে।

'আছে ? না গেছে!'

'এখনো সেন্‌স্ ফেরেনি—'

'যাক্, তবে আছে এখনো।' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল বিষাণ ; হাসবার চেষ্টা করল, 'সমস্ত খবরই আমি এতো দেরিতে পাই!'

বিষাণের পরনে ময়লা পাজামা, দোমড়ানো পাঞ্জাবি, তার ওপর একটা সোয়েটার চাপানো। ম্লান মুখের ভিতর চোখ দুটোই যা একটু উজ্জ্বল। দেখে মনে হয় দু' দিন দাড়ি কামায়নি। ব্যস্ত হাতে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল।

'তুমি কি বাড়ি থেকে আসছ, বিষাণদা!'

'হ্যাঁ রে। শরীরটা আজ ভালো নেই, শুয়েছিলাম। গায়ত্রীই খবরটা দিল।' ওপরে তাকিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বিষাণ! 'প্রথমে ভেবেছিলাম আসব না। পরে ভাবলাম মরে গেছে ভাবছি কেন! যদি বেঁচে থাকে ব্লাড-ট্‌লাড দিতে হতে পারে—'

নিজের ঝোঁকেই কথা বলছে বিষাণ। একটু হেসে বলল, 'তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। আমাকে তো কেউ চেনে না! দরকার হলে বলিস।'

স্থির চোখে ক' মুহূর্ত বিষাণকে দেখল অশোক। একটি মুখ সরে যাচ্ছে, আরেকটি আসছে ; এখন আরো স্পষ্ট করে চেনা যায়। বিষাণ নয়, হরবিলাস ভাদুড়ী। বিনয়বাবু সুস্থ থাকলে বলা যেত, অন্য কেউ নয়—একটু ক্ষ্যাপাটে, একটু বোকা, তবু এ তাঁরই ছেলে!

'কী দেখছিস বল তো ? ওভাবে তাকানোর কী আছে!'

'কিছু নয়।' অশোক হেসে ফেলল, 'একটা বিড়ি দাও না, খেয়ে দেখি।'

বিষাণ বিড়ি বের করল। দেশলাইটা জ্বেলে দিল।

পোড়া বিড়িপাতার ঝাঁঝালো গন্ধ একেবারে গলায় এসে ধাক্কা দিল। কাশতে কাশতে

একবার হাসপাতালটার দিকে তাকাল অশোক। এখন সবই অনিশ্চিত। তবে আরো কিছুক্ষণ তারা অপেক্ষা করতে পারে। কেন যেন মনে হচ্ছে খবরটা তাড়াতাড়িই আসবে। আকস্মিক হাওয়া এসে শরীরটা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

মৃত্যুর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ—মৃত্যু ও তাঁর মধ্যে এখনকার ব্যবধান শুধু হৃৎস্পন্দনের। নৈতিকতায় গড়া তাঁর পৃথিবী চলে গেছে বহু দূরে। যে-কোনো মুহূর্তেই থেমে যেতে পারে নিঃশ্বাস ; কিংবা, সেই ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন থেকেই আবার ফিরে আসতে পারে গোটা একটা পৃথিবী। কী করেছিল লোকটি। বাঁচবে কি। যদি না বাঁচে। একটু আগেই বিষাণদা বলেছিল কেউ তাকে চেনে না ; তাকেও কি চেনে। কী হতো দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সে যদি ছুটে না আসত। কিছুই নয়। তবু, অশোক ভাবল, বিনয়বাবু যদি মারাও যান, মৃত্যুর অনেক দিন পরেও তাঁর উদ্দেশে সে বলতে পারবে—আমি এসেছিলাম। একবুক রক্ত নিয়ে এসেছিল আরো একজন, নিজের নির্বুদ্ধিতা আর ব্যর্থতা থেকে আজও যে পৃথিবীকে কিছুই দিতে পারেনি।

গলার মধ্যেই একটা নিঃশ্বাস চেপে নিল অশোক। বিড়ির শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে দিল দূরে।

'বিষাণদা, শিখার কোনো খবর রাখো ?'

বিষাণ সম্ভবত অন্য কিছু ভাবছিল। তার চোখ হাসপাতালের ভিতরে—যেখানে থেমে-থাকা বহু লোকের মধ্যে এক-আধজন এখনো চলাফেরা করছে। দু'একজন ফিরেও যাচ্ছে। পরপর কয়েকটি সাইকেলে কয়েকজন তরুণ ছুটে গেল ভিতরে। সম্ভবত কলেজের ছাত্র। এতো রাতেও মানুষের ভিড় হাসপাতালে দিন এনে দিয়েছে। ঠিক এই রকম ভিড় হয়েছিল হরবিলাস ভাদুড়ীর মৃত্যুর দিন ; সামনের মাঠ ছাড়িয়ে আমতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল দুঃখিত, একাগ্র অসংখ্য মুখ। ওরই মধ্যে কেউ বলেছিল—'একটি মানুষ চলে গেল।'

বেশ পরে কথাটায় কান দিল বিষাণ। শূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শীতে নষ্ট রাশি রাশি পাতা, তার শব্দ ; সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই যদি কাউকে না বলিস, বলতে পারি।'

প্রায়ই এইভাবে বলে বিষাণ ; কিছু বলার আগে টেনে আনে শর্ত।

অশোক বলল, 'কাকে আর বলব।'

'গিয়েছিলাম একদিন।' বিষাণ বলল, 'আমাকে দেখেই কান্না জুড়ে দিল।'

'হঠাৎ।'

'হঠাৎ ?' অদ্ভুত চোখে তাকাল বিষাণ, 'এটা কোনো প্রশ্ন হলো ? খারাপ লাগবে না ? তবে দেখে তো মনে হলো ভালোই আছে। বড়ো-সড়ো সাজানো গোছানো বাড়ি—আখতারের পয়সাকড়ি আছে। শুনলাম গভর্নমেণ্ট ওর কাছে নাকি মেলা সিল্ক কিনছে।'

'দেখা হলো ?'

বিষাণ ঘাড় নাড়ল।

'খুব খাতির করল, জানিস। আমাকে দেখেই ব্যাটার পিরিত ঠেলে উঠেছিল, আগাগোড়া বড়ে ভাই বড়ে ভাই করে গেল—'

'তা হলে সুখেই আছে—।' অশোক বলল।

বিষাণ কথাটা শুনল কি না বোঝা গেল না। আবার তার চোখ চলে গেছে পুরনো জায়গায়। এমারজেন্সি ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে মিশিরজী আর কল্যাণদা। এখন একবার গিয়ে খবরটা নেওয়া যেতে পারে।

অসাবধানে সাইকেলটা ছিটকে পড়েছিল মাটিতে। সেটা তুলতে তুলতে দুঃখিত গলায় বিষাণ হঠাৎ বলল, 'আমাদের ফ্যামিলিটাই যেন কেমন হয়ে গেল!'

॥ বারো ॥

সেদিন শেষরাতে জ্ঞান ফিরে আসে বিনয়বাবুর। দু' দিনের মাথায় জানা যায় বিপদ কেটে গেছে—মাথার আঘাত তেমন মারাত্মক নয়, তবে হাত আর কাঁধ দুটোই জখম হয়েছে। সারতে সময় লাগবে।

আরোগ্যের খবরে সকলেই খুশি হয়েছে মনে হয় না। এই দু'দিন ধরে একটু একটু করে উত্তেজনাটা উঠছিল ওপরের দিকে, বিনয়বাবুর বেঁচে-থাকা সেটাকে সম্পূর্ণ হতে দিল না। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেল। তখন অনেকেই বলাবলি করল, হরেন ঘোষ আর তার গুণ্ডা ছেলেটাকে থানায় নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। খুন কি আর কেউ প্রমাণ রেখে করে। যতো দিন কেস্ চলবে ততো দিন ঘুস খেয়ে খেয়ে পুলিসের ওজন বাড়বে শুধু।

এসব আলোচনা সহজেই কানে আসে অশোকের। সকলের।

কালীটোলায় বিপিন পাড়ুইয়ের বাড়ির রকে রোজই সন্ধ্যায় আড্ডা বসে কিছু লোকের। অশোক সকলকে চেনে না। একদিন যাচ্ছিল ওই রাস্তা দিয়ে, বিপিন ডাকল।

'এই যে ভাই, শোন, শোন—'

কাছে আসতে বিপিন পাড়ুই বলল, 'হরবিলাস ভাদুড়ীর বড়ো মেয়ে নাকি প্রেগন্যান্ট হয়েছে?'

অশোক ভুরু কোঁচকাল, 'তার মানে!'

'যাতায়াত আছে কিনা, জিগ্যেস করছিলাম।' বলে আর একজনের দিকে তাকাল বিপিন, 'বুঝলে মদন, খবরটা তা হলে পাকা নয়।'

'সে আর আমি কী করব!' যাকে বলা হলো সে বলল, 'শ্যামবাবুর দোকানে মুগডাল কিনছিল, দেখে মনে হলো পেটটা ফুলেছে—'

তখন আর একজন বলল, 'পেট কি শুধু প্রেগন্যান্ট হলেই ফোলে!'

ক্রমশ ক্ষুব্ধ হচ্ছিল অশোক। হঠাৎ বলল, 'এসব কথা আমাকে ডেকে শোনাচ্ছেন কেন! আচ্ছা ইতর লোক তো আপনারা!'

বিপিন বোধ হয় রাগটা আঁচ করতে পারল। তাড়াতাড়ি নেমে এসে বলল, 'ঘাট হয়েছে ভাই, ঘাট হয়েছে! এখানে আর চেঁচামিচি কোরো না—'

রাগটা গেল না। আবার সাইকেলে উঠতে উঠতে একটু অসহায়ও লাগল অশোকের। এ নিয়ে একটা কিছু করা দরকার; কিন্তু কী করবে বুঝতে পারে না। কী চায় এই সব মানুষ? শুধু রাগ থেকে অসহায়তা, অসহায়তা থেকে দুঃখের দিকে ঠেলে দেয় তাকে।

রাস্তায় দেখা হলে তাড়াহুড়ো করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে বিমান মিত্তির। নিজেই শুরু করে, 'এখন তো দেখছি ভালোই আছে । নেকস্ট্‌ সিজিনে নিশ্চয়ই খেলতে পারবে, কী বলেন ?'

'পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।'

বয়স বেড়ে গেছে লোকটির। মুখে আঁশের মতো চকচক করছে খড়ি, খুস্‌কিতে ছেয়ে গেছে টাক। একটু কুঁজোও যেন হয়েছে। সন্দিগ্ধ চোখে ক'পলক তাকিয়ে থেকে আবার চলে যায় আপন মনে।

এক একদিন অন্যমনস্কতা থেকে নদীর দিকে চলে যায় সে। দ্যাখে থিকথিকে পলি নিয়ে পড়ে আছে চড়া, জল নেমে গেছে অনেক নিচুতে। ওপারে যতো দূর দেখা যায় শুধু ছোলা আর মটরের ক্ষেত—বিস্তীর্ণ সবুজ চলে গেছে দিগন্ত অব্দি। চোখে পড়ে চাষীদের কুঁড়ে আর কাকতাড়ুয়া, মাচানের ওপর কুমড়োর লতা। খেয়া নৌকোয় ওঠার আগে পায়ের জুতো খুলে হাতে তুলে নিচ্ছে নিঃসঙ্গ মানুষ। নিস্তরঙ্গ স্রোত, সেখানে আর ঢেউ খেলে না।

এবার শীতে একটা নতুন সোয়েটার পেয়ে গেল অশোক। মনেই ছিল না গায়ত্রী কোন দিন মাপ নিয়ে রেখেছিল। গায়ে পরিয়ে বলল, 'বেশ তো ফিট করেছে। শ্যামা দেখে যা তো—'

অনেকটা সময় নিয়ে নানা দিক থেকে পরখ করে শ্যামশ্রী বলল, 'ফুলহাতা করলি না কেন দিদি !'

'সামনের বছর তুই করে দিস একটা।' মিষ্টি করে হাসল গায়ত্রী, 'দেখেছ তো অশোক, শ্যামা তোমাকে পুরোপুরি ঢেকে রাখতে চায় !'

'আ- হা, আমি কী তাই বলেছি !'

শ্যামশ্রী চলে গেল। একই রকম গলা দু'জনের। হঠাৎ মনে হয় ঘরটা কেমন বড়ো বড়ো লাগছে—একটা খাট যেন এ-ঘরে ছিল ! মনে মনে চুপ করে যায় অশোক ; নতুন সোয়েটারের আনকোরা উত্তাপের ভিতরেও অল্প চিড় খেয়ে যায় বুকটা। আরো কিছু দিন যাক, ভাবে, রাজবালাকে বলবে শিখাকে ক'দিনের জন্যে নিয়ে আসতে। বাদামতলার নির্জন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সেই পুরনো গন্ধটা আবার ফিরে আসে তার কাছে, একই রকম অনুষঙ্গ নিয়ে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অশোক শুনতে পায় ক্রমশ নিঝুম হচ্ছে শহরটা। গর্ভের অন্ধকারে ভ্রূণের নড়াচড়ার মতো এখনো প্রাণ আছে ; ভয় হয়, হয়তো একদিন থেমে যাবে। ঘোড়া আস্তাবলের পাশ দিয়ে একা পথ হাঁটতে হাঁটতে উদ্দাত্ত গলায় একটি অন্ধ গান গায়—'অন্‌ধা নাচার কো দেগা রাম···।' শীতের নিস্তব্ধতা চিরে সেই করুণ কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয় চারিদিকে। এতো রাতে কে তাকে ভিক্ষা দেবে ! অন্ধকার রাস্তা কোন বৈচিত্র্য আনবে তার কাছে ! গেয়ে গেয়ে তবু সে চলে যায় দূর থেকে দূরে। স্তব্ধতা থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসে শেয়াল আর কুকুরের ডাক। ঘুমিয়ে পড়ার আগে হঠাৎই মনে পড়ে, এই রাতে দু'টি নিঃসঙ্গ মানুষ হয়তো এখনো ঘুমোতে পারছে না। সকলে ভুলে গেছে, তবু আজও প্রতিদিন শেয়াল-কুকুরের মিশ্র চিৎকার তাদের নিশ্চিন্ত হতে দেয় না।

একদিন সন্ধ্যায় খুব শীতের মধ্যে দিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল অশোক। আজ সে ইচ্ছে করেই সাইকেলটা নেয়নি। হাঁটছিল গতি যতোটা সম্ভব মন্থর করে। সাতটা

চল্লিশে ট্রেন। দাঁড়াবে মিনিট দশেক। তার একটু আগে পৌঁছুলেই চলবে। বাণীদিরা চলে যাচ্ছে। এর বেশি আগে সে যেতে চায় না।

আজ সে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়েছিল অফিস থেকে। ভেবেছিল কল্যাণদার বাড়ি হয়ে ওদের সঙ্গেই স্টেশনে যাবে। কথাও ছিল সেই রকম। তবু খানিক দূর গিয়ে ফিরে এসেছে আবার। তারপর বিকেল থেকে এতোটা সময় পর্যন্ত চুপচাপ শুয়ে কাটিয়েছে নিজের ঘরে। শুয়ে থাকতে থাকতেই অনুভব করছিল, আদ্যন্ত বিষাদে ডুবে যাচ্ছে সে।

ঠিক বুঝতে পারছিল না কেন! বাণীদি আর কল্যাণদার জন্যে! একটি আশ্রয়ের জন্যে!

পরে মনে হলো, কেন? এরা তো তার কেউই নয়! স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে হয়তো কিছু দূর অব্দি যাওয়া যেতে পারে, তার বেশি নয়। সময় কি সবই ভুলিয়ে দেয় না! টুসির মৃত্যু একদিন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সকলকে; এখন কি কেউ ভাবে, এই শহরের মাটিতেই একদিন খেলা করে গেছে ছোট্ট একটি মেয়ে! কেউ কি ভাবে, রাতের নির্জনতায় গুণ্ডাদের আক্রমণে আদর্শবাণ একটি মানুষ মুখে ও কপালে রক্ত নিয়ে মাথা পেতেছিল এই শহরের ধুলোয়! কেউ কি ভাবে, ধর্মান্তরিত একটি মেয়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে বাদামতলা থেকে। পায়ে রহস্যময় আঘাত নিয়ে তরুণ একটি ছেলে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে তার স্বপ্ন থেকে। তা হলে সে অতো ভাববে কেন!

যুক্তি দিয়ে এসব বুঝতে পারে না অশোক। অভিমান নিয়ে অনেকক্ষণ সরে থাকে দূরে।

তারপর আবার একসময় আল্‌গা হয়ে আসে স্নায়ুগুলো। মনে হয় কেউ হাত রেখেছে কপালে—কে, সে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না পিঁপড়ের সুড়ঙ্গ খুঁজে নেওয়ার মতো কখন অভিমানের ভিতর ঢুকে পড়েছে অল্প একটু সুখের অনুভূতি। হয়তো এই অভিমানের সবটুকুই সত্যি নয়। এর বাইরেও আছে আরো কিছু—জলের গন্ধের মতো রহস্যময়, যা তাকে একেবারে শূন্য হতে দেবে না। মনে পড়ল শ্যামশ্রীর মুখ; রাজবালা, গায়ত্রী আর বিষাণের মুখ। আরো অসংখ্য মুখ। জীবন জড়িয়ে যাচ্ছে জীবনের সঙ্গে; এই শহরের ভাঙাচোরা, বিবর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে থেকে এখন সে কোথায় আলাদা করে খুঁজে পাবে নিজেকে!

অন্যমনস্কতার ভিতর এই সব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাচ্ছিল অশোক। স্টেশনে পৌঁছুবার মুখে হঠাৎ ঘড়ি দেখে খেয়াল হলো দেরি হয়ে গেছে। ট্রেন এসে পড়েছে। ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল, ভাবল, চলে যাবার দিনটিতে আর একটু সময় হয়তো সে কাটাতে পারত ওদের সঙ্গে। এই দিনটিতে অন্তত অতোখানি ব্যক্তিগত না হলেও পারত। বাণীদিকে কী করে বোঝাবে, সে আসতে চায়নি, ইচ্ছে করেই দেরি করেছে!

প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে দেখতে পেল মিশিরজীকে। সঙ্গে বিনয়বাবু। গলা থেকে বাঁ হাতের কব্জি অব্দি পুরোটা প্লাস্টারে ঢাকা; কপালের ওপর থেকে ভুরু পর্যন্ত নেমে-আসা স্টিচের দাগ ভালোভাবে শুকোয়নি এখনো। চোখাচোখি হতেই হাসি ছড়িয়ে গেল মুখে।

'কী ইয়ং ম্যান, কেমন আছো?'

'আপনি ভালো আছেন?'

'এই, আছি।' অল্প শব্দ ফুটল বিনয়বাবুর হাসিতে, 'জিন্দা হ্যায়। অভি তক্ জিন্দা হ্যায়—'

শুনে মিশিরজীও হাসলেন। অশোক ওঁর মুখের বিমর্ষ ভাবটা লক্ষ করল। ঘড়ি দেখে

বললেন, 'টাইম করিব করিব হো গিয়া হ্যায়—'

অশোক ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অল্প দূরে কুলিদের পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে কল্যাণ। কাছে যেতে বলল, 'যাও অশোক, বাণী এক্ষুনি খুঁজছিল তোমাকে—'

বিনয়বাবুদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কল্যাণ।

নিজেকে একটু শক্ত করে নিল অশোক। হাতে চিবুক পেতে কামরার জানলায় বসে আছে বাণীদি, মাথাটা অল্প হেলানো। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে গালের একপাশ, কান আর চূর্ণ চুলের কিছুটা। হাতের বালাটা নেমে এসেছে কনুই পর্যন্ত। অশোক সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল বাণী। তারপর বলল, 'অশোক, আমরা চলে যাচ্ছি রে—সেই কলকাতাতেই। মনে আছে, তুই বলেছিলি?'

অশোক বুঝল, বাণীদি এখন ভাঙবে। সে এই রকমই আশা করেছিল, এই ভেবেই আসতে দেরি করেছে। হাত বাড়িয়ে বাণীর মুঠোটা ছুঁলো সে, একটু চাপ দিয়ে বলল, 'কলকাতা আপনার ভালো লাগবে।'

'জানি।' প্রায় অস্ফুট স্বরে বাণী বলল, 'জানি বলেই চলে যাচ্ছি—'

ঘন ঘন হুইসিল দিচ্ছে ট্রেনটা। স্টেশনেও ঘন্টি পড়ে গেল। কথা না বলে অশোকের হাতটা আঁকড়ে ধরল বাণী; মুখটা ঘুরিয়ে নিল কামরার ভিতরে।

কল্যাণ ছুটে আসছিল। ট্রেনে ওঠার আগে তবু থেমে দাঁড়াল একটু, এগিয়ে এলো কাছে।

'চলি, অশোক—'

কল্যাণের চোয়াল শক্ত হচ্ছে, ঠোঁট কাঁপছে। অশোক ওর হাতটা ধরে ফেলল। খুব শান্ত গলায় বলল, 'উঠে পড়ুন, কল্যাণদা। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—'

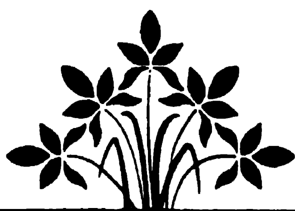
ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। কল্যাণ দরজায় দাঁড়িয়ে, বাণী জানলায়। এখন দু'জনেরই মুখ এদিকে। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই পা পা করে এগোতে লাগল অশোক। সামনে বাঁক। প্ল্যাটফর্ম ছাড়বার আগে বাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'শুধু একজন থেকে গেল—তুই দেখিস—'

বাণীদি হয়তো আরো কিছু বলত। তার আগেই বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল কামরাটা।

লোকজন ফিরতে শুরু করেছে। প্রায় ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অশোকের কানে আসতে লাগল শুধু এঞ্জিনের গতি নেওয়ার শব্দ, চাকার শব্দ। মানুষ ভুলে গেছে; হয়তো সেও ভুলে যাবে একদিন। তবু এখন, এই মুহূর্তে, অশোক ভাবল, এই দু'টি দুঃখী মানুষের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে সে আরো দু'এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারে।

এতোক্ষণে বোধ হয় ডিসট্যান্ট সিগন্যালও পেরিয়ে গেল। দূরে বিলীয়মান এঞ্জিনের একটানা শব্দে কান পেতে থাকতে থাকতে হঠাৎই তার কানে ভেসে এলো সেই ছড়াটা—'টুসি রে টুসি, খাচ্ছে চুষি....'

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বিনয়বাবু আর মিশিরজী। এখন যেতে হবে। ফেরার আগে তবু রুমালটার জন্যে পকেটে হাত দিল অশোক।



বিনিদ্র

বিনিদ্র

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৭৬ (মাঘ ১৩৮২)
প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৬·০০ । প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

উৎসর্গ :
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ এক ॥

জুনের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে হঠাৎই একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়ল দীপ্ত।

কারণ তেমন কোনো ছিল না। স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌সের সেল্‌স ম্যানেজার সিন্‌হাকে ডিনারে ডেকেছিল কাল, পার্টি ভাঙতে দেরি হলো, হ্যাংওভার কাটিয়ে ভোরে উঠতেও। ঘটনা হিসেবে এর কোথাও নতুনত্ব নেই। এরপর শুরু হবে আর একটি দিন—মেক্ ইওরসেল্‌ফ্ রেডি অ্যাজ ফাস্ট্ অ্যাজ পসিব্‌ল, মুভ্ ইওরসেল্‌ফ অ্যাজ ক্যুইক্‌লি অ্যাজ পসিব্‌ল। ঠিক। লাইফ ইজ লাইক দ্যাট। তাতে অলস বোধ করে না দীপ্ত। নড়াচড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে স্বাস্থ্য—পুরস্কারের জন্যে ভবিষ্যৎ। সে দমবে কেন!

তফাত ছিল আজকের সকালটায়। আলিপুরের আকাশ বহু দূর পর্যন্ত ছেয়ে গেছে মেঘে ; একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় রোদ চাপা দিয়ে ক্রমশ দখল কেড়ে নিচ্ছে মেঘ, বৃষ্টি দেবে। রোদ, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বহু কাল হলো, আছে শুধু এসবের স্মৃতি—পুরনো অনুষঙ্গ থেকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না কোন মেঘ বৃষ্টি দেয়। কাল রাতে ডিনারের সাফল্য ও আজ সকালের আকাশ অসময়ের আলস্য ডেকে আনল শরীরে। মধুর আলস্য। হাই তোলার অভ্যাস তার নেই। এককালে তুলত ; সে অনেক দিন আগেকার কথা—দীপ্ত তখন দীপ্ত হয়ে ওঠেনি। শরীরে ভিটামিন সি'র অভাব দূর করতে এখন প্রত্যহ সকালে পুরো এক গ্লাস কমলার রস পান করে সে।

এখন আটটা। এইমাত্র ড্রাইভারের সঙ্গে স্কুলে বেরিয়ে গেছে পাপু। জয়িতাও আড়ালে, সম্ভবত ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে ব্যস্ত। আর সবই চুপ। সচরাচর পাওয়া যায় না, তবে, দীপ্ত ভাবল, অফিসে বেরুবার আগে এখন কিছুটা সময় সে কাটাতে পারে নিজের জন্যে, বিছানার আরামে, একান্ত করে।

তবু অস্বস্তি লাগল একটু। কী ভেবে প্লেয়ারে এলভিস্ চাপিয়ে আবার বিছানায় ফিরে এলো দীপ্ত ; ইংরিজি দৈনিকটা টেনে নিয়ে টান-টান হয়ে শুলো। দুরন্ত বাজনা, স্তব্ধতার জ্যা-মুক্ত হয়ে আছড়ে পড়ছে ঘরের দেওয়ালে। এখুনি হয়তো ছুটে আসবে জয়িতা, জানতে চাইবে এই হঠাৎ-খুশির কারণ। জয়িতাকে কি বলবে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌সের বিজনেস এখন তার হাতের মুঠোয়! নাকি সে একটু দ্রুত ভাবছে! নিজেকে ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে না পেরে দীপ্ত চলে গেল 'পার্সোনাল' কলামে—গতকাল ও পরশুর মধ্যে এই স্পেস্ প্রব্লেমের দিনেও অন্তত সাতটি ধনী শিশুর জন্ম হয়েছে এই কলকাতায়, একটি মেয়ে ইতিমধ্যেই নাম পেয়ে গেছে—রূপা। বেশ তৎপর বলতে হবে এদের। পাপুর জন্যে তো এখনো একটা জুতসই মডার্ন নাম খুঁজে পায়নি তারা। জয়িতা অবশ্য বলেছিল 'প্রদীপ্ত' ; বড্ড কমন হয়ে যায় ভেবে ঠাট্টা করেছিল দীপ্ত, 'ও কোনো দিনই প্রো-দীপ্ত হবে

না, নক্সাল-টক্সাল হয়ে যেতে পারে। বরং অন্য নাম ভাবো—'

দরজায় কি কলিং বেলের শব্দ ? সম্ভবত। দীপ্ত উৎকর্ণ হলো, কাগজটা সরিয়ে রাখল পাশে, উঠল না। নিশ্চিত অপটু হাত ; না হলে এভাবে থেমে থেমে, কয়েক সেকেণ্ড ধরে বাজত না। ঘরের বাজনায় ঘষা খেয়ে শব্দটা দূর রাস্তায় ব্রেককষার শব্দের মতো অস্পষ্ট হতে হতে থেমে গেল। আলিপুরের এই নতুন ফ্ল্যাটে আসবার পর থেকে লোকজনের যাতায়াত কমে গেছে অনেক, বিশেষত সাধারণ দিনে আর সকালে। তবে ? কে এলো !

ইতিমধ্যে দরজা খুলেছে ও বন্ধ হয়েছে। জয়িতার গলা, 'কৌন আসলাম ?' জবাবটা এগিয়ে এলো ঘরের দরজা পর্যন্ত। হাল্‌কা পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করে আসলাম বলল, 'এক বাবু আয়া হ্যায়, সাব্‌।'

'বাবু ?' দীপ্ত উঠে বসল, 'কৌন সা বাবু ?'

'কেয়া বোলা, ভাই লাগতা হ্যায় !'

'ভাই !' দীপ্ত ভাবল একটু ; এ-রকম মুহূর্তে অন্যমনস্কতাই তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। বলতে চাইছিল, এখন দেখা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আসলামের সামনে সে-কথা বলা উচিত হবে না।

'ঠিক হ্যায়, বৈঠনে বোলো—'

তীব্র গানের সুর পাশ কাটিয়ে গেল। আল্‌গা হাতে প্লেয়ার থামিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দীপ্ত। সকালে উঠে মুখ ধোওয়া আর দাড়ি কামানো দুটোই সে একসঙ্গে সারে। এই মুহূর্তে পোশাক ছাড়া শরীরের আর কোথাও রাতের আবহ নেই। এসব ছাড়বে একেবারে বাথরুমে ঢুকে। প্রাত্যহিকতার কথা ধরলে এখনই তার তৈরি হওয়ার সময়। ইতিমধ্যে যিনি এলেন তিনি আমার ভাই ; রাবিশ ! অলিপ্ত আজ পাঁচ বছর লণ্ডনে, প্র্যাকটিস করছে, সম্ভবত ওখানেই সেট্‌ল করবে। ভাই বলতে সে। কিন্তু, আসলাম ভুল না শুনে থাকলে, আছে আরো কেউ কেউ—ভেবে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল দীপ্তর, চুলে ব্রাশ বুলোতে বুলোতে জিবটা ঠেলে দিল গালের দিকে। অবশ্যই সুপুরুষ সে—আয়না সাক্ষ্য দিচ্ছে ; রূঢ়তা তার সহজতম অভিব্যক্তি।

বিলেতে ম্যানেজমেণ্ট পড়ার সময় বিহেভিয়ারিয়াল সায়ান্স ছিল তার অন্যতম বিষয়। প্রায় তখন থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝতে শিখেছে দীপ্ত। এখন, ড্রইংরুমে ঢুকেই, বুঝতে পারল, আগন্তুকের চরিত্রে আর যাই থাক, নেই আত্মবিশ্বাস। না হলে চমৎকারভাবে সাজানো ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে এসে বসত সে, ঠিক পাখার নিচে। পরিবর্তে লোকটি বেছে নিয়েছে দরজার কাছাকাছি একটি আসন, একেবারে প্রান্তে, যেখানে পাখার হাওয়া পৌঁছয় না—যেখান থেকে এক পা এগোলেই চলে যাওয়া যায় দরজার বাইরে। বিশুদ্ধ বাঙালী ! পুরোপুরি না তাকিয়েই নিজের মনে অল্প হেসে নিল দীপ্ত। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ! এবং তেমন ভালো করে না দেখেও বুঝতে পারল, যুবকটিকে আগেও সে দেখেছে কোথাও, চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় ?

ইতিমধ্যে যুবকটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'এক পা এগিয়ে আসার ধরনে মনে হয় কীভাবে সূচনা করা যায় সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। দীপ্তর আচরণে আপ্যায়ন নেই, সুতরাং, যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। এ-সবই ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। দূরবর্তী সোফায় বসে ততোক্ষণে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করেছে দীপ্ত, লাইটার জ্বালল। দেখাদেখি সেও বসল।

'ইয়েস ?'

'দীপ্তদা, আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি রতন।'

দাদা সম্বোধনে দীপ্ত বিশেষ অভ্যস্ত নয়, তেমন পছন্দও করে না। মিস্টার রে, বা দীপ্ত—সম্পর্ক অনুযায়ী এ-দুটোর যে-কোনো একটিতে রুচি সাড়া দেয়। দাদা শুনলেই মনে হয় শোবার ঘরের পর্দা তুলে দাঁড়িয়েছে! প্রথম বাক্যটিতেই তাই সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারল, এখন হুট্‌ করে কিছু করা যাবে না। রতন নামটি তার চেনা, মুখটিও, মনে হচ্ছে এই সেদিনও চিনত ; যদিও পরিচয়ের উপলক্ষটা ঠিক ধরতে পারছে না।

রাশ আল্‌গা না করেই সিগারেটটা ঠোঁটে চাপল দীপ্ত।

'রতন মিন্‌স্‌ ?'

ছেলেটি হতাশ হলো। গায়ে ট্রাউজার্স আর শার্ট, পায়ে চটি, ছিপছিপে স্বাস্থ্য, মুখজুড়ে বিশ্রী তেলা ভাব। কুড়ি থেকে চব্বিশের মধ্যে যে-কোনো বয়স হতে পারে। দাড়ি কামায়নি বা গজায়নি এখনো ; গাল ও চিবুকের দিকে তাকিয়ে ঠিক বোঝা যায় না। তবে নার্ভাস, রিঅ্যাক্ট করে তাড়াতাড়ি।

'সুজনদাদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল! শম্পাদি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ?'

দুটো নামের উল্লেখেই ওলট-পালট হয়ে গেল। এরপর না-চেনার মানে হয় না। হারিয়ে ফেলা সূত্রটা টেনে নিয়ে নড়েচড়ে বসল দীপ্ত।

'মনে পড়েছে। তবে, সে তো অনেক বছর আগেকার কথা! তুমিই না হায়ার সেকেণ্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করেছিলে ?'

'ফিফ্‌থ্‌ হয়েছিলাম।' রতন আশ্বস্ত হলো একটু, 'একটা দরকারে এসেছিলাম আপনার কাছে—'

আবার আড়ষ্ট বোধ করল দীপ্ত। কথাটা না বললেও চলত ; এই চেহারা আর পোশাকে আজকাল যারা তার কাছে আসে, তারা দরকারেই আসে। দরকারের ধরনটাও অনুমান করে নিতে পারে দীপ্ত। তবু আগ্রহ দেখাল।

'বলো, কী করতে পারি আমি ?'

'মানে···', রতন ঘামছে। কপালে আঙুল ঘষে বলল, 'আপনার অফিসে ট্রেনি নিচ্ছেন, বিজ্ঞাপন দেখলাম কাগজে। আমি যদি সুযোগ পাই···'

'আই সি!'

পকেট থেকে একটা খাম বের করে হাতে নিল রতন। না দেখেই বোঝা যায় চাকরির দরখাস্ত। দীপ্ত হাত বাড়াল না ; আর একটা সিগারেট ধরাবে ভেবেও নিরস্ত হলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে ন'টার মধ্যে অফিসে পৌঁছুতে হবে তাকে, মিটিং আছে ; একটা ফোনও আশা করছে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌স্‌ থেকে। সিন্‌হার কাছ থেকে মোটামুটি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও চূড়ান্ত কিছু না-হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যাবে না। সিন্‌হার পরেও আছে মুখার্জি এবং টপ লেভেল, এ-বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তই সব। সুবিধে হলো সিন্‌হাও আপ-অ্যাণ্ড-কামিং, হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই রিপ্লেস করবে মুখার্জিকে। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় নষ্ট করল রতন। ক্লেভার চ্যাপ! ভাই বলে পরিচয় না দিলে সে হয়তো দেখাই করত না, তার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে দুটি নতুন নাম—সুজন আর শম্পাদি। দীপ্ত অকৃতজ্ঞ নয়। এক হিসেবে ওই দুটি নামের চুম্বকই প্রোথিত করে রাখল তাকে।

'তুমি এখন কী করো ?'

'বিশেষ কিছুই নয়। ইকনমিক্সে অনার্স ছিল, বি-এ পাশ করার আগেই বাবা মারা গেলেন।' একটু থামল রতন, সোজাসুজি তাকাল দীপ্তর মুখের দিকে। 'একটা স্কুলে পড়াচ্ছি আপাতত, লিভ ভেকান্সি। টিউসানও করি। বাড়িতে খাবার লোক পাঁচজন। বড়োই অসুবিধেয় আছি। শম্পাদি আপনার কথা বললেন। আপনি যদি একটু দ্যাখেন, দীপ্তদা—'

ডিসগাস্টিং! দীপ্ত উঠে দাঁড়াল। ছেলেটি পড়াশুনোয় ভালো, কিন্তু বেসিকালি ডাল ; এই বয়সেই ভুগছে হীনমন্যতায়। নিতান্তই শম্পাদির সুপারিশ নিয়ে এসেছে, নয়তো যেখানে ও 'দীপ্তদা' বলে মেরুদণ্ড নোয়াল, আর কেউ-কেউ সেখানে 'স্যার' বলত। এরা ভাবে চাকরি প্রার্থনায় মেলে! এসব নতুন দেখছে না দীপ্ত, জানে কাজ হবে না এদের দিয়ে। চাকরি চাইতে চাইতেই ফুরিয়ে যাবে সব উদ্যম ; তারপর, যদি পেয়ে যায় চাকরি, শুরু হবে নিশ্চিন্তে হাই তোলার জীবন! মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে চরিত্র নেই, ধরনে আক্রমণ নেই কোনো।

কিন্তু, ছেলেটি কি বুঝবে না, সময়ের দাম আছে দীপ্তর—একজন চাকুরিপ্রার্থীর প্যানপ্যানানি শোনার জন্যে গোটা সকালটা সে নষ্ট করতে পারে না। রীতিমতো চাপ পড়তে শুরু হয়েছে শিরায়। নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করে এসে দীপ্ত বলল, 'ঠিক আছে। এখনও কিছুই ফাইনালাইজ হয়নি, সময় লাগবে। দেখি কী করতে পারি।'

এতোক্ষণে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রতন।

'আপনারা যা যা চেয়েছেন, আমার সবই আছে। এই অ্যাপ্লিকেসানটা কি দিয়ে যাবো ?'

'পাঠিয়ে দিলেই ভালো হতো।' সংযত গলায় বলল দীপ্ত, 'ঠিক আছে, দিয়ে যাও। আজ আমি ব্যস্ত আছি একটু—'

দরজার প্যাঁচটা নিজের হাতেই খুলে ধরল দীপ্ত। এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না নিজেকে।

রতনও সম্ভবত আঁচ করতে পারল। বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আপনার অসুবিধে করলাম বোধ হয়—'

'নট অ্যাট অল—'

বিরক্তিটা প্রকাশ পেল দরজা বন্ধ করার শব্দে। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'বল্‌স্‌...'। হাতের মুঠোয় খুব স্বাভাবিকভাবে কুঁকড়ে এলো খামটা।

বেডরুম-সংলগ্ন ব্যালকনিতে নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়িতা। অন্যমনস্ক। দীপ্ত পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খুব নরম আলোয় বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটাকে এখান থেকে দেখাচ্ছে সদ্য ভোরবেলার মতো ; জনবিরল, প্রায় শব্দহীন। একটু আগে, দীপ্তর হাঁটাচলার মাঝখানে, ছুটে গেছে একটা গাড়ি, শব্দের রেশ বলতে ওইটুকুই। অল্প হাওয়ায় অনিচ্ছুকভাবে দুলছে গাছের পাতাগুলো। অবশ্য একেবারে জনশূন্য বলা ভুল। দীপ্ত লক্ষ করল, রাস্তার একধার দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে একটি যুবক, হাঁটার ধরনে স্টাইল নেই কোনো—ভিড়ের রাস্তা হলে অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে যেত।

কিন্তু, সে বিশ্বাস করে স্টাইলে, অ্যাগ্রেসানে। ভেতোমি সহ্য করতে পাবে না, আদ্যন্ত বাঙালিপনাও। বলতে গেলে তার নিজেরও প্রধান সম্পদ ওই দুটি—যা নিয়ে ক্রমশ গড়ে উঠেছে তার চরিত্র, চরিত্র থেকে ক্রমশ মিশে গেছে রক্তে। যখন সে কিছুই করত না, জীবন

ছিল অনিশ্চিত, চলায় বলায় তখনও অভ্যাস করে গেছে স্টাইল। তা না হলে মফঃস্বল শহরের এক হোমিওপ্যাথের ছেলে মাসিক সাড়ে তিন হাজার নিয়ে আলিপুরের এই বিশাল ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে পারত কি! মনে তো হয় না। এ-জন্যে পরিশ্রমও কম করতে হয়নি তাকে। মনে আছে, ঠিক উচ্চারণে ইংরিজি বলা শেখার জন্যে একদা সে পাঠ নিত এক ফিরিঙ্গি সাহেবের কাছে; চুল ছাঁটত সাহেব পাড়ায়, সচেতন হয়েছিল ট্রাউজার্সের লেটেস্ট কাট নিয়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে বেশি অভ্যস্ত হতে শিখেছিল জ্যাজে। পৃথিবী তখনো বহু দূরে, তবু। 'তোর জন্যে মায়া হয়, দীপ্ত', একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল শম্পাদি, 'সাহেবরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর সাহেব হতে শুরু করলি!'

কথার কথা, খোঁচা দেওয়ার সম্পর্ক শম্পাদির ছিল না। হস্টেলে রুমমেট ছিল সুজন, সপ্তাহে দু' দিন দেখা করতে আসত শম্পাদি। কিন্তু ভাইয়ের থেকে কখনো আলাদা করে দ্যাখেনি তাকে। সারাক্ষণ পলিটিক্স নিয়ে মেতে থাকত সুজন, কোনো দিন পাজামা পাঞ্জাবির ওপরে ওঠেনি। 'ল অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটির একটা এক্সেপ্সান্ দীপ্ত—', বলেছিল, 'বুঝলি দিদি, কনট্রাস্ট। কী ভাগ্যিস দীপ্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরে না! না হলে আমি দাঁড়াতে পারতুম না ওর পাশে!' এ-কথাতেও খোঁচা থাকতে পারে না। চেহারা ও ভঙ্গিতে তখনই প্রাণবান পৌরুষের অধিকারী দীপ্ত। তবু বিঁধেছিল বুকে। জবাব দিতে পারেনি। আত্মীয়া সম্পর্কের বাইরে শম্পাদিই তার জীবনের প্রথম নারী; সুন্দরী না হলেও স্বাস্থ্য ও স্বভাবে ব্যক্তিত্বময়ী, তার সান্নিধ্যে সর্বদাই দুর্বলতা অনুভব করত। সেদিন কথাগুলো হজম করলেও আজ মনে হয় নিজেকে শুধরেছে শম্পাদি। রতন এসেছিল তারই সুপারিশ নিয়ে। শম্পাদি কি আর জানে না, এককালের অভ্যাস কতো দূর সার্থকতায় নিয়ে গেছে দীপ্তকে! ইয়েস, আই অ্যাম অ্যান এক্সেপ্সান্!

ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকালে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। হানা দেয় স্মৃতি। এমনও হতে পারে, আজকের উপলক্ষই তাকে ধাবিত করেছিল স্মৃতির প্রতি। হুঁস হলো জয়িতার প্রশ্নে।

'হু ওয়াজ দ্যাট চ্যাপ?'

'চাকরি চায়।' দীপ্ত বলল, খামটা তখনো হাতের মুঠোয় ধরা, 'ওয়াণ্টস্ টু বি এ ট্রেনি…'

'ডু ইউ নো হিম? বাড়িতে এলো!'

'ওয়েল, ইন এ ওয়ে আই নো হিম। শম্পাদি পাঠিয়েছিল…'

'তাই বলো!' এখনো নাইটি ছাড়েনি জয়িতা। ঘাড় পর্যন্ত নামা চুলে চিরুনি জড়ানো। বাঁকিয়ে বলল, 'ইওর ওল্ড্ ফ্লেম্! সেই জন্যেই সকালে এতোটা সময় দিলে!'

'ডোণ্ট বি সিলি!'

বাতাস এখন খুব সরল। মেঘে মনোরম হয়ে উঠেছে দিনের আলো। ঘাড়ের পিছন থেকে জয়িতার বুকের অনেকটাই দেখা যায়—মধু ও অলিভের সুসম ব্যবহারে চমৎকার হয়ে আছে সব কিছু। দীপ্ত প্রলোভিত হলো। চকিতে হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে টেনে নিল স্ত্রীকে। যেন একটা ফণা তোলা সাপের মাথা আটকে পড়েছে মুঠোয়। ছটফট করে উঠল জয়িতা।

'উফ্! ইউ হ্যাভ হার্ট মি!'

দীপ্ত জানে এখন কী করতে হবে। জয়িতাও। শারীরিক সম্পর্কে দীপ্তর দুর্বলতা নতুন নয়। দীপ্তর ইচ্ছেমতো বিছানায় এলিয়ে পড়ল সে, দীপ্তকে মুখ বাড়ানোর সুযোগ

দিল—ঠিক ততোক্ষণই, যতোক্ষণ না হলে এই মুহূর্তটির অপচয় হতো।

'বাস্ করো বাবা! দেরি হয়ে যাচ্ছে—', নিজেকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে নিতে জয়িতা বলল, 'আজ তোমার দেরি হবে...'

'ঠিক পাঁচ মিনিট...'

পাখার হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে রতনের দেওয়া খামটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল জয়িতা।

'আমিও বেরুবো একটু। চুলটা ঠিক করতে হবে। প্লিজ ড্রপ মি অন ইওর ওয়ে...'

'ও, কে...ও, কে...'

ততোক্ষণে খাম থেকে অ্যাপ্লিকেসানটা বের করে চোখ বুলোতে শুরু করেছে জয়িতা। বাথরুমে যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিচ্ছে দীপ্ত। এও তার পুরনো অভ্যাস, সহজে দূরে যেতে পারে না।

'এ গুড্ ক্যাণ্ডিডেট।' জয়িতা বলল, 'আগাগোড়া স্কলারশিপ পেয়েছে!'

'বাট হি ডাজ্ নট স্ট্যাণ্ড এ চান্স্।'

'কেন!'

'তুমি দ্যাখোনি। অমন তেলা মুখ দিয়ে চলে না।'

'তাতে কী হয়েছে?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়িতার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিল দীপ্ত।

'জয়ি, আমি বাড়ির কাজ করার লোক খুঁজছি না। খুঁজছি দশ বছর পরে আমার রিপ্লেসমেন্ট। হোয়াট ডু ইউ থিংক্, শুধু স্কলারশিপহোল্ডার হলেই পারবে!'

জয়িতা একটা যুদ্ধের সম্মুখীন হলো। সোজাসুজি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পারবে না, তা তুমি এখনই জানছ কী করে!'

এসব প্রসঙ্গের জন্যেও ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি অভ্যাস করে রেখেছে দীপ্ত; এখনো তাই প্রয়োগ করল।

'ভাত টিপলেই বোঝা যায়...'

'তোমার অহঙ্কার বড়ো বেশি! অ্যাজ ইফ ইউ আর এ সাইকোলজিস্ট! এমনভাবে দরজাটা বন্ধ করলে...'

জয়িতা দাঁড়াল না। শেষের বাক্যটি এমনভাবে ছুঁড়ে গেল, যেন এতোক্ষণের অন্য সব কথাই ছিল উপলক্ষ, আসলে সে সরাসরি কথাটা উত্থাপন করতে পারেনি।

তবে কি দরজার শব্দই জয়িতাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ব্যালকনিতে! হতে পারে, বাথরুমে ঢুকে ভাবল দীপ্ত; এমনও হতে পারে, ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষাই করত জয়িতা—তর্কে হেরে একটা অজুহাত বেছে নিল। কিন্তু, জয়িতা কি জানে, অহঙ্কার আছে বলেই দীপ্ত আজ দীপ্ত হতে পেরেছে!

জয়িতার স্বভাবের এই আকস্মিক মেয়েলিপনা খুশিই করল দীপ্তকে। জানে, একটু পরেই গাড়িতে উঠে সে অন্য রকম হয়ে যাবে, এর আগেও যেমন হয়েছে বহুবার। কালই তো! সিন্‌হার সঙ্গে প্রথম দফা নেচে এসেই বেঁকে বসেছিল। দীপ্তকে একা পেয়ে বলল, 'কফি না বেচে লোকটার টুথ্‌পেস্ট্ বেচা উচিত!' এর চেয়ে অবাক-করা কথা দীপ্ত শোনেনি আগে। 'কেন!' বলতেই কাঁধ দুটো কান পর্যন্ত তুলে বিরক্তিতে হাত দুটো ডানার মতো দু' দিকে ছড়িয়ে জয়িতা বলল, 'বাব্বা, দুর্গন্ধ মুখে! মদের গন্ধ ছাপিয়ে উঠছে!'

দাঁত-না-মাজার জন্যে নয়, দীপ্তর সন্দেহ জয়িতা ক্ষুব্ধ অন্য কোনো কারণে। হয়তো

একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে সিন্‌হা। কিন্তু, সেই মুহূর্তে জয়িতার অস্বস্তির চেয়েও বড়ো ব্যাপার ছিল। হাসিতে গাম্ভীর্য মিশিয়ে বলল, 'দাঁত না মাজুক, দশ লাখ টাকার বিজনেস দিতে পারে। জয়ি, ইউ মাস্ট হেল্‌প্‌ মি!'

জয়িতা বলল, 'আই অ্যাম টায়ার্ড অফ দিজ পিপ্‌ল্‌!'

মনের সায় থাকুক না-থাকুক, নিজেকে মানিয়ে নিতে জয়িতার জুড়ি নেই। আবার নিজের ভূমিকায় ফিরে যেতে মুখে হাল্‌কা পাফ্‌ বুলোনো ছাড়া আর কিছু দরকার হয়নি জয়িতার। দীপ্ত কি অস্বীকার করতে পারবে গত সাত বছরে তার একটানা জয়ের ইতিহাসে জয়িতার কোনো ভূমিকা নেই বা ছিল না! একদিন জয়িতাই কি বলেনি, অহঙ্কারবোধ না থাকলে কেউ কেরিয়ার তৈরি করতে পারে না! তা হলে আজকের অহঙ্কার তাকে এতো ক্ষুব্ধ করল কেন!

নাকি একটু ভুল করছে দীপ্ত, অহঙ্কার ভেবে সে যেটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, তাতে মিশে যাচ্ছে নীতিহীন অন্য কিছু—যা এমনকি জয়িতাকেও বিরূপ করে তুলছে! দরজাটা সে বন্ধ করতে চেয়েছিল তাড়াতাড়ি, বাজেভাবে অনেকটা সময় নষ্ট হওয়ার জন্যে কিছুটা বিরক্তও ছিল সে-সময়, কিন্তু সেই মুহূর্তে শব্দ হওয়া না-হওয়ার ওপর সত্যিই কি কোনো হাত ছিল তার!

বাথরুমের নির্জনে, এই সকালে, হঠাৎই ধাঁধার সৃষ্টি হলো দীপ্তর মনে। অন্যমনস্কতার ভিতর এর থেকে বেরুবার একটা উপায় খুঁজল সে, পেল না। মাঝে মাঝে হয় এমনি, তুচ্ছ একটি ঘটনার জেরে ছড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলা—মনে হয় টান পড়ছে আত্মবিশ্বাসে! এই মুহূর্তে যেমন হলো। বিভ্রান্ত দীপ্ত শাওয়ারের ট্যাপটা ঘুরিয়ে দিল আস্তে, দেখল, উচ্ছলতা থেকে প্রবল বৃষ্টিধারা আস্তে আস্তে কেমন লুকিয়ে নিচ্ছে বিন্দুগুলি। শেষে, যখন আর একটিও বিন্দু থাকল না, কোনো রকমে গায়ে তোয়ালে ঘষে নিঃশব্দে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো সে।

॥ দুই ॥

বৃষ্টির আভাস দিয়ে থিতিয়ে থাকল মেঘ, বৃষ্টি হলো না। গুমোট বেড়ে চলল শুধু। ঠাণ্ডা ঘরে বসেও অসহ ভাবটা টের পাচ্ছিল দীপ্ত; উঠে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করে এলো এয়ার-কণ্ডিসানারের স্যুইচ—স্বস্তি হলো না। বাইরের প্রত্যক্ষ আবহাওয়ার সঙ্গে সম্ভবত এর সম্পর্ক নেই কোনো, হঠাৎই মনে হলো তার, অনুভূতিটা উঠছে ভিতর থেকে। কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে আড়ষ্ট আকাশ, আটতলা থেকে দেখা বলেই ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো উঁচু মাথার বাড়িগুলো ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট হয় না। মেঘে প্রকৃতিস্থ এই আকাশের কোথাও আছে সীমাহীন রুক্ষতা—সমুদ্রে ডুবে-থাকা কঠিন পাহাড়ের ক্বচিৎ জেগে-ওঠা মাথার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে যেমন হয়, কাঠিন্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে চোখ, এখনো সেই রকম হচ্ছে। বিয়ের এক বছরের মধ্যে মৃত একটি শিশুর জন্ম দিয়েছিল জয়িতা—ঘটনাটা ঘটার কয়েক দিন আগে থেকেই শরীর কঠিন হয়ে যাওয়ার অনুযোগ করত, এই মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘটনাটা মনে পড়ে গেল দীপ্তর।

অনুভূতিটা সুখের নয়। ভাবনাগুলোকে একাগ্র করার চেষ্টা সত্ত্বেও গলে যাচ্ছে ফাঁক-ফোকর দিয়ে—নিয়ন্ত্রিত তাপের ভিতরেও যেমন ঢুকে পড়ে অসহিষ্ণু উত্তাপ। এই নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে সে তৃতীয় সিগারেটটি ধরাবার চেষ্টা করল—একটি মাত্র আশায়, যদি ফিরে পায় নিজেকে।

অথচ, তার কাজ ছিল ; একটা নয়, অনেকগুলো। হিসেবমতো রাতে ঘণ্টা ছ-সাতের ঘুমে নিমগ্ন সময় ছাড়া বাকি সব সময়টুকুই তার কেটে যায় কাজে, কিংবা কাজের উদ্দেশ্যে, কাজ না থাকলে চিন্তায়। ঘুমের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে কাজ। গত তিন বছরে এর বাইরে সে আর কিছু করেছে মনে করতে পারে না, এমনকি ছুটির দিনেও। জয়িতার অনুযোগে মাঝে মাঝে কান দিলেও কার্যত সব অনুযোগ পুষিয়ে দিয়েছে বা চেষ্টা করেছে সে-জন্যে, অন্যভাবে—অর্থ ও সাচ্ছল্য দিয়ে। তিন বছরে, আলিপুর নিয়ে, অন্তত চারবার বাসা বদল করা হলো। স্কোয়ার ফুটের ক্রমবর্ধমান হিসেব দিয়েই এখন সে পরিমাপ করতে পারে নিজেকে।

ইতিমধ্যে দুই থেকে পাঁচে পৌঁছেছে পাপু। আরো মসৃণ হয়েছে জয়িতার ত্বক—ছোটো হয়েছে চুলের বহর, দীপ্ত মনে করতে পারে না শেষ কবে খোঁপা বেঁধেছিল জয়িতা। মনে করতে পারে না শেষ কবে সপরিবারে বাইরে বেরিয়েছিল সে—খুঁজতে সেই বিরল মুহূর্ত, যাতে, শুনেছে, অনেকেই অভ্যস্ত। বেরুনো বলতে সোস্যাল কল্—একে কি একান্ত বলা যাবে ? নাইট শোয়ে সিনেমা ? হ্যাঁ, গেছে ; কিন্তু পাপুকে আয়ার কাছে রেখে, জয়িতাকে হিচড়ে নিয়ে, কিছুটা অশান্তি এড়াবার জন্যে—ধর্মভীরু নাস্তিক যেভাবে ছুটে যায় রবিবারের গির্জায়। এই সব সময় মনে পড়ে পাপুকে। পাপুর মুখে তার আদল, কিন্তু সংস্পর্শে দূরত্ব অনেকখানি। বিষয়টা বুঝতে পারে যখন দিনান্তে অফিস থেকে ফিরলেও কাছে আসার জন্যে তেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে না পাপু, আয়ার সামনে বসে যখন সে আপন মনেই পাতা উলটে যায় ছবির বইয়ের, আর চকিত হয়ে ওঠে কলিং বেলের শব্দে—কোনো নির্দেশ ছাড়াই ছুটে যায় বাবা-মা'র সান্নিধ্য থেকে নিজের ঘরে, আয়ার কাছে, নির্বাসনে। মনে পড়ে, ড্রাইভারের বদলে একদিন সে নিজেই গিয়েছিল স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতে পাপুকে—ভেবেছিল অবাক হয়ে যাবে ছেলে। কিন্তু, অবাক হতে হলো নিজেকেই, যখন তাকে দেখেও তেমন কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না পাপু, শুধু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এলে যে ?' নিজের সন্তান বলে নয়, বস্তুত ওইটুকু ছেলের অমন নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর নিজের কানেই কেমন বেমানান শোনাল দীপ্তর। সেদিন সে এতোই অভিভূত হয়েছিল যে পাপুর পিছনে বসায় আপত্তি করেনি কোনো। ফেরার পথটুকু অতিক্রম করেছিল নিঃশব্দে।

নিঃশব্দে ? হয়তো নয়, হয়তো ওরই মধ্যে দীপ্ত খুঁজে পেয়েছিল নিজের পাঁচ বছর বা আর-একটু বেশি বয়সটাকে। স্কুল ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এসেছে—গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মুঠোয় স্টেথস্কোপ ধরা এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, কব্জিবদ্ধ ফুলশার্ট আর ধুতি, মাথার ঠিক মাঝখানে সিঁথি করে দু'পাশে নামানো কালো চুল আর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ—বগলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে তাকে তুলে দিচ্ছে রিক্সায়। রিক্সার অপরিসরে পিছনে বসার সুযোগ ছিল না, থাকলেও বসত কি ! তা হলে বাবার হাত থেকে নির্ভয়ে স্টেথস্কোপটা কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় ঝুলিয়ে নেওয়ার সুযোগ হতো না ; এবড়ো-খেবড়ো প্রায় গ্রাম্য রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে বলতে পারত না : 'বড়ো হলে আমি তোমার মতো ডাক্তার হবো।' প্রায়ই বলত কথাটা, স্টেথস্কোপের মধ্যে দিয়ে শুনত

নিজের হৃৎস্পন্দন। 'হও, কিন্তু অ্যালোপ্যাথ হতে হবে—', কম কথার মানুষ ছিল বাবা, নিজেকে প্রকাশ করত স্বচ্ছ হাসি দিয়ে, 'কতো রোজগার করবে, কতোজনের রোগ সারাবে, লোকে মানবে কতো!'

অভ্যাসটা যায়নি এখনো। তবে তফাত হয়ে গেছে একটু। রোগাক্রান্ত, এখনো সে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। শব্দের ধরনটাই যা আলাদা। কথাগুলো মিলে যায় কেমন, দিন গেলে শুধু বদলে যায় তাদের ধ্বনি, অর্থ, সম্মোহন! আকাশ দেখতে গিয়ে একটু আগেই সে ফিরে পেয়েছিল নিজের শিলীভূত সন্তানকে ; পাপুকে খুঁজতে গিয়ে ফিরে পেল শুধু তার প্রশ্ন!

অবসন্নভাবে চেয়ারের পিছনে মাথা হেলিয়ে চতুর্থ সিগারেটটি ধরাল দীপ্ত। যেন একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে—ইনভিজিলেটর দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, যে-কোনো মুহূর্তে এসে দাবি করবে উত্তর। কারণ খুঁজতে গিয়ে ছুঁতে পারে শুধু এই মুহূর্তের অসহায়তাকে, খুব সঙ্গোপনে যার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অল্প একটু ব্যর্থতাবোধ।

এমন হওয়ার কথা ছিল না। অফিসে এসেই সে বসেছিল মিটিংয়ে—পুরো টিম নিয়ে। স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্স্ নতুন ব্র্যাণ্ডের কফি ছাড়ছে বাজারে ; নতুন এই দ্রব্যটির চাহিদা আর কাটতি বাড়াবার জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করবে বিজ্ঞাপনে। একেবারে নতুন অবশ্য বলা যায় না। মাস ছয়েক আগে একবার ছাড়া হয়েছিল বাজারে, চলেনি তেমন ; খোঁজ নিয়ে ধরা পড়ল, যে-দামে ও যাদের মধ্যে এই কফি চালানোর চেষ্টা হয়েছিল, প্রথম প্রথম তারা উৎসাহ দেখালেও, শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকেনি। বিক্রি কমতে থাকল। শেষে এমন এক স্তরে নেমে এলো সমস্ত ব্যাপারটা, যখন ডিলাররাও আর স্টক করতে রাজি হলো না। প্রায়-নতুন অবস্থাতেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হলো কফিটা। সেই একই কফি এখন আবার নতুন নামে বাজারে ছাড়বার কথা ভাবছে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্স্, ভাবছে নতুন করে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা করতে। এমন এক পরিকল্পনা যা সত্যি কার্যকর হবে—আর কোথাও ঘা খাবে না।

স্টারলেট হিউম স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্সের পুরনো এজেন্সি। শুধু কফি নয়, গত পনেরো বছর ধরে গ্রিভ্সের তৈরি অন্যান্য জিনিসেরও বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা তারাই করছে। গ্রিভ্সের বিশ্বস্ত। সেই বিশ্বস্ততা চিড় খেল এতো দিনে এসে—নতুন কফিটা মার খাবার পর। এখন গ্রিভ্স্ একেবারে নতুন করে ভাবছে—স্টারলেট ছাড়াও ক্রিয়েটিভ গ্রুপ আর দীপ্তদের হিন্দুস্থান ফস্টারকে ডেকেছে ক্যাম্পেন তৈরি করার জন্যে। অসুবিধে হলো, ক্যাম্পেন তৈরি করা আর ব্যবসা পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। ঢের কাঠখড় পোড়াতে হবে সে-জন্যে, চালতে হবে কৌশল—যার সঙ্গে, আপাতত, কাজের সম্পর্ক নেই কোনো। তার একটি, সিন্‌হাকে মুঠোয় রাখা। নতুন পরিকল্পনায় অনেকটাই হাত আছে তার, সিন্‌হা বিগড়ে গেলে ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যেই ক্ষতি হয়েছে স্টারলেটের। চক্ষুলজ্জায় এবারও ক্যাম্পেন তৈরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের, কিন্তু স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্সের কফি অ্যাকাউণ্ট যে ওরা পাচ্ছে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সিন্‌হাই পেতে দেবে না।

অথচ, দীপ্ত জানে, আগেরবারের পরিকল্পনায় খুব একটা ভুল ছিল না স্টারলেটের। ভুল ছিল বাজার, ক্রেতা ও নতুন ব্র্যাণ্ডের কফি সম্পর্কে গ্রিভ্সের ব্যাখ্যায় ; নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্যে এজেন্সিকে দোষ দেওয়ার সহজতম পথটি বেছে নিয়েছে সিন্‌হা। স্বাভাবিক। আরো স্বাভাবিক সিন্‌হার মতো মানুষের পক্ষে। ক'দিন কথাবার্তা বলেই বুঝেছে দীপ্ত, মার্কেটিংয়ে

সিন্‌হার অভিজ্ঞতা কম ; বোধ আরো অস্বচ্ছ। লোকটা ভালোবাসে নিজেকে জাহির করতে। কথা শুনে ছুঁচলো হয়ে আসে জিব, বল্‌স্‌··· ! কিন্তু, বলা যাবে না এ-কথা। যতোক্ষণ স্বার্থ আছে, অন্তত ততোক্ষণ মেনে নিতে হবে সিন্‌হাকে।

দীপ্ত জানে, সহজে ভুল করার মতো এজেন্সি স্টারলেট নয়। বিজ্ঞাপন বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও টিম-ওয়ার্কের তুলনা হয় না কোনো, প্রফেসানাল নলেজেও। এজেন্সিতে চাকরি করতে এসে সে প্রথম ঢুকেছিল স্টারলেট হিউমে। সেখানে, প্রায় বছর তিনেকের অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছিল কীভাবে কী হয়—চিনেছিল রামতনু সোম আর নির্মল সেনের মতো তুখোড় বিজ্ঞাপনবিদ্‌দের। বিশ্বাস হয় না, মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে এ-রকম ভুল করবেন তাঁরা ! হয়তো এসব এড়ানো যেত, যদি বাজারে নতুন কফি ছাড়ার সময় স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌সের মার্কেটিং ডিরেক্টর অশোক মুখার্জি অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে না যেতেন, যদি তাঁর অপারেসান না হতো ; যদি, এসব কারণে, সিন্‌হা একাই ব্রিফিংয়ের দায়িত্ব না নিত !

দীপ্ত জানে। গ্রিভ্‌সের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরেই সে ফোন করেছিল স্টারলেটে, রবীন দত্তকে। রবীন আর সে একই সঙ্গে জয়েন করেছিল স্টারলেটে, সম্পর্কটা তুই-তুকারির। এতো দিনে বেশ উঁচুতে উঠে গেছে রবীন। গলা শুনেই বলল, 'কী বলবি, গ্রিভ্‌সের কফি-অ্যাকাউন্ট পাচ্ছিস, এই তো ?'

এতো সরাসরি কথাটা উত্থাপিত হবে ভাবেনি দীপ্ত। দ্বিধায় বলল, 'হঠাৎ কী হলো তোদের ?'

'হবে আবার কী ! দে আর নট হ্যাপি।'

'কারণ !'

'কারণ ?' ওরই মধ্যে ব্যঙ্গে হাসল রবীন, 'দে থট্‌ উই ওয়্যার নট এনাফ্‌ প্রফেসানাল দিস্‌ টাইম।'

'হু সেড্‌ দিস্‌ ?'

'সে অনেক ব্যাপার। ফোনে বলা যাবে না—'

'আই সি !' দীপ্ত বলল, 'তুই কি আর গ্রিভ্‌স্‌ হ্যাণ্ডেল করছিস না ?'

'করছি এখনো। তবে আর বোধ হয় করা ঠিক হবে না। আমি অলরেডি ম্যানেজমেন্টকে বলেছি, আমাকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিতে—'

'বুঝেছি। গণ্ডগোলটা তা হলে তোর সঙ্গেই হয়েছে !'

'ঠিক তা নয়।' ফোনের দূরত্ব থেকেও বুঝতে পারল দীপ্ত, হাসি ভাসছে রবীনের ঠোঁটে। একটু বা বিষণ্ণ। থেমে বলল, 'তুই তো আমাকে জানিস, দীপ্ত, আমি কি গণ্ডগোল করার ছেলে ! আই হ্যাভ দি বেস্ট্‌ অফ্‌ রিলেসান্‌স উইথ অল মাই ক্লায়েন্ট্‌স। আসল কথা হলো, মদ-টদ আজকাল আর খাই না, ম-এর বাতিক নেই, আই বিলিভ ইন স্ট্রেট ডিল। তাতে যদি কারুর না পোষায়, ওয়েল, আই অ্যাম হেল্‌প্‌লেস্‌ ! এ শালার অ্যাডভার্টাইজিং আর ভালো লাগছে না। ঘানির বলদের মতো শুধু তেল বের করে যাও। এর চেয়ে বেশ্যা হলে অন্তত মাসে তিন চার দিন ছুটি পাওয়া যেত—'

'বুঝেছি। তোর টায়ার্ড লাগছে···'

রবীন বলল, 'ভাবছি, ছেড়ে দেবো।···তোর খবর বল, চেষ্টা করছিস কফি অ্যাকাউন্টের জন্যে ? একটু বুঝেসুঝে লড়িস···'

দীপ্ত পরামর্শ চায়নি, ঘটনাটা জানতে চেয়েছিল শুধু। রবীনকে অবিশ্বাস করবার কিছু

নেই। এটা ঠিক, ব্যবসার জন্যে, আরো ভল্যুম বাড়ানোর জন্যে, ছুটতে তাকে হবেই। যে-কোনো মূল্যে। প্রফেসান সম্পর্কে রবীনের ধারণায় আস্থা নেই তার। এই মানসিকতা নিয়ে বিজ্ঞাপন জগতে, অন্তত এ-দেশে, প্রসপার করবে, এ দুরাশা মাত্র। আসলে রবীন একটু বেশি স্পর্শকাতর, একটু আলাদা, তাই একটু বাড়িয়ে ভাবছে। আর একটু এগোলে দেখতে পেত অগিল্‌ভিকে ; অল্প দূরত্বে খুঁজে পেত রামতনু সোমকে!

এটাও এক ধরনের প্যানপ্যানানি, জল না-ছুঁয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা। কেউ পারে! বলা যেত, তোর পক্ষে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। সেটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাবে ভেবে কথাটা ঘুরিয়ে দিল দীপ্ত।

'তুই একটুও বদলাসনি—'

'বলছিস!' এবার গলা ছেড়ে হাসল রবীন। 'একদিন সময় করে জানা আমাকে—মাল-টাল খাওয়া যাবে। তুই তো এখন বস্ হয়েছিস! ব্যস্ত! আমিই ডাকছি—'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না দীপ্ত। দেখাশুনো হলে রবীন হয়তো আরো কিছু বলবে, কাজ শুরু করার আগে জানাও দরকার সব কিছু। স্বার্থটা তার। বলল, 'একদিন কেন, লেট আস মেক্ ইট টুমরো। লাঞ্চ আওয়ারে। কোথায় বলতে হবে?'

'না। আমি চলে আসব।'

ফোনে যা বলতে পারেনি রবীন, বলেছিল পরে। দ্বিধায় পড়েছিল দীপ্ত। রবীন যা বলছে তার সবটাই কি তাকে সাবধান করার জন্যে, নাকি আর একটা উদ্দেশ্যও কাজ করছে আড়ালে—যাতে, অন্তত তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েও, প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায় দীপ্ত! হয়তো তাতে ব্যক্তিগত কিছু সুবিধে হবে রবীনের। এমনও হতে পারে, স্টারলেটও বেঁচে যাবে। খুব বেশি দিনের এজেন্সি নয় ক্রিয়েটিভ গ্রুপ ; ইদানীং কয়েকটা ভালো ক্যাম্পেন তৈরি করলেও ওরা বম্বে-বেস্‌ড্, মালিকানা পার্শী। সিন্‌হার কথা বাদ দিলেও, মুখার্জির যে-রকম বাঙালী-প্রীতি, তাতে, হয়তো সেই কারণেই, একটা লাইফ পাবে রামতনু সোমের এজেন্সি—যদি হিন্দুস্থান ফস্টার সরে দাঁড়ায়। সমস্যা! যদি সে-রকম কোনো উদ্দেশ্য থাকে রবীনের, একদা'র ঘনিষ্ঠতা স্মরণ করে দীপ্ত কি সরে দাঁড়াবে!

একটু অস্বস্তি বোধ করছিল দীপ্ত। এই একটা ক্ষেত্র, যেখানে সে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এইখানে এসে বুঝতে পারে, সে হিন্দুস্থান ফস্টারের অনেকখানি হলেও শুধু তাকে নিয়েই হিন্দুস্থান ফস্টার নয়। ভাবতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে, আর কোথাও না হোক, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে।

ইতিমধ্যে জয়িতার সঙ্গেও আলোচনা করেছিল সাদা মনের যুক্তি বোঝার জন্যে। রবীনকে জয়িতাও চেনে, সম্ভবত পছন্দও করে।

'ইউ মাস্ট হেল্‌প্ রবীন।' শুনেই বলল জয়িতা, 'হি ইজ এ নাইস ম্যান। তোমার মনে আছে, পাপুর জন্যে কীভাবে বেবিফুড জোগাড় করে আনতো!'

দীপ্ত হাসল, তার পক্ষে অস্বাভাবিক হাসি। প্রায় কৌতুকের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'জয়ি, তুমি তোমার বাবার মেয়েই থেকে গেছ! এখনো আমার স্ত্রী হতে পারোনি!'

'তার মানে!'

'আছে—'

আত্মস্থ হয়েছিল দীপ্ত। সিদ্ধান্ত কিছু নিতে হলে এখনই নিতে হবে। সময় নেই,

ক্যাম্পেন সাবমিট করতে তিন সপ্তাহের বেশি সময় পাওয়া যাবে না। মনে হয় সে এখনো চালিত হচ্ছে বিবেকের দ্বারা—রবীন যেমন বলেছিল ; না হলে এতো ইতস্তত করবে কেন।'

অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে দেরি হয়নি। ক্রমশ বুঝেছিল, বিবেক তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। স্বার্থ আর বিবেক একই স্রোতের বিভিন্ন ঢেউ নয়—এ-ক্ষেত্রে, এগোতে চাইলে, তাকে এগোতে হবে বিবেক ভাসিয়ে। যে-কোনো উপায়ে। একই যুক্তি দেখিয়েছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনয় চৌধুরীও, তাঁর বাড়িতে, একটু বা বিভ্রান্ত দীপু ছুটে যাবার পর—'ইজ দ্যাট দি প্রব্লেম দ্যাট ব্রট ইউ হিয়ার!' বিস্ময় নয়, যেন চাবুকই চালানো হলো আলতো হাতে। কম কথার মানুষ চৌধুরী, যখন বলেন এইভাবেই বলেন, সোজাসুজি, কখনো বা শ্লেষ মিশিয়ে—যাতে দ্বিতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা না হয়। হয়তো এটারও প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু, আজকের সমস্যা আলাদা। দীপু জানে না, আজকের সমস্যা বস্তুত কী ও কেমন—সকালের ঘটনা কেন তাকে এমন অবিন্যস্ত করে দিচ্ছে! বুঝতে পারেনি, ঠিক কোন মুহূর্তে শুরু হয়েছিল তার অন্যমনস্কতা। জয়িতার খুশিমতো তাকে নামিয়ে দিয়েছিল মার্গারেটায়—চুল তৈরি করবে ; তারপর অফিসে পৌঁছে, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মিটিং করেছে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌সের ক্যাম্পেন নিয়ে। আলোচনা করেছে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে। যদি এই অ্যাকাউন্টটা পায়, কলকাতা ব্রাঞ্চের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই হবে তার প্রথম সাফল্য। বস্তুত, কাজ করার ব্যাপারে সে একটা বাড়তি আগ্রহ বোধ করছিল ক'দিন ধরে। তারপর, মিটিং রুম থেকে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎই একটি প্রশ্নে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল সব—'কী ব্যাপার, আজ একটু গম্ভীর-গম্ভীর লাগছে! কিছু হয়েছে নাকি!' আকস্মিক প্রশ্ন ; ঠিক কে যে করল তা পর্যন্ত দেখার উৎসাহ পেল না দীপু। 'নো। নাথিং—', স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে এলো উত্তরটা। সম্ভবত তখনই একটু একা হতে চেয়েছিল সে, চেয়েছিল নিয়ন্ত্রিত তাপের মধ্যে সঁপে দিতে নিজেকে, চলে যেতে নিজস্ব আড়ালে। সময় চলে যায়।

আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসতে সময় নিল দীপু। কী ভেবে, ফোন তুলে অপারেটরকে বলল বাড়ির লাইন দিতে। জয়িতা নিশ্চয়ই ফিরে গেছে এতোক্ষণে ; পাপুরও পৌঁছুনোর কথা সাড়ে বারোটার মধ্যে। এখুনি একটা কথা বলা দরকার জয়িতাকে।

অল্প-ফাঁক দরজার বাইরে টুক্ টুক্ শব্দ। 'ইয়েস—' বলতেই ঢুকে পড়ল সমীরণ। আড়ে তাকিয়ে দীপুর মনে হলো, তখন প্রশ্নটা সমীরণই করেছিল।

'প্ল্যানটা দেখলে নাকি, বস্?'

'না—।' সামনে দিস্তাখানেক কাগজে ক্লিপ্ আঁটা। মিটিং রুম থেকে বেরিয়েই সে এগুলো দেখবে ভেবেছিল ; দেখে, সংশোধন করে, অবিলম্বে টাইপিংয়ে পাঠানোর কথা। হয়নি। তা হোক, এখন আর কোনো দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেবে না। গুরুত্ব না-দেওয়া গলায় বলল, 'ফ্র্যাঙ্কলি, সময় পাইনি এখনো।'

'তা পাবে কেন, গুরু!' সামনে যে-কোনো একটা চেয়ারে বসবার উদ্যোগ করল সমীরণ, ঠিক সাহস হলো না। যে-রকম গম্ভীর হয়ে আছে, হঠাৎ ফায়ার করে বসতে পারে। বসিং পেয়ে বসছে দীপুকে! তবু, হাল্‌কা ভাবটা বজায় রেখেই বলল সমীরণ, 'তোমার জন্যে আমিই শুধু রাত জেগে খেটে ম'লাম!'

'আমার জন্যে! কাম অন্—', ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি দুলে গেল দীপুর, 'দিস

ইজ নট মাই পার্সোনাল ওয়ার্ক !'

সমীরণ দমে গেল। দীপ্তকে সে চেনে, চেনে তার প্রতিটি অভিব্যক্তিকে। তবু অপরিচিত লাগে মাঝে মাঝে। যেমন এখন। দাঁতে নখ কাটতে কাটতে সম্ভাব্য একটা কারণ খুঁজল সমীরণ। সকালে, প্ল্যান্‌স্ বোর্ডের মিটিংয়ে, টারগেট গ্রুপ বিন্যস্ত করা নিয়ে নিখিল মুস্তাফীর সঙ্গে একটু মন্দ কষাকষি হয়েছিল দীপ্তর। নিখিলের বক্তব্য, মার্কেট ডিফাইন করা হয়নি ঠিকভাবে, সম্ভবত রিসার্চের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মন্তব্যটা খুশি করেনি দীপ্তকে ; হঠাৎই বলেছিল, 'এক্সপার্টের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।' নিখিল এরপর গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে, আর কোনো আলোচনায় অংশ নেয়নি এবং অশোভন না-দেখানোর সময় পার করেই উঠে চলে যায়। সম্ভবত দু'জনের সম্পর্ক ইদানীং খারাপ হয়েছে আরো। এটা এক হিসেবে ভালোই, ভাবল সমীরণ, যতোক্ষণ এটা বজায় থাকবে, অন্তত ততোক্ষণ সুস্থির হতে পারবে না দীপ্ত। আপাতত দীপ্তকে খুশি করার জন্যে একটা সুযোগ নিল।

'ও· কে· বস্। তুমি দেখে নাও আগে।...আমি এসেছিলাম অন্য ব্যাপারে। একটা স্কুপ আছে—'

'স্কুপ !'

সুযোগ বুঝে চেয়ার টেনে বসল সমীরণ। হাত বাড়াল দীপ্তর প্যাকেটের দিকে।

'তুমি তো কোম্পানির জন্যে জান লড়িয়ে দিচ্ছ। তলে তলে সাবোতাজ হচ্ছে খেয়াল রাখো !'

'হোয়াট !'

সন্দেহে সোজা হয়ে বসল দীপ্ত। ভুরু কোঁচকালো। অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম টান পড়েছে মেরুদণ্ডে। রিং হচ্ছে। দ্রুত হাতে রিসিভারটা তুলে কানে দিল। ওদিকে জয়িতা। লাইনটা সে নিজেই চেয়েছিল, এখন কিছু না বলে ছাড়া যাবে না।

'তুমি পৌঁছেছো কি না খোঁজ নিচ্ছিলাম—'

'হঠাৎ ! নো ওয়ার্ক টু-ডে ?'

জয়িতা এ-কথা বলতে পারে। ধরা-পড়ার ধরনে হাসল দীপ্ত ; সুবিধে এইটুকু, জয়িতা তার অস্বস্তি টের পাচ্ছে না। ভেবে বলল, 'গাড়িটা ফিরে আসেনি এখনো, তাই....'

'পাপু এই ফিরল, জাস্ট নাও। এখুনি পেয়ে যাবে।'

'ও· কে·। ছাড়ছি তা হলে—'

প্রতারণা, আশ্চর্য, তা হলে সময় বিশেষে নিজের সঙ্গেও প্রতারণা করতে পারে সে ! খানিক আগে বিবেক নিয়ে ভেবেছিল। পূর্বাপরহীন সংক্রমিত অবস্থার মধ্যে হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, সাত দিন আগে পাওয়া মা'র চিঠিটার জবাব দেওয়া হয়নি। জয়িতাও দিতে পারত—কী এমন ব্যস্ত সে ! এমনকি মাকে টাকা পাঠানোর কথাটাও মনে পড়েনি এর মধ্যে। হঠাৎ খসে-পড়া বাদামী পাতার মতো একটা আবেগ দুলে দুলে নামছিল—স্মৃতি থেকে বোধের দিকে। জয়িতাকে খুঁজেছিল সেই জন্যেই। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো প্রসঙ্গ এখন পড়ে রয়েছে সামনে। সন্ধ্যায় ফিরে যাবে বাড়িতে, তখন কি আর মনে পড়বে না মাকে ! স্লিপ বক্স থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে বড়ো বড়ো হরফে দীপ্ত লিখল : MOTHER, যতো দ্রুত লেখা যায়। সেটা ভাঁজ করে রাখল পকেটে, একটা সিগারেট টেনে নিল। হিসেবমতো সমীরণই এখন লাইটারটা জ্বেলে ধরবে।

'সাবোতাজ মানে ?'

'গেস্—'

'আই কান্ট্ গেস্ ।' ভারী গলায় বলল দীপ্ত, 'যা বলার সোজাসুজি বলো, আমার কাজ আছে—'

'দ্যাট ব্লাডি মুস্তাফী—', অপ্রস্তুতভাবে হাসল সমীরণ, 'শুনলাম, স্টারলেট হিউমে গিয়েছিল কাল !'

'তাতে সাবোতাজের কী হলো ?'

'হলো না !' নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায় গলার স্বর চড়িয়ে দিল সমীরণ, 'আমাদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি ফাঁস করে দিতে পারে । খুব সিমপ্‌ল ! নির্মল সেনের সঙ্গে খাতির আছে ওর !'

'সো, দ্যাট্‌স্ ইওর কেস্ !'

দীপ্ত হাসল, বেশ ছড়িয়ে । অপ্রয়োজনীয় ভেবে সিগারেটটা গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে ।

'সমীরণ, আমি তোমাকে লেটেস্ট স্কুপ্ দিতে পারি । মুস্তাফী যায়নি, নির্মল সেনই ফোন করেছিল মুস্তাফীকে—আমরা কবে ক্যাম্পেন প্রেজেন্ট করছি জানতে—'

'আলবাত্ গিয়েছিল—'

'ডোন্ট গেট্ এক্‌সাইটেড্ । যায়নি । ফোনটা এসেছিল আমারই এখানে, নিখিল এখানেই ছিল—'

যতো দ্রুত উঠেছিল, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো সমীরণ । প্রসঙ্গ পাল্‌টে বলল, 'আজ মিটিংয়ে শালাকে আর একটু টাইট দিলে পারতে । অডাসিটি ! তোমাকে কিনা চ্যালেঞ্জ করে !'

'সমীরণ !' থামিয়ে দিল দীপ্ত । উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার আর কিছু বলার ছিল ? আমি নোটটা দেখে নিতে চাই । প্লিজ !'

'ঠিক আছে । পরে ডেকো আমাকে— ।'

চলে গেছে । বন্ধ দরজাটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল দীপ্ত । আত্মবোধ বলে দেয় মনুষ্যচরিত্র বোঝার অধিকার আছে তার । তবু খটকা লাগে মাঝে মাঝে—যা ভাবছে তা ঠিক তো ! কী উদ্দেশ্য ছিল সমীরণের ? তাকে খুশি করা ! এ-অফিসের পঁচানব্বুই ভাগ কর্মীই তা করবার চেষ্টা করছে সারাক্ষণ—এমনকি তারাও, যারা, তার পদোন্নতি হওয়ার আগের দিন পর্যন্তও, তাকে দেখত অবহেলার চোখে । ঘৃণাও কি ছিল না ?

বয়স আর অভিজ্ঞতায় নিখিল মুস্তাফীর জোর তখন অনেক বেশি । ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার কৃষ্ণান চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, হাওয়ায় গুজব ছিল মুস্তাফী আসছে সে-জায়গায় । তার কথা ওঠেনি । লক্ষ্য থাকলেও, সে নিজেও খুব একটা আশা করেনি । তবু ক্ষীণ একটা স্বপ্ন নির্মেঘ আকাশে দূর বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝিলিক দিত মাঝে মাঝে । কারণও ছিল । বছরখানেক আগে হিন্দুস্থান ফস্টার ছেড়ে চলে যায় কিরমানি লিমিটেড । ছোট অ্যাকাউন্ট, বিজনেস ভল্যুমের দিক থেকে তেমন কিছু নয় । দেখাশোনা করত নিখিল মুস্তাফী । অ্যাকাউন্টটা চলে যাবার ব্যাপারে হয়তো নিখিলেরও ভূমিকা ছিল না ততো । কিন্তু ওই ব্যাপারেই ক্ষুব্ধ হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর । তাঁর ধারণা সময় থাকতে সচেতন হয়নি নিখিল, ক্লায়েন্ট সার্ভিসিংয়ের ব্যাপারেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি । দিলে হয়তো দুর্ঘটনা এড়ানো যেত । সন্দেহ নেই, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল সে । কিছু দিন মুস্তাফীকে দেখলেই জ্বলে

উঠত গা, পার্টিতে দাঁড়িয়ে পা কাঁপত অল্প অল্প—ইচ্ছে হতো মুস্তাফীর চওড়া কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছুঁড়ে মারে হুইস্কির গ্লাস। আশাহীনতা থেকে কেন সে একটা দাবি সৃষ্টি করে নিয়েছিল মনে—এমনকি ঘুমের মধ্যেও টেনে এনেছিল দুঃস্বপ্ন, আজও তা অনুমান করতে পারে না দীপ্ত। সম্ভবত রক্তই তাকে চালিত করেছিল এই ভবিতব্যের দিকে—যেখানে মনের মধ্যে পিঁপড়ের জল সেঁচার মতো শুধুই ঘোরাফেরা করে হননের চিন্তা।

মনে হয় সেই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছে এখন। আস্তে আস্তে অনেক বেশি সহিষ্ণু হয়েছে সে। সমীরণ তা বুঝবে না। এমনও হতে পারে, দীপ্তর ছেড়ে-যাওয়া চক্রান্তের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অন্ধ সেনাপতির মতো এখনো মুস্তাফীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সমীরণ, লড়াই থেমে যাবার পরও। সমীরণ কি জানে, দীপ্তর জায়গা থেকে এখন তার চেয়ে অনেক বেশি সহনীয় দেখায় নিখিলকে? নাকি এইভাবে, তাকে উত্তেজিত করে, একদা সাহায্যের প্রতিদান চাইছে সমীরণ? হাঃ! স্টুপিড! 'বাস্টার্ড' কথাটা আর ভাবল না দীপ্ত।

ইচ্ছে করছে ছড়িয়ে যেতে একটু। ব্যাকরেস্টে মাথাটা হেলিয়ে শরীরটাকে নিচের দিকে ঠেলে দিল দীপ্ত। নিখিলের সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছিল নিখিল, পরে বুঝেছে দীপ্ত—তখনও বোঝেনি তা নয়। আসলে হঠাৎ অহঙ্কারে ঝল্‌সে উঠেছিল সে; না হলে, পরামর্শটা মেনে নিলে, অন্যরা অপরিণত ভাবত তাকে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভুল জবাবটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ দিয়ে।

না, একবার যাওয়া দরকার নিখিলের কাছে। ক্ষমা না চাক, অন্তত দূরত্বটা ঘোচানো দরকার।

॥ তিন ॥

পরিচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে কেটে যায় কয়েকটি দিন। মাথার মধ্যে চক্রাকারে ঘোরে একটি মাত্র শব্দ—ক্যাম্পেন, ক্যাম্পেন, ক্যাম্পেন। তিনটি সপ্তাহ যেন তিনটি দিন। আর দিনগুলিও তেমনি—মুহূর্ত দিয়ে গড়া; ঘণ্টা, মিনিটের সমবায় নেই কোনো। পরিশ্রম অমানুষিক। কিন্তু সেটাও হয়ে ওঠে সহনীয়, যখন কাজ করতে করতেই আবিষ্কারের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মন। আরো নতুন কিছু তথ্য, ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রলুব্ধ করার মতো অভিনব কোনো উপায় হানা দেয় মাথায়। তারপর একটা সময় আসে যখন ব্যবসার প্রয়োজনটাও হয়ে দাঁড়ায় গৌণ; ভুলে যেতে হয় একই লক্ষ্যে ছুটে যাচ্ছে প্রতিযোগীরাও—একজনের সাফল্য নির্ভর করছে আর একজনের মুখ থুবড়ে পড়ার ওপর।

প্রেজেন্‌টেসানের আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হলো দীপ্তকে। উদ্বেগ প্রায় শূন্য করে দিচ্ছে। একা নয়; এ-কাজ একার হতে পারে না। তবু দায়িত্বটা তারই। জানে, সাফল্য যদি আসে, যদি নতুন এই অ্যাকাউন্টটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় হিন্দুস্থান ফস্টারে, তা হলে খ্যাতিটা তারই হবে। বাকিটুকু যাবে টিম-ওয়ার্কের নামে—ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নোটিশ পড়বে বোর্ডে, চেনা শব্দে।

যদি না আসে? যদি এমন কিছু হয়…একদিনেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সমস্ত আশা।

এই চিন্তাটাই মাঝে মাঝে দুলিয়ে দেয় দীপ্তকে। করে তোলে অন্যমনস্ক; অভিজ্ঞতার

বাইরে সে খুঁজে পায় আরো এক সম্ভাবনা, যার নাম ভাগ্য। কাজকর্ম সব দিক থেকেই ভালো হয়েছে। বলতে কী, সর্বস্তরে এমন গোছানো কাজ অনেক দিন হয়নি হিন্দুস্থান ফস্টারে। এমন কোনো খুঁত দেখছে না যাতে চিড় ধরতে পারে আত্মবিশ্বাসে। তবু, বিশ্বাস নেই রামতনু সোমকে—সম্মান নিয়ে যেখানে টানাটানির প্রশ্ন, সেখানে দীপ্তকে কি ক্ষমা করবেন তিনি। আহত মর্যাদা থেকে তিনি কি বের করবেন না এমন কোনো অস্ত্র, যাতে সহজেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে পারে দীপ্ত। কী করে ভুলবেন তিনি, একদা তাঁরই ছায়ায় প্রতিপালিত, 'সেদিনের ছোকরা' দীপ্ত রায় অহঙ্কার ও বুদ্ধিশাণিত হয়ে এখন হাত বাড়াতে চাইছে তাঁরই সাম্রাজ্যে!

এ ছাড়াও ভাবনা ছিল। স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌সের মার্কেটিং ডিরেক্টর মুখার্জির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তাঁদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দীপ্ত নিজে এখনো আড়ালে। তার যতো চর্চা সবই সিন্‌হার সঙ্গে। যতোই তৎপর হোক সিন্‌হা—ক্যাম্পেন অ্যাপ্রুভ করার ব্যাপারে মুখার্জির ওপর কথা বলবে না কোনো। অথচ, রামতনু সোমের প্রধান জোর মুখার্জিই। ক্যাম্পেন ও প্রেজেন্টেসান ভালো হওয়া সত্ত্বেও এমন কি হতে পারে, শেষ মুহূর্তে এই চালেই হার হবে তাদের।

সন্দেহ নিরসনের জন্যে ক'দিন আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছিল দীপ্ত। তিনি ভাবেন নিজের মতো করে। দীপ্তর উদ্বেগকে কোনো আমল না দিয়েই বললেন, 'সেটা যেন আমাদের অ্যাকাউন্টটা না-পাওয়ার অজুহাত না হয়। মুখার্জি ফেয়ার ডিলে বিশ্বাস করেন। সুতরাং—', একটু থেমে বললেন, 'আই বিলিভ ইউ হ্যাভ রিয়েলাইজ্‌ড্ দি পয়েন্ট!'

'আই হ্যাভ, স্যার।'

চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে দীপ্তর। সূক্ষ্ম একটা অপমান ছুঁয়ে যায় তাকে। আর একটি বা দুটি ধাপ, ভাবে, একদিন এই কথারও জবাব দেবে সে; বক্রোক্তি ফেরত দেবে ঠিক আজকের ভাষায়। একদিন, কিন্তু আজ নয়। আপাতত নয়। মুস্তাফীর ওপর বিনয় চৌধুরী বিরূপ হওয়ার পর ভেবেছিল হাওয়া তার দিকে—সম্ভবত ভুল ভেবেছিল। চৌধুরী ইদানীং তাকেও ছেড়ে কথা বলছেন না। এই সেদিন একটা এনটারটেনমেন্ট বিল পাশ করা নিয়ে কথা শোনালেন, 'ক্ষমতা থাকার অর্থ কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করা নয়, দীপ্ত! এরপর দেখছি আমাকেই দেখতে হবে এসব!'

দীপ্ত বলতে চেয়েছিল, সামান্য একটা বিল পাশ করা যদি আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা হলে এর চেয়ে আরো বেশি অপব্যবহার কি আপনি করছেন না, স্যার!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে এসেছিল কয়েকটি দৃষ্টান্ত। তবু বলতে পারেনি। বলার উপায় ছিল না, যোগ্যতাও না—ডিসিপ্লিন বাধ্য করেছিল চুপ করে থাকতে।

'আজকের রোখ সেই জন্যে আরো বেশি। যেন এই রাত জাগা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজের খুঁটিনাটি মিলিয়ে নেওয়া—অন্যদেরও জাগিয়ে রাখা, এসবের মধ্যেও কাজ করছে অবধারিত উদ্দেশ্য; শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজের চতুর্দিক ঘিরে রাখছে কঠিন পাহারায়, যাতে সামান্য ভুলে কোথাও অসঙ্গতি না ঘটে।

এক এক সময় অবাক লাগে ভাবতে—এতোখানি স্নায়ু-পীড়নের সত্যিই কি দরকার ছিল কোনো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান নয় সে; তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভা নিয়ে অনেক কম সুখের দিকে কতোজন হেঁটে গেছে স্বেচ্ছায়, রাত্রে ঘুম আর দিনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির

জন্যে মেনে নিয়েছে আপেক্ষিক ক্লেশ। তার ব্রিলিয়ান্স নিয়ে অনায়াসে অধ্যাপনার প্রশান্তি স্বীকার করে নিয়েছে সুজন ; আর, নির্মাল্য—তাদের সময়ের সবচেয়ে ব্রাইট বয়—তো সামান্য ভালো-না-লাগা থেকে ছেড়ে দিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ; এখন সে ছোটখাট একটা ইংরিজি সাপ্তাহিকের এডিটর। কাগজটা চলে না তেমন, বিজ্ঞাপন পায় না। দুপুরের চড়া রোদ মাথায় নিয়ে চৌরঙ্গির ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যায় নির্মাল্য, ক্বচিৎ অহঙ্কার মিশিয়ে। সে তো জানে দীপ্ত এখন বিজ্ঞাপন জগতের চাঁই-বিশেষ, ইচ্ছে করলেই পারে তাকে সাহায্য করতে ; তবু, দেখা হলে ভিতরের কোন অদম্য শক্তি প্রতিহত করে রাখে তাকে! অন্যরা যদি পেরে থাকে, দীপ্ত কেন পারল না! ব্যাপক জগতের কাছে কোন অঙ্গীকার ছিল তার! নাকি সে অঙ্গীকারবদ্ধ মা, পাপু, জয়িতার কাছে! মনে তো হয় না। তবে ? নিজের জন্যে! টাইয়ের নট্, জুতোর পালিশ, ড্রাইভিং আর শুদ্ধ উচ্চারণের মোহে। যদি তাই হয়ে থাকে, কী পাচ্ছে সে পরিবর্তে ? স্বাচ্ছন্দ্য! বিলাস! স্তুতি!

রেকমেণ্ডেসানের টাইপ-করা ফর্মা থেকে চোখ তুলে তাকাল দীপ্ত। ঝাপ্‌সা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে মুখগুলি—সমীরণ, রবি, সুনীতা, বিমল, সুধাংশু, যোশী। সরল থেকে ক্রমশ বৃত্তে ছড়িয়ে পড়ছে তারা—ঘুরছে, দীপ্তকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। জলের ভিতর থেকে শিলার উদ্ভবের মতো সকাল থেকে এতোটা রাত পর্যন্ত পরিশ্রমে কঠিন হয়ে উঠেছে মুখ। রাশ ছাড়েনি তবু। ভয়ে ? নিষ্ঠায় ? নাকি সেই একই আকাঙ্ক্ষা ঘুণপোকার মতো সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে তাদেরও বুকে, দীপ্ত যার পরিমাপ করতে পারে না!

কখনো কখনো ইচ্ছে করে নিজের দিকেই ছুঁড়ে দিতে নিজেকে। 'আছি' এই অনুভূতির জন্যে প্রয়োজন হয় শব্দের, ভঙ্গিতে চকিত হয়ে ওঠে বর্তমান।

সজোরে টেবিলে একটা ঘুঁসি মারল দীপ্ত। প্রায় চেঁচিয়েই বলল, 'কাম-অন্…রিল্যাক্স…'

দীপ্তর আকস্মিক উচ্ছ্বাস প্রায় সকলকেই বিমূঢ় করে দিল। চাপা হাসিতে বেঁকেচুরে যাচ্ছে বিব্রত মুখের রেখাগুলি—বর্ষার আভাসে শান্ত নদীর জলে কাঁপন লাগার মতো। ঠিক কেন বোঝা যায় না। শুধু এটুকু বোঝা গেল তার ব্যবহারে পরিকল্পনা ছিল না।

প্রথম কথা বলল সমীরণ।

'কী হলো! পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

'পাগল ? আমি!' দু' দিকে দু' হাত ছুঁড়ে সবল শরীরের ঢেউ তুলল দীপ্ত, 'হ্যাঁ, পাগল হবো। তবে আজ নয়, কাল! প্রেজেন্‌টেসানের পর—'

কী মানে হতে পারে এ-কথার! অদ্ভুত এক রহস্য যেন ঘিরে ধরেছে দীপ্তকে। বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের ঘুঁসি ঠুকতে ঠুকতে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে প্রায় বৃত্তাকারে ঘুরে এলো সে। থামল সুনীতার চেয়ারের পিছনে এসে। ভূমিকাবিহীন দুটি হাত ওর ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়ে সমীরণের দিকে তাকাল।

'স্টারলেট আমাকে আণ্ডারএস্টিমেট করছে! বলে বেড়াচ্ছে, আমরা বেকার চেষ্টা করছি। রিজিন ? রামতনু সোম নিজে ওদের ক্যাম্পেন প্রেজেণ্ট করবে। মাই ফুট!'

দু' হাতের দশটা আঙুল চেপে বসেছে সুনীতার মাংস ও হাড়ের ওপর। পাঁচজনের দশটি চোখ ছুঁয়ে গেল সুনীতাকে। বেশি মদ্যপান করলে কখনো-সখনো একটু বেসামাল হয়ে পড়ে দীপ্ত। সচরাচর হয় না। চোখে অন্ধকার নিয়েও ওর মুঠোয়-ধরা স্টিয়ারিং কাঁপে না কখনো। সেই দীপ্ত! এখনকার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা না থাকলেও আছে উত্তেজনা ; অথচ, কেউ মনে করতে পারল না, সন্ধে থেকে এ-পর্যন্ত সে জল অব্দি স্পর্শ করেছে কিনা।

মিটিং রুম থেকে বেরিয়ে বার দুয়েক নিজের চেম্বারে গিয়েছিল। সেও ডক্যুমেন্ট ঘাঁটতে। তা না হলে সারাক্ষণ এই ঘরে, সকলের সামনে, কাজ করে যাচ্ছে। এতোক্ষণ বরং একটু বেশিই সুস্থির ছিল। ইতিমধ্যে এমন কী ঘটল যাতে সে উত্তেজনা বোধ করবে এতো!

আড়ষ্টতা থেকে অস্বস্তি শুরু হলো সুনীতার। গায়ে হাত পড়েছে বলে নয়, দু' বছরে এ-রকম অনেকবারই তাকে ছুঁয়ে গেছে দীপ্ত। কখনো সহজে, হাল্‌কা মেজাজে, কখনো বা—সুনীতার ধারণা—দুর্বলতায়। স্পর্শই বলে দেয় কোন আবেগ কাজ করছে রক্তে! কিন্তু, এই মুহূর্তের স্পর্শে পেশী ছাড়া আর কোনো অবয়ব নেই। অস্বস্তিটা সেই জন্যেই আরো বেশি।

সম্ভবত দীপ্তও টের পেল ব্যাপারটা। হাত দুটো তুলে নিয়ে মুখটা নামিয়ে আনল সুনীতার কানের কাছে।

'আর ইউ হার্ট্?'

'না, না।' সুনীতা দেখল দীপ্ত বিরক্ত নয়। সাহস পেয়ে বলল, 'বাট প্লিজ ডোন্ট্ ট্রাই ইওর স্ট্রেন্‌থ্ অন মি!'

'সরি, সুনীতা। ভেরি সরি!' অপ্রস্তুতভাবে হাসল দীপ্ত। আবার নিজের ধরনে ফিরে যেতে যেতে বলল, 'কথাটা ঠিকই, স্ট্রেন্‌থ্। জোর! বুঝলি সমীরণ, কাল আমি জোরই দেখাব।...বাজি রাখবি, কফি অ্যাকাউন্টটা আমরাই পাচ্ছি!'

'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, গুরু।' সমীরণ বলল, একটু বা নিচু গলায়, 'কিন্তু, আগে থেকে এসব বলা ভালো নয়। লাকের ব্যাপারও আছে—'

'লাক্-ফাক্ নয়। আসল কথা কনফিডেন্স। নাউ আই অ্যাম কনফিডেন্ট...অবশ্য....', ভেবে বলল দীপ্ত, 'অবশ্য যদি না পাই...'

'বুঝতে হবে লাক্ খারাপ!'

কথাটা বলল সুনীতা। এমনভাবে, যাতে এমনকি দীপ্তও হেসে উঠল।

উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে, বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। সম্ভবত আজ এখানেই শেষ করা যাবে। ছড়ানো কাগজগুলো সাজিয়ে নিতে ব্যস্ত হলো দীপ্ত; প্রোজেকটরে ব্যাক করতে লাগল যোশী—দ্রুত ব্যবহারে রঙগুলো অদ্ভুত আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা দেয়ালে, সরে যাচ্ছে আবার। সুনীতা বাইরে গেল। শিস্ দিতে দিতে দীপ্তর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল সমীরণ।

'এবার বোতলটা খুললে হয় না?'

'ও. কে.।' মুখ তুলে সকলকে খুঁজল দীপ্ত, 'হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, যোশী? বিমল? রবি?'

না বলল না কেউই। সমীরণ চেঁচিয়ে বলল, 'কোই হ্যায়?' ছুটে গিয়ে কলিং বেলে চাপ দিল যোশী। তারপর, বেয়ারা ঘরে ঢুকতেই, সমীরণ বলল, 'নিয়ে এসো—'

সুনীতা ফিরে এলো। মুখ থেকে ক্লান্তির ভাবটুকু অদৃশ্য, সম্ভবত এরই মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ঠোঁট জুড়ে লাবণ্য। আলোয় চিকচিক করছে কপালের ওপরের চুলগুলি।

'আমি যাচ্ছি—'

ট্রে-তে সাজানো গোটা ছয়েক গ্লাস, মাঝখানে বড়ো মাপের বোতল। টেবিলে রাখার আগেই প্রায় ছোঁ মেরে বোতলটা তুলে নিল সমীরণ।

'চিয়ার্স !'

সেদিকে মন না দিয়ে সুনীতাকে লক্ষ করল দীপ্ত। মেয়েটি ভীরু। সকাল থেকে সমানে খেটে গেছে মুখ বুজে, কোনো অজুহাত দেখায়নি। খানিক আগে অল্প সপ্রতিভ হয়ে উঠলেও হঠাৎই যেন আবার গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ওকে সহজ করার জন্যে বলল, 'তুমি তো বাড়িতে বলে এসেছো দেরি হবে ? বলোনি ?'

সুনীতা ঘাড় নাড়ল।

'তবে ? তাড়া কেন ?' দীপ্ত বলল, 'কাম, জয়েন আস !'

'নো, থ্যাঙ্কস্। বাড়িতে ভাববে।'

'ও· কে·। গাড়িটা নিয়ে যাও। সিন্‌স্ ইউ আর নট উইলিং···'

কথাটা শেষ করতে পারল না দীপ্ত। থেমে গেল টেলিফোনের শব্দে। ধরেছিল রবি, সাড়া দিয়ে বলল, 'মিস্টার রে, কল ফর ইউ।'

'জাস্ট এ মিনিট—'

দীপ্ত এগিয়ে গেল। যা ভেবেছিল তাই। জয়িতার গলা।

'কী ব্যাপার ! এতো দেরি হচ্ছে ফিরতে !'

'আর পাঁচ মিনিট, প্লিজ !' অভ্যাসে উত্তরটা বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। বলে নিজের মনেই একটু হাসল দীপ্ত। এতো দূর কেতা অর্জন করার পরও কী অদ্ভুতভাবে এখনো স্ত্রীর মতো ব্যবহার করে জয়িতা।

'আগেরবারও তাই বলেছিলে !' স্পষ্ট অনুযোগ ফুটে উঠল জয়িতার গলায়, 'ক'টা বাজে খেয়াল আছে !'

'জয়ি, ট্রাই টু বি সেন্‌সিব্‌ল ! কাল সকালে প্রেজেন্‌টেসান—এতো পাংচুয়াল হওয়া কি সম্ভব !'

'আসছ, না আসছ না ?'

'ওফ্ !' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে উচ্চারণ করল দীপ্ত। তারপর বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরব।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই চোখাচোখি হলো সুনীতার সঙ্গে। এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এই রাতে, গভীর নিঃসম্পর্কের মধ্যে, ছ' সাতজন পুরুষের সঙ্গে একমাত্র মেয়ে। শুধু মেয়ে নয়, অসম্ভব যুবতী—এই মুহূর্তে শরীর জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে রাত ! ভাবামাত্র কঠিন হয়ে উঠল পেশী। আশ্চর্য, একটু আগে এই মেয়েটির শরীরেই দু' হাতের ভার নামিয়ে দিয়েছিল সে !

অল্প ভাবল দীপ্ত, ঠিক ততোক্ষণ, যতোক্ষণে দ্বিধা থেকে অনায়াসে পৌঁছুনো যায় সিদ্ধান্তে।

'তুমি আমার গাড়িতেও আসতে পারো। আমি নামিয়ে দেবো।'

'থ্যাংক ইউ।' বাধ্য গলায় বলল সুনীতা।

ততোক্ষণে গ্লাসগুলো উঠে গেছে হাতে হাতে। দীপ্তরটা নিয়ে এলো সমীরণ।

'চিয়ার্স—'

'চিয়ার্স !'

আগুন তরল হয় না। তবু জ্বালা ছড়িয়ে নেমে যেতে পারে, গলা বেয়ে, বুকের আশেপাশে, শাখা-প্রশাখায় বিদ্যুতের মতো। চাইলে সে ক্ষমাহীন হতে পারে—যেভাবে

হয়ে এসেছে এতোকাল, প্রায়ই, কারুর তোয়াক্কা না করে। সবটাই নিজেকে তৃপ্ত করার জন্যে। কানাকানির হাওয়ায় কখনো কি শোনেনি সেই সম্বোধন : ব্লাডি বাস্টার্ড ! অসহায় সে-সব মুহূর্তের অস্বস্তি কি অতো সহজে মিটে যায় ! ক্ষমতার অপব্যবহার ! অর্জনের জন্যে যাকে সহ্য করতে হয়েছে ক্লেশ আর অপমান, একটু-আধটু অপব্যবহারে কী আর এমন চিড় ধরবে তার চরিত্রে !

পুরো হাতে খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল দীপ্ত।

'গুড্ নাইট এভ্রিবডি। আই অ্যাম অফ্।' নতুন চারার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে-থাকা সুনীতার পিঠে হাত রাখল দীপ্ত, 'চলো সুনীতা—'

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল সমীরণের মুখ।

'তুমি চলে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু দাঁড়াও। আমিও আসছি—'

সুনীতা এগিয়ে গেছে। দূরে ছড়িয়ে আর যারা আছে, এই মুহূর্তে তারা চলে গেল আরো দূরে, দর্শকের ভূমিকায়। দৃশ্যটা চেনা ; অন্তত মিস্টার রে'র প্রমোসান হওয়ার পর থেকে নতুন কিছু নয়। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে নিল রবি আর বিমল। এখন চলবে।

'আর একটা গাড়ি আছে। ওদের নিয়ে তুমি চলে যেও।'

'অর্ডার করছ ?'

'ওয়েল...আমি বোধ হয় করতে পারি—'

'ঠিক আছে।' ঠোঁটে দাঁত বসাল সমীরণ, 'একদিন আমাকে না হলে চলত না !'

'হোয়াট ডু ইউ মিন্ !'

সম্ভবত অধৈর্য হয়ে পড়ছে সুনীতা। ওকে আবার এদিকে আসতে দেখে চুপ করে গেল সমীরণ। থমথমে মুখ। কিছু বলবে না ভেবেও বলল, 'গুড নাইট।'

সৌজন্যহীন, অনিচ্ছা থেকে উচ্চারিত হলো শব্দগুলি। অভ্যাসেও হতে পারে। এমনও হতে পারে, তাৎক্ষণিক আবেগ চাপা দেওয়ার জন্যে অন্য কোনো শব্দ খুঁজে পায়নি সমীরণ—হয়তো সে বাস্টার্ড্-ই বলতে চেয়েছিল। না-পারার রোষ থেকে এখন এগিয়ে যাবে ঢের দূর ; ক্ষোভ থেকে ঘৃণার দিকে। কান্ট্ বি হেল্প্ড্ ! মনে মনে হাসল দীপ্ত। সমীরণ কি বুঝবে, অপমান করতে ভালোই লাগে তার !

দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এলিভেটর। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান হাতখানেকও নয়। এতো কম দূরত্বে দাঁড়িয়েও জড়োসড়ো হওয়ার চেষ্টা করছে সুনীতা, তবু আড়াল করতে পারেনি শরীরের গন্ধ। ও-টিতে শুয়ে অ্যানাসথেসিয়ার জন্যে অপেক্ষা করার মতো অন্ধকার একটা অনুভূতি হামাগুড়ি দিয়ে ক্রমশ এগোচ্ছে শিরার ভিতর ; সাত থেকে পাঁচে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই মুখ ভরে উঠল এলাচ চিবুনোর স্বাদে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সুনীতার দিকে অল্প ঘেঁসে এলো দীপ্ত।

'ধরো, যদি হঠাৎ লোড-শেডিং হয় ?'

সরবার জায়গা নেই। সেটা শোভনও নয়। আঁচলটা ব্লাউজের ফাঁকে গুঁজে নিয়ে সুনীতা বলল, 'হঠাৎ তা হবে কেন !'

'যদি হয় ! কী করবে ?'

'জানি না।' অপ্রস্তুতভাবে হাসল সুনীতা, 'আপনি কী করবেন ?'

'আমি ! গেস ?'

'কী করে বলব !'

স্টপ-স্যুইচে হাত দিল দীপ্ত। একটা ঝাঁকুনি। আশঙ্কায় দেওয়াল আঁকড়ে ধরার বৃথা চেষ্টা করল সুনীতা।

'আই'ড প্রেফার টু চেঞ্জ মাই ওয়াইফ্।'

পাঁচ-বাই-চারের নিখুঁত আয়তনে আবদ্ধ এলিভেটরের মধ্যে দীপ্তর চোখ থেকে রক্ত-মাংস লুকিয়ে রাখার জন্যে আঁচলের আড়ালও যথেষ্ট নয়। কলকল শব্দ উঠল পেটে। তবু খুশি করার গলায় সুনীতা বলল, 'তার মানে ?'

'মানে ?' সামনে লাল আলোর সঙ্কেত। হয়তো ডাকছে কেউ। হয়তো সমীরণ। যা বলার এখনই বলতে হবে। ব্যস্ত আঙুলে গ্রাউণ্ড-স্যুইচে চাপ দিল দীপ্ত।

'ইন ফেভার অফ দি ডার্কনেস···ইন ফেভার অফ ইওর ডার্ক লিপ্‌স্···'

সুনীতা কাঁপল। দরজা খোলার আগেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল, দীপ্ত ওর হাত চেপে ধরল।

'তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। লেট ইট ওপেন !'

'খুব দেরি হয়ে গেল !'

'কোথায় !' বেরুতে বেরুতে কব্জি তুলল দীপ্ত, 'একটা বাজেনি এখনো ! বেশি দূরে তো নয়—মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

দীপ্তকে আগে বেরুনোর সুযোগ দিল সুনীতা। অসম্ভব ভারী লাগছে পা দুটো, কোমর জুড়ে আড়ষ্টতা, অদৃশ্য পিঁপড়েরা হেঁটে যাচ্ছে নাভিমূল ছুঁয়ে। যদি সে-রকম কিছু ঘটে, সে কি প্রতিবাদ করবে ? সুনীতা ভাবল। দীপ্ত বিবাহিত, না হলে এতোটা দ্বিধাগ্রস্ত হতো না।

নিজে উঠে সুনীতাকে ডেকে নিল দীপ্ত। স্টার্ট দিল গাড়িতে।

শব্দগুলো অনুরণন তুলছে কানে : 'ইন ফেভার অফ দি ডার্কনেস···', সেই মুহূর্তের চাতুর্য ভেদ করে ফুটে উঠছে অন্য তাৎপর্য—এলিভেটরের শব্দহীন ক্ষেত্র থেকে বিস্তৃত হতে চাইছে আরো বেশি নৈঃশব্দ্যে—এক প্রায়-গ্রাম্য ডাক্তারের সরল শিশুর সঙ্গে সাড়ে তিন হাজারের ছাপ-মারা দীপ্ত রায়ের নিরন্তর পারাপার ছাড়া যেখানে আর কোনো বিনিময় হয় না।

একটু আগে সুনীতার শরীরে নিজের আধিপত্য বিস্তারের কথা ভেবেছিল দীপ্ত—আরোপিত কলঙ্কে স্থাপন করতে চেয়েছিল সামান্য সত্য। সুনীতা কি অনুভব করেছে তার উদ্দেশ্য ! সম্ভবত করেছে। না হলে আঁচল দিয়ে গভীর স্তনের ভঙ্গি আড়াল করার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অসহায়তাও লুকোতে পারত। ভীরু মেয়েটি জানে না তাৎক্ষণিক অন্ধকারের সম্ভাবনার থেকেও আরো ব্যাপক সম্ভাবনা অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে—যেখানে শরীরে লিপ্ত না হয়েও দীপ্ত পেয়ে যেতে পারে তার চেয়েও বড়ো স্বাদ !

ফাঁকা রাস্তা। একটা দুটো গাড়ি কখনো একগতি, কখনো বা ছুটে যাচ্ছে পরস্পরের বিপরীত দিকে। অফিস থেকে বেরুবার সময়েই একবার আকাশ দেখেছিল দীপ্ত। খুব কালো ; হাওয়ায় থম ; রাতের শূন্যতা জুড়ে আর্দ্র আবহ। দূরে কাছে হয়তো বৃষ্টি হয়ে গেছে কোথাও—পিচের মসৃণতায় তার আভাস, হয়তো হবে আবার। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে একদমে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এলো দীপ্ত। সুনীতাকে বলেছিল পনেরো মিনিট। সময় আছে, অতোটা ব্যস্ত না হলেও চলে।

পাশে সুনীতা। স্টুডিয়োয় ছবি তোলার ভঙ্গিতে কাঠ হয়ে তাকিয়ে আছে সামনে।

মেয়েটি অ্যাম্‌বিসাস্‌, কিন্তু ভীতু—হ.সম্ভব ভীতু ! এলিভেটরের কল্পিত দুঃস্বপ্ন থেকে বেরুতে পারেনি এখনো—যৌবন ও বুদ্ধি নিয়ে আটকে পড়েছে শরীরে। সন্দেহ যায়নি। এই মেয়ে ফেস্‌ করবে সিন্‌হাকে ! ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই পাখির বাসার মতো ঝরে পড়বে না তো !

চিন্তাটা এলোমেলো করে দিল তাকে। স্টিয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে সিগারেট ধরাল, যেন একটা অবলম্বন দরকার ছিল। সুনীতাকে বলা যায়, যে-কৃতজ্ঞতা‌বোধ থেকে অস্বস্তির মধ্যেও তুমি মেনে নিচ্ছ আমাকে, ভাবছ কফি-অ্যাকাউন্ট তোমার মতো একজন জুনিয়রের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভবিষ্যৎ সহজ করে দিলাম তোমার জন্যে—সে আমার দান নয়। আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি মাত্র—বঁড়শির চারের মতো ; তুমি যোগ্য বলে নয়, শুধু সিন্‌হা তোমাকে চেয়েছিল বলে ! বলবে কী, স্বার্থের জন্যে নিজের স্ত্রীকেও যে ঠেলে দিতে পারে অস্বস্তিতে, নিঃসম্পর্কিতা একটি মেয়ের জন্যে তার প্রাণে দয়া থাকতে পারে না ; সত্য সামনে, ভেবে দ্যাখো কী করবে তুমি !

মেরুদণ্ড টান করে বসল দীপ্ত। বুক দিয়ে নামিয়ে দিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অন্যমনস্কতায় শ্লথ হয়ে পড়েছিল গতি, আবার দ্রুত করে তুলল। ঠিক হোক বা ভুল, ডিসিসান একবার নেওয়ার পর আর তা প্রত্যাহার করা যায় না। সুনীতাকে বাঁচানোর দায়িত্ব সুনীতারই, তার নয়। সমীরণকে পিছনে ফেলে এসেছে সে, আরো অনেককে ; বাঁচার জন্যে, প্রয়োজন হলে, সুনীতাকেও ফেলবে। আই মাস্ট সারভাইভ, নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাবল দীপ্ত ; যুক্তি দিয়ে—তুলনা টেনে এনে। তবু সহজ হতে পারল না। সম্ভবত মেয়েটি তাকে টানছে, ভীরুতা দিয়ে রুদ্ধ করতে চাইছে তার গতি ! ইম্‌পসিব্‌ল্‌ !

ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে সামনের দৃশ্য। হাল্‌কা, শব্দহীন বৃষ্টি কখন শুরু হয়েছে খেয়াল করেনি। ওয়াইপারটা চালু করে দিল দীপ্ত। আচ্ছন্ন আলোয় দেখা ভিটামিনের হোর্ডিংয়ে উপছে পড়ছে স্বাস্থ্য। কাছাকাছি ফুটপাথ ঘেঁসে কালো অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে—খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফুটপাথে দাঁড়ানো মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে একটি লোক। চকিতে ঘাড় থেকে আঁচল ফেলে দিয়ে আবার তুলে নিল মেয়েটি, পেরিয়ে যেতে যেতে দীপ্ত তার মুখের চড়া প্রসাধন লক্ষ করল। ফর সেল ! আর একটু পরেই, সুনীতা যতোক্ষণে বাড়ি পৌঁছুবে, দীপ্ত জানে, মুছে যাবে এই দৃশ্য। ওয়াইপার সক্রিয় আছে—দৃষ্টি সামনে, সুনীতা কি দেখছে না কিছু !

'সুনীতা ?'

'উঁ—'

'এতো চুপচাপ কেন ?'

'এমনি—'

'ঘুম পাচ্ছে ?'

সুনীতা তাকাল, শুধু এটুকু বোঝাবার জন্যে যে সে ঘুমিয়ে পড়েনি। চেষ্টা করে হাসল।

সিগারেটটা রাস্তার শূন্যে ছুঁড়ে দিল দীপ্ত। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল সুনীতার দিকে।

'কাছে এসো।'

আদেশের মতো শোনাল কথাটা। ইণ্টারনাল কম্যুনিকেসানের মধ্যে দিয়ে এই কণ্ঠ সে শুনে আসছে বহু দিন, এখন জবাবদিহি করতে হবে। কিছু বলার আগে একবার পিছনে

তাকাল সুনীতা, একবার বাইরে। যেন কিছু হারিয়ে গেছে! দীপ্ত সুযোগ দিল না। হাত ধরে টানতেই গায়ের ওপর এসে পড়ল সুনীতা। তীব্র হেডলাইট জ্বেলে উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি। বিশ্বস্ত হাতে পাশ কাটিয়ে গেল দীপ্ত।

'এ-বছর কতো ইনক্রিমেন্ট আশা করো?'

খেলাচ্ছলে কথাটা বলবার চেষ্টা করল দীপ্ত, বলে খুশি হলো। স্ট্রেট ডিল। যতোই প্রতারণা থাক, মেয়েটি ভাববে, দ্বিধায় পড়বে, পিছুবার আগে এগিয়ে আসবে একটু।

সুনীতা জবাব দিল না, ভঙ্গিতে পরিবর্তন হলো না কোনো। মুখ ঘুরিয়ে ওর কপাল ও চুলের গন্ধ নিল দীপ্ত, আর একটু কাছে টানল। মুখে আবার সেই এলাচের স্বাদ। কিন্তু, সে সিন্‌হা নয়, সমীরণ নয়, মুস্তাফী নয়। ভাবামাত্র এড়িয়ে যাওয়া কী আর এমন শক্ত তার কাছে! এলিভেটরের একান্তে অন্ধকার সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছেছিল সুনীতা, অন্ধকার দ্যাখেনি। সেই অন্ধকার এখন তার সামনে। সুনীতা দেখুক।

মাংসহীন আঙুলে ওর কাঁধে চাপ দিল দীপ্ত।

'ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। আমি খুব খারাপ লোক নই!'

'আমি কিছু বলিনি...'

'কিন্তু...', হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে হাসল দীপ্ত, 'ভয় তো পেয়েছিলে!'

'না—'

'ইউ আর এ মিস্‌ফিট্‌!' হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেল দীপ্ত, 'এনি ওয়ে, তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করোনি!'

সুনীতা সাড়া দিল না। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে, তবু সরে বসার কথা ভাবল না। এতোক্ষণে সত্যিই বিমূঢ় বোধ করল সে, একটু বা বিধ্বস্ত। কী চেয়েছিল দীপ্ত? প্রশ্রয়? নাকি একা পেয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিল!

'কাল প্রেজেনটেসান।' বাড়ির সামনে সুনীতাকে নামিয়ে দিয়ে দীপ্ত বলল, 'স্লিপ ওয়েল। গুড নাইট্‌।'

মাপা কথা। অস্ফুটে উচ্চারণ করল সুনীতা, 'গুড নাইট্‌।'

আর পিছনে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না দীপ্ত। সুনীতা ছিল, এখন নেই—থাকাটা না-থাকার সঙ্গে মিশে গেছে চমৎকার। অনুভূতি এক্স-রে করলে পূর্ববর্তী মুহূর্তগুলির কোনো চিহ্নই ধরা পড়বে না এখন। পরিবর্তে উঠে আসবে অন্যতর, বিষণ্ণ ক্ষতগুলি। মুখ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে কষা রক্ত—প্রতিটি স্মৃতির ওপর সৃষ্টি করছে পিচ্ছিল আবরণ। এই রাতে, অনুগত রাস্তার ওপর দিয়ে এক লক্ষ্যে বাড়ির দিকে ড্রাইভ করতে করতে হঠাৎ মুহ্যমান বোধ করল দীপ্ত। কী হয় যদি এই মুহূর্তে স্পিডোমিটারের কাঁটা ছাড়িয়ে যায় একশো'র দাগ, শরীরের যাবতীয় শক্তি জড়ো করে নিজেকে আক্রমণ করে সে। সাংঘাতিক মজা হবে না কি! যদি সে-রকম হয়, কাল ভোর তাকে আবিষ্কার করবে থ্যাঁতা মাংসপিণ্ডের ভিতর, এক নিরীহ গ্রাম্যতায়, নিরপেক্ষ আমোদে গড়া শৈশবে। আশ্চর্য, কতো সহজে নেমে আসা যায় সাড়ে তিন হাজারের দুঃস্বপ্ন থেকে, আলিপুরের ফ্ল্যাটের প্রশস্ত দূরত্ব থেকে স্বপ্নহীন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে!

লিফ্‌ট্‌ চলছে। তবু গাড়ি তুলে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগুলো দীপ্ত; গুনে গুনে উঠতে লাগল। জয়িতা কি অপেক্ষা করছে এখনো? হয়তো। সে কি বোঝে, ভালোবাসা থেকে কবে যেন অভ্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তার স্বামী নামে পরিচিত এই লোকটি—মুঠোভর্তি

আফিম-মাখানো মাংসের টুকরো, আত্মরক্ষার জন্যে যান্ত্রিক হাতে ক্রমাগত ছুঁড়ে দিচ্ছে সংসারের দিকে !

ক্লান্তি আজ একটু বেশিই লাগছে। কেমন যেন নেশায় পেয়ে বসেছে দীপ্তকে। এতো রাতে জয়িতা বিরক্ত হবে জেনেও কলিং বেলে ঘন ঘন চাপ দিতে লাগল। আসলাম কোয়ার্টার্সে, আয়াও বেরুবে না। সুতরাং জয়িতা। কাল কী হবে ঠিক নেই, ইতিমধ্যে খানিকটা হেসে নেওয়া যাক।

দরজা জয়িতাই খুলল।

'হোয়াট হ্যাপেণ্ড, আর ইউ ড্রাঙ্ক ?'

দীপ্ত হাসল। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে— ?'

জয়িতা জবাব দিল না। বেডরুমে আলো জ্বলছে। গম্ভীর মুখে পাপুর ঘরের পর্দাটা টেনে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। দীপ্ত সোফায়, জুতো খুলতে ব্যস্ত।

'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

জেরা করার ধরনে জিজ্ঞেস করল জয়িতা, কিছু বা রুক্ষ গলায়। দীপ্ত অবাক না হয়ে পারল না।

'কেন! ডিড্‌ন্ট্‌ ইউ নো ?'

'বলবে তো অফিসে! ইউ ড্যাম লায়ার! রাতটা কাটিয়ে এলেই তো পারতে!'

ভঙ্গিটা স্বাভাবিক নয়। যেন ভিতরের রাগ, জ্বালা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে আরো। গালের ওপর নীল শিরাটা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। স্থির চোখে ক'মুহূর্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল দীপ্ত। নিজেও তৈরি হলো।

'কী হয়েছে!'

'কী হয়েছে!' বলার আগে নিঃশ্বাস নিল জয়িতা, 'এক ঘণ্টা আগে অফিস থেকে বেরিয়েছ তুমি—উইথ সুনীতা। দিস ইজ ইওর ক্যাম্পেন! ব্লাফ্‌—অল ব্লাফ্‌!'

'আই সি!' সন্দেহে ভুরু কোঁচকাল দীপ্ত, ঘা-টা সহ্য করে নিল।

'কে বলেছে! সমীরণ ?'

'যেই বলুক! বলো, মিথ্যে বলেছে!'

জয়িতা দাঁড়াল না। প্রায় ছুটে চলে গেল ঘরের ভিতর।

ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারল না দীপ্ত। ঘরের পর্দাটা আটকে গেল চোখে। দেরি দেখে জয়িতা কি আবার ফোন করেছিল অফিসে ? ব্যাপারটা অভাবিত ; বিরক্তিতে মোজা দুটো দূরে ছুঁড়ে দিয়ে ভাবল, সম্ভবত সমীরণই বলেছে, না হলে জয়িতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অফিস ছেড়ে সমীরণ কি এখন ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে! ঠিক আছে, সমীরণ, ইউ আর ওয়েলকাম!

সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল দীপ্তর ঠোঁটে। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে চোখ পড়ল হাতায়—কালো, লম্বা একটা চুল জড়িয়ে আছে সেখানে। খুব সাবধানে সেটা তুলে মেঝেয় উড়িয়ে দিল দীপ্ত। জয়িতা দ্যাখেনি—শোনা কথাতেই জ্বলে যাচ্ছে ঈর্ষায়! এই ভালো। যতোক্ষণ ঈর্ষা আছে অন্তত ততোক্ষণ জয়িতাও থাকবে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বুকের বাঁদিকে চেপে ধরল দীপ্ত ; ছুঁচ-ফোটানো থেকে একটা বড়ো যন্ত্রণা জায়গা করে নিচ্ছে ক্রমশ। কিছু হলো নাকি! তারপর, আস্তে আস্তে বসে পড়ল সোফায়।

যন্ত্রণাটা সরে যাচ্ছে ; জলে জল আসার মতো আস্তে আস্তে ফিরে আসছে আত্মবিশ্বাস। আলোর ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার—ওরই মধ্যে রহস্যময় দৃঢ়তা নিয়ে ফুটে উঠল প্রফেসানাল মুখগুলি। প্রতিপক্ষকে চিনে নিতে কখনো ভুল করে না দীপ্ত রায়, এখনই বা করবে কেন!

একতাল নরম মাংসের মতো অভিমান নিয়ে জয়িতা এখন মুখ গুঁজেছে বালিশে। তার কথা এখন না ভাবলেও চলে।

॥ চার ॥

ই-সি-জি রিপোর্টে পাওয়া গেল না কিছু। প্রেসারে তারতম্য ঘটেছিল সামান্য ; এখন নর্মাল।

'ভয় পাবার কিছু নেই', ডাক্তার বললেন, 'দিন পনেরো রেস্ট নিন, সেরে যাবে।'

থামলেন একটু। পরের কথাটা জয়িতার সামনে বলা যায় কি না ভাবলেন।

'ড্রিঙ্ক কি খুব বেশি করেন?'

'বেশি কিনা জানি না।' দীপ্ত বলল, 'তবে করি—'

'করি মানে! পিপে পিপে!' হাতেমুখে একটা ভঙ্গি করল জয়িতা, 'ওর ওপরেই তো আছে। রোজ লাঞ্চ পর্যন্ত করে না!'

দীপ্ত প্রতিবাদ করল না। এটা জয়িতার এলাকা। গত তিন চার দিনে সমস্ত কর্তৃত্ব সে তুলে নিয়েছে নিজের হাতে ; এমনভাবে, যাতে আর কেউ ঘেঁসতে না পারে। প্রথম দিনে ডাক্তারের নির্দেশে ঘুমের বড়ি খেয়েছিল দীপ্ত। একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমের পর মনে হচ্ছিল একটা দূরত্ব পেরিয়ে এলো—বেশ ঝরঝরে লাগছে, কোনো ক্লান্তি নেই শরীরে। দৈনন্দিনতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেওয়ার যুক্তি ছিল না কোনো। জয়িতাই সরিয়ে রাখল। সে নিজে কিছুটা নিঃশঙ্ক হলেও জয়িতার ভয় যায়নি। আকণ্ঠ উদ্বেগের মধ্যেও এ ক'দিন প্রাণপণে জিইয়ে রেখেছিল নিজেকে। ডাক্তারের আশ্বাসে আবার ফিরে এলো স্বরূপে, অন্তত কথা শুনে তাই মনে হবে।

ডাক্তার বললেন, 'বুঝেছি। ওটা অবশ্য ওঁর একার রোগ নয় ; এ-রকম আরো দু'একটি পেসেন্ট আমার আছে। তবে, একেবারে ছাড়তে না পারুন, কন্ট্রোল করুন। ড্রিঙ্ক, স্মোকিং দুটোই। টেনসানের চাকরি, এগুলো হার্ম্ করে—'

পরামর্শটা নতুন নয়। এর আগেও বলেছে অনেকে, অনেকভাবে। খুব গা করেনি দীপ্ত। স্বাস্থ্যে জোর থাকলেও মাঝে মাঝে যখন শুকিয়ে আসে শরীর, সে নিজেও কি বোঝে না, বাহ্যিক নেশা তাকে নিয়ে যাচ্ছে ক্ষতির দিকে! এই সেদিনও, বুকে ব্যথা শুরু হওয়ার আগে, শরীর জুড়ে টের পেয়েছিল অস্বস্তি, শুকিয়ে এসেছিল ঠোঁট, জিব, হাতের তালু। দুর্ভাবনায় টান পড়েছিল রক্তে। এ-সবই হয়েছিল হঠাৎ, মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে—প্রবল জ্বরে যেমন হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সবই আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে, তেমনি, নিজের যতো কাছে সম্ভব শরীরটাকে টেনে এনেছিল দীপ্ত। শরীরের প্রতি এতোখানি মমতা এর আগে কখনো বোধ করেনি। রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অস্বস্তিটা

যাচ্ছিল না পুরোপুরি। এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

একা নয়। জয়িতাও। বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছিল দীপ্ত একেবারে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে নড়বে না—ডাক্তার নির্ভয় করে যাওয়ার পর আর দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকার মানে হয় না কোনো। এখন হেসে-খেলে পুরনো হয়ে যেতে পারে আবার, জয়িতা ভাবল, কিন্তু তার আগে দীপ্তকে আরো ক'টা দিন ছুটি নিতে বাধ্য করা দরকার। ক্লিনিক্যাল রিপোর্টেই যদি সব কিছু ঠিক ঠিক ধরা পড়ত, তা হলে শরীর নিয়ে এতো জটিলতা বাড়ত না। কিছু না হলেও নিশ্চিত কিছু একটা হয়েছিল দীপ্তর, হয়তো সামান্য ক্ষণের জন্যে—এমনও হতে পারে, স্বাস্থ্যের জোরে ভালোমন্দ কিছু পাকাপাকিভাবে হওয়ার আগেই কমে গিয়েছিল আক্রমণের তীব্রতা। একসঙ্গে অনেক দিন থাকা হলো, মুখের অভিব্যক্তি দেখে এখনো দীপ্তকে না-চেনার মতো বোকা নয় জয়িতা। সাবধান তাকে হতেই হবে।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো জয়িতা। দীপ্ত ব্যালকনিতে। পাশে পাপু। আকাশে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে প্লেন, সেদিকে আঙুল তুলে কী বলছে বাবাকে। ভ্রমরগুঞ্জনের মতো একটানা শব্দ এগিয়ে যাচ্ছে লাইন ধরে, হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেলেও রেশ কাটছে না তার। ইচ্ছে করেই মুখ ভার রেখে ঘরের মধ্যে থেকে গেল জয়িতা। নতুন প্রেসক্রিপসান লেখার জন্যে প্যাড আর কলম বের করে দিয়েছিল ডাক্তারকে, সেগুলো তুলে রাখল জায়গামতো, ডাক্তারের ফেলে-যাওয়া সিগারেটের খালি প্যাকেটটা ফেলে এলো বাস্কেটে। এখন, অগত্যা, বিছানার চাদর নিয়েই টানাটানি করবে সে, কিংবা, বেরুবার আগে, এই ফাঁকে চুলটাও আঁচড়ে নিতে পারে।

ঘর আর ব্যালকনির মাঝখানে ফিনফিনে পর্দার ভিতর দিয়ে দু'জনকে প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। রেলিংয়ে ঝুঁকে পাপু এখন আকাশ থেকে রাস্তার দিকে টেনে নিয়ে গেছে দীপ্তকে। আজ সে স্কুলে যায়নি, জোর করেও পাঠানো যায়নি। বহু দিন পরে দীপ্ত আজ ক'দিন পুরোটা সময় বাড়িতে—স্যুট, ট্রাউজার্স, বুশশার্টের তৎপরতা নেই, এমনকি সিগারেটের ধোঁয়ায় মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে না মুখ। এ-দৃশ্য পাপুর কাছে নতুন। হয়তো, হয়তো কেন—নিশ্চয়ই, পাপুর চোখে একটা ছবি আছে তার বাবার, দীপ্তর আজকের রূপান্তরের সঙ্গে যা হুবহু মিলে যায়। ছবিটা সে আর হারাতে চায় না। অল্প ঘোরের মধ্যে জয়িতা ভাবল, দৃশ্যটা তার কাছেও কি নতুন নয়!

প্লেনের শব্দ কখন মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। পিছনে পড়ে আছে দীর্ঘ সরলরেখা—একাভিমুখী ভাবনা থেকে চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে ফেরাতে পারল না জয়িতা।

কেরিয়ারিস্ট বলতে যা বোঝায় দীপ্ত ঠিক তাই, তার চেয়ে এক চুল কম নয়, বেশি নয়। পা ফেলার আগে পরখ করে নেয় পায়ের চেটো—দম আছে ঢের, দৌড় শুরু করে মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়েনি কখনো। দৌড়ুচ্ছে এখনো। দূরপাল্লার দৌড়ের মতো ট্র্যাকের শুরুটা চোখে পড়লেও শেষটা যেন ক্রমশই সরে যাচ্ছে দূরে। অগ্রবর্তী প্রতিটি বিন্দু থেকে দূরত্ব তাই সমানই লাগে। এতোটুকু রোখ কমেনি তবু। দীপ্তর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও দৌড়ে এসেছে বহু দূর। ঠিক কতো দূর, পিছনে তাকিয়েও এখন আর তা অনুমানে কুলোয় না। তবে নিশ্চিত অনেক দূর। খুব চেষ্টা করলে কুয়াশায় ঘেরা থামের মতো আবছাভাবে শুরুর খুঁটিটাও চোখে পড়ে কখনো-সখনো, প্রায়ই পড়ে না। তবু আজ, এই মুহূর্তে, দীপ্তর অগোচরে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক আবেশে ভরে উঠল জয়িতা। এই সেই লোক, যে তাকে জয় করার আগেই দাবি করেছিল : এই সেই লোক, যে আলাপের তৃতীয় দিনেই

শুতে চেয়েছিল তার সঙ্গে—এই সেই লোক, যার প্রতি ঘৃণায় একদিন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। পারেনি, ঘৃণা থেকেই ছুটে গিয়েছিল আকর্ষণের দিকে—শরীরী আকর্ষণে, একটি নষ্ট ভ্রূণের জন্ম দিতে। ভালোবাসা এসেছিল পরে। নেতিয়ে-পড়া ডাল থেকে যেভাবে জন্ম নেয় সবুজ, ঠিক সেইভাবে—আস্তে আস্তে নিজের রক্তে পাপুর জন্ম টের পেয়েছিল জয়িতা, টের পেয়েছিল দীপ্তর স্থায়িত্ব। সেদিনের অনুভূতি হঠাৎ স্পর্শ করে গেল তাকে।

খুব মমতাভরে ছেলের নাম ধরে ডাকল জয়িতা, 'পাপু, ও পাপু—'

পাপু ঘরে এলো। সঙ্গে দীপ্তও। বোতাম-খোলা পাঞ্জাবিতে আলস্য জড়ানো। ব্রাশ না-করা চুলগুলো ঝুঁকে এসেছে কপালে, গালে দাড়ির আভাস। ঠিক রবিবারেরও নয়, বিশুদ্ধ ছুটির চেহারা। জয়িতা মুখ ফিরিয়ে নিল। ভাবলে অবাক লাগে, ক'দিন আগে এক রাতে এই লোকটির দিকে তাকিয়েই 'গেট আউট' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে!

গায়ে গায়ে এসে আঁচল টেনে ধরল পাপু। ডাক্তার আসবে বলে আজ ভোরেই জয়িতা নাইটি ছেড়েছিল।

'কী, মা!'

'তুমি বাবার কাছে থাকো। আমি একটু বেরুবো।'

'ও মা, বাবাও তো অফিসে যাবে বলল!'

'না, যাবে না—', পরোক্ষে প্রস্তুতি চালাল জয়িতা, আলগোছে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে আবার ফিরে এলো পাপুতে, 'কী, থাকবে তো?'

'বাবা, থাকবে?'

দীপ্ত হাসল; জবাব দেওয়ার আগে স্ত্রীকে লক্ষ করল একটু। মনে হচ্ছে হঠাৎই আড়াল তুলে দিয়েছে জয়িতা—একটু আগে, ডাক্তারের সামনে, যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল, এখন আর তা নেই। 'পিপে পিপে' কথাটা জয়িতার মুখে আজই নতুন শুনল দীপ্ত; জয়িতার পক্ষে অসচরাচর বলেই তখন মজা পেয়েছিল খুব। এসব শুনে মনে হয় জয়িতারও একটা শৈশব ছিল—এখনো তা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় কাঁচা শব্দের ব্যবহারে, ভুলতে পারে না। দীপ্তও কি পেরেছে!

'শুনলে তো?'

'কী?'

'ডাক্তার কী বলল!' কথাটায় জোর দেওয়ার চেষ্টা করল দীপ্ত, 'আই টোল্ড্ ইউ! নাথিং রং।'

'সেটা তোমাকে বলেছে—', বলে, সামলে নিল জয়িতা। অযথা ভয় পাইয়ে লাভ নেই। থেমে বলল, 'এখন সাত দিন অন্তত বাড়িতে বসে থাকো।'

'বাড়িতে বসে থাকলে কি আমার চলবে! এখনই ক্লামজি লাগছে—'

'ঠিক আছে,' প্রসঙ্গটা শেষ করার চেষ্টায় জয়িতা বলল, 'নিজে যা ভালো বোঝো করো। সবই যদি নিজের ইচ্ছেয় করবে, তা হলে শুধু শুধু ডাক্তার ডাকা কেন!'

দু'জনের কথার মাঝখানে এবার এগিয়ে এলো পাপু। বায়না করার গলায় বলল, 'থাকো না বাবা বাড়িতে!'

'ও· কে· ও· কে·।' মাটিতে পা রেখে বিছানায় বসেছিল দীপ্ত, পা দুটো বাড়িয়ে সাঁড়াশির ধরনে কাছে টেনে আনল পাপুকে। মাথাভর্তি চুল পাপুর, মুখের গড়নে জয়িতার আদল।

মুঠোয় ওর একমাথা চুল টেনে ধরে দীপ্ত বলল, 'তা হলে তুমি আর আমি থাকি। মাকে ঘুরে আসতে বলো—'

'বাব্বা, এতো টান ছেলের জন্যে। জানতুম না তো!'

জয়িতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ইতিমধ্যে ওয়াড্রোব খুলে শাড়ি বের করেছিল—লালপেড়ে ঘি রঙের শাড়ি, জয়িতার পছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ব্যাপারটা চোখে পড়লেও দীপ্ত কিছু বলেনি তখন। ড্রেসিং রুমের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে লাল-সাদার মিশ্র আবরণ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। আগাগোড়া সচেতন থাকা সত্ত্বেও কখন কীভাবে বদলে যাচ্ছে রঙগুলি, ধরতে পারছে না ঠিক ঠিক। টান করে বাঁধা স্নায়ুগুলো বিশ্রামের আবহে ছড়িয়ে যেতেই অসংলগ্ন লাগছে সব কিছু—রঙ, শব্দ, কথা। যেন প্রত্যক্ষের আড়ালে থেকে যাচ্ছে আরো কোনো অর্থ। বোধ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস দিয়ে তাদের স্পর্শ করা সম্ভব নয়।

নিজেকে ঢিলে করে নিল দীপ্ত। খুব হাল্‌কা গলায় যে-কথাটি বলে এইমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জয়িতা, এখন তারও একটা মানে করে নিল। এই মুহূর্তে নয়; ঠিক এই কথাগুলি বলার জন্যে জয়িতা যেন অনেক দিন ধরেই প্রস্তুত হচ্ছিল মনে মনে। সুযোগ পায়নি। ভাবেনি অভ্যাস থেকে সত্যিই কোনো দিন বেরিয়ে আসতে পারবে দীপ্ত। আজ সে নিজেই সুযোগ করে দিয়েছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে দীপ্ত। কর্মহীন, ক্লান্ত দিনযাপনে অসম্ভব নির্বান্ধব মনে হয় নিজেকে। এতো দিন ধরে যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়েছে সবার ওপরে, যেন নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই তাদের—লতানে গাছের মতো খুঁটি ছাড়া উঠতে পারে না আকাশে। জীবিকা থেকে দূরে, আলস্যে, কাণ্ড-শুকনো ডালপালা নিয়ে নেতিয়ে পড়ে দীপ্ত। বাড়িতে টেলিফোন আছে, তবু খুঁজে পায় না এমন কোনো সম্পর্ক, যেখানে ডায়াল করে বলতে পারে—দীপ্ত বলছি। নাম ভাবতে মনে পড়ছে সমীরণ, সিন্‌হা, মুস্তাফী, রবি, বিমল, যোশী, সুনীতা—জীবিকার সুতোয় জড়ানো সব নাম, একটিকে টানলেই এসে পড়ে আর একটি, তারতম্যহীন স্লাইডের মতো। কেউই ব্যক্তিগত নয়। কবরখানার ফলকে নাম পড়ার ধরনে একে একে তাদের পেরিয়ে যায় দীপ্ত, দাঁড়ায় না—আকস্মিক চিন্তায় খাড়া হয়ে ওঠে রোমকূপ। ভয় হয়; একদিন হয়তো সে নিজেকেও পেরিয়ে যাবে এইভাবে।

রাতভোর বৃষ্টি গেছে কাল। এই বিছানায়, জয়িতার শরীরের প্রাকৃতিক গন্ধের ভিতরে শুয়ে, সারা রাত কান পেতে রেখেছিল বৃষ্টির শব্দে। ঘুম আসেনি। এমন পরিচ্ছন্ন ঘুম না-হওয়ার কষ্ট অনেক দিন অনুভব করেনি দীপ্ত। শেষ তিন চারটে দিন মদ্যপান না করলেও ঘুমের বড়ি খেয়েছিল, ঘুমোতে অসুবিধে হয়নি কোনো। কাল রাতে ট্রায়াল দিয়েছিল—কাল রাতে টের পেল রাতগুলো দিনের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ, নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও আশ্চর্যভাবে বেজে উঠতে পারে শব্দ। একটানা অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখে শব্দের উৎসও জেনে গেছে কাল। সে-সব কিছুই মনে থাকেনি সকালে, বৃষ্টি থেমে যাবার পর। ছিমছাম রোদ্দুরে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে আবার রাতের অনুষঙ্গে ফিরে যেতে চাইল দীপ্ত। একটা, যা-হোক একটা অবলম্বন চাই। নিষেধ ভাঙবে নাকি একটু? জয়িতা নেই, এখন ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে ফিরবে না। আসলামকে ডেকে বলবে নাকি ড্রিঙ্কস্ এনে দিতে!

না, পাপু আছে। নিজেকে সংযত করে নিল দীপ্ত। চেয়ার টেবিলে বসে রঙ-পেনসিল

দিয়ে ছবি আঁকতে বসেছে পাপু, ইতিমধ্যে একটিও কথা বলেনি। 'বাবাকে বিরক্ত কোরো না', যাবার সময় বলে গেছে জয়িতা, হয়তো মনে রেখেছে কথাটা। কী দরকার ছিল জয়িতার এ-কথা বলার!

ঘাড় তুলে কনুইয়ে মাথা দিল দীপ্ত। পাশ ফিরল।

'পাপু?'

একবার তাকিয়ে আবার ছবি আঁকায় মন দিল পাপু। সাড়া দিল না।

'কী আঁকছ?'

'দেখবে?' একটু বা সন্দেহের চোখে তাকাল পাপু। তারপর খাতা নিয়ে চলে এলো কাছে।

'বাঃ, বেশ তো!' প্রশ্রয়ের গলায় বলল দীপ্ত, 'এরা কারা?'

'চিনতে পারছ না! এটা মা, এটা তুমি—'

'আর তুমি কোথায়?'

'আমি!' অল্প দ্বিধা করল পাপু, 'আমি নেই!'

শব্দটা ঝুঁকে এলো কানে, রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই অনুরণন তুলল নৈঃশব্দ্যে। পাপুর জন্মের আগে জন্ম নিয়েছিল আর-এক পাপু, নামকরণের সুযোগ পায়নি দীপ্ত। বেঁচে থাকলে কীরকম দেখতে হতো সে, অবিকল পাপুর মতো! ভ্রূণ কি কখনো উৎসের আদল পায়!

দীপ্ত বলল, 'দাও, আমি তোমার একটা ছবি এঁকে দিই—'

কলিং বেলটা কোঁ-কোঁ করে উঠল এই সময়। কাগজের ওপর পাপুর আদল ফোটাতে ব্যস্ত দীপ্ত, চোখ তুলে বলল, 'দেখবে, কে এলো?'

'মা বোধ হয়।'

'মা এখন আসবে না।' আসলাম আছে, তবু, দ্বিতীয়বার শব্দ হতেই দীপ্ত বলল, 'দ্যাখো না, কে এলো!'

পাপু উঠে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেনা গলার শব্দে চমকে উঠল দীপ্ত। শম্পাদি!

আর বসে থাকা যায় না। বিশ্বাসও হয় না। অভ্যাসে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিল দীপ্ত, পাঞ্জাবির ঝুল টানতে টানতে বেরিয়ে এলো বাইরে।

'আরে, শম্পাদি! কী ব্যাপার!'

'তোর কী ব্যাপার বল আগে!' টেবিলের ওপর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে আঁচলে চাপ দিয়ে মুখ মুছে নিল শম্পা, 'দিব্যি বাবু সেজে বসে আছিস বাড়িতে। এদিকে তোর অফিস বলল ভীষণ অসুস্থ, ফোন করাও নাকি বারণ!'

'ফোন করেছিলে?' অপ্রতিভভাবে বলল দীপ্ত, 'বোসো না?'

'বসছি। পরশু ফোন করেছিলাম—', বসতে বসতে বলল শম্পা, 'ওই লোকটা কে তোর, বেয়ারা না বাবুর্চি! একটু জল খাওয়াতে বল আগে। কী রোদ বল আজ!'

রোদ শুধু বাইরে নয়, শম্পাদির সর্বাঙ্গে। ইশারায় আসলামকে জল আনতে বলল দীপ্ত। আড়ে তাকাল শম্পার দিকে। এখনো তেমনিই আছে, দশ কি বারো বছর আগে যেমন দেখে এসেছিল। বরং একটু রোগাই হয়েছে। চোখ সয়ে গেলে হয়তো পার্থক্যটা বুঝতে পারবে।

অল্প দূরে পাপু। চোখে পড়তেই শম্পা বলল, 'তোর ছেলে? কী লাভলি হয়েছে! এই

যে, কাছে এসো।'

জড়োসড়ো ভাব কাটিয়ে দু'এক পা এগিয়ে এলো পাপু।

'নাম কী তোমার ?'

'পাপু—'

'পাপু তো ডাক নাম, ভালো নাম বলো ?'

'ভালো নামও পাপু।'

ছেলের স্বতঃস্ফূর্ততায় অবাক হলো দীপ্ত। শম্পাদি জাদু জানে। আজ বলে নয়, একদিন সেও বশীভূত হয়েছিল, এমনকি জয়িতার সঙ্গে মেলামেশা জমে ওঠার পরও ভুলতে পারেনি অনেক দিন। এই সেদিনও 'ওল্ড ফ্লেম্' বলে ঠাট্টা করেছিল জয়িতা। দীপ্ত কি অস্বীকার করতে পারবে, আজও সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারছে না! শম্পার হঠাৎ-আবির্ভাবে খুশিই হয়েছে সে—অনেকক্ষণ একটানা গুমোটের পর হাওয়া এলো এক ঝলক ; তবু না এলেই যেন আরো ভালো হতো!

ভিতরে একটা ক্ষরণ টের পেল দীপ্ত। ছবিগুলো ধুলো মাখা, বিবর্ণ, অপ্রয়োজনীয়ও। দীপ্তর কাছে তাদের কোনো দাবি নেই। তবু ফেলে দিতে পারেনি। পাপুর ঘরের আলমারিতে পুরনো ফাইলে বন্দী হয়ে আছে চিঠিগুলো—শম্পাদির, সুজনের, বাবা আর মা'র, অলিপুর, একটি বা দু'টি নির্মাল্যরও। মূল্যহীন, ভাঁজপড়া কয়েকটা কাগজ ছাড়া কিছু নয়। প্রতিবার বাড়ি বদলের সময় জয়িতা সেগুলো ফেলে দেওয়ার কথা তোলে। এবার একটু ক্ষিপ্তই হয়েছিল দীপ্ত, 'ওগুলো থাকায় কী অসুবিধে হচ্ছে তোমার! এখন তো জায়গা অনেক বেশি!' চট করে কোনো জবাব দিতে পারেনি জয়িতা। 'জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভ কী!' পরে বলেছিল। জঞ্জাল!

পাশাপাশি দু'টি রাস্তা। দু'জন দীপ্ত। জয়িতার স্বামী, পাপুর বাবা, হিন্দুস্থান ফস্টারের নাম্বার টু-কে চেনা যায়। কুয়াশায় সূর্যালোক পড়লে আর-একজনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে, না হলে সে বন্দী হয়ে থাকে পুরনো গন্ধের ভিতর।

বর্তমানকে আধখানা করে শম্পার কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছিল দীপ্ত। আসলাম চা দিয়ে গেল। পাপু বসেছে শম্পার গা ঘেঁসে, ছবি-আঁকার খাতাটা তুলে দিয়েছে শম্পার হাতে। যেন ওদের অন্তরঙ্গতা নতুন নয়। বাইরে ঝকঝকে রোদ। ওপরের ফ্ল্যাটে চড়া সুরে রেডিওগ্রাম খুলে দিয়েছে। চেনা গলা, সম্ভবত ন্যাট কিং কোলে।

অস্বস্তি কাটানোর জন্যে সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যেতে বলল আসলামকে। ডাক্তার কন্ট্রোল করতে বলেছিল, ভাবেনি ফুসফুসে উত্তাপ সঞ্চারের জন্যে এটা তার দরকার। স্বাস্থ্য, শরীর এসব নিয়ে খুঁতখুঁত করতে ভালো লাগে না।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল দীপ্ত।

'সকালে এলে! আজ তোমার কলেজ ছিল না ?'

'ছিল। গিয়েওছিলাম। একজন প্রফেসর মারা গেছেন, ছুটি হয়ে গেল।' শম্পা বলল, 'ফেরার পথে ভাবলাম, ঘুরে যাই। শুনেছিলাম শরীর খারাপ। তুই তো আমাদের খোঁজ-খবর নিবি না!'

'কথাটা ঠিক নয়।' দীপ্ত বলল, 'সারাক্ষণ এতো ঝামেলায় থাকি!....যাক্‌গে, সুজনের খবর কী ? কলকাতায় আসে-টাসে ?'

'আসছে, শীগ্রিই আসবে লিখেছে। কী সব নতুন প্ল্যান ঢুকেছে মাথায়! চাকরিটাও বোধ

হয় ছেড়ে দেবে—'

'হঠাৎ।'

'জানি না—'

পরবর্তী প্রসঙ্গের জন্যে ছটফট করে উঠল দীপ্ত। শম্পাও যেন হঠাৎ গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। হয়তো মনে পড়েছে কিছু, হয়তো দীপ্ত তেমনভাবে সাড়া দিতে পারেনি। মাথা নিচু করে বসে আছে এখন। সচেতনভাবে লক্ষ করল দীপ্ত, শম্পার সিঁথিটা এখন আগের চেয়ে বেশি চওড়া দেখায়, একটু শুকনোও। একদিন শম্পাদি তাকে টানত। অথচ, আজ, এখন, সে তেমন কৌতূহল বোধ করছে না কেন।

'পাপু, মাকে একটা ফোন করবে নাকি ? বলো, শম্পাপিসি এসেছে—'

'না, না, থাক।' উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে উঠল শম্পা, 'শুধু শুধু ডাকছিস কেন। আমি এবার উঠবো—'

সত্যিই উঠে দাঁড়াল শম্পা। সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, 'তোকে খুব অন্যমনস্ক দেখছি। কী হয়েছে। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ?'

'না, সে-সব কিছু নয়। শরীরটা খারাপ— ।' অল্প হেসে বলল দীপ্ত। 'সুজন এলে খবর দিও। ও তো আসবে না, আমিই দেখা করব।'

'তার আগে তুই-ই আয় না একদিন। জয়িতা, পাপুকেও নিয়ে আসিস। কী পাপু, আসবে তো

পাপু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। আসবে।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' হাত বাড়িয়ে পাপুর গাল টিপে দিল শম্পা। 'তুমি যেন তোমার বাবার মতো বড়ো সাহেব হয়ে যেও না—'

দীপ্ত বলল, 'খোঁচা দিচ্ছ। তুমিও— ।'

'খোঁচা নয়। যা সত্যি তাই বললাম। তুই বড়ো হয়েছিস, আরো বড়ো হবি। তাতে কি অখুশি হবো আমি। আমি যে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি—'

কথাগুলোর অর্থ ঠিক বোধগম্য হলো না দীপ্তর। শুধু ক্ষীণভাবে মনে হলো, শম্পা হাত বাড়িয়েছে স্মৃতির দিকে। জানে না সকাল থেকে সে নিজেও বিচরণ করছে সেখানে। শম্পাদির হঠাৎ আবির্ভাবে যতোই আকস্মিকতা থাক, দীপ্তর কাছে সেটা আকস্মিক নয়। সে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

যাবে বলে উঠেও দাঁড়িয়ে থাকল শম্পা। নতুন করে অস্বস্তি শুরু হলো দীপ্তর। ভালো হতো জয়িতা বাড়ি থাকলে। দু'জন দীপ্ত তখন সহজেই একজন হয়ে যেতে পারত, অন্তত এতোখানি অসহায় লাগত না।

'তোর কাছে একটু দরকারেই এসেছিলাম, দীপ্ত। শরীর খারাপ, আজ আর বললাম না। তুই অফিসে যাচ্ছিস কবে ?'

'যাব আজকালের মধ্যে। তুমি বলো না কী দরকার ?'

আয়ার ডাক শুনে পাপু ছুটে গেল ঘরে। এখন ওর স্নান করার সময়। পাপুর ছেড়ে-যাওয়া জায়গাটার দিকে খানিক চুপচাপ তাকিয়ে থাকল শম্পা।

'একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম তোর কাছে। রতন—'

দীপ্ত ভুরু কোঁচকাল। এখন তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন।

'কী ব্যাপার বলো তো ?'

'মনে নেই। একটা চাকরির জন্যে…তোদেরই অফিসে।'

'ও, হ্যাঁ। নাউ আই রিমেমবার…'

দীপ্ত আর এগুলো না। বিষয়টা তেমন জরুরী নয়। অন্য কেউ হলে গা করত না, পরিষ্কার বলে দেওয়া যেত, সরি, চান্‌স্ নেই কোনো। শম্পাদি বলেই অসুবিধে। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে লাগল সে।

'এক মাস হয়ে গেল, এখনো কোনো খবর পায়নি। শুনলাম, তোদের ইন্টারভিউ হয়ে গেছে—'

'ওয়েল, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ইন্টারভিউ হয়নি এখনো।' তাড়াহুড়ো করে কথাগুলো বলে একটু থামল দীপ্ত। পরে বলল, 'ও কি অন্য কোথাও চেষ্টা করছে?'

শম্পা সম্ভবত কিছু আঁচ করল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল দীপ্তর দিকে।

'চেষ্টা করছে, সুজনকেও লিখেছি। ছেলেটি ভীষণ নিডি। কিন্তু খুঁটির জোর তো নেই! আমাকে ধরেছিল। আমার আর জোর কোথায়। ভেবেছিলাম—'

কথাটা শেষ করল না শম্পা। হঠাৎ ব্যস্ততায় এগিয়ে গেল কয়েক পা।

'চলি—।'

'আমি দেখব।'

'দেখিস. যদি কিছু করার থাকে…'

লিফ্‌ট্ পর্যন্ত এগিয়ে দিল দীপ্ত। লিফ্‌ট্ না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। চুপচাপ। নেমে যেতে-যেতে শম্পা বলল, 'আসিস।' শব্দটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল না।

খুব সাবধানে দরজাটা বন্ধ করল দীপ্ত, যাতে কোনো শব্দ না হয়। আর এক দফা চা'র ফরমাস করে পুরনো জায়গায় এসে বসল। সিগারেট ধরাল। পাপু রেডি না-হওয়া পর্যন্ত নৈঃশব্দ্যই তার সঙ্গী। মনে হচ্ছে ঠিক হয়নি, একটা মিথ্যাকে পাশ কাটাতে গিয়ে নতুন করে জড়াল নিজেকে। ভালো হতো যদি শম্পাদিকে পরিষ্কার বলে দিতে পারত, সম্ভাবনা নেই—রতনের দরখাস্তটা পৌঁছয়নি, আমি নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেলেছি। বলতে পারত, আমি অনেক বদলে গেছি, শম্পাদি, কে নিডি, কে নয়, তা ভাবলে এখন আর চলে না আমার। তা না বলে পরোক্ষে সে আশ্বাসই দিল না কি? কেন। ভয়ে? লজ্জায়? নাকি এতো দিন পরেও শম্পাদির ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে ছোটো মনে হয়েছিল তার।

॥ পাঁচ ॥

রিসেপসানিস্ট মেয়েটির চোখে খুব হাল্‌কা রঙের চশমা। সাদা কপালের মাঝখানে সূক্ষ্ম সবুজ রঙের টিপ। শাড়ি, ব্লাউজ, দুটোর রঙই সবুজ। এক হাতে পান্না-বসানো বালা, অন্য হাতে সবুজ ব্যাণ্ডের রিস্টওয়াচ। প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে।

'মিস্টার রে, আপনি যান। মিস্টার মুখার্জি ইজ ফ্রি নাউ।'

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। মুখার্জি সময় মেনে চলেন, ডিসিপ্লিন পছন্দ করেন। এ-সবই শোনা ছিল দীপ্তর। দেরি হতে পারে ভেবে মিনিট দশেক আগেই এসে পৌঁছেছিল, খবরও দিয়েছিল; কিন্তু পাঁচটা মানে যে পাঁচটাই এ-ধারণা ছিল না।

মেয়েটির দিকে সৌজন্যের হাসি ছুঁড়ে দিয়ে নিজের পোশাকটার দিকে তাকিয়ে নিল একবার। না, খুঁত নেই কোথাও। নতুন সামার-স্যুটটা আজই প্রথম পরল। চমৎকার ফিট করেছে গায়ে। পা বাড়াবার আগে সাফল্য শিহরন তুলে গেল শরীরে। মুখার্জি নিজে যখন ডেকেছেন, তখন নিঃসন্দেহে ভাবা যায় স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্সের কফি-অ্যাকাউন্ট হিন্দুস্থান ফস্টারে এসেছে ক্যাম্পেনের জোরে, সিন্‌হার তৎপরতায় নয়। এখন সে অনেক বেশি সহজ হতে পারে।

বাস্তবিক সহজ বোধ করছিল সে। ক্যাম্পেন প্রেজেন্ট করার কয়েক দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, দিন সাতেক অফিসে যায়নি। তাতে উৎকণ্ঠা প্রশমিত হলেও উদ্বেগ কমেনি। কোনো খবর না পেয়ে ভেবেছিল হাতছাড়া হয়ে গেল অ্যাকাউন্টটা—ব্যর্থতা ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছিল বিষাদে। আশ্চর্য, যে-সিন্‌হাকে সে খুঁটি বলে ভেবে এসেছিল এতো দিন, যার ইচ্ছেয় সুনীতাকে টোপ ফেলেছিল, প্রেজেনটেসানের পর এ-নিয়ে সেই সিন্‌হাও একটিও কথা বলেনি। একদিন ফোন করেছিল দীপ্ত। দ্বিধাগ্রস্ত গলায় সিন্‌হা বলল, 'এখনো কিছু ডিসিসান হয়নি। লেট আস ওয়েট অ্যাণ্ড সি। ঘাবড়াবার কিছু নেই—।'

এ-ধরনের মন্তব্যে জোর পাওয়া যায় না কোনো। বরং সন্দেহ হয়। ভদ্রতার খাতিরে একেবারে নাকচ না করে ধৈর্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। সব পাকা হয়ে গেলে রিগ্রেট লেটার পাঠিয়ে দেবে। অসুবিধে করছিল সিন্‌হার ওই 'ঘাবড়াবার কিছু নেই' কথাগুলো। নানা রকম প্রলোভন আছে লোকটির, এবং এ-ব্যাপারে রামতনু সোমের চেয়ে দীপ্ত অনেক নির্ভরযোগ্য। খটকা থেকে গেল।

তার পরের ঘটনাগুলো ঘটল অদ্ভুতভাবে। জয়িতাকে রিপোর্ট করা নিয়ে সমীরণের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না, দীপ্তর মেজাজ টের পেয়ে সমীরণও কাছে ঘেঁসেনি। চাপা যুদ্ধ। এমনকি দীপ্ত অসুস্থ হওয়ার পরও খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেনি সে। একটার পর একটা ঘটনা ক্রমশ বিরূপ করে তুলছিল দীপ্তকে, ভাবছিল প্রথম সুযোগেই সরিয়ে দেবে সমীরণকে। প্রায় এই রকম সময়ে সমীরণই খবরটা আনল ; হিন্দুস্থান ফস্টার সম্পর্কে ডিসিসান হয়নি এখনো, তবে স্টারলেট হিউম রিগ্রেট লেটার পেয়ে গেছে। চিঠি সই করেছেন স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্সের মার্কেটিং ডিরেক্টর নিজে।

খবরটা পেয়েই অফিসে ছুটে এসেছিল দীপ্ত। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখন কলকাতায় নেই। মাদ্রাজে গেছেন নতুন অফিস খোলার ব্যাপারে, ফিরতে অন্তত সাত-আট দিন দেরি হবে। করণীয় সব কিছুরই দায়িত্ব তার। এ-ছাড়া আর একটা বিষয়েও তৎপর না হয়ে পারেনি দীপ্ত। কফি-অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে বিনয় চৌধুরীর অ্যাটিচুড আগাগোড়া একটু গোলমেলে লাগছিল তার—কোনো দিনই খুব একটা উৎসাহ দেখাননি ভদ্রলোক, এমনকি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করেছেন মাঝে মাঝে। ঘা খেয়ে বুঝেছিল দীপ্ত, চৌধুরী পরীক্ষা করছেন তাকে—ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতের পথ বন্ধ।

তা ছাড়াও কারণ ছিল, যেটা বাড়িতে অলসভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ অনুমান করেছিল দীপ্ত। মুখে যাই বলুন, চৌধুরী রামতনু সোমকে ভয় পান। সেই ভয় থেকেই নিজে না এসে এগিয়ে দিয়েছেন দীপ্তকে—যাতে, বাইরের জগতে অন্তত, নিজের ভূমিকা পরিষ্কার হয়ে থাকে। সমীরণের খবরে এই চিন্তাটাই আবার ব্যস্ত করে তুলেছিল তাকে। এই অ্যাকাউন্টের কোনো কৃতিত্বই চৌধুরীকে নিতে দেওয়া যাবে না। লক্ষ্য ঠিক হয়ে আছে,

আজ না হোক কাল, কিংবা কয়েক দিন পরে চৌধুরীর মুখোমুখি সে হবেই। হাতের তাসগুলি এখনই সাজিয়ে রাখা ভালো।

তারপর আজ—আজ সকালে। ফোন এলো। নারী কণ্ঠ ; শুনেই বুঝল পুষি দত্ত, অশোক মুখার্জির সেক্রেটারি।

'কন্‌গ্র্যাচুলেসান্‌স্‌!'

'হঠাৎ!'

'হঠাৎ!' পুষি এলিয়ে দিল নিজেকে, 'ট্রাইং টু বি নটি! বেশ, বেশ। আজ আসুন বিকেল পাঁচটায়, বস্‌ ডেকেছেন। ওঁর কাছেই শুনবেন।'

আর কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পুষিকে চেনে। সিন্‌হার খুব ঘনিষ্ঠ, সিন্‌হাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এ-ব্যাপারে অন্তত ফাজলামি করবে না পুষি। উত্তেজিত গলায় বলল দীপ্ত, 'মেনি থ্যাঙ্কস্‌, পুষি। আই প্রমিস এ স্কচ্‌...'

পুষি হাসল, 'বাই অল মিন্‌স্‌, ইউ শুড্‌!' তারপর সুর পাল্টাল, 'তা হলে বিকেল পাঁচটায়। মিস্টার মুখার্জির সঙ্গেই দেখা করবেন আগে—'

শেষের কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না। সম্ভবত সিন্‌হাকে এড়িয়ে যেতে বলল পুষি। কারণ আছে হয়তো। আপাতত সে-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কৌতূহলটা দমিয়ে রাখতে পারে সে।

দু'চারজন ছাড়া কাউকে জানাল না। রক্ত আজ এলোপাথাড়ি দৌড় শুরু করেছে শরীরে। একটানা বেশ কয়েকটা দিন বিষণ্ণতায় ডুবে থেকে আজ আবার সে মাথা তুলেছে, নিজেরই তর্জনী উঠে এসেছে বুকের কাছে। সেখানে একটি মাত্র ধ্বনি—আমি, আমি, আমি। এর আগে ঠিক এমনি করে কখনো উপলব্ধি করেনি নিজের অস্তিত্ব। তখনই অফিস থেকে বেরিয়ে, ঘণ্টাখানেক বারে কাটিয়ে, বাড়ি গেল পোশাক বদলাতে। আজ সে স্বতন্ত্র হবে। জয়িতাকেও দেওয়া যাবে খবরটা।

টানা তিন-চার ঘণ্টার উত্তেজনার পর এখন এসেছে প্রশান্তি। গভীর আত্মবিশ্বাস। তার ছাপ তার হাঁটার ধরনে, হাসিতে, স্বরপ্রক্ষেপে—যেন এটাই স্বাভাবিক, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজে যতোই আস্ফালন থাক, যুদ্ধের পর, রিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে অসীম ক্ষমায় সে তাকিয়ে আছে তার ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে। নিপুণভাবে তৈরি ছিমছাম ও নিঃশব্দ করিডোরের মধ্যে দিয়ে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌সের মার্কেটিং ডিরেক্টরের অফিসের দিকে শান্ত অথচ ঋজু পা ফেলে হেঁটে যেতে যেতে দীপ্ত না ভেবে পারল না—এই সেই পথ, যার ওপর দিয়ে দিনের পর দিন হেঁটে গেছেন রামতনু সোম—বিজ্ঞাপন-জগতের মিথ্‌ ; পালিশ-করা প্লাইউডের গায়ে এখনো হয়তো ছুঁয়ে আছে তাঁর নিঃশ্বাস! স্টারলেট হিউমে ট্রেনি হিসেবে ঢুকেছিল অনেক বছর আগে, তখন থেকেই রামতনুকে সম্বোধন করেছে 'স্যার' বলে, মুখোমুখি দেখা হলে সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়েছে রাস্তা—এখন তাঁরই ছায়া মাড়িয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে সদর্পে। কফি-অ্যাকাউন্ট পাওয়ার চেয়ে এইটাই হয়তো আরো বড়ো সাফল্য। হ্যাঁ, আমি কেরিয়ারিস্ট, চোয়াল শক্ত করে ভাবল দীপ্ত, বাট আই ডিজারভ্‌ড্‌ টু বি সো!

'হাই দীপ্ত!'

'হাই পুষি!' পুষি দত্তের অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টাকে স্বাভাবিক করে তুলল দীপ্ত, 'নিশ্চয়ই দেরি করিনি?'

'না, না।' পুষির হাতে উল-কাঁটা। আঙুল জুড়ে পরস্পরকে অতিক্রম করার খেলা।

চিবুক হেলিয়ে বলল, 'ঢুকে পড়ুন।'

'থ্যাঙ্কস্‌!'

কাঠের দরজায় পুরু কুশন আঁটা, ঠেললেও শব্দ হয় না কোনো। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কম করেও ষোল বাই বারো হবে, ফার্নিচারের স্বল্পতায় পরিসরের প্রাচুর্য আরো বেশি চোখে লাগে। আগাগোড়া মেরুন কার্পেট বিছানো। ওরই মধ্যে বড়ো কাচের জানলার দিকে মুখ করে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন অশোক মুখার্জি—পিছন থেকে দেখা বলেই এই মুহূর্তের আচ্ছন্নতা অনুমান করা যায় না। তবে নিশ্চিত অন্যমনস্ক—না হলে টের পেতেন দীপ্ত ঘরে ঢুকেছে, অপেক্ষা করছে।

দীপ্ত শুনেছিল ভদ্রলোক অসুস্থ, ভুগছেন, ইতিমধ্যে অপারেসান হয়ে গেছে বার দুয়েক। কিন্তু এতোখানি অন্যমনস্কতা আশা করেনি। একটু দ্বিধায় পড়ল সে। শেষে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'মে আই...'

'প্লিজ্‌।'

চেয়ারটা ঘুরে গেল। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে দীপ্ত লক্ষ করল ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠবার ভঙ্গি করলেন মাত্র, উঠলেন না। ঠোঁটের কোণ দুটো কুঁকড়ে উঠল, সম্ভবত চাপা কোনো যন্ত্রণায়। ওরই মধ্যে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন—'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!'

'ওয়েলকাম টু স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌স্‌!' ভদ্রতায় হাত বাড়িয়ে দিলেন মুখার্জি, 'কনগ্র্যাচুলেসান্‌স্‌। আপনাদের ক্যাম্পেন আমরা অ্যাপ্রুভ করেছি। ইট্‌স্‌ গুড্‌, ভেরি গুড্‌।'

প্রত্যুত্তর হারিয়ে যাচ্ছে। অল্প দিশেহারা বোধ করল দীপ্ত। ঠিক কোন কথাটা বলবে বুঝতে পারছিল না। নিজস্ব আবেগে যতোটা না, তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি লাগছে মুখার্জির মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রেজেন্‌টেসানের দিন দেখেছিল, তার আগেও কয়েকবার। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই যেন চেহারার অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে ভদ্রলোকের। চোখ কোটরগত, ভাঙা গাল, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে পাশে। মুখ জুড়ে অস্বস্তিকর ধূসরতা। এ-রকম চেহারা ও চোখমুখের সামনে নিজের সাফল্যকে বড়ো করে দেখা যায় না। তবু, এটা অফিস, সম্পর্কটা অফিসিয়াল এবং সৌজন্যের, এই আলাপে নিছক ভদ্রতা ছাড়া অন্য কিছু বিনিময় করা শোভন নয়।

'ধন্যবাদ।' যতো দূর সম্ভব সংযত গলায় দীপ্ত বলল, 'আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ—'

'না, কৃতজ্ঞ হবার কিছু নেই। আমি আপনাদের কোনো রকম ফেভার করিনি—কাজ দেখেই দিচ্ছি।' বলে নিঃশ্বাস নিলেন, শরীরটাকে একবার পিছনে ঠেলে আবার ঝুঁকে এলেন সামনে। চেষ্টা করলেন হাসতে। তারপর বললেন, 'স্টারলেট হিউম আমাদের পুরনো এজেন্সি, রামতনু সোম আমার বন্ধুই বলতে পারেন। কিন্তু আপনাদের কাজ আমাদের ভালো লেগেছে। ...কৃতজ্ঞ হবার কিছু নেই—'

পর পর অনেকগুলো কথা। কিছু প্রশংসার, কিছু নীতির। সম্ভবত 'কৃতজ্ঞ' কথাটা ব্যবহার করা উচিত হয়নি। খুব যে ভেবেচিন্তে বলেছিল তাও নয়। মুখার্জি ঘুরছেন ওই কথাটিকে কেন্দ্র করে। একটু দমে গেল দীপ্ত ; শুরু করার মতো নতুন কোনো প্রসঙ্গ খুঁজে পেল না। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

'খুব দেরি হয়ে গেল জানাতে। আই অ্যাম সরি।' মুখার্জি বললেন, 'দোষ আমারই....শরীরটা ভালো ছিল না।'

ঠিক এই ভাষায়, এইভাবে কথাগুলো বলার দরকার ছিল না। যেন নতুন কিছু শুনছে, যা প্রতিদিনের অভ্যস্ততায় অত্যন্ত বেমানান। দীপু ব্যক্তিগত হওয়ার চেষ্টা করল।

'কিছু দিন আগেই তো অপারেসান হলো!'

মুখার্জি হাসলেন। অস্বস্তি লুকোতে পারলেন না।

'কী যে হয়! হয়তো আবার...'

কথাটা অসম্পূর্ণ থাকল। চেয়ারটা জানলার দিকে অল্প ঘুরিয়ে নিলেন মুখার্জি।

পড়ন্ত বেলা, তবু রোদের আভা যায়নি এখনো। কাঁচের স্বচ্ছতার জন্যেই সম্ভবত কলকাতাকে এখান থেকে খুব কাছের দেখায়। সোজাসুজি তাকিয়ে হাওড়া ব্রিজের মাথা দুটো দেখতে পেল দীপু। এখনই সেখানে জ্বলে উঠেছে তীব্র লাল। কাছেই কোথাও নতুন বাড়ি উঠছে। এতোক্ষণ খেয়াল করেনি—পাইলিংয়ের ধাতব শব্দটা কানে আসতেই কপালে ঘাম টের পেল দীপু। নিখুঁত চেম্বারের নিয়ন্ত্রিত তাপ কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না তাকে। আগাগোড়া অস্বস্তির মধ্যে সে শুধু অনুভব করল, সাফল্যের প্রথম ধাক্কাটি পেরিয়ে এসেছে। মুখার্জির আপত্তি থাকলেও সে কৃতজ্ঞ বোধ করতে বাধ্য।

চা এলো। সঙ্গে সরঞ্জাম। কাপ একটি। দীপু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আঁচ করলেন মুখার্জি।

'আমার বারণ আছে। প্লিজ হেল্প ইওরসেল্ফ্...।'

যন্ত্রণার ভাবটা হঠাৎ যেন অন্তর্হিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরে এলেন মুখার্জি।

'রামতনু সোমকে নিশ্চয় চেনেন?'

কাপে চুমুক দিয়ে ঘাড় নাড়ল দীপু।

'স্টারলেটে ট্রেনি হয়ে ঢুকেছিলাম আমি...প্রায় তিন বছর ছিলাম।'

'আই নো। আপনার হয়তো মনে নেই, আপনাদের ইন্টারভিউয়ের সময় আমিও ছিলাম।' সন্দেহে তাকালেন মুখার্জি। 'অবশ্য আমারও মনে থাকার কথা নয়। রামতনু রিমাইণ্ডেড মি।'

'উনি নিশ্চয়ই খুব শক্ড্ হয়েছেন?'

'শক্ড্!' মুখার্জি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, যেন প্রশ্নটা আশা করেননি। একটু ভেবে বললেন, 'বিজনেসের কথা ভাবলে নিশ্চয়ই। কিন্তু রামতনু নোজ হাউ টু ফেস্ ইট। উনি আপনার প্রশংসাই করেছেন।'

অনেক উঁচুতে চলে যাচ্ছেন রামতনু। দীপু বুঝতে পারে—আঘাতটা রামতনুর একার নয়, অশোক মুখার্জিরও। এটা আশাতীত; হয়তো রামতনু সোমের নতুন চাল—হয়তো নয়, কিন্তু পরাজয়ের মধ্যেও কয়েক পা এগিয়ে গেছেন তিনি। দীপু হঠাৎই অনুভব করল, খানিক আগে 'কনগ্র্যাচুলেসান্স্' বলে যিনি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন হাত, তিনি স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্সের মার্কেটিং ডিরেক্টর, অশোক মুখার্জি নন। ব্যক্তির কাছে পৌঁছুতে হলে এখনো অনেক দূর যেতে হবে তাকে।

বেলা ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। বিভিন্ন আয়তের রূপে কাঁচের জানলাগুলো ছায়া ছড়িয়েছে দেয়ালে। আশেপাশে একবার বিভ্রান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল দীপু। জুলাইয়ের শেষ; এখন ক্রমশ ছোট হবে দিন। তাপ কমবে রোদের। একটু আগে—এখানে আসতে আসতে—আত্মচেতনায় ডুবে গিয়ে হঠাৎই একটা উপমা মনে এসেছিল; দিনান্তের ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে আবার অন্যমনস্ক হলো সে, ভাবল, ক্রমশ ঠাণ্ডা হবে রক্ত। বয়স

ক্ষমা করবে না, বয়স বাধ্য হবে সরে দাঁড়াতে। কিন্তু, আজ থেকে অনেক বছর পরে, সরে যেতে গিয়েও সে কি পাবে রামতনু সোমের মর্যাদা!

'তা হলে মিস্টার রে,' আকস্মিক গলায় বললেন মুখার্জি, 'আপনার কিছু বলার আছে?'

'না। মানে...', ইতস্তত করে বলল দীপ্ত, 'আমরা কি কাজ শুরু করতে পারি?'

'বাই অল মিন্‌স্! ফ্র্যাঙ্কলি, দু' মাসের বেশি সময় আপনারা পাচ্ছেন না, হয়তো আরো কম। পুজোর আগেই আমরা প্রোডাক্ট লন্‌চ্ করতে চাই।'

'ও. কে. স্যার। তাই হবে।'

'গুড্।' দু' হাতের আঙুল জুড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলেন মুখার্জি, কপালে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। হয়তো এটা যন্ত্রণা শুরুর আভাস। ঠোঁটে জিব বুলিয়ে বললেন, 'আপনি তো মিস্টার সিন্‌হাকে চেনেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। আমাদের কিছু সাজেসান্‌স্ আছে—মাইনর সাজেসান্‌স্। সেগুলো খেয়াল রাখবেন। কাল আমাদের অফিসিয়াল কনফারমেসান পেয়ে যাবেন। সিন্‌হা উইল গিভ ইউ দি ডিটেল্‌স্...'

মুখার্জি বেল টিপলেন। হাতটা আবার বাড়িয়ে দিলেন দীপ্তর দিকে।

'উইশ ইউ অল দি বেস্ট্।'

করমর্দন ফেরত দিয়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল দীপ্ত। মুখ-চোখ দেখে মনে হয় ক্লান্ত বোধ করছেন মুখার্জি, এর বেশি আলাপে উৎসাহ নেই। তার নিজের দিক থেকেও প্রয়োজন কম। মনে মনে খুশিই হলো সে—আজকের সুযোগের জন্যে ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে। মুখার্জি তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেননি। এটা ভালো; দীপ্ত না ভেবে পারল না, অন্তত এই একটা অ্যাকাউন্টে বিনয় চৌধুরী কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে পারবেন না। এটা তারই সাম্রাজ্য; এখন তাকে এগোতে হবে আরো বেশি বিস্তৃতির দিকে। জিবটা গালের একদিকে ঠেলে দিয়ে আত্মবিশ্বাসে শান দিল দীপ্ত।

পুষি দত্ত ঘরে ঢুকেছে। মুখার্জি নির্দেশ দিলেন, 'এঁকে মিস্টার সিন্‌হার কাছে নিয়ে যান—'

পৃথিবী পুষ্ট হয়ে আছে বহুতর সম্ভাবনায়। দীপ্ত ঘড়ি দেখল। প্রায় পৌনে ছ'টা, হিসেব মতো হিন্দুস্থান ফস্টার বন্ধ হয়ে যাবার কথা। তবু অপেক্ষা করবে অনেকে—অন্তত সমীরণ, হয়তো মুস্তাফীও। সকালে পুষি দত্ত টেলিফোন করার পর যে-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল, তার কতোটা খুশির দিকে, কতোটা না—দীপ্তর চেয়ে বেশি তা আর কে বুঝবে! প্রচেষ্টা যতোই সম্মিলিত হোক, সমীরণরা জানে এটা দীপ্তরই জয়, আর কারুর নয়। নিশ্চিত হয়েও তাই তারা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সেই অনিশ্চয়ের জন্যে, ভাগ্য ছাড়া আর কেউই যা সৃষ্টি করতে পারে না। কী হবে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাড়াহুড়ো করে! ছড়ে-যাওয়া ক্ষতে আয়োডিন ছড়াবার জন্যে এখনো পড়ে আছে সময়—বাড়িতে টেলিফোন আছে, কাল সকালেও দেখা হতে পারে। সে ব্যস্ত হবে কেন!

'সো—', পিছনে দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গা ঘেঁসে এলো পুষি, 'আমার স্কচ্ কোথায়?'

একটা চড়া গন্ধ নাকে এলো দীপ্তর। এসেন্স আর ল্যাকারের মিলিত আক্রমণে ভারী হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। সম্ভবত পুষি এ-রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। এখন প্রগল্‌ভ হচ্ছে।

হাল্‌কা মেজাজে দীপ্ত বলল, 'স্কচেই হবে?'

'উম্, ম্যান, ইউ হ্যাভ লার্নট্ দ্য ট্রিক্স্ ! আমি ছাড়ছি না...'

'কাল পাঠিয়ে দেবো—'

'কাল !' আঁচল নেমে গেছে। বিস্ময়ের ঢঙে আটত্রিশ থেকে চল্লিশে বুক নিয়ে গেল পুষি। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'সেলিব্রেট করুন ! হোয়াই নট দিস ইভনিং ?'

জবাব না দিয়ে সিন্‌হার ঘরে ঢুকে পড়ল দীপ্ত। পিছনে পুষি। টেবিলে পা তুলে 'টাইম' ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল সিন্‌হা। পা দুটো নামিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। উঠে দাঁড়াল।

'ছাড়া পেলে ?'

'হোপ সো— ।' কাঁধ তুলল দীপ্ত। পরে বলল, 'তোমাকেই প্রথম ধন্যবাদ জানানো উচিত। আফটার অল ইট ওয়াজ ইউ—'

'পরে হবে ।'

পুষি বেরিয়ে যাচ্ছে। সিন্‌হা বলল, 'কী ব্যাপার ! ওল্‌ড্ ম্যান যায়নি এখনো ?'

পুষি চোখ টিপল।

'আসছি—'

শূন্য পাইপটা টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে সিন্‌হা হাসল। চতুর হাসি। ড্রয়ার টেনে একটা নতুন সিগারেটের প্যাকেট বের করে ছুঁড়ে দিল দীপ্তর দিকে।

'আমি আগেই জানতাম। ওল্‌ড্ ম্যানের খুব ইচ্ছে ছিল না— আমিই জোর করলাম। না হলে অ্যাকাউন্টটা স্টারলেটেই যেত। এই মিটিংটা ফর্মালিটি ছাড়া কিছু নয় ।'

'জানি ।'

দীপ্ত সংক্ষিপ্ত হলো। এতো দিন সন্দেহ ছিল, এই মুহূর্তে সিন্‌হার আত্মপ্রচারের চেষ্টা থেকেই ধরতে পারল, লোকটা মিথ্যে বলে গেছে এতো দিন। এখন, কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর, চাইবে নিজেকে কায়েম করতে। মুখে হাসি থাকলেও সিন্‌হার অস্বস্তি চোখ এড়াল না দীপ্তর। লোকটা ধূর্ত, এ-সবই নতুন কোনো প্রস্তাবের ভূমিকা। সিন্‌হাকে লুকিয়ে হিপ পকেটে ওয়ালেটটা অনুভব করে নিল দীপ্ত। হয়তো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। হোক, সে তৈরি হয়েই এসেছে। আজ একটা বিশেষ দিন, এমনকি ঘৃণা করার জন্যেও আজ সে অপব্যয় করতে পারে।

বেশ গম্ভীর মুখে প্যাকেটটা খুলল দীপ্ত। লাইটারটা তুলে নিল।

'মুখার্জি সাহেব আবার অসুস্থ হয়েছেন মনে হলো ?'

'অসুস্থ !' চোখ ছোটো করে আনল সিন্‌হা। স্থির দৃষ্টি ফেলল দীপ্তর মুখে। 'কিছু লোক থাকে, যারা চেয়ারের লোভ কাটাতে পারে না—চিতায় চড়ালেও আবার ফিরে আসে চেয়ারে। হি ইজ এ টাইপ !'

'মানে !'

'ভেরি সিম্‌প্‌ল ! চাকরির লোভ। আর কেউ হলে অনেক দিন আগেই রিজাইন করত। রোগটা কী জানো ?'

'না—'

'ক্যান্সার ।'

'হোয়াট !'

'ক্যান্সার ।' পাইপটা মুখের ভিতর ঠেলে দিল সিন্‌হা। ধোঁয়া টানার ব্যস্ততায় চোয়াল নাড়ল দ্রুত। চিবিয়ে বলল, 'বোধ হয় এখান থেকেই ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যেতে হবে ।'

থোকা থোকা জ্বালা নির্গত হচ্ছে সিন্‌হার পাইপের ধোঁয়ায়। মুমূর্ষুর জন্যে করুণা ভিক্ষা করার জায়গা এটা নয়। অন্তত সিন্‌হার কাছে সে-রকম কোনো বোধ আশা করাও অন্যায়। এমনও হতে পারে, সিন্‌হা যা বলছে তার সবই সত্যি। কিছুটা অসহায়ভাবে ডান হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরল দীপ্ত। একটা টাটকা উত্তাপ সেখানে ছুঁয়ে আছে এখনো—অদৃশ্যে কোথাও বিস্তৃত হতে চাইছে একটা ক্লিষ্ট হাসি। মাত্র কিছুক্ষণ আলাপের স্মৃতি থেকে ক্রশ করার ধরনে হাতটা সে নিয়ে গেল কপালে ও বুকে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, দীপ্ত। যতোক্ষণ আমি আছি, অ্যাকাউন্ট লুজ করার সম্ভাবনা নেই।'

'জানি।'

পুষি ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া গন্ধটাও। উগ্র অথচ চাপা—নিঃশ্বাসে মিশে হঠাৎই চলে যায় মাথার দিকে, রগের শিরাগুলো কেঁপে ওঠে অল্প। মনে হয় এক প্রস্ত প্রসাধন সেরে এলো পুষি। তাকে ঘুরে চলে গেল সিন্‌হার দিকে, প্রায় সেই নৈকট্যে—অন্তরঙ্গতা যেখানে শোভনতার সীমা মানে না।

'গেছে?'

'জাস্ট নাউ—'

পুষির কোমরের অনাবৃত মাংসে আঙুলের দাগ টানল সিন্‌হা।

'চেক্ করলে ডাক্তারের সঙ্গে?'

পুষি মাথা নাড়ল, একটু বা অপ্রস্তুতভাবে। তাকাল দু'জনেরই মুখের দিকে।

'মিস্টার রে, এটা খুব কনফিডেনসিয়াল। আর কাউকে বলবেন না।'

একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেল দীপ্ত। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ব্যবচ্ছেদ করল পুষি দত্তের কথার প্রতিটি শব্দ। বলতে গেলে আজই প্রথম অশোক মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার ; আজই, এতো দিনের মধ্যে, স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রিভ্‌সের সঙ্গে যে-কোনো সম্পর্কে যুক্ত হলো। সিন্‌হা যতোই অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করুক—হি ইজ নট মাই কাপ অফ টি, মানুষ হিসেবে তাকে অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি দীপ্ত। তবু মেনে নিয়েছে, সেটাই চাকরির দাবি। এর বাইরে এমন কোনো ভূমিকা তার নেই, যা থেকে এই প্রসঙ্গে জড়াতে পারে নিজেকে। পুষি দত্তের কথাগুলো তাই তীব্র হয়ে বিঁধল।

রাগ সংযত করার চেষ্টায় ক্রূর হয়ে উঠল মুখ। পুষি দত্ত মেয়ে না হলে দ্বিধায় পড়ত না এতো। কিন্তু, এই দ্বিধাও সে কাটিয়ে উঠবে। পুষিকে চেনে সিন্‌হার মাধ্যমে—বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে থাকে না, সিন্‌হার সঙ্গে সম্পর্কটাও নিতান্ত প্রাঞ্জল নয়। প্রচণ্ড মদ্যপ অবস্থায় একদিন পুষির শরীর বর্ণনা করেছিল সিন্‌হা। স্তন-কোমর-নিতম্ব বেষ্টিত সেই শরীরে সিন্‌হা যতোই আহ্লাদ পেয়ে থাকুক, আরকে-ভেজানো একটা অস্থির মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কোনো ছবি খুঁজে পায়নি দীপ্ত। মনে হয় সেই সম্পর্কের জের টেনে নিজেও কিছুটা এগিয়ে আসতে চাইছে পুষি—ভুলে গেছে দীপ্তর সঙ্গে তার ব্যবধান, ভুলে গেছে এক্সিকিউটিভ আর এক্সিকিউটিভ-এর পি এ-র মধ্যে ব্যবধান পাহাড় আর পাহাড়-সংলগ্ন সমতলের মতোই দুস্তর। এটা অসহ্য!

ক্রোধ থেকে চাপা হাসি ফুটে উঠল দীপ্তর ঠোঁটে।

'থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস ডাট, আমি জানতাম না এটা কনফিডেনসিয়াল! না বললে আমি হয়তো রটিয়ে দিতাম!'

'না....মানে....মিস্টার মুখার্জিও এখনো জানেন না। আমরা শুধু গেস করছি।'

আরো একটু মাংস অধিকার করে নিয়েছে সিন্‌হা। গাছের পুরু গুঁড়িতে গোসাপের মতো লেপ্‌টে আছে হাতটা। দু' থাক চর্বিতে চোখ আটকে গেল দীপ্তর।

'এই ঘটনায় আমার কী ইন্টারেস্ট থাকতে পারে!'

গলার ঝাঁঝ লুকোতে পারল না দীপ্ত। পুষি না বুঝুক, বিরক্তিটা এবার পরিষ্কার টের পেল সিন্‌হা।

'লেট আস নট ডিসকাস ইট। দীপ্ত, আই হেল ইওর সাক্‌সেস্। সেলিব্রেট করবে তো?'

'সিওর।' উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্ত বলল, 'মিস্টার মুখার্জি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন ফারদার আলোচনার জন্যে। কবে হতে পারে মিটিংটা? কাল?'

'রাইট।....কিন্তু, তুমি কি চলে যাচ্ছ?'

'টায়ার্ড।'

'কী হলো, দেখে তো মনে হচ্ছে না!'

'আজ থাক। কাল মিটিংটা হোক, কালই সেলিব্রেট করা যাবে।'

ক্রমশ স্বচ্ছন্দ হলো দীপ্ত। পুষিকে দেখল। সম্ভবত একটু বেশিই রূঢ় হয়ে পড়েছিল তখন। পুষি কিছু মনে করলে সিন্‌হাও করতে পারে। মুখার্জির সঙ্গে কথা বলার পর এখন আর অ্যাকাউন্ট পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে ভাবনা নেই। তবু—সমীরণ যে-রকম বলে মাঝে মাঝে—ক্লায়েন্ট লক্ষ্মী। যতো দিন না স্টেডি হচ্ছে সব কিছু, অন্তত ততো দিন মেনে নিতে হবে চুনোপুটি থেকে চাঁই পর্যন্ত সকলের বোকামি আর ঔদ্ধত্য। কে বলতে পারে পুষি দত্তকেও কখনো দরকার হবে না তার! মাংসময় এই জীবটিকে, দীপ্ত ভাবল, ঘৃণা করতে করতেও সে সম্বোধন করবে 'ডারলিং' বলে। আজ নয়। কিন্তু কাল, বা পরশু, যে-কোনো দিন থেকে।

খোশামোদের গলায় দীপ্ত বলল, 'আই প্রমিস্‌ড্ হার এ স্কচ্।'

থমথমে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল পুষি। আবার চঞ্চল হয়ে উঠল সিন্‌হার আঙুলগুলো।

'সত্যি!'

বাঁ হাতের মধ্যমা ও তর্জনী তুলল দীপ্ত, 'ভি' দেখাল।

'চলি।'

'সুনীতার খবর কী?'

'ভালো।'

সিন্‌হাও উঠল। পাইপটা মুখে নিয়ে টানল বার দুই। নিবে গেছে। চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো।

'কাল সুনীতাকেও আনছ নিশ্চয়ই?'

চট করে কোনো জবাব দিল না দীপ্ত। অনেকক্ষণ থেকেই এই প্রশ্নটির অপেক্ষা করছিল সে, ভেবেছিল পেরিয়ে যাবে। সিন্‌হা ভোলেনি। কী বলবে ভাবার আগেই ভেবে নিল কী কী বলবে না। এটা তার একটা ভুল, ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারত। এখন দেরি হয়ে গেছে।

'আমার থাকাই যথেষ্ট। সুনীতা কী করবে!'

'নিয়ে এসো।' চতুর ভঙ্গিতে হাসল সিন্‌হা, তাকাল পুষির দিকে। 'উই ওয়াণ্ট টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দি টিম।'

দীপ্ত পকেট হাতড়াল। না, এখন সিগারেট ধরিয়ে লাভ নেই। মাথার পিছন থেকে একটা শীতল অনুভূতি নেমে যেতে দিল মেরুদণ্ড বেয়ে। স্ট্র্যাটেজি সরে যাচ্ছে পাশে, ধৈর্যের ওপর স্তর পড়ছে নিজস্ব রক্তের। মাথা জুড়ে শুধু একটিই প্রতিধ্বনি : বাস্টার্ড্‌, বাস্টার্ড্‌, বাস্টার্ড্‌! আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত মনে হচ্ছে নিজেকে। দীপ্ত কি বলবে, কফি-অ্যাকাউণ্টে সুনীতাকে পাওয়া যাবে না ; কাজকর্মের দায়িত্ব হিন্দুস্থান ফস্টারের—কোনো ব্যক্তির নয়! কিংবা, ব্যক্তির হলেও, তা দীপ্তর হতে পারে, সুনীতার নয়। আফটার অল, সুনীতা পুষি দত্ত নয়। তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমার।

না। এখনো সময় হয়নি। অসহায়ভাবে নরম হয়ে এলো দীপ্ত।

'দেখি—'

তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।

॥ ছয় ॥

একদিন ভোর রাতে শীতে কুঁকড়ে উঠল দীপ্ত। ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

আলিপুরের আকাশে ঘোর কাটেনি তখনো, একটি কি দু'টি পাখি ডাকতে শুরু করেছে। জানলার বাইরে তারা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হাওয়ায় বেশ টান, অল্প ছ্যাঁকছ্যাঁকে ভাবও আছে। বর্ষা শেষ হতে চলল ; শীতে ঢুকে পড়ার আগে এ-সময় সাধারণত গরম হয়ে ওঠে হাওয়া—এবার সে-রকম কিছু হয়নি। বরং শীত-শীত লাগছে একটু। গ্রীষ্মের দু'পুরে হঠাৎ জ্বর আসার মতো দুটো সমান স্রোত বইছে শরীরে। ঘামে সিরসির করছে গলার খাঁজ আর কানের পাশ দুটো, ঘাম চোখের তলায়, মুখের ভিতর জিবটা আটকে আছে শুকনো তুলোর মতো। দিনের বিভিন্ন তারতম্যের মধ্যে এমন একটা সময়ও যে আছে—যখন ঘাম, ক্লেদ, শূন্যতায় আত্মবোধ হারিয়ে যায় পুরোপুরি, এটাও সে বুঝতে পারছিল না।

বিছানার ওপর প্রায় উবু হয়ে বসেছে দীপ্ত। বেশ কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হলো, এটা তার স্বাভাবিক জেগে ওঠার ভঙ্গি নয়। স্বপ্ন ও জেগে ওঠার মধ্যবর্তী কোনো একটা জায়গায় এই ভঙ্গিতে এসে থেমেছিল সে। দূরে ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে শেষ রাতের মালগাড়ি। ঠিক এই সময় আত্মহত্যার জন্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নেই কেউ—তবু দীর্ঘ, আনুনাসিক শব্দে হুইসিল্‌ দিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। যেতে যেতে, থেমে থেমে। নাকি এরও আছে আলাদা কোনো তাৎপর্য, আত্মঘাতী হতে চেয়েও যে ফিরে গেছে আত্ম-সংবরণের দিকে, তাকে ফিরিয়ে আনা আবার!

শীত-কাতর নিজের শরীরটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করল দীপ্ত। কিছু বা ফিরে পেল নিজেকে। না, ঠিক আছে। ভুলে ভয় পেয়েছিল। সব ঠিক আছে।

ঘরের অন্ধকারটা চোখ-সওয়া হয়ে এলো। চিত হয়ে শুয়ে আছে জয়িতা—হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাচ্ছে তাকে। আরো একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তার ঠাণ্ডা কপালে হাত দিল দীপ্ত, নাক ও ঠোঁট ছুঁয়ে হাতটা নেমে এলো বুকের দিকে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঠিকই। মুখে

অস্ফুট শব্দ করে পাশ ফিরল জয়িতা। একটা আলগা হাত উঠে এলো দীপ্তর কোলে।

আস্তে হাতটা সরিয়ে দিল দীপ্ত। অন্ধকারেও সুন্দর জয়িতা, গায়ের চমৎকার আভা লুকোতে পারে না। এই মুহূর্তে তার স্তব্ধ অবয়বের দিকে তাকিয়ে বিছানা থেকে নেমে লিভিংরুমের দিকে পা বাড়াল দীপ্ত ; স্যুইচ্ খুঁজে আলো জ্বালল। আড়াই হাজারের সৌজন্য দেখিয়ে বসতে ডাকছে সোফা-সেট ; মভ্-রঙ কার্পেটের কোথাও এতোটুকু দাগ পড়েনি পায়ের। অথচ হাঁটা-চলা কম হয়নি। গ্লাসটপের ওপর ঝকঝক করছে পরিচ্ছন্ন অ্যাশট্রে, সকালে আবার পালিশ পড়বে এসবের গায়ে। জানে দু' এক পা এগোলে দেয়ালে আড়াল-হওয়া ফ্রিজে ধরা পড়বে একই সুন্দরের আভা—ডাইনিং টেবিলের দামী ফিনিশে পিছলে যাবে আলো। কোনোখানে হেরফের হয়নি এতোটুকু। আর একটু এগোতেই স্তব্ধতা থেকে জেগে উঠল যামিনী রায়ের নারীমুখ—ওয়াল্‌র‍্যাক থেকে 'হ্যালো' বলল শেলী, কীট্‌স্, কোলরিজের লেদার বাইণ্ডিং, পেপারব্যাকের ইয়েভটুশেংকো, বার্গম্যানের চিত্রনাট্য, আর হালে সংযোজিত 'ম্যান অ্যালোন'। পড়বে, সবই পড়বে আস্তে আস্তে, সময় করে, নিজের মতো মর্জি মিশিয়ে। যাকে যেভাবে যেখানে রাখতে চেয়েছিল, সব তেমনিই আছে। ভোর রাতের নিঃশব্দ ভ্রমণে এদের শরীর থেকে উঠে-আসা স্তব্ধতার গন্ধ ছুঁয়ে গেল দীপ্তকে।

চোখে পড়ল পাপুর ঘর। ভিতরে হাওয়া নেই তেমন, তবু অল্প অল্প দোল খাচ্ছে পাপুর ঘরের পর্দা। এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল দীপ্ত। বিছানায় হাত পা মেলে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে পাপু, শেষ রাতের আলো আঁধারে অস্পষ্ট মুখে ভঙ্গি নেই কোনো। ওদিকে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়ে আছে আয়া। খুঁজে-পেতে না দেখলেও এসব দৃশ্য ধরা পড়ত চোখে। সম্ভবত এখানেও বিভ্রম নেই কোনো।

পর্দাটা তুলে রেখে আর একটু সময় অপেক্ষা করল দীপ্ত। আস্তে ডাকল, 'পাপু— ?'

ডাকটা স্পষ্ট হলো না। উৎকণ্ঠায় এখনো বুজে আছে স্বর, বেখাপ্পা শোনাল। ঢোঁক গিলে আবার ডাকল, 'পাপু ?'

'উঁ—', এবার উত্তর এলো সঙ্গে সঙ্গে।

দীপ্ত আশ্বস্ত হলো। পাপু জানল না, ঘুমের মধ্যেও কী অদ্ভুতভাবে সাড়া দিয়ে গেল সে। বড়োই পাত্‌লা ঘুম ছেলেটার। এমনও হতে পারে, জেগে ওঠার আগে আধোঘুমে অভ্যস্ত হয়ে নিচ্ছে। খুব সকালেই ঘুম ভেঙে যায় পাপুর, হয়তো তাই উত্তরটা এলো তাড়াতাড়ি।

দীপ্ত আশ্বস্ত হলো। দুটো সরু ঘামের রেখা কানের পাশ দিয়ে নেমে গেল ঘাড়ের দিকে। জয়িতা, পাপু, ঘর, দেওয়াল, আসবাব—প্রকৃতিস্থ পৃথিবীতে এর বেশি কোনো সম্পদ নেই তার, নেই আর কোনো বিনিময়ের সুযোগ, যা থেকে, ভাবতে পারে দীপ্ত, বঞ্চিত হয়েছে সে। বাড়ি থেকে দূরে যখনই একান্ত হয়, তাকে আঁকড়ে ধরে এসবের টান। এই সেদিন, বম্বে থেকে কলকাতা ফেরার সময়, পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে বোয়িং-এর জানলায় বসে, মেঘের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আকস্মিক শঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল বুক। হঠাৎ যদি কিছু হয়, ভেবেছিল, নির্বিকার শূন্যে তার দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে যাওয়ার আগে বহু দূর আলিপুরের ছিমছাম নিরাপত্তার মধ্যে বসে ওরা কি টের পাবে—তাদের কথা ভাবতে ভাবতে অন্তর্হিত হলো একজন !

সে-সব বাইরের কথা, দূরত্বের ভাবনা। কিন্তু এখন এমন হবে কেন !

আলোটা নিবিয়ে দিল দীপ্ত। ভোরের আলো ফুটতে দেরি আছে এখনো। এখন স্বচ্ছন্দে গিয়ে সে শুয়ে পড়তে পারে জয়িতার পাশে। সারা রাতের ঘুমে নরম হয়ে-আসা নারী শরীরে মিশে প্রার্থনা করতে পারে আর এক প্রস্ত ঘুমের—নিজস্ব ঘুম, যার মধ্যে দুঃস্বপ্ন নেই কোনো। নেই আক্রমণ। আশ্চর্য! সব ঠিক আছে, তবু সে এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কেন!

জয়িতাকে ওঠাবে? বলবে তার অস্বস্তির কথা?

না, থাক। ভারী সুন্দর মুখশ্রী ঘুমন্ত জয়িতার, তাকে আর বিচলিত করবে না। সুখে সজীব হতে হতে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি ক্রমশ উবে গেছে জয়িতার মুখ থেকে, আবার তাদের ফিরিয়ে আনতে কষ্ট হবে। বরং ভোর হোক। ঘাম শুকিয়ে আসছে ক্রমশ, জিবে স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছে আবার। বোধ হয় হাওয়া বইতে শুরু করল। কোনো শব্দ না করে দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল দীপ্ত। দূর থেকে এগিয়ে আসছে শব্দটা—আর একটা ট্রেন, বিপরীতগামী এঞ্জিনের হুইসিল্ নতুন কোনো ভাবনায় নিক্ষিপ্ত করল না তাকে।

মনে পড়ল 'ঊষা' কথাটা, পুবে তার আভা। আকাশে তাকালে ম্রিহি অন্ধকারে এখনো চিনতে পারে শুকতারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডল। আস্তে আস্তে পাখির গলায় ভরে উঠছে চারিদিক, ক্বচিৎ হাওয়ার দমকায় ছড়িয়ে পড়ছে শিউলির গন্ধ। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল দীপ্ত। সামনে ফাঁকা রাস্তা। ভয়াবহ রকমের ফাঁকা, হঠাৎ দেখলে মনে হবে নিষিদ্ধ হয়ে আছে, এই রাস্তায় কোনো দিন কেউ হাঁটবে না। আলিপুরে আসার আগে নির্জনতা খুঁজেছিল সে। এই সেই নির্জনতা!

রাস্তা একটাই, দু'জন দীপ্ত। প্রত্যূষের আবহে বহু দিন পরে দৃশ্যটা আবার সে ফিরিয়ে আনতে পারল, চোখের এতো কাছে যে মনেই হয় না ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে কুড়ি-একুশটা বছর।

সেদিনও রাস্তা ফাঁকা ছিল এমনি, অন্ধকার আরো একটু বেশি। পালা করে মা'র সঙ্গে রাত জাগছিল সে। অলিপ্ত ছোট তখন, অনিচ্ছের মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়ত তাড়াতাড়ি। সেও কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? আজ ঠিক মনে নেই। শুধু মনে পড়ে মা'র সেই কণ্ঠস্বর: 'খোকা, একবার যা বাবা। হরেন ডাক্তারকে নিয়ে আয়'। আমি যেন নাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না!' ঘুম চোখে তখনই লক্ষ করেছিল বাইরে বিষম রাত—ভয়ে সেঁধিয়ে এসেছিল হাত-পা। তবু মফঃস্বলের সেই অন্ধকার, নির্জন রাস্তা এমনিতে ভীতু ছেলেটিকে অসম্ভব সাহসী করে তুলেছিল সেদিন। আজ বুঝতে পারে জীবনে সেই প্রথম অসহায় শরীরময় অন্ধ আক্রোশ নিয়ে সময় ও গতির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু করেছিল সে—এক দমে দেড় মাইল রাস্তা ছুটে এসে অনুভব করেছিল এক রকম সাফল্য—তীব্র আহ্লাদে ঘেমে উঠেছিল শরীর। তখন জানত না, আরো এক প্রতিপক্ষ আড়ালে পিছনে টেনে রেখেছিল তাকে, স্তব্ধ করে দিয়েছিল সময় ও গতি। জানত না, শরীর-মনের প্রবণতা ছাড়িয়ে আছে আরো এক শক্তি, যার প্রবল আবির্ভাবে আকণ্ঠ অসহায়তা ছাড়া আর কিছু বোধ করা যায় না।

'ব্রাহ্ম মুহূর্তে মৃত্যু মানুষের পুণ্যের পরিচয়!' বাবার নাড়ি দেখে বলেছিল হরেন ডাক্তার, 'এসে কোনো লাভ হলো না!'

ব্রাহ্ম মুহূর্ত; কথাটা গেঁথে গিয়েছিল বুকে। আকাশে তাকিয়ে সেদিনও সপ্তর্ষি পেয়েছিল দীপ্ত; হঠাৎ পাখির গলায় ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল কান। ক্রমশ ফুটে উঠেছিল

আলো। আজ বহু দিন পরে আবার সেই প্রত্যূষের দিকে তাকিয়ে জলে ভরে উঠল চোখ।

'বাবা!'

কুড়ি কি একুশ বছরের ব্যবধান পেরুতে সময় লাগল না। এখনো গতি তার প্রধান উৎস। তফাত এইটুকু ; আজ, এই মুহূর্তে, একটু বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে।

সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রগড়াচ্ছে পাপু। সকালে ঘুম ভাঙার পর সচরাচর মা'র পাশে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেয় সে, তখনো অন্ধকার থাকে। দরজা খোলা দেখে আজ চলে এসেছে ব্যালকনিতে।

হঠাৎ আবেগে দু' হাতে ছেলেকে ওপরে তুলে নিল দীপ্ত।বয়স হওয়ার পরও মা'র মুখ থেকে 'খোকা' ডাক যায়নি।

পাপু বলল, 'তুমি কাঁদছ!'

'যাঃ, বোকা!' কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিল দীপ্ত, পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছে স্বচ্ছভাবে হাসল। ছিঃ, দীপ্ত, মনে মনে বলল, বিহেভ ইওরসেল্‌ফ্‌। লোকে তোমাকে 'হার্টলেস্‌' বলে জানে—শরীর, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি আর লক্ষ্যের একাগ্রতায় হৃদয় বলে কিছুর প্রয়োজন তুমি বোধ করোনি কখনো। এক রাতের দুঃস্বপ্ন আর স্মৃতির ঘায়ে এতোখানি বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। মৃত্যু স্বাভাবিক ; মৃত্যুরও আড়ালে দাঁত নখ শানিয়ে নিচ্ছে অনেকে। শরীরে মৃত্যু বহন করে এখনো কেউ কেউ অতিবাহিত করছে নিজেকে, শেষ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছে কেউ—একবার ধ্বনিত হলেই ছুটে যাবে ক্রিমেটোরিয়ামের দিকে।

পর পর মুখগুলি ভেসে উঠল চোখের ওপর। আবার ফিরে আসছে স্বাভাবিক মানসিকতা—নিয়মে চঞ্চল হয়ে উঠছে পেশীগুলো।

কোলে তোলা এবং কোল থেকে নামানো দুটোই এতো তাড়াতাড়ি ঘটল যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পাপু। অবাক চোখে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কাঁদছিলে! আমি দেখেছি—'

'দ্যাট্‌স্‌ ব্যাড, পাপু!' ছেলের মাথার চুলগুলো আদরে মুঠোয় চেপে ধরল দীপ্ত, 'কাম-অন! আচ্ছা, বলো তো, তুমি আমার কে?'

'কে আবার! ছেলে—'

'আর আমি তোমার কে?'

'কে আবার! বাবা—'

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটি ছেলেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে দেখল দীপ্ত—অসহায় তার শরীরে ফুঁসে উঠছে অন্ধ আক্রোশ। হেসে বলল, 'তুমি কি জানো, আমারও একজন বাবা ছিল?'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল পাপু। জয়িতাও এসে পড়েছে।

'কী চ্যাঁচামেচি করছ বলো তো দু'জনে! ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে!'

'নাথিং···।' চুলের গোছা মুখের প্রায় আধখানা আড়াল করে রেখেছে, একটু বা এলোমেলো পোশাক, হাত দুটো পকেটে। এটা ব্যালকনি না হয়ে লন হলে ভালো হতো। দামী মডেল ; এমন চেহারায় যে-কোনো হেডলাইন জুতসই হতে পারে। জয়িতাকে লক্ষ করতে করতে দীপ্ত বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ভালো ঘুমিয়েছো। আমি ঘুমোতে পারিনি।'

'কেন !'

'একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল—'

কথাটা বাড়াল না দীপ্ত। ব্যালকনিতে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে পাপু, কান এদিকে। এখুনি হয়তো পুরনো কথা টানবে ; জয়িতা জানবে। খানিক আগেকার অনুভূতি এখনো নরম হয়ে আছে চোখে। হার্টলেস—সম্ভবত জয়িতাও বিশ্বাস করে কথাটায়। এক-একসময় বলেও ফেলে। অর্থে তারতম্য থাকলেও বিষয়ের ভার কমে না। দুর্বলতার কথা জানিয়ে এখন আর নিজেকে চিনিয়ে লাভ নেই। এই বিষাদ তার নিজস্ব ; নিজেরই থাক।

'স্ট্রেঞ্জ !' দীপ্তর ভারী মুখের দিকে তাকিয়ে জয়িতা বলল, 'অন্য দিন কি ভালো স্বপ্ন দ্যাখো !' তারপর পাপুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। কথাটায় গুরুত্ব দিল না তেমন। কখনো, কোনো ব্যাপারেই যে কাতর হয় না, আজ হঠাৎ তার কথায় গুরুত্ব না দেওয়াই স্বাভাবিক।

লন পেরিয়ে কাগজের হকারকে ঢুকতে দেখল দীপ্ত। জীবন শুরু হচ্ছে আর একটি দিনের মতো, প্রায় একই ছকে। একটি মোটর ছুটে গেল দ্রুত, প্র্যামে বাচ্ছা নিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁসে হেঁটে যাচ্ছে আয়া, দূর থেকে ভেসে এলো মোটর-বাইকের আওয়াজ। দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা যাবে সেই বিশালবপু লোকটিকে—কব্জিতে চামড়ার ব্যাণ্ড, চোখে সানগ্লাস—লিভার্সের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। মিসেস রবিনসনকে টানতে টানতে এগিয়ে চলেছে চেন-বাঁধা বুলডগ। ওপরের ফ্ল্যাটে রেডিওগ্রাম চালু হলো : 'ইট ওয়াজ অ্যানাদার স্টোরি'। এর পরেও কী কী ঘটবে, কম-বেশি কাছাকাছি বলে দিতে পারে দীপ্ত। নির্জনতা জায়গা বদল করছে সাচ্ছল্যের সঙ্গে। বাকি সবই সরব। আগের পাড়াতেও দেখে এসেছে এসব, হয়তো পরেও দেখবে। মানুষ বদলায় না, বদলে যায় তার পোশাক আর ঘরবাড়ি, দরজার পর্দা আর ঘরের আসবাব। তবু প্রাণহীন বস্তুর পরিবর্তনেও কতো ভিন্ন দেখায় মানুষকে !

পাপু স্কুলে যাবে। এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়। চেঁচিয়ে আয়াকে ডাকল জয়িতা—'তুম কোই কাম্‌কা নেহি হ্যায় !' রোজই সে একই কথা বলে, ধমকায় একই গলায়। পাপুর পড়া তৈরি হয়নি, দোষারোপ করে সে-জন্যেও। কাল অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনেই বাড়ির বাইরে ছিল, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পার্টিতে। পাপুর কী দোষ ! দীপ্ত ভাবল, কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় জয়িতাকে। কী ভেবে নিরস্ত করল নিজেকে। কী লাভ ! অসম্ভব খাপছাড়া লাগছে আজ, মনে হচ্ছে এই প্রাত্যহিকতার সঙ্গে বস্তুত কোনো যোগ নেই তার ! যোগ নেই তার সঙ্গে জয়িতার কিংবা জয়িতার সঙ্গে পাপুর। রক্তের যদি প্রকৃতই কোনো আকর্ষণের ক্ষমতা থাকে, তা হলে এতোটা অসহায় লাগত না নিজেকে।

স্বপ্নটা ফিরে আসছিল। নদীর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'টি কিশোর—পরনে কোরা ধুতি, গলায় সুতোয় বাঁধা চাবি। আগে আগে পুরুত ঠাকুর। হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দ....কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল ; দীপ্ত দেখল, সাদা থানপরা রক্তাপ্লুত একটা শরীর লুটোচ্ছে মাটিতে....চিৎকার করছে জয়িতা আর পাপু.... ! সম্ভবত তখনই ঘুম ভেঙে যায় তার !

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে চা আর খবরের কাগজ দু'টিতেই মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল দীপ্ত। সিগারেট ধরাল। জুত হলো না তবু। নিক্সন থেকে ইন্দিরা গান্ধী, বিদ্যুৎ সংকট থেকে

বাঘের উপদ্রব, সিনেমার রিভিউ থেকে বিজ্ঞাপনের হেডলাইন—প্রতি সূত্রে শব্দগুলো বেজে যাচ্ছে খং খং করে, তাৎপর্যহীন ও নির্বিশেষ—শব্দগুলিতে তারতম্য নেই কোনো। মুখার্জির চেম্বারে বসে একদিন পাইলিংয়ের শব্দ শুনেছিল সে, আজও শুনল। কোথায় যেন খুঁজে পাচ্ছে একটা ধ্বনিগত ঐক্য। শব্দটা আকস্মিক, কিন্তু অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে নিঃশ্বাস আর অনুভবের সঙ্গে। ন্যাগিং। হঠাৎই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয় মনে।

ভালো লাগছে না। উঠে এসে বেডরুমে ঢুকল দীপ্ত। রাইটিং টেবিলের ওপর জড়ো করা আছে কিছু কাগজপত্র। কিছু খুঁজল সেখানে আঁতিপাতি করে, বুক সেল্‌ফের ড্রয়ার খুলে দেখল, তারপর বিছানায়, বালিশের নিচে। নেই! অসহায়তা ছিলই, এখন শরীর জুড়ে তাপ ছড়াচ্ছে রাগ। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মাথার পিছনের ঝাঁকড়া চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরল দীপ্ত।

'জয়িতা!'

সাড়া পেল না কোনো। একটু অপেক্ষা করে আবার গলা চড়াল দীপ্ত, 'জয়িতা—'

'কী হলো! হোয়াই আর ইউ শাউটিং!' দূর থেকে জবাব দিল জয়িতা।

'সেই চিঠিটা কোথায়?'

দীপ্ত এখনো খুঁজছে। কিছুটা এলোপাথাড়িভাবে।

'কোন চিঠি?' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল জয়িতা।

'ইউ ফরগেট এভ্‌রিথিং! কাল একটা চিঠি এসেছিল—কাকার কাছ থেকে, মা'র শরীর খারাপের কথা লিখেছিল...'

'সেটাই বলো!'

অল্প ভুরু তুলল জয়িতা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা তুলে নিল হাতে; পোস্টকার্ডটা বের করে বাড়িয়ে দিল দীপ্তর দিকে।

বাংলা পড়া আজকাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছে দীপ্ত। বিশেষত চিঠিপত্রের বাংলায় সে আগ্রহ বোধ করে না খুব, চোখ বুলিয়েই শেষ হয় দায়িত্ব। প্রয়োজনে জয়িতাই জবাব দেয়। 'খোকা আজকাল একেবারেই চিঠি দেয় না—', অনেক দিন আগে মা'র এই চিঠি পড়ে চুপচাপ হেসেছিল সে। এসব জয়িতার কাজ—মাসে মাসে টাকা পাঠানোর কথাই যা মনে থাকে শুধু। আজকের চিঠিটা মা'র নয়—কাকার; কাল অফিস থেকে ফিরে পেয়েছিল। পার্টিতে বেরুনোর তাড়ায় কোনো রকমে চোখ বুলিয়েই ফেলে রেখেছিল। আবার খুঁজে পাবে ভাবেনি।

জয়িতা চলে গেছে। একা-একা চিঠিটা পড়ল দীপ্ত, আদ্যন্ত—একবার, দু'বার, স্নায়বিক উত্তেজনায় ঠোঁট কেঁপে উঠল অল্প। ক্লান্ত লাগছে। স্বাস্থ্যের মধ্যে ঘুরে যাচ্ছে একটা কিছু। রাতে ঘুম হয়নি ভালো, সে-জন্যেও হতে পারে। বিষণ্ন মনে বিছানায় এলিয়ে পড়ল সে।

অফিসে বেরুবার আগে জয়িতাকে বলল, 'মা'র শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিছু দিন এনে রাখলে হয় না!'

'আনলেই পারো।' জয়িতা বলল, 'আমি মানা করিনি!'

'জানি।'

তখনই আর কোনো কথা খুঁজে পেল না দীপ্ত। জয়িতা ঠিকই বলেছে। সে মানা করেনি, দীপ্ত নিজেও কি করেছে! তা হলে এতো দূরত্ব কেন!

॥ সাত ॥

খবরটা আনল সমীরণ। কাল রাত ন'টার পরে সুনীতাকে দেখা গেছে সিন্‌হার সঙ্গে—প্রিন্সেস্ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এই মেলামেশায় দু'জনেরই প্রশ্রয় ছিল।

শুনে বিরক্ত হলো দীপ্ত।

'আমি কী করতে পারি। ইট্‌স্ আপ টু দেম!'

সমীরণ বলল, 'সুনীতাকে ডেকে কড়কে দাও। একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না!'

'ঠিক আছে। আমি কথা বলব।'

সমীরণকে আজকাল বিশেষ সহ্য করতে পারে না। যতো দিন যাচ্ছে, দেখছে সমস্যার সমাধানে কোনো কাজে না-আসুক, নতুন সমস্যার সৃষ্টিতে জুড়ি নেই ওর। মাঝে মাঝে মনে হয় সমীরণের চাকরিটা বিজ্ঞাপনের নয়, পুলিসের। এই প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দে চোখ রাখার দায়িত্ব কে তুলে দিল ওর হাতে! এমনও হতে পারে, মানুষকে সন্দেহ করতে করতে কিছুটা বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; পার্থক্য করতে পারে না প্রয়োজন অপ্রয়োজনের মধ্যে। সুনীতাকে দেখা গেছে সিন্‌হার সঙ্গে—এটা কি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়! বিশেষত দীপ্তর কী আছে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার! হিন্দুস্থান ফস্টারের একজন কর্মী সুনীতা—সে-হিসেবে তার প্রতি কিছু দায়-দায়িত্ব আছে দীপ্তর; কিন্তু, যে-সুনীতা সুনীতারই ব্যক্তিগত, তার প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করবে সে! সেটা কি অনধিকার চর্চা নয়!

তবু, বিষয়টা থেকে গেল মাথায়। এমনকি, একসময় ভাবল দীপ্ত, সমীরণ হয়তো অন্য কোনো ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল। সিন্‌হার ইচ্ছেয় কিছুটা বাধ্য হয়েই কফি-অ্যাকাউন্টের ভার দেওয়া হয়েছে সুনীতাকে। উদ্দেশ্যটা প্রাঞ্জল—সম্ভবত এখনো কিছু বুঝতে পারেনি সুনীতা। মেয়েটি অ্যাম্‌বিসাস্, স্বাস্থ্য ও রূপের ঘাটতি নেই শরীরে, কাজকর্মে পটু হলেও বুদ্ধি প্রখর নয় তেমন। এমন কি হতে পারে, সিন্‌হাকে খুশি করার চেষ্টায় ক্রমশ আত্মক্ষতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সুনীতা? যদি তাই হয়, দীপ্তর কি করার আছে কিছু?

দীপ্ত ঘড়ি দেখল। পাঁচটা বাজে প্রায়। সুজন এসেছে—কাল ফোন করেছিল শম্পাদি। দীপ্ত বলেছিল, আজই যাবে দেখা করতে; কলেজ-ফেরত আসতে বলেছে শম্পাকে। সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটা নাগাদ তার এসে পড়ার কথা। দেরি দেখে কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়ল। ঠিক বুঝতে পারছে না কেন, ঘড়ির কাঁটা যতো এগোচ্ছে, ততোই মনের মধ্যে ছায়া বিস্তার করছে শূন্যতা। অথচ শম্পাদির আসা বা সুজনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া—নিয়ম রক্ষা ছাড়া এগুলো আর কী! এগুলো বাদ পড়লে কি জীবন তার কাছে কম সহনীয় হতো! নাকি এরও মধ্যে কাজ করছে সেই অদৃশ্য পিছুটান, এতো দূর এগিয়ে এসেও যা তাকে বিহ্বল করে তোলে মাঝে মাঝে!

বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা, দুটোই এখন সমান সক্রিয়। আর কিছু করার না পেয়ে সুনীতাকে ডেকে পাঠাল দীপ্ত। সত্যি বলতে, এতোক্ষণে আর একটা কথাও ভাবতে শুরু করেছিল সে। বাড়িতে কাজ আছে বলে কাল একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছিল সুনীতা। কাজটা কি সিন্‌হাকে সঙ্গদান! যদি তাই হয়, তা হলে ধরে নিতে হবে ইতিমধ্যেই আড়ালে লুকোচুরি খেলতে শুরু করেছে সুনীতা। এটাও এক ধরনের প্রতারণা।

সুনীতা এলো পাংশু মুখে। সেদিন রাতের ঘটনার পর থেকেই লক্ষ করছে দীপ্ত, সুনীতা

তার সামনে আগের মতো স্বাভাবিক হতে পারে না। ভয়ে? নাকি দীপুর অসম্পূর্ণ খেলায় আঘাত লেগেছিল তার আত্মাভিমানে! দীপুর অবশ্য তাতে যায় আসে না বিশেষ। তেমন প্রয়োজন হলে সে আবার হাত বাড়াতে পারে, ইচ্ছে মতো, এক রাতেই টের পেয়ে গেছে সুনীতার প্রতিরোধ! এখনকার চিন্তা সেই জন্যেই আরো বেশি।

'কাজকর্মের প্রোগ্রেস কী?' কিছু বুঝতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করল দীপু।

সুনীতা দাঁড়িয়েছে টেবিলের কোণ ছুঁয়ে। প্রশ্নটায় আশ্বস্ত হলো।

'নো প্রব্লেম, এক্‌সেপ্‌ট্‌—'

'এক্‌সেপ্‌ট্‌ হোয়াট?'

'স্টুডিয়োতে দেরি হচ্ছে একটু...'

'আই সি!' দীপু ভাবল একটু। 'ও. কে.। আমি কথা বলব। কাল সকালে ডিটেল রিপোর্ট দিও আমাকে।'

সুনীতা ঘাড় নাড়ল। ভঙ্গিতে চলে যাওয়ার ব্যস্ততা প্রকাশ পেল।

দীপু বলল, 'আমি তোমাকে চলে যেতে বলিনি।'

অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল সুনীতা।

'কাল রাত্রে সিন্‌হার সঙ্গে দেখলাম তোমাকে। প্রিন্সেস্‌ থেকে বেরুচ্ছিলে—।' আড়ে তাকিয়ে বলল দীপু, 'ডিনারে ডেকেছিল?'

সুনীতা ইতস্তত করবে জানা কথা। অস্বস্তির ভিতর গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল নিজেকে।

'মিস্টার সিন্‌হা ইনভাইট করেছিলেন। আই মিন....কয়েকটা পয়েন্ট ডিসকাস করার ছিল...'

'সামথিং অফিসিয়াল!' হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দীপু। 'আমার মনে হয়, অ্যাকাউন্টের প্রাইমারি রেসপনসিবিলিটি আমার। কিন্তু আমিই জানি না ব্যাপারটা! আর্‌নট্‌ ইউ টেকিং লিবার্টি!'

টেলিফোনের শব্দ। রিসিভার তুলতেই অপারেটর বলল, একজন মহিলা দেখা করতে চান। শম্পাদি ছাড়া আর কে হতে পারে! দীপু বলল পাঠিয়ে দিতে।

সুনীতা দাঁড়িয়ে আছে মুখ নিচু করে। কানের আভা বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। শম্পা ঘরে ঢুকল। সংক্ষেপে 'এসো' বলে সুনীতার দিকে তাকাল দীপু।

'হেন্‌স্‌ফোর্‌থ্‌ কথাটা মনে রাখলে ভালো হয়। ইউ মাস্ট স্পিক্‌ টু মি ফার্স্ট।'

'আই অ্যাম সরি, মিস্টার রে!'

'আই ট্যু।'

কথাটা শেষ করতে চাইল দীপু। শম্পাদি অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

সুনীতা চলে যাওয়ার পর বলল, 'সাড়ে চারটেয় সময় দিয়ে এলে পাঁচটার পর! ব্যাপার কী!'

'কী করব বল! ট্রামে বাসে আসা, যা ভিড়!' আঁচল টেনে কপাল মুছল শম্পা, 'মেয়েদের ওপরেও বসিং করিস নাকি?'

'বসিং!'

'তাই তো দেখলাম। আহা, আমার সামনে না বললেই পারতিস!'

দীপু একটা গন্ধ পেল। ক্লান্তির। ঘামেরও হতে পারে। শম্পাদি বসে আছে টেবিলে

কনুই মেলে, বেয়াড়া রাস্তা, হয়তো সত্যিই ক্লান্ত। গন্ধটা তাকে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। হেসে বলল, 'তোমার সামনে বলিনি, তুমিই ইনট্রুড্ ক'রছ।'

'তাই কি! তা হলে ওয়েট করতে বললেই পারতিস!'

'ও-কথা থাক।' দীপ্ত সহজ হলো। 'কী খাবে বলো? কফি?'

'কিছু খেতে হবে কেন! বরং বেরিয়ে পড়ি, সুজনকে বলেছি বিকেলেই আসব। রতন চলে যাচ্ছে, আজ ওকে খেতে বলেছি রাত্রে।'

রতন! হঠাৎ ভুরু সিরসির করে উঠল দীপ্তর। যাবে? নাকি বলে দেবে, আজ থাক, আজ কাজ আছে একটু—কাল নিজেই চলে যাব! সেটা উচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এতো দূর টেনে এনেছে শম্পাদিকে। এখন ফেরানো অভদ্রতা।

একটা সিগারেট ধরাতেই হলো। সামলে নিয়ে বলল, 'তাড়ার কী আছে! যাবে তো গাড়িতে।'

'খাওয়া তা হলে...'

বেয়ারাকে তাড়াতাড়ি কফি আনতে বলল দীপ্ত। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধোঁয়া টেনে নিল বুকে। কাল ফোন পাওয়ার পর থেকেই টের পাচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রীর কোথাও যেন চিড় খেয়ে গেছে একটু। এখন সেখানে সেঁক দিয়ে যেতে হবে।

শম্পার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে চেম্বারের দেওয়ালে দেওয়ালে, খুঁটিনাটি সর্বত্র। চোখমুখের মুগ্ধতা এড়াতে পারছে না। ঘাম এখানে ঢুকতে পারে না কখনো, তবু অভ্যাসেই আঁচল বুলিয়ে নিল মুখে।

'তোকে দেখে ঈর্ষা হয়, দীপ্ত। ইচ্ছে হয় থেকে যাই। সত্যিই আরামে আছিস!'

দীপ্ত বলতে যাচ্ছিল 'থাকো না!' কৌশলে পেরিয়ে গেল পুরো বাক্যটি। হাসল শব্দ করে।

'তুমি আরামটাই দেখছ। বাট অ্যাট হোয়াট প্রাইস!'

'প্রাইস আবার কী! সব তো কোম্পানিই দিচ্ছে!'

'দিচ্ছে। সেটাই মনে হবে....'

ঈষৎ অন্যমনস্ক হলো দীপ্ত। ঝকঝকে রোদ্দুরে গা শুকোচ্ছে তীব্র নীল। পর পর ক'দিন বৃষ্টি হয়নি। হয়তো হবে না আর। আঁশ খসে ক্রমশ ন্যাড়া হবে রোদ্দুর, উত্তুরে হাওয়ায় শীত জানান দেবে শরীরে। যেন আগেভাগেই সেই হাওয়া ছুঁয়ে গেল তাকে। কাঁধ দুটো জায়গা মতো ফিরিয়ে আনতে আনতে দীপ্ত দেখল, দূরে বারোতলা নতুন বাড়ির গায়ে বাঁশের ভারায় দাঁড়িয়ে প্লাস্টার লাগাচ্ছে দু'টি লোক। মাটি অনেক নিচুতে। হঠাৎ পড়ে গেলে মাটিতেই পড়বে—অতো দূর উচ্চতা আর মাটির মধ্যে আত্মরক্ষার ভূমি নেই কোনো। আর, পতন মানেই তো মৃত্যু!

কফি দিয়ে গেছে। শম্পা একটা কাপ টেনে নিল। দীপ্তর মনে হলো বোধ হয় একটু বেশি সময়ই সে নীরব থেকেছে। কিছু বলার তাড়ায় ব্যস্ত হাত বাড়াল কফির দিকে। তারপর বলল, 'রতন চাকরি পেয়েছে এটা ভালো খবর। তবে আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে পারত!'

'কেন!'

'এখানেই নেবো ভেবেছিলাম ওকে। হয়তো সময় লাগত একটু।'

'ব্যাঙ্কের চাকরি খারাপ কী! তাছাড়া—', শম্পা বলল, 'সুজন বলছিল, তোদের

অফিসের চাকরি ওকে স্যুট্ করত না।'

'কেন!'

শম্পা চুপ করে থাকল।

দীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'সুজন জুটিয়ে দিল?'

'ঠিক সুজন নয়। মেদিনীপুরে ব্র্যাঞ্চ খুলছে নতুন—সুজন ওদের একজন ডিরেক্টরকে চেনে, তিনিই করে দিলেন। রেজাল্ট তো খারাপ ছিল না।'

'চাকরিটা কেরানির, সারা জীবন কেরানিই হয়ে থাকবে। এখানে স্টেটাস পেত!' হ্যাঙার থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিল দীপ্ত, 'সাড়ে পাঁচটা বাজে প্রায়। চলো, যাই।'

শম্পা বলল, 'তুই কি বলছিস, ভালো করল না?'

'আমি কিছুই বলিনি।' যেতে যেতে টাইয়ের নট্ ঠিক করে নিল দীপ্ত, 'এ ডিসিসান ওয়ান্স্ টেকেন ইজ টেকেন। হয়তো ভালোই হবে।'

'তোর যে ওকে এখানে নেবার ইচ্ছে সেটা তো কখনো জোর দিয়ে বলিসনি!'

ঘাড় বেঁকিয়ে শম্পাকে দেখল দীপ্ত। হাসল। বহু দিনের অভ্যাস-করা হাসি। এর জন্যে অনেকবার তাকে দাঁড়াতে হয়েছে আয়নার সামনে, তীব্র চোখে চিনতে হয়েছে অদৃশ্য স্তাবকের মুগ্ধতা। হাসির সঙ্গে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা মেশালে যে-কোনো মেয়েই গর্ভবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কাঁপবে। 'কীভাবে তাকাও তুমি!' জয়িতা বলেছিল একদিন, সে অনেক দিন আগেকার কথা। জয়িতাকে বলেনি, এই লুক্ আয়ত্ত করতে কম মহড়া দিতে হয়নি তাকে! এটা সিক্রেট। এলিভেটরের একান্তে সুনীতাও কি বিব্রত বোধ করেনি!

কিন্তু, শম্পাদি দৃষ্টিপাতের অপেক্ষা করল না, হাসিরও না। চমৎকারভাবে নরম হয়ে এলো প্রতারণার কাছে। সেদিন বাড়িতে এটা পারেনি দীপ্ত—অন্যমনস্কতা টেনে রেখেছিল সত্যের দিকে। আজ পারল। শম্পাদি বিশ্বাস করেছে রতন সম্পর্কে আগ্রহ ছিল তার এবং রতন অপেক্ষা না-করায় অখুশিই হয়েছে সে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এসব দেখাশোনায় এতোটুকু টাল খায়নি শম্পাদির ধারণায়। অথচ, কতো সহজে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল দীপ্ত!

পৃথিবী কি প্রতারণার ওপরেই চলছে! আজ সে প্রতারণা করল শম্পাদির সঙ্গে, একটু আগে ধরা পড়ে গেছে সুনীতাও। খুঁজলে আরো দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। একজন দু'জন হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত—অপ্থাল্মিক ডিজঅর্ডারে একের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে আর এক, একই মুখের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে আর এক মুখ! কিসের আকাঙ্ক্ষায় বোঝা যায় না। মুখার্জির মৃত্যু কামনায় সিন্হার অপেক্ষা—বুঝতে পারে সে; বুঝতে পারে সিন্হার জন্যে পুষি দত্তের আহ্লাদ। সুনীতাকেও বুঝতে পারে কিছুটা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অস্পষ্ট লাগে নিজেকে। একদিন খুব কাছে ছিল শম্পাদি, কালেভদ্রে দেখা হওয়া বা কথা বলা ছাড়া পার্থিব আর কোনো সম্পর্ক নেই এখন—তবু সুযোগ নিল সে। কেন? শুধুই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে? নাকি আর একটা ভয়ও তার ছিল: যে-মহানুভবতায় কোনো দিনই ফিরে যেতে পারবে না, অন্তত শম্পাদির চোখে নিজের সেই ভূমিকা ছুঁইয়ে রাখল একটু!

অনেকক্ষণের মধ্যে একটিও কথা বলেনি দু'জনে। ঘড়ি দেখল, না, অনেকক্ষণ বলা যাবে না। আসলে নীরবতার জন্যেই সময়কে মনে হচ্ছিল দু' গুণ, তিন গুণ। এরই মধ্যে শম্পাদির শারীরিক উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে হতে একটু হাল্কা হতে চাইল দীপ্ত। চেষ্টা করে সেই গন্ধটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল আবার—ঘামের বা ক্লান্তির; শম্পাদি প্রসাধনে বিশ্বাস করে না, এ তার শরীরের গন্ধ। প্রতিটি নারীর মধ্যে একই অবয়বের ছক,

শম্পাদিকে ভাবতে গিয়ে জয়িতার শরীর ভেবে নিল দীপ্ত—তবু প্রত্যেককে এতো আলাদা মনে হয় কেন। বিশ-পঁচিশ মিনিট ঠাণ্ডা ঘরে থেকে মাজা বাসনের মতো ঝকঝক করছে শম্পাদির মুখ ; মাথা ও ঘাড়ের মধ্যে, ঘাড় ও বুকের মধ্যে, মাংসের এমন সুসম ঢল চোখে পড়ে না সহজে। চোখের কোলে, চুলের সিঁথিতে সময় ছাপ রাখলেও খুব সহজেই শরীরে বয়স লুকিয়ে রাখতে পেরেছে শম্পাদি। বদলায়নি তেমন। শম্পাদি বলতে পারে—একদিন জিজ্ঞেস করবে সে কতোটা বদলেছে।

'সুজন আছে কেমন ? খুব বদলে গেছে ?' এইভাবে শুরু করল দীপ্ত।

'বদলাবে কেন। মাথায় টাক পড়েছে অল্প, না হলে সেই রকমই আছে !'

'সেই রকমই !' একটু হাসল দীপ্ত, 'তা হলে লক্ষ করোনি। নিশ্চয়ই বদলেছে। সকলেই বদলায়—'

'তোর মতন ?'

'বলতে পারো।' মানিয়ে নেওয়ার ধরনে বলল দীপ্ত, 'কিন্তু, আমি কি খুবই বদলে গেছি, শম্পাদি ?'

'খু-উ-ব।' এলানো গলা শম্পার। ভেবে বলল, 'সেটা আর অস্বাভাবিক কী ! সকলেই বদলায়।'

একই কথা, সে নিজেই বলেছিল খানিক আগে, শম্পাদি প্রতিধ্বনি করে গেল। সম্ভবত খুব গভীরভাবে ভেবে দ্যাখেনি—প্রতিধ্বনির মধ্যে লুকিয়ে রাখল নিজেকে। এতোক্ষণে একটা কথা মনে হচ্ছিল দীপ্তর ; সম্পর্কে ছেদ পড়ে গেছে অনেক দিন আগেই, এই যাওয়াটা রতনের সূত্রে, তার বা শম্পাদির বা সুজনের পারস্পরিক টানে নয়। রতনের চাকরির জন্যে একদিন বাড়িতে এসেছিল শম্পাদি, হঠাৎ, তখনই সুজনের কথা ওঠে—রতনের চাকরিটা হয়ে না গেলে শম্পাদি হয়তো যেচে ফোন করত না আর। ফোনটা কী জন্যে করেছিল ? সুজন এসেছে জানাতে ? নাকি রতন চাকরি পেয়েছে, দীপ্তর সাহায্য ছাড়াই পেয়েছে—এটা জানিয়ে তার অহঙ্কারে ঘা দিতে চেয়েছিল ! আসল উদ্দেশ্যটা মিটে যাওয়ার পর আসছে আজকের প্রয়োজন। এই যাওয়াটা ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। না গেলে অখুশি হতো না শম্পাদি।

খুব দ্রুত নিচে নেমে এলো দীপ্ত। সম্পর্কের ভিতরে আছে জটিলতা—জটিলতার ভিতরে ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে সম্পর্কগুলি। পাশাপাশি, সহজ রাস্তা ভেবে এতোক্ষণ এগিয়ে যাচ্ছিল সে, এখন মনে হচ্ছে, ঐ রাস্তায় পৌঁছুনো যাবে না। ধস্ নেমে যাচ্ছে মধ্যিখানে। অথচ, অতীত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট—মাঝখানের ঐ ধস্‌টুকু না থাকলে অসুবিধে হতো না কোনো। শম্পাদি কী ভাবছে অনুমান করা মুশকিল ; কিন্তু, দীপ্ত জানে, মাঝখানের দূরত্ব শুধুই এক হাতের নয় ; এখন হাত বাড়ালেই সুনীতার মতো টেনে নিতে পারবে না শম্পাদিকে।

বিকেলের রাস্তা। ভিড় বেশি। শম্পাদি রাস্তা দেখছে। রাসবিহারীর মোড় পেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে এগোতে এগোতে দীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক যাচ্ছি তো ?'

'ঠিক। এখন সোজা যেতে হবে—'

'সোজা ! এককালে অবশ্য তাই মনে হতো।'

'মানে ?'

'কতোবার গেছি ! আজ তবু জিজ্ঞেস করতে হলো তোমাকে !'

'হয় রে, হয়। আগ্রহ কমে গেলে এমনি হয়। শেষ কবে গিয়েছিলি মনে পড়ে ?'

'কবে ?'

উত্তরটা আগে ভেবে রাখেনি শম্পা। ভেবে নিতে যতোক্ষণ সময় লাগে তার চেয়ে বেশি নিল।

'মা মারা যাবার পর—'

'না। তোমার মেমারি খারাপ—'

'কেন !'

'বলছি। সুজন যেদিন চলে গেল। ঠিক বলেছি ? আমি ওকে পৌঁছে দিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে, তুমিও ছিলে !'

'ঠিক।'

চোখ তুলে তাকাল শম্পা। কিছু একটা বলতে চাইল, বলল না। দৃষ্টিও ফিরিয়ে নিল না।

অল্প অস্বস্তি বোধ করল দীপু। তাকানোর ধরনটা নতুন নয়। একটু আগে স্মৃতির প্রসঙ্গ তুলেছিল সে, এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে শম্পাদি—দৃষ্টি দিয়ে যা বোঝাল, শব্দ তার চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে না। সময়ও পারে না। দৃষ্টি নয়, যেন কানের পাশে একটা দেশলাই জ্বেলে ধরল শম্পাদি—শরীরময় ছড়িয়ে পড়ছে উত্তাপ : মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে ?

অনুভূতির মধ্যে সংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে প্রথম শরীর ; আশ্চর্য, এতো দিন পরেও দীপু সেই অনুভব ধরে রাখতে পেরেছে পুরোপুরি ! অস্বস্তি বেশি লাগায় টাইয়ের নট্‌টা খোলার জন্যে ব্যস্ত হাত বাড়াল সে, আর তখন—ঠিক তখন—হাত বাড়িয়ে ওর কব্জিটা চেপে ধরল শম্পা।

'খুলছিস কেন !'

'গরম !' প্রায় ছেলেমানুষের গলায় বলল দীপু, 'তা ছাড়া—সুজনের কাছে যাচ্ছি, এখন আর এটার দরকার নেই !'

'এ ছাড়া ন্যাড়া লাগবে তোকে। সুজন দেখুক, না হয় পরে খুলে ফেলিস।'

অ্যালকোহলের তীব্র ঝাঁঝে 'র' হয়ে আছে শরীর, স্টিয়ারিংটা ঠিক করে ধরে টাইয়ে লিপ্ত হাতটা শম্পার হাতের ওপর রাখল দীপু। আঙুলের ডগায় যদি কোনো তাপ থাকে, শম্পাদি টের পাবে। পাক। এখন সে অনেক বেশি সাহসী।

হাতটা নিজেই টেনে নিল শম্পা। সামনে বাঁক ; ভয়ঙ্কর শব্দে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে একটা-ট্রাম। নির্ভুল সাহসে 'পাশ' কাটিয়ে গেল দীপু।

'এখুনি অ্যাক্সিডেন্ট হতো !'

'হতো না…।' দীপু হাসল। বেঁকিয়ে বলল, 'এখন আর ওসব ভয় নেই। তুমি আমাকে কতোটুকু চেনো !'

'তুই একটুও বদলাসনি, দীপু।'

ব্যবধানটা এখন আগের মতোই। শম্পা বলেছিল বলে নয়, এমনিতেই গলার আল্‌গা হওয়া ফাঁসটা শক্ত করে নিল দীপু। বিড়ালের থাবা ঘষার ভঙ্গিতে হাতটা বুলিয়ে নিল মুখের ওপর। রোদ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ছায়াকে, ফুটপাথ দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে পিলপিল করে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ ; তাদের মুখে ছায়া। দু' পাশের আঁটসাঁট বাড়ির ছায়া ঢুকে পড়েছে

গাড়ির মধ্যেও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা হবে সুজনের সঙ্গে, বেশ কয়েক বছর পরে। সে-জন্যে এখন থেকেই তৈরি হওয়া দরকার।

একটা সিগারেটের অভাব বোধ করছিল দীপ্ত। গিয়ার চেঞ্জ করে ফাঁকা রাস্তা খুঁজল। জলেভেজা একটা নিটোল বাদামী হাত ভেসে উঠেছে চোখের সামনে—গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে অ্যাব্‌স্ট্রাকসানের ভিতর। ইচ্ছে করলেই দীপ্ত আর তাকে ছুঁতে পারে না। হয়তো পারত একদিন। তা হলে জীবন অন্য রকম হতো।

কথাটা ভেবে ডুবে যাওয়া যায়। স্মৃতি নাড়া দেয় না কোনো—একা-একা অনুভূত বলেই কেমন কোণঠাসা লাগে নিজেকে।

সুজন আর অলিপ্ত গেল কোনারক বেড়াতে। দীপ্তর জ্বর ; দু' দিন এক নাগাড়ে সমুদ্র-স্নানের জের টানছিল একা। শম্পাদি গেল না। গল্পে গল্পে, আলস্যে, পার হলো সকালটা। দুপুরে অসহ্য রোদে তেতে উঠল বালিয়াড়ি। জ্বর এলো। ওরই মধ্যে শুনতে পেয়েছিল সেই কিছু-বা সলজ্জ গলা : 'তোয়ালেটা ভুলে এসেছি, একটু এনে দিবি ?' বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত বিস্তৃত তাপ আনাগোনা করছিল সর্বাঙ্গে, সেই একই তাপ কেন্দ্রীভূত হলো বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে। দরজার ফাঁকে এগিয়ে এসেছে একটা জলে-ভেজা বাদামী হাত। স্বাস্থ্য তখন প্রবল, নিম্নগামী তাপ স্তব্ধভাবে অপেক্ষা করছিল বিস্ফোরণের। দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হয়নি কথাগুলো। কিংবা, কনুই থেকে নিঃশব্দে ঝরে-পড়া জলের বিন্দুগুলিতেই ছিল তার উচ্চারণ! সাহস হয়নি। সেদিন, প্রায় তিন চার মিনিট পরে, তোয়ালেটা এগিয়ে দিতে গিয়েও স্পর্শ এড়িয়ে গিয়েছিল সে—দেখেছিল তোয়ালে-ধরা একটি মুঠি কীভাবে নিস্তেজ হয়ে আসে ক্রমশ। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দরজাটা। দীপ্ত ভেবেছিল, সুযোগ একবারই আসে।

শম্পাদিও কি তাই ভেবেছিল ? হয়তো। হয়তো নয়। ভাবনাগুলো ধরা পড়েছিল শম্পাদির পরবর্তী আচরণে—দূর থেকে দেখায়, এড়িয়ে যাওয়ায়। হয়তো সেই একবারই একটু অন্য রকম হতে চেয়েছিল শম্পাদি, স্নেহ ও বন্ধুতার থেকে আলাদা করে দেখিয়েছিল নিজেকে। নিঃশব্দ আহ্বানে যে সাড়া দিতে পারে না, অন্য কোনো আহ্বানও তার কাছে মূল্যহীন। 'তুই একটুও বদলাসনি, দীপ্ত!' কী বলতে চেয়েছিল শম্পাদি—হাতের ওপর হাত রাখার চেষ্টায় কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নেই! সেদিন যা পারেনি, আজ তা পারার সুযোগ নেই কোনো!

হয়তো ঠিকই। তখন সাহস মানে সাহসই বোঝাত—নারী মানে অস্পষ্টতা ; কাঁচা মাংসে চকচক করত আলো। এখন সে স্বাদ বুঝে গেছে!

'ব্যস, এবার বাঁ দিকে—'

স্পিড্ বেশি ছিল। ব্রেক কষে ব্যাক করতে হলো। বাঁয়ে ঘোরার সুযোগে একবার শম্পাকে দেখে নিল দীপ্ত। শরীরে যে বয়স লুকিয়ে রাখতে পারে, জ্বর তার কাছে কোনো বিষয় নয়। এটা তার অনেকবারই মনে হয়েছে। পুরনো হতে হতে মরচে ধরে যাচ্ছে স্মৃতিতে, এখন তাকালেই চোখ যায় চওড়া সিঁথিতে, বিষণ্ণ চোখের কোলে। তবু, সেদিনের অস্পষ্টতা এখনো তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে মাঝে মাঝে।

জানে শম্পাদি এখন স্বাভাবিক হবে। থামতে না থামতেই নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি।

'শেষ পর্যন্ত এলি তা হলে ?'

'এলাম। কিন্তু, বসব না বেশিক্ষণ। তোমাকে বলিনি, আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট

আছে।'

শম্পা তাকাল। কিছু বলবে ভেবে ঠোঁট ফাঁক করল অল্প, বলল না। শেষ বিকেলে প্রথম রঙ বদলায় ঘাস, মাটি, রাস্তা ; এগুতে থাকে ছায়া। দীপ্ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে ছায়াগুলো, আধাআধিভাবে তারা ছুঁয়ে আছে তাকে আর শম্পাকে। যুক্তি বা গায়ের জোর দিয়ে সরানো যাবে না তাদের—সন্ধ্যার ছায়া ঊর্ধ্বগামী। আশেপাশে তাকিয়ে সে বলল, 'অনেক বদলে গেছে দেখছি!'

দরজা খুলল রতন।

'আ-রে, দীপ্তদা! আসুন, আসুন—'

'কী খবর!'

শম্পাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে অল্প ইতস্তত করল দীপ্ত, তারপর বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকল।

একেবারে মনে না-পড়ার মতো কিছু নয়। দরজার পর তিন হাত এগোতে না এগোতেই সিঁড়ি ঘুরে গেছে ওপরে। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েই দীপ্ত মনে করতে পারল, সিঁড়ির শেষে দরজা পাবে, এক ফালি লম্বা বারান্দার শেষে রান্নাঘর, বাথরুম। বাঁ দিকে পর পর দু'টি ঘরের মাঝখানে দরজা আছে। মাসিমা থাকতে দু'টিই শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার হতো। মাসিমা যাওয়ার পরও তাই ছিল, আগের মতোই বসার ঘরের তক্তপোশে রাত কাটাত সুজন, একার জন্যে আলাদা ঘর পেয়েছিল শম্পাদি। অবশ্য বেশি দিনের জন্যে নয়। যে-সিঁড়ি দিয়ে একদিন মাসিমার ছোটখাট শরীরটাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিচে, সেই সিঁড়ি দিয়েই একদিন সুজনের স্যুটকেস হাতে নেমে গিয়েছিল সে। শম্পাদি মৃত্যুটা মনে রেখেছে, তার শেষ যাওয়াটা নয়। একটু আগে সে-ই মনে পড়িয়ে দিল। হয়তো সেই যাওয়াটাকেও এতো দিনে মৃত্যুর সঙ্গে বদল করে নিয়েছে শম্পাদি। আজকের আবির্ভাবে ধারাবাহিকতা নেই কোনো, না এলেও তারতম্য হতো না বিশেষ।

এ-রকম অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে এর আগে বড়ো একটা পড়েনি। পিছনে দরজাটা বন্ধ হতেই ঠেসে এলো অন্ধকারের ছায়া। দীপ্ত একটা গন্ধ পেল—পুরনো গন্ধ, সম্ভবত দেওয়ালের। গন্ধই বলে দিল সে ঢুকে পড়েছে অপরিচয়ের মধ্যে।

'দাঁড়িয়ে কেন, ওঠ?'

'উঠছি। সুজন আছে তো?'

'আছে বাবা, আছে। আমি তোকে ধাপ্পা দিয়ে আনিনি!'

'সে-কথা নয়—'

কথাটা শেষ করতে পারল না দীপ্ত। দেখল, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সুজন, হাসি-হাসি মুখ। শম্পাদি ঠিকই বলেছিল, মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে অনেক, বুকখোলা পাঞ্জাবির ভিতর থেকে ঠেলে উঠল কণ্ঠাদুটো।

'এই যে, সাহেব, এলে শেষ পর্যন্ত!'

ভরাট গলা সুজনের, 'এলে' শব্দটায় জোর দিল। আগের সম্বোধনে 'তুই' থাকত। দীপ্ত অতোটা ভুল করতে পারে না।

'আসতে হলো। তুই তো আমার খোঁজ-খবর করবি না। এর মধ্যেও তো বারকয়েক কলকাতা ঘুরে গেছিস!'

'ইচ্ছে ছিল না তা নয়। ভয়ে দেখা করিনি—', প্রথম ঘরটায় তাকে টেনে নিল সুজন,

'সাহেব হয়ে গেছিস, এখন তোর আদবকায়দাই আলাদা। ভিজিটরস্ স্লিপ্ পাঠাতে হবে, তাও দেখা করবি কি না ঠিক নেই।'

'কেন। তুই কি গিয়েছিলি কোনো দিন ?'

'যাইনি। শুনতে পাই—'

সুজন হাসছে। বেতের সোফায় বসতে বসতে সুজনকে খুঁজল দীপ্ত, না-পেয়ে ভুরু কোঁচকাল।

মুখোমুখি তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই এ-ঘরে। শম্পাদি ঢুকেছে নিজের ঘরে, রতনকেও দেখা যাচ্ছে না। তবু সূত্রটা খুঁজে পেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গলার চামড়ায় উসখুস করে উঠল টাইয়ের নট্। বিহেভিয়ার সম্পর্কে তার ধারণায় ভুল নেই কোনো—প্রথম যেদিন রতন গিয়েছিল তার বাড়িতে, সেদিন ছেলেটি সম্পর্কে যা ধারণা করেছিল, তাতে ভ্রান্তি ছিল না। দ্বিতীয় সাক্ষাতেও নতুন কিছু জানত না। সেটা বুঝতে পারল আজ, এই মুহূর্তে, সুজনের কথা শুনে। একটা রাগ শিস্ বাড়িয়ে দিল মাথায় ; দীপ্ত থেকে মিস্টার রে-তে পৌঁছুতে সময় লাগল না। 'বল্‌স্—', কথাটা চলে এসেছিল মুখে। কোনো রকমে সামলে নিয়ে ভাবল, এখন নয়। আজকের আসায় যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তার মাশুল তাকে দিতেই হবে।

মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকল দীপ্ত। তারপর বলল, 'ঠাট্টা পরে করবি। তোর খবর কী ? শুনলাম চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিস ?'

'কে বলল ? দিদি ?'

'শুনলাম—'

সুজনের হাতে চারমিনারের প্যাকেট, সম্ভবত একটিই সিগারেট আছে—খুলে আবার বন্ধ করে রাখল। পকেট থেকে নিজের প্যাকেট বের করে সুজনের দিকে এগিয়ে দিল দীপ্ত, সুজন 'না' বলল। নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে একটু ছড়িয়ে বসল দীপ্ত।

'কিছু ঠিক করিনি এখনো—,' সুজন বলল, 'তবে দিতেও পারি।'

'কী করবি ?'

'দেখি—।' সুজন আর এগোল না, 'তোর খবর বল ?'

'আমার ?' যতোটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে হাসবার চেষ্টা করল দীপ্ত, 'চলছে। চলে যাচ্ছে।'

'অ্যাডভার্টাইজিং ?'

দীপ্ত মাথা নাড়ল। হেসে বলল, 'উপায় কী ! কিছু একটা করতে হবে। তোর মতো হুট্ করে চাকরি ছাড়ার কথা আমি ভাবতে পারি না।'

সুজন একটু গম্ভীর হলো। সিগারেটের প্যাকেটটা আবার তুলে নিল হাতে।

'এখনো ছাড়িনি। তবে হুট্ করে ছাড়ব না—চাকরি কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না বলেই ছাড়ব।'

শম্পা ঘরে এলো। পিছনে রতন, শম্পাকে সাহায্য করতেই হাতে করে নিয়ে এসেছে চায়ের কাপ দুটো। একটা প্লেটে কিছু কুচো নিম্‌কি। প্লেটটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে শম্পা বলল, 'তাড়ার জন্যে এটা ফেলে যাস না। সকালেই করেছি—'

তিন কি চার বছর আগে, কিংবা তারও আগে, যে-কথাটি অনায়াসে বলতে পারত, সেই কথাটির সন্ধানে নিজের ভিতর পর্যন্ত ডুব দিল দীপ্ত। পেল না। হয়তো পেত, যদি রতন না

থাকত, যদি আর একটু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসত সুজন। এখন তা সম্ভব নয়—সুজন শুরু করেছে মাত্র, কতো দূর এগোবে এখনই বোঝা যাচ্ছে না। তবে এগোবে। জুতসই প্রতিরোধের জন্যে কাটাছেঁড়া নিজেকে অল্প ঘসটে নিল দীপ্ত। ইতিমধ্যে শাড়ি বদলেছে শম্পা, সম্ভবত চুলটাও আঁচড়ে নিয়েছে। টান-টান কপালে পিছলে যাচ্ছে আলো। একটি বাদামী হাত আবার এগিয়ে এলো সামনে। এখন হাসিই তার একমাত্র অস্ত্র।

'আসছি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শম্পাদি। সুজন ফিরে এলো।

'দেখা হয় না, কিন্তু তোর খবর পাই ঠিকই। নির্মাল্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন—শুনলাম লিকার ডিপ্লোম্যাসি তোকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে!'

এগুলো কথা নয়। দু'জন দীপ্ত ক্রমশ এক হয়ে যাচ্ছে। দীপ্ত বলতে চাইল, আমার খবর তুই আমার কাছেই পেতে পারিস, সুজন। অন্য কারুর থ্রু দিয়ে নয়! কিন্তু, আজ, এখন, কোনো কথাতেই আর উৎসাহ পাচ্ছে না তেমন, এমনকি বুঝতে পারছে না, সুজনের সঙ্গে দেখা করার কথাটা সে নিজেই বা তুলেছিল কেন! ভ্রূণ-ঘাতকের মতো চাকরির দরখাস্তটা ছিঁড়ে ফেলার অনেক দিন পরেও রতনের জন্যে চেষ্টা করার কথা সে বলতে পেরেছিল শম্পাদিকে—তার চেয়ে অনেক বেশি সহজে এড়িয়ে যেতে পারত আজ। তা হলে এলো কেন!

মাথার ভিতর তাপ ছড়াতে শুরু করেছে আবার। প্রাণপণে নিজেকে বাঁচিয়ে দীপ্ত বলল, 'কথাটা ভালোই বলেছিস, লিকার ডিপ্লোম্যাসি। কিন্তু, সুজন, ওটা আমার জীবিকা, জীবন নয়। যেমন তুই আর তোর চাকরি এক নয়।...কিছু মনে করিস না, তোকে কেমন ফ্রাস্ট্রেটেড লাগছে।'

'ফ্রাস্ট্রেটেড? আমাকে!' ব্যঙ্গে হেসে উঠল সুজন, 'আমি তোর মতো অ্যামবিসাস্ নই, দীপ্ত। হলে কথা ছিল। এক লাফে অনেকখানি পেরিয়ে এসেছিস তুই—মাঝখানটা ফাঁকা, না হলে বুঝতে পারতিস, ফ্রাস্ট্রেসান আর যার আসুক, আমার আসবে না। আমি সাধারণ, বরাবরের সাধারণ। কিন্তু, তুই এখন ক্লাসে বিলং করিস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের যুগ গেছে, এখন তোরাই একটা যুগ—ভিখিরিকে বলিস টেরিলিন পরতে, অপুষ্টির দেশের মেয়েদের ব্যবহার করতে বলিস বাস্ট-ডেভ্লপার! এটা এক ধরনের প্রিটেনসান। দেশের খবর কিছু রাখিস!'

কথা, কথা, কথা। নেপথ্য জুড়ে শুরু হলো পাইলিংয়ের শব্দ। কথাগুলো বাজতে লাগল কানে, অর্থ স্পষ্ট হলো না তেমন। তবু কান খাড়া করে রাখল দীপ্ত। অল্প অল্প কাঁপছে সুজনের গলা, আবেগে না রাগে ঠিক ধরা যায় না। এতো দিন প্রোডাক্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, ব্যাখ্যা করেছে তাদের দোষ-গুণ, এখন নিজেকেই মনে হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট। সুজন শেষ করতেই হেসে বলল, 'তুই কি ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিস? নাকি কথা বলছিস আমার সঙ্গে?'

'জানি না। ঠিক বুঝতেও পারি না।' অপ্রস্তুত গলায় বলল সুজন, 'সরি। তুই কিছু মনে করলি না তো?'

'মনে। বোধ হয় না।' শ্লেষ মেশানোর সুযোগটা কাজে লাগাল দীপ্ত, 'একটা জিনিস তা হলে স্বীকার করলি, মন বলে কিছু আছে আমাদের!'

শম্পা ফিরে এলো। দু'জনের কথাবার্তার কিছু বোধ হয় কানে গিয়েছিল। বলল, 'এখনো তর্ক থামল না তোদের! কী শুরু করেছিস বল তো?'

'আমি না গেলে বোধ হয় থামবে না— ।' দীপ্ত উঠে দাঁড়াল, 'আজ চলি । সুজন, তুই কি আসবি একদিন ? জয়িতা খাওয়াবে বলছিল—'

'বেশ তো । জানাবো ।'

নিরুত্তাপ গলা সুজনের । দীপ্ত একটু দাঁড়াল, ভাবল । মাঝখানে অনেকটা সময় । একটা আবেগ উঠে আসতে চাইল । এরপরও হয়তো দেখা হবে মাঝে মাঝে, হঠাৎ যেভাবে হয় নির্মাল্যর সঙ্গে, রাস্তায়, কিংবা আর কারও সঙ্গে । তার চেয়ে বেশি নয়, তার চেয়ে কম কিছু নয় । মাথা না তুলেই উদাসীন গলায় দীপ্ত বলল, 'চলি, সুজন ।'

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাল্‌বের আলোয় সিঁড়িগুলো অস্পষ্ট । দীপ্ত একবার পিছনে তাকাল । সুজন দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, সিগারেট ধরাচ্ছে । শেষ সিগারেট । চকিত আগুনের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ । অল্প চেঁচিয়ে বলল, 'রতন, বেরুলে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো ।'

পাশে, প্রায় গা-ঘেঁসে, নামছে শম্পাদি । দীপ্ত সেই পুরনো গন্ধটা খুঁজল—চাপা ও রহস্যময়, বিশৃঙ্খলার মধ্যে একাগ্র করতে পারল না নিজেকে । নিঃশব্দে বাইরে এসে তাকাল রতনের দিকে ।

'তুমি কবে জয়েন করছ ?'

'এই তো, আর দিন তিন-চার—'

'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল—', গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল দীপ্ত, 'আসবে ?'

অল্প ইতস্তত করল রতন । তারপর বলল, 'চলুন—'

দীপ্ত ওকে গাড়িতে তুলে নিল । স্টার্ট নিয়ে পিছনে তাকাল একবার । ঘাস মাটি ছাড়িয়ে অন্ধকার এগিয়ে গেছে অনেক দূর, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে শম্পাদি । চিনতে ভুল হয় না । হাসি পৌঁছুবে না অতো দূর—স্মৃতি ডুবে যাবে স্মৃতিতে । মাঝে মাঝে মনে পড়বে হয়তো । সে আর এমন কি কষ্টকর !

আলগোছে হাত নাড়ল দীপ্ত । পিচ এখানে পোক্ত নয় । গতির সঙ্গে সঙ্গে ধুলোর গন্ধ এলো নাকে ।

'একদিন চাকরির খোঁজে তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে, মনে পড়ে ?'

রতন মাথা নাড়ল । অস্বস্তিটা চোখ এড়াল না দীপ্তর । সময় নিয়ে বলল, 'হিন্দুস্থান ফস্টার একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, তখন কি তুমি জানতে ?'

'বাঃ, জানব না কেন !' রতন বলল, 'এও জানতাম আপনার হাতে ক্ষমতা আছে । সেই জন্যেই গিয়েছিলাম ।'

একটু যেন অন্য রকম স্বর রতনের, ক্রমশ বেরিয়ে আসছে প্রাথমিক অস্বস্তি থেকে । এরপর কোন দিকে যাবে আঁচ করার চেষ্টা করল দীপ্ত । তারপর বলল, 'এখন যদি হিন্দুস্থান ফস্টার থেকে কল্ পাও, কী করবে ?'

'এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'আমার জানা দরকার ।'

'নেবো না—'

'আই সি !' ঠোঁটে দাঁত বসাল দীপ্ত, 'ধরো, ব্যাঙ্কে যা পাবে, তার ডবল যদি পাও ?'

'তা হলেও না ।' রতন হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠল । 'আপনি বোধ হয় লোভ দেখাচ্ছেন,

দীপ্তদা। না-টা হঠাৎ বলিনি। সেদিন আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়েই বুঝেছিলাম চাকরিটা হবে না—ও-চাকরি আমার জন্যে নয়।'

'কেন!'

'সেটা ধারণার কথা। আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

বাস্টার্ড! শব্দটা চাপা দেওয়ার জন্যে সজোরে ব্রেক কষল দীপ্ত। কপালে তিরতির করছে ঘাম। এখন সে যা-হোক কিছু করতে পারে।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চাপা গলায় দীপ্ত বলল, 'ও· কে·। উইশ ইউ অল লাক্....'

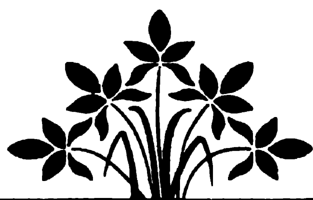
রতন নেমে গেল। দীপ্ত অপেক্ষা করল না। ফাঁকা রাস্তা—এখন সহজেই সে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে পারে।

মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে দুটো ফোন করল দীপ্ত। একটা বাড়িতে, জয়িতাকে—আজ তার ফিরতে দেরি হবে। আর একটা সিন্‌হাকে।

সিন্‌হা নেই। শুনল এইমাত্র বেরিয়ে গেছে ক্লাবে। সঙ্গে এক মেমসাহেবও ছিল। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে জিবটা গালের দিকে ঠেলে দিল দীপ্ত।

জানে, এখন সে কোথায় যাবে। শরীরময় উগ্র রক্তের চলাচল রোধ করতে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরল সে।

চিয়ার্স্‌!



চরিত্র

চরিত্র

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ১৯৭৬ (বৈশাখ ১৩৮৩)
প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৬·০০ । প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

উৎসর্গ :

কল্যাণী-কে

॥ এক ॥

দুপুরে মেঝেয় মাদুর পেতে শোয়ার অভ্যাস আছে আহামরির। এবং ঘুমোনোর। শোয়া ও ঘুমোনোর মধ্যবর্তী সময়টুকু সে বইটই পড়ে, 'কাজারচলতি বাঙালী গপ্‌পো লিখিয়েদের যতো রাবিশ' ; ঘুমের ডোজ হিসেবে মন্দ নয়। ইদানীং মাঝেসাঝে একটা রঙচঙে কেচ্ছার ম্যাগাজিনও মাদুরে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছে ব্রতীন, কখনো বা খবরের কাগজ। এসব আবিষ্কারের প্রতি বিন্দুমাত্র মোহ নেই তার। দ্যাখে, দেখতে হয় তাই। এ-রকম সময়ে নিজের মধ্যে কেমন একটু আটকানো ভাব টের পায় সে। চোখ যেভাবে দেখায় মন সেভাবে ভাবতে সাহায্য করে না।

আজকের ব্যাপারটা অবশ্য স্বতন্ত্র। খুব না হলেও কলেজ থেকে অল্পস্বল্প আগে ফিরেছিল সে ; লাইব্রেরিতে না গিয়ে, কফিহাউসে না গেঁজিয়ে, সোজা বাড়ি। আসলে মনটা ছিল খুব ফাঁকা। এমন একটা অবস্থা যখন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো একরোখা একটা ভাব আসে শরীরে, আশেপাশের রাস্তাগুলো যায় গুলিয়ে এবং আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে লাইব্রেরি, আড্ডা, বন্ধুবান্ধব, টিউসান এসবের ছড়াছড়ি থাকলেও বাড়ি যেহেতু একটাই, সুতরাং কোনো নির্দেশ না থাকলেও সে পৌঁছে যেতে পারে চোখ বুজে। তেমনিই পৌঁছেছিল। কলেজ স্ট্রিট থেকে ট্রামে, টিকিট কেটে, চৌরঙ্গিতে ট্রাম ছেড়ে বাসে উঠে এবং রাসবিহারীতে নেমে নিজেদের রাস্তাটি ধরে বাড়ির সামনে এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত তার কিছুই মনে হয়নি। একতলা থেকে দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে একবার শুধু মনে হয়েছিল বাড়ি ফিরছে ; এবং যেহেতু অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি, সুতরাং, দরজায় বেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিছুক্ষণ : এটা আহামরির ঘুমোবার সময়।

ঘুমোনোর প্রকৃতির মধ্যে সচরাচর মানুষে মানুষে তফাত থাকে না কোনো। আহামরির আছে। ঠিক কেমন তা এক কথায় বুঝিয়ে বলা শক্ত। সেটা, বস্তুত, লক্ষ সাপেক্ষ। তবে, এই প্রকৃতিটা যে আসে ভিতরের অভ্যাস থেকে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ব্রতীনের। এটা সে লক্ষ করছে গত বারো বছর ধরে, বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই প্রায়। তারও আগে, পারস্পরিক টানের ভিতর কিছু শোয়াশুয়ির চেষ্টা থাকলেও সেটা স্বভাব পর্যবেক্ষণ করার মতো যথেষ্ট অবকাশ দেয়নি। তপ্ত সুগন্ধে তখন সারাক্ষণ নিজেকে ভরে রাখত আহামরি। ব্রতীন খুশি ছিল শিকড় বিস্তারে : চিন্তার ভিতর মাংস ভিন্ন আর কোনো অনুষঙ্গ ছিল না।

এসব কথা এখন ভাবতেও কেমন লাগে—একটা হোঁচট যেন ঘোরে পায়ে পায়ে ! তবে গা সিরসির করে না। কল্পনায় সৌন্দর্য চেখে দেখার সুযোগে যে-ধরনের রক্ত হঠাৎ তাতিয়ে ওঠে শিরায়, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই কোনো। নেই অন্য কোনো সম্পর্কও। একটু বাড়িয়েও যে ভাববে তারও উপায় নেই। যেমন ব্লাউজ-ব্রা খুলে কোনো দিন আহামরির

বুক দেখতে পাবার আগেই সে নিস্তরঙ্গে ভাসমান বয়ার কথা ভেবেছিল। আসলে তার অনুষঙ্গে সাহায্য করেছিল ইতালিয়ান আর্টে ছাপা একটা ন্যুড। সেটা কোনো ব্যাপার নয় ; জাপানী আর্টে হলেও তখনকার মানসিক অবস্থায় সে আহামরিকেই ভাবত। পরে অবশ্য ধারণাটা পাল্‌টে যায়।

নিজের স্বভাবের এই ভাবুকতা নিয়ে সতর্ক কোনো কোনো মুহূর্তে নিজের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করে নেয় ব্রতীন। তবু ভাবে। এটাও ঠিক, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকলেও তন্মুহূর্ত থেকে ভাবনাগুলো তাকে একটু-আধটু সরিয়েও দেয়। অজান্তে, অনেক সময়, দেরিও করে ফেলে।

যেমন আজ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই সে ভেবেছিল আহামরি ঘুমোবে এবং দরজা খুলতে দেরি হবে। বাড়িতে কাজ করার জন্যে আছে বছর দশ-এগারোর একটি মেয়ে, চেহারায় গেঁড়ি ; যদি কোনো কারণে ওপরের ছিটকিনি লাগানো থাকে, তা হলে টুল এনে নাগাল পাবার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। সেটা সময় সাপেক্ষ। আহামরির স্বভাবের খুঁতখুঁতুনি কাঠের ছোটো টুলটিকে প্রায়ই যথাস্থানে রাখতে দেয় না—এ-ক্ষেত্রে, আহামরি ঘুমিয়ে থাকলে এবং কলিং বেলের শব্দ কোনোক্রমে মেয়েটির কানে পৌঁছুলে, টুলটি টেনে দরজা পর্যন্ত আনতে আনতে সময় যাবে কিছুটা। আরও দুটি সম্ভাবনা আছে এর মধ্যে। এক, টুল টানার শব্দে আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে পারে আহামরির এবং সে নিজেই তৎপর হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অভ্যাস থাকলেও, আহামরি যে ঘুমোবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধাটিকে একটু বাড়িয়ে নিল ব্রতীন। এ-ধরনের অ্যানালিসিস তার পক্ষে অস্বাভাবিক না হলেও ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। এই ভাবনায় বাস্তবতা নেই কোনো। সময়টা যদিও অসময়, তবু, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির কথাই কি আর-কিছুর আগে তার ভাবা উচিত হয়নি ! এমনকি, সে এটাও ভাবতে পারত, আহামরি আদৌ বাড়িতে থাকবে কি না। এই প্রশ্নের প্রস্তুতি কলেজ থেকে বেরুনোর আগে হঠাৎই দু'এক মুহূর্তের জন্যে ছুঁয়ে গিয়েছিল তাকে। স্টাফরুমে দাঁড়িয়ে তালুতে সিগার ঠুকতে ঠুকতে সহকর্মী নৃসিংহ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী, বাড়িই যাবে তো এখন ?'

'বাড়ি ?' ঠিক অন্যমনস্ক না হলেও অন্যমনস্কতা থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেছিল ব্রতীন, 'তুমি কোথায় চললে ?'

'ঠিক করিনি। তবে ইচ্ছে আছে কলেজ স্ট্রিটে যাবো একটু। রমেন বলেছে লেখাটার প্রুফ পাওয়া যাবে—'

প্রায় এই সময় অমলেশ চক্রবর্তী ঘরে ঢুকে ব্যবস্থাটা খাপছাড়া করে দেন। তাড়াহুড়ো করে ব্রতীন বলেছিল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'তা হলে সন্ধেবেলায় আসছি—'

'হ্যাঁ।'

'নিমন্ত্রণ বুঝি ?'

প্রশ্নটা অমলেশের ; কিন্তু এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যে কার প্রতি বোঝা কঠিন। লক্ষ্য ব্রতীন হলে প্রশ্নের মধ্যে একটু জটিলতাও এসে পড়ে। উপলক্ষহীন নিমন্ত্রণে বরাবরই তার অস্বস্তি প্রবল, বিশেষত সেটা জানাজানি হলে। বাঁচিয়ে দিল নৃসিংহ।

'অমলেশদা, ব্যাচেলরের পাত যেখানে পড়ে সেখানেই নেমন্তন্ন। আসলে একটু আড্ডা

দেব আজ। চলি হে—', যেতে যেতে বলেছিল নৃসিংহ, 'দেরি হলে খেয়েও আসতে পারি। আহামরিকে বলে রেখো।'

সম্ভবত এই সময়েই আহামরির থাকা না-থাকা নিয়ে সন্দেহটা সরে যায় মন থেকে। কথার মাঝখানে অমলেশদা এসে না পড়লে সে হয়তো নৃসিংহের সঙ্গ ধরত। পরে, ট্রামে উঠে, ভেবেছিল, প্রুফ দেখার ঘটনাটা অজুহাত, রমেনকে সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করবে নৃসিংহ, হয়তো কোনো বারে। মদ্যপানে চমৎকার আসক্তি আছে ওর। পারেও। সে পারে না—নৃসিংহ যা যা পারে তার অনেক কিছুই সে পারে না, এইভাবে প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়েছিল ব্রতীন। যেমন, ভেবেছিল, হৈমন্তীকে আহামরি নামে ডাকা এবং প্রকাশ্যে, এটা সে কোনো দিনই পারত না। এ-ব্যাপারে তার হিসেব খুব পরিষ্কার, এতো পরিষ্কার যে খুঁত-নিখুঁত বুঝতে অসুবিধে হয় না।

যেমন, মনে করতে পারে ব্রতীন, হৈমন্তীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রায় এগারো মাস পরে একটি সিনেমার ইভনিং শোয়ে পিছনের রো-তে সতেরো নম্বর সিটে বসে সে প্রথম চুমু খায় হৈমন্তীকে। হৈমন্তী বাঁ দিকে এবং আঠারো নম্বর সিটে বসার ফলেই গলা বাড়াতে সুবিধে হয়েছিল তার। চোদ্দ, পনেরো এবং ষোলোয় কেউ ছিল না—আঠারোর পরেও না। ছবিটা পুরনো এবং অনেক দিন ধরে চলছিল—এ-সবই তাকে সুবিধে করে দেয়। চুম্বনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ীতার সম্পর্ক ছিল না কোনো; কোনো রকমে আইনের শর্ত মেটানোর মতো আবছা একটা রাবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করেছিল সে। এবং, মনে আছে, তারপর যতোক্ষণ শো চলে প্রায় ততোক্ষণই সে ও হৈমন্তী কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে বসে থাকে; এমনকি—যেন ব্যবস্থার একটু এদিক-ওদিক হলেই কেউ গুলি করবে—খুব জোর পেচ্ছাপ পেলেও সে উঠে বাইরে যাবার কথা ভাবেনি। একটি অস্বচ্ছ অবয়ব এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বিঁধছিল তাকে। হৈমন্তী তখন আহামরি—যদিও উচ্চারিত হয়নি, যদিও ছবির পর্দায় চোখ রেখে এবং কিছু না দেখে ব্রতীন, বিষয়টির মধ্যে আরও একটু নিজস্বতা আরোপের চেষ্টায়, ভেবেছিল, এখন থেকে হৈমন্তীকে আহামরি নামে না ডেকে শুধু 'আহা' কিংবা শুধু 'মরি' নামে ডাকলে কেমন হয়! ধ্বনি প্রতারণা করেছিল। অনেকক্ষণ ধরেই আলাদা শব্দ দু'টিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিজের সঙ্গে তার যে বাক্যবিনিময় হয় তা অনেকটা এই রকম : শালা ন্যাকা। এক চুমুতেই কাত। তখনই সে অধ্যাপক; কিন্তু সেটা প্রায় বারো-তেরো বছর আগেকার কথা, তখন তার বয়স কম। পরে একটা রফায় আসে। হল থেকে বেরিয়ে সেদিনই সে, প্রথম, হৈমন্তীকে আহামরি নামে ডাকে। পরিচয়ের এগারো মাস পরে।

কিন্তু নৃসিংহের ব্যাপারটা আলাদা। অর্থাৎ তার সাহসের ব্যাপারটা। দেড় বছর আগে তাদের কলেজে জয়েন করেই সে তার সঙ্গে, এবং সকলের সঙ্গেই, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সেটা কিছু নয়। যা নিয়ে ব্রতীন একটু ভেবেছিল, কিংবা না-ভেবে পারেনি : হৈমন্তীর সঙ্গে আলাপের চতুর্থ দিনেই নৃসিংহের ঠোঁটে ও জিবে জড়িয়ে উচ্চারিত হয় আহামরি নাম, এবং তখনই, অন্তত একবারের জন্যে হলেও, ভেবেছিল ব্রতীন, এগারো মাস এবং চার দিনের মধ্যে তফাত অনেকখানি এবং একটা কিছু করার জন্যে সকলেরই সিনেমা হলের অন্ধকার কিংবা সতেরো ও আঠারো নম্বর সিট খোঁজার দরকার পড়ে না। এটা বিশেষ করে মনে হয়েছিল যখন নৃসিংহের গলায় আহামরি ডাক শুনে বারো বছর আগেকার চোখ তুলে তাকাল আহামরি। তখনো তাদের বিয়ে হয়নি।

কিন্তু, আহামরির এই সময়ে বাড়িতে থাকা বা না-থাকা নিয়ে সন্দেহের মধ্যে এতোখানি

জটিলতা নিশ্চয়ই নেই। কারণটাও খুব স্বাভাবিক।

গরমকাল হলেও আকাশ সব সময় মেঘলা হয়ে ওঠে না। গেরস্থ ঘরে—কথাটা আহামরির—যখনই অবকাশ পেকে ওঠে ঠিক তখনই উত্তাপ মনে হয় প্রচণ্ড, একটা ভ্যাপসানো ভাব এসে চেপে ধরে শরীর। অর্থাৎ দুপুরে, ব্রতীনের কলেজে যাওয়া এবং কলেজ থেকে ফিরে আসার মাঝখানের সময়টুকু। আহামরির নিজস্ব সময় বলতে ওইটুকুই। সেটার সদ্ব্যবহার করার জন্যে ক'দিন থেকেই ভাবছিল আহামরি ; বলেওছিল ব্রতীনকে। কস্তুরী, আহামরির ছোট, স্বামীসহ লণ্ডন গিয়েছিল মাস দেড়েকের জন্যে, বেশ ক'দিন হলো ফিরেছে তারা। ইতিমধ্যে এসেছিল একদিন ; আগে থেকে না-জানায় সেদিনই ছবি দেখতে বেরিয়েছিল দু'জনে। ফিরে শোনে। সেদিন থেকেই যাবো যাবো করছে আহামরি, তবে নিশ্চিতভাবে বলেনি কিছু। আজ দুপুরে হঠাৎ রোদ নরম ও আকাশ মেঘলা হতে দেখে ব্রতীন অনুমান করছিল আজই সেই দিন। আহামরির থাকা না-থাকার ব্যাপারটা তখনই তাকে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক করে তোলে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রতীন আহামরিকে ভাবল, কস্তুরী ও তার স্বামী দীপঙ্করকে ভাবল, নৃসিংহকে ভাবল। এর মধ্যে খুব যে একটা সময় চলে যায় তা নয় ; বরং পরপর কিন্তু অগোছালো বিভিন্ন চিন্তা থেকে হাত তুলে কলিং বেলের প্রতি সক্রিয় হতে হতে হঠাৎই তার মনে হয়, এতো তাড়াহুড়ো না করে আর একটু ধীরেসুস্থে বাড়ির দিকে এগোলেও কিছু যেত আসত না। নীতিও সায় দেয় না এ-ব্যাপারে। তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হওয়ার উপলক্ষ ছিল একটা—যদিও বিশেষভাবে উপলক্ষটা তার মনে পড়ছে এখনই। অ্যাকাউন্টেন্ট যতীন মুখার্জি মারা গেছেন। তাঁর সঙ্গে এমন একটা কিছু খাতির ছিল না তাদের ; কিন্তু, এটাও ঠিক, প্রায় কুড়ি বছর যে-লোকটি এই কলেজে কাজ করে বিদায় নিল, তার প্রতি তাদের কিছু দায়িত্ব ছিল। বেশি দূরে নয়—যতীনবাবু থাকতেন বেলেঘাটায়, কলেজ থেকে হাঁটাপথের দূরত্বও আধ ঘণ্টার বেশি নয়। এ-রকম অনেক রাস্তা অনেক দিনই হেঁটে গেছে তারা—সে, নৃসিংহ, জয়ন্ত, অসীম, রথীন্দ্র। অথচ তারা কেউই যাচ্ছে না। প্রিন্সিপাল অবশ্য যাবেন, হয়তো অমলেশদাও ; 'তোমরা কেউই'তা হলে যাচ্ছ না'—বেরুবার আগে একটু বা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন শুনেছিল অমলেশের মুখে। তারা, ইয়াংরা যে কেউই যায়নি, এ নিয়ে হয়তো কথা উঠবে কাল।

ইয়াং কথাটা ছোট্ট একটু ধাক্কা দিল ব্রতীনকে। সম্ভবত সে একটু অন্যমনস্ক ছিল, ইতিমধ্যে দরজা খোলার ব্যাপারটা লক্ষ করেনি।

ভিতরে ঢুকতে তবু একটু ইতস্তত করল ব্রতীন। ট্রুথ ও ফিকসানের একটা ধাঁধা এসে যাচ্ছে এখানে। এতোক্ষণ ধরে সে যা ভেবেছিল বা ভাবছিল, প্রত্যক্ষ দৃশ্যের সঙ্গে তার মিল নেই কোনো। হয় আহামরি না হয় ছোট মেয়েটি—হলেও হতে পারে টুল টানার শব্দ—এই দুই বিকল্প ফাঁকি দিয়ে গেল তাকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ধ্রুব। তার ছাত্র।

'তুমি !'

পাশ কাটিয়ে প্রায় মিনিট খানেক পরে ঘরে ঢুকল ব্রতীন, 'কতোক্ষণ ?'

'মিনিট পাঁচেক। চলে যাচ্ছিলাম....'

'হঠাৎ ?'

ধ্রুব দরজাটা বন্ধ করল। ছিটকিনি তুলল না। বিব্রত হেসে বলল, 'নীরদ চৌধুরীর বইটা

চেয়েছিলেন, দিয়ে গেলাম।'

'কোথায় ?'

'বউদির কাছে—'

'ও।'

আহামরি তা হলে ঘুমোয়নি, অন্তত এই মুহূর্তে ঘুমোচ্ছে না অনুমান করে আশেপাশে তাকাল ব্রতীন। তা হলে ঘরেই আছে। তখন, আবার, চাপা গলায় বলল, 'কলেজে দিলে না কেন ? মনে পড়েনি ?' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল।

দুপুরের আহামরির সঙ্গে মাদুরের সম্পর্ক একেবারে অহেতুক নয়। বসার ঘর থেকে ছোট প্যাসেজ পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে সেখানেই আবিষ্কার করল আহামরিকে। ধ্রুবর দেওয়া বইটা এখন তারই হাতে। দুপুর বলেই ঢিলেঢালা। আগে স্লিম ছিল, এখন তেত্রিশ ; গত তিন বছরে অল্প অল্প করে মেদ জমে খাঁজখোঁচগুলো ভরিয়ে তুলেছে। তাতে এক ধরনের অ্যাপিল ফুটে ওঠে, বিশেষত গরমকালে—ফ্যানের হাওয়া সত্ত্বেও যখন ঘামে মাজা-মাজা ভাবটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় না, যখন মাথা ছাড়াই শরীরটাকে ভাবতে ভালো লাগে। আড়ে তাকিয়ে আহামরির পায়ের অনাবৃত গোছটা লক্ষ করল ব্রতীন। সে স্ত্রীই হোক আর যেই হোক, নারীকে কখনো আপন বলে মনে হয় না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটটা খালি করল ব্রতীন। বড়ো খামটা এসেছে রেডিও থেকে, কলেজের ঠিকানায়। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক বিষয়ে টক্ দিতে হবে একটা ; বিশেষ করে ছুঁতে হবে বর্তমানের সমস্যা। সমস্যাটা কোথায়, ঠিক ঠিক জানা নেই। শিক্ষক হবে বলে সে কলেজে পড়ানোর চাকরি নেয়নি। নিয়েছিল একটা চাকরির দরকার ছিল বলে। মাঝে মাঝে ফেড-আপ লাগলেও ছাড়তে পারেনি—কোনো আদর্শের পিছুটানে নয়, স্রেফ আর একটা চাকরি চট্ করে পাওয়া যাবে না বলে। গা থেকে বুশ শার্টটা খুলে ফেললে যে বেরুবে সে ব্রতীন ; তার সঙ্গে টক্ দেওয়া না-দেওয়ার সম্পর্ক নেই কোনো। তবে, খুব টেনে-টুনে একটা সম্পর্ক অবশ্য ও বের করতে পারে। টাকার। গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাওয়া যাবে। কন্ট্রাক্টটা সে-জন্যে গুছিয়ে রাখা দরকার।

'আজ এতো তাড়াতাড়ি ?'

'হলো।' সামনে আয়না ; ইয়াং কথাটা ছুঁয়ে গেল ব্রতীনকে। 'ধ্রুব কিছু বলেনি ?'

'কী ?'

এটা আহামরির উঠে বসার সময়। এক হাতে ভর করে উঠে মৎস্যকন্যার ভঙ্গিতে তাকাল স্বামীর দিকে। বাড়িতে অনেক সময়েই ব্রা পরে না আহামরি, বিশেষত গরমে। আজও পরেনি। আড়াআড়ি আঁচল টেনে দুই কাঁধের ওপর তুলে দেওয়ার ফাঁকেই ব্রতীন ভাবল, সে আসার আগে ধ্রুব সম্ভবত এ-ঘরেই ছিল এবং ব্যাপারটা সেও লক্ষ করেছে।

'আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট যতীন মুখার্জি মারা গেছেন। ছুটি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি—'

ধ্রুব সম্ভবত পাশের ঘরে। এ-বাড়িতে তার যাতায়াত নতুন নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধ্রুবই যা আহামরিকে কাছ থেকে চেনে ; সে বাড়িতে না থাকলেও আসে যায়। ব্রতীন ভাবতে চেষ্টা করল আজকের আসাটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। অসুবিধে করছে ওর বই দেওয়ার ব্যাপারটা। শেষের দুটো ক্লাস আজ হয়নি ; তার মানে এই নয় যে ধ্রুব কলেজে যায়নি। শার্টটা খুলতে গিয়েও না খুলে ব্রতীন পাশের ঘরে যাবার কথা ভাবল।

'কী হয়েছিল ?'

'ক্যান্সার।' কেউ প্রশ্ন করলে এবং প্রশ্নের মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে জবাবটা অভ্যাসেই বেরিয়ে আসে। আহামরির কোনো ভাবান্তর হয় কি না দেখার জন্যে একটু অপেক্ষা করে ব্রতীন জুড়ে দিল, 'আজকাল অনেকেরই হচ্ছে—'

'তাই তো দেখছি। ওপরতলার মিসেস বল বলছিলেন ওঁর ননদেরও নাকি হয়েছে—'

'কোথায় ?'

'যেখানে হয়। বয়স নাকি বেশি নয়। বাইরে নিয়ে যাবার কথা ভাবছে।'

ঝোঁকা ভাব থেকে ওঠার চেষ্টায় আবার এলোমেলো হলো আহামরি। ব্রতীন আরো একটু সতর্ক। একটু আগে ভেবেছিল নারী কখনো আপন হয় না ; এখন সে আর একটি কথাও না ভেবে পারল না : নারী কখনো পুরনো হয় না। নারী, না মেয়েমানুষ ! এইমাত্র আহামরি যে ভঙ্গি থেকে ফিরে গেল, ছবি তুললে এবং সিনেমার কাগজে ছাপা হলে তা অনেক দামে বিকোত। ক্যান্সারের চিন্তা থেকে একটা ইচ্ছে কাঁপিয়ে দিল তাকে। এখন সময় যাওয়া মানে সুযোগ হারানো। এখনই সুযোগ নেওয়ার অর্থ মাদুরের ওপর বড়ো বালিশে আর একটি মাথার দাগ রাখা। বারো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এখন আর কোনো প্রিকসান নেওয়ার দরকার পড়ে না।

ইচ্ছেটাকে সংযত করল ব্রতীন। ধ্রুব অপেক্ষা করছে পাশের ঘরে। সুতরাং সে অনায়াসে আহামরিকে আলনার দিকে হাত বাড়াতে দিল এবং বলল, 'মেয়েটা কি ঘুমুচ্ছে ? একটু চা খেতাম।'

'ধ্রুব আছে না চলে গেল ?'

দেওয়ালের দিকে মুখ করে আহামরি এখন পরিপাটি হচ্ছে। দাঁতে ব্রা-র ফিতে চেপে বোতাম খুলছে ব্লাউজের ; ব্রতীন দেওয়ালটাকে ঈর্ষা করল। তারপর অস্ফুটে 'আছে' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বারো বছর কম সময় নয়। মোটামুটি প্ল্যান করে চললেও বারো বছরে গোটা দুয়েক হতে পারত। খুশি মতো চললে আরো বেশি। সেটা বাঞ্ছনীয় হতো না, কারণ, বিয়ের পর পরই হিসেব করতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রতীন, তাতে খরচ কতো বাড়বে এবং আয় কতোটা বাড়াতে হবে। যথাসময়ে আহামরিও এ-বিষয়ে সতর্ক করে তাকে, কেন না—বলেছিল আহামরি, তার কোষ্ঠীতে অনেকগুলি ছেলেপুলে আছে। চার-পাঁচ বছর পরে কথাটা আবার মনে পড়ে যায় ব্রতীনের এবং হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ হয়। একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়েও বলতে পারে না কথাটা। এর পরেও সে কয়েক দিন ভাবে এবং একদিন বাড়ি ফিরে আহামরিকে বলে, 'আজ একজন হাত দেখল। নামকরা জ্যোতিষী। বলল ছ'টি সন্তানের পিতা হবো। এখনো হইনি শুনে বলল আরো দু'তিন বছর অপেক্ষা করতে। তাতে নাকি আমাদের দু'জনেরই ভালো হবে—'

'কী ভালো হবে ?' হঠাৎ-চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল আহামরি।

'হবে—', বলতে হয়েছিল ব্রতীনকে, 'এই বৈষয়িক আর কি ! তুমি কী বলো ?'

'দ্যাখো।'

তার তিন মাস আগে থেকেই পিল খাওয়া বন্ধ করেছিল আহামরি। ব্রতীন আবার সেটা চালু করে ; বলে, 'দু'তিন বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

আহামরি উত্তর দেয়নি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে লক্ষ করেছিল ব্রতীন, শরীরে ঝাঁকুনির ভাবটা কমে যাচ্ছে আহামরির—একটা খালি বোতলের মতো, যে-কোনো রকমের

নড়াচড়াতেই শূন্য হয়ে থাকে। পরে ব্যাপারটা ধাতস্থ হয়ে যায়। একদিন নিজে থেকেই আবার পিল খাওয়া বন্ধ করে আহামরি এবং ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, যদিও, পাকা ব্যবহারকারীর মতো, তফাতটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ব্রতীনের। বছর দুয়েক আগে একদিন তারা ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। 'তেমন কিছু তো পাচ্ছি না—', সব দেখেশুনে ডাক্তার পরামর্শ দিল, 'অনেকেরই দেরিতে হয়। হেল্‌থ্ ভালো আছে, চিন্তার কিছু নেই।' যেন ব্রতীন কেউই নয়—এরপর থেকেই ঢিলেঢালা ভাবটা বেড়ে যায় আহামরির।

ধ্রুবও কি কেউ নয়! একটু একরোখাভাবে ছেলেটিকে লক্ষ করতে করতে ব্রতীন বলল, 'আর কী খবর?'

'ভালোই।' ধ্রুব বলল, 'আপনি কি ঘুরে এলেন?'

'ঘুরে? তা কেন!' প্রশ্নকারীকে না চেনার মতো করে ব্রতীন বলল, 'ট্রামে-বাসে আসা, সময় খুব কম লাগে না।' বলেই বুঝতে পারল এটা খুব প্রাসঙ্গিক নয়। তখন বলল, 'যতীনবাবুর বাড়িতে তোমরা কেউ গেলে না? ওঁর ছেলে তো তোমাদের সঙ্গেই পড়ত!'

ধ্রুব মাথা নাড়ল।

'উচিত ছিল। ইয়াং এজে এসব সামাজিকতার দাম থাকে, এ-সবের মধ্যেই অ্যাকটিভিটিস চোখে পড়ে। কিন্তু—'

বাইরে কিসের একটা হট্টগোল। জানলার নিচে সদর রাস্তা, সেখানে। মাঝে মাঝে তবলায় চাঁটি পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে এলোপাথাড়ি। শব্দটায় কান পেতে ব্রতীন শেষ করল, 'তোমাদের সোস্যাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটির সেন্‌স্ কম।'

ব্রতীনের গলায় রূঢ়তা ছিল। ঠিক এইভাবে, অন্তত ছেলেটির সঙ্গে, এর আগে কথা বলেনি। ধ্রুব বিব্রত বোধ করছে দেখে খুশিই হলো সে।

ধ্রুব বলল, 'আমাদের বাড়িতে আজ একটা কাজ আছে। বোনকে দেখতে আসবে, সেই জন্যেই যাইনি।'

'ও। আমি শুধু তোমাকেই বলিনি।'

'আমি চলি, স্যার—'

'এসো।'

ব্রতীনই আগে উঠল। এর পরের প্রসঙ্গের জন্যে অস্বস্তিতে পড়তে হতো। দরজাটা নিজের হাতেই খুলে ধরল সে এবং, ধ্রুব বেরিয়ে যেতে যেতে পিছনে তাকালে, বলল, 'চা খেলে না?'

শব্দটা এখনো তেমনিই আছে, বরং বেড়েছে। শব্দের সঙ্গে এখন ছেঁড়া ছেঁড়া একটা গানেরও আভাস পেল ব্রতীন, সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত তালি, ছোটবেলায় ব্রতচারীর দলে যেমন শুনত। আলতো হাতে দরজাটা বন্ধ করে সে ঘরে ফিরে এলো। জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। নিচে রাস্তায় এখনো তেমন চাঞ্চল্য শুরু হয়নি। বিকেল হতে দেরি থাকলেও আলোর অভাবে চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। বাঁ দিকে চল্লিশ ডিগ্রি কোনাকুনি তাকালে লাল ফ্ল্যাটবাড়ি, তারই নিচে হিজড়েদের জটলা। কিছু উটকো লোক ভিড় জমিয়েছে ওদেরই আশেপাশে। কালো, খুব পাকানো চেহারার, শাড়িপরা হিজড়েটা হঠাৎ কোমরের দু' দিকে হাত লাগিয়ে নাচ শুরু করে দিল।

'ধ্রুব চলে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'বললে আছে।'

দু' হাতে দুটো কাপ, আঁটসাঁট শরীরে আহামরিকে এখনো যুবতী বলে চালানো যায়। ইতিমধ্যে ছেলেপুলে হলে বাঁধুনি নিশ্চয়ই অনেক আলগা হয়ে যেত। এসব ভাবলে এক একদিন নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হয় ব্রতীনের। এক একদিন দুঃখ হয়। খালি বোতলটা তখন নীলচে লাগে। এখনও সেই রকম একটা ব্যাপার ছুঁয়ে গেল তাকে।

'তাড়া ছিল, চলে গেল—'

কাপগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে আহামরি বলল, 'চা-টা নষ্ট হবে—'

'বলো তো ডেকে আনতে পারি।'

'তার মানে!'

'না, ঠাট্টা করছিলাম।'

'ঠাট্টা!' 'ট্টা' শব্দের ওপর জোর দিল আহামরি। আসলে বাইরের কোলাহলে ওর স্বরক্ষেপ আলগা শোনাল। জানলার দিকে যেতে যেতে বলল, 'কোনটা ঠাট্টা কোনটা না, বুঝি না!'

এসব কথায় সাধারণত হাসিই পায়। যেভাবে কথাটা বলল তাতে মনে হবে ভিতরে ভিতরে খুব ফুলে আছে আহামরি, কিংবা এইমাত্র তারা একপ্রস্ত ঝগড়া করেছে। সে-রকম কিছুই হয়নি। জামাকাপড় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ঢিলেঢালা ভাবটুকু এখন পুরোপুরিই অদৃশ্য ; পোশাকের টান ধরা পড়ছে কথাতেও। স্বাভাবিক। জানলায় দাঁড়িয়ে ও এখন কী দেখছে বোঝা যায় না, কী ভাবছে তাও নয়। নিচে হট্টগোল, হিজড়ের নাচের কর্কশতা থেকে বের হচ্ছে নানা রকম শব্দ—ঢোলের, তালির, কখনো বা খিস্তির। নিচে থেকে ওপরে তাকালেই আহামরিকে দেখা যাবে ; তার পিছনে আড়াল হয়ে আছে ব্রতীন। এই সময়টাকে পুরোপুরি বিকেল বলা যায়।

'চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, খেয়ে নাও।'

একবার পিছনে তাকিয়ে ব্রতীনকে দেখল আহামরি, একবার পাখাটার দিকে তাকাল। তখনই ফিরল না। ওর কোমরের পিছনে একটা লালচে আভা লক্ষ করল ব্রতীন, সেটা আলোর তারতম্যে কিনা বোঝা যায় না। আহামরির দিকে তাকিয়ে কখনোই উইকার সেক্স্ কথাটার মানে বুঝতে পারে না সে।

'বিকেলগুলো বড়োই খারাপ লাগে—'

'কেন!'

'জানি না।' এক চুমুকেই চা-টা শেষ করল আহামরি, সোজা হয়ে। সোফায় হেলান দিয়ে কোমরটা গড়িয়ে দিল নিচের দিকে। অ্যানাটমির কন্ট্রাস্টটা সহজেই ধরা পড়ে এখন। খুব শিথিলভাবে মনে পড়ল ব্রতীনের, হাউসের অন্ধকারে প্রথম সংস্পর্শের মুহূর্তেও এইভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল আহামরি। তখন থেকে খুব একটা বদলেছে কি!

'মেয়েটা কোথায়?'

'র‍্যাসান আনতে পাঠিয়েছি। কেন?'

'এমনি।'

প্লেটের ওপর কাপটা নামিয়ে রাখার সময় তাড়াহুড়োর শব্দ হলো। ব্রতীন উঠে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ আগেকার অনুভূতি এখন আবার তার শরীরে রক্ত সঞ্চালন করতে শুরু করেছে।

'ভেবেছিলাম কস্তুরীদের ওখানে যাবে আজ। গেলে পারতে—'

'ফোন করেছিল—' দাঁতে নখ কাটতে কাটতে আহামরি বলল, 'ওরা আজ আসতে পারে!'

ব্রতীন খুশিই হলো। একা নৃসিংহ তাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে। অনেকবার ভেবেছে, তবু না করতে পারে না। হঠাৎ তৎপরতায় আহামরির ওপর ঝুঁকতে ঝুঁকতে সে বলল, 'ভালোই তো। সন্ধেটা ভালোই কাটবে।'

'ভর বিকেলে এ আবার কী!'

'চলো।'

একবার এড়াতে গিয়েও কী ভেবে আর জোর করল না আহামরি। ঘরে থাকতেই সে এ-ব্যাপারটা আশা করেছিল; তখন ধ্রুব ছিল। এখন কোনো ভয় নেই। জানলায় বেলা পড়ে আসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ তো হিজড়ের নাচ দেখছিলে, তাই দেখলেই পারতে!'

ব্রতীন একটা ঘা খেল। এখন নিজেকে প্রত্যাহার করা মানেই আহামরিকে সুযোগ দেওয়া। তারপর ক্রমাগত হারতে থাকবে সে। কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের গতি পরিবর্তিত হলো। ভাবল, পারবে। তারপর ভারী পাথর তোলার ভঙ্গিতে আহামরির বড়ো শরীরটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল দু' হাতে।

॥ দুই ॥

ক্লান্তি ব্রতীনকে পৌঁছে দেয় অনেক দূর। সমান্তরাল রেখায় না হয়ে নিজস্ব ভূমি থেকে সে ক্রমশ নামতে থাকে নিচের দিকে এবং নামতেই থাকে। এসব সময় মনে হয় নিজস্ব ভূমি বলতে কিছু নেই। এটা শুধুই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছুনোর ব্যাপার—টেক্-অফের মুহূর্তে প্লেন যেমন কোনাকুনি উচ্চতায় সোজা এগিয়ে যায়। একটা বয়স পর্যন্ত নিজেকে ঠেলেঠুলে সেও এগিয়েছিল। আটত্রিশে পৌঁছে বুঝতে পারে এ-রকম এগোনোয় সার্থকতা নেই কোনো; এর আর-একটা অর্থ থেমে থাকা। বয়স এগোয়, এগোয় শারীরিক প্রবণতাগুলো, কিন্তু এসবই যেহেতু মানুষের সংকল্প হতে পারে·না, তাই, অনুভূতি ক্রমশই টেনে নিয়ে যায় পিছনে। না নিচে? মুখ থুবড়ে পড়ার উপায় থাকলে সে হয়তো নিচেই ভাবত, পারত পতনের পরিমাপ করতে। পারে না বলেই আরো অসহায় লাগে নিজেকে। কলেজের ছেলেদের নিয়ে একদিন এক্স্কারসানে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ কাকতাড়ুয়া দেখে হঠাৎই থেমে পড়েছিল ব্রতীন। দৃশ্যটা মনে আছে। বীরত্বব্যঞ্জক তার শারীরিক তেজ সত্ত্বেও মাথার ওপর একটা কাক বসে চিৎকার করে যাচ্ছে তারস্বরে। 'মকারি', অস্ফুটে বলেছিল সে; আর কেউ শোনেনি।

অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ার আগে আজ অনেক দিন পরে আবার ফিরে এসেছিল দৃশ্যটা। পাশে আহামরি। পাশ ফেরা। মেপে না দেখলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না তফাতটা ছ' ইঞ্চির কম নয়। ইচ্ছে মতন বাড়িয়েও নেওয়া যায়। সেটা সমস্যা নয়। আসলে আহামরির এই পাশ ফেরার ব্যাপার নিয়েও একটা তারতম্য কবে যেন ঘটে গেছে। আগে

আগে—বিয়ের পরে এবং তারও পরে অনেক দিন পর্যন্ত, আহামরির পাশ ফেরার গতিটা ছিল তার দিকে। গতির মধ্যেও ছিল উৎসুক তৎপরতা। এমনকি অনেক দিন ভোরে উঠেও আচ্ছন্নতার মধ্যে আহামরির লেগে-থাকা ভঙ্গিটা টের পেত ব্রতীন। এখন গতিটা উল্টো দিকে: এখন যা-কিছু ঘটে সবই জানাশোনার মধ্যে। যা ঘটে তা ঘ'টে যাবার পর অনেকগুলো এলোমেলো ভাবনা ঠেসে ধরে একসঙ্গে—আচম্বিতে ঝড় আসার মতো, মনে হয় জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলো আল্‌গা ছিল সব। কিছুক্ষণ ধরে গড়ে তোলা একতাকে আর কিছুতেই জড়ো করতে পারে না।

আগে আগে অবশ্য এসব চিন্তার সুযোগই ছিল না। এখন ভাবে বলেই মনে পড়ে। আহামরি কী ভাবে না ভাবে কে বলবে! তবে, খুব সতর্ক হয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারে ব্রতীন, এখনকার মতো আর কখনোই তার মন জুড়ে ছিল না আহামরি।

আচ্ছন্নতার মধ্যে ঘুম ভাঙলেও স্বপ্নের ঘোর কাটে না। একটু বিরক্তও হলো ব্রতীন।

'তোমার টেলিফোন—'

'কে?'

'জানি না। খবর পাঠিয়েছে ওপর থেকে—'

'বলে দাও নেই—'

বলল, তবে উঠে বসল। চোখে চোখে অল্প তাকিয়ে আহামরি বলল, 'কে করছে না জেনেই!'

একটু আগেই ব্রতীন তার শরীরে ঢুকেছে। অভিজ্ঞতাটা ভুলে যাচ্ছে ক্রমশ। ঠোঁটের কোণায় অল্প হাসি, সম্ভবত একেও চেনে ব্রতীন। বিপন্নতা থেকে আস্তে আস্তে টেনে তুলছে

পায়ে স্লিপার গলিয়ে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে ব্রতীন টের পেল সন্ধে হয়ে গেছে, কারণ ঘরের মধ্যে আলো জ্বালা। তার মানে সে ঘুমিয়েছে ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশি। এই সময়টা আহামরি কী করছিল জানা নেই। ইতিমধ্যে আর একটা শাড়ি বদলেছে এবং রঙ মিলিয়ে টিপ পরেছে কপালে। স্বাভাবিক। কস্তুরী, দীপঙ্কররা আসবে বা আসতে পারে এটা সে আগেই বলেছিল। নৃসিংহ সম্পর্কে পাল্‌টা খবরটা ইচ্ছে করেই চেপে গেছে ব্রতীন। বলবে সময়মতো। বেগুনি টিপের পরিপ্রেক্ষিতে আরো উজ্জ্বল ও সাদা হয়ে আছে আহামরির কপাল—যেটা, প্রকৃতপক্ষে তার উরুর রঙ। একটা সময় ছিল যখন আহামরি অনায়াসে নির্লজ্জ হতে পারত, ব্রতীনও সময় অসময় মানত না। 'দিনে এতোবার শাড়ি বদলাতে হলে ক'টা শাড়ির দরকার ভেবে দেখেছো,' বলেছিল আহামরি। কথাটায় বিস্তর মজা পেয়েছিল ব্রতীন—অনেক, অনেক দিন আগে। বিশেষ কোনো কারণে নয়, আহামরিকে কিছু দিতে পারার ইচ্ছে থেকেই অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে তখন আনন্দ পেত চমৎকার। একটার জায়গায় দুটো, দুটোর জায়গায় তিনটে টিউসান নিতেও পিছুপা হয়নি। এক-একটা সিজিনে হাজার তিন-চার খাতা দেখার ঝক্কি সহজেই সামলাত।

এখন যে-কোনো উদ্যমেই টের পায় মরচে পড়ার গন্ধ। কিছুরই কোনো মানে নেই, এই বিশ্বাস থেকে সে যখন-তখন জোর দিয়ে উচ্চারণ করে 'কী হবে' কথাটা—বাড়িতে কিংবা বাইরে, প্রায় যে-কোনো প্রসঙ্গে।

মিস্টার বসের ফ্ল্যাট ওপরে। টেলিফোনটা সেখানে। ভদ্রলোক কন্ট্রাক্টর, মাটি কেটে আর রাস্তা বানিয়ে উপার্জন ভালো। ওপরে কেতাদুরস্ত হলেও নিজের সম্পর্কে কমপ্লেক্স

আছে কিছুটা ; সেটা পুষিয়ে দেন সৌজন্য দিয়ে। গোড়া থেকেই লক্ষ করেছে ব্রতীন, বল-পরিবার তাদের প্রতি বেশ সহৃদয়। দুই ছেলের একটিকে পড়াচ্ছেন দার্জিলিংয়ের কনভেন্টে। ছোটটি ছোট, এখানেই থাকে। কাজকর্মে প্রায়ই বাইরে যেতে হয় ভদ্রলোককে, তখন খোঁজখবর নেওয়ার দায় ব্রতীনের। এক টেলিফোন না এলে ওপর নিচের বিনিময়ের কাজটুকু আহামরিই সারে।

দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকেই মিসেস বলের মুখোমুখি হলো ব্রতীন।

'ঘুমুচ্ছিলেন বোধ হয় ?'

'হ্যাঁ—'

'দেখুন ছেড়ে দিল কি না !'

ব্রতীন একটু বিব্রত বোধ করল। খবর দেওয়া এবং তার আসা, এই দুই কাজের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সময় গেছে। সে প্রথমে 'সরি' বলল, তারপর, অস্বস্তি কাটানোর জন্যে, 'আপনি এখানে—'

'চাকরটা রান্নায়। দেরি দেখে ভাবছিলাম নিজেই যাবো কি না আবার—'

ব্রতীন আবার 'সরি' বলল। এই ধরনের চেহারায় বয়স ধরা যায় না। গ্রাম্যতা ও রূপ একসঙ্গে মিশে একটা থমকানো ভাব এনেছে গঠনে, ঠিক যেখানে যেটুকু দরকার তার বেশি নয়। বড়ো কর্কশ চেহারা ও মাথায় টাক নিয়ে মিস্টার বল পাশে দাঁড়ালে মনে হয় মধ্যবয়সী, অথচ, একা থাকলে, সদ্য কৈশোর-পেরুনোর লাবণ্য হঠাৎই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নাকে সবুজ পাথরের নাকছাবি—সেদিকে লক্ষ রেখে ব্রতীন রিসিভার তুলল।

'প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে আছি—'

ওদিকের কণ্ঠস্বর আচমকা অস্থির করে তুলল ব্রতীনকে। টেলিফোনটা প্যাসেজে হলেও ঘরে বসে তার গলা শুনতে পাচ্ছে মিসেস বল। শব্দ আড়াল করার জন্যে পিছন ঘুরে দাঁড়াল ব্রতীন। একবার শুরু করলে সহজে ছাড়তে চায় না তৃণা। এখন কিছুক্ষণের জন্যে স্বরসংকোচের চেষ্টা চালাতে হবে তাকে।

'হ্যাঁ, বলো। আমি ঘুমোচ্ছিলাম—আসতে দেরি হলো—'

'সারা দিন এতো ঘুমোন কেন বলুন তো ?'

'এই, এমনি আর কি ! আজ একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়েছে।'

'বেশ আছেন। তাড়াতাড়ি ছুটি, বাড়িতে সুন্দরী বউ, মেঘলা দিন···। নিজে ঘুমোলেন, না বউদি ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ?'

অল্প নড়ে দাঁড়াল ব্রতীন। তৃণা এখন প্রগল্‌ভ হবে এবং সহজে ছাড়বে না। ব্রতীনকে ব্রতীনদা বলার সূত্রে আলাপের আগে থেকেই আহামরি তার কাছে বউদি। দেখেছে বার দুয়েকের বেশি নয়। সুন্দরী কথাটা সংযোজন। তৃণাকে স্যাম্পল হিসেবে ধরলে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে যে মেয়ে যতো সচেতন, অন্যকে সুন্দরী বলায় তার আগ্রহও ততো বেশি। অসুবিধে হলো, মিসেস বল নিশ্চিত কান পেতে আছে এদিকে। মাপা কথার বাইরে সে একটি শব্দও ব্যবহার করতে পারবে না।

'হ্যাঁ, বলো আর কী খবর ?'

'কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন ? বউদি পাশে আছেন ?'

'না, আমি অ্যালোন—', শেষের কথাটা প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করল ব্রতীন।

'মানে বাংলায় যাকে বলে একা ?'

'হুঁ।'

তৃণা হাসছে, অফুরন্ত হাসি। পাতলা কাচের বাসন গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ এখানে অপরিণত লাগে। দূরত্ব প্রায় মাইল তিনেক হলেও টেলিফোনের ভিতর দিয়ে তার ছোঁয়া পরিষ্কার অনুভব করতে পারে ব্রতীন। টোল পড়ছে তৃণার গালে—হয় সে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে পিছন দিকে, না হয় ঝুঁকে এসেছে সামনে। একদিন পড়ার টেবিলে, বইয়ের খোলা পাতার বিভিন্ন অক্ষরের ওপর দিয়ে পিঁপড়ের মতো ছুটে গিয়েছিল তৃণার নিঃশ্বাস,দেখেছিল ব্রতীন ; আলোর তারতম্যের জন্যেই হোক বা আর যে-কোনো কারণে, দৃশ্যটা এড়ানো যায়নি। উদ্দেশ্য হারিয়ে সে যখন তাকিয়ে আছে পলকহীন, তৃণা বলল, 'কী দেখছেন! আজই নতুন পরলাম।' আলতো হেসে শাড়ির আঁচলটা গুঁজে দিয়েছিল খাঁজে। সেদিন ক্রমাগত ভেবে গিয়েছিল ব্রতীন, ওইখানে খাঁজ আছে এবং তৃণা নিতান্তই ছাত্রী নয়—নিজেকে চেনাতে চায় পুরোপুরি।

কিন্তু আজ সে ক্লান্ত। আজ সে আলাদা কোনো আকর্ষণ বোধ করছে না। তাড়াতাড়ি করার জন্যে বলল, 'কী বলবে বলো ?'

'খুব ব্যস্ত বুঝি ?'

'অল্প। বলো—'

'কাল সুব্রত আসছে—', তৃণা কথাটা শেষ করল না।

ব্রতীন বলল, 'বেশ তো, কাল আমি আসব না। সুব্রত কি এখন থাকবে ?'

'না, না। মোটে দু' দিনের জন্যে। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে ভাববেন না। অফিসের কাজেই আসছে।'

'ঠিক আছে। আমি তা হলে দু' দিন বাদ দিয়ে যাবো।'

ফোন ছেড়ে দিল। তৃণা ক্ষুব্ধ হবে, হয়তো সে আরো কিছু বলত। হাসত আরো অনেকক্ষণ ধরে। গত ছ' সাত মাসে এটুকু অধিকার সে অর্জন করেছে। বস্তুত, মাসান্তে তার নাম টাইপ-করা সাদা খামটা হাতে এসে পৌঁছুনোর সময় ছাড়া আর কোনো সময়েই সঠিকভাবে মনে পড়ে না ব্রতীনের তৃণা তার ছাত্রী। আগে আগে খুশি হতো ব্রতীন, কিন্তু এখন সাদা খামটা হাতে নিয়ে অল্প দুর্বল বোধ করে সে, কিছুটা অসহায়। সুবিধে এইটুকু, খামটা আসে তৃণার অগোচরে, পিওনের মারফত বাড়িতে। খাম না খুলেই বুঝতে পারে ব্রতীন কী আছে ভিতরে—তিনটে বড়ো নোট, ঝকঝকে ও নতুন, তাদের নম্বরগুলিও পরপর। আজ পর্যন্ত এই নিয়মের হেরফের ঘটেনি কখনো। দু'তিনবার দেখার পর আজকাল সে আর খুলে দেখে না, খামটা সোজা তুলে দেয় আহামরির হাতে।

এক হিসেবে ফোনে কিংবা সামনে উচ্ছল হবার জন্যে তৃণা দাম দিয়ে যাচ্ছে পুরোপুরি—ব্রতীনেরও চুপচাপ সহ্য করে যাওয়ার কথা। তিনশো টাকার জন্যে কৃতজ্ঞতা বোধ করা ছাড়াও এর মধ্যে আছে আরো কিছু। সত্যি বলতে, যেভাবে ও হঠাৎ প্রসঙ্গ শেষ করে ফোনটা রেখে দিল তাতে নিজেরই খারাপ লাগছে এখন। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে শুনতে ভালোবাসে এবং অন্য পক্ষ শেষ না করা পর্যন্ত শুনেও যায়। একটার পর একটা কথা ছাড়িয়ে যায় পরস্পরকে, তখনো প্রত্যাশা উন্মুখ করে রাখে তাকে—সর্বত্র—বিশেষত সে যদি তৃণা হয়। আজ অন্য রকম হলো। তৃণা কী ভাববে।

কথা শেষ হবার পরও অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ব্রতীন। যা বলল তার পরেও আর কী বলত বা বলতে পারত তৃণা, ভাববার চেষ্টা করল। তেমন করে মনে পড়ল

না কিছু। একেবারে নিজের আড়াল থেকে উঠে এলে কথা ছিল, কিন্তু এতোক্ষণ সে কথা বলছিল তৃণার কথার উত্তরে—খেই হারানো থেকে খানিকটা ভোঁতা লাগে নিজেকে।

তার কথা শেষ হলেও মিসেস বলের ভঙ্গি থেকে কান-পাতার আড়ষ্টতা যায়নি। ব্রতীন বেরিয়ে আসতেই তৈরি গলায় বলল, 'গার্লফ্রেণ্ড বুঝি ?'

সবুজ পাথরের নাকছাবিতে চিকচিক করছে আলো। বান্ধবী কথাটা এদের মুখে আসবে না।

ব্রতীন বলল, 'না, ছাত্রী।'

'অতো বড়ো মেয়ে কখনো ছাত্রী হয়!' সোফা থেকে পিঠটা তুলে নিল মিসেস বল, 'আমি তো দেখেছি—যেদিন এসেছিল—'

মেয়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে, কথাটা আহামরির। সম্ভবত পারে। তৃণা নিশ্চিত নাম বলেনি, কিংবা বললেও, মিসেস বলের বর্ণনামতো এতোটা পরিষ্কার করেনি নিজেকে। তবু উহ্য থাকেনি। ব্যাকগ্রাউণ্ড অনেক সময় অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়। চোদ্দ বছরে বিয়ে হলে এবং কুড়ির মধ্যে দু'টি সন্তানের মা হলে তেইশ-চব্বিশের কোনো মেয়েকে ছাত্রী বলে মনে হবে না।

ব্রতীন বলল, 'ছাত্রীই—'

'ভয় পাচ্ছেন কেন! এতো যে ফোন আসে, আপনার স্ত্রীকে কিছুই বলি না—'

'ব্যাপারটা গোপন নয়।' ব্রতীন এবার হাসল, 'বান্ধবী হলেও নয়—'

'চলে যাচ্ছেন!'

'হ্যাঁ—'

'চা হচ্ছিল—', হঠাৎ কথাটা বলেই নিজেকে গুটিয়ে নিল মিসেস বল। হাতের উল্টোপিঠটা ঘষে নিল নাকছাবির ওপর।

অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম লক্ষ করল ব্রতীন : বিছানা ছেড়ে যেমন-কে-তেমন উঠে এসেছে সে। চোখে এখনো লেগে আছে ঘুম-ভাঙার অস্বস্তি। সামনে মিসেস বল, একটি কথার জের সামলাতেই লাবণ্য জুড়ে ছায়া ছড়িয়েছে মুখে। সম্ভবত আমন্ত্রণটা ফিরিয়ে নেবে। তার আগেই তার চলে যাওয়া উচিত।

'এখন থাক, একটু তাড়া আছে।'

মিসেস বল ঘাড় নাড়ল, মুখ তুলল না। মাথায় টাক, বড়োসড়ো চেহারার একটি লোক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে : যাবার আগে ব্রতীন বলল, 'চলি—'

সিঁড়িগুলো অন্ধকার। ওপরে আসার সময় এতোটা মনে হয়নি, তখনো ছিটেফোঁটা আলো ছিল। আন্দাজে স্যুইচটার দিকে হাত বাড়াল সে, জ্বলল না। সম্ভবত ফিউজ হয়ে আছে। অন্ধকার চোখ-সওয়া হয়ে গেলে হঠাৎই এক ধরনের থ্রিল অনুভব করল ব্রতীন—সংস্পর্শের : রেলিংয়ের সঙ্গে হাতের, পায়ের সঙ্গে সিঁড়ির, ক্রমশ নেমে যাওয়ার এবং নৈঃশব্দ্যের। ভালো হতো যদি দৃশ্য না থাকত—অকারণে, প্রায়-অবসাদের মধ্যে ভাবল সে, যদি চেনা না যেত অভিব্যক্তি, আড়াল হয়ে যেত কথা—যদি শুধুই স্পর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত সম্পর্কগুলো। কেন এমন মনে হলো নিজের কাছেই তার কোনো সদুত্তর নেই। এটা বয়স বাড়ার লক্ষণ হতে পারে। এমনও হতে পারে ক্লান্তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা অসম্ভব ভাবনার মধ্যে। ভাবনাটা ধরা পড়ছে ঠিক ঠিক, কারণগুলো নয়।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সোজা বেসিনে মুখ ধুতে গেল ব্রতীন। ট্যাপটা খুলে আঁজলা ভর্তি

জল নিয়ে খানিকক্ষণ চেপে রাখার চেষ্টা করল চোখে। জলহাত বুলিয়ে নিল মাথায় ও ঘাড়ে। কাছেই কোথাও শব্দ বাজছে ঘড়িতে। সাতটা ; রাত হতে, কিংবা আবার বিছানায় ফিরে যেতে এখনো চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরি। ইতিমধ্যে কেউ কেউ আসতে পারে। যদি না আসে তা হলে তাকে সময় কাটানোর উপলক্ষ ভাবতে হবে। অনেক দিন কিছু নিয়ে বসা হয় না। আধ বোতলটাক ব্র্যানড্রি অনেক দিন ধরে পড়ে আছে আলমারির কোণে, সেটা শেষ করা যেতে পারে—ঘুম আসবে তাড়াতাড়ি। কিংবা রেডিও-টক্‌টা নিয়েও ভাবতে পারে।

'এতোক্ষণ ধরে কার সঙ্গে কথা বললে ?'

তোয়ালেটা টেনে এনে ব্রতীনের হাতে তুলে দিল আহামরি। ব্রতীন সময় নিল, ঘাড়-মুখ মুছল ভালো করে। তারপর, আহামরিকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'এতোক্ষণ, মানে কতোক্ষণ ?'

'ঘড়ি দেখিনি। দেরি হচ্ছে তাই দেখলাম।'

শোবার ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে আহামরি। ওকে অনুসরণ করতে করতে ব্রতীন বলল, 'নৃসিংহ—'

'কলেজে দেখা হয়নি ?'

'হয়েছিল—। কেন।'

'না। আমি ভাবলাম কস্তুরীরা ; হয়তো আসতে পারছে না। চাল নিতে গিয়েও নিলাম না।'

'খেতে বলেছ ?'

খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছিল আহামরি। জবাব না দিয়ে হঠাৎই চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের দিকে।

'অনেক দিন খায়নি।'

আকাশ থমকে থাকলেও গরম যে খুব বেশি তা নয়। অবশ্য, সদ্য মুখ ধোয়ার পর তার নিজের একটু অন্য রকমও মনে হতে পারে। ব্যস্ত হাতে গলায় বুকে পাউডার বুলোচ্ছে আহামরি ; প্রায় আয়না জুড়ে দেখা যাচ্ছে তাকে। ব্রতীন বুঝতে পারে না আজকাল প্রায় সময়েই তাকে অতো দূরের বলে মনে হয় কেন!

'তা হলে একটু বেশি করেই নিও। নৃসিংহও খেয়ে যাবে।'

'বলল ?'

'ঠিক বলেনি, তবে—'

দু' আঙুলে চামড়া টেনে চোখের কোল পরীক্ষা করছে আহামরি। ফোনটা যে নৃসিংহেরই ছিল, কথা শুনে মনে হয় আহামরি তা বিশ্বাস করেছে। একটা মিথ্যা থেকে এখন অনায়াসে সে আর একটা মিথ্যায় চলে যেতে পারে। যতো দূর মনে হয় মিসেস বল কোনো দিনই আহামরির ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করবে না। যদি করে, যদি—, ভাবনাটাকে পাশ কাটাতে একটু এগিয়ে গিয়ে খুব কাছ থেকে আহামরিকে দেখার চেষ্টা করল ব্রতীন। এখন তারা পাশাপাশি, পাউডারের গন্ধের সঙ্গে আহামরির শরীরের গন্ধ মিশে একটা অদ্ভুত সুবাস লাগছে নাকে। ব্রতীন ওর পিঠের পুরু মাংসে হাত রাখল।

'সরো—' আহামরি নিজেই সরে গেল। অল্প বিরক্ত। বলল, 'বাড়িতে কিছু নেই। এরপর কী করবে ভেবে দ্যাখো—'

'বলো, আমি যাই ? এখন মোটে সাতটা ।'

'তার মানে সারা সন্ধেটা রান্না করে কাটাই !'

আহামরি চলে গেল । সম্ভবত রান্নার দিকেই ; এখন কথার পিঠে কথা সাজিয়ে নাড়াচাড়া করলে খারাপ হবে । সাধারণত চাপা স্বভাবের আহামরি তার ব্যবহারে খুঁত খুঁজতে পারে । আপাতত সে-রকম কিছু সমীচীন হবে না ।

একা দাঁড়িয়ে হঠাৎই নিজের মধ্যে একটা ফাঁকা ভাব ঘনিয়ে আসছে টের পেল ব্রতীন । এ-রকম হয় মাঝে মাঝে, অস্পষ্টতা থেকে ক্রমশ আরো দূরে চলে যায় আহামরি, ভোর রাতের ঘুমে আকস্মিক বৃষ্টির শব্দে জেগে ওঠার মতো আশেপাশের সব কিছুই নিয়ে আসে রহস্যময়তা—মনে হয় জানাশোনার আড়ালে ঘটে যাচ্ছে অনিবার্য কিছু যার অভিঘাত সে এড়াতে পারবে না । এর চেয়ে আহামরি একটু সরব হলে ভালো হতো । তা হলে, সম্ভবত, নিজেকে আর একটু ছাড়িয়ে যেতে পারত ব্রতীন ।

বাজারের থলি হাতে রাস্তায় বেরিয়েও একই চিন্তা জড়িয়ে থাকল তার পায়ে । খুব যে দরকার ছিল তা নয় ; তবু আহামরিকে রান্নায় ব্যস্ত রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও একটা কাজের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করল ব্রতীন । এটাকে অজুহাত বলা যেতে পারে—'স্বার্থপর' কথাটা চট করে মুখে আনতে পারবে না আহামরি । কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এটাও না ভেবে পারল না ব্রতীন, তৃণা নৃসিংহ নয়—আহামরির কাছে তৃণাকে নৃসিংহে রূপান্তরিত করার খুবই কি প্রয়োজন ছিল !

নিজের মনেই ক্রমশ অন্যমনস্ক হতে থাকে ব্রতীন । সামনে, পিছনে, পাশে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে কলকাতা, শব্দ আর আলোয় ধরা পড়ে বিভিন্ন তৎপরতা, নিঃশব্দ চাঞ্চল্যের মধ্যে, ঘুমের মধ্যে হেঁটে যাওয়ার একটা অর্থ খুঁজে পায় সে—সত্যিই সে এমন হয়ে যাচ্ছে কেন, ভাবে, এমন অন্যমনস্ক, যে-কোনো প্রসঙ্গে এতোখানি বিব্রত, নিজের বিষয়ে এতোখানি স্পর্শকাতর ! নিজেকে কি হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ, নাকি আহামরিকে ? পিঁপড়ের জল সেঁচার মতো একটিই ভাবনা বৃত্ত টেনে দেয় তার চারপাশে । বেরুতে পারে না ।

দরজা খুলল আহামরি । ভিতরে ঢোকার আগে এতোক্ষণের ধরে রাখা নিঃশ্বাসটাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল ব্রতীন ।

'এতো দেরি ?'

'দেরি ! কই, না তো !' ঘড়ি দেখতে গিয়েও দেখল না ব্রতীন । পোড়া সিগারের গন্ধ লাগছে নাকে । খালি বুকের ভিতর গন্ধটাকে পুরোপুরি আসতে দিল ।

'কে ?'

'তোমার বন্ধু—'

আহামরি চলে যাচ্ছে । সামান্য যা কিছু এনেছে তাতে দু' একটা পদ তৈরি করে নিতে বেশিক্ষণ লাগবে না । মনে পড়ল সে বাজারে গিয়েছিল, স্বার্থপরতা এড়াতে—যেটা না করলেও চলত । নৃসিংহ এসেছে তার যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যে । এখানেও তার ক্যালকুলেসানে ভুল হয়ে গেছে একটু । কেন জানে না, সে ভেবেছিল কস্তুরীরাই আগে আসবে ।

এখন তার স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত । তবু, ঘরে ঢোকার আগে অল্প ইতস্তত করল ব্রতীন । একটা ব্যাপার এখনই তার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গেল, নিজেকে সে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে না । তৃণাকে আড়াল করার জন্যে খুব সহজেই আমদানি

করেছিল নৃসিংহকে, অথচ, তারও আগে, কলেজে, আহামরিকে আড়াল করার কথাটা আদৌ ভাবেনি। ইচ্ছে করলেই একটা কিছু বলে এড়িয়ে যাওয়া যেত নৃসিংহকে। এমন নয় যে প্রতি সন্ধ্যাতেই তারা বাড়িতে থাকে ; সিনেমা-থিয়েটারও প্রায়ই চলে। অন্তত কথাচ্ছলেও আজ এড়িয়ে যাওয়া যেত নৃসিংহকে। কস্তুরীরা আসবে, সন্ধ্যায় আহামরির ধরন-ধারন দেখে মনে হয়েছিল আজই নৃসিংহের আসাটাকে সেও খুব ভালো চোখে দেখেনি। আফটার অল, কস্তুরীরা ঘরের লোক, আসছেও অনেক দিন পরে—নৃসিংহের সামনে তারা অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

এখন ওসব ভেবে লাভ নেই কোনো। মুখে হাসি টেনে ব্রতীন জিজ্ঞেস করল, 'কতোক্ষণ ?'

'মিনিট দশেক।' খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে নৃসিংহ বলল, 'ব্যাপার কী, অসময়ে বাজার!'

দশ মিনিট অনেকটা সময়। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ব্রতীন বলল, 'এতো তাড়াতাড়ি এক্সপেক্ট্ করিনি তোমাকে।'

'তাও তো ভবানীপুর থেকে হেঁটে এলাম।' কাগজটা মুড়ে রেখে সিগারের শেষাংশ অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল নৃসিংহ, 'আজ রমেনকে খুব কায়দা করা গেল না।'

চামড়ার পুরনো ব্যাগটা ছোটখাট একটা কুকুরের মতো পায়ের কাছে পড়ে আছে চুপচাপ। এখন তাকালে বোঝা যায় না এককালে কীরকম ছিল। প্রায় বারো বছর ধরে ওটা ব্যবহার করছে নৃসিংহ, বলেছিল একদিন, চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই। শেপ্‌লেস ফর্ম, ব্রতীনের প্রায়ই বিসদৃশ লাগে। একদিন ব্যঙ্গও করেছিল। নৃসিংহ দমেনি। 'নাড়াচাড়া করার মতো ওই একটা জিনিসই আছে আমার', বলেছিল, 'মেক্সিকান লেদার। বারো বছর ধরে সব রকম ধকল সহ্য করছে আমার। ফেলব বললেই কি ফেলা যায়! কেমন একটা অ্যাটাচমেণ্ট গ্রো করে গেছে—', লেদার আর অ্যাটাচমেণ্ট কথা দুটো থেকে সেদিনকার আলোচনা গড়িয়েছিল অনেক দূর। অমলেশ চক্রবর্তী রাশভারী মানুষ, আলোচনার তোড়ে তিনিও বেরিয়ে এসেছিলেন খোলস ছেড়ে : 'অতো মেক্সিকান লেদার দেখিও না, ভাই। আমাদের ইণ্ডিয়ান লেদারও কম ধকল সয় না। বিয়ে থা করো, বুঝবে!'

ব্যাগটা এখন নৃসিংহের কোলে। মুখ খুলে খুঁজছে কিছু। পুরনো ঘটনা থেকে নিজেকে বের করে আনল ব্রতীন।

'তা হলে বিকেলটা বেকারই গেল—'

'খুব না। এক পেগের ওপরেই সারতে হলো।' ব্যাগটা আবার মেঝেয় নামিয়ে রেখে নৃসিংহ বলল, 'রমেন চলে গেল সোমেশ মুখুজ্জেকে নতুন নভেলের বায়না দিতে। এক বোতল কিনে নিলাম।'

ব্রতীনের চুপচাপ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল নৃসিংহ।

'হবে নাকি ?'

'এখন না।' তাড়াহুড়ো করে বলল ব্রতীন, 'আজ আমার শ্যালিকার আসার কথা, আজ থাক—'

'শ্যালিকা! আহামরির বোন ? পিউরিটান নাকি ?'

'না, না—'

'তবে ? দীক্ষা নিয়েছে ?'

'সে-রকম কিছু নয়। জাস্ট এমনি।'

ব্রতীন এইভাবেই শেষ করল। নৃসিংহ জের টানতে পারে, এটা সে লক্ষ করছে আজ নয়, বহু দিন ধরে। পরিচয়ের প্রায় শুরু থেকেই। অনেক সময় বিরক্তি লাগে ; অনেক সময়—বিশেষত মেজাজ যখন যাহোক-কিছু গ্রহণ করার জন্যে রপ্ত হয়ে থাকে, খারাপ লাগে না। এখন ঠিক কোন সময় বুঝতে অসুবিধে হলো ব্রতীনের। মাত্র এক পেগ নৃসিংহের কাছে জল। সঙ্গে বোতল নিয়ে এসেছে ; হয়তো ইচ্ছে করেই আজ একটু বেসামাল হবার চেষ্টা করবে। ব্যাপারটা অনুমান করে গায়ে কাঁটা দিল। মুগডালে ঘি ছড়ানোর পর চমৎকার গন্ধ আসছে ভিতর থেকে। গন্ধটা চাউর হবার আগেই চাপা পড়ে গেল। নতুন একটা সিগার ধরিয়েছে নৃসিংহ। হয়তো আবার শুরু করত ; আহামরি ঘরে আসায় গুটিয়ে নিল নিজেকে।

'চা খাবেন ?'

'চা !' আড়ে তাকিয়ে নৃসিংহ বলল, 'চা ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পার না !'

'অতো বুঝি না ! খাবেন তো বলুন, না হলে এখনই উনুন জোড়া হবে—'

রান্নাঘর থেকে আসার জন্যেই সম্ভবত কপালে চিকচিকে ঘাম নিয়ে এসেছে আহামরি, সিঁথির কোণায় নরম হয়ে এসেছে সিঁদুরের দাগ। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ধাতস্থ নয়। নৃসিংহের ওপর থেকে চোখ তুলে ব্রতীনকে দেখল।

'তুমি খাবে ?' তখন তো খেলে না—'

'দ্যাখো, অসুবিধে না হলে—'

বায়না করার ধরনে আহামরি বলল, 'দেখছেন কী, তাড়াতাড়ি বলুন !'

'তোমাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে, আহামরি ! যেন—', কথাটা ইচ্ছে করেই থামিয়ে দিল নৃসিংহ, উপমার অভাবে নয়। বড়ো সোফার মাঝখান থেকে সরে গেল কোণের দিকে। তারপর গোছানো গলায় বলল, 'স্বামীরা কখনো না বলে না। অতো ব্যস্ত হবার কী আছে ! বসে যাও একটু !'

আহামরি বসল না। ব্রতীন জানত, বসবে না। ওপর ওপর তাকিয়েই তবু ও বুঝতে পারল স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে আহামরির, চাপা ঘাম থেকে সরু জলের রেখা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে কানের দিকে। নৃসিংহ নয়, তার চোখ ব্রতীনেরই দিকে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হলো সে। যেতে যেতে বলল, 'ওরা আসতে দেরি করছে কেন !'

'এসে পড়বে এখুনি।' স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় বলল ব্রতীন, শোনার জন্যে আহামরি দাঁড়িয়ে নেই জেনেও।

নৃসিংহ উঠে দাঁড়িয়েছে। বাঁ দিকে দেওয়াল ঘেঁসে বইয়ের র‍্যাক, পাঠ্য অপাঠ্য ব্রতীনের বারো বছরের সমস্ত সংগ্রহ ওখানে। বেশি বই ধরানোর জন্যে আলাদা অর্ডার দিয়ে তৈরি করেছিল। লম্বায় নৃসিংহের মাথার সমান। যে-কোনো একটা বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে নৃসিংহ বলল, 'আজ তোমাদের গেস্ট আসবে জানলে আসতাম না—'

ব্রতীন হাসল, 'তাতে কী !' তারপর বলল, 'বসো, আসছি—'

দশ মিনিটে রূপের পরিবর্তন হয় না কোনো। এখন চমৎকার হয়ে থাকলে দশ মিনিট আগেও আহামরি তা ছিল। তখন ব্রতীন ছিল না। এমনকি, বাইরে থেকে ফিরেও ভালো করে আহামরিকে লক্ষ করার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। করলে, হয়তো, তখনই

আহামরির কপালে ঘাম টের পেত !

সে-জন্যে নয় ; ব্রতীন বিব্রত বোধ করল অন্য কারণে। বিকেল থেকে বাইরে বেরুনোর আগে পর্যন্ত একা বাড়িতে সে অনেকটা সময় পেয়েছিল—নৃসিংহের কথাগুলো সে নিজেই তখন বলতে পারত অনায়াসে। বলেনি। বেশি ব্যবহারে পুরনো হয়ে যায় কথাগুলো, আলস্য পেয়ে বসে, অর্থও যেন পাল্‌টে যায় কেমন। কথার ক্লান্তি ঢুকে পড়ে শরীরে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আহামরি এ-সবের অপেক্ষা করে কি না। এমনও হতে পারে, তার ও আহামরির দাম্পত্যের ভিতরের শীত ক্রমশ আঁচ করে নিচ্ছে নৃসিংহ। আজ একটা সুযোগ নিল।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খুব সন্তর্পণে পিছন থেকে আহামরিকে লক্ষ করল ব্রতীন। ভিতরে পাখা নেই, গ্যাসের উনুনে ছটফট করছে নীলবর্ণ শাঁস, তবু আহামরি যেন একটু বেশিই ঘামছে। নিজের মনে সচরাচর সে এতোখানি অন্যমনস্ক থাকে না। অবশ্য, ওরই মধ্যে ভাবল ব্রতীন, পায়ে প্যাড লাগিয়ে হাঁটাটাও তার পক্ষে নতুন।

সময় নিয়ে বলল, 'চা হয়ে গেছে ?'

'ও, তুমি !' আঁচল মুঠো করে গাল, গলা মুছে নিল আহামরি, 'দিচ্ছি—'

'না ভিজিয়ে থাকলে থাক।' দরজায় কলিং বেলের শব্দ শুনে ব্রতীন বলল, 'বরং কাজগুলো সেরে নাও তাড়াতাড়ি।'

'দ্যাখো তো, ওরা বোধ হয় এলো !'

একটু আগে চোখেমুখে জল দেওয়ার কথা ভেবেছিল ব্রতীন। কলিং বেলের শব্দে আকস্মিক ভার নেমে যাওয়ার অনুভূতি টের পেল ; সম্ভবত দরকার হবে না আর। দরজার দিকে এগোতে এগোতে দেখল আহামরিও আসছে। এখন নৃসিংহের কথা না ভাবলেও চলে।

'আরে, এসো, এসো— ।' এই স্বর ব্রতীনের নিজস্ব। একটুও খাদ না মিশিয়ে বলতে বলতে জায়গা ছেড়ে দিল ওদের, 'আরো আগেই তোমরা আসবে ভেবেছিলাম।'

'এমনভাবে বলছেন যেন সত্যিই ছটফট করছিলেন !' কস্তুরীই আগে ঢুকল, 'বাঃ, প্রিন্টটা ভারী সুন্দর তো। ছোড়দি, নতুন পর্দা করালি ?'

'তুই দেখিসনি আগে। অনেক দিন হয়ে গেল।'

'আসছিও তো অনেক দিন পরে।' দীপঙ্কর বলল, 'অবশ্য এর মধ্যে একদিন—'

'হ্যাঁ, আমরা সেদিন—'

'শুনেছি।' ব্রতীন শেষ করার আগেই কস্তুরী বলল, 'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন তো ! বেশ আছেন !'

'বলছ !'

ব্রতীন সংক্ষিপ্ত হলো। দরজায় দাঁড়িয়ে আলাপের পক্ষে প্রয়োজনেরও বেশি সময় ব্যয় করেছে তারা। প্যাসেজটা চওড়ায় ছোট বলেই আরো ভিড়াক্রান্ত লাগে। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে আহামরি, অন্য সময় হলে সম্ভবত আরো একটু চঞ্চল হতো। আহামরি শিশুকে নয় এ-কথা কেউ বলবে না। একটু আগেই মুঠোয় আঁচল চেপে গলার ঘাম মুছেছে। ওকে দেখেই মনে পড়ল, নৃসিংহ বসে আছে।

বসার ঘরের পর্দাটা নিজের হাতেই তুলে ধরল ব্রতীন। কস্তুরী ও দীপঙ্করকে পার করে দিয়ে নিজে এসে দাঁড়াল মাঝখানে।

'আলাপ করিয়ে দিই। কস্তুরী, দীপঙ্কর দত্ত। আর নৃসিংহ মজুমদার, আমার কোলিগ।' এ-পর্যন্ত বলে অল্প সহিষ্ণু হবার চেষ্টা করল ব্রতীন, 'ব্রিলিয়ান্ট স্কলার।'

'ওটা ব্রতীনের বাড়াবাড়ি।' নৃসিংহ আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। বসতে বসতে বলল, 'গুণ অবশ্য আমার আরো আছে। যেমন, ধরুন, আমি ব্যাচেলর, কমবেশি মদ্যপও।'

ব্রতীন হতচকিত হলেও নৃসিংহের কথায় কস্তুরী ও দীপঙ্কর দু'জনেই হাসল। হাসিতে শব্দ যোগ হতে ব্রতীনের খেয়াল হলো মাত্র কিছু দিন আগে ওরা ফিরেছে বিদেশ থেকে। কস্তুরীর শরীরের বাড়তি লাবণ্যটুকু আগেই লক্ষ করেছিল, এখন দেখল হাসিটাও মাপা। দীপঙ্কর অবশ্য বরাবরই সাহেব। ঠিক ঠিক ইংরিজি উচ্চারণ শেখার জন্যে আগে আগে খুব মন দিয়ে বি-বি-সি শুনত ; কথাটা কস্তুরীই একদিন ফাঁস করে দেয়। নতুন কোম্পানিতে চাকরি নেওয়ার পর এখন ঝোঁক পড়েছে আমেরিকান অ্যাকসেন্টের দিকে। ঈষৎ চিবিয়ে বলার ফলে শব্দগুলো এলিয়ে পড়ে গায়ে গায়ে।

আপাতত কস্তুরী থামলেও দীপঙ্কর থামল না। বুশ শার্টের পকেট থেকে ডানহিল বের করে বাড়িয়ে দিল নৃসিংহের দিকে।

'দেখছি আপনার সঙ্গে আমার বেশ মিল আছে। স্ত্রী সামনে আছে বলে ব্যাচেলর বলে জাহির করতে পারছি না, তবে—', লাইটারের আগুনটা নৃসিংহের দিক থেকে নিজের দিকে টেনে নিল দীপঙ্কর, 'মদ্যপানটা আমারও খুব মন্দ লাগে না।'

'বাইরে গিয়ে আরো বাড়িয়েছ।'

স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করে শূন্যে ধোঁয়া ছাড়ল দীপঙ্কর।

'পেটুকের ক্ষিদে বাড়লে সেটা নিউজ হয় না। তুমি যে ব্যাপটাইজড্ হলে সেটা বলেছ!'

'এই, খুব খারাপ হবে—'

বিয়ের দু' বছর পরেও স্ত্রীকে চকচকে রেখেছে দীপঙ্কর। এ-রকম হয় না, তবু, ওদের মাংসে এখনো চুম্বক লাগানো। তিরস্কারের ছলে যেভাবে দীপঙ্করকে ছুঁয়ে গেল কস্তুরী, তাতে এ-ছাড়া অন্য কিছু মনে হলো না ব্রতীনের। নতুন নেকলাইন দেখা দিয়েছে কস্তুরীর, মেদ ঝরে গেছে অনেকটা, লাবণ্য বলতে ত্বকের মসৃণতাই চোখ টানে বেশি। সত্যিই প্লাস্টার অফ প্যারিস কি না বুঝবার জন্যে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কোমরের অনাবৃত অংশ। আহামরি কি কোনো দিনই এ-রকম ছিল? ভাবতে গিয়ে দিশেহারা বোধ করল ব্রতীন। শুরুটা মনে আছে ; আর, ইদানীং তো সে বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। মাঝখানের প্রায় সবটাই হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা চড়ার মতো, পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঢেউগুলো চলে যায় আশপাশ দিয়ে।

ইতিমধ্যে হাসির কী কারণ ঘটল ব্রতীন বুঝল না। যে যেভাবে বসে আছে তাতে ওদের তিনজনকে নিয়ে একটা ত্রিভুজ টানা যায়। সে বাইরে ; মোড়া টেনে বসেছে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। বড়ো সোফায় নৃসিংহের পাশে অনেকটা জায়গা খালি পড়ে আছে। এখন আহামরি এ-ঘরে এলে এবং বসতে চাইলে নিশ্চিত দ্বিতীয় মোড়াটা খুঁজে নেবে না। খুন্তি নাড়ার শব্দ পেল রান্নাঘর থেকে, সম্ভবত আর-একটা পদ শেষ করল আহামরি। শব্দটায় কান পেতে রেখে, কী ভেবে, মোড়া ছেড়ে নৃসিংহের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় উঠে গেল ব্রতীন।

স্থান পরিবর্তনের এই দৃশ্য কেউই যে খুব খেয়াল করল মনে হলো না। সিগারেটটা দু' আঙুলে টিপে ধরে নৃসিংহ বলল, 'এতোই যখন মিল, তখন সন্ধেটা বোধ হয় আমরা

সেলিব্রেট করতে পারি।'

'বাই অল মিন্‌স্‌। কী বলেন, ব্রতীনদা?' দীপঙ্কর বলল, 'শ্যাল উই মুভ্‌ আউট?'

'কেন?'

'ও মা, আপনি বুঝি কিছুই শুনছেন না!' কস্তুরী বলল। তারপরেই, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, 'ছোড়দি, তুই কী করছিস বল তো?'

'আসছি—হয়ে গেছে—'

'হোস্টের পারমিসান পেলেই হয়। বাইরে যাবার দরকার কী!' ব্যস্ত হাতে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে ব্যাগ খুঁড়ে বোতলটা টেনে বের করল নৃসিংহ। হাতটা শূন্যে তুলে বলল, 'বান্দা হাজির।'

'ব্রেভো!' হাত বাড়িয়ে বোতলটা টেনে নিল দীপঙ্কর, 'হুইস্কি! না মশাই, হার মানলাম আপনার কাছে। এটা রিয়েল সারপ্রাইজ! নাকি ব্রতীনদারই প্ল্যান?'

'না, না, আমার নয়।' নৃসিংহের প্রতি রাগে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল ব্রতীনের। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা হঠাৎ-কিছুর ফল নয়, জেনেশুনেই অস্বস্তিতে ফেলা হলো তাকে। বোতল বেরিয়ে গেছে, এখন ফেরা মানেই সিন ক্রিয়েট করা। সেটা খারাপ হবে, বিশেষত দীপঙ্করের—এবং মনে হয় কস্তুরীরও—যখন সায় আছে। রাগটা হজম করে বলল, 'আমার হলে কি ঝুড়ি থেকে বেড়াল বের করার মতো বোতল বেরুত! ওটা নৃসিংহেরই কারসাজি।' বলেই অবশ্য সামলে নিল, 'ম্যাজিকও বলতে পার।'

'এতো হাসাহাসির কারণ কী শুনি!'

আহামরি ফিরে এসেছে। খানিক আগেকার বিব্রত ভঙ্গিটুকু এখন আর নেই, বরং বেশ ফিটফাট, সদ্য চিরুনি-চালানো চুল সমগ্র মুখে এনেছে পরিপাটি ভাব। দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করালে মুখের ডৌলে মিল পাওয়া যাবে। আর কিছুতে নয়। মেদে মাংসে দৈর্ঘ্যে আহামরি বোধ হয় আরো বেশি আকর্ষণীয়।

'পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা শুনবেন না, অ্যাকসান প্ল্যানে সাহায্য করবেন।' হুইস্কির বোতলটা তুলে ধরল দীপঙ্কর, 'ক'টা গ্লাস বের করুন, ছোড়দি, প্লিজ, চটপট।'

'ওমা, ওটা কোত্থেকে আনলেন!'

'স্বর্গ থেকে নয়, ম্যাডাম।' নৃসিংহ বলল, 'দয়া করে পাঁচটা গ্লাস নিয়ে এসো। আমরা পাঁচজনই তো!'

'তিনটে আনলেই হবে।' ব্যস্ত, কিছু বা শঙ্কিত গলায় বলল ব্রতীন, 'ও খায় না। আমিও খাব না। শরীরটা ভালো নেই—'

'ওফ্‌, জামাইবাবু, আপনি একেবারে ইউজলেস্‌!' কস্তুরী হঠাৎ বলল, 'সমস্ত চার্ম নষ্ট করে দিচ্ছেন! খেতেই হবে আপনাকে।'

কথাটা সরাসরি ধাক্কা দিল বুকে। ইউজলেস্‌। ভেবে না বললেও বলেছে। ঘাড় তুলতে গিয়ে এলিয়ে পড়ল ব্রতীন। নৃসিংহ বলল, 'হোস্টের না করাটা ইনডিসেন্সি। তুমি খাবে, আহামরিও খাবে—'

'আমি কিছুতেই নয়।' আহামরির চোখ ব্রতীনের দিকে, 'তুমি খাবে না কেন! ওরা বলছে, খাও না!'

ব্রতীন চুপচাপ।

আহামরি বলল, 'আমি গ্লাসগুলো এনে দিচ্ছি—'

দীপঙ্কর চেঁচিয়ে বলল, 'আর একটু আইস, ইফ্ পসিব্‌ল।' বলতে বলতে হাতের মোচড়ে বোতলটা খুলে ফেলল, 'ব্রতীনদা, হোয়াট্‌স্ রং উইথ ইউ! শরীর সত্যিই খারাপ নাকি!'

'না, সামান্য। ক্যারি অন।'

ট্রেতে গ্লাস সাজিয়ে ঘরে ঢুকল আহামরি। দীপঙ্করের সামনে নামিয়ে রাখার পর লক্ষ করল ব্রতীন, তিনটে বা পাঁচটা নয়, একসঙ্গে ছ'টি গ্লাস বয়ে এনেছে আহামরি। দেরি না করে সমান মাপে গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে দীপঙ্কর।

'উই আর ফাইভ।'

'না, আমাকে বাদ দিন—।' আহামরি স্বামীকে দেখল। স্টিলের বাটিতে আইসকিউব এনে টেবিলে রাখল কস্তুরী। ব্রতীন তাকিয়ে আছে গ্লাসগুলির দিকে—জলের ওপর গলা ডুবিয়ে ভাসছে অল্প হলুদ কিউবগুলো। প্রথম গ্লাসটা নৃসিংহের দিকে বাড়িয়ে দিল দীপঙ্কর। নৃসিংহ এগিয়ে ধরল ব্রতীনের দিকে।

'ঠিক আছে। তুমি নাও—'

'আরে, নাও না।' জোর করে ব্রতীনের হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল নৃসিংহ, 'তুমি না নিলে আহামরিও নেবে না।'

'আপ-টু হার নাউ। আমি বারণ করিনি—'

'এই তো, লিবারেটেড।'

একটু জোর দিয়েই কথাগুলো উচ্চারণ করল নৃসিংহ। এখানে আসার পর যে-জড়তা ছিল কথায় বা ভঙ্গিতে, এখন আর তা নেই। মুখ উদ্ভাসিত দেখাচ্ছে চাপা হাসিতে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আর একটা গ্লাস তুলে নিল হাতে।

'না, আমি খাব না।' প্রায় সন্ত্রস্ত গলায় বলল আহামরি, বলতে বলতে ধপ্ করে বসে পড়ল কস্তুরীর খালি করা জায়গাটায়, 'জোর করবেন না, প্লিজ!'

'খাবে না কেন! ভয়!' আহামরিকে আড়াল করে ওর হাতটা চেপে ধরল নৃসিংহ। পিছনে উপবিষ্ট ব্রতীন, জানে, পরে যা হয় হোক, আপাতত পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হবে না নৃসিংহ।

'নাও, ধরো। চিয়ার্স!'

'চিয়ার্স।'

প্রায় এক চুমুকে অর্ধেকটা গিলে ফেলল ব্রতীন। একসঙ্গে অনেকটা নামানোর চেষ্টায় গলা, বুক জুড়ে গড়িয়ে গেল অন্ধকার। ইউজলেস্ কথাটা ফিরে এলো কানে। নিশ্চিত ভেবে বলেনি কস্তুরী; তবে বলেছে। একটি কথার মোহ ক্রমাগত জড়াতে লাগল ব্রতীনকে।

নৃসিংহ ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। চোখ আহামরির দিকে। এক চুমুকের পরেই মাথা ঝুঁকিয়ে জের সামলাচ্ছে আহামরি, কাঁধ থেকে আঁচলটা খসে পড়েছে কোলে। এখন তাকে অনেকটাই দেখা যায়।

ছোট একটা ঢেঁকুরের শব্দ গলার মধ্যেই চেপে দিল ব্রতীন। গ্লাসটা আবার চেপে ধরল দাঁতের আগায়। ঠিক বুঝতে পারছে না কোথাও কোনো ভুল করল কি না।

॥ তিন ॥

সময় কাটে না আহামরির। একটু আগেই একটা উপন্যাসের মধ্যিখান থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে সে, কিছুটা অবহেলাভরে। প্রায় তারই বয়সী একটি মেয়েকে নিয়ে গল্প। সরল ও সাদাসিধে মেয়েটি—স্বাস্থ্যে বিভ্রম নেই কোনো ; ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও এক ননদকে নিয়ে সংসার, কথাবার্তা ও আচরণে বেশ একটা সুখী-সুখী ভাব। তবু সারাক্ষণ ভোগে কীরকম এক একাকিত্বে। মেয়েটির চরিত্রের এই দিকটাই টানছিল আহামরিকে, থেমে গেল নতুন চ্যাপটারের প্রথম লাইনে এসে। মেয়েটির বিষয়ে : সারাদিন এটা-ওটার মধ্যে কী করে যে সময় কেটে যায় বুঝতেও পারে না। পুরোপুরি খটকা লাগার মতো ব্যাপার। যার সময় কেটে যায় আড়ালে, এবং স্বচ্ছন্দে—সময়ের ভার সম্পর্কে যার বোধ নেই কোনো, একাকিত্ব তার সাজে না। নাকি ওটাও বিলাস এক ধরনের ; হয়তো সব কিছু পেয়ে যাওয়ার সুখেও আছে এক ধরনের ক্লান্তি, মেয়েটি যা নিয়ে ভাবতে ভালোবাসে !

কথার ভিতরের অর্থ বুঝতে পারার সাধ্য আহামরির নেই। প্রায় সমবয়সী একটি মেয়ের নিঃসঙ্গতা নিয়ে ভাবতে চেয়েছিল কিছুক্ষণ, যদি তার মধ্যে কোনো রকমে খুঁজে পায় নিজেকে, হয়ে ওঠে সদৃশ। এও এক রকম খেলা—যেটা খেলতে হয় একা একা, নিভৃতে, যখন আশেপাশে আর কেউই নেই, শুধু বইয়ের পাতার অক্ষরের পর অক্ষর থেকে ক্রমশ গড়ে উঠছে একটি রক্তমাংসের সঙ্গী। এইমাত্র আহামরির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল তার। বইটা মুড়ে পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে হাই তুলল, খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল মেঘ ঘন হচ্ছে ক্রমশ। বেলা বারোটার রোদে মেঘের অনবরত লুকোচুরি কেউ সাধারণত চোখ তুলে দেখে না ; কিন্তু, এই ঘিঞ্জি কলকাতা শহরে থেকেও বহির্জগতের প্রায় সব পরিবর্তনই ধরা পড়ে তার চোখে—সকাল থেকে দুপুর ও সন্ধে পর্যন্ত, শুধু দৃশ্য বলেই এদের সাহচর্য কেমন একটা ভয় ধরিয়ে দেয় মনে। ভয়টাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না আহামরি। আড়াল থেকে শুধু টের পায় সময় চলে যাওয়ার অনুভূতি।

রোদ ও মেঘের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বিষণ্ণ বোধ করল সে। আলো আড়াল করার জন্যে চোখে হাত চাপা দিয়ে শুলো। তাড়া নেই ; কিছু করারও নেই। অন্য কিছু ভেবে না রাখলে এখন থেকে ব্রতীন ফিরে না আসা পর্যন্ত পুরো সময়টাই তার নিজস্ব, এটা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। বড়ো পাথরের মতো বিশাল গড়ন তার ; নিজস্ব হলেও শুধুই তার আশেপাশে ঘোরে আহামরি, কখনো বা ছুঁয়ে দেখে, নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দেয় গায়ে। ঠেলতে কখনোই পারে না।

ব্রতীন কলেজে গেছে প্রায় এক ঘণ্টার ওপর। যেমন যায়। দরজা বন্ধ করার পর কিছুক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে ব্রতীনের চলে যাওয়া লক্ষ করেছিল আহামরি। বাড়ি থেকে বড়ো রাস্তা পেরুতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগে না। একটু ধীরেসুস্থেই হাঁটে ব্রতীন, ওর কোনো কাজেই কখনো তাড়া লক্ষ করেনি আহামরি। আজ হঠাৎই আরো একটু শ্লথ লাগল ওকে, কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। যেন একটু মোটা হয়েছে, ঘাড়ের পিছনের টান টান ধরনটুকু হারিয়ে গেছে মাংসের খাঁজে। অভিজ্ঞতা থেকে এটাকে পরিবর্তন বলে চিনতে পারে আহামরি, স্বাস্থ্য কি না ধরতে পারে না। সম্ভবত নয় ; সম্ভবত ওটা বয়সের ভার। একদিন ওর হাঁটার মধ্যেই খুঁজে পেত সৌন্দর্য—দেখার রাস্তাটা তখন সোজা রেখায় এগিয়ে যেত অনেক দূর পর্যন্ত, মিলিয়ে ভাববার সুযোগ ছিল। আজ অনেক দিন পরে চোখ রেখেও ঠিক

ব্রতীনের বাঁক ফেরার মুহূর্তটিতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল আহামরি। আজকাল এ-রকম হয়, প্রায়ই। যাকে ভাবে, বা যা নিয়ে ভাবে, অজান্তেই কখন হারিয়ে যায় সে ; পরিবর্তে প্রচুর হয়ে আসে ভাবনাগুলো। রাস্তার দৃশ্যমান অংশে চোখ রেখে তখন থেকেই একটার পর একটা অনেকগুলো বাস ছুটে যেতে দেখল সে, ভাবল, এর কোনো একটিতে ব্রতীন আছে। আগে আগে ব্রতীন বেরুবার সময় সে 'সাবধানে যেও—' কথাগুলো উচ্চারণ করত। আজই মনে পড়ল আজকাল বলে না ; আজই মনে পড়ল যেতে যেতে এখন আর ফিরে তাকায় না ব্রতীন। প্রতিদিন একই কথা বলা এবং একই আচরণ পালন করার মধ্যে প্রয়োজনের চেয়ে অভ্যাসই খেলা করে বেশি। এসব অভ্যাস কবে ছেড়ে গেল তাদের!

একটা অস্থির ভাব মাথা থেকে পা পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে গেল আহামরিকে। দু' মুঠোয় জানলার শিক ধরে এরপর কী করবে না করবে ভাবতে ভাবতে ক্রমশ অলস করে দিল নিজেকে। আগে খেয়াল করেনি, এখন দেখল, সাইকেল-আরোহী দু'টি যুবক থেমে আছে ফুটপাথ ঘেঁসে, চোখ তারই দিকে, হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে। চোখাচোখি হতে পরিষ্কার চোখ টিপল একজন। আহামরি এর অর্থ বোঝে না তা নয়—ফ্রক ছাড়ার পর থেকেই উপেক্ষা করতে শিখেছে এগুলো। তবু ভুরু কুঁচকে জানলা থেকে সরে যেতে যেতে টের পেল শরীরের ভিতর চাড়া দিচ্ছে মাংস, ঠিক আগেকারই মতো। মন এখনো ঠিক ঠিক ধরে রাখতে পারে না শরীরকে, বিয়ের বারো বছর পরেও। অনেক দিন অনেক ভেবেও এর কোনো কারণ খুঁজে পায়নি আহামরি। এমনও হতে পারে, এটাই শরীর ও মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—আর কাউকে জিজ্ঞেস করলেও হয়তো একই জবাব পেত। আর কিছুর অভাবে বই নিয়ে বিছানায় চলে আসার পরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভাবনাটা জুড়ে থাকল তাকে।

চোখ বন্ধ করলেই আরো বেশি করে প্রত্যক্ষ করা যায় নিজেকে ; শরীরী হয়ে ওঠে অন্ধকার। ঘুম এলে ভালো ; না হলে অনর্গল চৈতন্যের ওপর অসংখ্য শাখানদীর মতো ছড়িয়ে পড়বে ভাবনাগুলো—শিরার ভিতর গিয়ে মিশতে চাইবে রক্তে, সেই সব ভাবনা গত ক'দিন যা তাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে ক্রমাগত—দিনে, রাতে, এমনকি বিচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যেও। ভালো হতো যদি 'ভয় করছে' এ-কথাটা বলতে পারত কাউকে। কাকে বলবে? ব্রতীনকে? অন্যমনস্ক হবার প্রাণপণ চেষ্টায় চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে দিল আহামরি।

নিচে দিন বেড়ে ওঠার শব্দ এখনো ঝিমিয়ে পড়েনি পুরোপুরি। কাছেই মোটর গ্যারাজ—একটা গাড়ি স্টার্ট করানোর চেষ্টা চলছে অনেকক্ষণ ধরে, বিশ্রী ধরনের গলা খাঁকারি দেওয়ার মতো এঞ্জিনের শব্দ উঠছে এক-একবার, পর মুহূর্তেই থেমে যাচ্ছে আবার। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, সেই সঙ্গে হুটোপাটি। মিসেস বলের ছোট ছেলে, শুনেই বুঝল, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। রোজকার অভ্যাসে যাবার আগে দুমদাম শব্দে দুটো কিল বসিয়ে দিয়ে গেল তাদের দরজায়। তাকে নাওয়াতে-খাওয়াতে একটু পরেই শোনা যাবে মিসেস বলের ব্যতিব্যস্ত গলা। এর সমস্তের ভেতরেই আছে শব্দ ও গতি ; এগুলো আছে বলেই নিজের ভিতরের নৈঃশব্দ্য ও থেমে থাকাটা টের পায় বেশি। বেশ কিছু দিন ওপরে ওঠেনি সে, হঠাৎই ভাবল আহামরি : মিসেস বলও আসেনি ; একা ফ্ল্যাটে এভাবে নিজেকে ক্ষইয়ে না দিয়ে আজ, অন্তত কিছুটা সময়, মিসেস বলের ফ্ল্যাটে কাটিয়ে আসতে পারে সে।

কাজের মেয়েটি ছুটি নিয়ে দেশে গেছে দিন দুয়েক হলো। বাড়িটা সে-জন্যে আরো শূন্য ও নিঃশব্দ লাগে। টুকিটাকি কাজ যা বাকি আছে এখন তাকেই সারতে হবে। আহামরি উঠল। যেভাবে নরম হয়ে আসছে রোদ, মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে এক পশলা নামতে

পারে। শোবার ঘরের বিছানার গা-ঘেঁসা জানলাটা বন্ধ করে বেরিয়ে এলো প্যাসেজে।

ব্রতীন খেয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো। এঁটো বাসনগুলো টেবিল থেকে তুলে ওয়াশ-বেসিনে নিয়ে গিয়ে ধুতে ধুতে নিজের মধ্যে তীব্র অনিচ্ছে খুঁজে পেল আহামরি। কিছু করা এবং না-করার মধ্যে এখন আর পার্থক্য নেই কোনো ; মানসিকতায় টাল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ওষুধের তীব্রতায় শরীরময় ছড়িয়ে পড়ছে অবসাদ। কাজ নেই, অন্য সময় হলে এই অবসাদও মনে হতো উপভোগ্য—বস্তুত, অন্যান্য দিন এ সময় খেয়ে-দেয়ে কিঞ্চিৎ গড়িয়ে নেওয়ার কথা ভাবে সে, গরমে তোশকের চিটচিটে ভাব এড়ানোর জন্যে ফিনফিনে মাদুরটা পেতে নেয় মেঝেয় ; ঘুম আসে ভালো, না হয় বই ও ম্যাগাজিনের পাতা উল্টেই কেটে যায় সময়। সময়ের ভার সম্পর্কে এর আগে কখনোই সে এতোটা সচেতন হয়ে ওঠেনি, যেমন আজ হলো : আজ সারাক্ষণই সে চোখে চোখে রেখেছিল ব্রতীনকে—মৃত্যু আসন্ন জেনে যেমন কখনোই রোগীকে চোখছাড়া করতে ইচ্ছে করে না। তেমন কোনো কারণ নেই, তবু বারো বছরের মধ্যে আজই প্রথম সে টের পেল ব্রতীন চলে গেলে বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় ; শরীরের ভিতর রক্তমাংসের আকৃতির পরিবর্তে ঢুকে পড়ে নিলামে জড়ো করা আসবাবের শূন্যতা।

এমন হবার সত্যিই কি কারণ ছিল কোনো ! এটা ঠিক, বিয়ের পর থেকেই বহু দিন ধরে একটা কিছুর আশা করে যাচ্ছে সে—একটা কিছু, যা তার আপাত-অনাব্য শরীরে ফুটিয়ে তুলবে অন্য কোনো রূপ, যা তাদের মিলিত নিঃশ্বাসকে করে তুলবে একাগ্র। আশাটা ব্রতীনকে বাদ দিয়ে নয়। আহামরি জানে, একটি মানুষকে ভালোবেসে কীভাবে ভরিয়ে তোলা যায় নিজেকে। সেই জানা থেকেই এতো দিন যে-কোনো সংকেতে তিল তিল করে সাড়া দিয়েছে সে, মনের আবেগ তীক্ষ্ণ করে তুলেছে শারীরিক উত্তাপে। এর সবই কি ভুল ! বুঝতে পারে না। আচরণে বরাবরই খামখেয়ালি ব্রতীন, কোনো চাওয়াকেই সময় দিয়ে আড়াল করতে জানে না। তার প্রয়োজনে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক দিন সাড়া দিয়ে গেছে আহামরি—আর কোনো কারণে নয়, সে ব্রতীন বলেই। বলতে কি, দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে লুকোনো আশাটা যতোই চলে যাচ্ছিল দূরে, সমানানুপাতে ব্রতীন যেন ততোই এগিয়ে আসছিল কাছে, আরো কাছে। একদিন—বেশি দিন আগের কথা নয়, মনে পড়ে আহামরির, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কানের পাশে একটা রুপোলি চুল আবিষ্কার করে অকারণ আহ্লাদে হঠাৎই কেঁপে উঠেছিল সে। ব্রতীন খবরের কাগজ পড়ছে তখন, প্রায় ছুটে গিয়ে বলেছিল, 'দেখছ, এবার বুড়ি হতে শুরু করলাম !' চুলটা আঙুলের ডগায় টেনে পরখ করতে করতে ঠাট্টা করেই বলেছিল ব্রতীন, 'পাক শুধু চুলেই ধরেছে, অন্যগুলোর খবর রাখো !' বুঝতে দেরি হয়নি আহামরির। 'তুমি সেই মাছিই থেকে গেলে—', সরে যেতে যেতে বলেছিল, 'ঘুরে ফিরে একই জায়গায় !' আহামরি এখনো লজ্জা পায়। একটু চেয়ে থেকে ব্রতীন বলেছিল, 'মাছি নয়, বলো মৌমাছি—'

একান্তে খুশি হয়েছিল আহামরি। তেত্রিশ-চৌত্রিশেই কেউ বুড়ি হয়ে যায় না—সে-জন্যে নয়। আসলে মাঝে মাঝে ব্রতীনকে বাজিয়ে নিতে ভালো লাগে। মন, যন্ত্রটন্ত্র সবই আছে ঠিকঠাক ; তবু, আহামরি জানে, আকর্ষণ আর এক বিষয়।

পুরনো কথা। অনেক চেষ্টা করেও সেই ব্রতীনকে আর খুঁজে পায় না আহামরি। নিজেকে মনে হচ্ছে অসম্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর। চারিদিকে দূরত্বের গন্ধ ; এমনকি, গরমের দুপুরে বাথরুমের আলোছায়ার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করার পরিচিত উৎসাহেও

ঢুকে পড়ছে শীত। এখন চোখে শুধু একটাই দৃশ্য : শ্লথগতি, অন্যমনস্ক, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ব্রতীন। মনেই হয় না এইমাত্র যাত্রা শুরু হলো তার, পিছনে তাকালেই চিনতে পারবে নিজের বাড়িটিকে।

কোনো রকমে স্নান সেরে বেরিয়ে এলো আহামরি। খেতে ইচ্ছে করছে না। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় গেল—বৃষ্টির আভাস দিয়ে সরে গেছে মেঘ, বাইরে আবার ঝকঝক করছে রোদ্দুর। আর কোথাও শব্দ নেই কোনো ; কিংবা, থাকলেও, আহামরিকে টেনে রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। ব্যস্ত হাতে চুলে চিরুনি চালিয়ে নেলকাটার হাতে বসার ঘরে চলে এলো সে। বৃষ্টি ও ধুলোর আশঙ্কায় আগে থেকেই বন্ধ হয়ে আছে একটা জানলা, অন্যটার আলোয় ক্রমশ আবছা হয়ে আছে ঘরের একদিক। সোফায় বসে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে নেলকাটারটা চেপে ধরতেই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল শরীর—ধাতুর চাপ ঢুকে পড়েছে মাংসের মধ্যে। আঙুলে রক্তের আভাস দেখা দিতেই চকিতে মনে পড়ল আহামরির, আজ মঙ্গলবার। গত মঙ্গলবার এই সোফা থেকেই শেষবারের মতো তাকে বিছানায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল ব্রতীন।

চিন্তাটা বিচ্ছিন্ন করে দিল তাকে। এতো দূর অন্যমনস্কতা চট করে কাউকে গ্রাস করে না। নখের কোণ ছেড়ে কাঁচা রক্ত এখন গড়াতে শুরু করেছে আঙুলের আল বেয়ে ; আগেই ভাবা উচিত ছিল, আর একটু আগে সতর্ক হলে সোফায় ছোপ লাগত না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আর-কিছুর অভাবে তিন আঙুলের আগায় থুথু টেনে দ্রুত ঘষতে লাগল সোফার কভারে। তাতে রঙ একটু পাতলা হলেও ছোট জায়গা থেকে দাগটা ছড়িয়ে পড়ল আরো। একবার দাগটার দিকে তাকাল আহামরি, একবার আঙুলটার দিকে। মনে হচ্ছে জমতে শুরু করেছে রক্ত ; চিনচিনে একটু ব্যথা মরে আসছে ক্রমশ। একা ঘরে নিজের প্রতি মমতায় হঠাৎই ভীষণরকম অসহায় বোধ করল আহামরি। চৌত্রিশে পৌঁছে চোখে জল আনার জন্যে অনেক দিন পরে একটা উপলক্ষ খুঁজে পেল সে।

আজ মনে হয় অতর্কিতে সেদিনও কোথাও এইভাবে শুরু হয়েছিল ক্ষরণ। আচ্ছন্নতা বিভোর করে রেখেছিল তাকে ; না হলে ব্রতীনের অন্যমনস্কতা লক্ষ করে আগেই সতর্ক হতে পারত। এমনও হতে পারে ব্রতীনের অন্যমনস্কতা তারও মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল ক্রমশ—ব্রতীনের অনুযোগ সত্যি হলে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই নিজেকে ব্যবহার করেছিল সে ; এখন আর কিছুই ঠিক ঠিক মনে পড়ে না। শুধু এটুকু মনে আছে, কস্তুরী-দীপঙ্কররা চলে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ বসেছিল নৃসিংহ। শরীর খারাপ নিয়ে অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল ব্রতীন ; নৃসিংহ চলে যাবার সময় একবার শুধু উঠে এসেছিল দরজার কাছে।

তন্মুহূর্তের স্মৃতি বলতে আর বিশেষ কিছুই নেই আহামরির। মাঝরাতে, বিছানায়, আচ্ছন্নতার মধ্যে হঠাৎই মনে হয়েছিল ব্রতীন পাশে নেই, আশেপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে শূন্য পড়ে আছে বিছানা। তখনই সাড়া পড়ে যায় শরীরে। আতঙ্কে ধড়ফড় করে উঠে বসল আহামরি, বেডস্যুইচ টিপে আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল বালিশে—সন্ধেয় যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে সেটা, নিভাঁজ ও পরিপাটি, ব্রতীন বিছানায় আসেনি বোঝাই যায়।

হঠাৎ জ্বর নেমে যাওয়ার মতো ততোক্ষণে ঘাম দিতে শুরু করেছে শরীরে, অনভ্যাসের জন্যেই সম্ভবত অসম্ভব ভারী লাগছে মাথাটা। বিছানা থেকেই প্যাসেজের মেঝেয় চোখে পড়ল আলোর রেখা, তার মানে বসার ঘরের আলোটা জ্বলছে এখনো, ব্রতীন ওখানেই

আছে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে এলো আহামরি। টেবিলে পা তুলে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে ব্রতীন, মুঠোয় ধরা বই—বইয়ের জন্যেই আড়াল হয়ে আছে মুখটা। আরো অবাক হলো ওর হাতে সিগারেট পুড়তে দেখে। আগে খেত, সাইনাসাইটিসের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর গত দু' বছর আর ছোঁয়নি। টেবিলে ডানহিলের প্যাকেট ; সম্ভবত নিয়ে যেতে ভুলে গেছে দীপঙ্কর। কিছু বলার আগে বেশ কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে থাকল আহামরি।

'তুমি শোওনি ?'

'হঠাৎ!'

উত্তরটা এতো স্বচ্ছন্দে এলো যেন ব্রতীন জানত আহামরি আসবে এবং জিজ্ঞেস করবে। পরিষ্কার গলা। সামান্যতম পরিবর্তন হলো না ভঙ্গিতে।

বারো বছরের বিবাহিত জীবনে কতোবার এমন কাঠ হয়েছে ব্রতীন, গুনে বলে দিতে পারে আহামরি। একটা কারণে পৌঁছুতে গিয়েও অসহায় লাগল তার, এর আগে কখনো ব্রতীনকে এমন অপরিচিত মনে হয়নি। হাতের সিগারেটটাই তাকে ঠেলে দিল আরো দূরে। ঠিক বুঝতে পারল না জলজ্যান্ত একটি মানুষের অনুপস্থিতি টের পেতে সে-ই বা এতোটা সময় নিল কেন।

বেরুবার সময় ঘড়ি দেখেছিল, সাড়ে তিনটে। আকাশটা চওড়া হয়ে নেমে এসেছে জানলার কাছে, দূরে কাছে একসঙ্গে জ্বলজ্বল করছে অনেকগুলো তারা। জানলায় গিয়ে দাঁড়াল আহামরি। ভোর হতে এখনো কিছু দেরি আছে ; ফাঁকা রাস্তা, তার তাকিয়ে থাকার মধ্যেই দক্ষিণ থেকে উত্তরে দ্রুত বেগে ছুটে গেল একটি মোটর। ঠাণ্ডা-জড়ানো একটা হাওয়া হঠাৎই ছুঁয়ে গেল তাকে। অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজছে ব্রতীন। কঠিন চোয়াল। এতোক্ষণে আহামরি তার মুখ দেখতে পেল। ইচ্ছে করেই যেন আহামরিকে দেখার চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে ব্রতীন। একটা শেষ হতে না হতেই আবার প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়াল।

'হঠাৎ সিগারেট খাচ্ছ ?'

'জবাবদিহি করতে হবে ?'

দেশলাইটা ঠিকমতো জ্বালতে পারছে না ব্রতীন ; হাত কাঁপছে, বোঝাই যায়। নিজেকে অসম্ভব পরিত্যক্ত মনে হলো আহামরির। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, বিকেলে, এই লোকই খুঁড়েছিল তাকে, ভাবতে চেষ্টা করল সে। একটা ভয় উঠে আসছে ভিতর থেকে। ইচ্ছে করলেই এখন এগিয়ে গিয়ে ছুঁতে পারবে না ব্রতীনকে।

মুখটা আবার ঢাকা পড়েছে বইয়ের আড়ালে। আহামরি তাকিয়ে থাকল। গলা পর্যন্ত উঠে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা প্রশ্ন, ঠিক মুহূর্তটিকে খুঁজে পাচ্ছে না।

'এতো রাগ কিসের!' সময় নিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল আহামরি, 'ড্রিঙ্ক করেছি বলে ?'

কথাটা ব্রতীন শুনেছে বলে মনে হলো না। সিগারেটসুদ্ধ ওর হাতের আঙুলগুলো দুলে উঠল অ্যাশট্রের ওপর।

'জোর করা হয়েছিল, নিজের ইচ্ছেয় খাইনি। তখন তুমিও জোর করতে পারতে—'

'স্নাফ!' ব্রতীন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এতো রাতে আমাকে ডিস্টার্ব করার জন্যে উঠে আসার দরকার ছিল না—'

'জানি।' ঠাণ্ডা গলায় বলল আহামরি, 'তোমাকে ডিস্টার্ব করার জন্যেই উঠে এসেছি!' বলতে বলতে বসে পড়ল মাটিতে।

'এখানে বসে থেকে লাভ নেই। আমি নৃসিংহ নই যে হাত ধরে তুলে নিয়ে যাবো—'

'নৃসিংহ!' পিঠ সোজা করে বসল আহামরি। সোজাসুজি তাকাল ব্রতীনের দিকে, 'এর মধ্যে সে আসছে কী করে!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ব্রতীন। বইটা মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আহামরি দেখল ব্রতীনও বদলে যেতে পারে।

'উইল ইউ গেট আউট?'

একজন নয়, যেন একসঙ্গে চিৎকার করছে দশজন ব্রতীন। দেওয়ালে ঘা খেয়ে শব্দটা ফিরে এলো আহামরির কানে। খুব সংযত হয়ে সে বলল, 'যাচ্ছি, যাচ্ছি। পাড়াসুদ্ধ লোক জানল তুমি চ্যাঁচাচ্ছ!'

সেই একবারই চেঁচিয়েছিল ব্রতীন। শব্দটা থেমে গেলেও তার রেশ যায়নি সহজে। তারপর, গত সাত-আট দিনে ব্রতীন যে এ-বাড়িতে আছে এটা আহামরি ছাড়া আর কেউ টের পায়নি। আহামরিও কি পেয়েছে? 'হ্যাঁ' বা 'না' বা প্রয়োজনের উত্তরে মৃদু ঘাড় নাড়া—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু এইটুকুর মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে না। শরীরের কথা না ভাবলেও আহামরি এসব ভাবে; এর চেয়ে, ভাবে, চিৎকারও ভালো ছিল। ঠিক সময়ে বেরিয়ে যায় ব্রতীন, ফেরে দেরি করে। এমনকি বিছানায়, ঘুমের মধ্যেও, রাখতে পারে চমৎকার দূরত্ব।

এতো দিন সহ্য করে আজ ব্রতীন কলেজে বেরুবার আগে প্রায় মরিয়া হয়েই কথাটা তুলেছিল আহামরি।

'এভাবে থাকা যায় না—'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির বোতাম ঠিক করছিল ব্রতীন। কথাটা আচমকা বলেই উত্তরটাও সেইভাবে এলো।

'কীভাবে!' তারপরেই সামলে নিল ব্রতীন, 'না থাকলেই হয়—'

এরপর আর কিছু বলা যায় না। ব্রতীনের পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত এসে একবার শেষ চেষ্টা করল আহামরি:

'ফিরতে দেরি হবে?'

ব্রতীন শুনেছে বলে মনে হলো না। বিচলিত আহামরি দেখল সিঁড়িগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, গতির মধ্যে কোনো ভাবান্তর রাখছে না ব্রতীন। দরজাটা আজ একটু শব্দ করেই বন্ধ করেছিল সে।

রক্ত জমে জায়গাটা কালো হয়ে আছে। খেলাচ্ছলে উস্‌কে দিতেই আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি তরল হয়ে এলো। মনে হচ্ছে ফুলেছে অল্প, জায়গাটা খারাপ—এসব ভেবেও আরো একটু যন্ত্রণায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আঙুলটা টিপে ধরল আহামরি। তিরতির করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। ব্রতীন জানবে না, পরিচর্যাহীন ক্ষরণে কীভাবে নিজেকে আরো বেশি অভিমানের ভিতর ঠেলে দিচ্ছে আহামরি!

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে খেলায় নিজেকে মাতিয়ে রাখল আহামরি। শরীর জুড়ে একটা অবশ ভাব; এই অবস্থায় ঘুম আসে সহজে। কিন্তু আজ সে ঘুমোবে না; এতোক্ষণের স্থিরতা থেকে এখন একটা জোর পাচ্ছে মনে—রোদে মেলে দেওয়া শিকড় ক্রমশই খুঁজে

নেয় নতুন অবলম্বন, ব্রতীনকে এখন সে দেখতে পাচ্ছে সেই রোদের ভিতর, যে করেই হোক ফেরাবে তাকে। যদি না পারে, যদি—কথাটা ভাবতে গিয়ে আকস্মিক শীতে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল আহামরি। ভাবতে পারে না।

তাড়াতাড়ি উঠে আয়োডিন লাগাল পায়ে। বেলা হেলে পড়েছে জানলার গায়ে, এখন ক্রমশ বিকেলের দিকে যাবে। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রোদের গতি লক্ষ করল আহামরি। দুটো, আড়াইটের সময় কলেজেই থাকার কথা ব্রতীনের। ফোনে কথা বললে কেউ কারুর অভিব্যক্তি লক্ষ করতে পারবে না ; দূরত্ব, এমনকি, কিছুটা সাবলীলও করে তুলতে পারে ব্রতীনকে।

সদরের দরজা বন্ধ করে ওপরের সিঁড়িতে পা রাখল আহামরি। দুপুরের এই সময়টা তার কাছে চেনা, কাচের জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়া কৌণিক রোদও। কোথাও কোনো অস্বস্তি নেই। অসুবিধে হলো, ব্রতীনের সঙ্গে তার কথাবার্তা মিসেস বলের কানে যাবে ; সেটা সাত কান হতে পারে।

দ্বিধান্বিত হাতে কলিং বেল টিপল আহামরি। বিয়ের বারো বছর পরে হঠাৎ মনে পড়ল সে ও ব্রতীন স্বামী-স্ত্রী।

সামনে মিসেস বল। পরনে ম্যাক্সি। মনে হচ্ছে মিস্টার বলের এবারের বম্বে সফরের ফল। কোমর পর্যন্ত ছড়ানো চুল নতুন পোশাকের সঙ্গে ম্যাচিং, না বাঁধার সুযোগ হয়ে ওঠেনি এখনো, বোঝা যায় না। হাসির ধরনেও অনভ্যাস চোখ এড়ায় না।

কিছু বলার আগে অল্প ইতস্তত করল আহামরি।

'বিরক্ত করলাম না তো !'

'এ মা, সে কি ! আসুন। আজকাল তো আসেনই না !'

মিসেস বলের মুখোমুখি বসে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল আহামরি। হেসে বলল, 'রোজই ভাবি আসব, হয়ে ওঠে না। সাত ঝামেলায় আছি।'

'জানি ভাই।' কোমর ঠেলে এগিয়ে এলো মিসেস বল, 'সেদিন রাতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনেই খারাপ লাগছিল। আপনার দুঃখ আমি বুঝতে পারি।'

সিনেমার ডায়লগের মতো লাগছে কথাগুলো, অপটু রিহার্সালের ফলে একটু দ্রুতই আউড়ে যাচ্ছে। ক্ষতটা আবার মুখ খুলছে টের পেল আহামরি। পরিস্থিতি ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে, এখনই ব্রতীনকে টেলিফোন করার কথাটা কীভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না। খুব ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, 'আমার কোনো দুঃখ নেই।'

'না থাকলেই ভালো।' দরজাটা বন্ধ করার জন্যে উঠে গেল মিসেস বল। ফিরে এসে বসল পায়ের ওপর পা তুলে। কোমরের ঘেরে চোখে পড়ছে স্থূলতা, আবার হয়তো বাচ্চাকাচ্চা হবে। চুপচাপ একটা নিঃশ্বাস নামিয়ে দিল আহামরি।

'আপনাকে বলিনি', চুলের গোছা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল মিসেস বল, 'ক'দিন আগে আপনার একটা ফোন এসেছিল। পুরুষের গলা, কিছুতেই নাম বলে না। আমার স্বামী ধরেছিলেন—'

আহামরির নাকের সামনে একটা রুমাল নড়ে উঠল। নিঃশ্বাস সহজ করার জন্যে এলিয়ে বসল সে।

'আমাকে ডাকলেন না কেন !'

'উনিই মানা করলেন। বললেন এই সব বদ লোকের জন্যেই ঝামেলা হয় সংসারে। যে

ডাকবে তার নাম বলতে অসুবিধে কী।'

'আপনি বুঝি ওঁকে সব বলেছেন।'

'সব নয়, এটাই বলেছি।' ঠোঁট মুচড়ে হাসল মিসেস বল, 'তা বলে ভাববেন না আপনার স্বামীর কানে যাবে। পুরুষদের আমি চিনি না! এই তো, আমার এক পিসতুতো ভাই—'

পরের কথাগুলো ঠিক ঠিক শুনতে পেল না আহামরি। ঝাঁঝালো একটা গন্ধ এগিয়ে আসছে নাকের কাছে। শক্ত মুঠোয় আঁচল তুলে নাকমুখ চাপা দিল সে।

॥ চার ॥

ইচ্ছে করে আজকাল অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে কাটায় ব্রতীন। ঠিক যে ভালো লাগে তা নয়; তবু। এতোকালের অভ্যস্ত রুটিন থেকে দূরে সরে এসে কোথাও পায় না সেই স্বাচ্ছন্দ্য, অনেক দিন আগে যা তার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক—যখন যে-কোনো ভাবনার কেন্দ্রে সে নিজে ছাড়া আর কেউ ছিল না, থাকত না। অস্বস্তি লাগে, মানসিক ক্লান্তি প্রায় সময়েই জড়িয়ে ধরে শরীর। মাঝে মাঝে চমকে উঠে খেয়াল করে, ক্লাসে পড়ানোর মতো গতানুগতিক ঘটনার মধ্যেও ঢুকে পড়ছে অন্যমনস্কতা। ব্যাপারটা ক্ষুব্ধ করে তাকে। আবার প্রকৃতিস্থ হতে না হতেই টের পায় মাথায় ও রগের দু' পাশে অল্প থেকে ক্রমশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে উত্তেজনা। রাগ হয় নিজের ওপর, আহামরির ওপর; রাগ হয় আশেপাশের সকলের ওপর—যেন সে নিজে স্থির থাকা সত্ত্বেও তাকে টলানোর জন্যে চারিদিকে চলছে একটা নির্লজ্জ ষড়যন্ত্র। মনে হয় ইতিমধ্যেই অনেকটা হেরে গেছে সে—সম্ভবত কোনো দিনই ফিরে পাবে না পুরনো আবহ। দুঃখ হয় না; বস্তুত, এসব ভাবলেই একটা অপমানবোধ রি-রি করে ওঠে শরীরে। সম্পর্কহীন ও নির্বান্ধব, পরের অনুভূতিগুলো কোথাও নিয়ে যায় না তাকে।

সম্ভবত একটু বদলেও গেছে ব্রতীন। স্বভাব এমনিতেই তার চোখমুখ জুড়ে ছড়িয়ে রাখে ভাবুকতা; কথা যতো না বলে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে শুনতে। বন্ধু, সহকর্মী বা ছাত্রদের সামনে হাসিই তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এ ক'দিনে একটু একটু করে বদলে গেছে সে। কলেজে আসে, ক্লাসে যায়—সবই প্রায় যন্ত্রচালিত; স্টাফরুমের বিভিন্ন আলোচনা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিনের প্রতি মনোযোগ বাড়িয়ে। একসময় চলে যায়। ঠিক ঠিক মনে পড়ে না প্রকৃতভাবে তার কোথাও যাবার কথা ছিল কি না, এমনকি যেতে যেতেও মনে পড়ে না ঠিক কোথায় যাচ্ছে! একটার পর একটা বাস চলে যায়, বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ব্রতীন ভাবে, তাড়ার কী আছে—ধীরেসুস্থে গেলেই চলবে। সত্যিই তাড়া নেই, আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে যেতে ভাবে, বাকি রাস্তাটুকুও সে হেঁটে যেতে পারে অনায়াসে।

আজ, বেশ কয়েক দিন পরে যাবার একটা উপলক্ষ খুঁজে পেল। তৃণার মা ফোন করেছিলেন কলেজে, যেন একবার দেখা করে। খুব সংক্ষেপে কথাবার্তা হলো; ব্রতীন বলল, আসবে, সন্ধের দিকে। আর কিছু জিজ্ঞেস না করেই ফোন ছেড়ে দিল। শিথিলভাবে একবার মনে পড়ল তৃণাকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে উঠল আহামরির মুখ—ব্রতীন নিজেকে

ব্যস্ত করে তুলল। এখন বিকেল, তৃণাদের বাড়ি যাবে সন্ধের পরে। তার আগে অনেকটা সময় তাকে কাটাতে হবে একা-একা। বাড়ি যাবে ? না। বরং যেতে পারে বিভাসদের খবরের কাগজের অফিসে। অনেক দিন দেখা হয়নি। বিভাস এ-সময়টা অফিসেই থাকে ; না থাকলেও ক্ষতি নেই—চেনাশোনা অনেকেই আছে, গল্পগুজব করে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ওদের ম্যাগাজিন এডিটর দেখা হলেই কিছু লেখার কথা বলেন। সময় কাটছে না ; শারীরিক সম্পর্ক থেকে দূরে গিয়ে রাতগুলোও হয়ে উঠেছে দীর্ঘতর ; নিছক সময় কাটানোর জন্যেও এখন সে কিছু লেখার কথা ভাবতে পারে। এ-ছাড়া কি উপায় আছে কোনো ?

ক্লাসে পড়াতে পড়াতেই এই সব ভেবে যাচ্ছিল ব্রতীন। টেপ-রেকর্ডারে নিজের গলা শোনার মতো, শব্দগুলো চলে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে এলো কোনো দিকে না তাকিয়ে, একটু বা দ্রুত। স্টাফরুম প্রায় ফাঁকা। বড়ো টেবিলের কোণের দিকে একা বসে টিউটোরিয়ালের খাতা দেখছেন অমলেশ চক্রবর্তী ; প্রায় না-দেখার মতো করেই একবার তাকিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল ব্রতীন। অমলেশ ডাকলেন।

'চললে ?'

'হ্যাঁ—'

দু' এক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন অমলেশ।

'ক'দিন থেকেই দেখছি তুমি ভীষণ চুপচাপ ! শরীর ভালো নেই ?'

'না, সে-রকম কিছু নয়।'

'তা হলে ? বাড়িতে অশান্তি ?'

প্রশ্নটা সহজ নয়। একটু সন্দেহের চোখে তাকাল ব্রতীন। তারপর বলল, 'না। অশান্তি হবে কেন ?'

'কিছু না হলেই ভালো।'

সামনের খাতাটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন অমলেশ। সম্ভবত ক্লাস আছে। এক এক করে অন্যরা ঢুকছে স্টাফরুমে। ব্রতীন নৃসিংহকে দেখল—বইগুলো টেবিলে রেখে সিগার বের করল, চলে গেল জানলার দিকে। এখন তাকে দ্রুত হতে হবে।

অমলেশের পাশাপাশি বাইরে বেরিয়ে এলো ব্রতীন।

'তোমার হাবভাব নিয়ে অনেকেই কথা বলছে !'

যেন তৈরি হয়েছিল, খুব তৎপর গলায় ব্রতীন জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছে ?'

'তেমন কিছু নয়। তবে, হঠাৎ এমন চুপচাপ হয়ে গেলে লোকে ভাববে বইকি ! যাক্‌গে—', যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে অন্য প্রসঙ্গ টানলেন অমলেশ, 'সতী কাল বলছিল তোমাদের কথা। অনেক দিন আসো না। হৈমন্তী মাঝে মাঝে একাই আসত, এখন সেও বন্ধ করে দিয়েছে। ও নাকি একদিন সরষে-ইলিশ খেতে চেয়েছিল ! তা কবে আসবে ?'

'দেখি, আসব একদিন—'

উত্তরটা বোধ হয় মনঃপূত হলো না অমলেশের। সোজাসুজি তাকালেন ব্রতীনের দিকে।

'হৈমন্তী ভালো আছে তো ?'

তাড়াতাড়ি করার জন্যে ঘাড় নাড়ল ব্রতীন এবং খুশি হলো। অমলেশ চলে যাচ্ছেন। উত্তাপহীন ব্যবহারে হয়তো অসন্তুষ্ট হলেন একটু। মাথায় ছোট, পিছন থেকে দেখার

জন্যেই সম্ভবত এখন অনেক বেশি বয়স্ক লাগে। বয়স কি সত্যিই নিরাভরণ করে দেয়! কলেজ ফুটবলে একদা লেফ্‌ট আউটে খেলতেন অমলেশ, কথায় কথায় একদিন বেরিয়ে পড়ে তথ্যটা—ছাত্রদের সঙ্গে খেলায় সেদিন বাড়তি উৎসাহ নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন অমলেশদা। পরনে গেঞ্জি আর আণ্ডারওয়্যার—দু'. গোলে পিছিয়ে পড়া অধ্যাপকদের সম্মান বাঁচাতে কোনাকুনি বল নিয়ে গোলের দিকে ছুটছেন অমলেশদা, অভূতপূর্ব সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দু' দলের খেলোয়াড়রাই থমকে দাঁড়িয়েছে। গোল হলো। ছাত্ররা তাঁকে কাঁধে তুলে ধরতেই চোখে জল এসে গেল অমলেশের—'ভাবছ হঠাৎ হয়ে গেল! তা নয়। এককালে অনেক দিয়েছি, কলেজ টিমে খেলতাম লেফ্‌ট আউটে। ইউনিভার্সিটি টিমেও নাম উঠেছিল।'

বেশ কয়েক দিন পরে কারুর জন্যে মমতা বোধ করল ব্রতীন। 'এককালে' কথাটা অনুরণন তুলছে কানে—পিছন থেকে দেখলে তাকেও এখন অনেক বয়স্ক লাগবে। অদৃশ্য প্রহরার ভিতর দিয়ে সে নিজের জন্যে একটা পথ খোঁজার চেষ্টা করল। প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। সম্পর্কের ভিতর ঢুকে পড়েছে অভ্যাস—লক্ষ্য তাড়া করলেও স্মৃতি জড়িয়ে ধরছে পায়ে পায়ে। এই মুহূর্তের অস্বস্তি কাটাতে কিঞ্চিৎ দ্রুত হলো ব্রতীন। ভিতর জুড়ে টের পাচ্ছে একটা এলোমেলো ভাব—ভাঙা ব্রিজের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ওপারে তাকাবার মতো, সে জানে না কেন!

ফুটপাথ বরাবর তাকালে রাস্তা দেখা যায় বহু দূর পর্যন্ত। আসন্ন বিকেলের এই সময়টা লোকজন কম থাকে রাস্তায়; ক্রমশ নরম হয়ে আসে রোদ, বাড়িগুলোর ছায়া ক্রমশ লম্বা হতে হতে ঢেকে ফেলে রাস্তা। অন্য দিনের তুলনায় আজ যেন একটু বেশিই ফাঁকা লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে হাওয়ায় একটা সোঁদা গন্ধ পেল ব্রতীন, কানে এলো কংক্রিটের ওপর দিয়ে শালপাতা উড়ে যাওয়ার খড়খড়ে শব্দ। এর সমস্তকেই গ্রহণ করার জন্যে ইন্দ্রিয় খুলে দিল ব্রতীন। ফাঁকা বাসস্টপের সামনে বসে এক ভিখিরি যুবতী একটা ছেঁড়া শাড়িকে ক্রমাগত জড়াবার চেষ্টা করছে গায়ে—কিন্তু কোনোভাবেই সম্পূর্ণ আড়াল করতে পারছে না নিজেকে। বোধ হয় পাগল, না হলে বুঝতে পারত প্রয়াসে কাজ দেবে না। ছেঁড়া অংশগুলোর লুকোচুরি খেলায় তবুও বিভ্রান্ত হচ্ছে না একটু।

পকেট খুঁজে একটা ভাঁজ-লাগা সিগারেট বের করল ব্রতীন। আবার অভ্যাসে না পৌঁছুলেও সেদিন রাতের পর থেকেই মাঝে-মধ্যে এক-আধটা খাচ্ছে। অনভ্যস্ত গলায় একসঙ্গে অনেকটা ধোঁয়া টেনে নেওয়ার ফলে অতর্কিতে নাকমুখ বুজে এলো। অবস্থাটা সামলে, কিছু না ভেবেই আবার সিগারেটে টান দিল সে। আশেপাশে আরো দু' তিনজন এসে দাঁড়িয়েছে। কবে আসবে? প্রশ্নটা আবার ছুঁয়ে গেল তাকে। অমলেশকে কি সত্যি কথাটা বলা যেত? বারো বছর আগে প্রায় এই সময়েই আহামরিকে নিয়ে ট্যাক্সিতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের চেম্বারে গিয়েছিল সে। তার ও আহামরির মাঝখানে বসে পান চিবুতে চিবুতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল সতীদি, সামনের সিটে বসে একের পর এক সে-সব কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন অমলেশদা। মাঝখানে সতীদি। তার দেওয়া নতুন বেনারসীতে গা মুড়ে জড়োসড়ো হয়ে রাস্তা দেখছিল আহামরি—সে নিজেও চুপচাপ থেকে বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনের মধ্যে একটা যোগ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল। পরে বিভাস আসে। সেদিন রাতে তারা বাইরে খেয়েছিল এবং তখনো ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা না হওয়ায় ওদের সঙ্গে ফিরে এসেছিল বাড়িতে। ব্রতীন জানত না আড়ালে এতো ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছে। সতীদি

যখন ওদের ঘরে যাবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে, দূর থেকে অমলেশদা বললেন, 'সে কি, আজ না কালরাত্তির !' চাপা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে সতীদি জবাব দিয়েছিল, 'তুমি থামো তো ! এখানে একগণ্ডা মাসি, পিসি, শাশুড়ি নেই । ওদের আজকেই ফুলশয্যা ।' 'তাই সই ! তুমি যখন বলছ—', ঠাট্টা করে বলেছিলেন অমলেশ, 'বুঝলে ব্রতীন, লাভ ম্যারেজের পুরোটাই লাভ ! এই সময় পুরো এক রাত্তিরের অ্যাডভানটেজ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা !'

পুরো তিন দিন অমলেশদের ওখানে থেকে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল ওরা । বারো বছর আগে ঘরের দেওয়ালে যে রঙ ছিল এখন তার পুরোটাই জ্বলে গেছে । পরিবর্তনের সবটাই কি তার চোখে পড়ে ! একসঙ্গে অনেকগুলো সম্পর্ক পেরিয়ে এসে পিছন থেকে নিজেকে দেখবার চেষ্টা করল ব্রতীন । সে কেন্দ্রে—চরকির মতো ঘুরছে নাগরদোলা, কোনো মুখই এখন আর পরিষ্কার দেখা যায় না । এই মুহূর্তে ভুলে-যাওয়া সমস্ত স্বাদ ফিরে পাবার জন্যে স্নায়ুজুড়ে একাগ্রতা আনবার চেষ্টা করল ব্রতীন—নতুন বেনারসীর গন্ধ থেকে আলাদা করে খুঁজল আহামরিকে । পেল না । পরিবর্তে একটা অন্য রকম গন্ধ উঠে এলো নাকে—পরিচিত হয়েও অপরিচিত, মাথার মধ্যস্থলে ধাক্কা দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেল নিচের দিকে ।

'ব্রতীন !'

কাঁধের ওপর একটা হাত এসে পড়েছে । নৃসিংহের সঙ্গে চোখাচোখি হবার পর পোড়া সিগারের গন্ধটা পুরোপুরি চিনতে পারল সে । এটা রাস্তা, দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে—নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ, এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জড়ো হযেছে কম করেও সাত-আটজন । পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে অল্প দূরত্বে সরে গেল ব্রতীন—যাতে নৃসিংহের হাতটা আপনিই খসে পড়ে । তারপর কথা বলতে গিয়ে অনুভব করল, যে-কোনো কারণেই হোক, তার জিব জড়িয়ে যাচ্ছে ।

বিশৃঙ্খল চোখ নিয়ে নৃসিংহ তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে । আড়ষ্টতা কাটিয়ে ব্রতীন জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার !'

'বাড়ি ফিরছ ?'

'কেন !'

মনে হলো নৃসিংহ উত্তর খুঁজছে । চট করে কিছু না পেয়ে সিগারটা চেপে ধরল ঠোঁটে । নিবে গেছে । ব্যস্ত হাতে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'তাড়া না থাকলে চলো, কোথাও গিয়ে বসি—'

'তাড়া আছে—' । এতোক্ষণে বোধ হয় সত্যিই বাস এলো । বলার কথাটা ভঙ্গিতে ফিরিয়ে আনল ব্রতীন । বাসটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইটায় উঠব ।'

'দাঁড়াও ।'

দেশলাইয়ের আগুনে ধোঁয়া টানার জন্যে খাবি-খাওয়া মাছের মতো নড়াচড়া করছে ঠোঁট । ওরই মধ্যে নির্দেশের মতো কথাটা গলিয়ে দিল নৃসিংহ । ইচ্ছে সত্ত্বেও নড়তে পারল না ব্রতীন । দেখল, কিছু যাত্রী তুলে বাসটা চলে যাচ্ছে ।

'ক'দিন থেকেই তোমাকে একটু আলাদা করে খুঁজছি । কিছু কথা ছিল—'

'কথা ! আমার সঙ্গে !' এবার সত্যিই আগুনে পা দিল ব্রতীন, এতোক্ষণ ধরে চেপে রাখা অস্বস্তিটা কেঁপে উঠল গলায়, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা থাকতে পারে না ।'

'এ-রকম ব্যবহার করছ কেন, ব্রতীন !' নৃসিংহ বলল, 'সহকর্মী ছাড়াও আমরা বন্ধু । যদি

কোনো মিসাণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে থাকে—', থেমে গিয়ে আবার বলল, 'কী এমন ব্যাপার হয়েছে সেদিনকে যে কথাবার্তা বন্ধ করে দিলে !'

'সেটা বোঝার কালচার তোমার নেই।'

'আর ইউ ম্যাড ?'

'আই'ম অলরাইট।' নিজের গলার চড়া সুর নিজেই ধরতে পারল ব্রতীন। আশেপাশে দু'একজন এরই মধ্যে তাকাতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে নিজেকে সংযত করল ব্রতীন, 'বাজে কথা বলার সময় আমার নেই—'

নৃসিংহ তাকিয়ে ছিল সোজাসুজি, ঠোঁট কাঁপছে—কিছু না বলে চোখ নামিয়ে নিল। এখন প্রায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তারা, তফাতটা ইচ্ছাকৃত। দেখে মনে হবে না ওরা বাসস্টপে দাঁড়ানো দু'জন যাত্রী ছাড়া আর কেউ।

'তোমার স্ত্রীকে জোর করে মদ খাইয়েছি বলেই কি এই সব ! দ্যাট্ ওয়াজ জাস্ট এ ফান্ !'

'কোনটা কী তা বোঝার মতো বোধবুদ্ধি আমার আছে, নৃসিংহ। আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো না—'

'আশা করি—', তাড়াতাড়ি বলতে গিয়েও সংযত হলো নৃসিংহ। তারপর, চাপা গলায় বলল, 'এ-জন্যে আহামরিকে নিশ্চয়ই কিছু বলোনি ?'

'নৃসিংহ, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না !'

'সরি। আমি দুঃখিত। শুধু একটা কথা—দোষটা আমারই ; এর ভিতর আর কিছু নেই। আমার মনে হয় কিছু আজেবাজে ভাবনা নিয়ে অশান্তিতে ভুগছ তুমি !'

'তোমার মনে হয় !' গলার স্বরে ব্যঙ্গ এড়াতে পারল না ব্রতীন, 'আমি কী ভাবছি না ভাবছি সেটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। হু আর ইউ টু সাজেস্ট— !'

'জানি, তুমি এখন অনেক কথাই বলবে।' সহ্য করার ধরনে নিজেকে গুটিয়ে নিল নৃসিংহ। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, আমাদের সম্পর্ক খারাপ হবার মতো কিছুই ঘটেনি। আমি তোমাকে বন্ধু বলেই মনে করি—'

কথাটা বলেই যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল নৃসিংহ। ব্রতীন দেখল, টান-টান শরীর নিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হচ্ছে ও। নিত্যকার সঙ্গী চামড়ার বড়ো ব্যাগটা ঠিকই ধরা আছে বাঁ হাতের মুঠোয়, হাঁটার ধরনে গ্লানি নেই কোনো। গত দেড় বছরে এই লোকটিই ছিল তার সবচেয়ে কাছাকাছি। গত কয়েক দিনের নিরপেক্ষতায় ভুল বোঝাবুঝি মিটমাটের একটা সুযোগ যদিও বা ছিল, এখন কী হবে বলা যায় না। সম্ভবত এটা এড়ানো যেত। তখন মনে হয়েছিল অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছে নৃসিংহ ; এখন দৃশ্য পাল্টে যাবার পর মনে হচ্ছে এতোটা না করলেও চলত। যা নিয়ে এতো বৈষম্য, সত্যি সত্যিই সেদিন ঘটেছিল কি ? আজকের ঘটনার জন্যে সে কি ক্ষমা চাইবে নৃসিংহের কাছে ? তা হলে এবং তার আগে ফিরতে হয় আহামরির কাছে। এখন থেকে তৃণাদের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে আছে ঘণ্টা তিনেক সময়, ইচ্ছে করলেই সে বাড়ি যেতে পারে। যদি যায়, দরজা আহামরিই খুলবে এবং নিশ্চিত অবাক হবে খুব। অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার জন্যে প্রয়োজনে একটু নাটকীয়ও হতে পারে ব্রতীন—ভালো লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগছে না। তারপরের ঘটনার দায়িত্ব আহামরির—রক্তে চুম্বক আছে তার, স্পর্শমাত্র নিজেকেও খুলতে দেরি করবে না।

ভিতরের অভিমান হাত চেপে ধরল ব্রতীনের। একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, প্রায় হঠকারীর তৎপরতায় সেটা থামিয়ে উঠে বসল চটপট। যা হবার হোক, ক্লান্তভাবে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে ভাবল, একটানা হারের পর এই প্রথম সে জেতার সুযোগ পেয়েছে—ভুলই হোক বা ঠিক, সে জিতবে। তাছাড়া উপলক্ষ না থাকলে কি নৃসিংহ এগিয়ে আসত!

সদ্য শুরু-হওয়া বিকেল ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। জন ও যানের বিচিত্র শব্দগুলো ডিঙিয়ে যাচ্ছে পরস্পরকে ; ওরই মধ্যে ঢুকে পড়ছে নৈঃশব্দ্য। যতোক্ষণ হাঁটে, অন্তত পায়ের পরিশ্রমের মধ্যেও নিজেকে চেনা যায় স্পষ্ট—এই মুহূর্তের ক্লান্তির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ট্যাক্সির একান্তে চোখ বন্ধ করতেই ফিরে এলো আহামরি : অ্যানাটমির চার্টের মতো নম্বর বসানো সর্বাঙ্গে ; কপাল, চোখ, নাক, মুখ, স্তন, নাভি, উরু—প্রতিটি প্রত্যঙ্গে সাবলীল হাত ঘুরিয়ে আনল ব্রতীন, বুকে কান পেতে শুনল হৃৎপিণ্ডের অবিরাম শব্দ, যদি কিছু খুঁজে পায়। বারো বছর ধরে একটু একটু করে এসবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে সে, এখন আহামরিকে খোঁজা মানেই নিজেকে খোঁজা। তবু কেন এতো দূরত্বময় লাগছে সব কিছু!

কাগজের অফিসের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে লিফ্‌টে, সেখান থেকে সোজা নিউজ-রুমে চলে এলো ব্রতীন। দরজা থেকেই দেখতে পেল বিভাসকে। মুঠো করে সিগারেট ধরে ঘাড় ঝুঁকিয়ে এক মনে লিখে যাচ্ছে কিছু। সামনে গিয়ে দাঁড়াবার পর খেয়াল করল।

'আরে আয়, আয়। বোস।'

'ব্যস্ত খুব?'

'না, একটা স্টোরি করছিলাম—!' চেয়ারগুলো কোনোটাই জায়গামতো নেই। উঠে গিয়ে একটা টেনে আনল বিভাস, নিজে বসতে বসতে বলল, 'কী যেন একটা হয়েছিস! রোগা, না মোটা?'

'একসঙ্গে দুটোই হওয়া যায় না!' প্রশ্নটার অর্থ বুঝে পাশ কাটিয়ে গেল ব্রতীন, 'সিগারেট আছে?'

'কবে ধরলি আবার!'

'ধরিনি, মাঝে-মাঝে খাই—'

কান পর্যন্ত ছড়িয়ে হাসল বিভাস। প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোর মুখে মাঝে-মাঝে কথাটা শুনলেই হাসি পায়—'

'কেন!'

'মনে পড়িয়ে দিতে হবে? থাক। চা খাবি নাকি?'

'বল।'

চেঁচিয়ে বেয়ারাকে ডাকল বিভাস ; দু' কাপ চা আনতে বলল।

'থেমে গেলি কেন?' ব্রতীন ফিরে এলো আবার, 'বল না?'

'বলতেই হবে?' কলম তুলে সেন্‌টেন্সের শেষ শব্দটি কেটে দিল বিভাস। লেখায় চোখ রেখেই হাসল আবার, 'বয়স হয়ে যাচ্ছে। আজকাল খিস্তিটিস্তি বিশেষ করি না।' তারপর মাথাটা এগিয়ে আনল সামনে, 'এখনো কি মাঝে-মাঝে চালাচ্ছিস, নাকি রেগুলার?'

বারো বছর আগে শব্দ নিয়ে একটা গোলমাল করেছিল সে ; জানে না বলে নয়—তার ও আহামরির ব্যক্তিগত সম্পর্ক গোপন করার জন্যে। ঘটনাটা এখনো মনে রেখেছে বিভাস,

কথাগুলো মনে পড়ায় ব্রতীনও হাসল। নতুন ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের ধোঁয়ায় জ্বালা করছে গলা ; আটকে-পড়া ধোঁয়াটা পুরোপুরি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে।

'কিছুই কি আর রেগুলার আছে, বিভাস ! বয়স আমারও কম হলো না !'

'কতো হলো ?'

'আটত্রিশ—'

ছোঁও চল্লিশ, যৌবন ফিরে পাবে।' মুঠো করে সিগারেটে টান দিল বিভাস, তাকাল সোজাসুজি, 'বউ কেমন আছে ?'

'ভালো।'

'আর কোনো খবর আছে ? নাকি এখনো ফ্যামিলি প্ল্যানিং চলছে ?'

চা এসে গেছে। কাপটা হাতে তুলে চুমুক দিল ব্রতীন। জবাব দিল না। আবার কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বিভাস। মন ওইখানেই, খাপছাড়াভাবে কথাগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। টেলিপ্রিন্টারের যান্ত্রিক শব্দে কান রেখে আবার একা হয়ে গেল ব্রতীন। আপাতত তার সমস্যা সময় কাটানো ; কথা বলে, চুপচাপ বসে থেকে, যে-কোনো উপায়ে। শুধু একজন সঙ্গী দরকার। বিভাসের সমস্যা আলাদা, লেখাটা হয়তো শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি। এখন তার চলে যাওয়াই ভালো।

'তুই কাজ কর, আমি চলি—'

'কেন !' বলেই সামলে নিল বিভাস, 'কিছুক্ষণ বসে যা, আর কয়েকটা লাইন লিখলেই হয়ে যাবে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি, ডাকে যাবে—'

'কী-রকম !'

আঙুলে আঙুল জড়িয়ে হাড় মটকানোর শব্দ তুলল বিভাস। পুরো কাপ চা গিলে নিল এক চুমুকে।

'যোধপুর পার্কে একটা ফ্যামিলি আজ স্যুইসাইড করেছে। ভদ্রলোক গভর্নমেণ্ট অফিসিয়াল, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, তার সুন্দরী স্ত্রী, দু'টি ছেলেমেয়ে। সব বিষ খেয়ে। ছেলেমেয়ে দু'টিকে অবশ্য মারা হয়েছে। প্যাথেটিক ব্যাপার !'

'কারণ ?'

'সেটাই এখনো জানা যায়নি। কেউ বলছে স্ত্রীর অ্যাফেয়ার ছিল, কেউ বলছে স্বামীর। গোলমেলে কেস—'

ধোঁয়াটা সোজা গিয়ে ধাক্কা দিল টাকরায়। কাশির বেগ চাপা দেওয়ার চেষ্টায় বুকে চিনচিনে ব্যথা টের পেল ব্রতীন।

'এতো বিষই বা এরা পায় কোথা থেকে !'

'ওটা কোনো প্রব্লেম নয়।' বিভাস বলল, 'সহজেই জোগাড় করতে পারে, যে কেউ। ল্যাবরেটরি আছে, ডিস্‌পেন্‌সারি আছে—বিষের অভাব নেই।'

'হরিব্‌ল।' বলে একটু থামল ব্রতীন, 'তুই লেখ, আমি চলি—'

'একদিন আসব তোর বাড়িতে। ধর, সামনের উইকে ?'

ব্রতীন বলতে যাচ্ছিল 'না', পরিবর্তে ঘাড় নাড়ল। সে কারুর করুণা চায় না।

পঁয়তাল্লিশে পৌঁছুতে এখনো বেশ কয়েক বছর দেরি আছে তার। চল্লিশে পৌঁছুনোর জন্যে বিভাস একটা ইঙ্গিত দিল। তার ও ভদ্রলোকের মধ্যে বয়সের ব্যবধান সাত বছরের ; ফ্যান্টাসির কথা ভাবলে এই সাতটি বছরের সৌভাগ্য ভদ্রলোককে দান করা যায়—অন্তত

পঁয়তাল্লিশের আগে তাঁকে আত্মহত্যা করার কথা ভাবতে হয়নি। এমনও হতে পারে, বয়সের এই হিসেবটা সে, ব্রতীন, এখন ভেবে নিচ্ছে জোর করে। কে বলতে পারে সাত-আট বছর আগেই শুরু হয়নি তাঁর আত্মহত্যার পরিকল্পনা, কে বলতে পারে সুন্দরী স্ত্রীর যে-অ্যাফেয়ার শেষ পর্যন্ত তাঁকে সাঙ্গ করে দিল কাল, ঢের দিন আগেই তা শুরু হয়নি! এই সাত-আটটি বছর অন্তত ক্রমাগত নিজের সঙ্গে যুঝে গেছেন তিনি। যদি তাই হয়, তা হলে অসাধারণ বলতে হবে ভদ্রলোককে—ব্রতীন তাই ভাবল। দু' সপ্তাহও হয়নি নিজের জীবনে একটা অ্যাফেয়ারের গন্ধ পাচ্ছে সে, অকল্পনীয় বলেই ব্যাপারটা অসহ্য ; অনুভূতির পরিমাপ করলে এরই মধ্যে তার গায়ে পড়েছে জেব্রার দাগ। আর, সন্দেহ সত্যি হলে আহামরি-নৃসিংহের ব্যাপারটাও নতুন নয়। এটা শুরু হয়েছে এক বছরেরও বেশি দিন আগে, যেদিন, মনে করতে পারে ব্রতীন, আলাপের পর চতুর্থ দিনেই আহামরিকে আচমকা 'তুমি' সম্বোধন করে বসল নৃসিংহ। সেদিনই কি ফিনফিনে একটা সন্দেহে দুলে ওঠেনি সে।

অ্যাফেয়ারটা যে মহিলার দিকেই ছিল তা অবশ্য জোর করে বলতে পারল না বিভাস। থাকা অসম্ভব নয়। কথাবার্তা থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় বিষটা সংগ্রহ করেছিলেন ভদ্রলোকই, বিভাসের সূত্র অনুযায়ী বিষ যেসব জায়গা থেকে সংগ্রহ করা যায় সেখানে ভদ্রলোকেরই সুযোগ থাকবে, মহিলার নয়। একটু প্রোব করলেই রহস্যটা ধরা পড়ত। অসুবিধে হলো, ছেলেমেয়ে দুটিও—যাদের মেরে ফেলা হয়েছে—গত : তারা থাকলে ঘটনাক্রম বুঝতে সুবিধে হতো অনেক। আরো অসুবিধে, এখানে নৃসিংহ নামের কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্যুইসাইডের ঘটনাটা ধাক্কা দিতে দিতে অনেক দূর হাঁটিয়ে আনল ব্রতীনকে। ক্লোরোফর্মের ঘোরেও যেমন সক্রিয় থাকে রোগী, অনেকটা তেমনি, বিকেল ও সন্ধ্যার তারতম্য চোখে না পড়লেও আবছাভাবে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে লাগল সে—বাসে উঠল, টিকিট কাটল, নির্দিষ্ট স্টপে বাস থেকে নেমে চেপেচুপে মুখ মুছল রুমালে : মুখ ফুটে না বললেও সে বোঝে হাতমুখের তেলতেলে, অলস ভাবটুকু তৃণারা কোনো দিনই পছন্দ করে না।

গাছে ফুল ফোটার ব্যাপারটা অনেক দিন নিজের চোখে লক্ষ করেনি ব্রতীন। অবলম্বনের সুবিধের জন্যে আহামরির ঘরের দেওয়ালে আছে মা কালীর ছবি এবং পাশাপাশি তারকেশ্বরের শিব—মাঝে মাঝে ফুলের মালা পড়ে সেখানে। বেশির ভাগই গন্ধহীন আকৃতিমাত্র। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘরের মধ্যে আবছা গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে অন্যমনস্কভাবে দূরে কোথাও ফুল ফোটার কথা ভাবে ব্রতীন—স্মৃতি টেনে নেয় সেই সব দিনে, যখন বিশেষভাবেই আহামরির জন্যে, কিংবা তার খোঁপার জন্যে, সে ফুলের মালা কেনার কথা ভাবত। তখনই টের পেয়েছিল সে সন্ধ্যায় রূপ বদলে নেয় মেয়েরা—সারা দিনের স্বচ্ছতার পর মাংসে জেগে ওঠে রহস্য, শরীর খুঁজে নেয় ঘ্রাণ। রূপ-রহস্য থেকে কবে সে প্রত্যাহার করে নিল নিজেকে এখন ঠিক মনে পড়ে না। এখন তৃণাদের বাগান থেকে উঠে-আসা জুঁইয়ের গন্ধ স্মৃতির দিকে সামান্য টেনে নিল তাকে। গন্ধটা ভিজে। আজ সারা দিন বৃষ্টি হয়নি, খটখটে চারিদিকে শুধু মেঘের ছায়া ছড়িয়ে পড়তে দেখেছে সে। মনে হয় এখানে হয়েছে।

লিভিং রুমের সেলফে ব্রোঞ্জের বিশাল নটরাজ অনেকক্ষণ একচক্ষু করে রাখল

ব্রতীনকে। গোটা ঘর জুড়ে পরিপাটি সৌন্দর্য—ধুলোহীন কার্পেটে পা রেখেই মনে পড়ে নিজেকে, মনে পড়ে সে ট্রামে চড়ে, কলেজে পড়ায়, মাসান্তে সাদা খামের ভিতর তিনশোটি টাকা তার খুব প্রয়োজন। তৃণার কাছে এলে ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যায় সে—ঢাকা বারান্দা দিয়ে কোণের ঘরের দিকে যেতে যেতে একবারও দাঁড়ায় না। সেটা নিয়মবিরুদ্ধ। আজ তাকে চুপচাপ বসে থাকতে হবে স্পঞ্জের অস্বস্তিকর আরামের ওপর, যতোক্ষণ মিসেস সেন এসে না পৌঁছন, যতোক্ষণ কথা শেষ না হয়। তৃণা সম্ভবত বাড়িতেই আছে ; প্রয়োজন যা চায় মেয়েটির শরীর কোনো দিনই তার কম-বেশি যায় না। একা থাকলে ব্রতীন এক-একদিন ফলের খোসা ছাড়ানোর মতো করে ছাড়িয়ে দেখেছে তৃণাকে—সেখানেও আহামরির ছায়া, কল্পনা তাকে বেশি দূর দেখাতে পারে না।

ব্রতীন অনুভব করল নাকের নিচে বিজবিজ করে উঠছে ঘাম। রুমালটা বের করার কথা ভেবেও নিরস্ত হলো ; এখন এ-রকম কিছু করা অশোভন।

'ফোন পেয়ে বিরক্ত হননি তো ?'

ব্রতীন উঠে দাঁড়াল।

'না। বিরক্ত হবার কী আছে !'

'আগে আপনার বাড়িতেই করেছিলাম। কাল, আজ, দু' দিনই। একজন মহিলা বললেন, এ-সময় আপনি বাড়িতে থাকেন না—'

'ও। বোধ হয় মিসেস বল, আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে থাকেন—'

'তৃণা বলছিল।' বসতে বসতে হাসলেন মিসেস সেন, 'সেই জন্যেই খবর পাননি !'

অতো বড়ো মেয়ে কারুর ছাত্রী হতে পারে না—মিসেস বল এথিক্স্ মানে, এতো যে ফোন আসে, কেউ জানতে পারে না কখনো। প্রসঙ্গের অভাবে হাত-পা গুটিয়ে নিল ব্রতীন। সম্ভবত খানিক আগেই ঘর জুড়ে স্প্রে করা হয়েছে ফ্রেশনার, এই মুহূর্তের নৈঃশব্দ্যে ছড়িয়ে পড়ছে চাপা সুগন্ধ। গন্ধটা নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নিতে নিতে ব্রতীন ভাবল, বর্তমান ভিন্ন আর কোনো অনুভূতি প্রশ্রয় পায় না এখানে। বিকেল থেকে এখানে আসার আগে পর্যন্ত চিন্তায় এলোমেলো হয়ে-যাওয়া স্মৃতিগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করল সে এবং অনুভব করল, নির্জন রাস্তায় দাঁড়ানো ল্যাম্পপোস্টের মতো পরপর দাঁড়িয়ে আছে আহামরি, নৃসিংহ, বিভাস, অমলেশদা, সতীদি, আর যোধপুর পার্কের সেই ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী—ব্রতীন যাঁদের নাম জানে না। যোগসূত্রহীন ও বিচ্ছিন্ন ; কাছে টানার প্রাণপণ চেষ্টায় তারা ক্রমশই চলে যাচ্ছে দূরে। এতো দূর অস্পষ্টতা থেকে ব্রতীন তাদের নাগাল পেল না।

'সরি, আমার একটু দেরি হলো।' তৃণার বাবা ঘরে ঢুকলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারার হাতে চলে এলো চা ও স্ন্যাক্স্। সেগুলোর বিতরণ লক্ষ করতে করতে চশমার ফ্রেম ঠিক করে নিলেন মিস্টার সেন, 'একটা ফ্যামিলি প্রব্লেম অ্যারাইজ করেছে। ভাবলাম, ইউ মাইট হেল্প্ আস টু টেক এ ডিসিসান।'

ব্রতীন জড়োসড়ো হলো। কয়েক দিন আগেই স্টেট্স্‌ম্যানে চেয়ারম্যান্স্ স্পিচে ছাপা হয়েছিল ভদ্রলোকের ছবি, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর—ছবিটিই তাকে টেনে নিয়ে যায় বক্তব্যের ভিতরে। যেন একটা চায়ের কাপের ভিতরে সমগ্র করে আনা হয়েছে দেশের শিল্প ও অর্থনীতির সমস্যাগুলোকে, সাবলীল ধোঁয়ার মতো উড়ে যাচ্ছে প্রতিকারের ভাবনা ! আপাতত ব্রতীনের কাছে সাহায্য চাইছেন তিনি—টু টেক এ ডিসিসান ! অবিশ্বাস্য মনে হলেও এখন একটা ভান দরকার। ইত্যাদি ভেবে সাদা খামের পরিচ্ছন্নতার আড়ালে

আত্মগোপন করল ব্রতীন।

'চায়ে চিনি ঠিক আছে তো?'

শরীরের ভার না থাকলে তৃণার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য ধরা যেত না। গলার স্বর সে-রকম কিছু বলে না। চায়ের সুগন্ধে নাক ডুবিয়ে অনুগতের মতো মিসেস সেনের দিকে তাকাল ব্রতীন; ঘাড় নাড়ল। অন্যত্র হলে অনায়াসে সে কোন ব্র্যাণ্ডের চা জিজ্ঞেস করে নিতে পারত।

'সুব্রতর সঙ্গে তৃণার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে।' মিস্টার সেন বললেন, 'ফ্যামিলির মধ্যেই রাখলাম ব্যাপারটা। এখন সমস্যা হলো, বিয়ের জন্যে আমরা অপেক্ষা করব কি না!'

'মানে!'

প্রশ্নও না, উত্তরও না, মাঝামাঝি জায়গায় আড়ষ্ট স্বর ভাসিয়ে দিল ব্রতীন। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন স্বামী-স্ত্রী। চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিলেন মিস্টার সেন।

'সুব্রত বলছে তৃণার এম-এ পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এদিকে তৃণা—'

কথাটা শেষ হবার আগেই থেমে যেতে দেখে উস্‌কে দিলেন মিসেস সেন, 'বলো, বলো না!'

'সি ইজ এ বিট ফার্ম্‌। মানে, এখনই বিয়ে করতে চায়—'

সোজাসুজি উত্তর আশা করছেন ভদ্রলোক। চোখমুখ ভর্তি। এর ফলে, ব্রতীন ভাবল, সে একটু একা হলেও হতে পারে। অমলেশদার সঙ্গে সতীদির বয়সের যা তফাত, তার সঙ্গে তৃণারও প্রায় তাই। তৃণা ফোন করলে মিসেস বল জানতে দেয় না আহামরিকে, সেও না—আগের দিন বলেছিল 'নৃসিংহ'। আহামরি ও নৃসিংহ, এই মুহূর্তে দু'জনেই তার সামনে দাঁড়িয়ে। ব্রতীন ভাববার চেষ্টা করল, শুধু তিনশো টাকার জন্যেই সে ইতস্তত করছে কি না। তারপর বলল, 'বেশ তো!'

মিস্টার সেন হাসলেন।

'ওটা অ্যাপ্রুভ করা হলো। আমরাও বিয়েতে না করিনি। আপনি কি কিছু সাজেস্ট করতে পারেন—অ্যাজ হার টিচার?'

'আমার কিছু সাজেস্ট করার নেই।' নিজের ভিতর থেকে বেরুতে চাইল ব্রতীন, 'এটা আপনারাই ঠিক করবেন। এবং ওরা, যারা বিয়ে করবে।'

'জানি। তবু যেটা জানতে চাইছিলাম, স্টাডি কনটিনিউ করলে কি কিছু গেন করবে ও? যদি রেজাল্ট ভালো করা সম্ভব হয়, তা হলে উই ডোণ্ট মাইণ্ড। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যেতে পারে—'

এতোক্ষণে বিষয়টার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারল ব্রতীন। এতো দিন ধরে মাসে মাসে তিনশোটা টাকা দেওয়ার পরিবর্তে ওঁরা আর কিছু প্রতিদান চান। এখনই সময়, এখনই নিজেকে নিয়ে সে কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। খুব ভেবেচিন্তে, ঘাড় সোজা করে সে বলল, 'কনটিনিউ করলে ভালো রেজাল্টই করবে মনে হয়। তা ছাড়া, একটা বছর কোনো সময়ই নয়; তৃণার বিয়ে হওয়াও কি কোনো সমস্যা!'

'দ্যাট্‌স্ ইট। আই অলসো এগ্রি।' হাতে স্মেলিং সল্টের শিশি, নাকের সামনে দু'বার ঘুরিয়ে শিশিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন মিস্টার সেন, 'ও আমাদের একমাত্র চাইল্ড, আমরাও কিছু ব্যস্ত নই।'

সম্ভবত সফল হয়েছে সে। টান-করা শরীরটাকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল ব্রতীন।

'তা হলে তৃণা কিছু জিজ্ঞেস করলে তাই বলবেন।' মিসেস সেন উঠে দাঁড়ালেন, 'ও ওপরে আছে, ঘরে।'

হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না ব্রতীন, এসব এখানে অবান্তর। ঠিক বুঝতে পারছে না, তার পরামর্শকে এঁরা কতোখানি গুরুত্ব দেবেন, বা এ-ব্যাপারে আদৌ তাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কি না। দেখাদেখি উঠে দাঁড়াবার সময় অনুভব করল মেরুদণ্ড বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে আয়োডিনের জ্বালা। শরীর উপলক্ষ মাত্র, কাগজে পড়েছিল, এ-ধরনের অনুভূতি আসে ভয় থেকে।

'সরি, আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম!' বললেন মিস্টার সেন, 'আমাদের একটা পার্টি আছে, বেরুতে হবে। একদিন আসুন না সময় করে—হ্যাভ ডিনার উইথ আস। এডুকেসান নিয়ে আলোচনা করা যাবে। দেয়ার আর সো মেনি প্রবলেম্স্!'

জলভর্তি পিতলের ঘড়া উপুড় করে দেওয়া হয়েছে, ওলট-পালট-করা ভোঁতা শব্দ উঠছে চারিদিকে। গুছিয়ে বললে এগুলোই রূপ নিত অক্ষরে ; মুদ্রিত হরফে আছে এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা, যা যে-কোনো সময়েই টেনে নিয়ে যেতে পারে মুগ্ধতাবোধের দিকে। আজ মনে হয়, চেয়ারম্যানের স্পিচ্ তাকে একটু বেশিই অভিভূত করেছিল। নৃসিংহ প্রায়ই এক ধরনের ম্যাচুরিটির কথা বলে, সুখে-দুঃখে যা ক্রমশই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় নিজের দিকে। সেই পরিণত মানসিকতা থেকে সম্ভবত নিজেকে বিচ্যুত করে ফেলছে সে, ক্রমাগত।

সিঁড়িতে পা রাখলে মনে হয় সে-ই প্রথম যাত্রী, মোজেইকের ঝকঝকে নিস্পৃহতা এখনো ঘেঁসতে দেয়নি কাউকে। চেনা রাস্তায় যেতে, তাই, প্রতিদিনই নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হয় স্মৃতি, নিঃশ্বাস ঝরে পড়ে চুপচাপ। বাঁকের মুখে জানলার স্ট্যাণ্ডে বসানো নিপুণ হাতের কাজ-করা ব্রোঞ্জের ভাস-এ চমকে ওঠে ফুলগুলি, সম্ভবত শরীরের হাওয়া লেগে। একটা কল্পনা ছুঁয়ে যায় ব্রতীনকে : মনে হয় পা ফেলার অভ্যাসে সে এখনো নিম্নবিত্তের ঢঙ এড়াতে পারেনি। ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার তেমনিভাবে নানা দিক থেকে আলো পড়ে এখানে, শুধু সিঁড়ি, বারান্দা ও রেলিংয়ের মসৃণতা চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে! কেন জানে না, আজ সে বিশেষভাবে লক্ষ করে এগুলো ; 'দ্যাটস্ ইট্' কথাটা প্রতিধ্বনি তোলে কানে, যেতে যেতেই থেমে দাঁড়িয়ে অনুমান করে সেনদের বেডরুমের নিভাঁজ পর্দায় অদৃশ্য প্রহরা। অতর্কিতের দ্বন্দ্ব এসে এলোমেলো করে দেয় ব্রতীনকে—এসব কি তার কাছে দাবি করে কিছু! ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পা। আর একটু এগোলেই তৃণার ঘর। আল্‌গা হাওয়ায় থিরথির করছে ডাবল-নিটের পর্দা ; খুব হাল্‌কা একটা সুরতরঙ্গ ভেসে আসে কানে। ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যে প্রস্তুত আছে তার গলা খাঁকারি দেওয়া বা জুতোর অতিরিক্ত শব্দ তোলা, যাতে তৃণা টের পায় তার আবির্ভাব। কিন্তু, আজ সে এসব অভ্যাস থেকে বিরত থাকল। জলে জল আসার মতো একটি চিন্তায় বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছে আর একটি চিন্তা—তারপর আর একটি : আজ সকাল থেকে ঘটে-যাওয়া সমস্ত ঘটনার স্মৃতি জট পাকিয়ে অন্ধ মাছির মতো চক্রাকারে ঘুরতে লাগল মাথায়। সম্ভবত সে নিজের ভিতরেই যাবার চেষ্টা করেছিল, তারপর, তাৎক্ষণিক আবেগের জের সামলাতে পারেনি। সম্ভবত সেন-দম্পতির সামনে আর একটু দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল তার, আর একটু স্পষ্ট—শুধু এটুকু ভেবে যে তৃণা ও সুব্রতর মাঝখানে দাঁড়াবার মতো সম্ভাব্য কোনো ভূমি নেই। তা হলে কেন

এই প্রতারণা। সম্ভবত নৃসিংহের প্রতি আজকের ব্যবহার অনুচিত হয়েছে ; প্রসঙ্গটা ব্যক্তিগত বলেই উপেক্ষা করা উচিত ছিল নৃসিংহকে। তা না করে প্রকারান্তরে সে কি আরো বেশি প্রত্যক্ষ করে তুলল না নিজেকে, নিজের দুর্বলতা ও ভয়। 'সন্দেহ যার স্বভাব, দু' চোখের জায়গায় সে চার চোখে দ্যাখে', ইতিমধ্যে একদিন বলেছিল আহামরি—কথাগুলো পুনরায় ফিরে এলো কানে। অবজ্ঞা মিশিয়ে দেখেছিল বলেই আহামরির পুরো মুখটা দেখতে পায়নি সেদিন। সম্পর্কহীন আবছা একটা দৃশ্য মনে পড়ল তার : সাদা দেওয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল, বাইরে অবিরাম বৃষ্টির শব্দ। আপাতত বুকের মধ্যে শব্দটা মোচড় দিয়ে গেল।

নিচে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ। বোধ হয় পার্টিতে বেরিয়ে গেলেন ওঁরা। ধাতস্থ হয়ে ব্রতীন ভাবল তৃণা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে বলার কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিল সে।

'তৃণা!'

'আসুন, ব্রতীনদা—'

ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না ব্রতীন। রেকর্ডে খুব মৃদু শব্দে বেজে চলেছে সেতার, আলোর সুষম প্রক্ষেপে ফিকে হলুদ দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে কমনীয়তা—আসবাব কম বলেই ঘরটাকে আরো পরিচ্ছন্ন লাগে। ঘরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিল্ট-ইন্ পার্টিসান, সামনে বুক-র‍্যাকের আড়াল, ওদিকে, ব্রতীন জানে, তৃণার বেডরুম। জানে কোথায় আছে তৃণা ; দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে তার সজীব সম্পূর্ণতা নিয়ে। পোশাকে চমক দিতে ভালোবাসে তৃণা।

এ-রকম স্নিগ্ধতায় অপেক্ষা করতে খারাপ লাগে না। সোফার এক কোণে বসে যে-কোনো একটা ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিল ব্রতীন ; যে-কোনো একটা পাতায় মনঃসংযোগ করার জন্যে যথাসাধ্য তৎপর করে তুলল আঙুলগুলো। জুত হলো না তেমন। আঙুলের তৎপরতায় সায় দিচ্ছে না চোখ, নিঃশ্বাস হয়ে উঠছে এলোমেলো। বহুকাল সে এমন ক্লান্ত বোধ করেনি। এখন কোনো একটা অবলম্বন পেলে ভালো হতো ; অন্তত একটা সিগারেট ; কয়েক দিন মাঝে মাঝে খেয়ে দেখেছে ধোঁয়া এক রকম চাঙ্গা করে তোলে শরীর। আপাতত সে-সুযোগ নেই। এখন থেকে পুরো একটা প্যাকেট কিনে সঙ্গে রাখবে। তবু সঙ্গে থাকবে একটা কিছু, সারাক্ষণ—নিজস্ব অধিকারের বস্তু। ক্লান্তিতে হাই উঠল ব্রতীনের। হঠাৎ অনুভব করল, সেতারের শব্দটা ছড়াতে শুরু করেছে তার ভুরুর ওপর।

'কী, শেষ হলো কনফারেন্স!' বেরিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্ত গলায় বলল তৃণা, 'বাব্বা, বোর্ড মিটিংয়েও এতো সময় লাগে না!'

'যা বলেছ!'

নতুন করে হাসলে জমানো বুকের ওপর আলতো হাওয়া উড়ে যায় তৃণার।

'আপনি এতো নার্ভাস কেন!'

'নার্ভাস!'

'দেখলাম তো একবার। এমন মুখ করে বসেছিলেন যেন আপনাকেই বিয়েব পিঁড়িতে বসতে বলা হচ্ছে!'

কথাবার্তায় তৃণা কোনো দিনই সম্পর্কের ধার ধারে না, যা বলার বলে ফেলে স্পষ্ট।

গোড়ার দিকে এ-জন্যে বিস্তর অস্বস্তিতে পড়েছে ব্রতীন। আপাতত দাঁতে দাঁত ঘষে 'টিচার' শব্দটিকে পিষে ফেলল। তার ও তৃণার মধ্যে ব্যবধান হাত চারেকের বেশি নয়; আর একটু কমও হতে পারে। সোজাসুজি ওর মুখের দিকে তাকাল ব্রতীন—মুখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আনল শরীরে, আবার ফিরে গেল মুখে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তৃণা তাই, এতোটুকু বেশি বা কম নয়। তফাত এইটুকু, তৃণার সৌন্দর্যে প্রলোভন বেশি। হলদে রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ আর হাল্‌কা সবুজ ডুরে শাড়িতে যতো দূর সম্ভব ঢেকে রেখেও নিজেকে ঢাকতে পারেনি পুরোপুরি। দুই ঠোঁটের অল্প-ফাঁকের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে চমৎকার সাদা দু' টুকরো দাঁতের আভাস; জেগে-ওঠা স্তনের ভঙ্গিতে ভান নেই কোনো। ওই ঠোঁট তার জন্যে নয়, ওই বুক তার জন্যে নয়, ওই শরীর তার জন্যে নয়—ব্রতীন ভাবল, নৃসিংহ যতো সহজে পারে আহামরির দিকে ছুটে যেতে, চেপে ধরতে হাতের কব্জি, একই তৎপরতায় সে কি পারে তৃণার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত হতে!

নিজের ভিতরেই পরপর অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে এলো ব্রতীন, একেবারে প্রত্যন্তে এসে সংযত করল নিজেকে। না, পারে না। আর, পারে না বলেই ওই শরীর নিয়ে আর একজনের খেলা করার অধিকার ইচ্ছে করেই দেরি করিয়ে এসেছে সে।

একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের নিচের সাদা অংশ জলে ভরে এলো ব্রতীনের। ভব্যতা যা দাবি করে সম্ভবত তার চেয়ে একটু বেশিক্ষণই তাকিয়ে ছিল সে। ইতিমধ্যে কখন থেমে গেছে সেতারের সুর খেয়াল করেনি।

পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার জন্যে আরো দু'এক মুহূর্ত সময় নিল ব্রতীন। শেষ কোন কথায় এসে তারা থেমেছিল মনে করতে পারল না।

'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই সিগারেট আছে। দিতে পারো?'

'আপনি খান নাকি?'

'খাই। মাঝে মাঝে। দিতে পার?'

'দিচ্ছি—'

ঈষৎ এলানো গলা তৃণার; শুনলে মনে হবে স্বর-সঙ্কোচ অভ্যাস করছে। উঠে, হেঁটে গেল পার্টিসানের দিকে। সিনেমার পর্দায় একদা বীজ থেকে গাছের উদ্ভব লক্ষ করেছিল ব্রতীন, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা সেই সবুজে মিশেছিল সাপের তৎপরতা। অনেকটা সেইভাবে, নিমেষে, এই মেয়েটি রূপান্তরিত হলো তার চৈতন্য জুড়ে। এটা অস্বাভাবিক, শরীরময় আকস্মিক স্ফুরণ এড়াতে এড়াতে সতর্ক হলো ব্রতীন। নিজেকে সে বড়ো বেশি প্রকাশ করে ফেলছে।

প্লেয়ারে নতুন রেকর্ড চাপিয়ে ফিরে এলো তৃণা। হাতে আনকোরা দামী সিগারেটের প্যাকেট। একটা টেনে বাড়িয়ে ধরল ব্রতীনের দিকে, নিজেই দেশলাই জ্বালল।

যতোটা সম্ভব দ্রুত সিগারেটে আগুন টেনে ব্রতীন বলল, 'বোসো। তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'এতো গম্ভীর করে বললে ভয় লাগে—'

সঙ্গে সঙ্গে বসল না তৃণা। বসার আগে আঁচল ঠিক করল, বসার পর ডান পায়ের আঙুল টেনে বাঁ পায়ের গোড়ালিটা ঢেকে নিল। আল্‌গা হাসিতে ঠোঁটের কোণ কুঁকড়ে উঠল অল্প; ফোনে সে আরেক রকমভাবে হাসে। ব্রতীন চোখ ফেরাল না। আজ সে নির্লজ্জ হবে; দৈন্য দিয়ে ভরে তুলবে ক্লান্তি। উৎক্ষিপ্ত কয়েকটা ধোঁয়ার রেখা তৃণার কাছাকাছি গিয়েও

ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যে। এখনকার দূরত্বটা অনুমান করে নিতে পারে—নিশ্চিত হাত তিনেকের বেশি হবে না। সেটা কিছু নয় ; এক বিছানায় শুয়ে আরো কম দূরত্বে থেকেও আজকাল আহামরিকে মনে হয় অনেক দূরের। শরীর সেতু নয়, হয়তো উপলক্ষ মাত্র ; অন্তর্নিহিতে আছে গভীর ও দুর্বোধ্য আরো কিছু, সে যার নাগাল পাচ্ছে না।

অস্বস্তিকর এই বসে থাকা। কথার অভাব অসহিষ্ণু করে তুলল ব্রতীনকে।

'প্যাকেটটা তোমার কাছেই ছিল ?'

তৃণা চোখ তুলল।

'কেন !'

'খাও ?'

'মাঝে মাঝে।' তৃণা স্বচ্ছন্দ হলো। 'যখন খুব মাথা ধরে বা একা লাগে—'

'একা ! লাগে ?'

তৃণা জবাব দিল না। হঠাৎই আড়ষ্ট হয়ে পড়ল কেমন। ওকে লক্ষ করতে করতে প্যাকেটটা খুলে ফেলল ব্রতীন।

'নাও, খাও একটা—'

'এ কি ! আপনার সামনে কেন খাব !'

'আমি মাইণ্ড করব না।'

জায়গা ছেড়ে উঠে এলো ব্রতীন। নৃসিংহের বড়ো শরীরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে আহামরি—দৃশ্যটা ফিরে এলো চোখে। তার শরীরের মাপ অতো বড়ো নয়। পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে দেখল নাক দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বের করে যাচ্ছে তৃণা ; ধোঁয়ার আড়ালে জ্বলজ্বল করছে দু'টি চোখ। ব্রতীনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল ঠোঁট ছড়িয়ে।

'প্যাকেটটা নিয়ে নিন। মাঝে মাঝে খাবেন—'

মাঝে মাঝে শব্দটার প্রতি তার অবসেসান আছে ; বিভাস বলেছিল, তৃণাও সম্ভবত খেয়াল করেছে, না হলে শব্দটার ওপর জোর দিত না। এসব সময় কেমন মুষড়ে পড়তে হয়, ছোট লাগে নিজেকে। এখন থেকে সে সতর্ক হবে।

'যাক', পুরনো কথার জের টানল ব্রতীন, 'তবু কিছু দিলে। নিলাম। এরপর যখন একটা একটা করে সিগারেট ধরাবো, তোমার কথা মনে পড়বে।'

'এটা কোনো দেওয়া নয়।'

'আর কী দিতে পার, তৃণা !' হঠাৎ আবেগে সামনে ঝুঁকে এলো ব্রতীন, প্রায় অকারণে। 'আমি তোমার প্রাইভেট টিউটর। পড়াই, বদলে কিছু টাকা পাই। এ-ছাড়া আমাদের সম্পর্কে আর কিছু নেই। আমি ঠিক জানি না তোমার বিয়ের ব্যাপারে আজ তোমার বাবা-মা আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন কেন !'

তৃণা সলজ্জ হলো।

'আপনি কী বলেছেন ?'

প্রশ্নটা আকস্মিক। ব্রতীন একটা সমস্যার সম্মুখীন হলো। মিস্টার ও মিসেস সেনের কাছে তখন যা বলেছিল তার পিছনে ছিল উদ্দেশ্য ; অর্থ যাই হোক, তৃণার সান্নিধ্যে থেকে আরো একটা বছর নিজের আয়ু বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে। আজকের একাকিত্বের বোধই সম্ভবত আর কোনো দিকে যেতে দেয়নি তাকে। এখন তার সামনে বসে আছে তৃণা—একটু আগেই সে একা হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। ব্রতীন কী বলবে !

'সমস্যাটা তোমার। তবে, একটা বছর অপেক্ষা করতে পার কি না ভেবে দেখো।'

'কেন।'

ব্রতীন হাসল। এতোক্ষণ ধরে কথার পর কথা সাজিয়ে যাচ্ছে তারা, কথাগুলো অর্থ পাচ্ছে না কোনো। এর চেয়ে ভালো তৃণার টিউটোরিয়ালের খাতাগুলো চেয়ে নিয়ে কাটাকুটি করা। তাতে সময় কাটত ; একসময় উঠে যেত সে। যেমন যায়। তারপর রাস্তা—বহু দূর পর্যন্ত রাস্তা, সন্তর্পণে হেঁটে যাওয়া। তৃণার ঘরের সুষম আলোয় বসে প্রায়ান্ধকারে নিজেকে হেঁটে যেতে দেখল ব্রতীন। যাওয়াটাই শুধু দেখছে ; কে দরজা খুলবে তা নিয়ে ইদানীং সে খুব একটা ভাবে না। নিজের নিঃশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে আহামরি না থাকলে কী হবে তার একটা আভাস পায় শুধু। আপাতত দৃশ্যটা উঠে এলো গলা পর্যন্ত। ব্রতীন চলে যাবার কথা ভাবল।

'এই এক বছরে তুমি পরীক্ষাটা দিয়ে নিতে পারতে—'

'এটা মা-বাবার একটা কন্‌সপিরেসি !' তৃণা বলল, 'আপনি জানেন না, ব্রতীনদা, দেরি করলে আমারই অসুবিধে। সুব্রত আমাকে ছেড়ে যেতে পারে !'

'বিয়েই হলো না, এরই মধ্যে ছাড়াছাড়ির ভাবনা ! এ কেমন ভালোবাসা তোমাদের !'

'ভালোবাসা ছিল, এখন নেই।' ঠোঁটে দাঁত বসাল তৃণা ; অস্থিরভাবে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল হাতে। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'যা জানেন না তা নিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা মন্তব্য করবেন না।'

কথাগুলো অপ্রত্যাশিত। বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ তৃণার মুখের পরিবর্তন লক্ষ করল ব্রতীন।

'তৃণা, কী হয়েছে আমাকে বলো !'

'হয়নি, কিছুই হয়নি !' দুটো হাত সমানভাবে মুখের ওপর বুলিয়ে আনল তৃণা, 'ও একটা স্কাউন্ড্রেল ! বাবা খবর এনেছে বম্বেতে একটি মারাঠী মেয়ের সঙ্গে ও ঘোরাফেরা করছে, সেই জন্যে সময় চাইছে। কিন্তু, সময় আমি ওকে দেব না। আমি ওকে জব্দ করব।'

'এটা ভুল খবরও হতে পারে—'

'ভুল হলে এনগেজমেন্টের পরে কেউ পিছিয়ে যায় না !'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল তৃণা। প্রবলভাবে কিছুতে আঘাত করার মতো একটাই হাত তিনবার ছুঁড়ল শূন্যের দিকে। তারপর কিছু না বলেই দ্রুত চলে গেল পার্টিসানের আড়ালে। সম্ভবত এখন কাঁদবে।

কিঞ্চিৎ দিশেহারা বোধ করল ব্রতীন। কথাবার্তা, আচরণ, তৃণার সবই এলোমেলো। সেন-দম্পতি পুরোটা বলেননি ; মেয়েকে সামলানোর জন্যে সম্ভবত একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাকে। সমস্ত ব্যাপারটা জড়িয়ে ভাবলে এখন একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। বয়সের ব্যবধান থেকে এতোক্ষণে তৃণার শরীরের সমস্ত মাংস ঝরে যেতে দেখল ব্রতীন ; ঘৃণা হলো নিজের ওপর। নিজেকে কখনো এতোখানি নিরস্ত্র মনে হয়নি।

বাড়িতে এখন কেউ নেই ; যারা আছে তারা এ-ঘর পর্যন্ত উঠে আসবে না। কিছু না-দেখা দৃষ্টিতে বেশ কিছুটা সময় পার্টিসানের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রতীন। এতো দিনের আসা-যাওয়ায় প্রলোভন ওটাকে নিষিদ্ধ বলে চিনিয়েছে। খুব আবছাভাবে মনে করতে পারে ব্রতীন, এক-একদিন স্বপ্নে সে ঘুরে বেড়িয়েছে তৃণার বেডরুমে—গলায় ঘাম, মুখ ভরে গেছে লোনা স্বাদে। আজ সে প্রকৃতই নিজের ভিতর থেকে সাহস পেল। ভাবতে যেটুকু

সময় লাগে তার বেশি সময় নিল না।

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে তৃণা। মুখ বালিশে ঢাকা, শাড়ির পাড় উঠে গেছে গোড়ালির অনেক ওপরে। সেখানে কাঁচা মাংসের আভা। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ব্রতীন, যদি তৃণা টের পায়। তারপরেই ওর পিঠের সাদা অংশ লক্ষ করে হাত বাড়াল।

'তৃণা!'

হাতটা নিজের হাতে চেপে ধরল তৃণা; ব্রতীন সরে যাবার আগেই উঠে বসল আধশোয়ার ধরনে।

'আমাকে দেখে আপনার লোভ হয় না, ব্রতীনদা!'

'ভেবে দেখিনি—'

'হয়। আমি জানি। অনেকেরই হয়!' উত্তেজনায় মুখে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল তৃণার; নিঃশ্বাসের ওঠা-নামায় বেরিয়ে এলো কাঠামো ছেড়ে। এ-রকম অবস্থায় কান্নার দরকার পড়ে না। তৃণা বলল, 'ভালোবাসা না থাক, শুধু আমাকে পাবার জন্যেই তো সে অপেক্ষা করতে পারত!'

শরীরের সুগন্ধে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ। রক্তে উপোস টের পেল ব্রতীন; অসতর্কতার সুযোগে বিভ্রান্ত এই মেয়েটিকে ইচ্ছে করলেই এখন ব্যবহার করতে পারে সে। পারে না কি! তবু শরীর সংহত করার জন্যে প্রয়োজনীয় জোরটুকু পাচ্ছে না কেন!

হাতটা নিজেই ছাড়িয়ে নিল ব্রতীন।

'এতো তাড়াতাড়ি সব কিছু ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। ভাবো, ভেবে দ্যাখো—'

তৃণা কিছু বলল না। খানিক থেমে থেকে শাড়িটা ভালো করে জড়িয়ে নিল গায়ে, উঠে দাঁড়াল। চোখ ভরে উঠেছে জলে।

'সরি, ব্রতীনদা।'

সোজাসুজি তৃণার দিকে তাকিয়ে হাসল ব্রতীন।

'আমি যাই। তুমি বরং একটা সিগারেট খাও—'

'ঠাট্টা করছেন!'

'না।'

যাবার আগে নিজেই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল ব্রতীন। পিছনে তাকাল না। অন্য দিন নিচে পর্যন্ত নেমে আসে তৃণা। আজ আসবে না। মসৃণ সিঁড়িগুলো একা নামতে নামতে নিজেকে আশ্চর্য নির্ভার মনে হলো ব্রতীনের, আর ক্লান্ত—যেন সে এইমাত্র সহবাস সেরে এলো! বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্যে হঠাৎ জুঁইফুলের গন্ধ একটু শ্লথ করে দিল তাকে। এতোক্ষণ তৃণা ছিল—এখনো তার সুগন্ধ লেগে আছে নাকে। আর একটু এগোলেই সে একা হয়ে যাবে।

ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, অদ্ভুত বিষাদ নিয়ে বাড়ি ফিরল ব্রতীন; সোজা চলে গেল বিছানায়। আলোটা নিবিয়ে দিল। খোলা জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসে তা যথেষ্ট নয়। নিষ্প্রভ অনেকগুলি তারার মধ্যে একটিই বেশ উজ্জ্বল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্রতীন দেখল তারাটা বড়ো হচ্ছে ক্রমশ, তারার মধ্যে থেকে এক ধরনের নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ক্রমশ ঢেকে ফেলছে দৃশ্যমান আকাশটাকে। বড়োই অদ্ভুত সে-আলোর রঙ! কেন জানে না, ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো তার। উঠতে যাচ্ছিল, দেখল আহামরি এসে দাঁড়িয়েছে পায়ের কাছে।

প্রায় শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় ব্রতীন জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি ?'

'কিছু নয়। একটু থাকতে দাও কাছে—'

ব্রতীন কিছু বলার আগেই মাথাটা তার বুকের ওপর নামিয়ে আনল আহামরি। ঘন চুল থেকে বের হচ্ছে বারো বছরের গন্ধ ; ব্রতীন ভাববার চেষ্টা করল, এ তার স্ত্রী—তারা বিবাহিত, এর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। ঠিক বুঝল না শব্দগুলোর অর্থ কী, কিংবা, এগুলোই ভালোবাসা কি না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বুকে ঈষদুষ্ণ উত্তাপ অনুভব করতে করতে দু' হাতে আহামরির মুখটা তুলে ধরল সে।

'তুমি কি জানো নৃসিংহ তোমাকে ভালোবাসে ?'

'জানি না, জানতে চাই না—', পরিষ্কার আবেগে ভেঙে পড়ল আহামরি, 'কেন বারবার বলছ এসব কথা !'

জানলার বাইরে নীলবর্ণ আকাশটা আবার ভেসে উঠল ব্রতীনের চোখে। দু' হাতে তুলে-ধরা মুখটিকে নিজের দিকে টেনে আনতে আনতে সে ভাবল, কালই নৃসিংহের কাছে ক্ষমা চাইবে।

॥ পাঁচ ॥

পি-জি হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতেই একটি শিশু এসে হাত পাতল আহামরির সামনে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, চোখে পড়ল শিশুটি সম্পূর্ণ ন্যাংটো—চোখের কোলে কান্নার জল শুকোয়নি এখনো, বয়স বছর তিন-চারের বেশি হবে না। সরল জুলজুলে দু'টি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, যেন আহামরির প্রত্যাখ্যান সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। একটু পরেই শিশুটি গাড়িচাপা পড়তে পারে।

কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল আহামরির। হঠাৎ এ-কথাটা মনে হলো কেন !

হাত নেড়ে শিশুটিকে কাছে ডাকল আহামরি। কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করল তার নড়বড়ে পায়ে দৌড়ে আসা। ধুলোভর্তি মাথাটা ছুঁয়ে দেখল একটু।

'এই, তোর মা নেই ?'

জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল শিশুটি। অস্ফুটে উচ্চারণ করল আহামরি, 'হতভাগা !' তারপর, খুচরো পয়সার জন্যে ব্যাগ খুলতেই কোথা থেকে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে ছুটে এসে ঘিরে ধরল তাকে, প্রত্যেকেরই হাত বাড়ানো। অল্প বিব্রত বোধ করলেও দমল না আহামরি—ব্যাগ খুলে আন্দাজ করে নিল খুচরোর পরিমাণ। তারপর একটি একটি করে পয়সা তুলে বিলিয়ে দিতে লাগল বাচ্চাগুলোর হাতে।

ঠিক তখুনি একটি সবল হাত উঠে এলো আহামরির সামনে। সচকিত হয়ে আহামরি দেখল, নৃসিংহ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। প্রায় অবিশ্বাস্য ! হিম হবার আগে বাঁ দিকের বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল দু'বার।

'আপনি !'

'দানের হাত আমার বেলাতেই গুটিয়ে নাও কেন !' নৃসিংহ হাসল, হাসতে হাসতেই

নামিয়ে নিল হাতটা, 'যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, দেখলাম অকাতরে ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছ। দাঁড়িয়ে পড়লাম। তা, তুমি এখানে ?'

ব্যাগের মুখ বন্ধ হচ্ছে দেখে নীরবে ও আস্তে আস্তে সরে গেল বাচ্চাগুলো। ওরা বুঝতে পারে। আশেপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা—এখন সরে দাঁড়ানোর অর্থ ভাববার সুযোগ দেওয়া। সেটা অশোভন হবে। আঁচলটা সামান্য ঠিকঠাক করে নিল আহামরি।

'আমার বোনের শাশুড়ি আছেন এখানে, দেখতে এসেছিলাম—'

'দেখা হলো ?'

নৃসিংহের চোখে চোখ রেখে ঘাড় নাড়ল আহামরি। চোখ নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল, খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ করছে নৃসিংহ। পুরুষালি গন্ধের সঙ্গে সিগারের মিশ্র গন্ধ—ব্যবধানটা ভারের মতো চেপে বসল বুকে।

নৃসিংহের সঙ্গে দেখা হলো প্রায় দু' মাস পরে। সময়ের হিসেবে ভুল হয়নি কোনো। তারও পরে, একদিন রাতে বাড়ি ফিরে ব্রতীন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি জানো, নৃসিংহ তোমাকে ভালোবাসে ?' বন্যার জল সরে যাওয়া মাটির লাবণ্যে সেদিন নিজেকে শিথিল করে দিয়েছিল আহামরি ; বারো বছর আগে, সেই প্রথম দিনে যেমন দিয়েছিল। তফাত এইটুকু : সংশয় ছিল না, আশপাশ জুড়ে অন্ধকার থাকায় আবেগ বাধা পায়নি কোনো ; অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও তারা হারিয়ে গিয়েছিল অতর্কিত ব্রেকারের তলায়। দিনের আলোয় অবশ্য ভুলটা ভেঙে যায়। বারো বছরে সে অনেক বদলেছে, ব্রতীনও ; সেটা বুঝতে দেরি হয়নি। আলাদা দুটো টুকরোয় জোড়া লাগলেও দাগটা থেকে গেছে। নৃসিংহের সামনে দাঁড়িয়ে সেই দাগটায় স্নেহের হাত বোলাল আহামরি। মিলিয়ে যাবে, মনে মনে বলল, মিলিয়ে যাবে। তারপর তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্যে একটা অজুহাত খুঁজল ; কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল।

'সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে—'

'হ্যাঁ।' কথার উত্তরে সায় দেওয়া প্রয়োজন মনে করল নৃসিংহ, 'তুমি কি স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছ ?'

সাধারণত এর চেয়ে ভারী গলায় কথা বলে নৃসিংহ। এটা হাসপাতালের ফুটপাথ, লোকজন আসছে, যাচ্ছে। যেভাবে বলল তাতে আর কেউ শুনতে পাবে না।

'স্বামী' কথাটা কানে লাগল আহামরির। অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, চলেই যাচ্ছিলাম—'

'ও। ব্রতীন তো হেড-এগজামিনারের কাছে যাচ্ছে বলল—'

'দেখা হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ, একসঙ্গেই বেরিয়েছিলাম অনেকে।'

'আপনি হঠাৎ এদিকে ?'

উত্তরের অপেক্ষা করল না। একটা ফাঁকা ট্যাক্সি এগিয়ে আসছে মিটার তুলে, কয়েক পা এগিয়ে গেল আহামরি এবং দেখল, সে ব্যস্ত হওয়ার আগেই একজোড়া যুবক-যুবতী সেটা থামিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত ট্যাক্সিটার জন্যে আরো আগেই সে তৎপর হতে পারত, মনস্থির করতে দেরি করায় হাতছাড়া হলো। পরবর্তী সুযোগের জন্যে এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কথাটা আবার ভেসে এলো কানে : তুমি কি জানো···· ? আহামরি বলল, জানি। আমায়

যদি কেউ ভালোবাসে, তার দায়িত্ব আমি নেব কেন ! বলার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিল। ভয় লাগছে নৃসিংহের মুখের দিকে তাকাতে।

ভঙ্গিতে যতোটা সম্ভব নিরপেক্ষতা ফুটিয়ে তুলল আহামরি—যেন সে দাঁড়িয়ে আছে একা, চলে যাবে এক্ষুনি। মনে হয় নৃসিংহ ও ব্রতীনের সম্পর্ক এখন আর খারাপ নয় ; ব্রতীন বলেছে সে হেড-এগজামিনারের কাছে যাবে, তাকেও বলেছিল। কস্তুরীর সঙ্গে তার হাসপাতালে আসার কথাও জানে ব্রতীন। যতোই আকস্মিক হোক, তার অর্থ এই নয় যে নৃসিংহের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে, হঠাৎ। সময় কম, ছ'টা নাগাদ কস্তুরীও বেরিয়ে আসতে পারে ; আজই আসতে আসতে সে নৃসিংহের খবর জিজ্ঞেস করছিল। কথা শুনে মনে হলো নৃসিংহ সম্পর্কে বেশ আগ্রহ আছে—'যাই বলিস, ব্রতীনদার বন্ধুদের মধ্যে এই একজনই দেখলাম একটু আলাদা। অসম্ভব ফ্র্যাঙ্ক আর রাগেড্।' ছোট বোনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি বড়ো একটা করে না আহামরি। শুনে গিয়েছিল চুপচাপ। এখন, পরপর ভাবনাগুলো দুলিয়ে দিল তাকে ; দূরত্বটা ইচ্ছে করেই জিইয়ে রাখল।

নৃসিংহ এগিয়ে এসে বলল, 'ছুটোছুটি করার দরকার নেই। আমিই তোমাকে ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।'

'না, পেয়ে যাবো।'

বিকেলের এই সময়টায় হাওয়া দেয় খুব জোরে, ইচ্ছে করে কিছু না করেই শুধু গা ভাসিয়ে রাখতে। অনেক দিন পরে এদিকটায় এসে আহামরির মনে পড়ল, ময়দান, রেড রোড, ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে বহু দিন হলো। এককালে ছিল ; ব্রতীনের সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রথম দিকে প্রায় প্রতি দিনই বিকেলে ভিক্টোরিয়ার ভিতরে বাঁধানো পুকুরের ধারে গিয়ে বসত তারা। তখন তার নাম ছিল হৈমন্তী। বেশি দিন নয় ; ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছিল অভ্যাসগুলো—ময়দানের খোলামেলা পরিবেশের চেয়ে রেস্টুরেন্টের কেবিন কিংবা সিনেমা হাউসের অন্ধকারেই অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ও কাছাকাছি লাগত নিজেদের। সাহসের ব্যাপারে বরাবরই ভিতু ব্রতীন ; প্রথম যেদিন তাকে চুমু খায়—সিনেমা হাউসে—তারও আগে অন্তত সাত দিন খুব কাছাকাছি এসেও সরে গিয়েছিল। ব্রতীনের কথা ভেবেই তখন দিনে তিনবার দাঁত মাজত আহামরি,গন্ধ-এলাচের দানা পুরে রাখত মুখে, নিয়মিত শাম্পু করত চুলে। ভালোবাসা মানুষকে কতোভাবে যে তৈরি করে ! ব্যাপারটা মনে পড়ায় হাসি পেল আহামরির। দূর দিয়ে তাকিয়ে কয়েকটা বড়ো গাছ দেখতে পেল, গাছগাছালির ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে ভিক্টোরিয়ার সাদা, নীলে-সাদায় অনেক দূর পর্যন্ত অপরূপ হয়ে আছে আকাশ। হেঁটে গেলে এখন অনায়াসে পুকুরটার ধারে পৌঁছে যেতে পারে।

'এতো অন্যমনস্ক কেন ?'

'কেন ?'

'দেখছি, নিজের মনেই হাসছ—'

অল্প কেঁপে গেল আহামরি। এ-পর্যন্ত যতোবার দেখা হয়েছে প্রায় ততোবারই তার, তার রূপের প্রশংসা করেছে নৃসিংহ—ঠিক ঠিক প্রসঙ্গ না থাকলেও করেছে। আহামরি নিজেও জানে ওটা সাজানো, একই কথা বারবার বলার সত্যিই যুক্তি নেই কোনো। এইমাত্র সে আর একটা সম্ভাবনা এড়িয়ে গেল। আড়ে তাকিয়ে দেখল সিগার ধরাচ্ছে নৃসিংহ ; হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া সিল্কের শাড়ির আঁচল ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। তাড়াতাড়ি আঁচলটা টেনে হাতে জড়িয়ে নিল আহামরি—সেদিন রাতে চলে যাবার আগে তার আঁচলে মুখ মুছেছিল নৃসিংহ, কী বলেছিল, আচ্ছন্নতার জন্যে তা আর কানে পৌঁছয়নি। ব্রতীন শুনে থাকতে পারে।

'ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। আমি যাই—'

হঠাৎ যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল আহামরি। নৃসিংহের কথা সে ভাববে কেন! রাস্তাটা পেরিয়ে গেল দ্রুত। এখান থেকে বাঁ দিক দিয়ে কিছুটা এগোলেই ট্রাম পাবে, কিংবা বাস। অফিস ছুটির ভিড়ে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ আছে, কিন্তু এই মুহূর্তের অস্বস্তি থেকে বাঁচবার জন্যে আর-কিছু ভাবতে পারল না সে।

চলে যেতে গিয়েও তবু দাঁড়িয়ে পড়ল আহামরি। এটা কি অভদ্রতা হলো না, ভাবল, এর পরেও হয়তো কোনো দিন দেখা হবে নৃসিংহের সঙ্গে—রাস্তায় কিংবা বাড়িতে, তাদেরই বাড়িতে; আজকের ঘটনার জের কি আরো অস্বস্তিতে ফেলবে না সেদিন! আপাত-চোখে নৃসিংহ কোনো অভদ্রতা করেনি তার সঙ্গে; ভাবল, আমায় যদি কেউ ভালোবাসে তার দায়িত্ব আমি নেব কেন!

শরীর জুড়ে একটা আটকানো ভাব টের পেল আহামরি; ছোট রুমালটা টেনে নিল মুঠোয়—শুধু এটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে নৃসিংহ তাকে পিছু টানছে না। তারপর তাকাল রাস্তার ওপারে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে নৃসিংহ, এক হাতে সিগার অন্য হাতে ব্যাগ, তাকানোর তারতম্যে দৃষ্টি অনুধাবন করা যায় না ঠিক। ক্রমাগত মোটর, ট্যাক্সি ও বাসের পারাপারে হঠাৎই চঞ্চল হয়ে উঠেছে রাস্তা, এর মধ্যে দ্রুত পেরিয়ে আসার সুযোগ কম। এমনও হতে পারে এ-চাঞ্চল্য আগেও ছিল, অন্যমনস্কতায় এসব কিছুই সে লক্ষ করেনি। দূরে যাওয়া বাচ্চাগুলো এখন ক্রমশ জড়ো হচ্ছে নৃসিংহের আশেপাশে, ওরা কি বিশেষভাবে একা-মানুষ চিনতে পারে! ওদের ভিড়ে আহামরি সেই প্রথম শিশুটিকে খুঁজল; নেই; দেখল, গেটের পাশে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে শিশুটি তাকিয়ে আছে তারই দিকে। কেন! প্রশ্নটা ছুঁয়ে যেতেই চাপা উত্তেজনায় ভিজতে শুরু করল সে। নৃসিংহ কি লক্ষ করেনি সে দাঁড়িয়ে পড়েছে, অপেক্ষা করছে!

প্রায় আত্মবিস্মৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল আহামরি, 'কই, আসুন!'

চলমান দুটো গাড়ির মধ্যে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হলো নৃসিংহ, চলতে শুরু করার আগে ঠিক আহামরির পাশে এসে দাঁড়াল।

পরের কথাটা খোঁজার জন্যে নিজের ভিতরে ডুবে গেল আহামরি। তেমন করে ভাবতে পারল না কিছু। ভদ্রতা মাঝে মাঝে বিষম বাধা হয়ে দাঁড়ায়! নিরুপায় হয়ে তাকাল পিছন দিকে—শিশুটি হারিয়ে গেছে।

নৃসিংহ বলল, 'এভাবে রাস্তা পেরুনো ঠিক নয়—'

'আমার তাড়া আছে—'

'তা হলেও—রিস্‌ক্ নিয়ে লাভ কী! অ্যাক্সিডেন্ট জানিয়ে হয় না!'

'কী হতো?'

'কী হতো!' ছড়িয়ে হাসল নৃসিংহ, একবার আহামরির মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা তাকাল আবার। হাসিটা ছাড়ল না। তারপর বলল, 'অন্তত দু'জনের ক্ষতি হতো!'

প্রশ্নটা ফিরে এলো আবার। অল্প সরে গিয়ে আল্‌গা হাতে বাঁ কানের লতিটা ছুঁয়ে নিল আহামরি; এবং ভাবল, সময় কম। সে যাবে বাঁ দিকে, ট্রামে কিংবা বাসে। সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারে ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। অপেক্ষার সময়টুকু পর্যন্ত নৃসিংহকে সহ্য করা যায়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে ঠিক মুহূর্তটি খুঁজল সে, ঠিক কথাটি; মুখের মধ্যে এসেও শব্দগুলো হারিয়ে যাচ্ছে বারবার। নাকের পাটায় একটা সিরসিরে অনুভূতি, ভিজে ভাবটা

সংক্রমিত হচ্ছে ক্রমশ—সময় নেওয়ার জন্যে গতি শ্লথ করল আহামরি।

'আপনি এদিকে কোথায় এসেছিলেন ? হাসপাতালে ?'

'না।'

'তবে ?'

'একা মানুষ কি আর ঠিকানা নিয়ে ঘোরে !' ঈষৎ শব্দ করে হাসল নৃসিংহ, 'এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সঙ্গী ছিল। তারপর ইচ্ছে হলো হাঁটি—ময়দানের মধ্যে দিয়ে এলাম। এখন মনে হচ্ছে ভালোই করেছি।'

'কেন !'

পাশাপাশি যেতে যেতে হঠাৎ ওর হাতটা চেপে ধরল নৃসিংহ—ক্রশিংয়ের মাথায় দ্রুতগামী একটা মোটরের সামনে পড়ার আগে থেমে দাঁড়াল।

'তুমি এতো অসাবধান কেন !'

কোনো কারণ খুঁজে পেল না আহামরি। অন্য ফুটপাথে পৌঁছুবার আগেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছে নৃসিংহ। একই সঙ্গে ফুটপাথে উঠল দু'জনে। এগিয়ে যেতে যেতে অসহায় চোখে এইমাত্র পেরিয়ে-আসা বাঁ দিকের রাস্তাটার দিকে তাকাল আহামরি। কথা ছিল না, তবু সে ভুল রাস্তায় যাচ্ছে কেন !

থেমে দাঁড়িয়ে আহামরি বলল, 'আমি বাঁ দিকে যাবো, ট্রামে উঠব।'

'তাড়া আছে ?'

'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও পিছিয়ে পড়ল আহামরি। জিবে ব্লটিং পেপারের শুষ্কতা, গলায় যেটুকু ধ্বনি ছিল ঠোঁটে পৌঁছুবার আগেই শুষে নিল।

'তাড়া না থাকলে চলো হাঁটি। তোমায় বাসে তুলে দেব।'

'কতো দূর ?'

'ধরো হাজরা পার্ক পর্যন্ত ; আমি বাড়িই যাবো।' পা বাড়িয়ে নৃসিংহ বলল, 'আজ হাঁটতেই ভালো লাগছে—'

সব ঠিকঠাক আছে, আহামরি ভাবল, এই যাওয়ার গল্পটুকু বাড়ি ফিরে ব্রতীনের কাছে স্বচ্ছন্দেই সে করতে পারবে।

না হাঁটলে রাস্তা চেনা যায় না। সংস্রব ছড়ানোর অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মাটির ; সংস্পর্শে জেগে ওঠে স্মৃতি। রোদ-যায়-যায় বিকেলে লাল রঙের একটা পুরনো বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে ফুটপাথে ঢলে-পড়া বকুলগাছ লক্ষ করল আহামরি ; তেমন ফুল নেই, বিকেলের হাওয়ায় শুধু থমকে আছে গন্ধ। ওয়েলিংটনে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের বাড়ির সামনেও ঠিক এমনি বকুলগাছ ছিল একটা—মনে পড়ে : বাড়ির সম্মতি ছিল না, ব্রতীন তখন নিতান্তই আটপৌরে, অমলেশবাবুর স্ত্রী সতীদি ছিলেন মাঝখানে ; ট্যাক্সি থেকে পরপর সকলে নেমে গেলেও আহামরি পারেনি। বকুলের বিষণ্ণ গন্ধ ছাড়া সেদিন আর কোনো উৎসব ছিল না কোনো দিকে। ট্যাক্সির খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্রতীন ডেকেছিল, 'এসো ?' আহামরি নড়েনি। সব অনুভূতির ব্যাখ্যা করা যায় না—হঠাৎই কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় মাথায়, সেটা যে ভয় তাও বুঝতে পারেনি আহামরি। তবু, অস্ফুট আবেগে ব্রতীনের একটা হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'ভয় করছে।' অবাক চোখে তাকিয়ে ব্রতীন জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন !' আহামরি বলতে পারেনি। তার আগেই ঠাট্টা করে বলেছিলেন সতীদি, 'মহা মুশকিলে পড়া গেল তো এদের নিয়ে ! ও হৈমন্তী, এসো তাড়াতাড়ি। চুপি

চুপি কথা বলার জন্যে তো সারা জীবন পড়ে আছে।'

'কেন'র উত্তর দেওয়া হয়নি ; বারো বছরে ব্রতীনও থেমে আছে একই প্রশ্নে। আনমনা যেতে যেতে শো-কেসের বাইরে থেকে আহামরি সেই স্টিল-ছবির দিকে তাকাল।

'তোমাকে ফোন করেছিলাম একদিন।'

'কেন!'

'শুধু কেমন আছো জানতে—'

চুপচাপ একটা নিঃশ্বাস সংবরণ করল আহামরি। বিকেল শেষ হতে চলল। কোনো কোনো বাড়ির মাথায় খুব আল্‌গা হয়ে লেগে আছে রোদের আভা ; যে-কোনো মুহূর্তে সেটুকুও উবে যেতে পারে। ইতিমধ্যে অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছে তারা। পাশে নৃসিংহ। ফুটপাথে জমা জল এড়াতে গিয়ে গায়ে গা লাগল, পেশীর স্পর্শে সচকিত হয়ে সে অনুভব করল, ভিতরে কোথাও খুলে যাচ্ছে শিরার মুখ—ভিজে ভাবটা আবার ফিরে আসছে শরীরে।

'সে-খবর তো ওর কাছেও পেতে পারতেন। তা ছাড়া—', শক্ত হয়ে বলল আহামরি, 'আলাদাভাবে আমার খবর নেবার কী আছে!'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।' নৃসিংহ বলল, 'দোষটা হয়তো আমারই। তবে, সেদিন ব্রতীনকে দেখে মনে হয়েছিল ও ক্ষুব্ধ, তোমাকে কিছু বলতে পারে—'

তক্ষুনি কোনো জবাব দিল না আহামরি। পরে বলল, 'স্ত্রীর কাছে স্বামীর নিন্দে করতে নেই।'

'জানি।' অপ্রস্তুত হওয়ার ধরনে নৃসিংহ বলল, 'ব্রতীন খুব ভালো ছেলে। তোমার স্বামী বলেই বলছি না ; আমার বন্ধু বলেও।'

গলার স্বরে ক্লান্তি, ক্লান্তি হাঁটার ধরনেও। যেতে যেতেই চশমা খুলে পাঞ্জাবির আগায় মুছে নিল নৃসিংহ। এই প্রথম ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণতা টের পেল আহামরি ; ওপরে কাচের আড়াল থাকার জন্যেই সম্ভবত কখনো কখনো ওই চোখ দু'টিকে অতিরিক্ত উজ্জ্বল বলে ভ্রম হয়। একটু আগেই ভালো লাগার কথা বলেছিল নৃসিংহ, বলেছিল—দু'জনের ক্ষতি হবে। 'দু'জনের', না 'দু'জনেরই'? আত্যন্তিক প্রয়োজনে অক্সিজেন মাস্কের মতো শব্দ দুটোকে নিজের কাছে টেনে নিল আহামরি—যেন তাদের অর্থ স্পষ্ট হওয়ার ওপরেই নির্ভর করছে তার অনেকখানি! জবাব যে দিতে পারত তাকে সে নিজেই বিচ্ছিন্ন করেছে, এতোক্ষণ ধরে—একটু একটু করে। এখন খারাপ লাগছে। এতোটা রূঢ় হওয়ার দরকার ছিল না কোনো।

আকস্মিক মায়ায় নিজেকে ভরে তুলল আহামরি। সম্পর্কটা সহজ করার জন্যেই বলল, 'আমি জানতাম না আপনি ফোন করেছিলেন—'

'জানি। তা হলে বলতে—।' নৃসিংহ বলল, 'না জেনে অবশ্য ভালোই হয়েছে। ভোলা সহজ হবে।'

আহামরি হঠাৎ বলল, 'আর করবেন না।'

কথাটা শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না ; হাল্‌কাভাবে হাসল নৃসিংহ। আরো খানিকটা রাস্তা চুপচাপ হেঁটে এসে বলল, 'তোমার স্বামী যদি আবার কোনো দিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসে, তা হলে?'

যে-কথাটা বলার জন্যে এতোক্ষণ ধরে ছটফট করছিল আহামরি, অথচ গোছাতে

পারছিল না. নৃসিংহ যেন সেই কথাটিই বলে ফেলল, সোজাসুজি। শুধুই কথা নয়, প্রশ্ন। আহামরি দ্বিধায় পড়ল, কী বলবে ? আপনার চেয়ে ব্রতীন আমার কাছে অনেক দামী, তাকে আমি হারাতে চাই না। না কি বলবে, আপনার ধারণাই ঠিক, সত্যিই সেদিন দুর্ব্যবহার করেছিল ব্রতীন ! এর কোনোটাই তো ঠিক উত্তর নয়। একটি লোকের আবির্ভাবেই কি মিথ্যে হয়ে যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ? যদি তাই হয়, তা হলে কেন এতো চিন্তিত হচ্ছে সে, কেনই বা এতো দ্বিধা ! যা বলার পরিষ্কার বলে দেওয়া যায় নৃসিংহকে—'তা হলেও না !'

আহামরি ঘেমে উঠল। ব্রতীনের সঙ্গে মন কষাকষির পরই সমাধানের জন্যে খাপছাড়াভাবে এখানে-ওখানে হাত দিতে শুরু করেছিল সে। আশেপাশের সবাই ও সব কিছুর ওপরেই তখন তার প্রচণ্ড রাগ, আর অভিমান—নালি-ঘা চিরে দূষিত রক্ত বের করে দেওয়ার মতো ঝরিয়ে ফেলছিল সম্পর্কের ভিতরের সমস্ত ঘুণ। এই সময় ধ্রুব আসে। এমনিতে ছেলেটিকে খারাপ লাগত না আহামরির ; বই-টই এনে দিত, ফাইফরমাশ খাটত ছোট-খাট, লাজুক ভঙ্গিতে কথা বলত নানা বিষয়ে। আহামরি টের পেয়েছিল ধ্রুব তাকে পছন্দ করে একভাবে—তাকে খুশি করার জন্যে উৎসুক থাকে সারাক্ষণ। কুড়ি-একুশে এটা অসম্ভব নয়। নির্দোষ—বস্তুত, আগে কোনো দিনই ধ্রুবকে পুরুষ বলে ভাবেনি আহামরি। ভাবল পরে। 'তুমি এমন অসময়ে হুটহাট এসে পড়ো কেন বলো তো !' নির্জন দুপুরের বিষণ্ণতা সেদিন রুক্ষ করে তুলেছিল আহামরিকে ; ধ্রুবর মুখের হতচকিত ভাব লক্ষ করে সামনে নিল, 'আমার শরীরটা ভালো নেই, শুয়ে আছি। তুমি বরং আর-এক সময় এসো, উনি থাকবেন।' ছেলেটির তরুণ মুখে বিস্ময় ফুটেছিল এক ধরনের, 'আচ্ছা' বলেই চলে যায়। গত দেড় দু' মাসে ধ্রুব আর আসেনি।

কিন্তু, এগুলোই কি সমাধান ? মনে মনে ভাবল আহামরি, সমস্যা কোথায় ? এতো দিন ধরে সে সন্ধান করেছে একটার পর একটা উপায়, শুধুই ব্রতীনের কথা ভেবে, কখনো কি তাকিয়ে দেখেছে নিজের ভিতরে ! আজকের সমস্ত ভাবনাই তার নিজেকে নিয়ে। একজনকে ভালোবেসেই সমস্ত জোর কমে গেছে তার ; এর মধ্যে আর একজনের আকর্ষণ প্রতিরোধ করার শক্তি কোথায় ?

নৃসিংহ বোধ হয় ওর অবস্থাটা অনুমান করতে পারল। বড়ো রাস্তা থেকে বাঁ দিকের ছোট রাস্তায় বাঁক ঘোরার সময় লক্ষ করল মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করছে আহামরি—আসন্ন সন্ধ্যার আলোয় ঘন হয়ে উঠেছে মুখ। ব্রতীনের স্ত্রী ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে নারীতে—যাকে সে চিনেও চেনে না। একে নিয়েই সন্দেহে ছারখার হচ্ছে ব্রতীন, এরই জন্যে একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল তাকে। পরে, ব্রতীন ফিরে এলেও নৃসিংহ বুঝতে পারে, মনে মনে তারা দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে বিকেলের বাসস্টপে। আবার কোনো দিন নেমন্তন্ন করার কথাটা সে ঠাট্টা করেই বলেছিল।

গলা পর্যন্ত বিষাদ উঠে এলো নৃসিংহের। আহামরিকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই—এতোক্ষণ অনেক কথাই বলতে দিয়েছে তাকে, যাতে ভারটা নেমে যায়। আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, না হলেও সে সুযোগ খুঁজত। চেনা কিংবা অচেনা কারুর কাছেই দীন হয়ে থাকতে ভালো লাগে না।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল নৃসিংহ।

'আহামরি, ওই শেষের বাড়িটায় আমি থাকি।'

আহামরিও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নৃসিংহের হাতের ইশারা লক্ষ করে দূরে তাকাল ; কথা

বলল না।

'ব্রতীন অনেকবারই এসেছে— ।' বলে চুপ করে গেল নৃসিংহ। আহামরির মুখের থমথমে ভাবটা যায়নি। তখন বলল, 'সন্ধে হয়ে এলো। চলো, তোমাকে বাসে তুলে দিই।'

'থাক। কাছেই তো। আমি একাই যেতে পারব।'

যাবার জন্যে পা বাড়াল আহামরি। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে চেয়ে থেকে নৃসিংহ ডাকল, 'শোনো— ।'

আহামরি থেমে গেছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে নৃসিংহ ওর মুখোমুখি দাঁড়াল।

'কথাটার মানে হয় না কোনো, তবু বলছি, আমি খুব খারাপ লোক নই।'

'আমি কিছু বলিনি—'

'বলতে পারলে সহজ হতে। একা মানুষ, মদভাঙ খাই। পেটে পড়লে বেচালও হই হয়তো, তার বেশি কিছু নয়।' নৃসিংহ হাসল এবং সময় নিল। 'যাক্ গে—চলো, এতোটাই এলাম, তোমাকে এগিয়ে দিই। আমার তাড়া নেই—'

শেষের কথাগুলো ঠিক ঠিক শুনল না আহামরি। একটাই কথা গেঁথে যাচ্ছে বুকে—একা মানুষ, একা মানুষ, একা মানুষ! কেন ঘুরে ফিরে একটাই কথা বলে যাচ্ছে নৃসিংহ! কিছু না ভেবেই স্পষ্ট চোখ তুলে নৃসিংহকে দেখল আহামরি। কাচের ওপর রাস্তার আলো পড়ে অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখদুটো ; মুখে হাসি ছুঁইয়ে রাখলেও এখন সেই পূর্বাবস্থা—সেদিনের মতো, যেন এখুনি শরীর আড়াল করে ঝুঁকে পড়বে তার ওপর, চেপে ধরবে হাত ; বড়ো শরীরের আড়াল থেকে চেষ্টা করেও সে কোথাও খুঁজে পাবে না ব্রতীনকে। কেন মনে হলো জানে না।

কোনো রকমে স্থিরতায় ফিরতে ফিরতে আহামরি বলল, 'এতো কথা আমাকেই বা বলছেন কেন! আমি কি আপনাকে একা করে রেখেছি!'

'এটা রাস্তা।' নৃসিংহ হঠাৎ বলল, 'তা ছাড়া তোমার তাড়া ছিল—'

'আমার তাড়া নেই—'

'তা হলে এসো। বাসাটা দেখে যাবে। আসবে?'

তাড়া না-থাকার কথাটা সত্যি নয়, আহামরি ভাবল, বলার ঝোঁকে বলে ফেলেছে—এখন ফিরিয়ে নেওয়া অভদ্রতা। সবে সন্ধে হলো ; ব্রতীন নিশ্চয়ই এতো তাড়াতাড়ি ফিরবে না। আরো কিছুটা সময় অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় বাইরে, স্বচ্ছন্দে। গোড়ার আড়ষ্টতা কেটে গেছে, নৃসিংহের সান্নিধ্যে এখন আর খারাপ লাগছে না ততো। সে কি নৃসিংহ নিজেকে খুলে ধরেছে বলেই!

অস্বস্তি কাটিয়ে আহামরি বলল, 'তাড়া নেই বলে বসতে পারব না। ও ফিরবে।'

'ভেবো না। ব্রতীন জানবে না তুমি এসেছিলে।'

আহামরি একটা ঘা খেল। ঠোঁট চেপে বলল, 'সে-জন্যে নয়—'

কয়েক মুহূর্ত আগেও এ-রকম একটা দৃশ্য কল্পনা করতে পারেনি আহামরি। নৃসিংহকে অনুসরণ করে ফ্ল্যাট বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়ে গা-ছমছম করে উঠল। বাঁকের পর বাঁক সিঁড়িগুলো উঠে গেছে ওপরে, প্রত্যেক বাঁকেই দরজায় লাগানো নেমপ্লেট, নতুন ফ্ল্যাট। বাড়িটা সম্ভবত খুব নতুন নয়—খসখসে দেওয়াল ও রেলিং, আলোর স্বল্পতায় পুরনো লাগে আরো। কুকুরের গলার চেন ধরে একটি যুবক শিস্ দিতে দিতে নেমে গেল পাশ দিয়ে। বোধ হয় স্নান করেছে এক্ষুনি—নিজেকে ভুলে গিয়ে নিঃশ্বাস নিল আহামরি : প্রত্যেক

পুরুষের গায়েই আছে আলাদা গন্ধ। অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলেও গন্ধে সে চিনতে পারবে পরিষ্কার—ব্রতীনকে, কিংবা নৃসিংহকে। আর কোনো নাম মনে পড়ছে না, স্মৃতি সঙ্কুচিত করেও না ; তা হলে সে এভাবে ভাবল কেন!

ব্যস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল আহামরি, 'আর কতো দূর ?'

নৃসিংহ উঠে যাচ্ছে চটপট। পিছনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ব্যস, আর একটা ফ্লোর—'

কাছাকাছি উঠে এসে আহামরি বলল, 'এখানে লিফ্‌ট থাকা দরকার—'

'তুমি আসবে জানলে ব্যবস্থা করতুম।'

'থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না!'

দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দম নিল আহামরি। নৃসিংহ তালা খুলছে ; প্যাসেজের মুখে ভাঙা কাচের জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে হু হু করে। সিঁড়িগুলো উঠে গেছে আরো এক বাঁক, সিঁড়ির শেষে দরজা, তালা লাগানো। ওখানে ছাদ আছে অনুমান করল আহামরি। বিয়ের আগে সে যে-বাড়িতে ছিল সেখানে ছাদ ছিল ; ছাদ বলতে এখন সে আচ্ছাদন বোঝে—আর কিছু নয়।

আলো না-জ্বলা পর্যন্ত বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল আহামরি। হঠাৎই মিইয়ে পড়েছে যেন। শুধু ক্লান্তির জন্যে নয়—ক্লান্তির সঙ্গে আরো একটা কিছু মিশে এলোমেলো করে দিচ্ছে নিঃশ্বাস। এখন বসতে কিংবা গড়াতে পারলে কিছুটা স্বস্তি হতো।

হাত বাড়িয়েও গা ছুঁলো না নৃসিংহ। ডাকল, 'এসো—'

ঘরে ঢুকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিল আহামরি অগোছালো, তবু বেশ বড়ো। এই ঘর ছাড়ালে আর একটা ঘর, সেখানে পর্দা নেই। অন্ধকার, তবু বেডরুম বলে সহজেই চেনা যায়। এ-ঘরের জানলা দুটো খুলে দিয়ে ও-ঘরে গেল নৃসিংহ—মুহূর্তে জ্বলে উঠল হাল্‌কা নীল আলো। এ-ঘরে বেতের পুরনো সোফার ওপর একগাদা বই, স্তূপীকৃত খাতা, টিপয়ের ওপর বাসি চায়ের কাপ—দেখার মতো আর কিছুই নেই। আসবাব কম বলেই ঘরটাকে অসম্ভব ফাঁকা মনে হলো আহামরির।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নৃসিংহ। আহামরি বলল, 'ভালোই তো!'

'হ্যাঁ, ভালোই।' নৃসিংহ বলল, 'ও ছাড়া আর কোনো বিশেষণ খুঁজে পাবে না।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মনে হচ্ছে একসঙ্গে তিন-চারজন উঠে আসছে ওপরে, একটি শিশুর গলাও শোনা যাচ্ছে। আহামরি সরে গেল : দরজাটা খোলা—এখন যে-কেউ ওপরে এলেই আবিষ্কার করতে পারবে তাকে। এমন কি হতে পারে, হেড-এগজামিনারের কাছে গিয়ে তাঁকে বাড়িতে পেল না ব্রতীন, হাতে অনেকটা সময়—সোজা বাড়ি না ফিরে সে চলে এলো এখানে! নিঃশ্বাস ধরে রেখে কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শব্দটা শুনল আহামরি। না, এখানে নয়। অস্ফুট গলায় সে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।' এবং দেখল, নৃসিংহ কাজ করছে তার কথা মতো। হাঁটু দুটো ঈষৎ কেঁপে গেল আহামরির।

'তুমি এখনো হাঁফাচ্ছ।' নৃসিংহ বলল, 'বোসো না!'

'বসছি।' দ্রুত পায়ে সোফার দিকে এগিয়ে গেল আহামরি ; প্রয়োজন ছিল। মুখোমুখি না বসে অল্প দূরে পাশের সোফাটায় বসল নৃসিংহ। এতো হাওয়ায় ফ্যানের দরকার করে না, তবু গরম লাগে আহামরির—খানিক আগেকার ভাবনাটা অধিকার করে রাখে পুরোপুরি। এই ফ্ল্যাটটা অনেক উঁচুতে, জানলার বাইরে খুব দূর দিয়ে তাকালে বিচ্ছিন্ন কয়েকটা বাড়ি

চোখে পড়ে, সেখানে আলো জ্বলে উঠেছে। শব্দহীন চতুর্দিকের মধ্যে শাঁখের শব্দ কানে এলো আহামরির, বাজছে টেনে টেনে—একবার, দু'বার, তিনবার—থেমে যাবার পরও রেশটা অনেকক্ষণ লেগে থাকল কানে।

নৃসিংহ সিগার ধরাল। এরপর হয়তো সোজাসুজি তাকাবে তার দিকে, হাসবে। বলার মতো একটা কথা খুঁজল আহামরি, যে-কোনো কথা। অসুবিধে হলো, ইচ্ছে সত্ত্বেও সে এখনই ফেরার কথা বলতে পারছে না ; এসেছিল, অন্তত এটা বোঝার জন্যেও আরো কিছুক্ষণ সময় দরকার। আহামরি ভাবল এখন সে সহজ হবে, সারাক্ষণের দুর্ভাবনাটা নৃসিংহকে বুঝতে দেওয়া উচিত হবে না।

'কলকাতায় কতো ফ্যামিলি একটি মাত্র ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকে। ব্যাচেলর হয়ে আপনি এতো বড়ো ফ্ল্যাট আটকে রেখেছেন কেন!'

'তারা খুব অসুবিধেয় থাকে না। এ ফ্যামিলি ইজ এ ফ্যামিলি, তার চার্ম আলাদা।'

আহামরি আঁচ করল নৃসিংহ কী বলতে চায়। থেমে না গেলে ও আবার ফিরে আসত সেই প্রশ্নে, আজ সারা রাস্তা যা তাকে বিব্রত করেছে। বইয়ের র‍্যাকের দিকে চোখ ফিরিয়ে চুপ করে গেল সে, দৃষ্টি আটকে গেল একটি নামে—'ইন্‌টিমেট্ বিহেভিয়ার'। মনস্তত্ত্ব পড়ায় নৃসিংহ। না তাকালেও বুঝতে পারে এখন তাকিয়ে আছে তার দিকে ; ধোঁয়ার একটা স্তবক তার মুখের কাছাকাছি এসে ভেঙে ছড়িয়ে গেল।

'শুধু ব্যাচেলর নই, ভাগ্যবান ব্যাচেলর বলতে পার আমাকে।' উর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছেড়ে হাসল নৃসিংহ, 'একটা মজার গল্প বলি তোমাকে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একটা ফ্ল্যাটের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। পেশা, আয় শুনে বাড়িওয়ালা রাজি। শেষে ফ্যামিলির সাইজ জিজ্ঞেস করলেন। সত্যি কথাটা বলতে হলো। শুনে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, বললেন ব্যাচেলরকে ভাড়া দেবেন না, সে যেই হোক। জিজ্ঞেস করলুম, কেন ? উত্তরটা শুনবে ?'

হাসিমুখে তাকাল আহামরি, 'কী ?'

'বললেন, সে-বাড়িতে আরো পাঁচটা ফ্ল্যাট আছে, প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই আছে যুবতী মেয়ে—তাদের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হয় তাঁকে। ঘি আর আগুন পাশাপাশি রাখা বিপজ্জনক।'

হাসির শব্দ লুকোতে পারল না আহামরি। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন্‌টা ?'

'বলা মুশকিল।' নৃসিংহ বলল, 'পরীক্ষা করে দেখিনি—'

আহামরি বলতে যাচ্ছিল 'দেখলেই পারেন', কী ভেবে চুপ করে গেল। ঘড়ি দেখল, প্রায় সাড়ে ছ'টা। দেখা না পেলেও সাড়ে সাতটা, আটটার আগে ফিরতে পারবে না ব্রতীন। বলেছিল দেরি হবে। এখনো কিছুটা সময় আছে, তবু অকারণ অস্বস্তি শরীর ঠেসে ধরল আহামরির।

উঠে দাঁড়িয়ে নৃসিংহ জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে—'

'আছে সব ?'

'মনে তো হয় আছে—'

নৃসিংহ কিচেনের দিকে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে আহামরি বলল, 'আপনি বসুন, আমি করছি—'

নৃসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কিচেনে এলো সে, এখানেও সেই অব্যবস্থা। তবে আছে সব

কিছুই। গ্যাস জ্বেলে পাশাপাশি দু'টি কাপ সাজিয়ে রাখল নৃসিংহ। বাহার দেখে মনে হয় শৌখিনতা আছে ; ধুয়ে নিলেই চলবে।

'ভরার দায়িত্ব তোমার।' চলে যেতে যেতে নৃসিংহ বলল, 'আমি চট করে স্নান সেরে নিচ্ছি। চা খেয়ে বেরুব।'

এই লোককে নিয়ে এতো কাণ্ড, ভাবতে খারাপ লাগে। গ্যাসের নীল আগুনের দিকে তাকিয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল আহামরি, এমনকি আগুনের সোঁসোঁ শব্দও। সবই কেমন অবিশ্বাস্য—এই ফ্ল্যাট, নৃসিংহ, গ্যাসের আগুন, সব। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বিয়ে করলে নৃসিংহের স্ত্রী ঠিক সেইখানেই দাঁড়াত। তখন ঘরদোর এতোটা অগোছালো থাকত না, দরজায় এবং জানলায় ঝুলত মানানসই পর্দা—সম্ভবত ময়দান হয়ে ঘুরে আসার শখ থেকেও নিজেকে নিবৃত্ত করত নৃসিংহ। ব্রতীনকে দিয়েই বুঝতে পারে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের অন্তত এভাবে চলে না।

পটে চা ভিজিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো আহামরি ; ফাঁকা ঘরে দাঁড়িয়ে ভাবল এই ঘরটাকে সে কীভাবে সাজাতে পারত। নিজের ঘর থেকে টেনে এনে অনেক জিনিসপত্রই সে বসাল এখানে—জুত হলো না ; নিজেই আবার ভেঙে ছড়িয়ে দিল সব। ভ্রান্ত এই খেলার মানে হয় না কোনো, তার পক্ষে তো নয়ই। চা তৈরি হচ্ছে, নৃসিংহ বেরুলেই সে চলে যাবে। সময় কম। এটা ঠিক, আর কোনো দিনই সে আসবে না এখানে, আজকের মতো আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেলেও নয়। অজুহাত হিসেবে নৃসিংহ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আর একটা বাসা বদল করবে না।

ভাবনাটা স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কৌতূহল টানতে লাগল বিভিন্ন দিকে, যেন এই ঘরবাড়ির প্রতিটি কোণেরই আহামরির কাছে কিছু দাবি আছে! বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল দু' একটা বই, সেখান থেকে চলে এলো জানলার সামনে। বাইরে তাকালে বহুদূর পর্যন্ত আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। শ্রাবণের শেষ, এখন থেকেই তারাগুলো ক্রমশ ঘন হতে থাকবে আকাশ জুড়ে। হঠাৎ জল পড়ার শব্দ শুনে মনে হলো বেরুতে এখনো কিছু সময় নেবে নৃসিংহ। এ-ঘরে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে অন্য ঘরটির দিকে তাকাল আহামরি : নরম নীল আলোর রহস্য সেখানে, আবছায়ায় কিছুই তেমন ভালো করে দেখা যায় না। অল্প দ্বিধা বোধ করল সে—ওটা নৃসিংহের বেডরুম, যাওয়া কি উচিত হবে! অবশ্য, পর মুহূর্তেই ভাবল, কে আর দেখছে! দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে নতুন আলোয় চোখ সইয়ে নিল আহামরি। এ-ঘরটা আয়তনে ছোট, খাট-বিছানা ছাড়াও আছে একটি লেখার টেবিল ও চেয়ার, আলনা, দেওয়ালে আয়না আর ক্যালেণ্ডার—আর কিছু নয়। একটা টাইমপিসের শব্দ শুনল, ঠিক কোনখানে খেয়াল করতে পারল না। এমনও হতে পারে, শব্দটা সে নিজেই কল্পনা করে নিচ্ছে। আসবাবগুলোর ডিজাইনে সমতা নেই কোনো, দেখেই মনে হয় ভাড়া করা। সেটাই সম্ভব—হাবভাব চালচলন দেখে মনে হয় না কোনো পাকা ব্যবস্থায় ধরা দিতে চায় নৃসিংহ। এর মধ্যে শুধু এই নীল আলোটাই যা বেমানান ; সাধারণ, অতি সাধারণ কতোগুলি বস্তুকে ঢেকে রেখেছে অখণ্ড রহস্যে। মনে হয় প্রকৃত আলোয় ধরা পড়বে এদের আসল সত্য। শখ? হতে পারে, নাও হতে পারে। এতো স্পষ্ট করে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না।

বাথরুমের দরজায় শব্দ হতেই ব্যস্তভাবে কিচেনে ফিরে এলো আহামরি। নৃসিংহ তৈরি হতে হতে চা-টা তৈরি হয়ে যাবে।

সময় নিতে লাগল। পট থেকে কাপে চা ঢালার সময় অসতর্কতায় কিছুটা চা চল্‌কে পড়ল শাড়িতে। জলে আঙুল ভিজিয়ে দাগটুকু ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে নৃসিংহের গলা শুনল, 'আমি রেডি।'

বেরুবার আগে শাড়ির আঁচলটা কোমরে গুঁজে নিল আহামরি। কাপ দুটো তুলে নিল দু' হাতে। তারপর শ্লথ পায়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

নীল আলোর রহস্যটা এখনো টানছে তাকে। প্রায়ান্ধকারে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল নৃসিংহ। বলল, 'এসো।'

নতুন পাজামা-পাঞ্জাবির পাট ভেঙেছে নৃসিংহ ; আহামরিকে জায়গা করে দেওয়ার জন্যেই সম্ভবত পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। কাপটা ওর হাতে না দিয়ে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল আহামরি। নিজে সরে গেল জানলার ধারে। বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখার জন্যেই বোধ হয় চায়ে উষ্ণতা নেই তেমন, অন্তত আহামরির তাই মনে হলো—দু' চুমুকে নিঃশেষ করে কাপটা রেখে দিল টেবিলে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে বুঝল সিগার ধরাচ্ছে নৃসিংহ। আর দু' এক মুহূর্ত পরেই ফেরার কথা ভাবতে হবে তাকে। দু' হাতের মুঠোয় শক্ত করে জানলার গরাদ দুটো চেপে ধরল আহামরি। নৃসিংহ না বললে তাকেই বলতে হবে।

বাইরে তাকালে বহু দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। এখন থেকেই ক্রমশ ঘন হতে শুরু করে তারাগুলো। আজ আকাশ খুব পরিষ্কার, তেমনি হাওয়া—শূন্যের কাছাকাছি বলেই বোধ হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় সংঘর্ষের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। সেদিনও শুনেছিল। অবশ্য সেটা শ্রাবণ ছিল না, বৈশাখ, কদর্য মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল আকাশ। সতীদিদের বাড়িতে তিন দিন কাটিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় তারা উঠে এসেছে নতুন ফ্ল্যাটে ; ঝড় শুরু হলো। অনেক রাত পর্যন্ত জানলায় দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ মেঘের আনাগোনা লক্ষ করেছিল আহামরি। টুকিটাকি ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত ছিল ব্রতীন, পাশে দাঁড়িয়ে একসময় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী দেখছ?' আহামরি বলেছিল, 'ঝড়। দেখছ, আজই এলো! এ-বাড়িটা বোধ হয় ভালো হবে না।' কথা শেষ না হতেই শুরু হলো বৃষ্টি, তুমুল বৃষ্টি। হঠাৎ আবির্ভাবে অনেকটাই ভিজে গেল তারা। এক হাতের বেড়ে তাকে ধরে, অন্য হাতে জানলা বন্ধ করতে করতে ব্রতীন বলেছিল, 'তুমি বড়োই পেসিমিস্টিক! প্রকৃতি নিজের নিয়মেই চলে। আমরা যে নতুন এ-বাড়িতে এলাম, সে-খবর প্রকৃতি রাখবে কী করে!' কথাগুলো ভেবে একটা নিঃশ্বাস চাপল আহামরি। আজ, এখন, হঠাৎ এসব কথা মনে পড়ার কারণ নেই কোনো, তবু, আহামরি ভাবল, হয়তো মনও চলে নিজের নিয়মে।

টেবিলে কাপ রাখার শব্দ। নৃসিংহ বোধ হয় চা শেষ করল। জানলায় মুখ চেপে রেখে উৎকর্ণ হলো আহামরি। সে প্রস্তুত আছে, নৃসিংহ বললেই চলে যাবে। কেন কে জানে, একটা বিষণ্ণতা এসে চেপে ধরল তাকে। স্মৃতি মাঝে মাঝে বড়ো কষ্ট দেয়।

'আজকের দিনটা মনে থাকবে।' নৃসিংহ হঠাৎ বলল, 'যত্ন কাকে বলে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

আহামরি একটু কাঁপল। নৃসিংহের সব কথাই অর্থ খুঁজছে আজ। হতে পারে এটা ইচ্ছাকৃত ; এমনও হতে পারে, বিকেলের উদাসীন আচ্ছন্নতা থেকে এখনো পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি নিজেকে। খানিক চুপ করে থেকে আহামরি বলল, 'ভুলে যাতে না যান সে-ব্যবস্থা করলেই পারেন!'

নৃসিংহ হাসল শব্দ করে। বলল, 'তোমরা সবই বলতে পার।'

কথাটায় কৌতুক বোধ না করে পারল না আহামরি। যেন ইচ্ছে করেই নিজের অসহায়তাকে প্রকট করে তুলবার চেষ্টা করছে নৃসিংহ, আগেও করেছিল। বলল, 'আপনার যা সামর্থ্য, তাতে অনায়াসে একটা বিয়ে করতে পারেন। বলুন, মেয়ে দেখব?'

'পারবে— ?'

'কেন পারবো না। পছন্দের ফিরিস্তিটা দিলেই হয়।'

সামান্য কথা, প্রায় খেলাচ্ছলেই বলা। তবু জবাব দিতে আশাতীত সময় নিল নৃসিংহ। তারপর বলল, 'যদি বলি তোমার মতো, তাতেও পুরো বলা হয় না।'

কথাটা বোধগম্য হলো না আহামরির। হঠাৎ মনে হলো, স্বতঃস্ফূর্ত হয়েও সে আচ্ছন্ন ছিল, না হলে নৃসিংহের নিঃশব্দ আবির্ভাব টের পেত। কাঁধের ওপর একটা হাত এসে পড়তেই হিমভাব ছেয়ে গেল শরীরে। চোখ তুলে দেখল, নৃসিংহ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় তার গা ঘেঁসে—কাঁধে লাগছে তার নিঃশ্বাস। সরে যাবার চেষ্টায় আরো বেশি করে ঘন হয়ে এলো নৃসিংহের শরীরে।

মুখটা কপালের ওপর নামিয়ে আনল নৃসিংহ।

'ভুল বলিনি, বিশ্বাস করো।'

বহুক্ষণ পরে আবার সেই ভিজে ভাবটা ফিরে আসছে শরীরে, একসঙ্গে অনেকটা নিঃশ্বাস ছটফট করে উঠল বুকে। পিছনে সরে গিয়ে দু' হাতের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নৃসিংহকে ধাক্কা দিল আহামরি। ডুবে-যাওয়া শব্দগুলোকে কোনো রকমে তুলে এনে বলল, 'সরুন, আমাকে যেতে হবে—'

লাভ হলো না। বাড়ানো হাত দু'টি ধরে প্রবলভাবে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল নৃসিংহ। আর কিছু ভাববার আগেই আহামরি অনুভব করল ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরেছে নৃসিংহ। অসম্ভব তপ্ত মুখে ঝাঁ-ঝাঁ করছে সিগারের গন্ধ, যেন তার শরীরের সমস্ত রস এক গণ্ডূষে পান করে নেওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই নৃসিংহের। একটা চেষ্টা করল আহামরি, এক ঝটকায় মুখটা সরিয়ে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এ কী করছেন আপনি! ছেড়ে দিন আমাকে, প্লিজ, ছেড়ে দিন—'

যেন এ-আর্তির মানে হয় না কোনো। নীল, আচ্ছন্ন আলোয় নৃসিংহের কঠিন, পুরুষালি মুখে একবারের জন্যে হাসি ফুটতে দেখল আহামরি, তারপরেই তার উন্মত্ত হাতের টানে ঢলে পড়ল বিছানায়। চোখে, মুখে, গলায় শিলাবৃষ্টির মতো এসে পড়ছে চুম্বন ; এলোমেলো হাতের হিংস্র আক্রমণে পটপট করে ছিঁড়ে গেল ব্লাউজের দুটো বোতাম, ব্রেসিয়ারের ফিতেয় টান পড়তেই শরীরে মোচড় দিয়ে চিৎকার করে উঠল আহামরি, 'না—।' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের পিছনে চুলের গোছা ধরে মাথাটা বালিশে ঠেসে ধরল নৃসিংহ। আবার নতুন করে শুরু হলো ক্ষ্যাপামি। হঠাৎ ব্রতীনের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ক্ষিপ্তভাবে নৃসিংহের হাতে কামড় বসাল আহামরি ; প্রায় নিঃশেষিত গলায় বলল, 'এই জন্যে ডেকে এনেছিলেন আমাকে? এই জন্যেই বলেছিলেন খারাপ লোক নন— !' বলতে বলতেই নিজের সর্বাঙ্গে অসহ্য আবেগ টের পেল সে। স্তনদুটো সম্পূর্ণ অনাবৃত করে ফেলেছে নৃসিংহ, ঠোঁট কাঁপছে, মুহূর্তের জন্যে মুখ তুলে বলল, 'একবার—শুধু একবার তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না, আহামরি!' 'না, না—', গোঙানির মতো শব্দটা চাপা পড়ে গেল গলায়। শরীরময় এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে নৃসিংহের হাত, ঠোঁট থেকে মুখ সরিয়ে

বুকের ওপর রাখতেই অস্ফুট যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আহামরি। প্রতিরোধ ভেঙে যাচ্ছে, পরিবর্তে আসছে একটা ঝিমঝিম করা অনুভূতি, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে গোটা শরীরে। একটা শিশু যেন হাত পেতে দাঁড়াল সামনে। ঘোরের মধ্যে নৃসিংহের মাথাটা দু' হাতে বুকের ওপর চেপে ধরতে ধরতে আর একটা যন্ত্রণা পেরিয়ে এলো আহামরি, এবং ভাবল, বারো বছরে যদি কিছু না হয়ে থাকে, আজও হবে না। ভাবতে ভাবতে জ্বালা করে উঠল চোখের কোণ দুটো।

নীল আলোটা জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশ মিশে গেল অন্ধকারে। স্তব্ধতায় ঝিঁঝির ডাকের মতো শব্দ উঠছে একটা, অনুভূতিহীন কান পেতে ঠিক কিসের শব্দ বোঝা যায় না। হতে পারে অবসাদের, কিংবা গ্লানির—অসাড় হাত-পাগুলোকে যথাস্থানে রাখতে রাখতে শব্দটাকে স্মৃতির দিকে ছুটে যেতে দেখল আহামরি। সম্ভবত এতোক্ষণ সে ভুল আবেগে কেঁপেছিল। নৃসিংহ উঠে যেতেই বালিশে মুখ গুঁজে প্রবল কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল। ক্রমশ—ফুলে ফুলে, ডুকরে।

উঠে এসে ওর পিঠে একটা হাত রাখল নৃসিংহ।

'কাঁদছ কেন! কেউ জানতে পারবে না—'

'আমি তো জানলাম!' শব্দগুলো জড়িয়ে গেল গলায়। কী ভেবে হঠাৎ চুপ করে গেল আহামরি। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে যতোটা সম্ভব গোছগাছ করে নিল নিজেকে। তারপরেই কিছু না বলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, দরজা খুলল। সামনে অন্ধকার সিঁড়ি। প্রচণ্ড রাগে একটা কুকুর চিৎকার ছুঁড়ে যাচ্ছে কোথাও। শব্দটায় কান রেখে আস্তে আস্তে বুকের ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনল আহামরি। এখনো সময় আছে, ব্রতীন ফিরে আসার আগেই সে হয়তো পৌঁছুতে পারবে।

॥ ছয় ॥

স্টাফরুমে সচরাচর একসঙ্গে এতোজন থাকে না। ইউনিয়ন ইলেকসানের জন্যে দুটো ক্লাস অফ্ করে দেওয়া হয়েছে; আজ ছিল। একটু পরেই ভোট কাউন্টিংয়ের জন্যে ডাক পড়বে। উপস্থিত মুখগুলিকে লক্ষ করল ব্রতীন—এরা কেউই তার সমবয়সী বা ঘনিষ্ঠ নয়। অমলেশের প্রেসার বেড়েছে। আজ আসেননি। একটু আগে এখানে আসার আগে দেখা হয়েছিল নৃসিংহের সঙ্গে। লাইব্রেরিতে যাচ্ছিল, বলল, 'তুমি কি চলে যাচ্ছ?'

'না। একজনের আসার কথা আছে, অপেক্ষা করতে হবে।'

নিচের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল নৃসিংহ। তারপর বলল, 'থেকো। কথা আছে।'

সম্ভবত এখনো লাইব্রেরিতেই আছে নৃসিংহ। এখন সে আর-একজন। একা ভাবলে প্রায়ই জেগে ওঠে দুঃখ; ব্রতীন ভাবে, একদিনের অসংযম কী আশ্চর্যভাবে পরিবর্তন এনে দিল দু'জনের সম্পর্কে! সেদিন কি পারত না একটু ধৈর্য ধরতে, কিংবা সরাসরি হেসে উড়িয়ে দিতে! কেনই বা ভিতরের ঝড়কে এ-ভাবে আসতে দিয়েছিল বাইরে! সন্দেহ? ভয়? অপমানবোধ? পরে কি মনে হয়নি এ-সবই তাকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত হননের দিকে—যার সঙ্গে, বস্তুত, নৃসিংহ বা আহামরি, কারুরই যোগ নেই কোনো! পরে কি সে

নিজেই ফিরে আসেনি নৃসিংহের কাছে ! কিন্তু কোন নৃসিংহের কাছে !

কতো দ্রুত পাল্‌টে যাচ্ছে মুখগুলি তাদের সমস্ত অভিব্যক্তি নিয়ে ! কোনাকুনি রাস্তা পার হচ্ছে নৃসিংহ—সদর্পে, কংক্রিটের রাস্তা না হলে জুতোর দাগ বসে যেত মাটিতে। প্রায় পাঁচ মাস পরে আবার একা-একা বিকেলের বাসস্টপে ফিরে গেল ব্রতীন।

স্টাফরুমে ঢুকেই একটা সোরগোল টের পেয়েছিল। বিভিন্ন মন্তব্যে কান রেখে কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারল আলোচনাটা মেয়েদের ইনটেলিজেন্স নিয়ে; সূত্রটা আসছে অ্যানসার-পেপার থেকে। উৎসাহ পেল না। তৃণা আসবে চারটে নাগাদ, দেরি আছে এখনো। আর-কিছুর অভাবে স্টেট্‌সম্যানটা তুলে নিয়ে বাইরে তাকাল ব্রতীন। কলেজ কম্পাউণ্ডে ঘাসের ওপরে রোদ ও ছায়ার সংমিশ্রণে থমকে আছে বিষণ্ণ হলুদ ; ছায়ার দিকে গোল হয়ে বসে আছে তিনটি মেয়ে। অল্প দূরেই পায়ে বুট, গায়ে জার্সি দু'টি ছেলে বল নিয়ে 'হেড্' প্র্যাকটিস করছে। নোটিশ বোর্ডে দেখেছিল, পরশু কলেজ লিগের ফাইনাল খেলা।

বিভূতি নাগ বাংলা পড়ায়। কবিতা লেখে। গোলগাল, ফর্সা চেহারা, মাথায় বড়ো বড়ো চুল, পান খায়, ব্রতীন ওকে ঠিক পছন্দ করতে পারে না। ইদানীং কি একটা পুরস্কার পেয়ে কথার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেটি নিজের গলা শুনতে ভালোবাসে।

ফ্রন্ট পেজে চোখ রেখে পুরনো খবরগুলিতেই আর একবার চোখ বুলনোর চেষ্টা করল ব্রতীন।

'এই মেয়েটি আরো ইন্টারেস্টিং—মৃদুলা দত্ত।' একটা খাতা খুলে পাতা উল্টে গেল বিভূতি নাগ, 'এর চিন্তায় দার্শনিকতা আছে। শুনুন—জীবন কী ? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া মনস্তাত্ত্বিকদের পক্ষেও সম্ভব নয়। জীবন কি জল ? জীবন কি বস্তু ? জীবন কি রক্ত-মাংস-অনুভূতির মিলিত রূপ ? তাকে কি সুন্দরী নারীর সঙ্গে তুলনা কবা চলে, যে-নারী প্রবঞ্চিকা— ।'

'প্রবঞ্চিকা !' বর্ণনার মাঝখানে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল শুভ্রাংশু, 'ও-রকম একটা শব্দ আছে নাকি ?'

'জ্বালালেন।' বিভূতি নাগ বলল, 'সুন্দরী নারীরা শব্দের ধার ধারে না।'

'তা হলে কিসের ধার ধারে ?'

'শুনলেন তো, রক্ত-মাংস-অনুভূতি...'

ফিজিক্সের অমিতাভ মিত্র কাগজে পেনসিল বুলিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছিল ; এখন কাগজটা বিভূতি নাগের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন, ইনটেলিজেন্স-টেস্ট বাজে কথা ! আসলে মেয়েছেলে মানেই এই—'

কাগজটা নিয়ে ইস্তাহার পড়ার মতো করে চোখের সামনে মেলে ধরল বিভূতি নাগ, 'বাঃ ! দারুণ সেক্স-অ্যাপিল দিয়েছেন তো !' বলে কাগজটা বাড়িয়ে দিল ব্রতীনের দিকে, 'দেখুন ব্রতীনবাবু, দেখুন—'

বিরক্ত লাগছিল। গম্ভীর গলায় ব্রতীন বলল, 'তোমরাই দ্যাখো। আমার ইন্টারেস্ট নেই।'

'ম্যারেডদের এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট না থাকাই স্বাভাবিক।' অমিতাভ হঠাৎ বলল, 'আমাদের ফিজিক্সে একটা কথা আছে—'

আর এগুলো না। দু'টি ছাত্র স্টাফরুমে ঢুকে বলল, 'ভোটিং কমপ্লিট। আপনারা

আসুন।'

ওরা উঠল। ব্রতীনের যাবার কথা নয়। এতোক্ষণের কথাবার্তা চাপা একটা রাগ ছড়াচ্ছিল মনে, আর একটু গড়ালেই বিরক্তিতে সে হয়তো ধমক দিতে বাধ্য হতো। সাধারণত তার শরীরে রাগ কম ; কিন্তু, আজকাল কী হয়েছে, স্নায়ুগুলো চড়া পর্দায় বাঁধা থাকে সব সময়, অল্পেই বেজে ওঠে ঝনঝন করে। প্রায়ই মনে হয় পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। যেখানেই যাক, পৌঁছুবার পর কেমন যেন মনে হতে থাকে দেরিতে পৌঁছুল—ঠিক একটু আগেই শেষ হয়ে গেছে একটা প্রসঙ্গ। মনে হয় বিষয়ের কেন্দ্রে সে-ই ছিল ; নিষ্কাশিত, আপাত-সরল মুখগুলিতে খোঁজে প্রতারণার চিহ্ন। একটু আগে অমিতাভর মুখে 'ম্যারেডদের' কথাটা উচ্চারিত হতেই এই রকম একটা সম্ভাবনায় কেঁপে উঠেছিল ব্রতীন। অথচ, অপরিণতদের প্রগল্‌ভতা ছাড়া কিছুই নয় এগুলো। এরা নতুন, আপন মনেই হাসল ব্রতীন, বেশ আছে এরা। কিন্তু সে কি কোনো কমপ্লেক্সে ভুগছে ? না হলে হঠাৎ-হঠাৎ এমন হয় কেন!

মাঠ জুড়ে খেলা করছে চমৎকার রোদ্দুর। মেয়ে তিনটিকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। জার্সি পরে যে ছেলে দু'টি বল খেলছিল, দেখতে না পেলেও মনে হচ্ছে তারা এখনো যায়নি—এখন বোধ হয় খেলা চলছে দূর পাল্লার শটের। শূন্যে রোদ্দুর চিরে কয়েকবারই বলটাকে পারাপার করতে দেখল ব্রতীন—বলের সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপের আকৃতি নিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কিমাকার ছায়া। দূর শূন্যে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টিতে বলের ছুটোছুটি দেখতে দেখতে হঠাৎই বিভ্রম সৃষ্টি হলো ব্রতীনের মনে। বস্তু ও বস্তুর ছায়া কি এক রকম নয় ? প্রশ্নটাকে একটা ফ্যালাসিতে দাঁড় করানোর চেষ্টায় পরপর টেনে আনল অনেকগুলো দৃষ্টান্ত, কোনোটাই দানা বাঁধল না। অবশেষে, একসময়, খেই হারিয়ে ফেলল। চোখ তুলে দেখল পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে, রোদ্দুর ও সবুজ জায়গা বদল করছে পালা করে। প্রকৃতিলোকের এই অদ্ভুত খেলা জালের মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। ক্রমশ বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতেই নড়ে বসল সে। হাই উঠল। সর্বাঙ্গ জুড়ে ছেয়ে আসছে ঘুম। অস্বাভাবিক নয়। প্রায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কাল, হঠাৎ, তারপর অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরও আর ঘুম আসেনি।

ঢেউয়ের মতো ছোট ছোট কয়েকটা হাই পরপর উঠে গলার মধ্যেই বুজে গেল। পকেট খুঁজে দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল ব্রতীন। একটাই আছে। কমনরুম থেকে একটা হট্টগোল ভেসে এলো এই সময়। সম্ভবত বিজয়ী হলো কেউ। চিনচিনে একটা ব্যথা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে বুকে—গলাভর্তি ধোঁয়া টেনে ব্রতীন ভাববার চেষ্টা করল তৃণা আসবে ; নৃসিংহের জন্যেও অপেক্ষা করছে সে। হলো না। যতো ভাবেই ভাবুক মন সম্ভবত এ-ভাবে ফেরে না। ক্লান্ত চোখের সামনে আবছায়া থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল আহামরি।

এসব দৃশ্যের প্রথম অনুভূতি অবিশ্বাস ; তাবপরেই দ্রুত হয় শিরার টান—আশঙ্কায় ঘাম ছুটতে থাকে শরীরে। বিছানা থেকে না উঠেই আলতো মুখ তুলে দৃশ্যটা বুঝতে চাইল ব্রতীন। ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আহামরি, আলোয় স্তূপাকার বুক, এক হাতে উঁচু করে ধরে রেখেছে টর্চটা, অন্য হাতে টেনে টেনে দেখছে স্তনের মুখ। গোটা দেহের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার জন্যেই এতো কাল সৌন্দর্যের শাসানি অনুভব করেনি—আজ, আকস্মিক শীত নেমে যেতে, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন

রহস্যময় লাগল ব্রতীনের। এতোখানি তন্ময় হয়ে কী দেখছে আহামরি। আত্মরূপ!

বিশ্বাস হয়নি। আস্তে উঠে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে নিয়েছিল আহামরি। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না ; বুকের ওপর তার মাথার ভার টের পেল ব্রতীন, একই অনুভূতি—বিয়ের পর থেকে এতোকাল যা সে ক্রমাগত বোধ করে এসেছে।

'কী হয়েছে!'

'কিছু নয়।' অস্ফুট গলায় বলল আহামরি, 'একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল—'

'কী!'

'তোমাকে বলা যাবে না—'

'এমন কী, যা আমাকে বলা যাবে না!'

তখুনি কোনো জবাব দিল না আহামরি। আস্তে আস্তে, ব্রতীন অনুভব করল, জলের রেখা ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। হঠাৎ তার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল আহামরি।

'দ্যাখো, বুঝতে পারবে।'

নরম মাংসের তালের ভিতর আছে সূক্ষ্ম শিরার জাল, তার ভিতর রক্তের প্রবাহ। স্পর্শে কাতর হয়। বহু বছরের অভ্যাস থেকে এর বেশি আর-কিছু বুঝতে পারেনি ব্রতীন। সম্ভবত এটা আহামরির খেয়াল। রাতের দূরত্ব থেকে হঠাৎ নতুন লাগল আহামরিকে।

'আসছি', বলে বাথরুমের দিকে হেঁটে গেল আহামরি।

'সরি। অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।'

'থাকতেই হতো।'

'কেউ আসবে?'

'তৃণা।' ব্রতীন বলল, 'তুমি চেন, আমার ছাত্রী—'

কোথায় বসবে ঠিক করতে পারছে না নৃসিংহ। দু' তিনটে চেয়ার ছুঁয়ে এসে পাশেরটিতেই বসল শেষ পর্যন্ত। হাতের বই দুটো নামিয়ে রাখল টেবিলে। চশমাটা খুলল, আবার পরল, কী ভেবে খুলে রাখল আবার। আজ বোধ হয় দাড়ি কামায়নি। গাল, চিবুক ও গলা জুড়ে দাগ পড়েছে পুরু ; অল্প যে বিমর্ষ লাগছে তার কারণও হয়তো এই। পুরু ঘামের একটা রেখা জেলির মতো আস্তে আস্তে গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাড় বেয়ে। দূরে সহর্ষ চিৎকার ; একদল ছেলে জটলা করতে করতে দৌড়ে গেল মাঠের ভিতর। সম্ভবত কাউন্টিং শেষ হলো।

'লাস্ট ইয়ারের টিমই জিতল শুনলাম।' নৃসিংহ সিগার বের করল, 'নেবে নাকি? খাচ্ছ তো আজকাল!'

খানিক আগেই একটা সিগার ধরিয়েছিল ব্রতীন, জুত হয়নি তেমন—থেকে থেকে হাই উঠে আসছে মুখে। আহামরিকে জড়িয়ে দৃশ্যটা ভুলতে পারছে না এখনো। সদ্য পেরিয়ে-আসা স্বপ্নের মতো তার কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট—বৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা পুরু কাচের আড়াল থেকে আর-একবার ঘটনার কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা করল সে। সিগারটা নিল ; সম্পর্কের অস্বস্তি কাটিয়ে এর ফলে যদি একটু কাছাকাছি আসা যায়।

আগুন জ্বলে ওঠার পর ব্রতীনই কথা বলল প্রথম।

'কী বলবে, বলো?'

'বলছি—'

আবার দেশলাই জ্বেলে ধরাটা ইচ্ছাকৃত কি না বোঝা যায় না। এমনও হতে পারে, সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবার আগে বলার কথাগুলো পরপর সাজিয়ে নিচ্ছে নৃসিংহ। কী বলতে পারে ও ? কাছাকাছি এমন কোনো বিষয় নেই যাতে দু'জনেই হাত রাখতে পারে একসঙ্গে। অনুমানের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। একদিন ছিল যখন ভূমিকা ছাড়াই নিমেষে প্রসঙ্গে নেমে আসতে পারত নৃসিংহ—হাসত জন্তুর মতো, টেনে হিঁচড়ে নামাতে পারত রাস্তায়। কলেজ থেকে বেরিয়ে আজকাল প্রায়ই এসব মনে পড়ে যায়। ক'দিন আগে রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভাবছিল বন্ধুদের মুখ ; নামগুলো ঠিক ঠিক মনে এলেও বিশেষভাবে ফিরে এলো না কেউই। স্মৃতির সবটাই প্রায় চলে গেছে সুদূরে।

নৃসিংহ বলল, 'ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

'মানে ! তোমার ফ্ল্যাট ?'

'হুঁ।'

মুখ না তুলেই কথা বলছে নৃসিংহ। টেবিল থেকে একটা বই তুলে পাতা উল্টে গেল যথেচ্ছ।

'কেন ?' ব্রতীন অবাক হলো না, এটা নৃসিংহের ব্যক্তিগত। 'অতো বড়ো ফ্ল্যাট, ভাড়াও তো সস্তা ছিল—'

'প্রশ্নটা প্রয়োজনের। ভেবে দেখলাম প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া অন্য অসুবিধেও হচ্ছে।'

'যেমন ?'

'ডিটেলে গিয়ে লাভ কী !' ব্রতীনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যেই যেন অনেকক্ষণ বাদে মুখোমুখি তাকাল নৃসিংহ, 'মীর্জাপুরে একটা মেস দেখেছি। উঠে আসব।'

মনে মনে একটা হিসেব কষে নিল ব্রতীন এবং ভাবল, দূরত্বে তার সায়ই দেওয়া উচিত। কলেজ স্ট্রিট থেকে বাসে ট্রামে তার বাড়ি পঁয়তাল্লিশ-মিনিট এক-ঘণ্টার কম নয়—এতো দূর থেকে ইচ্ছেমতন নিয়মিত পাড়ি দেওয়া যায় না। তখুনি মনে হলো প্রায় পাঁচ মাস নৃসিংহ তার বাড়ি যায়নি। দেড় দু' বছরে এটাই সবচেয়ে বড়ো গ্যাপ। মনে হয় গ্যাপটা বাড়বে।

কথাগুলো কোনোভাবেই স্পর্শ করল না ব্রতীনকে। এটা সামান্য খবর ; নৃসিংহ নিশ্চয়ই তার কাছে পরামর্শ চাইতে আসেনি। তবে ?

পরবর্তী প্রশ্নটায় সরাসরি চলে এলো ব্রতীন।

'কবে যাচ্ছো ?'

'ধরো সামনের মাসে—'

কথা এগোচ্ছে না। নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারে নৃসিংহও থেমে পড়েছে। শুধু এইটুকু শোনানোর জন্যেই কি তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল নৃসিংহ, নাকি ছিল আরো কোনো কথা, দ্বিতীয় চিন্তায় যেগুলো সে আড়াল করে নিল ! যদি তাই হয়, তা হলে, ঘটনাটা এইখানেই শেষ হওয়া উচিত।

একা থাকলে যে-বোধগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সংস্রব হারিয়ে এখন তার সবই ভোঁতা লাগছে। কিঞ্চিৎ ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখল ব্রতীন। পৌনে চারটে। তৃণাকে বলেছিল, স্টাফরুমে অপেক্ষা করবে, ইতিমধ্যেই তার চলে আসা উচিত ছিল। দেরি হচ্ছে। নৃসিংহ চলে গেলে সে গেটে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

অল্প অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ব্রতীন। নৃসিংহের গলা শুনে ফিরে এলো।

'অমলেশবাবু কি তোমাকে কিছু বলেছেন ?'

'কী বিষয়ে ?'

'বিষয় সামান্যই।' প্রসঙ্গ থেকে আর-এক প্রসঙ্গে যেতে যেটুকু সময় লাগে তার বেশি থামল না নৃসিংহ। হাসল, 'আমি সম্ভবত জলপাইগুড়িতে ফিরে যাবো।'

এতোক্ষণের সব কথা থমকে দাঁড়াল একটি বিস্ময়ে। এতোটা আশা করেনি ব্রতীন।

'মা একা আছেন। তা ছাড়া—', একটু চুপ করে থেকে নৃসিংহ বলল, 'নিজের কাছ থেকেই একটা বাধা আসছে ; কলকাতা আর টানছে না। একটা পর্যায়ে এসে এসব ভাবতে হয়।'

ব্রতীন তাকাল ; চোখেমুখে থম। একটা কথা মুখে এসে গেল—'তোমার এই উপলব্ধি কি হঠাৎই হলো নৃসিংহ ! কলকাতা মানে কি তুমি বিশেষ একজনকে ভেবেছিলে !' কিন্তু, বলতে পারল না। ভিতরে একটা জ্বালা অনুভব করল সে। এই চিন্তার সবটুকু গ্লানিই তার—নৃসিংহকে নিশ্চয়ই তা স্পর্শ করবে না।

এককালে ঘনিষ্ঠ ছিল, কিছুক্ষণ আগেও সিগার চেয়ে নিয়ে ব্রতীন নৃসিংহের কাছাকাছি আসার কথা ভেবেছিল। এখন মনে হচ্ছে ঘা শুকোয়নি, বরং চোরাপথে গড়িয়েছে অনেক দূর, না হলে উপযাচক হয়ে এক-আধটা পরামর্শ সে দিতে পারত।

ভিতরে ভিতরে ডুবতে লাগল ব্রতীন।

নৃসিংহ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বইগুলো তুলে নিল হাতে।

'সেদিন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। আজ ক্ষমা চাইছি—'

কাঁধে হাত রেখেছে নৃসিংহ, অল্প কাঁপছেও যেন। কাঁপুনিটা তার নিজের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। মাথা ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসে থাকল ব্রতীন। তারপর ধরা গলায় বলল, 'ঠিক করে ফেলেছ ?'

'প্রায়। অমলেশদাকে বলেছি। তোমাকেও বললাম।'

'আজই বলার তাড়া ছিল না।'

নৃসিংহ হাসল শব্দ করে, প্রায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। হাসির টানে ফিরে আসছে ওর মুখের পুরনো রেখাগুলো।

'মানুষ বদলায়। তুমি একটু বেশিই বদলে গেছ ব্রতীন !'

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে নৃসিংহ, ব্রতীনও উঠে দাঁড়াল। প্রায় পাশাপাশি হেঁটে স্টাফরুম থেকে বেরুল দু'জনে। পড়ন্ত রোদ পিছু হটতে হটতে পৌঁছে গেছে গেট পর্যন্ত ; প্রাকৃতিক অসাম্যের জন্যেই কি না কে জানে, কোনো কোনো জায়গা বড়ো বেশি আলোকিত লাগে। আশ্বিনের হাওয়ায় ফিরে আসে স্মৃতি। একদিন—সে অনেক দিন আগে, নৃসিংহের কলকাতায় আসার গোড়ার দিকে, ক্রিক রো'র মেসবাড়ির ঘুপচি ঘরে দাঁড়িয়ে ব্রতীন নৃসিংহকে বলেছিল, 'যতো দিন অন্য ব্যবস্থা না হয় তুমি আমার বাসায় চলে আসতে পার।' বলেছিল কি ? সন্দেহ মানুষকে বড়ো ছোট করে দেয়।

মাঠের রাস্তায় পা দিয়ে ব্রতীন দেখল গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামছে তৃণা। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হাত নাড়ল। অন্যমনস্কভাবেই ব্যাপারটা লক্ষ করল না ব্রতীন। নৃসিংহ যখন বলে এইভাবেই বলে—সাজিয়ে গুছিয়ে, আত্মবিশ্বাস মিশিয়ে। এখন তবু অন্য রকম লাগল। মনে হচ্ছে এক কথা বলতে এসে বলে গেল আর-এক কথা ; যাকে বলা হলো বাকিটুকু ভেবে নেওয়ার দায়িত্বও তার। সে ভাববে।

গেটের কাছে পৌঁছুতেই এগিয়ে এলো তৃণা। ওকে দেখেই সম্ভবত, ব্যস্ত হয়ে পড়ল

নৃসিংহ।

'আমি চলি, ব্রতীন। পরে দেখা হবে।'

স্থিরভাবে তাকিয়ে ওর এগিয়ে যাওয়া লক্ষ করল ব্রতীন। দূরত্ব যতো বেশি হয়, ছন্দও থেমে আসে ততো, মনে হয় শ্লথ হয়ে পড়ছে গতি। সামনে বাসস্টপ। একদিন ওখান থেকে প্রায় একইভাবে চলে গিয়েছিল নৃসিংহ। সেদিন ও ক্ষমা চাইতে আসেনি।

'ভদ্রলোক কে?'

'নৃসিংহ।' বন্ধু কথাটা এড়িয়ে গেল ব্রতীন, 'আমার সহকর্মী।'

তৃণা বলল, 'চেহারাটা কিন্তু ভারী সুন্দর!'

'তোমরা, মেয়েরা, শুধু চেহারাটাই দ্যাখো—'

'আপনি আরো বেশি দেখছিলেন; ফ্যাল ফ্যাল করে!' সহজ গলায় বলল তৃণা, 'ব্যাপার কী! মনে হচ্ছে দেরি করেছি বলে রেগে গেছেন খুব!'

ব্রতীন মেয়েটিকে দেখল। পুরু সবুজ পাড়ের সিল্কের শাড়ি পরেছে তৃণা, জমিটা সাদা, একটু খুঁজলেই অবশ্য সাদা বুটিগুলো চোখে পড়ে। ব্লাউজটাও সাদা। কপালে সরু করে টানা সবুজ টিপের দু'একটা গুঁড়ো এসে পড়েছে নাকের পাটায়। শাম্পু-করা চুলের গোছা সবুজ ক্লিপে আটকানো। পায়ের স্লিপারের রঙও সবুজ। দেখতে দেখতে একই সঙ্গে অসম্ভব কৌতুক ও উত্তেজনা বোধ করল ব্রতীন। তৃণার ঘড়ির ব্যাণ্ডের রঙ সবুজ, বাঁ হাতের পুরু সোনার বালায় পান্না বসানো—হাতের আঙুল জড়িয়ে ঝুলছে সবুজ রঙের হ্যাণ্ডলুমের ব্যাগ। প্রগাঢ় সবুজের আক্রমণ ধুয়ে হাল্‌কা করে দিচ্ছে তাকে—গাছগাছালি থেকে উড়ে-আসা সবুজ হাওয়া শুশ্রূষা ছড়িয়ে দিচ্ছে গায়ে। বিস্ময়ে তৃণার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু আগেকার অস্বস্তিটা পাশ কাটিয়ে গেল ব্রতীন।

'অমন করে দেখার কিছু নেই।' মৃদু তিরস্কারের গলায় তৃণা বলল, 'ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। উঠুন।'

'কোথায়!'

'আগে উঠুন, বলছি।'

রাস্তার মধ্যেই হাত ধরে টানল তৃণা। ব্রতীন আপত্তি করল না। যেখানেই যাক, কোনো খোঁজ-খবর করার দরকার নেই এখন। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। ইলেকসানের জন্যে খানিক আগে পর্যন্ত শব্দের পর শব্দ ছুটে যাচ্ছিল চারিদিকে, এখন সব চুপচাপ। ফুটপাথে, গাছের গুঁড়ির পাশে বসে ডানায় চোটলাগা একটা শালিক চেষ্টা করছে উড়ে যেতে—তার মাথার ওপর ওড়াউড়ি করে তারস্বরে চিৎকার করছে কয়েকটা কাক। দৃশ্যটায় চোখ রেখে ট্যাক্সিতে উঠল ব্রতীন। ভালো লাগে না এই অবসাদ আর ক্লান্তি, সারাক্ষণ শিরা টান করে বেঁচে থাকা। তৃণার সান্নিধ্যে, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

ইচ্ছে করেই একটু তরল হলো ব্রতীন।

'তৃণা, একদিন তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে তোমাকে দেখে লোভ হয় কি না। মনে পড়ে?'

'যাঃ! সেদিন একটু বাড়াবাড়ি করেছিলাম।'

'সে-কথা নয়।' ব্রতীন বলল, 'সেদিন ঠিক জবাব দিতে পারিনি। আজ বলছি, হয়, ভীষণ লোভ হয়।'

'কচু হয়।' কানে লালচে আভা লাগল তৃণার। হঠাৎ ব্যাগের ভিতর থেকে একটা নতুন সিগারেটের প্যাকেট বের করে ছুঁড়ে দিল ব্রতীনের কোলে, 'আপনার দৌড় জানা আছে।

তা ছাড়া—'

ব্যস্ততার শেষ হচ্ছে না তৃণার। কী বলতে গিয়ে থেমে হাতের মুঠোয় একটা লাইটার তুলে আনল।

'নিন, এটাও আপনার।'

'এসব আমাকে দিচ্ছ কেন?'

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ট্যাক্সিটা এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল তৃণা, 'পার্ক স্ট্রিট।' হেসে বলল, 'আগে নিন। পরে বলব।'

মনে হচ্ছে ভীষণরকম উত্তেজিত তৃণা। থুপ থুপ করে রুমাল বুলিয়ে নিল নাক ও ঠোঁটের ওপর। আলগা একটা হাসি অনেকক্ষণ ধরেই লেগে আছে ঠোঁটে। সেদিনের পর আরো অন্তত দশ-বারো দিন দেখা হয়েছে, এর মধ্যে একবারও সেদিনের প্রসঙ্গ ওঠেনি—অত্যন্ত সংযত ব্যবহার করেছিল তৃণা। ভাবভঙ্গি দেখে বুঝবার উপায় নেই আজ হঠাৎ কী হলো!

অবাক হলেও কৌতূহলে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। শুরুতে স্বতঃস্ফূর্ত হলেও এখন আবার ফিরে আসছে ক্লান্তি। এই মেয়েটির সঙ্গে বস্তুত কোনো সম্পর্ক নেই তার; কিংবা, থাকলেও, তা শুধু প্রয়োজন আর ভদ্রতার—ভাবতে ভাবতে অল্প সরে গেল সে, মাথাটা হেলিয়ে দিল সিটের পিছনে। ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা। কাঁধের ওপর হঠাৎই উঠে এলো নৃসিংহের হাত—ঠাণ্ডা ও আড়ষ্ট; হাত বাড়িয়ে হাতটা সরিয়ে দিল ব্রতীন।

পার্ক স্ট্রিটের নামকরা কনফেক্‌সানারের সামনে এসে ট্যাক্সি থামাল তৃণা—একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল ড্রাইভারের হাতে। খুচরোটা নিল না।

'আসুন, ব্রতীনদা।'

'এখানে কী!'

'ভিতরে চলুন। চা খেতে খেতে একটা খবর দেব আপনাকে।'

সুখবর, ধরেই নিল ব্রতীন। কতো দূর এবং কী অনুমান করতে পারল না। কাচের দরজা ঠেলে ঢুকবার আগে ইতস্তত করল একটু! উৎসাহ তৃণাকে কৃত্রিম করে তুলেছে।

'চা খাবার ইচ্ছে থাকলে আগে বলোনি কেন! আমিই তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম।'

'কেন!' তৃণা বলল, 'এ-জায়গা আপনার পছন্দ নয়?'

ব্রতীন ভাবল, 'না' বলবে। তৃণা, আমি ক্লান্ত, এসব শৌখিনতা ভালো লাগছে না, এই মুহূর্তে আমার মনে কোনো আবেগ নেই। তবু বলতে পারল না। অনেক দিন পরে মেয়েটি আজ প্রাণ খুলে হাসছে। কোথায় কী হয়ে যাচ্ছে—এইমাত্র নৃসিংহের কাছে ছোট হয়ে এলো; আর পারবে না। ইত্যাদি ভেবে নিজের হাতেই দরজাটা ঠেলে ধরল ব্রতীন।

'তোমার পছন্দ হলেই আমি খুশি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ—'

এই সময় ভিড় থাকার কথা নয়। এদিক-ওদিক অনেকগুলো টেবিলই খালি পড়ে আছে। কোণের দিকে কাচের দেওয়ালের পাশে একটা জায়গা বেছে নিল তৃণা। ওয়েটারকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ব্রতীনদা, কী খাবেন?'

'শুধু চা।'

'ব্যস! আচ্ছা, ঠিক আছে—'

এখান থেকে রাস্তা দেখা যায় পরিষ্কার। কাচের আড়াল থাকার জন্যেই হয়তো বাইরেটা ঘোলাটে লাগছে বেশি। লোকজন, গাড়ি, সারি সারি দোকান ও রেস্টুরেন্টের সাইন—সবই কেমন ঝিমুনো। আশ্বিনের এই সময়টা বেলা ছোট হয়ে আসে ক্রমশ, সে-জন্যেও হতে পারে। আবছা একটা ধুলোর ঘূর্ণি উঠে কাচটাকে আড়াল করে দিল।

'ব্রতীনদা, আপনিই ঠিক বলেছিলেন—'

'কী-রকম?'

'সুব্রত আসছে। আমাকে চিঠি দিয়েছে একটা। খুব রাগ। কথা তো চাপা থাকে না—'

কাচের ওপর আঙুলের দাগ কাটতে কাটতে থেমে গেল তৃণা। ক্রমশ আভা ছড়িয়ে পড়ছে ওর মুখে। আবেগে ঠোঁটটা অল্প ফুলে উঠেছে যেন। চোখ না তুলেই বলল, 'বোধ হয় অঘ্রানেই হবে—'

'এ তো সুখবর! কন্‌গ্র্যাচুলেসানস্‌!' ব্রতীন এইমাত্র সক্রিয় হলো। বলল, 'কিন্তু, চায়ের ওপরেই চালাচ্ছ, ব্যাপারটা কী!'

তৃণা চোখ তুলল এবং নামিয়ে নিল। হাসতে হাসতেই বলল, 'না, না, অমন ভাববেন না।'

আরো একটা কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেল ব্রতীন। কথার প্রতারণা আজকাল প্রায়ই তাকে বিব্রত করে—জিব অধিকার করে নেয় মুখের সবটুকু, মনে হয় নিঃস্ব হয়ে পড়ছে ক্রমশ। মনে হয় এগিয়ে ভাবতে পারছে না। এগোতে গেলেই শব্দগুলো জড়িয়ে যায় মাথার মধ্যে, ভুল টেপ চালানোর মতো গরগর করে ওঠে স্মৃতি। স্মৃতি?

এই মুহূর্তে কথাটার অর্থ খুঁজল ব্রতীন। পেল না। চায়ে চিনি মিশিয়ে কাপটা এগিয়ে দিল তৃণা। ঝুঁকে আসার জন্যে সরে গেছে শাড়ির আঁচল, চমৎকার সাদা বুকে উপচে পড়ছে আলো। চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল ব্রতীন। একসঙ্গে অনেকখানি ধোঁয়া টেনে আবার ছাড়তে ছাড়তে দেখল ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে তৃণা। ভালোবাসায় ভরে আছে এখন, তাকে সামনে রেখেও নিশ্চিত তার কথা ভাবছে না। এই তৃণাই ক'দিন আগে প্রতিশোধের কথা ভেবেছিল, ভেবেছিল জব্দ করবে সুব্রতকে!

এই বিকেলে তৃণার মুখোমুখি বসে অদ্ভুত আবেগে কেঁপে উঠল ব্রতীন। মানুষ বদলায়, নৃসিংহ বলেছিল, হয়তো সত্যিই একটু বেশি বদলে গেছে সে। পরিচয়ের পর থেকেই দিনের পর দিন এই মেয়েটি লোভ সৃষ্টি করে গেছে তার মনে। সুযোগ এসেছিল; তখন তাদের মধ্যে ছিল তিনশো টাকার ব্যবধান। সাহস হয়নি। নৃসিংহ হলে কি ব্যাপারটা অন্য রকম হতো!

সম্পর্কগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে; কাউকেই ধরে রাখা যাচ্ছে না তার ঠিক জায়গায়। হতে পারে এটা তার মনের ভুল। সন্দেহে কালো হয়ে আছে ভিতরটা—মাঝে মাঝে তাকালে নিজেই দাগগুলো দেখতে পায় ব্রতীন। এখন হাজার ঘষেও তুলে ফেলা যাবে না।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় বাথরুমে কাটিয়ে অন্ধকার ঘরে ফিরে এলো আহামরি। খাটে আধশোয়া হয়ে সিগারেট খাচ্ছে ব্রতীন; জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসে তাতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো কারুর মুখ দেখা যায় না। তবু, অন্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন যতোটা দেখা যায় প্রায় ততোটাই দেখা যাচ্ছিল আহামরিকে। ব্রতীন জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি শরীর খারাপ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না আহামরি। বিছানায় উঠে এসে আবার শুয়ে পড়ার আগে

থেমে বলল, 'বুকে ব্যথা। মনে হলো বমি হবে।'

'তেমন মনে হলে ডাক্তার দেখানোই ভালো—', বলতে বলতে সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলল ব্রতীন।

আহামরি বলল, 'শরীর আমার একার নয়, তোমারও! আজই হঠাৎ তফাত করছ কেন?'

সাধারণত এ-রকম গলায় কথা বলে না আহামরি। অর্থটাও স্পষ্ট নয়। ঠিকমতো ধরতে না পেরে ভারী মাথাটা আস্তে আস্তে বালিশে নামিয়ে রাখল ব্রতীন। তখনই ঘটনাটা ঘটে। হঠাৎই তার শরীরে ঘেঁসে এসে মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রচণ্ড আবেগে মুখে, কপালে, গলায় চুমু দিতে দিতে আহামরি বলল, 'দিন-দিন এতো কোল্‌ড হয়ে যাচ্ছ কেন!'

জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা তখন নয়। আহামরি ফিরে যাচ্ছে তার বাইশ বছর বয়সে, যখন প্রতিদান ফেঁপে ওঠে ঢেউয়ের মতো। আজও একটা অসম্ভব আগুন না জ্বেলে ছাড়বে না। অনেক দিন পরে আহামরির আগ্রহে তপ্ত হয়ে উঠল ব্রতীন। ভাবল, পারবে। তখন নিজেকে ফিরে পাবার আসুরিক চেষ্টায় ক্লান্ত হতে হতে অনুভব করল, দু'জন ব্রতীন একসঙ্গে কাজ করছে তার মধ্যে—কিছুতেই একাত্ম হতে পারছে না। অনুভূতিটা গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নিল এবং ক্লান্তভাবে বলল, 'বয়স হচ্ছে। এখন কিছুই আর ঠিকঠাক থাকে না।'

আহামরি শুনেছে বলে মনে হলো না। কানের কাছে মুখ এনে জ্বরো গলায় বলল, 'সারাক্ষণ ভাবছ বলেই এমন মনে হচ্ছে। চেষ্টা করো, পারবে।'

বিছানা জুড়ে পরিশ্রমের গন্ধ। অন্ধকারে আবার আহামরির কাছে ফিরে যেতে যেতে ব্রতীন ভেবেছিল, ভালোবাসায় ভুল নেই কোনো। তবু আহামরি ব্রতীন নয়, সে আহামরি নয়। দূরত্ব থাকবেই।

'ব্রতীনদা!'

জোর করে নিজেকে টেনে তুলল ব্রতীন। সিগারেটটা গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে। হাসল।

'আজ আপনি এতো অন্যমনস্ক কেন!'

'কিছু নয়। ভাবছিলাম কিছুই ঠিকঠাক থাকে না। মানুষ বদলে যায়, সন্দেহগুলো ভুল হয়ে যায়।'

'মিছিমিছি একটা ব্যাপার হয়ে গেল!' তৃণা বলল, 'এখন ভয় লাগছে—'

'কেন!'

'সব ঠিক হয়ে গেলেও মনে হচ্ছে সম্পর্কে কোথায় একটা খিচ ধরে গেছে। মাঝখানের এই ব্যাপারটা কি আমরা ভুলতে পারব!'

তৃণা আবার চা ঢালতে যাচ্ছিল কাপে। হাত নেড়ে বারণ করল ব্রতীন।

'ভাবছ বলেই মনে হচ্ছে। চেষ্টা করো, পারবে।'

মনে হলো তৃণা এখনো ভাবছে। ব্রতীন কিছুক্ষণ লক্ষ করল ওকে—যে-ভাবে মানুষ তাকিয়ে থাকে, একা-একা।

'উঠবে— ?'

'হ্যাঁ, চলুন—'

'তুমি কিছু মনে কোরো না।' ব্রতীন বলল, 'বিলটা আমি পে করছি—'

'কেন!' বলেই থেমে গেল তৃণা। তারপর কী ভেবে বলল, 'আচ্ছা।'

মুখের মধ্যে কতকগুলো হাই উঠে এলো পরপর। তৃণাকে পিছন থেকে দেখে আবার সামনে এগিয়ে এলো ব্রতীন। প্রায়-সন্ধ্যা। খানিক আগে আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুকে আলো পড়েছিল তৃণার। সে-আলোয় তারতম্য ছিল না কোনো। বাইরেটা অন্য রকম—জ্বলে উঠেছে নিয়নগুলো, গাড়ির পর গাড়ি, মানুষের পর মানুষ ; কোনো মুখই চেনা বলে মনে হয় না। কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কিছু মনে পড়ে কি না ভাববার চেষ্টা করল ব্রতীন—কোনো মুখ, কোনো ঘটনা, কোনো কাজ। এটা তার পুরনো অভ্যাস। কিছুই মনে পড়ল না। তখন ভাবল, এখন বাড়ি ফিরে গেলে দরজা আহামরিই খুলবে।

'তুমি কি বাড়ি ফিরবে ?'

'না।'

'তবে ?'

হাতের ইশারায় ট্যাক্সি ডাকছে তৃণা। বলল, 'গোলপার্কে আমার মাসির বাড়ি, সেখানে। মা থাকবে। আপনাকে নামিয়ে দিতে পারব।'

'একা-একা এতো ট্যাক্সি চড়া ভালো নয়।' ব্রতীন বলল, 'এখন একটু সাবধানে থেকো।'

সারা রাস্তা প্রায় একটিও কথা বলল না ব্রতীন। তৃণার কথার উত্তরে 'হ্যাঁ' 'না' করে গেল শুধু। অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা ঢুকে পড়েছে রক্তে, ক্রমশ, সেই একদিন গ্লাসে চুমুক দেওয়ার আগে যেমন হয়েছিল। কস্তুরী বলেছিল. ইউজলেস্ ! মনে থাকাই যদি স্মৃতি হয়, তা হলে এখনো অনেক দূর হাঁটতে পারবে ব্রতীন। বাড়ির সামনে নেমে দেখল চলে যেতে যেতে হাত নাড়ছে তৃণা। সেও নাড়ল। তারপর পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

এরই মধ্যে আবছা হতে শুরু করেছে সিঁড়িটা। আগে আগে সংখ্যা গুনতে গুনতে সিঁড়ি উঠছে মিসেস বলের ছেলে—সম্ভবত পার্ক থেকে ফিরল। ব্রতীন মিলিয়ে দেখল সংখ্যাগুলো মিলছে না। খটকা লাগল। তখন মনে পড়ল সে শুরু করেছিল মাঝখান থেকে ; আবার প্রথম থেকে শুরু করলে হয়তো মিলবে। ছেলেটিকে পাশ কাটিয়ে আলোর স্যুইচে হাত দিল সে। দোতলা ও তিনতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় ছেলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস বল। মুখোমুখি হতেই হাসল।

'ছাত্রী না ?'

অনিচ্ছুকভাবে ঘাড় নাড়ল ব্রতীন।

'এতোটা এলো, বাড়িতেও আসতে পারত !'

গা করল না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে পুরনো অভ্যাসটাকে টেনে আনল ব্রতীন, কে দরজা খুলবে ! তারপর হাত রাখল কলিং বেলে।

আহামরিই। থমকানো মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে—চোখের কোল বসা, চুল উস্কোখুস্কো, আজ বোধ হয় বেশি করে সিঁদুর পরেছিল।

খানিক তাকিয়ে থেকে ব্রতীন জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি শরীর খারাপ ?'

জবাব না দিয়েই ভিতরের দিকে হেঁটে গেল আহামরি। এমনও হতে পারে, দিয়েছিল, সে শুনতে পায়নি। পিছন ফিরে দরজাটা বন্ধ করতে করতে ব্রতীন ভেবে নিল কোন কথাটা আগে বলবে এবং কীভাবে বলবে ! এক হিসেবে দুটোই ভালো খবর, এক হিসেবে দুটোই খারাপ। এর মধ্যে একটা সে সহজেই চেপে যেতে পারে। কিন্তু, কোনটা ?

আবার শুরু থেকে আরম্ভ করল ব্রতীন।

॥ সাত ॥

আহামরি আত্মহত্যা করেনি। ভয় পেয়েছে বলে নয়, বস্তুত ব্রতীনই করতে দেয়নি তাকে। বারো বছরের অভ্যাস তাকে ব্যক্তিগত বলে শেখায়নি কিছু—একার জন্যে ভাবতে গেলেই কেমন সিরসির করে ওঠে গা ; যেন এই ব্যাপারেও ব্রতীনের সায় দরকার ছিল ! আর একটা কথাও অবশ্য ভেবেছিল সে। এইভাবে হুট্ করে চলে গেলে ভাবুক আর বিষণ্ণ এই মানুষটা আর-একটু একা হয়ে পড়বে না কি !

ভাবনাগুলো ক্রমশই বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল তাকে—সব বুঝেও যেন কিছু বুঝতে চায় না ব্রতীন ! চোখমুখ জুড়ে ভাবুকতার মধ্যেও এককালে ছিল বুদ্ধি আর কৌতুক, এখন সত্যিই হাবাগোবা লাগে। ব্রতীনের তাকানোর ধরন দেখে মাঝে মাঝে বড়ো ভয় করে আহামরির—কিছু কথা, কিছু শব্দ, কিছু দৃষ্টির ধরনে আজকাল প্রায়ই আটকে যাচ্ছে ব্রতীন। 'তোমার কি শরীর খারাপ ?' কথাটা ঘুরেফিরে ছুটে আসে কানে—অসহায়ভাবে, মাকড়শার জালে আটকে-পড়া মাছির মতো, ব্রতীন যেন তার সমস্ত উদ্যম শেষ করে দিচ্ছে ওই কয়েকটি শব্দের কেন্দ্রে ! ঠিক বুঝতে পারে না, কেন ব্রতীনের শরীরে লিপ্ত হয়েও ইথার তরঙ্গে তার নাকে ভেসে আসে নৃসিংহের গায়ের গন্ধ ! শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে, ঝিমঝিম করে মাথা, বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণা। সমস্তই সে সইয়ে নেয় আস্তে আস্তে। ভাবে, শেষ দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ব্রতীনের জন্যে।

এসব ঘটনার দিন দশেক বাদে সত্যিই একদিন ব্রতীন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হলো।

বিকেলেই যাবে। সব গোছগাছ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আহামরি —অনেক দিন পরে আজ সে রীতিমতো সেজেছিল, দেখল, বেরুবার দরজা খুলবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে ব্রতীন। হঠাৎ নাভির কাছে সিরসির করে উঠল আহামরির। কিছু না ভেবেই অস্ফুট গলায় সে ডাকল, 'ব্রতীন !'

আহ্লাদে-ভরা সেই ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রতীন। হাতটা তখনো ছিটকিনি ছুঁয়ে আছে, আহামরিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাকাল অবাক চোখে।

'নাম ধরে ডাকলে যে !'

'ইচ্ছে হলো।' খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ব্রতীনের বুকে মাথা ছোঁয়াল আহামরি, ছুঁইয়েই রাখল। বলল, 'বিয়ের পর তো কখনো নাম ধরে ডাকিনি। আজ হঠাৎ ইচ্ছে হলো।'

ব্রতীন ভাবল, জামায় সিঁদুরের দাগ লাগতে পারে, বেরুলে কেচ্ছা হবে। ইচ্ছে করেই তবু সে সরল না। নিতান্তই বেরুবার সময়, না হলে—যে-ভাবে তপ্ত হয়ে উঠেছে আহামরির নিঃশ্বাস, মনে হয় সুযোগ পেলেই সে চলে যেত বাইশ বছর বয়সে।

'বিয়ের আগে ডাকতে !' ঠাণ্ডা, প্রায় বুজে-আসা গলায় বলল ব্রতীন, 'শুনিনি তো কখনো !'

'ডাকতাম, মনে মনে।' মুখ তুলে হাসল আহামরি, 'অনেকবার। ব্রতীন-ব্রতীন-ব্রতীন ! কস্তুরী বলেছিল একদিন, আমি নাকি ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরতাম তোমার নাম করে। তুমিই ছিলে, আর কারুর কথা ভাবতাম না তো !'

'এখন ভাবো !' কথাটা প্রায় বলেই ফেলেছিল ব্রতীন, 'এখন' পর্যন্ত এসে থেমে গেল।

বলল, 'চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

সিঁড়িতে আলো আছে এখনো। সুযোগ সত্ত্বেও অল্প পিছিয়ে গেল আহামরি, শাড়ি গুছনোর ছলে ছুতো খুঁজল। ভালো লাগছে ব্রতীনকে পিছন থেকে দেখতে—সেদিন যেমন দেখেছিল জানলা থেকে, তার চেয়ে আজকের হাঁটার ধরনটা আলাদা। দূর থেকে দেখার জন্যেই সম্ভবত, ছন্দটা সেদিন ধরা পড়েনি। ছোট একটা নিঃশ্বাস চাপল আহামরি। বিয়ের ঠিক তিন দিন পরে একদিন বিকেলে, প্রায় এই সময়, ব্রতীনের পিছনে পিছনে এই একই সিঁড়ি বেয়ে ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। চাবি ব্রতীনের হাতে। ফোকরে গলাতে গিয়েও তবু হাত তুলে নিয়েছিল ব্রতীন—একটু বা নার্ভাস, হেসে বলল, 'প্রথম দিন। তুমিই খোলো।' আহামরি বলেছিল, 'না, তুমি।' ব্রতীনের রোখ চেপে গেছে ততোক্ষণে, বলল, 'সংসার মেয়েরাই করে—।' আহামরি বলল, 'কার জন্যে?' সম্ভবত তার কথাটিই ভাবিয়ে তুলেছিল ব্রতীনকে—জল লেগে তখন মোমের মতো মসৃণ হয়ে আছে আহামরির হাত, চেপে ধরে ব্রতীন বলল, 'ঠিক আছে। তুমি ছুঁয়ে থাকো আমাকে—'

হাত বাড়িয়ে ব্রতীনকে ছুঁয়ে ফেলল আহামরি। শার্টের একটুখানি টেনে ধরে বলল, 'ট্যাক্সি কেন! হেঁটেই চলো না!'

তার আগেই মিটারটা নেমে গেল টুং-টাং শব্দে। একবার আহামরিকে দেখল ব্রতীন, একবার তাকাল মিটারটার দিকে। কিছু বলল না। শুধু অন্যমনস্কভাবে ওঠার পথ করে দিল আহামরিকে।

ব্রতীন কথা বলছে না। বেশ কিছুটা রাস্তা স্তব্ধতায় ছটফট করে অধৈর্য হয়ে উঠল আহামরি। ব্রতীনের একটা হাত কোলের ওপর তুলে নিয়ে বলল, 'বারো বছর আমরা একসঙ্গে আছি। বারো বছরে এক যুগ হয়, জানো!'

ব্রতীনের চোখ সামনে। না ফিরিয়েই বলল, 'হঠাৎ এ-কথা বলছ!'

হাতটা ছাড়ল না আহামরি। অন্য দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বলল, 'জানি না। মনে হলো—'

ট্যাক্সিটা এই সময় ডাক্তারের চেম্বারের সামনে এসে থামল।

তারপরের ঘটনা খুবই সামান্য। আহামরি ভিতরে। ব্রতীন অপেক্ষা করছে বাইরে। এখানে আসার ঠিক আগেই পুরো এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিল সে।

ডাক্তার বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ব্রতীন, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এগিয়ে গেল কয়েক পা এবং শুনল, 'চিন্তার কিছু নেই। সি ইজ ক্যারিইং—'

'অ্যাবসার্ড!' ব্রতীন বলতে যাচ্ছিল; তখনই দেখল, আহামরি বেরিয়ে আসছে মুখ নিচু করে। মুখে হাসি টেনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ—'। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে হেঁটে গেল সামনে।

আহামরি চিরকালই পিছনে থেকেছে, আজও থাকল। অনেকটা রাস্তা এইভাবে দুই অচেনা পথচারীর মতো হেঁটে এলো তারা। আরো দূরে একটা ট্যাক্সি নিল ব্রতীন; দরজা খুলে আহামরিকে ঢুকতে দিয়ে একটুক্ষণ কী ভাবল চুপচাপ। তারপর উঠে এলো।

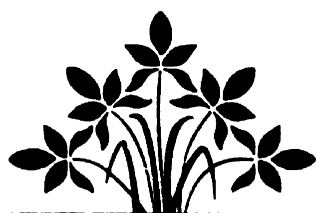
গাড়িটা স্টার্ট করে ট্যাক্সিওলা জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে যাবো?'

ভিতরে আলো খুব স্পষ্ট নয়। ওরই মধ্যে মনে হলো আহামরির, ব্রতীন হাসছে। হাসির টানেই, এতোটুকু অপেক্ষা না করেই বলল, 'যেদিকে ইচ্ছে—'

প্রচণ্ড বাঁক নিয়ে ট্যাক্সিটা ঘুরে গেল তাদের বাড়ির বিপরীত দিকে। ওদিকে ফাঁকা আছে—আছে গাছগাছালি, নির্জনতা, আর অফুরন্ত হাওয়া। ট্যাক্সিওলা জানে, জোড়ে থাকলে মেয়ে-পুরুষ ওদিকেই যায়।

সিটের পিছনে আস্তে আস্তে মাথাটা নামিয়ে রাখল আহামরি।

আজ না হোক কাল, কিংবা পরশু, কিংবা আর-একদিন, সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। তবু, বারো বছরের সম্পর্ক এক নিমেষেই চুকিয়ে ফেলা যায় না। ব্রতীন ঠিকই করেছে : ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে আহামরি ভাবল, অন্তত আরো কিছুক্ষণ তারা কাছাকাছি থাকতে পারবে।



একা

একা

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ (মাঘ ১৩৮৩)
প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৬·০০ । প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ

উৎসর্গ :
মতি নন্দী-কে

॥ এক ॥

বারো দিন পরে একদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে খুব ঝরঝরে বোধ করল শিশির। টানা দু' দিন ক্লান্তিকর ট্রেন জার্নির পর প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে যেমন চনমন করে ওঠে স্নায়ু, ইচ্ছে করে ছড়িয়ে যেতে, তেমনি, অনুভব করল অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে সে। ভুরুর ওপর যে-ভারটা শক্তভাবে চেপে থাকত সব সময়, বা, কপালের যে দপদপানি প্রায়ই তাকে ভাবিয়ে তুলত সাইনাসাইটিস নামে একটা রোগ আছে এবং প্রয়োজনে তার চিকিৎসা দরকার—সবই যেন চলে গেছে হঠাৎ। ভালো লাগছে দু' পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ও হাঁটতে, চোখ খুলে তাকিয়ে দেখতে চারিদিকে—লোকজন, যানবাহন, রাস্তাঘাট ; একতারা হাতে হেঁটে-যাওয়া বৈষ্ণবীর পিছনে পিছনে কুকুরের চিৎকার, এমনকি মুদিখানার পাশে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের চোয়াল নাড়া পর্যন্ত, সব কিছু। শেষরাতে বৃষ্টির পর ফুটপাথ এখন শুকনো। পরিচ্ছন্ন রোদ্দুরে, ঈষৎ গরম থাকলেও অস্বস্তি বোধ করার মতো কিছু নয়। এইভাবে কিছুটা মন্থর ভঙ্গিতে যখন সে ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাঁটছিল এবং বিশেষ কিছুই ভাবছিল না—অন্যমনস্কতার ভিতর হঠাৎ তার মনে পড়ল, বারো দিন নয়, ঠিক ঠিক ধরলে সময়টা আসলে বারো বছর—যদিও আর কয়েক দিন পরেই বিয়ের দশ বছর পূর্ণ হবে তার। তারও আগের দুটো বছরের মেলামেশা ছিল গোপনে। অনায়াসে দশটা বছর পেরিয়ে যেতে পারলে দুটো বছর, কী আর এমন অসম্ভব !

সকাল দশটার কলকাতা যেমন তৎপর থাকে তেমনিই আছে। এতো ভিড় ও ব্যস্ততার মধ্যে আলাদা কোনো স্বার্থ নেই কোথাও। পোশাকে যদি বা চিহ্নিত করা যায় এক-একজনকে, বা রঙের তারতম্যে, মুখগুলি সব একই রকম। তেমনি বাস বা ট্রাম বা মোটর, ট্যাক্সি। তাদের নাম্বার আছে, আছে রঙ ও আকার ; তার পরের সবটাই ছেড়ে দেওয়া গতির ওপর। গতিই সব। আর শব্দ। বস্তুত, হাঁটতে হাঁটতে মোড় পর্যন্ত এসে সে যখন দাঁড়িয়ে ও এরপর কী করা যায় ভাবছে—গন্তব্যের কথা, নিরপেক্ষভাবে ধাবমান গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করল, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যদিও ট্রামে, বাসে কিংবা ট্যাক্সিতে খুব কম চড়েনি, তবু এমন একজন ড্রাইভারও চোখে পড়েনি যার মুখের আদল কিছুটা ছাপ রেখে গেছে স্মৃতিতে। এমনও হতে পারে, গতিই যেখানে সব, সেখানে আলাদাভাবে মুখগুলিকে লক্ষ করার কোনো চেষ্টাই সে করেনি কোনো দিন। শুধু রাস্তায় কেন, সর্বত্র। তার চেনাশোনার ব্যাপ্তি কম নয় ; কাজ, অকাজ বা পরিচয়, আত্মীয়তার মধ্যে অসংখ্য নাম তার মুখস্থ—কিন্তু সম্ভবত এর অধিকাংশের অস্তিত্বই ধরা আছে শুধু নামে। অনেক চেষ্টা করলেও মুখগুলি আর মনে পড়ে না। কাল রাতে হাওড়া স্টেশনে মাকে তুলতে গিয়ে অসংখ্য মুখের সংস্পর্শে এসেছিলে তুমি—মনে পড়ে কি !

শিশির একটা ভঙ্গি করল, যা কোনো-না-কোনোভাবে স্মৃতির দিকে ফেরার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, কিছুই মনে করতে পারল না। একটা 'লেডিজ' ট্রাম ছুটছে দ্রুত ঘণ্টি বাজিয়ে—ভুল প্রোকেজসানে টানা রিলের মতো কয়েকটি রঙ ও আকার সরে গেল তার সামনে দিয়ে ; তাদের একটিও কোনো নারীর মুখ নয়। অথচ, এই রকমই চেনা ট্রামে একদিন কেউ তার নাম ধরে ডেকেছিল, কে ! কে যেন ? পরিপ্রেক্ষিতের তারতম্যেই সম্ভবত, গতির টানে মুখ যতো তাড়াতাড়ি অপসৃত হয়, তার চেয়ে কম দ্রুতভাবে হাত। অপরিচয় নিয়ে বহু দূর পর্যন্ত তা শুধু নড়তে থাকে।

পরপর বিস্মৃতি এসে হঠাৎ রোদ্দুরকে আরও তীক্ষ্ণ করে দেয়। যতোই ব্যস্ত হোক, ও শব্দময়, প্রকৃতিস্থ পৃথিবীতে মানুষের হারিয়ে যাওয়ার সীমা নেই কোনো—সেও আছে এর মধ্যে, তাৎক্ষণিক ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে ভাবল শিশির, কিন্তু কীভাবে ? এমনকি হতে পারে, সে যাদের দেখছে ও ভাবছে—এমনকি যাদের দেখছে না, তারাও, তার দিকে তাকিয়ে আছে, যাচ্ছে একইভাবে, একই উদাসীন নিরপেক্ষতা নিয়ে ! ভাবনাটা বিমূঢ় করে দিল তাকে।

স্বাস্থ্যে যতোই সাবলীল হোক, যে-কোনো অনুভূতিকে বেপরোয়াভাবে আড়াল করার জোর শিশিরের কম। আরো কম নিজেকে ধরে রাখার। গত কয়েক দিনের ঘটনার মধ্যে নিজেকে দাঁড় করালে ব্যাপারটা নিজেই টের পায় সে। শ্রীলা চলে গেল। যাবার পর, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন যারা এলো ও চলে গেল, মৃত্যু তাদের কোনোভাবে স্পর্শ না করলেও প্রায় প্রত্যেকেই ভেবেছে মৃত্যুটা অপ্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত ! ভারী গলার সে-সব স্বর যতোই আবেগ বয়ে আনুক—এই ধরনের মন্তব্যে শিশিরের আপত্তি বরাবরই প্রবল ; যে-কোনো দুর্ঘটনাকেই অপ্রত্যাশিত ঘোষণা করার মতো, 'কিছু বলা' ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো বিষয় নেই। আসলে সে চাইছিল অন্যভাবে ভাবতে ; মৃত্যু কি আবেগে যোগ করে অননুভূত তাৎপর্য ! কিন্তু স্ত্রীর থাকা না-থাকার সঙ্গে শ্রীলার থাকা না-থাকার তফাত কতোখানি, বুঝতে পারছিল না ঠিক ঠিক। একটা শুকনো অনুভূতি ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাকে। এরপর কি ক্রমশ অসুখী হবার দিকে এগিয়ে যাবে সে ? নাকি শ্রীলার অভাবে অসহ্য হয়ে উঠবে জীবন ?

প্রশ্নগুলো আসছিল থেকে থেকে ; প্রায় অকেজো এঞ্জিনের মতো একপাক শব্দ তুলেই থেমে যাচ্ছিল। যেমন এখন, অচেনা হয়ে থাকার অস্বস্তিকর অনুভূতি এড়ানোর জন্যে সিগারেট ধরানোর সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতিটা তরল হয়ে এলো শিশিরের। পরিবর্তে, ক্রমশ নিজের ধোপদুরস্ত পোশাকটাকে চিনতে পারল সে ; চকিত হাওয়ায় ভেসে-আসা আফটার-শেভ লোসানের গন্ধে মনে পড়ল দাড়ি কামিয়েছে সকালে। গাড়িটাকে গ্যারাজ করে রাখার অর্থ তার নিজের ছুটি নয়। এসব প্রস্তুতির অর্থ বারো দিন পরে আজ সে অফিসে যাবার জন্যে বেরিয়েছিল, ধীরে-সুস্থে অন্য কোনো ভাবনায় গা ভাসানোর জন্যে নয়।

একটা ট্যাক্সি খুঁজল শিশির। পাবার পর, উঠে, সিটের পিছনে গা এলিয়ে দিতে দিতে ভাবল, জীবন একার। হয়তো সকলেরই, সে ঠিক জানে না। তবে, বিশেষত তার। যদি তা না হতো, যদি শ্রীলা ও সে সত্যি সত্যিই জড়িয়ে থাকত—যে-রকম অ্যালবামে, তা হলে জীবন অন্য রকম হতো।

কাল রাতে পরিচ্ছন্ন বিশ্রামের পর আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছিল তার। অ্যালার্ম বা

অন্য কারুর ঠেলে তোলায় নয়, নিজে নিজেই। এ-রকম আলস্যহীন জেগে-ওঠার অভিজ্ঞতা তার বেশি নয়। আরো কম শরীরের মধ্যে নিজেকে ঝরঝরে বোধ করা—যখন অলস চোখ দু'টিকে আলোয় মেলে ধরার জন্যে জলের ঝাপ্‌টা দেবার দরকার হয় না ; চিরুনির স্পর্শ ছাড়াই জীবন্ত থাকে চুলের গোড়া। পরিপূর্ণ, নিটোল ঘুম, যার পর স্বেচ্ছায় তৈরি হতে পারে আর একটি দিনের জন্যে। কতো বছর পরে ? চার, না সাত ? হিসেবে মেলে না। এসব অঙ্ক আসে ধাপ চেনার সুবিধের জন্যে। যেমন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও প্রোমোসানের বছরগুলো তার মনে আছে স্পষ্ট ; বা—, না হলে মনে করতে হয় অনেক ভেবেচিন্তে, প্রসঙ্গ মিলিয়ে ; বহু দূর থেকে প্রত্যাশিত কিছুর দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত না চিনতে পারার মতো করে।

সত্যি বলতে, ঘুম ও জেগে ওঠা, তার দুটোই এতোই অনিশ্চিত ও ক্লান্তিকর যে ও-সবের স্মৃতি নেই কোনো। যেমন, শ্রীলার শরীরের সেই বিশেষ অংশ—, স্মৃতি নেই কোনো ! 'মেশিনের মতো ?' হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে, তার সঙ্গে আর পাঁচজনের তফাতটা বোধ হয় ভাগ্যের—মেশিন কখন চালু হবে বা বন্ধ হবে তার নিয়ন্ত্রণ যেন অন্য কারুর হাতে, স্যুইচ অন্-অফ্ হয় গোপনে। রক্তে ? হতে পারে—, কী যেন একটা কবিতা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়েছিল অতনু দত্ত, তার লেখকবন্ধু ! যাক গে। ছ্যালছেলে ভাবনা থেকে অনেক দিন আগেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে সে। তার দায় শুধু ঘুমিয়ে পড়া ও জেগে ওঠা, বর্ণহীন এই দু'টি কাজের আগে ও পরে হাই তোলায়।

'এভাবে নিজেকে অযত্ন করা—', শ্রীলা মাঝে মাঝে অনুযোগ করত, 'দেখ, একদিন তুমি খুব অসুখে পড়বে—'

হাঃ, অসুখ ! লাইক এ গুড ওয়াইফ ! গোড়ার দিকে কিছু দিন—কয়েক বছর ?—বিছানায়, অন্ধকারে, অশরীরী শালীনতার ভিতর তাকে পাওয়া যেত মাগুর মাছের মসৃণতায়। পরে, জোড়া-দেওয়া পাটাতনের মতো শ্যাওলা ধরে অভ্যাসে। ঠিক কতো দিনে ? শ্রীলা কি জানত ? দশ বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সব অনুযোগের বাঁধানো উত্তর ছিল শিশিরের—শ্রীলা তখনো আবদ্ধ হয়ে আছে ফ্রেমে। 'মন্দ কী !' শিশির বলত, 'স্বামী-সেবা কাকে বলে তা বুঝবার সুযোগ তো আজও পেলে না ; তেমন কিছু হলে খুশিই হওয়া উচিত তোমার।'

কথা অবশ্য সেখানেই থামত না। আগের সেন্‌টেন্সটা যদি নিতান্তই জবাব হয়, পরেরটা আসত ধারণা থেকে, হয়তো বা অভিজ্ঞতা থেকেও। এসব কথার মধ্যেই নিজেকে অনেকটা বিচ্ছুরিত করে ফেলত শিশির।

'তবে আমার সে-রকম হবে না বলেই মনে হয়—', বলত, 'যে-খাতে বইছি তার দুটোই দিক আছে। বিগিনিং আর এণ্ড। শুরুটা কেন হলো তা যেমন বুঝতে পারিনি আজও, শেষটাও বোধ হয় পারব না। পড়ব আর মরব। দ্যাট্‌স্ লাইক এ গুড বয়।'

'কথা ! কথা ! কথা !'

'উপদেশ ! উপদেশ ! উপদেশ !'

'আমার ভারী দায় পড়েছে— ।'

বিছানায় মেয়েরা কখনো সোজাসুজি বসে না, বসে আড়াআড়ি। আরো, যদি কাছাকাছি পুরুষ থাকে, থাকে সান্নিধ্য, স্বামী বা আর কেউ—আর কেউ ?—যখন ভালোবাসায় ধারণা থাকে, আবেগ থাকে না কোনো, মাথার কাছে আলগোছে পা ঝুলিয়ে বসার এই ধরনটা

শ্রীলার একার নয়। কিন্তু শ্রীলার ভঙ্গিও কি আর কারও!

আত্মখুশি, বেপরোয়া, দায়িত্বহীন—এসবের মধ্যে শ্রীলা যতোই একজন আহাম্মককে দেখুক, শিশিরের কি খুব গিয়েছিল! ক্লান্তিটাকে সে মেনে নিয়েছিল সাফল্যের অঙ্গ হিসেবে। সত্যি, ভেবে কিছু হবে! কথাবার্তায় সে প্রায়ই স্মার্ট, অনুভূতির বেলাতেও তাই। নিজেকে বাস্টার্ড সম্বোধনে পিঠে পালক বোলানোর সুখ পায়। এইভাবে, নিজেকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে ভালো মন্দ তার পছন্দগুলি স্পষ্টই আলাদা—বাইরে থেকে ইনফিউজড হতে হতে এখন তা চরিত্র। অবশ্য খাঁটি কি না বুঝবার জন্যে মাঝেমাঝে দেশলাই জ্বেলে নিতে হয়, এই যা।

এই তো, কিছু দিন আগে। 'টাইম' ম্যাগাজিনে একটিমাত্র গিয়ারের মোটরকার সম্পর্কে কিছু বেরোতে ক্লাবে গিয়ে বিস্তর হৈ-চৈ করেছিল সে : ওসব ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড, বেসিক্যালি ফুলবাবুদের জন্যে, যারা চৌরঙ্গিতেও ভেঁপু বাজায়, ফাঁকা মাঠেও তাই। আমি একটাই গিয়ারে বিশ্বাস করি, দ্যাট ইজ টপ।

শ্রীলা কি হাড়ে-হাড়ে চিনত তাকে। পেটে কিছু পড়লে নাকি মাধ্যাকর্ষণ শুধু হয়ে যায় শিশিরের, ঠাট্টা করে বলেছিল একদিন, তখন তাকে দেখায় অনেকটা ব্যাঙের মতো হাত-পা ছিত্‌রানো, খোল বড়ো, কথাগুলো যেহেতু একই জায়গা থেকে ঘুরপাক খেয়ে বেরোয়, তাতে গবগব শব্দ যতোটা থাকে, অর্থ ঠিক ততোটা নয়। সে যাক। এসব যখন বলেছিল তখন শিশিরের হাতে ছিল হুইস্কির গ্লাস ; আশেপাশে, হ্যাঁ, অনেকেই ছিল। গুহ আর রক্ষা কি— ? মনে পড়ে না। তো সেদিন, রাতে বাড়ি ফেরার রাস্তায় টপ-গিয়ারের প্রচণ্ডতা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিল শিশির। বনেটসুদ্ধ গাড়ির ডান দিকটা স্ম্যাশড হয়ে গেলেও, দৈবই বলতে হবে, প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল দু'জনেই। অ্যাক্সিডেন্টের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে তরতর করে বলেছিল শিশির, 'সামান্য ব্যাপার। গাড়ি সারাবে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। চাইলে কোম্পানি নতুন গাড়িও দিতে পারে—তাদের কাছে আমার দাম ফুরোয়নি এখনো।' শুনে, বোধ হয় সেদিনই প্রথম, শ্রীলা বলেছিল, 'তোমার দামের জন্যে আমি আর ভাবি না। তবে আমাকে নিজের জন্যে ভাবতে হয়, আমার একটা ছেলে আছে—তার ভবিষ্যৎও ভাবতে হয়—'

সেদিন মাঝরাস্তায় তাকে ছেড়ে রেখে ট্যাক্সি ডেকেছিল শ্রীলা। তার সাহস ছিল, চলে গিয়েছিল একা। রাগ ? অভিমান ? ঘৃণা ? নাকি একা রাতে ট্যাক্সির অন্ধকার তখন তার কাছে অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয়েছিল!

মিটারে ছ' টাকা বারো। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল খুচরো নেই। তার দেওয়া দশ টাকার আনকোরা নোটটায় দু'বার আঙুলের টোকা দিয়ে লোকটা এমনভাবে তাকাল যেন তার কাছে খুচরো না-থাকার দোষটা শিশিরের। বসন্তের দাগে ভর্তি লোকটার মুখ ; বাঁ দিকের চোখটা হয় ছানিপড়া না হয় একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত—বেলা সাড়ে দশটা, এগারোটার ঝকঝকে আলোতেও সন্দেহ ছড়ায়। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তার ধারণা খুব পাকা নয়, তবু একপলক লোকটির চোখে তাকিয়ে শিশিরের মনে হলো, হারুক, জিতুক, এরা কখনো সুযোগ হাতছাড়া করে না—অন্যায় করতে ভালোবাসে বলেই অন্যায় করে। এমন কি হতে পারে, সেদিন রাতে এই লোকটাই ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিল শ্রীলাকে! যদি তাই হয়, তা হলে—, শিশির ভাবল, অন্তত সে-জন্যেই খুচরো টাকাটা তার ছেড়ে দেওয়া উচিত। ভাবামাত্র হাতল ঘুরিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল সে এবং সহাস্যে বলল, 'ঠিক আছে,

নিয়ে নিন—'

'বেশি দেবেন কেন !'

'কেন ?'

সম্ভবত এদের অহঙ্কারও থাকে। লোকটা জানলা দিয়ে নোটসুদ্ধ হাতটা ফেরত দেবার ধরনে বাড়িয়ে ধরেছে দেখে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শিশির বলল, 'ওটা পুরস্কার। সেদিন রাতে শ্রীলাকে কিছু না করার জন্যে—'

আচমকা টফি গিলে ফেলার মতো করে ঠাট্টাটা নেমে গেল গলা দিয়ে—বুকের কোনোখানে এসে ছড়াতে লাগল গোলাকারে। নৈঃশব্দ্য। এতোক্ষণে লোকটা কিছু না বুঝে 'আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ স্যার' বলে বিব্রত হাসিমুখে যাবার জন্যে ব্যস্ত হলো। শিশির দেখল সেই ফার্স্ট গিয়ারেই গাড়ি তুলছে লোকটা, সেকেণ্ড গিয়ার চেঞ্জ করার আগেই এগিয়ে গেল অনেকটা। তখন অন্যমনস্কভাবে সে ভাবল, সেদিন ক্ল্যাশটা হয়েছিল গাড়ির ডান দিকে, শ্রীলা ছিল তার বাঁ দিকে—তেমন কিছু হলে তারই হতো। শ্রীলা কি ভেবেছিল ব্যাপারটা সেদিন, নাকি কী ঘটবে এবং কেমন করে তা জানত বলেই, এতোটুকু গুরুত্ব দেয়নি !

এসব কতো দিন আগেকার কথা ! গতকালের, না আজকের ! বয়স কি বাড়ে, নাকি এক জায়গার পর পুশ্ না করলে কমতে থাকে ক্রমশ ! সেখানে স্মৃতির জট, ছাউনি-মেলা বুড়ো বটের মতো অনর্গল ঝুরি নামাতে থাকে নিচের দিকে ! যতোবারই দেশলাই জ্বালুক, সিগারেটটা নিবে যায় বারে বারে—তখন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ক্লান্তিতে, তাকাতে হয় সামনের দিকে। সামনে ?

'হ্যালো, শিশির !'

'হ্যালো—'

ফুটপাথে দাঁড়িয়েই পিছন ঘুরে পাকড়াশীর বাড়ানো হাতটাকে আলগোছে ছুঁলো শিশির, হাসল। সলিসিটার। বোধ হয় কাজে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে এখন। এখনই তার সঙ্গে দেখা হবার দরকার ছিল না কোনো। হিসেবী লোক ; সুবিধে এইটুকু, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে একচুল বেশি দেরি করবে না।

ঠোঁটে দেঁতো হাসি, টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে ঘাড় দোলাল পাকড়াশী।

'তারপর, কেমন আছো ?'

'ভালো।' স্বচ্ছন্দে বলে নিল শিশির, 'খুব ভালো।'

'ভালো !' তার কপালের ঠিক মাঝখানে চোখ রাখল পাকড়াশী, 'শরীর ?'

'ভালো।'

'বেশ। হ্যাপি টু হিয়ার ইট।'

ঘড়ি দেখল পাকড়াশী , তারপর তার কাঁধের ওপর দিয়ে দূর পর্যন্ত। পার্ক-করা গাড়ি নিয়ে আসতে দেরি করছে ড্রাইভার। হাতটা হঠাৎ টেনে নিতে বুঝল এবার যাবে।

'ইট্‌স্ স্যাড, ভেরি স্যাড !' মাটির দিকে ঝুঁকে জুতোর ডগা নাচাতে নাচাতে পাকড়াশী বলল, 'কালই বলছিলাম মিসেসকে—মানে তোমার বৌদিকে, ইউ হ্যাড এভরিথিং। কেরিয়ার, ইনটেলিজেন্স, তারপর ধরো অ্যামবিসান—সেই জন্যেই—'

অল্প থেমে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পাকড়াশী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'হাউ ওলড্ আর ইউ ?'

'সাঁইত্রিশ—আটত্রিশ—'

'হুঁ।'

গাড়িটা এসেছে। খেয়াল হতে নিউট্রালে হাত রাখল পাকড়াশী, তৎপর হলো সামান্য। স্থূল শরীরটাকে গাড়ির ভিতর ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'ও-কে। দেখা হবে—'

বলে থামল আবার। বন্ধ দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

'ভাবিনি—'

'দিলে বোলো। ছোট শালা ফিরে এসেছে। হি ব্যাডলি নিড্স্ ওয়ান।'

মৃদু ঘাড় নাড়ল শিশির, যার অর্থ সম্মতি বা অসম্মতি নয়। শালা! দেখল, তার বাণিজ্যের চাপে এতোক্ষণ কলকাতাকে থামিয়ে রেখেছিল পাকড়াশী; যাবার পর সব কিছু সচল হয়ে এলো আবার। এমনকি সেও। যে-সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিল একদিন, সমূহ মসৃণতা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে সে—মানে বস্তু, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, যেহেতু প্রাণ নেই। তা হলে সে মানে শ্রীলা—কি? ভাববার সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিত মেঘে ছেয়ে এলো রোদ্দুর। তারপর কী হয়েছিল মনে করতে না পারার আগে সে পরিষ্কার দেখল, এয়ারপোর্ট-প্রত্যাগত রম্ভা তাকে বরণ করার জন্যে তুলে নিচ্ছে গাড়িতে; ঈষৎ মাংসল তার চন্দনবর্ণ বুকের আঁচল খসে পড়েছে ঠিক যতোখানি দরকার।

সেই ফার্স্ট গিয়ার! গুহ নেই, সুতরাং শালীনতা নেই। সুতরাং এখন আর শো-কেসে ঢুকবে না রম্ভা।

আঙুলের সবুজ পাথরটার দিকে তাকিয়ে শিশির বলল, 'সো!'

'ফ্লাইট ডিলেড শুনে ওয়ারিড হয়ে পড়েছিলাম—'

'কেন!'

'গুহকে কোম্পানি দিতে হতো। আই উড্ হ্যাভ মিস্ড ইউ!'

'বিচ্!'

রম্ভার মুখে দীর্ঘ ছায়া। হঠাৎ লম্বাটে হয়ে-যাওয়া মুখটা ওপর দিকে তুলে স্পিড কমিয়ে আনল, প্রতিবাদ করল না। গতি কি স্ট্র্যাণ্ডের দিকে? ডান হাতে স্টিয়ারিং, ঘড়ি, বাঁ হাতে আঁচল তুলে হাল্কাভাবে বুলিয়ে নিল নাকের ওপর।

'কতো স্পিডে এসেছি জানো?'

'কতো?'

'আশি কিলোমিটার হবে।'

'তোমার চরিত্র নেই—'

এসেন্স স্প্রে করা আছে ঠিক নাকের নিচে, যাতে নিঃশ্বাস—দীর্ঘশ্বাস —ফেললেই সুগন্ধ ছড়ায়। গন্ধটা যতোক্ষণ থাকা উচিত, ততোক্ষণ কথা বলল না। সামনেরটা স্টুডিবেকার, ব্রেকলাইটে স্প্যাজমের সঙ্কেত। সাবধানে হাসল।

'জানি এ-কথা বলবে। আজ নয়, বহু দিন ধরেই বলছ!'

'ইউ আর এ বিচ্!'

রম্ভা হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে সাইড করে আনল। দুটো হাতই আলগা করে দিয়ে মাথাটা হেলিয়ে দিল পিছনে।

'চালাবে? চালাও না! আই ফিল টায়ার্ড।'

ফুটপাথ থেকে সিঁড়িতে পা দেবার আগে সিঁড়িটার প্রতি লক্ষ রাখল শিশির। হাতের সঙ্কোচে পা ঘষল দু'বার। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন!

শ্রীলাকে অবশ্য দু' হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল প্রবল। সেই মুহূর্তের সম্বিৎ থেকে দূরে, বেশ কিছু দিন পরে শিশিরের ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল সহবাসের উত্তেজনায় কেঁপে ওঠার আগের মুহূর্ত। বুকের এতো কাছে এমন নির্লিপ্তভাবে উঠে আসার সম্ভাবনা কি আগে কোনো দিন ছুঁয়েছিল শ্রীলাকে ! অত্যন্ত ঠাণ্ডা তার কপালের স্পর্শ থেকে মুখ তুলে সে কি চিৎকার করে উঠেছিল ? না, না তো ! তবে ?

মনে পড়ে না।

মৃত্যুরও গন্ধ আছে, তা একান্তভাবে শ্রীলার নয়। এই মুহূর্তে পাশাপাশি দু'টি গন্ধের আক্রমণে দু' হাত ছড়িয়ে লিফট্টাকে আড়াল করে দাঁড়াল শিশির। এইভাবে কতোক্ষণ সে শুয়েছিল পাশে ? সে—যে বস্তু নয় ; কিংবা, সে—যে বস্তু ! ঘুমের মধ্যে অভ্যাস থেকে যার গায়ে হাত রেখেছিল শিশির, কে সে ! প্রশ্নটা ধাঁধিয়ে দিল তাকে। ক্লান্ত হতে হতে, ক· সেই হারানো যন্ত্রণা ফিরিয়ে আনতে আনতে শিশির ভাবল, তা হলে মৃত্যুর মধ্যেও শ্রীলা তারই পাশে থাকার কথা ভেবেছিল !

'সেলাম সাব।'

'সেলাম !'

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা আছে সব ঠিকঠাক—যে-রকম ছিল, হয়তো যে-রকম থাকবে। তার বিস্তৃতি পরিপার্শ্ব জুড়ে। লিফ্টের দেওয়ালে ছবি, ছবিতে মাথায় প্রকাণ্ড চুল নিয়ে ভরা মুখ, ভারী গলা ও লাল কুর্তায় আচ্ছাদিত একটি লোক হাসছে গত বারো দিন ধরে কিংবা তারও বহু দিন আগে থেকে। দো-আঁসলা মহিলাটির পিঠভরা ঘামাচি, সেখানে ঘূর্ণ্যমান ফ্যানের হাওয়ায় ক্রমশ মরে যাচ্ছে ঘামের বিন্দুগুলো। আলাপের ইচ্ছা সত্ত্বেও কথা না বলার অস্বস্তিতে ক্রমশ পা নেড়ে চলেছে লিফ্টম্যান ; দরজা খোলা ও বোতাম টিপে আবার বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে তার পুরনো হাসি। অকারণ। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন ও তিন থেকে চারে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে প্রায় একই সময় নিয়ে এক ধরনের ঠাণ্ডা নেমে যায় শিশিরের গলা থেকে নাভি পর্যন্ত। তবু তা শীত নয়। মনে হয় বারো দিন ধরে সমানে প্রস্তুত হয়েছিল এই সব, ছিল অপেক্ষায়। সকলেই ছিল।

সে একা ব্যতিক্রম ! বলেন কি মশাই, অ্যাঁ, একা ! এ তো একটা রেকর্ড ! না, তা হয় না। হতে পারে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই মাসে সেই তারিখে গোটা দেশে অন্যূন দু' লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশো তিপ্পান্ন জন ব্যক্তির পত্নীবিয়োগ হয়েছে ; এই সব উইডোয়ার—সরি, বিপত্নীক—ব্যক্তিদের নিয়ে একটা মাঝারি দেশের পুরো সেনাবাহিনী তৈরি হতে পারে। এবং এরা যেহেতু নিজেদের সতীসাধ্বী স্ত্রীদের স্বাস্থ্য ও আয়ু রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে না, সুতরাং সর্বজনসম্মতিক্রমে এদের কাজ হবে যতো সোমত্ত যুবতীদের ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রেপ্ করা এবং—

'আপ্‌কা ফোর্থ ফ্লোর সাব।'

'সরি। থ্যাঙ্ক ইউ—'

কথাটায় ফিরে গেল শিশির—উইডোয়ার ! তার মানে কি শ্রীলা ছুটি পেল !

চোখ তুলে চোখে পড়ল অতিকায় সচ্ছলতা : মসৃণ মেঝের কোণে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা কংক্রিটের টবে প্লাস্টিকের নিখুঁত পাতাবাহার ; তার সবুজ ম্লান হয় না কখনো। কাচের দরজার বাইরে থেকে ম্যানিকিনের ভঙ্গিতে রিসেপসান কাউন্টারে বসে আছে লিজ—হাই লিজ !—চোখাচোখি হলেও হাসল না ; জানে হাসবে না যতোক্ষণ দরজা

ঠেলে শিশির ভিতরে না ঢোকে। শুধু স্বাস্থ্য, সৌজন্য ও হাসির জন্যেই তার দাম মাসিক দেড় হাজার। নিয়ন্ত্রিত তাপের দূরত্ব তার ও লিজের মধ্যে—দায়িত্ব ও ঔদাসীন্যের মধ্যে, তার সূর্যোদয় ওই দশ-বাই-আটের রিসেপসানে, যখন টেপ-করা গলায় বলে উঠতে পারবে, 'গুড মর্নিং—'

'গুড মর্নিং !'

বাইরের উষ্ণতা থেকে চমৎকার ঠাণ্ডায় এসে জুড়িয়ে গেল শরীর। আর কিছু না বলে চুপচাপ জায়গাটা পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল শিশির, না-তাকিয়ে আর-একটা দরজার দিকে। তখনই মনে হলো।

'কিছু বলছিলে ?'

বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল লিজ। শিশিরকে থামতে দেখে বেরিয়ে এলো ঘোড়ার নালের হুক থেকে।

'আমি খুবই দুঃখিত—'

'ধন্যবাদ।'

'সেদিন আমিই প্রথম শুনেছিলাম খবরটা ; সো শকিং ! ইট মেক্‌স্ ইউ কোল্‌ড !'

শো-কেসের বাইরে থেকে দেখার দূরত্ব নিয়ে তাকিয়ে থাকল শিশির। বিশেষ কারুর দিকে নয়। যা শুনল তারও উত্তর ছিল 'ধন্যবাদ' ; এড়িয়ে গেল কথাটা। দ্বিধান্বিত, সে খুঁজতে লাগল মৃত্যুর খবর প্রথম শোনার মধ্যে আলাদা কোনো বিষয় আছে কি না ! যদি থাকে, লিজকে কি বলবে, সে-দাবি আসলে আমার ! এবং শোনা মাত্র—বোঝা মাত্র ? অনুভব করা মাত্র ?—আমার হাত-পা সিঁটিয়ে যায়নি !

লিজ বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

শিশির হাসল। আমি তোমার শরীরে মুগ্ধ হতে পারি, দুঃখে নয়। তোমার শরীর তোমারই ; কিন্তু, একই দুঃখ—যেটা অপ্রয়োজনে তোমাকে টেনে আনল নালের বাইরে—তুমি পেয়েছিলে এর আগের মৃত্যু-সংবাদে, সম্ভবত তারও আগের মৃত্যু-সংবাদে ; হয়তো একইভাবে পাবে এর পরেরটির বেলাতেও। আসলে কি তা এক রকমের সুখ ! হতে পারে, নাও হতে পারে। এক-একটি মানুষ এক-এক রকম, তাদের মৃত্যুও আলাদা। তবু দুঃখ পাবার ধরনে রকমফের নেই কোনো ! আসলে কি তা এক রকমের বিলাসিতা, যা আছে ছিমছাম হয়ে লিজের পোশাকে, তার শরীরে, তার ঠোঁট ও হাসিতে। গোড়ার দিকে—সে অনেক দিন আগেকার কথা শ্রীলা বলেছিল একদিন, 'এভাবে তাকাও কেন ! এভাবে তাকানোর অন্য রকম মানে হয় !'

'কী-রকম ?'

'সে বলা যাবে না। যদি মেয়ে হতে, বুঝতে !'

নিশ্চিত লিজ তা বলবে না, মাসিক দেড় হাজার তাকে সারাক্ষণই ভরে রাখছে দৃষ্টি আকর্ষণের দিকে।

'বারো দিনে তুমি আরো সুন্দর হয়েছ—'

'রিয়েলি !' মৃত্যু-সংবাদ আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়াল লিজ। ফোটোজিনিক হেসে বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু বারো দিন কেন ?'

'বারো দিন ধরে তুমি অপেক্ষা করেছিলে আমার জন্যে, দুঃখ প্রকাশের জন্যে। অ্যাণ্ড হাউ পারফেক্‌ট্‌লি ইউ হ্যাভ পারফরম্‌ড্।'

মেয়েটি কাঁপল এবং হতচকিত গলায় বলল, 'সরি, মিস্টার রে। আমি কি—'

'না, ঠিকই আছে—'

শিশির তাড়াতাড়ি করল। কাচের দরজা ঠেলে ঢুকছে আর একটি লোক। ফ্যাকাশে ভাব থেকে আবার স্বাভাবিক রক্তে ফিরে যেতে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় নিল লিজ। 'গুড মর্নিং! হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ স্যার?' চমৎকার! দ্যাট মেক্স্ ইউ প্রফেসানাল। তবে, সে সময় নিয়েছিল ঢের বেশি। নাকি কম সময়ের মধ্যেও ধরে রেখেছিল অনেক বেশি সময়! বুকে ধরে চাপ দিতেই আলট্রা-গ্লোর স্বচ্ছ লাল থেকে ক্রমশ পাংশুবর্ণ হয়ে উঠল শ্রীলার ঠোঁটদুটো; অন্যভাবে আবার চলে গেল কচিৎ লালের দিকে। আধভরা শিশি এদিক-ওদিক নাড়লে যা হয়। 'পুতুল পেয়েছ নাকি— ?', বলেছিল একদিন, সেও অনেক দিন আগে। ঘন চুলের ভিতর থেকে একটা শুকনো গন্ধ উঠে আসছিল নাকে। তার হাতের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাতের আঙুলগুলোকে হাঁসের পায়ের মতো ছড়িয়ে পড়তে দেখেই সেদিন শিশির বুঝেছিল এখন সে যথেচ্ছ খেলতে পারে।

হলঘরটা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তাকে দেখেই থেমে গেল মৃদু গুঞ্জন। দু' একটি চেয়ারের শব্দময় নড়ে-ওঠা, দু' একটি মুখের 'জানি' ভাব ছাড়া আর কোনো অভিব্যক্তি ছুঁতে দিল না শিশির। করিডোর পার হয়ে নিজের অফিসের দিকে যেতে যেতে থেমে-যাওয়া শব্দটাকে আস্তে চালু করে দিল আবার, কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল—এগারোটা। তারপর, রগের দু'পাশের চাঞ্চল্য কপাল ছুঁয়ে ভুরুর ওপর নেমে আসতে দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, সব ঠিক হয়ে যাবে। মৃত্যু বলেই কথা, না হলে শ্রীলা তার কতোখানি ছিল!

মনে হচ্ছে সে আসবে টের পেয়ে একটু আগেই আর-এক দফা ঝাড়ন বোলানো হয়েছে টেবিলে। তকতক করছে সব কিছু। পাশাপাশি সাজানো দুটো টেলিফোনেরই রঙ সাদা—তাতে হাড়ের শূন্যতা। তা হোক; পুরু গদির রিভলভিং চেয়ারটায় বসে একবার বৃত্তাকারে ঘুরে এলো শিশির। সামনের চারটি চেয়ার ফাঁকা, তারপর দেওয়ালের সাদা। পিছনের বড়ো কাচের জানলাটায় ভারী পর্দা টাঙানো; তার ছায়াচ্ছন্নতা ঘরে আনছে নতুন ঔজ্জ্বল্য। এতো বেশি সাদায় বেশিক্ষণ চোখ রাখলে হঠাৎই চোখে পড়ে বিভিন্ন আলোর স্তর। চোখ ধাঁধিয়ে যায় কেমন। লাগে। রেনোভেসানের পর লাঞ্চে বসে একদিন কথাটা তুলেছিল সে। পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হার্টলে নিজে এসে দেখে গেল ব্যাপারটা—অনেকক্ষণ ধরে, তার চেয়ারে বসে। 'বয়সের জন্যে নয় তো! আমি তো সাদাই দেখছি, বিশুদ্ধ সাদা!' তারপর, শিশিরকে নিরুত্তর দেখে বলেছিল, 'ও-কে। ভালো দেখে একটা পেন্টিং কিনে নাও—।' হার্টলের কথামতো সেটা আসছে বম্বে থেকে, আর কিছু দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তার মানে আর কিছু দিনের মধ্যেই দেওয়ালের সাদা—সাদার ভিতরে বিভিন্ন আলো, ঢাকা পড়বে। কিছু দিন, মানে সময়।

ঠিক। সবই সময়ের ব্যাপার। অনেকক্ষণ পরে আর একটা সিগারেট ধরানোর প্রয়োজন বোধ করল শিশির। একটু আগে লিফ্‌ট্ থেকে বেরুবার সময়, মনে পড়ছে, সে একটা সংখ্যার কথা ভেবেছিল। কতো যেন? দু' লক্ষ কতো যেন: যতোই অবান্তর হোক, বস্তুত যা ঘটল তা তাকে এমন কিছু অসাধারণত্বে পৌঁছে দেয়নি যে সে ভেঙে পড়বে।

হোয়াই শুড আই! ধোঁয়া গিলতে গিলতে প্রায় চেঁচিয়ে ভাবল শিশির: বাবা মারা যাবার সময় আমার বয়স ছিল আট, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আমাকে মানুষ করেছিল মা; তার সঙ্গেও সম্পর্কটা প্রায় চোদ্দ বছর ধরে অফিসিয়াল রেকর্ডে শিল দেবার মতো, খাপছাড়া;

তাতে কি সত্যিই কিছু হলো ! আমি, শিশির রায়—কল মি রে, ধাপের হিসেবে স্যাণ্ডহ্যাম-এর তিন নম্বর। কার তোয়াক্কা ! আই অ্যাম হোয়াট আই অ্যাম ! লুজার ? ক্ষতিগ্রস্ত ? আ-রে মশাই, সে দেখা যাবে। এমন আর কী বদলাবে জীবন ! অসুবিধে ? তা ভাববার আগে ভাবা দরকার সুবিধে কী ছিল। তবে, হ্যাঁ, ওই লিগাল ব্যাপারটা—যাতে ইচ্ছে হলেই বিছানায় গড়াগড়ি দেবার অধিকার জন্মায় ! সেই অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত। তবে, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনারা যাঁরা আমাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, আপনারা কি সত্যিই ব্যাপার-স্যাপারগুলো বোঝেন ? ধড় থেকে মুণ্ডু বাদ দিয়ে ঠিকঠাক ভাবুন তো ওটা শুধু মাংসের অলিগলি কি না ; খুব একটা সামান্য কি না ! নয় তো ! গুড্।

'সো ?' সামনের ফাঁকা চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে, আকণ্ঠ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঠোঁটদুটো সরু করে আনল শিশির। তারপর পেপারওয়েট চাপা চিঠিপত্র টেলিগ্রাম ইত্যাদি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা খাম তুলে নিল হাতে, উল্টেপাল্টে দেখে, ঈষৎ ভুরু কুঁচকে, মুখটা ছিঁড়ে, ভাঁজ-করা কাগজটা বের করে মেলে ধরল চোখের সামনে।

'প্রিয় শিশির, আঘাত নানাভাবে আসে ; কিন্তু তোমার জীবনে যেভাবে এলো—', এই পর্যন্ত পড়ে কাগজটা মুঠোর মধ্যে দুমড়ে নিল শিশির, টেলিফোনের রিসিভারটা তুলেও কী ভেবে নামিয়ে রাখল আবার। তারপর সজোরে বেল টিপতে টিপতে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল, 'রাবিশ ! রাবিশ !' মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো ভাসিয়ে রাখল সিলিংয়ের দিকে, যাতে আর কিছু চোখে না পড়ে।

দরজায় হাল্‌কা শব্দ। বেয়ারা।

সোজাসুজি না তাকিয়েই শিশির বলল, 'কণা মেমসাহেবকে ডাকো—'

বছরের পর বছর লোকটা ছুঁয়ে আছে তাকে—অন্ধ যেভাবে ছুঁয়ে থাকে লাঠি। কিন্তু, শিশির তার যষ্টি নয়। তবে ? এমনকি তার বিয়ের রাতেও এসেছিল রবাহূত। দশ বছর আগে তখনো কিছু পেলবতা অবশিষ্ট ছিল শিশিরের ; অস্বস্তি এড়াতে পারেনি তবু। বুঝতে পেরে নীরদ বলেছিল, 'নেমন্তন্ন খেতে আসিনি, বাবা। তোমার ভালো দেখতে এসেছি ; তোমরাই তো আমার পুঁজি। রেজাল্টের দিন, মনে নেই, কলকাতা ভাসছিল জলে ! উনিশ শো চুয়ান্ন সাল ? তুমি কি বলেছিলে আসতে ? পাঁচ মাইল সাঁতরে সেদিন অতো রাতে কে খবর দিতে এসেছিল তোমাকে !'

দোমড়ানো কাগজটা খুলে হাতের তালু ঘষে-ঘষে আবার পূর্বাবস্থায় ফেরাতে চাইল শিশির। নীরদ ভট্টাচার্য। স্কুলে পড়াত। শুনে বলেছিল, পাষাণ !

হয়তো। যতো দিন যাচ্ছে তার গায়ে শ্যাওলা পড়ছে আরো। দশ বছর পরে হলে কী বলত শ্রীলা ?

'ডেকেছিলেন ?'

'হ্যাঁ— !' ভাঁজ একবার পড়লে তা আর সমান হয় না। এলোমেলো কাগজটাকে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে মুখ তুলল শিশির, 'বসুন !'

কণা বসল না। হাতে নোটবুক ও পেনসিল, দরজা ও পরবর্তী দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল মুখ নিচু করে।

এসব অস্বস্তি কাটাতে খুব বেশি সময় লাগে না। কে বা কার উদ্দেশে না জেনেও প্রায়ই অনুভব করে পিংপংয়ের বলের মতো বুকের মধ্যে সারাক্ষণ লাফিয়ে উঠছে কথাগুলো—উদ্যত হলেই ছুটে যাবে ঝিলিক দিয়ে। কিছু না ভেবেই এখন সে নিরস্ত

হলো।

কালো থেকে ফর্সার দিকে যেতে যেতে রঙটা থেমে গেছে এক জায়গায়। এই রঙের সঙ্গে লালপেড়ে সবুজই মানায়। দু' বছর আগে যখন চাকরি নিয়ে এসেছিল এ-অফিসে, তখনো হাত মুখের তেলাভাব যায়নি, হাঁটার সময় শব্দ হতো চটিতে—বয়স স্বতঃস্ফূর্তভাবে যৌবনকে যা দিতে পারে সেখানে এসেই হাল ছেড়ে দেয়। এই একটা ধরন, যারা বাড়িতে কবে মাংস হলো না হলো মনে রাখে ; কস্‌মেটিক্‌স, যদি কেনে, কেনে নিয়ম করে মাসের গোড়ায়। স্যাণ্ডহ্যাম-এর স্পেসিফিকেসান অনুযায়ী অচল। তবু, সেদিন ইন্টারভিউয়ের পর বোর্ডরুম থেকে বেরুবার সময় মেয়েটি অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে ; ফলে শিশির একটা ডিসিসান নিতে বাধ্য হয়। স্যাণ্ডহ্যাম-এর জলহাওয়া কাউকে অস্পৃশ্য করে রাখে না বেশি দিন। এখন মনে হচ্ছে সেদিন ভুল করেনি।

'কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে কেন !' সোজাসুজি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে শিশির বলল, 'দুঃখটা কীভাবে প্রকাশ করবেন বুঝতে পারছেন না !'

একবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল কণা। পরিবর্তনের মধ্যে চেয়ারটার কাছাকাছি এগিয়ে এলো শুধু। বসল না।

সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়াল শিশির। তখন কী জন্যে ডেকেছিল মনে পড়ছে না ; যেন তা স্মরণ করার জন্যেই দরকার ছিল ওই ভঙ্গির। তার পরেই মনে পড়ল। দু' আঙুলের টোকায় মসৃণ টেবিলের ওপর ভারী লাইটারটাকে কিছুটা গড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই চিঠিপত্রগুলো নিয়ে যান, দেখুন। যেগুলো কনডোলেন্স সব ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবেন। বাকিগুলো নিয়ে আসুন। ফ্র্যাঙ্কলি, আই অ্যাম টায়ার্ড অফ সিম্প্যাথিজ !'

কণা এগিয়ে এলো। আলগাভাবে ছড়ানো চিঠিপত্রগুলো চটপট তুলতে তুলতে তাকাল শিশিরের দিকে।

'আপনার লাঞ্চ ?'

'লাঞ্চ !' রিস্টওয়াচে চোখ রেখে ভাবল একটু। তারপর বলল, 'নো, থ্যাঙ্কস। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

কণা চলে যাচ্ছে। আঘাত নানাভাবে আসে—, শুনে শ্রীলা বলেছিল, পাষাণ। একটা কথা মাত্র, যা কিছু ব্যক্ত করে না। দরজার দিকে কণা যতো দূর এগিয়ে গেছে, দু বছর আগে প্রায় ততো দূর গিয়ে ফিরে তাকিয়েছিল তার দিকে। কেন !

'মিস রায়চৌধুরী—'

দাঁড়িয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে শিশির ওর গোড়ালিটা লক্ষ করল। ফাটা নয়। এলিভেটেড সোলের জন্যেই সম্ভবত আজ একটু লম্বা লাগছে।

'স্যাণ্ডহ্যাম-এ কে আপনাকে চাকরি দিয়েছিল ?'

'শুনেছি—আপনি—'

'শুনেছেন ? বুঝতে পারেননি !' থেমে বলল, 'তবু ভালো, ইউ রিমেমবার !'

বিব্রত ভঙ্গিতে কণা তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে আলগোছে হাসল শিশির, 'ঠিক আছে—'

'কফি বলব ?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

সময়। আসলে সবই সময়ের ব্যাপার। কণা চলে যাবার পর আবার টেলিফোনটার

দিকে হাত বাড়াল শিশির। একটা ডিজিট ঘুরিয়ে কী ভেবে রিসিভারটা রেখে দিল আবার। কথাটা ফিরে আসছে—আঘাত নানাভাবে আসে। সেই সঙ্গে দেওয়ালের সাদা। হাড়ের শূন্যতা!

ধোঁয়া তাড়ানোর জন্যে অ্যাশট্রের ওপর থেকে আধপোড়া সিগারেটটা তুলে ঘষে নিবিয়ে দিল সে। টানা বারো দিন অনুপস্থিতির পর আজ অফিসে এসে পুরোদমে কাজ করার কথা ; কিন্তু, কীভাবে! শরীরময় একটা অনিশ্চিত অনুভূতি যেন ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্রের দিকে—যেখানে সবই অগোছালো, অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন।

ঠিক কোথা থেকে বোঝা যাচ্ছে না, তবে অদৃশ্য কোনো রহস্য থেকে আলো এসে বিভ্রম সৃষ্টি করছে চোখে। অস্বস্তি লাগতে চোখটা নামিয়ে তাকাল দেওয়ালের দিকে। রিসিভারের রঙ যতো দূর সম্ভব সাদা ; তবু দেওয়ালের অদৃশ্য শ্বেতের সঙ্গে তার মিল নেই কোনো। কিছুক্ষণ চোখের সামনে বর্ণহীন দুই সাদার প্রতিযোগিতা দেখতে দেখতে হঠাৎই ধাঁধা লাগল শিশিরের—শুকনো পাতার টুপ করে খসে পড়ার মতো খুব শীতল একটা অনুভূতি দুলে গেল বুকে। আলো। ফিজিসিস্টরা বলতে পারবে এর কোথায় আছে কোন জটিল অঙ্ক—কোন রঙ ও তার পারম্পর্য, যা ক্রমশ ছুটিয়ে নিয়ে যায় একা হওয়ার দিকে!

ঠোঁটে জিব বুলিয়ে স্পর্শের কাছাকাছি পৌঁছে গেল শিশির। একা! শব্দটায় ধ্বনি আছে, প্রাণ নেই কোনো। এমনও হতে পারে তার এই মুহূর্তের মানসিকতা যথেষ্ট স্পর্শক্ষম নয় ; অবোধ্য দূরত্ব থেকে রক্ত বের করে নিচ্ছে সাহচর্যের স্বাদ, ম্লান করে দিচ্ছে সমস্ত আবেগ। মুখখানি তার মুখ নয়, ভাসমান—অত্যন্ত শীতের ভোরে আবছা অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দিকে হেঁটে যাওয়ার মতো। এই মুহূর্তে স্মৃতির চারপাশ জুড়ে চেনাশোনা বস্তুপুঞ্জ—দরজার কপাট থেকে খাট, বিছানা, আলনা কিংবা আরো একটু ছাড় দিলে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজের অন্তরীক্ষ। অসমান মাংসের দেওয়াল, ছুঁয়ে দ্যাখো। সঙ্গ! সঙ্গ! একদা, হঠাৎ, ঘুম থেকে উঠে নিজের অব্যবহিত পরিবেশ সম্পর্কে যেমন কিছু-কিছু ধারণা গড়ে ওঠে, তেমনি, যেন সমস্তই ছুটে আসছে পরপর, সঙ্গ দিতে। অস্পষ্ট সঙ্গ। এদের আবহ থেকে নিজেকে বর্তমানে ফিরে পেতে না পেতেই দূরাগত শারীরিক সুগন্ধে ভারী হয়ে উঠল নিঃশ্বাস ; হাত মুঠো করে হাতের উল্টোপিঠে যেখানে সে চোখ রাখল সেখানে কররেখা নেই। তবু, শ্রীলা নেই—দু' হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়তে পড়তে শিশির ভাবল, এটা তো সত্যি!

॥ দুই ॥

প্রায় তিন-চার ঘন্টা সময় কিছুই করল না শিশির। কিংবা, যা যা করল তার সঙ্গে সচেতন সম্পর্ক নেই কোনো। সত্যি বলতে, নির্দিষ্ট কাজ ছিল না কিছু। স্যাণ্ডহ্যাম জমিয়ে রাখায় বিশ্বাস করে না এটা সে জানত ; কিন্তু, বারো দিনের অনুপস্থিতির কোনো প্রভাবই যে পড়বে না কাজে, পরিষ্কার হয়ে থাকবে টেবিল—এই আবিষ্কার রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলল তাকে। কাজ ও কাজে ডুবে থাকাই হয়তো এই সময় তাকে বাঁচাতে পারত ক্লান্তি থেকে। দ্বিতীয়ত, যেটা ভেবে আরো সংশয়াভিভূত হচ্ছিল শিশির—প্রায় দু' সপ্তাহের অনুপস্থিতির

কোনো ছাপই যে ফেলতে পারে না, যার জন্যে অপেক্ষা করে না কিছুই, একদিন না একদিন সে কি অনাবশ্যক বলে গণ্য হবে না ! না কি এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। নো ওয়ান ইজ ইনডিস্‌পেন্‌সেব্‌ল্‌, কথাটা ইতিপূর্বে সে নিজেই প্রয়োগ করেছে বারবার, অনেকের প্রসঙ্গে, অনেক ব্যাপারে ; কিন্তু নিজের উঠোনে তার ছায়া ছড়াতে দেখে বিমর্ষ বোধ না করে পারল না। মানসিক প্রস্তুতির অভাবের জন্যেই সম্ভবত, এ-বিষয়ে আরো জানবার জন্যে কণাকে ডেকেছিল একবার। যখন শুনল, পেনডিং কাগজপত্র সবই মূর্তির কাছে চালান করে দিয়েছে গুহ, তখন বলবে না ভেবেও সখেদে বলল, 'তা হলে মূর্তিই সব করতে পারে। আমার থাকার দরকার কী !'

বলেই অবশ্য বুঝেছিল এভাবে নিজেকে প্রকাশ করা উচিত হয়নি। মূর্তি এ-কোম্পানিতে নতুন ; কাজেকর্মে যতোই তৎপর হোক, শিশির রে-কে স্পর্শ করার দীপ্তি এখনো সে অর্জন করেছে কি ? করলে, নিজেকেও সে বিস্তৃত করতে পারে। চার বছরে পাঁচটি বড়ো ধাপ সে ছাড়া আর কেউই সম্ভবত পেরিয়ে আসেনি। আস্‌ক্‌ এনিওয়ান হু রান্‌স্‌ স্যাণ্ডহ্যাম ! ইউ উইল নো ! শেষ প্রোমোসানের চিঠিটা হাতে দিতে দিতে হার্টলে বলেছিল, 'এটা একটা রেকর্ড। কনগ্র্যাচুলেসান্‌স্‌ শিশির, ইউ হ্যাভ ডিজারভড মোর দ্যান হোয়াট ইউ রিকোয়ার্ড।' তা হলেও, ব্যাপারটা শোভন হলো কি ! কণা যথোচিত বিশ্বস্ত ও নরম, কথাগুলো ছড়াবে না হয়তো। তবু, কণা নিজেও কি ভাবল না কিছু ? যেমন, এই লোকটা, শিশির রায়, সুনামের দম্ভে পা পড়ে না মাটিতে ; কিন্তু, আসলে এর ভিতরে লুকিয়ে আছে একটা ভীরু ; পরিত্যক্ত বারুদের মতো হলকা ছুঁড়লেই যে জ্বলে ওঠে !

নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় ভিতরে ভিতরে নুয়ে পড়ল শিশির। একা হাসির গল্প পড়ার ভঙ্গিতে সামাল দেবার জন্যে হাসল চুপচাপ। 'ফাইলগুলো নিয়ে আসুন', কণাকে বলল, 'উল্টেপাল্টে একটু আপ-টু-ডেট হয়ে নিই।'

মেয়েটি শান্ত, আশ্চর্য শান্ত। দু' বছর তাকে অনেকটা দিলেও মনে হয় তার কোথাও আছে নিষেধের নির্দেশ ! কোথায় ? যেন তা বুঝবার জন্যেই তার চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শিশির। দেখল, হাঁটার সময় খুব সাবধানে ওঠানামা করে কণার গোড়ালি। ঘর থেকে বাইরে, দরজা দিয়ে শেষ অন্তর্হিত হয় তার পা—প্রায় সদ্যোজাত শিশুর মুঠোর মতো। দৃশ্যটা অনেকক্ষণ লেগে থাকে চোখে।

আশ্চর্য, কী-সব দেখছে সে ! এক সময় নিজেই সচেতন হয়ে উঠল, কী-সব ভাবছে সে ! ভাবামাত্র গুহকে খুঁজল টেলিফোনে। নেই। সেক্রেটারি বলল, ফ্যাক্টরিতে গেছে সকালে, ফেরেনি এখনো। তবে ফিরলেই জানাবে।

'প্লিজ ! থ্যাঙ্কস আ লট।'

'ওয়েলকাম !'

থ্যাঙ্কস, থ্যাঙ্কস আ লট ; থ্যাঙ্কস, থ্যাঙ্কস আ লট—মনে মনে নিজের স্বরের অনুগত হয়ে এলো শিশির ; ওয়েলকাম কথাটার দূরত্ব এড়ানোর জন্যে থেমে এলো নিজের মধ্যে।

দিন সাতেক আগে শেষ দেখা হয়েছিল গুহর সঙ্গে। বম্বে থেকে ফেরার পর। বাড়িতে গিয়েছিল, সেই একই দুঃখ জানাতে। রম্ভা আসেনি। গুহকে দেখেই কি তার মনে পড়ে শ্রীলা ও তার মধ্যে শেষ মুহূর্তের স্মৃতি নেই কোনো ; কিংবা, থাকলেও,তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আড়ালে ! যেখানে থামের মতো দাঁড়িয়ে আছে রম্ভা। গুহকে তা বলা যাবে না।

'আমার স্ত্রী তো খুব শক্‌ড্‌, তিন দিন ঘুমোতে পারেনি—', বলে পাশের ঘরে গুহ যখন

সান্ত্বনা দিচ্ছিল মাকে, মনে হলো খুব রাতে সমুদ্রের ধারে অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে আছে সে—খেয়াল করেনি শিকারী বাঘের পেটের মতো প্রবল ঢেউ উর্ধ্বমুখে পেরিয়ে যাচ্ছে তাকে। ঝিমঝিম করছে মাথা। দাঁতে দাঁত চেপে দমবন্ধ চিৎকার করে উঠেছিল শিশির, 'বাস্টার্ড!' গুহ বলেছিল, 'ভাববেন না। অদৃষ্টের ওপর তো কারও হাত নেই! হয়তো ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে—।' উফ্! তার মানে, রম্ভা ও শিশিরের এই শোয়া-বসার ব্যাপারটাও কি তা হলে ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে! সেদিন রাতে কাজের লোক চিন্তু যখন হরলিক্সের কাপ নিয়ে সামনে দাঁড়াল, ইচ্ছে করেই, অসাবধানে, হাত থেকে কাপটা ফেলে দিল শিশির এবং বলল, 'এবার থেকে কেউ ফোন করলে তুমি ধ'রো। কে করছে জেনে নিও। আমি নেই, আমাকে ডেকো না—'

ফাইলগুলো ঘন্টা তিনেকের ওপর থাক করে সাজানো আছে টেবিলে। একবারও উল্টেপাল্টে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। বিশদভাবে বর্তমানে ফিরে আসার সব চেষ্টাই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল পিছনে। যেন একজন ভ্রান্ত লেখক, উপমাটা নিজেই ভাবল—গল্পটা জানা আছে, তবু ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে। মিথ্যে নয়। প্রায় উত্ত্যক্তভাবে অনুভব করল শিশির, সে দাঁড়িয়ে আছে সেই একই জায়গায়, যেখানে ছিল; যেটা সুস্পষ্টভাবে কোথাও নয়। বাড়ি ফিরে যাবে? সারা রাত পরিচ্ছন্ন ঘুমের পর এতো ঘুম যে কোত্থেকে আসে—ভিজে ন্যাকড়ার পুঁটলির মতো আঁট ও ভারী হয়ে ঘোরাফেরা করে মাথার ভিতর! তার পরেই খেয়াল হলো ফ্ল্যাটের চাবিটা আছে তারই কাছে। যেতে হলে অফিস থেকে বেরিয়ে লিফ্‌ট, লিফ্‌টের পর রাস্তা, রাস্তার পর ট্যাক্সি, ট্যাক্সির পর সিঁড়ি ও সিঁড়ির পর দরজা ও চাবি ঘুরিয়ে শূন্যে প্রবেশ—তারপর কি অনন্তকাল ধরে ফ্ল্যাটের তিনটি ঘর ও লিভিং রুম ঘুরে ঘুরে আসবাব সচ্ছলতার সঙ্গে আলাপ? ধারাবাহিক এই চিন্তা তাকে টেনে নিল আরো বেশি ক্লান্তির মধ্যে।

ধারাবাহিক কথাটা গেঁথে গেল মনে। ধারাবাহিক—ধারাবাহিক—ইংরিজি শব্দটা কি কন্‌টিনিউয়াস?, সাক্‌সেসিভ? তো, মনে পড়ল, ইতিমধ্যে ধারাবাহিকভাবে একটা অন্যায়ও সে করে যাচ্ছে···, মনে পড়া মাত্র ঝুঁকল রিসিভারের দিকে।

সকাল থেকে এই নিয়ে দু'বার, না তিনবার? থাক্, এখন নয়—পরে, ভাবল, এটা অসময়—স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় বরাবরই অভ্যস্ত চন্দন। সাত বছর বয়সের ক্লান্তি বড়ো মধুর। তাছাড়া দফায় দফায় খোঁজ করার দায়িত্বটা তার নয়, শ্রীলার। শ্রীলার! হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে, অনেকবারই লক্ষ করেছে শিশির—দু'জনের মধ্যে একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল তারা, শ্রীলা ও চন্দন, যেখানে তার কি কিছু করার ছিল! পায়রা ও পায়রার বাচ্চা, ছাগল ও ছাগলছানা—পারস্পরিক, ওদের আবেগের মধ্যে ছিল এক ধরনের বন্যতা; কিংবা, সেটা গড়ে ওঠেছিল ক্রমশ! যেমন, শিশির হয়তো ফিরল অফিস থেকে, বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল দরজার দিকে পিছন ফিরে শ্রীলা শুয়ে আছে বিছানায়, পরিপূর্ণ হয়ে; তারপর চন্দন কোথায় ঠিকঠাক জানবার জন্যে তাকে এগোতে হতো একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলের দিকে—চন্দনকে দেখা যেত শুয়ে আছে শ্রীলার আড়ালে, গায়ে গায়ে, খোপে খোপে; একটাই শরীর! তারপর, শ্রীলার কোমর ভেঙে উঠে বসার ধরনে অবিকল উঠে বসত ছেলেটা। খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে এই আবিষ্কার চোখে চেখে দেখেছে শিশির, বেশ কৌতুক নিয়ে—যে-চোখে মানুষ চিড়িয়াখানায় খাঁচার ভিতরের দৃশ্য লক্ষ

করে।

কাছেই কোথাও শান দেওয়া হচ্ছে ছুরিতে ; তীক্ষ্ণ শব্দটা ছুটে যাচ্ছে কপাল ভেদ করে। অন্ধকার অনুভব করার প্রকৃষ্ট সময় বলে যদি কিছু থাকে তা হলে তা এখনই। হাতের ওপর দিয়ে ঝুলে আছে হাত—হাঁসের পা ; তার উপমাশক্তিতে আহত হবার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল চারিদিকের শব্দ, দক্ষ তীরন্দাজের লক্ষ্যভেদের ভঙ্গিতে দমকে দমকে ছুটে এলো শীত। বুদ্ধিমান শিশির ; প্রত্যক্ষকে ভুল করবার মতো এলেবেলে সে নয়। শ্রীলার শরীরটাকে পূর্বাবস্থায় নিয়ে যেতে যেতে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল সে—কাছে যেটুকু জায়গা ছিল শীতলভাবে বসল তার পাশে। দু' হাতে শ্রীলাকে আড়াল করে ঝুঁকে এলো তার মুখের ওপর। খানিক আগেকার শীত এখন আর গায়ে লাগছে না। আস্তে হাত তুলে শিশির তার কপালের সেই জায়গায় রাখল, যেখানে শুকিয়ে-যাওয়া রক্তপাতের মতো সিঁদুর। মনে হয় কালই পরেছিল বেশি করে, কিংবা, তার ঘুমের মধ্যে ; বোধ হয় জানত বাড়াবাড়ির জন্যে ঠাট্টা শুনতে আর সে শিশিরের মুখাপেক্ষী হবে না।

হোল্ড্ অন, হোল্ড্ অন, জেন্টলমেন, আপনারা কি কখনো মৃতা স্ত্রীকে চুম্বন করে দেখেছেন ? বিশেষত, যদি সে-স্ত্রী হয় এমন কেউ, যাকে আপনি ভালোবাসেন, কিন্তু যার জন্যে কোনো ভালোবাসার অনুভব আলাদা করে আসেনি কখনো ! সেই চুম্বন, যা নিষিদ্ধ হতে জানে না—যা অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্যে ! যদি না করে থাকেন—

'হ্যালো, ইয়েস !'

'আপনি কি ঘরে ছিলেন না ?'

'কেন !'

'অনেকক্ষণ ধরে কানেকসান দিচ্ছি—'

'সরি, অপারেটর। হু ইজ ইট ?'

'স্পিক হিয়ার।'

'হ্যালো—'

'হ্যালো, শিশিব— ?'

'ইয়েস—'

'আমি অতনু। চিনতে পারছিস ?'

'অতনু—মানে অতনু দত্ত, কবি, লেখক, আর কী যেন—'

'ঠাট্টা রাখ্। তোর ব্যাপার কী ?'

'ভালো। খুব ভালো।'

'ভালো !'

অতনু চুপ করে গেল ; যেন আত্মনির্ভরতার খেই হারিয়ে কথা খুঁজছে আশেপাশে। পরবর্তী গলার স্বর বেশ পাল্টে এলো।

'শিশির, ভালো থাকা কাকে বলে আমি জানি, ভালো না থাকাও। তোর তো ভালো থাকার কথা নয় !'

'তবু আছি।' চেষ্টা করে হাসল শিশির ; রিসিভারটা কাঁধে চেপে ফস্ করে জ্বেলে নিল সিগারেট ! ধোঁয়া টানল। 'তবু ভালো আছি ; আমাকে বিশ্বাস কর—যে-রকম থাকা যায়। এইমাত্র একটা সিগারেট ধরালাম। আরো জানতে চাস ! এখন আমার চারিদিকে একটা

নতুন গোল টেবিল—মাঝখানে ফাঁক। সেখানে বসে আমি যেদিকে চাচ্ছি ঘুরে-ঘুরে সকলকে বলে যাচ্ছি, ভালো আছি, খুব ভালো আছি—'

'বুঝেছি। স্মার্টনেসই তোর কাল হবে—'

'বাঃ চমৎকার! আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস ফাঁদ না—বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু! ঝালমুড়ির রেসিপি দিয়ে আর কতো দিন সিনেমার গপ্পো লিখবি!'

'শোন্, শোন!'

'হ্যাঁ বল্—'

'রঞ্জনা ফোন করেছিল তোর বাড়িতে—'

'রঞ্জনা! মানে তোর বউ? কেন?'

'নিশ্চয়ই কিছু বলার ছিল—'

'অ্যাডভানটেজ পয়েন্ট, আমার। শ্রীলা কি কোনো দিন ফোনটোন করত তোকে!'

'রাস্কেল, ন্যাকামি করিস না। ভবিষ্যৎ ভাব। ছেলেটার কথা ভাব—'

'হ্যালো, অতনু, হ্যালো—'

'বল্।'

'রঞ্জনা ফোন করেছিল কেন?'

'বলব। বাড়িতে থাকিস? তা হলে আমরা আসব।'

'ঠিক আছে—'

'চন্দন কোথায়?'

'শ্বশুরবাড়িতে—আপাতত—'

'সেই ভালো। কবে আসব?'

'যেদিন খুশি—'

শেষ কথাটা শোনা গেল না। শুনবার চেষ্টা থেকে আরো কিছুক্ষণ রিসিভারটা কানে ছুঁইয়ে রাখল শিশির। শব্দ ও নৈঃশব্দ্য যতো দূরে পৌঁছে অতিক্রম করে যায় পরস্পরকে, প্রায় ততো দূর অব্দি গিয়ে ঢিলে করে দিল নিজেকে। একটু আগে ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল, এখন আর ততোটা নয়। তবু আলস্য এলো ঢেউয়ের মতো, হাই উঠল পরপর। ফাইলগুলো বাঁচিয়ে জুতোসুদ্ধ পা দুটো টান-টান করে তুলে দিল টেবিলে। গায়ে ছিমছাম পোশাক, চোখে চশমা, ঠোঁটে সিগারেট এবং ইচ্ছায় তৎপর—আমি, শিশির রায়। মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড অতনু দত্ত, ভেবে দ্যাখো তো সত্যি সত্যিই ভবিষ্যতের ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে কি না! না, না, ঠিক সে-অর্থে নয়। কেসিয়াস ক্লে'র মতো ঘুষি পাকিয়ে আমি একবারও বলছি না—আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট। আমারও লিমিটেসান আছে; না হলে অমন ফুটফুটে বউটা আত্মহত্যা করবে কেন! যদিও 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়—' কথাগুলো লিখে গেছে স্পষ্ট; তবু, এটা তো সত্যি যে কিছু একটা ঘটেছিল, কিছু একটা ঘটছিল—আমি ঠিক জানি না, যা পরোক্ষে আঙুল তুলে আছে আমারই দিকে। আমি বলছি, তোমাদের স্ট্যান্ডার্ডে? গপ্পো উপন্যাসে তো দিব্যি জলে চোবানো নায়িকাকে লাট্টুমার্কা নায়ককে দিয়ে উদ্ধার করিয়ে, কিংবা মুখে দু' চারটে ধর্মের মরিচ-মেশানো ডায়লগ লাগিয়ে হিরো করে দাও। তো, সেই তুলনায়—গর্ব করছি না, আমার অ্যাচিভমেন্ট কি কম! আট বছরে যার বাবা মারা যায়, যার মাকে এক হেঁপো কাকার আশ্রয়ে চিরকাল উনুনে আঁচ দিয়ে আর রুটি বেলে ছেলে মানুষ করতে হয়—সে ক্রমশ শিশির রায় হয়ে ওঠে কী করে! ঠিকুজিতে

ছিল ? তো, ভাই, বিয়েটা যদিও প্রেম করে, তবু, বিয়ের আগে সেই হেঁপো কাকা তো দু'জনেরই ঠিকুজি দেখে বলেছিল রাজযোটক। তা হলে সব এমন গোলমাল হয়ে গেল কেন ! আর, ছেলের ভবিষ্যৎ—

একবার, দু'বার ; তিনবার বেজে ওঠার আগেই এবার তৎপর হলো শিশির। ওদিকে গুহ। সংক্ষিপ্ত স্বর শুনে মনে হচ্ছে এইমাত্র ফিরেছে। এখনই না যাওয়া বা দেরি করার অর্থ ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং, সিগারেটটা তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে গুহর অফিসের দিকে পা বাড়াল শিশির।

ঘরের পর্দা আছে বলে বোঝা যায়নি এতোক্ষণ। দরজা ঠেলে হলে পা দিতেই চোখে পড়ল বিকেল ; বড়ো কাচের জানলাগুলো দিয়ে ছায়া ছড়িয়েছে ইতস্তত। সকলেই চুপ। ঠিক বুঝল না নীরবতার এই ভাবটুকু আগেই ছিল, না সে নিজেই সঙ্গে নিয়ে এলো ! লোকগুলি চেনা। তবু তাদের মুখের দিকে আলগাভাবে তাকিয়ে করিডোর পার হতে হতে একটিও নাম মনে করতে পারল না শিশির। প্রায় এই সময়—মুখ ও নামের দ্বিধার ভিতর দিয়ে যখন সে হাঁটছে, হাল্কা থেকে ক্রমশ জোরালো অথচ অস্পষ্ট একটা গন্ধ ক্লোরোফর্মের রুমালের ধরনে নড়ে উঠল তার নাকের সামনে। চেনা গন্ধ, যেন একটু আগেও চিনত। আপাতত গুলিয়ে ফেলার অস্বস্তিতে গতি মন্থর করে টানবার আগেই আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যেতে দিল শিশির। মৃত্যু ও জীবনের মাঝামাঝি নিশ্চয়ই আছে কোনো স্থির মুহূর্ত, সেখানে পৌঁছে কী ভেবেছিল শ্রীলা ! কার কথা ! তার ? চন্দনের ?

গুহর গলা ঠাণ্ডা। চিঠিপত্রে সই করছিল বোধ হয়, 'এসো' বলে টেবিলে শুইয়ে রাখা টেলিফোনের রিসিভারটার দিকে ইঙ্গিত করল, 'মাই ওয়াইফ। তোমাকে চাইছে।'

কথা না বলে রিসিভারটা তুলে নিল হাতে। গুহ বলেই বাধ্য, না হলে কী মানে হয় এসব ন্যাকামির !

'হ্যালো—'

'ভুলে গেছ ?'

'ন্-না—'

টেলিফোনে নয়, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে রম্ভা। প্রশ্নের মধ্যেই যতো দূর সম্ভব আদর-কাড়া হয়ে উঠল।

'কতো দিন তোমাকে দেখিনি, শিশির !'

'হ্যাঁ—'

'এখন তো তুমি ফ্রি। আজ রাত্রে ডিনারে এসো ? আসবে তো ?'

গরুর মতো, চোয়াল শক্ত করে ভাবল শিশির, নিঃশ্বাসের কাছাকাছি সে এখন তার গলকম্বল দেখতে পাচ্ছে। তারপর বলল, 'কী দরকার ! মানে—'

'বসের সামনে ভয় পাচ্ছ !'

'না, নট রিয়েলি।'

'আসবে না ?'

'ও-কে। দেখি—'

আর কিছু শুনবার আগেই অন্য হাতে রিসিভারের মুখ চাপা দিল শিশির ; গুহ কিছু বলবে কি না জিজ্ঞেস করল। গুহ বলল, না। তখন আস্তে করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল, এ কেমন, কেন সে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে টেলিফোনের সঙ্গে !

গুহ তাকিয়ে আছে তারই দিকে। শিশির বসবার পর বলল, 'আসছ তা হলে ?'

'কী দরকার ! মানে—'

'ফর্মালিটির কিছু নেই। তা ছাড়া—', নিবে-যাওয়া পাইপের মুখে বার দুয়েক ঠোঁট টিপে গুহ বলল, 'এ-রকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল ! সন্ধেটা আমাদের সঙ্গে কাটালে হয়তো তোমার কিছুটা ভালো লাগত !'

নিরুত্তর থেকে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল শিশির। কতো নির্বিশেষে মানুষ ভালো লাগার কথা বলতে পারে !

কাঠি দিয়ে পাইপ খুঁড়ছে গুহ। মুখ নিচু। শিশিরের মনে পড়ল, গুহ তাকে নয়—সে-ই খুঁজছিল গুহকে। উদ্দেশ্যের কথা ভাবেনি। গুহ নিশ্চয়ই আশা করবে তার কিছু বলার আছে। কী বলবে ? কৃতী, অক্লান্ত, প্রায়-প্রৌঢ় এই লোকটিকে সে পছন্দ করে—জানে, স্যাণ্ডহ্যামে এই-ই তার চ্যাম্পিয়ন। আড়ালে এরই সঙ্গে তার প্রতারণা। গুহ কি বোঝে, ডিনারটা অজুহাত, টেলিফোনের আবডালে এইমাত্র তাকে গলকম্বল দেখিয়েছে রম্ভা—দ্যাট ব্লাডি বিচ্ অফ্ এ উয়োম্যান, মাংসের আহ্লাদ ভিন্ন আর কোনো অনুভূতিতে যে বিশ্বাস করে না। নাকি সবই জানে গুহ, জেনেশুনেও নিরুপায় ! নাকি গুহরও আছে অন্য কোনো প্রতারণা !

সম্ভবত একটু বেশিই সময় নিচ্ছিল শিশির। গুহই কথা বলল প্রথম।

'সারাটা দিনই আজ ফ্যাক্টরিতে গেল ! গো-স্লোর ব্যাপারটা কি তুমি শুনেছ ?'

শিশির চুপ করে থাকল।

'ইউনিয়নে পলিটিক্যাল ব্রেন ঢুকলে এই রকমই হয়।' ইতিমধ্যে পাইপ ধরিয়ে রিল্যাক্স করার ধরনে ছড়িয়ে বসল গুহ, 'প্রোডাকসান ম্যানেজারকে বলেছি রিং লিডারকে ম্যানেজ করতে। কিন্তু সেটা তো সল্যুসান নয়। ডিসেম্বরের মধ্যে এক্সপোর্টের অর্ডারটা মিট করতে হবে—হুইচ নাউ সিমস্ ইম্পসিবল্। ভাবছি—'

ফোন। বাইরের কল। বেশিক্ষণ সময় নিল না গুহ ; সম্ভবত আগামীকালের কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট কনফার্ম করল।

'সো, ইউ সি—'

'এক্সটেনসান চাইতে হবে—'

'আমিও তাই ভেবেছি, হার্টলেকেও বলেছি।' অল্প থেমে গুহ বলল, 'হার্টলে সাজেস্ট করছিল ইউ শুড টেক দি ট্রিপ টু জাপান—। কিন্তু—'

শিশির নড়ে বসল।

'ও-কে। আই অ্যাম রেডি।'

'আই নো।' গুহ হাসল, ছড়িয়ে। 'তোমাকেই যেতে হবে তেমন কোনো কথা নেই। যে কেউ যেতে পারে, আমি—'

'বাট, স্যার—'

'শিশির !' অস্বস্তি থেকে ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করল গুহ, 'যাক না কিছু দিন, এক মাস, দু' মাস। অফিস, কাজকর্ম এসব তো আছেই ! যাক্‌গে—'

প্রসঙ্গ থেকে দূরে যাবার জন্যেই যেন ভঙ্গি পরিবর্তনের দরকার হলো গুহর। পাইপটা নামিয়ে রাখল হোল্ডারের ওপর।

'তোমার খবর বলো। হাউ ড্যু ইউ ফিল নাউ ?'

এতোক্ষণের শ্রোতৃভাব থেকে নিজেকে ঝাঁকিয়ে তুলল শিশির। ইংরিজির বাংলা করলে 'কেমন আছ'ই দাঁড়ায়। কেন ভালো নয়! সত্যিই কি তার অন্য রকম থাকার কথা ছিল! ভাবনাটা ঠেলে দিল অধৈর্যের দিকে।

'চমৎকার।'

'চমৎকার!' গুহ প্রতিধ্বনি করল। সময় নিয়ে বলল, 'আমি ঠিক জানি না, শিশির—বোধ হয় এখনই কিছু বলার সময় নয়। ক'দিন হলো? বারো দিন? বারো দিনে কি কিছু বোঝা যায়!'

কিছু মানে, কী? তাকে নয়, যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল গুহ। তাকাল দূর দিয়ে, জানলার বাইরে—যেখানে ক্রমশ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আকাশ। গুহর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিভ্রম ছেঁকে ধরল শিশিরকে। রোদের ম্লান হয়ে আসাই সম্ভবত দায়ী এর জন্যে, ভাবল, আসন্ন ছায়ায় সবই ফিরে আসে অন্য অর্থ নিয়ে!

'ভাগ্য, সবই ভাগ্য।' গুহ হঠাৎ বলল, 'এসব দেখে তাই মনে হয়, শিশির। না হলে শ্রীলার মতো মেয়ে—, আন্‌থিংকেব্‌ল—'

গুহর দীর্ঘশ্বাসে ছাই ওড়ে। পাইপটা বোধ হয় আবার নিবে গেছে। কখন? উঠে যাবার ভঙ্গিতে পা দুটো জড়ো করে আনল শিশির। কখন? মৃত্যু যদি এসে থাকে, তবে নিশ্চিত তা এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে আসেনি। নিশ্চিত তার আগে সে অনেকবার ভেবেছিল। বলবে না ভেবেও নিশ্চিত সে 'তুমি বুঝে নাও' চোখে তাকিয়েছিল শিশিরের দিকে—একদিন, কোনো এক মুহূর্তে! এমন কি হতে পারে, শ্রীলা ভেবেছিল সঙ্কেত পাওয়া মাত্র তাকে ফেরাবার কথা ভাববে শিশির! শিশির কি পেয়েছিল? বা, গায়ে-গায়ে, খোপে-খোপে লেগে থাকা, বিছানায় চন্দনকে জড়িয়ে শুয়ে থাকার সেই বন্য আবেগ—কবে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল শ্রীলা!

শরীরে পরস্পরবিরোধী পারাপার শুরু হতেই উঠে দাঁড়াল শিশির।

'সন্ধেয় আসছ?'

শিশির ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না।

সোজাসুজি তার দিকে তাকাল গুহ।

'নিজেকে ফোর্স কোরো না। ভালো লাগলে এসো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'পুলিস তোমাকে হ্যারাস করেনি তো?'

'তেমন কিছু নয়। তবে—', মেনে নেওয়ার ধরনে বলল শিশির, 'তাদের কাজ তারা করবেই।'

'আমারও তাই মনে হয়। কাল ক্লাবে চৌধুরীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হি সেড ইট ওয়াজ এ রুটিন অ্যাফেয়ার—'

শ্রীলা তো লিখেই গেছে—, যেন তার ইচ্ছে হয়েছিল। যদি তা না লিখত, তা হলে এতো দিনে কি কাটাছেঁড়া শুরু হতো তাকে নিয়ে? সে, শ্রীলা, ঘুমের বড়ি খেয়ে ঢলে পড়ার আগেই সেদিন সে, শিশির, যে আচ্ছন্ন ঘুমের তন্ময়তায় ঢলে পড়েছিল—একটা গোটা রাতের কোনো পরিচ্ছন্ন স্মৃতি নেই তার মনে, কেউ কি বিশ্বাস করত তা! এমন কি হতে পারে, তার নয়—আসলে সেদিন রাতে শ্রীলা ছিল চন্দনেরই পাশে, একই ভঙ্গিতে! তবু, মৃত্যু আসন্ন জেনে শঙ্কিত সে ছুটে এসেছিল শিশিরের কাছে—বাঁচার ইচ্ছে নিয়ে, তারপর

আর ফিরে যেতে পারেনি ! হতে পারে, নাও হতে পারে। ফোন পেয়ে ছুটে এসে অর্জুন ওর জামার কলার চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাকে বলতে হবে, শিশির, কেন ও স্যুইসাইড করল !' শিশির কি হেসেছিল ! মনে পড়ে, উদ্‌ভ্রান্ত অর্জুনের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে সে শুধু বলেছিল, 'ও তোমার বোন, অর্জুন, আমারও তো স্ত্রী ! আমি কাকে জিজ্ঞেস করব !'

মাথার ভিতর ফেঁপে আঠা হয়ে যাচ্ছে শিরাগুলো। সেখানে ঘুম। কিন্তু—দু' হাতে চুলের মধ্যে বিশৃঙ্খল আঙুলগুলো ঠেলতে ঠেলতে শিশির হাই তুলল, কিন্তু সে ঘুমোবে না। তার অভাবে নিরর্থক হয়ে যাবে জীবন, এ কেমন কথা ! বাঁচতে ভালো লাগে তার, সে বাঁচবে। বাঁচবে অফিস নিয়ে, বাঁচবে কেরিয়ার নিয়ে, বাঁচবে সাফল্য আর সচ্ছলতা নিয়ে। বাঁচবে যা থেকে গেল তা নিয়ে, তাদের নিয়ে। আজ সকালেই না সে একটা সংখ্যার কথা ভেবেছিল ? তা যদি সত্যি হয়, সে একা অসহায় হয়ে পড়বে কেন ! ভালোবাসা ! সে তো অনুভূতি মাত্র ! তার চলে যাওয়াটা যদি সত্যি হয়, আবার ফিরে আসাটা অসম্ভব কেন !

আবার টেলিফোন। ঘর জুড়ে আলো, ফ্লুরোসেন্টের শাঁস থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সমান আভা। তবু অবেলা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই অসময়ে কে ! আবার সহানুভূতি নাকি ! ধরবে, না অপারেটরের ধৈর্যের ওপর ছেড়ে দেবে কলটা !

দ্বিধা থেকে ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে, অন্যান্যবারের মতো, যান্ত্রিক উদ্যমে রিসিভারটা তুলে নিল শিশির।

'হ্যালো—'

'কে ? বাবা ? আমি চন্দন বলছি—'

'ও ! চন্দন ! কেমন আছ তুমি ?'

'আমি ভালো আছি। তুমি আজ সারা দিন আমার খোঁজ করোনি, তাই মা বলছিল—'

'মা— !'

মুঠোর মধ্যে পেপারওয়েটটা শক্ত করে চেপে ধরল শিশির। আজ সারা দিন ভঙ্গিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি আমি, ভাবনায়, দর্শকের মতো। সাত বছরের তুই—তুই কী করে ভুলবি !

সামলে-নেওয়া গলা চন্দনের। থতমত খেয়ে বলল, 'মা নয়, পলামাসি বলছিল—'

'তাকে দাও।'

পাঁচটা পঁচিশ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে পি-বি-এক্স। তার আগেই ছোট করে আনো সংলাপগুলো।

'শিশিরদা ?'

'হ্যাঁ। চন্দন ঠিক আছে তো ?'

'ভালোই আছে। আমরা নতুন নয়—'

'অবস্থাটা নতুন।...যাক, ভালো থাকলেই হলো—'

প্রমীলা সময় নিচ্ছে। গলার পিছনে ঘাম, একটা রেখা নেমে গেল চুপচাপ।

'ছেলেকে রেখেই বুঝি আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল !'

'আমি দায়িত্বহীন, অর্জুন এটা বারবার বলে—'

'দাদার কথা থাক।' এলানো, নিচু গলায় পলা বলল, 'দাদাই কি সব ! আমরা—'

পলা হঠাৎ চুপ করে গেল। এটা কার দান ? শিশির ভাবল, পলা কি আবার শুরু

করবে ? নাকি আস্তে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখবে সে !

'আপনি আসছেন না আজ ? ছেলেকে দেখে যান অন্তত—'

'দেখি. যদি পারি—'

'কী, জানি বাবা ! বউ যেন কারুর মরে না !'

'মরে' কথাটা, যেমন 'মরে গেছে—', এ ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম উচ্চারিত হতে শুনল শিশির, যেমন 'বউ' কথাটা। এর মধ্যে শ্রীলা নেই—চেষ্টা নেই কোনো। রুমাল টেনে ঘাড়ের অস্বস্তিটা মুছে নিল শিশির। কথা শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে, এরপর আর কী থাকবে !

'চন্দনকে কী বলব ? কখন আসবেন ?'

'দেখি। সন্ধের পর···রাখছি—'

নিঃশব্দে কেটে যাচ্ছে আর একটি ব্যক্তিগত দিন। এর মধ্যে খুব কি এগিয়ে যাওয়া হলো ? বোঝা যায় না। সময়ের এই স্বতঃশ্চলতাকে হয়তো নিঃশব্দ বলাও ভুল। যতো দূর খেয়াল হয় অনেকের সঙ্গেই ইতিমধ্যে কথা বলছে সে, এমনকি কয়েকবারই টেলিফোনের সঙ্গেও। এখন মনে হচ্ছে সকাল থেকে এ পর্যন্ত যা যা করেছে বা বলেছে, তার সবই করা বা বলার ধারণা থেকে, তাৎক্ষণিকতা থেকে নিজেকে আর একটু উসকিয়ে দেখার জন্যে—তার বেশি আর কিছু নয়। কার্যত সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বেশ কয়েকটা ঘন্টা সময়ের মধ্যে সে যা ছিল তার চেয়ে অন্যরকমভাবে প্রতিভাত হয়েছে কি—অন্তত নিজের কাছে ! অনুভব যাই দিক, শব্দের সঙ্কীর্ণতা থেকেই বা কতো দূর এগোল ! 'ভালো' আর 'দেখি', গোটা দিনটাকে নিজেই এখন চিনতে পারছে এই দু'টি শব্দ বা তাদের যোগফলের মধ্যে, তার অর্থ থেমে থাকা ! যার অর্থ : এগারো বা তার আগের দিনগুলি থেকে বারো দিনের দিন পৌঁছেও সাঁকোর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটোছুটি করেছে সে, শুধু পারাপারের ধারণা নিয়ে—বস্তুত পৌঁছয়নি কোথাও ! শ্রীলার মৃত্যু একটা ঘটনা মাত্র—যেমন অন্যান্য ঘটনা, এইভাবেই ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করেছে এতোক্ষণ। তা হলে সে থেমে আছে কেন !

অনুভূতি জুড়ে এক ধরনের অসহায়তা যেন তাকে টেনে রাখতে চাইছে বর্তমানে, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে শারীরিক স্থিতিস্থাপকতায়। এখন উপস্থিতি বলতে শ্রীলা—যে তার স্ত্রী ছিল, এখন নেই। থাকা ও না-থাকার তফাতটুকু বুঝতে পারলে এই মুহূর্তের অবসাদ কাটিয়ে সে হয়তো কিছুটা নিরপেক্ষ হতে পারত।

'আমি কি যেতে পারি ?'

কণা ! শিশুর মুঠোর মতো গোড়ালি। সামনের অবিমিশ্র সাদা থেকে চোখ তুলে হাসল শিশির।

'কী ব্যাপার ! ছুটি হয়ে গেল ?'

কব্জি তুলে ঘড়িতে চোখ রাখল কণা। জবাব দিল না। সময়ের পরিমাপ তার ভঙ্গিতে। ভুল মশলায় তৈরি মোম, তাপেও গলবে বলে মনে হয় না।

মেয়েটি এ-রকম ছিল না। কিংবা এই রকমই ছিল কি না আড়ে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল শিশির। স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে গেল লাসকাটা টেবিলে। দাগগুলো পড়ছে পরপর। রক্ত নয় ; আঠার মতো একটা তরল পদার্থ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে দু' পাশে। অন্য রূপে, অন্য রঙে এগুলোই কি ছিল অনুভূতির উৎস ! এদের সাহচর্যেই কি শ্রীলা উঠে এসেছিল

পাশে !

কণার অস্বস্তি চোখ এড়াল না শিশিরের।

'তাড়া আছে— ?'

কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল কণা। একটু কাঁপল, একটু ভাবল ; তারপর মাথা নাড়ল। যার অর্থ, না।

উত্তরটা শিশিরকে মনে করিয়ে দিল তার প্রশ্নে প্রশ্ন ছিল না কোনো। বলেছিল, নিতান্তই বলা দরকার ছিল বলে। বলতে কি, আজ সারা দিনই এইভাবে কথায় প্রবাহিত হচ্ছে সে। এখন উত্তর থেকে একটা উদ্দেশ্য বের করার চেষ্টা করল এবং ভাবল, হয়ত এটাই সত্যি—এতোকাল শ্রীলা ছিল বলেই ছড়িয়ে ছিল সে। নেই ; তাই চেনাজানা সংস্পর্শগুলো ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে।

শিশির উঠে দাঁড়াল। ড্রয়ার বন্ধ করে চাবিটা ভরে রাখল ওয়ালেটে। নিঃশ্বাসে টেনে আনল সেই আত্মবিশ্বাস, যা তাকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠ করতে পারে। সিগারেট ধরিয়ে গলাভর্তি ধোঁয়া টেনে ও ছেড়ে, পিঠটা টান-টান করে, ভাবল, এই মেয়েটি শুনেছে শিশির রায়ই তাকে চাকরি করে দিয়েছিল স্যাণ্ডহ্যামে। শোনা ও জানার মধ্যে তফাতটুকু এখনো রাখতে চায় আড়ালে—হয়তো মেয়েলি সঙ্কোচ তাকে এইভাবেই অস্পষ্ট হতে শিখিয়েছে। যেমন, এখনো, শিশিরের দৃষ্টি বিশেষভাবে তার স্তনে আবদ্ধ নয় জেনেও আঁচলের অবস্থানটুকু ঠিকঠাক করে নিল সে। ওটা স্বভাব। কিন্তু গত দু' বছরে শিশির কি অনেকটা বদলে যেতে সাহায্য করেনি ! গত দু' বছরে তার মুখ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে তেলাভাব ; শরীর থেকে জল-না-পাওয়া গাছও। অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদিন শিশির ডিসিসান না নিলে কী হতো ! কণা হয়তো থাকত তখনো, তবে এভাবে নয়। তার হাবভাব, বাধ্যতা ও কথা বলা দিয়ে মেয়েটি এতোদিন প্রাণপণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে তার কাছে। সম্ভবত অকারণে। শিশির কি চেয়েছিল ? না। আজ যদি সে চায় ! যদি বলে, মিস রায়চৌধুরী, আপনাকে আমি ভালো করে চিনি না ; কিন্তু আজ এই মুহূর্তে যখন আমার কিছুই করার নেই, হাতে অফুরন্ত সময়, যখন আমি চাইছি সমস্ত সহানুভূতি এড়িয়ে যেতে—আমার আপনাকেই দরকার ? মেয়েটি কি প্রত্যাখ্যান করবে তাকে !

দূরত্ব থেকে কণার দিকে সোজাসুজি তাকাল শিশির, কিছু বা নতজানু ; যাতে কণা স্থানচ্যুত না হয়।

'আপনি থাকেন কোথায় ?'

'এন্টালির দিকে।'

'কাছেই তা হলে— ।' এগোতে এগোতে কণার কাছাকাছি পৌঁছে শিশির বলল, 'তাড়া নেই—এখন বেরিয়ে চট করে ট্রাম-বাসও পাবেন না, ট্যাক্সিও না। আমার গাড়ি নেই। চলুন, আমাকে কিছুক্ষণ সঙ্গ দেবেন। আপত্তি আছে ?'

উত্তর পাবার আগেই কণার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল শিশির ; ঠিক ততোটুকুই কাছে টানল, যাতে উত্তরটা পজিটিভ হয়। তারপর দরজাটা টেনে ধরল।

শিশিরের আগে বেরুতে বেরুতে ঠোঁটের কোণে শিথিল রেখা ফুটিয়ে তুলল কণা, উত্তর দিল না। এ-রকম অবস্থায় কণা যে হাসবে শিশির তা আগেই জানত। সুতরাং আমল দেবে কেন ! হলের সামনে দিয়ে করিডোর পেরুতে পেরুতে দেখল তখনো দু' একজন থেকে গেছে অফিসে—তাদের চোখে বুঝে-ফেলা হাসি। বিলিং সেকসানের ইনচার্জ সেই

কটা-চোখ মোটা লোকটা—হ্যাঁ, ভাদুড়ী—সমর্থন ছুঁড়ল মাথা নাড়ার ধরনে, যার অর্থ এই তো ! হ্যাপি টু সি ইউ ব্যাক টু ফর্ম । তা হলে আমার একটা নির্দিষ্ট ফর্ম ছিল ! ভাদুড়ীকে চেনে । আগে তার সঙ্গেই কাজ করত । ইদানীং আলাদা । আলগোছে লোকটির দিকে তাকিয়ে শিশির অনুমান করল, কাল অফিসে এসে কণা কিছুটা বিব্রত বোধ করতে পারে । এন্‌ট্রিতে টিক্ দিতে দিতে আঁতিপাঁতি করে ওর শাড়ির ভাঁজগুলো খুঁজবে লোকটা, শরীরে কোনো হেরফের হলো কি না বুঝতে—জানে তো সেটা আরো ভালো বোঝে স্যালারি সেকসানের লোকগুলো ; হ্যাঁ মশাই, কণা রায়চৌধুরীর মিড-টার্ম ইনক্রিমেন্টের কোনো খবর আছে নাকি ? তা ছাড়া বিল রেজিস্টারের বিকল্পে কণাকে ভেবে নিতে অসুবিধে কী ! আর, দাঁতের দাগ বসানোর জন্যে তো লাল পেনসিল আছেই—, একটু ছুঁচলো করে নেওয়া দরকার, এই যা ! উঃ, শালা, কেন যে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালাম না !

কণা এগিয়ে গেছে অনেকটা । দ্রুত হাঁটার ধরনে মনে হয় জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চায় তাড়াতাড়ি । সঙ্কোচে, না ভয়ে ? ভেবে, লিফ্‌টের কাছাকাছি পৌঁছে চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হলো শিশির—যেন হা-হা-তেই স্ফূর্ত হতো বেশি । কাচের দরজা পর্যন্ত সে এটা সংবরণ করেছিল ।

'হাসছেন যে !' নিজে থেকে কণা এই প্রথম বলল ।

'একটা কথা মনে পড়ে গেল । হাসির কথা নিশ্চয়ই—', বলতে বলতে লিফ্‌টের বোতামে হাত দিল শিশির, 'ওই ভদ্রলোককে চেনেন ? ভাদুড়ী ?'

'অফিসেই চিনি ।' কণা বলল, 'ওঁর ভাইঝি আমার সঙ্গে পড়ত—কলেজে—'

'ভাইঝি···পড়ত ? তা হলে তো—', বলতে গিয়েও সামলে নিল শিশির । কী লাভ ! ধারণা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কটা-চোখের দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল তাকে । রেজিস্টারের ওপর ঝুঁকে পাতাকুটো জড়ো করছে ভাদুড়ী, উবু হয়ে তলায় ফুঁ দিলেই দপ্ করে উঠবে । এসব ছড়াতে সময় লাগে না । হয়তো সে একা নয়, হয়তো সে একা ছিল না । থাকে না । খুব রাতে একদিন তার নামে ডাকে-পাঠানো উড়ো চিঠিটা শিশিরের হাতে দিতে দিতে শ্রীলা বলেছিল, 'যা করছ করো । তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে জড়াও কেন !' খুব রাতে নেপথ্য থেকে ভেসে-আসা, তাই কিছুর সঙ্গেই মিল হয় না শ্রীলার সেই স্বরের !

চার থেকে তিনে পৌঁছুবার আগেই হাসিটা মিলিয়ে এলো শিশিরের । স্মৃতি মাঝে মাঝে শিকড় ধরে টান দেয় !

লিফ্‌ট খুব ফাঁকা নয় । লিফ্‌টম্যান ছাড়াও আছে আর একজন ; অচেনা । ক্রমশ নেমে-যাওয়ার শব্দ ; চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হবে মাইল মাইল নিম্নতায় প্রতিবাদহীন চলে যাওয়া—এর চেয়ে সুখকর আর কিছু নেই ।

এসবে কাতর নয় কণা । হঠাৎ বলল, 'বেশি দেরি হবে না তো ?'

'দেরি !' প্রসঙ্গে ফিরে আসতে যতোটুকু সময় লাগে তার বেশি নিল না শিশির, 'ইচ্ছে হলে এখনো চলে যেতে পারেন ।'

'তা কেন !' আচমকা চোখ তুলল কণা, 'কিছু ভেবে বলিনি—'

'তবু, বলেছেন তো !'

মানে হয় না জেনেও কথাটা বলল শিশির । এবারেও কণাকে বেরুতে দিল আগে ।

সিঁড়ি । ফুটপাথ । শব্দ । কলকাতা । আস্তে ঠোঁট ছোঁয়ানোর মতো সোল ছুঁয়ে যাচ্ছে মসৃণ গোড়ালি । মেয়েটি স্বচ্ছন্দ হোক । হাই চাপা দেবার জন্যে হাতটা মুখের ওপর টেনে

আনল শিশির।

হিসেব মতো কণার ব্যবহারে ভুল নেই কোনো। সে জানে শিশির তার বস্ ; জানে ভাদুড়ী ও আর কেউ কেউ তাকে বেরুতে দেখেছে শিশিরের সঙ্গে। দু' বছরে চেহারা ও ভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে হয়তো, মানসিকতায় আসে কি ! কী বলেন, মিস রায়চৌধুরী, এলে পেঁপে গাছেও গোলাপ ফুটত, তাই না ! এই যে জড়োসড়ো হয়ে হাঁটা, জানি, আমি নয়—আপনার পিছনে আছে ভাদুড়ী। সম্ভবত আমাকে মিস্টার রে বা আপনার বস্ না ভেবে শিশিরবাবু বা শিশির বা যে-কোনো একটা লোক বা একটা মানুষ ভেবে নিলে অনেক স্বচ্ছন্দ হতে পারতেন। বুঝেছি, ওই কাঁধে হাত রেখে বুকের কাছাকাছি টেনে নেওয়ার ব্যাপারটা তো ? তা, ধরুন, দু' বছরে যদি এসব ধান্ধা না করে থাকি, তা হলে আজকেই বা কেন ! কাঁধে হাত দেওয়া মানেই কি আর-কোথাও হাত দেওয়া ! আমাকে বিশ্বাস করুন, শরীর-স্বাস্থ্য ও সৌজন্যে যুবতী হলেও এবং ফ্ল্যাটটা এই মুহূর্তে খালি থাকলেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে আপনাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে তোলার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। আমি ক্লান্ত। ক্লান্ত। ক্লান্ত হতে চাই আরো। এজন্যে দরকার ছিল আপনাকে, বা বিশেষভাবে আপনাকে না হলেও, আপনার মতো একজনকে—প্রশ্নহীন যে প্রত্যক্ষ করতে পারবে আমাকে। যদি মনে করেন কিছুক্ষণ সঙ্গ দিলে কোনো অসুবিধে হবে না আপনার, তা হলে দয়া করে আমার পাশে পাশে হাঁটুন। ভয় পাচ্ছেন ? ভাদুড়ীমশাই কী ভাবলেন ! তা দেখুন, যারা ভাববার বা বুঝবার, তারা ঠিকই বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। যেমন মেয়ে মানেই মেয়ে আর পুরুষ মানেই পুরুষ—যেমন কণা আর শিশির, হেঁ-হেঁ, তা এসব একটু-আধটু হবেই তো ! ব্যাপারটা বুঝুন, সকলেরই সামনে এক-একটা অ্যানাটমির চার্ট ঝোলানো—হাতে পেনসিল, স্পেস রিসার্চ সেন্টারের বৈজ্ঞানিকের মতো মহাকাশে ভেলা পাঠিয়ে লক্ষ করছে গতিবিধি—দাগাচ্ছে,দাগিয়ে যাচ্ছে—যতোক্ষণ না দাগ পুরোপুরি একটা ক্ষতের রূপ নেয় ! আমার ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন ! যদিও শ্রীলা লিখে গেছে স্পষ্ট, তবু অর্জুনের তর্জনী কেন এখনো নামছে না আমার বুকের ওপর থেকে ! একদিন আপনাকে ফেভার করেছিলাম বলে নয়, মিস রায়চৌধুরী—আমার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কিছু-কিছু শুনেছেন আপনি ! সত্যি বলুন তো, আমাকে দেখে কি মনে হয় শ্রীলার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী !

স্বপ্নে উচ্চারিত শব্দের মতো বিড়বিড় করে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে গেল শিশির, হাসল, ক্রমশ চলে এলো কণার পাশাপাশি। ভিড়। এই তার প্রতিদিনের রাস্তা—রাস্তা থেকে টপ-গিয়ারে ছুটতে ছুটতে প্রতিদিনই সে ফুটপাথ দেখে, আজ ফুটপাথ থেকে রাস্তা দেখতে দেখতে ভিড়টা হঠাৎই বেশি মনে হলো তার। বিচিত্র সব মুখ, এক-এক দিক থেকে এসে পরস্পরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে তারা। এইভাবে, এদের সঙ্গে গা মিশিয়ে দিলে, যে-কোনো একটি দিকে পৌঁছে যাবে সে। ঠিক কোন দিকে ? এর মধ্যে কেউ কি আছে যে অবিকল তার মতো—যাকে ধরে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যায়, থাকা ও না-থাকার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় !

ছ'টা বাজে প্রায়। আকাশে তাকিয়ে সন্ধের আর কতো দেরি আন্দাজ করার ক্ষণিক চেষ্টা করল শিশির ; মাটি থেকে আলপিন খুঁজে তোলার নৈঃশব্দ্যে ছোট একটা নিঃশ্বাস নামিয়ে দিল গলা দিয়ে। এখন ঠিক বিকেল নয়, সন্ধেও নয়—এই একটা সময় যখন হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে লাইজলে মেশানো কার্বলিকের গন্ধ। নিঃশ্বাস ছুটে যায় দিগ্বিদিকে—ধ্বস্ত শবে এঁটে দিতে হয় নামের লেবেল !

'কোথায় যাচ্ছি, বলুন তো ?'

'জানি না। হয়তো কোথাও নয়—'

কণা দ্বিধা করল, সে-জন্যে ট্রাফিকও দায়ী কিছুটা। পুলিসের সঙ্কেত পেয়ে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল অনায়াসে। আকর্ষণ থাকলে শিশিরকে এখন চেনা যেত অনুসরণকারীর ভূমিকায়।

'কোথাও যেতে হবে তার কোনো মানে আছে ?'

'আছে। সকলেরই থাকে।' কণা হাসল, 'একেই যদি সঙ্গ দেওয়া মনে হয়, তা হলে এই ভিড়েই হেঁটে গেলে পারতেন। আমাকে টেনে আনার দরকার ছিল !'

'সঙ্গ কাকে বলে ?'

'জানি না—'

'নিঃসঙ্গ ?'

'তাও জানি না।' কণা কি হাসল ? বলল, 'যদি কখনো বাংলায় ডিক্টেসান দেন, জেনে নেব।'

অনেকক্ষণ পরে মেয়েটিকে খোলা চোখে দেখল শিশির। মনে হচ্ছে টেলিপ্যাথিক চুম্বক থেকে বেশ কিছু জানাজানি হলো, তার নীরবতার মধ্যেও অনেকটা জেনে নিয়েছে কণা। না হলে এতো বেশি স্পষ্টতায় শিশির রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারত না। শিশিরবাবু ? হতে পারে ; সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে দেখল প্রথম ধাপে উঠে এসেছে কণা। দূরত্বটা এখনো বহু দূর, এতো দূর থেকে কেউ কাউকে একান্ত করে নিতে পারে না। তবু সেদিন খুব দ্রুত উঠে এসেছিল শ্রীলা—অনেক, অনেক দিন আগে। প্রতিটি বিষণ্ণতার বোধই তখন সিরিঞ্জের মতো, রক্তের দিকে পারস্পরিক। রক্ত, না আবেগ ? অ্যানাটমি কী বলে ?

'আর একটু এগোলেই ময়দান, ফোর্ট—এই সময় কলকাতা সুন্দর হয়ে ওঠে।'

সবুজ থেকে বিচ্ছিন্ন লাল আঁচলটা তুলে মুখ চাপা দিল কণা। হাসল কি ? অন্য গলায় বলল, 'তা হলে আপনি বাংলা জানেন, ময়দানও চেনেন ?'

চশমার ভিতর দিয়ে যতো দূর দেখা যায় মেয়েটিকে দেখল শিশির। এখন সে ইচ্ছে করলে তার গোড়ালিটা ছুঁয়ে দেখতে পারে। সদ্য পাটভাঙা শাড়ি পরে এসে এইভাবে অনেক সুযোগ দিত শ্রীলা। গোটানো পাড় ও কুঁচি টেনেটুনে পায়ের পাতার লেবেলে নামিয়ে আনতে আনতে রক্তের সমগ্রতা টের পেত শিশির—অক্লান্ত জিব বুলিয়েও দেখত রক্ত ফিরে আসছে প্রবল উচ্ছ্বাসে। উঠে এসো, শিশির, আমি বলতে কি আমার গোড়ালি !

'ঠাট্টা ! করুন। তবে—', থেমে বলল শিশির, 'এককালে জানতাম, এক কালে চিনতাম। কতো দিন আগে ! তখন সব অন্য রকম ছিল...'

'কী-রকম !'

'জানি না। কখনো একা গেলে হয়তো বুঝতে পারব।'

একা কথাটা ইচ্ছে করেই উচ্চারণ করল শিশির। তখন সত্যিই অন্য রকম ছিল সব কিছু। এই মেয়েটির সঙ্গে সে-সবের সম্পর্ক নেই কোনো, থাকা সম্ভবও নয়। এই মুহূর্তে সঙ্গ বা নিঃসঙ্গ কোনোটিরই সংস্পর্শহীন কে কার আকর্ষণে হাঁটছে বোঝা মুশকিল। একদিনের—কিছুক্ষণের—নিঃশর্ত কড়ার থেকে কোনো স্মৃতি উজ্জীবিত হয় কি ? কাল নিশ্চিত এ-আবহ থাকবে না, পরশুও না। হঠাৎ বেজে-ওঠা এই মেয়েটি—কণা—তখন শিশিরকে নিয়ে একটা গল্প তৈরি করতে পারে। সে-গল্প ভাদুড়ীর চেয়ে আলাদা। এইভাবে

একটার পর একটা আলাদা-আলাদা গল্প কী অদ্ভুতভাবে তৈরি করছে এক-একটা মানুষ—যার সঙ্গে হয়তো বাস্তবের সম্পর্ক নেই কোনো। শিশির ? আমি ওর গোড়ালির—নরম-নধর গোড়ালির, যা আসলে শ্রীলারও—প্রেমে পড়েছিলাম। হা-হা-হা—

বুকভর্তি শ্লেষ্মার মতো শব্দটা ঘড় ঘড় করে উঠেই থেমে যায়। আর একটু এগোলেই নির্জনতা, টিলার ওপর দিয়ে মিশে গেছে সবুজে। ওইখানে বসে যে-কোনো অন্ধকারে কণা তার পোশাকের লাল আরো বেশি অর্থময় করে তুলতে পারে—প্রতিদান এভাবেও আসে। যদি আসে ? ভেবে, তেমন কিছু না-দেখার চোখে শিশির তার সবুজ ছুঁয়ে যায়। ধরা দিতে গিয়েও হারিয়ে যাচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত। বেশ বৃষ্টি হয়েছিল কাল রাতে—পরিচ্ছন্ন ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শিশির তার শব্দ শুনেছিল ; ঠিক কতো দিন পরে ! বৃষ্টির ভিতরে বৃষ্টি, নিশুতির ভিতরে শব্দ। খালের ওপর কাঠের ব্রিজ, তার ওপর দিয়ে ঘেঁসড়ে ঘেঁসড়ে চলে যাচ্ছে দূরপাল্লার মালগাড়ি—শববাহী ?—কেউ অপেক্ষায় নেই বলেই সম্ভবত, যাওয়ারও শেষ নেই কোনো ! কোনাকুনি ছুটে এসে ধারাবাহিকতায় মিশে গেল শিশির। সামনের নির্জনতা থেকে চোখ তুলে তাকাল কণার দিকে।

'হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

'কেন !'

'ওখানে কেউ নেই। ওই জায়গাটায় আমরা কিছুক্ষণ বসতে পারি—'

'দেরি হবে না তো ?'

'ইচ্ছে হলে এখনো চলে যেতে পারেন—'

কণা তাকাল ; কথা বলল না কোনো। অন্যমনস্কতার ভিতর আচমকা হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া আঁচলটা সামলাতে সামলাতে সরে এলো কাছে। শিশির দেখল, কাছে আসাটা ভুল ; তাকে পেরিয়ে কণা এখন পা রাখছে ঘাসে। বড়ো ঘাস ও চোরকাঁটার লোভে আড়াল হতে হতেও জেগে উঠছে তার গোড়ালি। অনেকক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস পেরিয়ে এলো শিশির। এইভাবে—সময় থেকে আরো বেশি সময়ের দিকে।

মাঠে কি লিগের খেলা ? হতে পারে। সারি সারি সাজানো দৃশ্যমান মাথাগুলির মধ্যে থেকে প্রবল চিৎকার উঠে উড়িয়ে দেয় গাছের পাখিগুলিকে—ফোর্টের দিকে গিয়ে দলবদ্ধভাবে হাওয়ায় কাত হতে হতে ক্রমশ অদৃশ্য হবার আগে আকাশে সন্ধ্যার আভা ছড়িয়ে যায় তারা। আবছা লালের মধ্যে থেকে আবার বেরিয়ে আসে রোদ্দুর। হাওয়া ; কণা কণা নয় ; বিকেলের গন্ধময় আর কেউ—ঘাসটির স্নিগ্ধতার সঙ্গে এক হয়ে উঠছে ক্রমশ। বসে, শিশির তার বসার ভঙ্গি লক্ষ করল—অ্যানাটমির বিভ্রম নাকি ! না হলে কেন সে ধরা দিচ্ছে প্রায় একই ভঙ্গিতে ; শাড়ির পাড়ে গোড়ালি ঢেকে, হাঁটু ভাঁজ করে, ডান হাতটা হাঁটুর ওপর, বাঁ হাত ব্যস্ত এলোমেলো ঘাসের শিস্ ছেঁড়ায়—সুতরাং এলানো খোঁপাসুদ্ধ মুখটাও সেদিকেই ফেরানো, অপরাহ্নের আলো ছুঁয়ে যাচ্ছে কানের লতি। সঙ্গ যেন সে শিশিরকে নয়, পৃথিবীকে, কিংবা, এই মুহূর্তের সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতকে, দেবার জন্যে স্থির হয়ে আসছে ছবির মতো ! বারো বছর আগে এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে শিশির তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল আদ্যন্ত ; তখন কথা ছিল—নিঃশ্বাস ক্রমাগত ছুটে যেত স্তব্ধ তার প্রোফাইলের দিকে। দীর্ঘ সময়ের অপ্রেম এখন ঠাণ্ডা স্পিরিটের মতো বুক ছুঁয়ে নেমে যায় নাভির দিকে—হঠাৎ-বিকেলে শোনা মেঘ গুড়গুড় করে ডেকে ওঠে পাকস্থলীর মধ্যে

হ্যালো, অতনু, হ্যাঁ, আমি শিশির, হ্যাঁ, একটা মেয়ে জোগাড় করেছি ; ভালোই—কিন্তু, ডায়লগ-টায়লগগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন ; গপ্পো উপন্যাসে তো সিচুয়েসান বুঝে জুতসই লাগিয়ে দিস দিব্যি ! আমার সময় নেই, এক্ষুনি দরকার—দু' চারটে কথা, দু' চারটে শব্দ—সঙ্গ থেকে দূরত্ব তাড়িয়ে দিতে পারে এমন কিছু ! অসহ্য ! দিস ইজ্ সিকেনিং !

দাঁত কামড়ে, পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতে যতো সময় লাগে, তারও আগে নিচু হয়ে এলো আকাশ। বিকেল পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ, আলোয় পচন-ধরা কমলালেবুর রঙ। হাওয়ায় নির্বিশেষ থম ; এলোমেলো যেতে-যেতে লাইজলে মেশা কার্বলিকের গন্ধ চিনে নেয় তাকে। নাকের সামনে অনেকগুলো মশা উড়ে উড়ে স্থান পরিবর্তন করছে পরস্পরের সঙ্গে। কণা ও তার সঙ্গে তাদের দূরত্ব প্রায় সমান। অস্বস্তিকর সেদিকে তাকিয়ে বলার মতো একটা কথা খুঁজে পেল শিশির।

'মিস রায়চৌধুরী, আপনি কখনো প্রেম করেছেন ?'

'প্রেম !' হাঁটুর ওপর গাল-বদল করতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিল কণা, 'হঠাৎ !'

'হঠাৎ ! কোনটা ? প্রেম, না আমার প্রশ্ন ?'

'প্রশ্নটা।' কণা বলল, 'কী করবেন জেনে ? ওটা ব্যক্তিগত—'

'গোপনীয় ?'

'হয়তো নয়। যদি বলি করিনি খুশি হবেন ? যদি বলি করেছি, তা হলে—'

তার ও কণার মধ্যে অনেকগুলো মশার ব্যবধান, আড়াল থেকে শিশির বলল, 'কথাটা খুশি হওয়া না-হওয়া নিয়ে নয়—'

'জানি। কিন্তু, যাকে আপনি চেনেনও না ভালো করে, তার ব্যক্তিগত খবর আপনাকে খুশি অখুশি কিছুই করবে না। বরং—'

নিবে-যাওয়া সিগারেটটা আবার জ্বালিয়ে তোলার চেষ্টা করছে শিশির। স্ফুলিঙ্গ না-দেখা পর্যন্ত সময় নিল কণা। তারপর বলল, 'আমার জন্যে ভাববেন না। বরং আপনার স্ত্রীর কথা বলুন, আমি শুনব। সেটা হয়তো আপনারও ভালো লাগবে।'

'আমার স্ত্রীর কথা !' শিশির বলল, 'সেও তো আপনার চেনা নয়—'

'দেখেছিলাম একদিন, অফিসেই। আপনার খোঁজেই এসেছিলেন !'

'তারপর ?'

'সেদিন আপনি আর ফেরেননি—'

কণা যেখানে শেষ করল, তারপরও আছে। সিঁড়ির ওপর থেকে দ্রুত কয়েক ধাপ নিচে নেমে এলো শিশির। চকিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কবে ?'

'আমার ঠিক মনে নেই। তবে বেশ কিছু দিন আগে। ধরুন মাস দুয়েক—'

'সারপ্রাইজিং !' শিশির বলল, 'আমাকে বলেননি তো !'

'উনি মানা করেছিলেন।' দূর থেকে বলল কণা, 'লিফ্টের কাছে গিয়েও ফিরে এসেছিলেন একই কথা বলার জন্যে—যেন আপনাকে কিছু জানানো না হয়।'

তীক্ষ্ণ চোখে কণাকে লক্ষ করল শিশির, কয়েক পলক, এবং ভাবল, না।

এখনো তেমন কোনো আভাস না থাকলেও হঠাৎই নেমে আসতে পারে অন্ধকার। ঠিক কখন ? একটু আগে জিজ্ঞেস-করা 'কবে'র সঙ্গে প্রশ্নটা মেলাবার চেষ্টা করল শিশির—তাকাল দূর দিয়ে। এ-রকম কতোবার ? কেন ! তফাতটা আসছে থাকা ও

না-থাকা থেকে। কণা নিশ্চিত এসব জানবে না।

ঊর্ধ্বে মুখ তুলে বুকের অনেকটা জায়গা ভরে নিল শিশির। গন্ধটা ফিরে আসছে। কণাকে কিছু বলবে ভেবেও কথাগুলো ফিরিয়ে নিল আবার। লাভ নেই—লাভ নেই কোনো। যদি থাকত, তারও আগে দেখা হতো শ্রীলার সঙ্গে ! হতো না কি !

হাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গাঢ় শীত। বারো দিন আগে প্রায় এই সময় মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীলার অপেক্ষা করছিল সে। সঙ্গে অতনু ছিল, রঞ্জনা, অর্জুন এবং আরো কেউ কেউ। তারা বিশেষভাবেই শ্রীলার আমন্ত্রিত বলে মুখগুলি মনে রাখেনি সব—প্রয়োজনও ছিল না। কিছু দূরে একাকী শোকাভিভূত অর্জুন, খালি পা ও বিস্রস্ত ; লক্ষ্য কি শিশির ? একটু আগেই তাকে নামতে দেখেছিল সৎকার সমিতির গাড়ি থেকে।

লাইজল ও কার্বলিকের চড়া গন্ধ থেকে উঠে এসে একই মাছি বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছে সকলকে। হৈ-হৈ করে ট্রাক থেকে খাট নামাচ্ছে একদল ছেলে, সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে গোছ-করা রজনীগন্ধা, মাটির সরা ও আরো কী কী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভিড়। রোঁয়া-ওঠা, লিকলিকে একটা কুকুর, ধাঙড় ও হিজড়ের বচসায় বিরক্ত হয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে গেল বড়ো রাস্তার দিকে। লম্বা বেঞ্চিতে বসে অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে ঘোমটায় মুখ-ঢাকা এক যুবতী, সম্ভবত বধূ—গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকেই আমল দিচ্ছিল শিশির ; আর সব বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওই স্বরটুকুই ছুঁয়ে থাকল তাকে। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে। হয়তো কান্নার উপলক্ষ আছে মেয়েটির। তার ? সকালে অ্যাম্বুলেন্স এসে শ্রীলাকে তুলে নিয়ে যাবার পর, কিংবা তারও আগে, প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল মৃত্যু ! তারপর এতোটা সময় ধরে পোস্টমর্টেমের জন্যে হন্যে হয়েছে সে, আশ্চর্য ! শ্রীলাকে দ্রুত কাটাছেঁড়া করার জন্যে সে এতো ব্যস্ত হয়েছিল কেন !

ফিরে এসে অতনু বলল, 'শ্রীলা যে এমন কিছু করতে পারে আগে কোনো দিন টের পাসনি তুই ?'

'কী বলব, পেয়েছিলাম ?' শিশির হাসল, 'সাক্ষি যে দিতে পারত সে এখন নেই !'

'ওর কি ইনসমনিয়া ছিল ?'

'আমার ছিল। জানি না।' নড়ে উঠে বলল শিশির, 'হয়তো ওর দরকার ছিল।'

'আঃ, তুমি কি থামবে !' অতনু আর কিছু বলার আগেই গাড়ির ভিতর থেকে রঞ্জনা বলেছিল, 'এখনই কি এসব বলার সময় !'

তার মানে দিন পড়ে আছে ! তার মানে সবই পড়ে থাকে ! যেমন বিছানা তার, বালিশের শীতল আকৃতি। আলনা জুড়ে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজের অপেক্ষা—ওয়াড্রোব খুললেই থরে থরে সাজানো ভাঁজ থেকে বেরিয়ে আসবে ন্যাপথলিনের গন্ধ ! যেমন ড্রেসিং টেবিলে মেক-আপের সব কিছু, যেমন সিঁদুরকৌটো আর রুপোর কাঠি—সমস্ত, সমস্ত—অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের মৃত প্রলোভন থেকে কী অদ্ভুতভাবে সজীব হয়ে উঠত তারা ! সবই পড়ে থাকে ? ভুল ! যেমন—প্রথম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ হেসে নেয় শিশির—, দ্যাখো, আর কয়েক দিন পরে তোমার বিবাহবার্ষিকী ; ভুলে যাবার দৈন্য থেকে তুমিই টেনে তুলতে বারবার ; এবার আমার মন কতো বেশি জাগ্রত ! এবার অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে, বেঁচে যাবে অনেকটা সময় ! বেঁচে যাবে একদিন তোমার মন পাবার চেষ্টা—আমাদের ফিরে-যাওয়া—অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে শরীরে শরীরে কানাকানি, গভীর স্তন থেকে উঠে-আসা নতুন মাটির গন্ধ !

অন্ধকারে সাবলীল হয়ে আসছে চোখ, নাকের নিচে ঘামের রেখা। মাংসল প্রচণ্ডতায় বহু দূর পর্যন্ত নেমে গিয়ে শিকড়সুদ্ধ শ্রীলাকে উপড়ে আনল শিশির। সদ্যোজাত শিশুর কান্না তার শরীরে—, 'এতো ভালোবাসা, তবু কেন সব ভুলে যাও, শিশির!'

এসব কতো দিন আগেকার কথা! গত বছরের? তার আগের বছরের? তার—তারও আগের বছরের?

সময়ের নিরবচ্ছিন্ন পারাপার থেকে উঠে এসে কপালের ওপর চেপে-বসা মাছি তাড়াল শিশির। করোনারের অফিসের ভিতর দিয়ে দরজা; 'মিসেস শ্রীলা রায়ের কে আছেন এখানে? বডি আইডেনটিফাই করুন।' তিতকুটে গলা লোকটির; চেঁচিয়ে যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে। আর কয়েক পা এগোলেই শ্রীলা! ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শিশির। 'আপনি কে? স্বামী? আচ্ছা, আসুন—'

গন্ধটা সংক্রামক। পা বাড়াবার আগেই হাত চেপে ধরল অতনু। পিছন থেকে অর্জুন বলল, 'চিনতে পারবে তো?'

সোজা প্রশ্ন। মানেটা অস্পষ্ট নয়। বেঁচে থাকলে শ্রীলাও কি বলত এ-কথা!

প্রত্যুত্তরের সময় এটা নয়। ধরা গলায় শিশির বলল, 'তুমিও এসো—'

পরপর সাজানো গোটা দশেক লাশ। মেয়ে-পুরুষে মেশামেশি। আদ্যন্ত শরীরে এতোটুকু লজ্জা নেই কোনো। যে-তুমি আমার পাশেই লজ্জা পেতে, তার এতো অবহেলা কেন! তুঁতরঙ সেই সমষ্টির দিকে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করল শিশির, এর মধ্যে কোনজন শ্রীলা? ততোক্ষণে তর্জনী তুলেছে অর্জুন; লোকটি চেঁচিয়ে 'সাত নম্বর' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠল ধাঙড়েরা। পাশাপাশি সে ও অর্জুন। কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।

মনে পড়ে, সবই মনে পড়ে। দূরে, স্থির জাহাজের আলোর দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস সংবরণ করল শিশির। মুঠোয় ধরা জ্বলন্ত পাটকাঠি, তার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে চন্দনের মুখ। যে-দুঃখ আজও আমি চিনিনি, তাকে তুমি চেনো! সে কি বলেছিল?

এসব ভাবতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। অথচ, এইভাবেই তারা কাটিয়ে এসেছে দশটা বছর! সে আর শ্রীলা। দশ বছরে সে অনেকটা এগিয়েছে—শিশির থেকে শিশির রে'র দিকে। যদি এটাকেই এগোনো বলে! শ্রীলা কি এগিয়েছিল? তার স্ত্রী হওয়া থেকে আর কোনো দিকে? নাকি সময় ও শরীর পুরনো হবার সঙ্গে সঙ্গে সিঁদুর-শাড়ি-সচ্ছলতা-ও-চন্দনকে নিয়ে যে-জীবন, তা ক্রমশ আরো পুরনো করে দিচ্ছিল তাকে, আরো ক্লান্ত; অভ্যাসের ভিতর থেকে তাই হঠাৎ সরিয়ে নিল নিজেকে!

এই একটা জায়গা, গত বারো দিনে বারবার যেখানে এসে থেমে যাচ্ছে সে। পরিষ্কার বুঝতে পারে শিশির, মৃত্যুর বর্ণনা ছাড়া এর মধ্যে স্মৃতি নেই কোনো—চিহ্ন নেই পরিবর্তনের। আজ সকাল থেকে খানিক আগে পর্যন্ত তার প্রাত্যহিক রুটিনে ছেদ পড়েনি কোনো—দাড়ি কামানো থেকে ব্রেকফাস্ট সারা, তারপর বেরুনো, অফিস, টেলিফোন—ওই মাঝে মাঝে সহানুভূতি ব্যাপারটা বাদ দিলে এর চেয়ে বেশি বই কম বার রিসিভার তোলে না সে; সবই আছে এক রকম। তবু, একটা অস্বস্তি, আড়ালের একটা যন্ত্রণা এসে বারবার সব এলোমেলো করে দিচ্ছে কেন! কেন মনে হচ্ছে জীবন যেমন ছিল আর ঠিক তেমন থাকবে না—শরীর থেকে ক্রমশ কমে যাবে হাত-পায়ের জোর, মন থেকে দাপট, স্মৃতিবিজড়িত বিস্মৃতির দিকে ক্রমশ হাঁটতে হবে একা! না হলে, ভাবনা থেকে মুখ তুলে আবার ভাবনায়

নিমজ্জিত হলো শিশির—তা না হলে, দু'বছরে যে-মেয়েটির দিকে স্পষ্ট চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত, তাকে হঠাৎ সঙ্গ দেবার জন্যে ডেকে আনবে কেন ! বস্তুত, কিছু কি অভাব ছিল তার !

কণা বসে আছে চুপচাপ, যে-রকম ছিল। কী ভাবছে বোঝা যায় না ; হয়তো বিরক্ত, হয়তো ততোখানি নয়—হয়তো স্যাণ্ডহ্যামের প্রচলিত গল্পের সঙ্গে এতো দিনে নিজেকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ডিয়ার গার্ল, আই অ্যাম ইনডেটেড টু ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ, কণা, মিস রায়চৌধুরী, আশা করি এই সন্ধ্যার ঘটনাটিকে আপনি অন্যভাবে নেননি ! আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট, এটা কি কোনো সময় ! একটু আগে বাড়ি না ফিরে একটু পরে ফিরছেন, তফাত বলতে এইটুকু। একটা জরুরী কাজ-টাজ পড়ে গেলে এর চেয়ে বেশি দেরি কি হতো না !

'আপনার অনেক দেরি হলো—'

'দেরি !' দম-দেওয়া পুতুলের মতো কব্জি তুলে অন্ধকারে ঘড়ি দেখল কণা, নিশ্চয়ই কিছু বুঝল না। তারপর আকাশে তাকাল, যেন তার তাড়া নেই কোনো। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'মেঘ করেছে, বৃষ্টি হতে পারে—'

শিশির হাসল শব্দ করে। সারা দিনের মধ্যে প্রথম।

'মিস রায়চৌধুরী, ওগুলো সম্ভাবনার কথা। এতোক্ষণ নিশ্চয়ই আপনি আরো অনেক সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন, তার অনেকগুলোই আমাকে নিয়ে। কিন্তু, আমি বোধ হয় খুব খারাপ লোক নই—'

কণা খুব বিচলিত হয়েছে মনে হলো না। একই গলায় বলল, 'আপনি অন্তর্যামী !'

'ওটা ঠাট্টা !' একটু থেমে শিশির বলল, 'আমার স্ত্রীর আমার বিরুদ্ধে একটিই অনুযোগ ছিল, আমি তাকে বুঝতে পারি না। অথচ দেখুন, আপনার কাছে সে নিজেকে যতোটা জানিয়েছে আমি তাও জানি না !'

শেষের দিকে বুঝি শিশিরের গলা কিছুটা তির্যক হয়ে এসেছিল, অন্ধকারে কণার হঠাৎ-তাকানোর ধরনে অন্তত তাই মনে হবে। এই আলোয় চোখ দেখা যায় না, ঠোঁট কিছু ব্যক্ত করলেও না।

'আমাকে কী জানিয়েছেন !'

'ওই আসার ব্যাপারটা—'

কণা চুপ করে থাকল। সেদিন শ্রীলার প্রতি অনুগত না হয়ে এই মেয়েটি যদি তাকে তার আসা ও ফিরে যাওয়ার কথা জানাত, শিশির ভাবল, জীবন কি তা হলে একটু অন্য রকম হতো ! এমন কি হতে পারে, শ্রীলার আসা এবং ফিরে যাওয়ার মধ্যে সেদিন পার্থক্য ছিল প্রচুর—মাঝখানের অপেক্ষার সময়টুকুই ছিল সবচেয়ে জরুরী ; যে এসেছিল এবং যে ফিরে গিয়েছিল, দু'জনেই এক নয়। এমন কি হতে পারে, যে এসেছিল সে আর ফিরে যায়নি তার কাছে—যে ফিরে গিয়েছিল খুঁজলে তার গায়ে শিশির তখনই আবিষ্কার করতে পারত তুঁতের রঙ, বা তার প্রথম আভা, অল্প আগেই কাঁচের আড়ালে যা সে প্রত্যক্ষ করে এলো !

কণার ওঠার ধরনে পেলবতা নেই, স্প্রিংয়ের মতো হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এখন গুছিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। এমন আড়ালে শিশুর হাতের মুঠো প্রত্যক্ষ করা যায় না—তার চেয়ে আরো বেশি সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শ্রীলা। হাওয়ায় তার গন্ধ ; অন্ধকারে ছুঁচ কুড়োনোর মতো অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় ফিরিয়ে আনল তার নিঃশ্বাস। মেয়েটি যেখানে

বসেছিল এতোক্ষণ, প্রায় সেইখানে কি ! মাঝরাতের ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে অস্ফুট গলায় শিশির বলল, 'চলো ।'

বারো বছর আগে অন্ধকারে লাবণ্য ছিল বেশি । কিংবা তাই মনে হতো তখন । বাড়ানো হাতের ওপর ভর করে স্বচ্ছন্দে উঠে আসত শ্রীলা ।

'তোমার এতো তাড়া কেন, শিশির !'

'তাড়া ! তোমারই জন্যে—'

বুকে লগ্ন শ্রীলা । মাটির মসৃণতায় খুলে দিয়েছে শরীরের সব রোমকূপ বীজ গ্রহণের জন্যে । নিঃশ্বাসে চারিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির গন্ধ । শ্রীলা বলল, 'ঘাস মাটি নির্জনতার গন্ধে ভরা এই অন্ধকারে তোমার থেকে যেতে ইচ্ছে করে না, শিশির !'

কথাগুলোর মানে কী ! শিশির হেসে বলল, 'তুমি বড়ো রোম্যান্টিক ।'

'কিছু বললেন ?'

'আপনাকে নয়— ।'

এতোখানি ব্যবধান নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা হাঁটে না । সেটা নিশ্চিত হয়ে কণার কাছাকাছি রাস্তায় উঠে এলো শিশির । আড়ে তাকিয়ে দেখল ব্যস্ততা আড়াল করে দ্রুত হাঁটবার চেষ্টা করছে কণা । আজ সারা দিনই তবে তাকে অন্ধকারের মধ্যে দেখেছিল সে ! এখন, একটু এগিয়েই ট্রামে কি বাসে তুলে দিতে পারবে । তারপর, সে কোথায়— !

॥ তিন ॥

তোদের এই ডায়লগ-টায়লগের ব্যাপারগুলো, অতনু, আমি ঠিক বুঝি না । আসেও না ! এইমাত্র একটি মেয়ের সঙ্গে—থুড়ি, যুবতীর সঙ্গে, যথাযোগ্য পরিবেশে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম আমি । কী কথা ! ছেঁড়া-ছেঁড়া—সাত-ফাটা তোয়ালেয় লজ্জা ঢাকার মতো, ফ্র্যাঙ্কলি, সে-সব কথা নিয়ে যায় না কোথাও । আধো-আধো, বাধো-বাধো, নিজেকেই মনে হচ্ছিল ন্যাকা ! পলা ঠিকই বলেছিল, শালা বউ যেন আর কারও মরে না ! এর চেয়ে বেশি স্ফূর্তি বোধ করা যায় ল্যাভাটরিতে ঢুকে, চমৎকারভাবে নিজেকে খুলে দিয়ে—হাঃ, হাঃ, হুঃ !

তোকে তো বলেছি সেই গল্পটা । সেই যে স্যাণ্ডহ্যামে বোনাস নিয়ে ঝামেলা হলো ও ঘেরাও হলাম আমরা ! টানা চার ঘন্টার পর নিতান্তই জৈবিক প্রয়োজনে যখন ল্যাভাটরির দিকে এগোচ্ছি, টের পেয়ে লোকগুলো আবার ছেঁকে ধরল আমাকে । ওই লোকটা, কাল যে অবশ্যই আমার ও কণার মধ্যে শোয়াশুয়ির ব্যাপারটা ছড়াবে—হ্যাঁ, ভাদুড়ী, সেও ছিল । বললাম, মশাই, ঘেরাও তো আমাকে । সকলের সামনে একটা আজেবাজে অসভ্যতা করে ফেললে কি ভালো হবে ! এ-বেচারার ভাবগতি দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো সিমপ্যাথি নেই আপনাদের জন্যে ! আর, তখনই মির্‍্যাক্‌ল ঘটল—লোকগুলো ছেড়ে দিল আমাকে । একজন অবশ্য আওয়াজ দিয়েছিল, 'ভগবান বেচারা তৈরি করেছে আপনাদেরই জন্যে !' যেন পর্বতের উপর হইতে যিশুর উপদেশ, 'করে নিন, করে নিন !' তো, এমনকি এখানেও যেটুকু সত্য আছে, মেয়েটি ও আমার মধ্যে তা ছিল না—সো ডাল ! ক্লান্তি আমাকে ঠেলে

তুলে দিল আবার, যেখানে সব থেকেও কিছু নেই। অথচ. তোদের লেখা-টেখা পড়ে যা মনে হয়, এই বেঁচে থাকা-টাকার পুরো ব্যাপারটাই ঝুলে আছে কথার ওপর ! কথা, কথা, কথা। হ্যালো, মাইক টেস্টিং— হ্যালো ! হ্যালো ! হ্যালো ! আর তার মধ্যে যদি অপরূপ এক যুবতী এসে পড়ে, তা হলে তো কথাই নেই—কথা সেঁটে যাবে কথায়, তাদের যৌথ ক্রীড়া থেকে বেরুনো আঠা থেকে যা জন্ম নেবে তাও এক রকম কথা ; পৃথিবী পুলকিত হবে, এমনকি পাখিরাও ডেকে উঠবে চমৎকৃত গলায়, নেপথ্যে শোনা যেতে পারে ; ফিরে চলো-ও-ও, ফিরে চলো-ও-ও বিছানায় ! বিছানা, মানে রম্ভা—দ্যাট ফ্রেশি উয়োম্যান : আমি ধরেই রেখেছি কোনো দিন খুন করতে হলে তাকেই—, মাংসের প্রবণতা থেকে উত্তেজনা ছাড়া আর কোনো রক্ত যে বের করতে পারে না !

যাক গে, চুলোয় যাক কথা—কথা কে বলবে ! পারবি আমাকে নিয়ে একটা কিছু লিখতে ? দ্যাখ, কেমন প্রেমে পড়ে যাচ্ছি উইডোয়ার কথাটার ! না, শুধু আমাকে নিয়ে নয় ; শ্রীলাও তো ছিল আমার সঙ্গে ! মনে পড়ছে ! মর্গ থেকে বের করে এনে তাকে কীভাবে সাজিয়েছিল রঞ্জনা, তোর বউ ! তখন কি মনে হচ্ছিল না পৃথিবীর সুন্দরতম মেয়েদের মধ্যে শ্রীলা একজন ! অসহ্য সে-রূপ যে তাকে সাজিয়ে তুলল সেও সহ্য করতে পারেনি। চোখে জল নিয়ে—'কনের সাজে সাজিয়ে দিলাম, মনে রেখো।' হ্যাঁ, ওটা রঞ্জনারই কথা। কী বলছিস, মৃতের পাবলিক অ্যাকসেপট্যান্স নেই, লোকে নেবে না ! লোকে কী নেবে ? চিকা-চিকা-বম-বম !

লোকে আমাকেও নেয়নি। কিন্তু, আমি তো জীবিত। কে না কে লিখেছিল কার শোকে নাকি পাথর হয়ে গিয়েছিল কলকাতা। প্রিয়তমা ? অল বোগাস, বুলশিট ! কলকাতা তেমনই আছে—যেমন ছিল ; ট্রাম চলছে, বাস চলছে, অসীম ব্যস্ততা নিয়ে অনর্গল ছুটে চলেছে লোকজন। নিয়নে জীবনবীমার বিকল্প নেই কোনো, হোর্ডিং থেকে বিয়াল্লিশ ইঞ্চির প্রলোভন দেখিয়ে ছিটকে আসছে নায়িকা ! একটু আগেই একটা উটকো লোক আমার পা মাড়িয়ে যাবার সময় হেসে গেল অক্লেশে। উঃ, নিশ্চয়ই ঘোড়ার নাল পরে ছিল ; যন্ত্রণাটা চাগিয়ে উঠতেই আমার মনে পড়ে গেল আমি শিশির রে—স্যাণ্ডহ্যামের নাম্বার থ্রি, গাড়ি ছাড়া নড়ি না ; ইচ্ছে হলে একদিন টপ-গিয়ারে যেতে যেতে চাপা দিতে পারি লোকটাকে। কিন্তু, তখনই মনে পড়ল আবার, লোকটা কে ! এক থেকে বিপুল জনতায় হারিয়ে যাবার মতো—তাদের কাউকেই চিনতে পারছি না আমি, তারাও আমাকে— । শিশির রায়, ওরফে আমি, তা হলে কে ! চিনত যে—উৎকণ্ঠ আমার লাগি···তাকে কনের সাজে সাজিয়ে শেষরক্ষা করেছে রঞ্জনা। এখন আমি বাড়ি ফিরব না। চন্দনের কাছে ? সে যে শ্রীলারই অংশ ! ফেরাবে না, মনে পড়াবে। ও, হ্যাঁ, গুহর ওখানে ডিনারের নেমন্তন্ন আছে বটে। 'আসবে না !'

'আসবেন ? ঘর আছে—'

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর মেয়েটিকে বেশ্যা বলে চিনল শিশির। এক হাতেরও বেশি নয় দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে ; আবছায়া বেশি হলে থাম বলে ভ্রম হতে পারত।

ভিজে একশা সারা গা, চুলের গোড়া চুঁইয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে গালে, ভুরুর ভিতর সুড়সুড়ি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জলপোকা। এই দেড় দু' ঘন্টা সময় কি তা হলে বৃষ্টির মধ্যেই ছিল সে ! যদি তাই থেকে থাকে, তা হলে, ভিজেভুজে এই শেডের নিচে কতোক্ষণ ?

ঠিকমতো আন্দাজ করতে না পেরে ঘড়ি দেখল শিশির। জলে ঝাপসা কাঁচে কাঁটাগুলো

ডিঙিয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে পরস্পরকে ; আরো বেশি উদ্যমের দিকে না গিয়ে ভাবল কতো আর হবে ! তখন হাত দিল পকেটে। স্যাঁতসেঁতে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজতেই কাগজের টুকরোয় জুড়ে এলো ঠোঁট—পিঁপড়ের ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসার মতো তামাকের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল ঠোঁটে আর জিবে। বিস্বাদ কাটাতে পুরো হাতের উল্টো পিঠটা ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল সে ; ভিজে সিগারেটটা ফেলে দিল পাশে। এতো বৃষ্টি চারিদিকে—যেন বাঞ্ছিত নয়, হঠাৎ আক্রমণে ভাসিয়ে দিচ্ছে সব। চশমার ঝাপসা কাঁচের ভিতর দিয়ে, দূরে তাকিয়ে ধীরগতি দু' তিনটে ট্রাম চোখে পড়ল ; শৈথিল্যে ভারী দূর-দূর দিয়ে বাসের আলো—মোটরের হর্ন। আশেপাশে কেউ নেই তেমন। মনে পড়ছে, ছিল—ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমেছিল ?

এই বৃষ্টিতে বেরিয়ে কতো দূরে যাবে ! কাল যদি জ্বরে পড়ে—, আছে বহু অ্যানালজেসিক। বাঃ, বেশ তো, এটা কি একটা কবিতার লাইন হতে পারে !

অনন্যোপায়, দ্বিতীয় সিগারেটটি প্রবঞ্চনা করল না।

ভিজে বারুদে তাপ সঞ্চার হতে সময় লাগে। তিনবার ঘষবার পর নুনছাল ওঠার তীব্রতায় আগুন ফস করার সঙ্গে সঙ্গেই হাত প্রশমিত হলো শিশিরের—'আগুনটা দিন তো !' দেখল, প্রায় তার গা ঘেঁসে এসেছে বেশ্যাটা ; একটু আগে ফেলে দেওয়া সিগারেটটা ডান হাতের দু' আঙুলে টিপে ধরেছে ছুঁচলো-করা ঠোঁটের সামনে, আলগা ব্লাউজের ভিতর থেকে বাঁ হাতের খোঁচায় তুলে আনছে শেয়ালের মাথার মতো ধূসর মাংস। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, তার বেশিও হতে পারে—বেশ্যার বয়স নিয়ে কী যেন প্রবাদ আছে একটা ! এই মুহূর্তে, মনে না পড়ার বিড়ম্বনায় কিছুটা হাল্‌কা হয়ে এলো শিশির। শরীরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ধীরেসুস্থে নিজেরটা ধরাল, তারপর কাঠিসুদ্ধ আগুনটা বাড়িয়ে ধরল তার দিকে। সামনে বৃষ্টি। যেন তা পড়ছে অনন্তকাল ধরে—সমানে পড়ে যাচ্ছে। দূরে কাছে কোথাও থেকে-থেকে হর্ন দিচ্ছে ট্যাক্সি ; থেমে যাবার পরেও শব্দটা ফেঁসে থাকে মাথার ভিতরে। সে যতো রাতই হোক না কেন, বেডরুমের আলো নিবত না সহজে।

'কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি ! মা গো, গতর যেন ঝামসে উঠছে—'

বৃষ্টিকে 'বৃষ্টি' বলায়, তুমুল বৃষ্টিকে 'কী বৃষ্টি', সবই তো চাক্ষুষ—এর মধ্যে আলাদা কিছু আছে নাকি ! রম্ভা কি এভাবে বলে ? ভেবে, সাদা ঊরুর ওপর গ্লিসারিনের মতো হাতটা গড়িয়ে আনল শিশির, সিগারেটটা মুঠো করে ধরায় হঠাৎই প্রচুর মজা পেয়ে গেল এবং হাসল, 'অমিয় চক্কোত্তি পড়েছ, সেই যে, কেঁদেও পাবে না তাকে— !' বলল না।

'কী হলো, চলুন ! পাঁচ-দশ যা হয় দেবেন। ট্যাক্সি আছে—'

'কোথায় ?'

'ওই তো—হর্ন দিচ্ছে, শুনছ না !'

ঝটপট নেমে এলো তুমি-তে। ঘুরে দেখানোর ভঙ্গিতে বিদ্যুতের ছটায় ডান চোখের মণির জায়গায় গোলাকার সাদা দেখতে পেল শিশির। এখন, কথা পাকা হবার সম্ভাবনায় শেয়াল আড়াল করতে ব্যস্ত—নাকি ব্লাউজটাই ছেঁড়া ? সিগারেটটা টুক করে ছুঁড়ে দিল জলস্রোতে।

'অ্যাডভান্স নেবে ?'

'মাল খেলে আরো বেশি লাগবে।'

'দেখি—'

হিপ-পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করতে যতো সময় লাগে, তার আগেই শুনল, 'মাল ভালো। ঠকবে না—'

ইউ বেট আই নো হোয়াট ইউ-ওয়ান্ট ! মার্কেটিং ! চমৎকার ! দশ টাকার একটা নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে ইচ্ছে করেই চোখের সাদা এড়িয়ে গেল শিশির। চোয়াল শক্ত করে, 'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। খদ্দের না আসা পর্যন্ত এক পা নড়বে না—', বলতে বলতে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা পেরিয়ে ছুটে গেল ট্যাক্সিটার দিকে।

'পার্ক স্ট্রিট।'

'ও ছোকরি নেই আয়েগি সাব— ?'

'পার্ক স্ট্রিট ! জলদি !'

'জেইসে বোলিয়ে আপ।'

চাবি ঘোরাতে বাঁজা শব্দ তুলে থরথর করে কেঁপে উঠল গাড়িটা। একবার, দু'বার, তিনবার—ডিস্ট্রিবিউটরে জল ঢুকেছে হয়তো। ওপর দিকে শ্বাস টানতেই ঘড় ঘড় শব্দ হলো। যার শোক নেই, স্মৃতি নেই কোনো, মুখের আদলের চেয়ে নোটের জলছাপে তার প্রয়োজন বেশি। বৃষ্টিহীন শেডের নিচে কাল যদি একইভাবে এসে দাঁড়াই, আমাকে কি চিনে নেবে !

ওয়াইপার সক্রিয়, তবু গলে যাচ্ছে কলকাতা। তুমি মোর পাও নাই পাও না-ই-ই পরিচয়—যা শুনেছে তা কি গান, না কি শুধুই মনে হওয়া ! বৃষ্টি থেকে বৃষ্টিতে চৌচির কপাল ; এ-বয়সে এমন দুদ্দাড় করে ভেজা প্রায়-জ্বর নিয়ে ত্রিশূলের ভঙ্গিতে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে রগের দু' পাশ থেকে মাথার ঠিক মধ্যিখানে, পুরু বিনুনির মতো তারপর নেমে যাচ্ছে ঘাড়ের পিছনে। পার্ক স্ট্রিট কতো আর দূর ! তবু, ভালো হয় যদি অনেক ঘুরে ঘুরে পৌঁছুনো যায় সেখানে। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, আবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ভারী মাথাটা ঘোরাতে ঘোরাতে শিশির ভাবল, নিজেকে ফোর্স কোরো না—এই বৃষ্টিতে গুহরা নিশ্চয়ই আর অপেক্ষা করবে না। ভদ্রতা ? লয়ালটি ? রম্ভার স্পেশাল ডিশ ? বাড়িতে তিনবার ফোন ? হু কেয়ারস্ ! এখন আমি ঘুমুবো।

গোটা শরীরটাকে দু' হাতের সমস্ত জোর দিয়ে তুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল শিশির। গন্ধ তার শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ; হাতটা টেনে আনল কপালে।

'ম্যারেড-টু-অফিস, ম্যারেড-টু-ওয়ার্ক, ম্যারেড-টু-কেরিয়ার ! পনেরোটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল, শ্রীলা, টেরই পেলুম না কিছু !'

'আর যা যা পেয়েছ তা তোমায় টের পাওয়ায় না কিছু !'

'আর যা—', মনে করার ধরনে সময় নিল শিশির, 'জানি না। পোশাকটা যেন গায়ের মাপের চেয়ে বড়ো হয়ে যাচ্ছে ! মাঝে মাঝে এতো হেলপ্‌লেস্ লাগে— !'

সম্ভবত আরো কিছু বলার ছিল, বলতও। শ্রীলাই থামিয়ে দিল।

'যারা তোমার পকেটে হেয়ারপিন গুঁজে দেয়, তারা তোমার শরীরের খোঁজ নেয় না কেন, শিশির !'

তার মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে—সেদিন—শ্রীলা কি নিজেকেই খুঁজেছিল ! ব্যস্ততাহীন বলার ধরন, উত্তরও চায়নি কোনো। নীল এমালসান কোটিং জুড়ে শব্দগুলোকে তবু আলাদা করে চিনতে পারছিল শিশির ; নিরপেক্ষ বলেই যেন তাদের ধার বেশি !

'হাঁ, পার্ক স্ট্রিট। আব বোলিয়ে—'

জবাব দেবার আগে আরো একটু এগিয়ে যাবার সুযোগ নিল শিশির।

'ব্যস, ব্যস—এইখানে—'

বেরিয়ে মনে হলো বৃষ্টি যেন কমেছে একটু। এরই মধ্যে দু' চারজন নেমে পড়েছে রাস্তায়। ভাড়া মেটাবার আগেই একজোড়া যুবক-যুবতী প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার গায়ে।

তীব্র এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'ছাড়ছেন ?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'উয়ো, লাভলি— !' তর না-সওয়া, বাহুতে স্পর্শ দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীন যুবতী গলে গেল ভিতরে, যুবকটি অপেক্ষা করছে শিশিরের সরে যাবার ; যুবতী চেঁচিয়ে বলল, 'বাজিটা কিন্তু আমি জিতেছি। এখন দেব না বললে চলবে না !'

'আমারও একটা পাওনা আছে—'

আড়ে যুবকটির অধৈর্য মুখের দিকে তাকিয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় শিশির বলল, 'উঠুন।'

খোদল পেরুবার মুখে কিছু কাদাজল ছিটকে এলো গায়ে। ঝাপসা কাচের আড়ালে দুটি মাথা চিনে নিচ্ছে পরস্পরকে। এখানে না নেমে যদি সে চলে যেত ক্লাবের দিকে, কিংবা অন্য কোথাও, কিংবা চন্দনকে দেখতে— ? তা হলে ট্যাক্সিটা থামত না এখানে। পরেরটা ? তখন কে জিতত ! যেই জিতুক, তা হলেও লেনদেন হতো—একইভাবে দু'টি মাথা চিনে নিত পরস্পরকে। যদি শ্রীলা না করে সে করত, যদি—

ঘষা কাচের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে নিষ্প্রভ আলোয় চোখ সওয়াতে সময় লাগল একটু। লোকজন তেমন বেশি নেই, হয়তো বৃষ্টির জন্যে, ফাঁকা। ঠিক কোনখানে বসবে ভাবতে ভাবতে ওয়েটারই ডেকে নিল তাকে, কোণের দিকে। আঃ ! যদি—, কাঁচের ওদিকে পরপর সাজানো মৃতদেহগুলির মধ্যে থেকে কে সনাক্ত করত তাকে ? শ্রীলা নিশ্চয়ই আসত না ; চন্দন ? না। অর্জুন ? হতে পারে, নাও হতে পারে। অতনু ? গুহ ? রম্ভা ?

'হুইস্কি—'

'উইথ সোডা, স্যার ?'

'উইথ ওয়াটার—সাম আইস—'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার—'

স্থান পরিবর্তনের প্রশ্নই এখানে ওঠে না ; কেন না, শ্রীলার মতো, চন্দন ও তার মধ্যে পারাপার করত না সে। সুতরাং, জায়গাটা নির্দিষ্ট। দৈবাৎ যদি শ্রীলা তার পাশেই শুতো, তা হলে, ঠিক কোন সময় সে আবিষ্কার করত শিশিরকে ? ঘুমোলে বোঝা যায় না, কিন্তু ইদানীং তার, শ্রীলার, শোবার ধরনেও কি নিরপেক্ষতা পৌঁছয়নি কিছুটা ! অন্তত বিয়ের পর থেকে চন্দন না-হওয়া পর্যন্ত যা করত—জামার বোতামগুলো খুলে, নিজের মাথা-মুখের মাপে বুকের চামড়া দখল করে ঠোঁট-নাক-চোখ ছুঁইয়ে রাখা সেখানে—'এতো সেফ্ লাগে !' তা হলে, যতোই গভীর হোক, কোনো-না-কোনো সময়ে ঠাণ্ডা বুক ও শুকনো ঘাসের মতো লোমগুলো জাগিয়ে তুলত তাকে। তারপর ? তারপর ?

'আ-রে !' অন্য দিকে যেতে যেতেও লোকটা চলে এলো তার কাছে, 'রায় সাহেব না !'

'কী খবর !' এক চুমুকে যতোটা গিললে লোমগুলো ঘাসের মতো হয়ে ওঠে, প্রায় ততোটাই গলায় ঢেলে নিল শিশির। বাস্টার্ড !

চেয়ার টেনে বসে পড়ল লোকটা।

'চিনতে পারছেন তো ? আমি গণেশ দত্ত। সেবার পারচেজ অর্ডার—'

'ক'টা বাজে ?'

কায়দা করে কব্জি নাকের সামনে টেনে নিল গণেশ দত্ত।

'সাড়ে ন'টা—। যদি কিছু মনে না করেন—'

'দাঁড়ান। একটা ফোন করতে হবে।'

উঠে, দ্রুত ক্যাশ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল শিশির। কাউন্টারে কনুই পেতে, ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়ে, চোখ রাখল গণেশ দত্তর ওপর।

'ক্যান আই ইউজ দ্য টেলিফোন ?'

'ইয়েস, প্লিজ !'

কিন্তু, কাকে ? চন্দন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েনি এখনো। তাকে ডেকে বলতে পারে—কী বলেছিলাম, মনে আছে ? আমি আসছি, তুমি জেগে থেকো। যদি অর্জুন ধরে—, না।

পিছন ফিরে তাকে দেখে নিল গণেশ দত্ত। ল্যাভাটরি থেকে বেরিয়ে ফ্লাই-বাটন আঁটতে আঁটতে রোগা, বেঁটে, অল্পচুল একটা লোক এখন তার পাশে গিয়ে বসছে। বসে, আবার উঠে পড়ল এবং—হোয়াট এ ফান ! ট্রাউজার্সের দু' পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে, পা ফাঁক করে কোমরটা নিচের দিকে নামাতে লাগল ক্রমশ, যাতে মোটামুটি একটা স্প্যাট্যুলার আকার নেয় এবং তারপর—প্রথমে ডান পা,পরে বাঁ পা, তারপর আবার ডান পা নেড়ে কিছু একটা করবার চেষ্টা করল, যাতে মনে হতে পারে ফ্লাই-বাটনগুলো ঠিকঠাক আঁটতে পারেনি। কিংবা, এমনও হতে পারে, যে-কাজে লোকটা ল্যাভাটরিতে ঢুকেছিল তা পুরোপুরি করবার আগেই বেরিয়ে এসেছে—ভয়ে কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাবে, অসমাপ্ত, সেই প্রক্রিয়াই এখনো তাকে ট্রাবল দিয়ে যাচ্ছে দস্তুরমতো। এই ধরনের লোকেরা সাধারণত ভয় পায় স্ত্রীকে, বিশেষত কিছু করার আগে, কেন না তার আগেই অস্বস্তি শুরু হয়ে যায় কোমরে ও তলপেটে। হাঃ, হাঃ, হাঃ। সেই বেশ্যাটার হাতে একে ছেড়ে দিলে হতো ! যেমন গুহসাহেব—! কিন্তু কাঁপুনি থামিয়ে গণেশ দত্তর সঙ্গে লোকটা তার টেবিলেই বা বসছে কেন ! যেহেতু বারও বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা নয় ! ইউ বাস্টার্ডস ! আমি শুধু তোমাদের মুখ চিনি বা আদৌ চিনি না—একটু একা থাকতে চাই, একা ; উফ্ !

টেলিফোন ব্যবহারের অনুমতি চেয়েও তেমন স্বাভাবিক হতে পারল না শিশির। চন্দনকে ডাকা যাবে না। কারণ চন্দন নিজে তো আর টেলিফোন ধরবে না ! ধরলে অর্জুন কিংবা পলা—রাবিশ ! দেখছি, শ্রীলার ব্যাপারটা নিয়ে ওরা দু'জনেই ভাবছে দু' রকম করে ; যেমন, 'তোমাকে বলতে হবে শ্রীলা স্যুইসাইড করল কেন ?' এবং গেছে গেছে বাঁচা গেছে—'বউ যেন আর কারও মরে না !' হয়তো মরে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, এবং যারা মরে তাদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনাও কম নয়। আসলে মৃত্যুটাই কথা। যদি এমন হতো, শ্রীলা কন্‌সিভ করত আবার—সে তো চেয়েইছিল, অপরূপ স্নিগ্ধতায় নিজেকে আলজিভ পর্যন্ত বিস্তৃত করে, বারবার ; এবং মারা যেত প্রসব করতে গিয়ে, সেটাও কি মৃত্যু হতো না ! তবে ? তা হলে ! বাট, আমাকে বিশ্বাস করো, শ্রীলা—তোমার অভূমিষ্ঠ শিশুর মাথায় হাত রেখে বলছি, তুমি যাও—তুমি চলে যাও আমি তা একবারও চাইনি, কোনো দিন চাইনি ! আর একটা সুযোগ পেলে আমি তা বোঝাতে পারতাম। আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলো, বা আর যা ইচ্ছে—শিশির রে মিথ্যে, আমার পাঁচ হাজার আর পার্কস মিথ্যে ; দ্যাখো,

তুমি আমার কী করেছ ! পৃথিবী-জোড়া সব টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ ; পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকে আমি রেপ করব— ; কেন তুমি সেদিন এসেও ফিরে গিয়েছিলে—কোন-সে-বিশেষ কথা তোমার ছিল আমার সঙ্গে, কেন বারণ করেছিলে তাকে—ওই হ্যাংলা মেয়েটাকে, আমার দয়া ছাড়া যে বাঁচত না ! কেন ! কেন !

আকস্মিকভাবে ঢেঁড়া পেটানোর মতো মুষ্টিবদ্ধ তার হাতটা কাউন্টারের ওপর পড়তেই রিসিভার দুলে উঠল, কাউন্টারের লোকটিও ।

'কী হলো, স্যার !'

'সরি । ভেরি সরি ইনডিড । একটা নাম্বার মনে করবার চেষ্টা করছি, পারছি না—'

'ডিরেক্টরি চাই ?'

হ্যাঁ বা না, না-শুনেই কাউন্টারের তলা থেকে ডিরেক্টরিটা বের করে দিল লোকটা । 'জি' ফর গুহ, নাম্বারটা চট করে মনে এসে গেল শিশিরের, ৪৪—, তবু, এই মুহূর্তে লজ্জিত তার পাতা ওল্টানোর দরকার ছিল । একবার নিজের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখল লোকদুটো বসে আছে তখনো—গণেশ দত্ত, আর সেই স্প্যাট্যুলা । ঝিমুনো আলো । গ্লাস তুলল হাতে । তারটা নয় তো ! পারচেজ অর্ডারের কথা কী যেন বলছিল তখন ? বস্তুত, এই লোকগুলি কারা ! ওই গণেশ দত্ত লোকটাকে দেখেছে বলে মনে হচ্ছে আগে, কোন সূত্রে ? বাজে কোনো মতলব নেই তো ! না, এখন আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না । মানে তো ঠকা, মানে তো—

রিং হচ্ছে । অপেক্ষা । 'হ্যালো—', রম্ভার গলা । খানিক আগে সিপ-করা হুইস্কির ডেলাটা গলায় আটকে যেতেই খুব মজা পেল শিশির ; 'হ্যালো—হ্যালো—হু ইজ ইট ? —হ্যালো— ।' রেসপণ্ড করল না । ওদিকে লাইন ছেড়ে দিতে কাউন্টারের লোকটির দিকে তাকিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল শিশির । অকারণ, তবু কেঁচো হেসে বলল, 'এনগেজড ।' তারপর রিসিভারটা আবার তুলে নিয়ে আঙুল রাখল ডায়ালে । ৪৪—, রিং হচ্ছে । 'হ্যালো—', এবার রম্ভা । একেবারে অন্য রকম গলায় জবাব দিল শিশির, 'হ্যালো—', তারপর একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে—যাতে লোকটি আড়াল হয়ে যায়, স্পিকিং এণ্ড-এ ফুঁ দিল সজোরে । 'এ কী !' রম্ভার গলা, 'হ্যালো—হ্যালো— !' শুনে, আবার ফুঁ দিল, শিসের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তার ঠোঁট দিয়ে । 'হ্যালো—', রম্ভার গলা, 'কে আপনি ! হ্যালো, কী চান !' উত্তর না দিয়ে ফুঁ-টাকে চক্রাকারে ঘোরাতে লাগল শিশির । 'মাই গুডনেস !' ওদিকে রম্ভা, 'উইল ইউ স্পিক্ আউট ! কতো নম্বর চান আপনি ? —হ্যালো, কী চান !' মনে মনে খুব একচোট হেসে নিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখার আগে মনে মনে শিশির বলল, 'আই ওয়ান্ট ইওর ব্লাড— । তোমার রক্ত !' তারপর নামিয়ে রাখল ।

উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসবার জায়গা করে দিল গণেশ দত্ত । হাসল শব্দহীন হ্যা-হ্যা করে । গ্লাসটা, যা ভেবেছিল, সত্যিই খালি । আশ্চর্য তো !

বিরক্তভাবে তাকাতে কাচুমাচু হলো গণেশ ।

'ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল, তাই খেয়ে ফেললুম । ফ্রেশ স্কচের অর্ডার দিয়েছি—', বলে তির্যক ভঙ্গিতে ঘুরে বসল, 'ব্যারা—ব্যারা—'

'থাক । চ্যাঁচাবার দরকার নেই । আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ । আমি এখন উঠব ।'

খপ্ করে ওর একটা হাত চেপে ধরল গণেশ, ঈষৎ জড়ানো গলায় বলল, 'আপন গড্ স্যার, এ-রকম করবেন না । জীবনে আর কারুর এঁটো খাইনি—আপনার বলেই হেজিটেট

করলাম না। পারচেজ ম্যানেজার বলেছিল—শিশির রে, বাপ্‌স ! এই তো—ব্যারা—'

লোকটা কে ? হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে শিথিল আঙুলে তবলার বোল তুলছে, রোগা বেঁটে অল্পচুল পাশের লোকটা ? এরা কি জানে আমি কে ? এরা কি জানে আমি কী— ? এরা কি জানে মৃত্যু কী, বা, যাকে এই স্তাবকতা সে শিশির রে নয় ? কী বললেন, চিয়ার্স ! খ্যামটা নাচে ঘোমটা কেন ? ও-কে, ও-কে। আমার চেয়ে বেশি স্কচ নিশ্চয়ই আপনারা খাননি !

লোক দু'টির নগ্নতা থেকে নিজেকে বের করে এনে হিপনোটাইজ করার ধরনে খানিক তাকিয়ে থাকল শিশির। কিংবা, ক্ষণিক বিভ্রান্তির পর—এইভাবে—আবার ফিরে এলো ঘটনার ধারাবাহিকতায়। তারপর শক্ত হাতে গ্লাসটা ধরে এক চুমুকে পুরো হুইস্কিটাই ঢেলে নিল গলায়।

'সাবাস !' লং জাম্পের দর্শকের মতো গণেশ দত্ত বলল, 'এক চুমুকে। ভাবা যায় না।'

'লোকটা কে ?' অল্পচুলের কপালের মাঝখানে আঙুল দেখিয়ে গণেশ দত্তের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল শিশির।

'আমার বন্ধু, শতদল পাকড়াশী।'

'সলিসিটার !'

'না না, সে-সব কিছু নয়। স্মল এন্টারপেনার, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে নিজে ব্যবসা করছে। ওই-ই মাল খাওয়াচ্ছে—'

'সে-জন্যে নয়।' টানা সোফার দু' দিকে দু' হাত ছড়ানো, ভেজা পোশাক আর হুইস্কির তাপ এক ধরনের জেদ আনছে শরীরে। এতোক্ষণের সমস্ত কথাবার্তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল শিশির। তারপর অলসভাবে ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আই হেট পাকড়াশীজ—'

'এ কী ! এসব কী বলছেন !' ভ্যাবাচাকা খেয়ে গণেশ দত্ত বলল, 'এ তো অত্যন্ত অপমানজনক কথা !'

কথাগুলোয় আমল দিল না শিশির। পেটে মদ পড়লে যে-কেউই বেসুরো বাজে ; গপ্পো উপন্যাসে বা সিনেমায় যে-ধরনের আলাপ হয়, এখানেও তার চেয়ে আলাদা কিছু কি ? শ্রীলা বলত, মাধ্যাকর্ষণ ; মাতালের ভিড় থেকে আলাদা করে নিয়ে সৃষ্টি করত আর-এক মাতাল। কী যেন কথাটা, ক্ষমার্হ ? তো, পাকড়াশী যখন ফ্ল্যাটটার কথা তুলল, তখন নিশ্চিত মাতাল ছিল না ; ক্ষমার্হ ! ওয়েল, মিস্টার পাকড়াশী, স্যাণ্ডহ্যামের সিক্রেট আপনি জেনে থাকতে পারেন, সম্ভবত জানেন না স্যাণ্ডহ্যামের সিক্রেটই শিশির রায়ের সিক্রেট নয়। আমি কাজ ও বুদ্ধি বিক্রি করি—আমার প্রফেসানাল জ্ঞানগম্যির অনেকটা। নিজেকে নয়। নেভার। তা হলে দেখছেন, স্যাণ্ডহ্যাম আর আমি একই অস্তিত্ব নই ! কিংবা ধরুন, এই যে লোকটা—গণেশ দত্ত, এতোক্ষণ ধরে বকর-বকর-বকর-বকর করে যাচ্ছে এবং সঙ্গে ধরে এনেছে এক বশংবদ 'এন্টারপেনার'-কে—আমার এঁটো চাখলেও এবং আমাকে 'মাল' খাওয়াবার সুযোগ নিলেও আসলে তার সমস্ত তদ্বিরই স্যাণ্ডহ্যামকে। কাল যদি হার্টলে আমার পেছনে জুতোসুদ্ধ লাথি কষায় একটা, তা হলে লোকটা কি মলম নিয়ে ছুটে আসবে, না স্যাণ্ডহ্যামের খাতিরে—পারচেজ অর্ডার সেফ রাখার জন্যে, ব্যস্ত হবে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে ! তা হলে দেখছেন, আমি কে ? একজন, যে-কোনো একজন। লাশকাটা ঘরের কাঁচের আড়ালের মধ্যে আরো পাঁচ-দশটার সঙ্গে ন্যাংটো করে শুইয়ে দিলে

আপনিও সনাক্ত করতে পারবেন না। কিন্তু ঘটনাটা হলো, স্যাণ্ডহ্যামের সূত্রে যেহেতু আপনি আমাকে চেনেন, সুতরাং অনায়াসে শ্রীলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে হলো ফ্ল্যাটটায় আমার দরকার নেই আর, কারণ আপনার ছোট শালার একটা ফ্ল্যাটের দরকার। সুতরাং, জানলা-দরজার পর্দাগুলো যে তারই চোখ ও হাতে তৈরি, আলনায় ও ওয়াড্রোবে যে এখনো জড়িয়ে আছে তার গন্ধ, বা বেডরুমের দেওয়ালে আমাদের বিয়ের ছবিটাই তার হাতে টাঙানো—ঠিক জায়গা মতো, এবং ওই ফ্ল্যাটের মেঝেতেই যে বারবার ছুঁয়ে গেছে তার গোড়ালি, এবং থাকা ও না-থাকার সন্ধিতে দাঁড়িয়ে ওই ফ্ল্যাটের দেওয়ালেই যে চোখ রেখেছিল শ্রীলা—বড়ো যত্নে সাজানো তার সংসারের দিকে, এসব—এই সমস্ত—একবারও মাথায় আসেনি আপনার ! ফ্রাঙ্কলি, আপনি একটা ডিল করতে চাইলেন, একটা শর্ত—যার শুরু ও শেষ শ্রীলার মৃত্যুতে। তা হলে আপনি নিশ্চিত যে শ্রীলা মারা গেছে ? বেশ। আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে, আপনার শালার সঙ্গেও। এতো আগ্রহ ! আহা, আমি কেন আপনার ছোট শালা হলাম না ! এ-রকম উপকারী একটা ভগিনীপতি থাকলে কে না বর্তে যায় !

ফাঁকা গ্লাসে জমে গেল আর-একটা বিল। গণেশ দত্ত বা শতদল সম্ভবত এখন আর সিরিয়াসলি নিচ্ছে না তাকে। নিলে আর এক প্রস্তের কথা ভাবত না। লোকটা ভীতু ও নার্ভাস, হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে মাঝে মাঝেই তাকিয়ে নিচ্ছে তার দিকে ; সম্ভবত এখনো আটকে আছে পাকড়াশীতে এবং বিব্রত হচ্ছে নিজের পদবী নিয়ে। হোক। দোষী হও বা না হও ভুগতে তোমাকে হবেই। কারণ তুমি পাকড়াশী ; যেমন, আমি—শিশির রায়। সনাক্তকরণ হয়ে গেছে—যে-কোনো একজন থেকে নির্দিষ্ট একজন। যেমন শ্রীলা আর আমি—স্বামী ও স্ত্রী। লোকে জানত। ফ্লাই-বাটন নিয়ে যতোই অস্বস্তিতে থাকো তুমি, শ্রীলার মৃত্যুর জন্যে নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে হ্যারাস করেনি ! বোধ হয় এই একটি কারণেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিতে পারো।

তার অন্যমনস্কতার ফাঁকে টুকটাক মুখে বাদাম তুলছে শতদল। তার ও শতদলের মাঝখানে গণেশ দত্ত। ঘাবড়ানো ভাব থেকে নিজেকে তুলতে পারেনি এখনো—হয়তো ভাবছে বিজনেস আগে না অপমানবোধ। সে—বা তাকে নিয়ে যা-কিছু—আগে, না শ্রীলা ! ব্যাপারটা গোলমেলে এবং মীমাংসা নির্ভর করছে কে কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কে কীভাবে ভাবছে, তার ওপর। বোগাস ! পারা যায় না নিজের গলাটা দু'হাতে টিপে ধরে সব ভাবনার শেষ করে দিতে ! শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী ? একটি মৃত্যুই তো ! হঠাৎ রাস্তা পেরুতে গিয়ে গাড়ি চাপা-পড়া কুকুর, চটির আঘাতে ঠ্যাঙ-তোলা আরশোলা, ইলেকট্রিকের তারে ফেঁসে-যাওয়া কাক—গতকাল সন্ধ্যায় মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে ; পুলিস এটাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে সন্দেহ করছেন ! মৃত্যু ! অসুবিধে করছে ওই নামটা আর পরিচয়টা। তবু, যদি সে মৃত্যুই ভেবে থাকে—আমারই [illegible] বয়ে যাবে না কেন !

কৌতুকের চোখে শতদলের দিকে তাকাল শিশির।

'কিসের ব্যবসা ?'

গণেশ জবাব দেবার আগেই শতদল নিজেকে ফিরে পেল।

'গেঞ্জি আর জাঙিয়ার।'

'শতদল ব্র্যাণ্ড ?'

'ন্-না। পদ্মছাপ—'

'শতদল মানেও তো পদ্ম, তাই না!'

চোখ ছোট করে তাকাল শতদল পাকড়াশী ; কিঁক্-কিঁক্, একটা অদ্ভুত শব্দ বের করল মুখ দিয়ে। শিশির ভেবেছিল শ্বাসনালীতে বাদামের টুকরো আটকে গেছে, পরে বুঝল হাসছে। ঝুঁকে, নাক টেনে নিল একবার। লোকটি বিনীত। হেঁচকির মতো শব্দটা জিইয়ে রেখে গ্লাসটা তুলে নিল হাতে।

অল্প অল্প দুলছে গণেশ দত্ত। আবছায়াতেও চোখের ঘনভাব দৃষ্টি এড়ায় না। তবে মনোযোগী। ঝানুও। শতদল যেখানে থামল সেইখান থেকে তুলে নিল কথাগুলো।

'ওর বউয়ের নাম পদ্মা। সেই থেকে পদ্মছাপ।'

সেকেণ্ড রাউণ্ডটাও শেষ হয়ে এলো প্রায়। নাকি থার্ড রাউণ্ড! কোথাও কি যাবে ভেবেছিল! চন্দনের কাছে? ওঃ, চন্দন, তুই না থাকলে আজ সময়ও থাকত না! গ্লাসে যতোটা আছে সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শিশির। গণেশ দত্ত ছটফট করছে, হয় ল্যাভাটরিতে যাবে, না হয় এক্ষুনি 'ব্যারা' 'ব্যারা' করে চেঁচিয়ে উঠবে। অভ্যাস থেকে মাল জড়িয়ে যায় কোনো কোনো লোকের গলায়। মাল! ভালো! ঠকবেন না! এতোক্ষণে মনে পড়ল বৃষ্টি পড়ছিল ; পোশাকের সোঁদা লেপ্‌টে গেছে শরীরে। ঘষা কাঁচের বাইরে কিছুই প্রতীয়মান নয়। মনে হয় থেমে গেছে, অজ্ঞাতে, না হলে একটানা ঝিমঝিম কানে আসত। যে-রকম থামে ; ঘুম ও আচ্ছন্নতার মধ্যে—যে-রকম ভোরে উঠে দেখা যায়, নেই!

হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন, বউয়ের নাম পদ্মা? ফ্লাই-বাটনের বউ, তাই তো? আমার ধারণা, নামের শেষে যাদের আ-কার যুক্ত থাকে, তারা খুব তাড়াতাড়ি—, যাক্‌গে।

গড়ানো পেট নিয়ে ভরা চেহারার এক যুবতী হেঁটে গেল শিশিরের সামনে দিয়ে।

'বুঝেছি।' হেসে বলল, 'আকারই যদি বাদ যায় তা হলে বউয়ের আর থাকল কী!'

'অ্যাঁঃ!' আঁতকে উঠে শতদলের গায়ে ঠেলা দিল গণেশ দত্ত। ডান হাতে বাদামের টুকরো, মুখে তুলতে গিয়েও গ্লাসসুদ্ধ বাঁ হাতটা শিশিরের দিকে তুলে দিয়ে কিঁক্-কিঁক্ হাসিতে সারা অঙ্গ কাঁপিয়ে তুলল শতদল ; হাসিটা সংযত করে বলল, 'গণেশ, দ্যাখ, স্যারের ন্-নেশা হয়েছে।'

ইন্‌টলারেবল্! অসহ্য! হাসতে গেলে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, এরা কারা!

শিশির উঠে পড়ল। ওয়ালেট থেকে একটা বড়ো নোট বের করে বিলের গ্লাসে গুঁজতে যাচ্ছে, হা-হা করে উঠল গণেশ দত্ত।

'অ্যাঁ, এ কী হচ্ছে রায়সাহেব! বললুম না শতদল খাওয়াচ্ছে—'

'আমি রায়সাহেব নই। ভুল লোককে খাইয়ে লাভ কী!'

'বলেন কী!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গণেশ দত্ত, 'ঠাট্টা! আপনি শিশির রায় নন!'

গণেশের ঘোলাটে চোখে অস্বস্তি। চেয়ারে পিঠ ধরে দুলতে দুলতে মুখটা এগিয়ে আনল কাছে, 'গণেশ দত্তর হিসেবে পাই পয়সার ভুল হয় না। আলবাত শিশির রায় আপনি!'

'আমি শিশির রায় নই—'

প্রতিটি কথার পর কিঁক্-কিঁক্ হাসিতে ফেঁপে উঠছে ফ্লাই-বাটন। ঘটনায় ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো, বিরাম নেই টুকটাক মুখ চালানোয়। ওর পিঠে আল্‌গা হাত ছুঁইয়ে শিশির বলল, 'চলি হে পদ্মছাপ। দেখা হবে—'

বৃষ্টি নেই। ফুটপাথে ছড়িয়ে আছে জের তার। পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট

কিনল শিশির। চুন-লাগা টাইমপিসে সাড়ে দশটা। সময় চলে যাচ্ছে। তুই না থাকলে সময়ও থাকত না। তোকে জড়িয়ে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করে গেছে এতো দিন ; তা না হলে তোকেও সঙ্গে নিতে পারত ! পুলিসে সিজ্ করার আগে, আমি তো দেখেছি, তীব্র নীলের শুদ্ধতা নিয়ে আরো কয়েকটা থেকে গেছে শিশিতে। আমার জন্যে ! না। সাত বছর আগে একদিন—অনেক বেশি রাতে—গয়নার বাক্স খোলার মতো, সাবধানে, সে তার পেট খুলে দেখিয়েছিল আমাকে ; সেখানে কান পেতে আমি শুনেছিলাম তোর নড়াচড়ার শব্দ। তারপর ? তারপর—

'ট্যাক্সি !'

'কোথায় যাবেন ?'

'নিউ আলিপুর—'

'আসুন—'

পেট্রলের গন্ধ। কলকাতা। কলকাতার গন্ধ। শ্রীলার গন্ধ ! চন্দনের গন্ধ ! ঘুমের গন্ধ—

'ও বাবা ! বলো না, তারপর কী হলো ?'

'তারপর ? বলছি—। সবই বলব। আমার সব মনে আছে—'

'তারপর যেতে-যেতে-যেতে-যেতে অনেক ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে জাহাজটা একদিন তীরে এসে পৌঁছুল। তখনো ভোর হয়নি ভালো করে, কালিঝুলি মাখা অন্ধকারে ঝিঝি ডেকে যাচ্ছে একটানা। কখনো-সখনো একটা দুটো পাখি। সেই নিঝুম থতমত অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আমি দেখছি খুব দূর দিয়ে এগিয়ে আসছে জাহাজটা, ভীষণ গর্জন তুলে এক-একটা ঢেউ ঝাপ্টা দিচ্ছে তার গায়ে—ভয়ে টাল-মাটাল হতে হতে তবু সে ঠিক এসে গেল। তার খোল থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল সাত রাজার ধন এক মানিককে। অতো দূর থেকে অতো ঝড়ঝাপ্টা পেরিয়ে আসার ক্লান্তি কি কম ! নোঙরে এসে সে তখন ধুঁকছে। ওরই মধ্যে ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরল সে। দেখলাম তার চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। হেসে বলল, বড়ো কষ্ট ! বড়ো আনন্দ—'

'দুর ! এটা বানানো গল্প ! জাহাজের আবার হাত থাকে নাকি ?'

'থাকে। বড়ো হও, বুঝতে পারবে—'

'কী ব্যাপার ! এতো রাতে !'

খোলা দরজা জুড়ে অর্জুন দাঁড়িয়ে। পরনে পাজামা, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। দেখে মনে হয় বিছানা থেকে উঠে এলো।

'এলাম।' স্বরের জড়তা কাটিয়ে শিশির বলল, 'চন্দন কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?'

'শুধু চন্দন নয়, সবাই। একটা শিশু জেগে থাকবে এতোক্ষণ, হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট ?'

শীতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শরীর। কাঁপুনি এড়িয়ে চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিল শিশির। সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, 'চোর নই, ডাকাত নই—তুমি এ-রকম ব্যবহার করছ কেন, অর্জুন ! আমি ক্লান্ত। আমাকে ঢুকতে দাও, বসতে বলো—'

'সেটা মদের গন্ধেই বুঝতে পারছি—'

আরো কিছু বলত কি অর্জুন ? হয়তো, হয়তো নয়। ইতিমধ্যে প্রমীলা এসে পড়ল। অল্প খটকা লাগল শিশিরের। পলাই দরজা খুলবে—সে কি ভেবেছিল ?

'এ কী ! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, শিশিরদা ! ভিতরে আসুন !'

'তোমার দাদার সঙ্গে গল্প করছিলাম।' শিশির হাসল, ঠিক এই মুহূর্তে যে-রকম দরকার, 'চন্দন কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'খানিক আগে ঘুমুলো। আর কতোক্ষণ জাগবে বলুন!'

'জানি না।' জনান্তিকে কথাটা ফেলে দিল শিশির। জানি না। সারা দিন, সারা রাত, হয়তো সারা জীবন।

দরজায় খিল তুলে দিচ্ছে পলা। যেতে যেতে অর্জুন বলল, 'ওকে নিয়ে যা। কফি-টফি খায় তো করে দে। মাকে এখন আর জাগাস না—'

ও? কে? অর্জুনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে খলবলে হাসিতে বুক ভরে তুলল শিশির। শরীরের এই শীত, তুমি তার মায়া জানো! অর্জুন, সত্যিই তো—আমি কে!

আলোর স্যুইচের দিকে হাত বাড়িয়েও কী ভেবে থেমে গেল পলা। এক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে ধরা গলায় বলল, 'আসুন—'

দরজা। বারান্দা। দরজা। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল শিশির। বিছানায় চন্দন। তারপর এগিয়ে গেল। ঘুমন্ত শরীরের দু'দিকে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে এলো চন্দনের মুখের ওপর। অবিকল সেই মুখ, খোপ থেকে বেরিয়ে এসেও ভঙ্গিটা এড়াতে পারেনি এখনো! নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ওর নিঃশ্বাসে কান পাতল শিশির। অবিকল, সবই অবিকল! শুনেছি মাতৃমুখী ছেলেরা সুখী হয়। তুই কি সুখী, চন্দন?

আস্তে ওর কপালের ওপর দিয়ে হাতটা বুলিয়ে আনল শিশির। তোর দুর্ভাগ্য, তুই আমার ছেলে!

ঘাড়ের ওপর থমকানো নিঃশ্বাস। চোখ তুলতেই বুকের ওপর জামার অনেকটা অংশ খামচে ধরল পলা। একে দূরত্ব বলে না। নিঃশ্বাসটা মুখের ওপর ছড়িয়ে যেতে শিশির ভাবল, সেও একদিন অপেক্ষায় থাকত! 'আপনি ভিজে গেছেন, শিশিরদা'

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়িয়ে শিশির বলল, 'যাই। তোমাদের অসুবিধে করলাম।'

'এর মধ্যেই!' সমান দূরত্ব রেখে কথা বলছে পলা, 'দাদা কফি দিতে বলল, শোনেননি!'

'শুনেছি। সমস্তই শুনি—'

এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় দ্রুত দরজার কাছে এগিয়ে গেল শিশির। খিলটা নিজেই খুলে নিল।

'কাল আসবেন?'

'দেখি—'

তার চেয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে আড়াল করল পলা। পুরো সময়ের অপেক্ষা শরীর থেকে খুঁটে নিয়েছে সব রোম, ঠোঁটের নিচের ঘাম টইটম্বুর চিবুকের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে নেমে যাচ্ছে গলার দিকে। কোমর পর্যন্ত নামা বিনুনি, গায়ে জড়ানো ডোরাকাটা ঘুমের শাড়ি—শ্রীলাও বদলাত, দাঁড়ানোর ধরন থেকে ক্রমশ বের করে আনছে বয়সের প্রয়োজন। পুরনো আঙুর। মনে হয় একটি মাত্র চাপে সে এখন ছিটকে যেতে পারে বহু দূর। চন্দনের উপস্থিতি এসব লক্ষ করতে দেয়নি। তবু, শিথিলভাবে মনে করবার চেষ্টা করল শিশির, বৃষ্টির কথা—একটু আগে পলা কি বলেছিল?

'আপনাকে বুঝি না। এতো যার তাড়া, তার আসার কী দরকার!'

'আমিও তাই ভাবি—'

মঞ্চে আলো পড়েছে খুব। দর্শকের আসনে বসে পলার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে

নেপথ্য অনুমান করবার চেষ্টা করল শিশির—নারী ভূমিকা বদল করে নিল মেয়েমানুষের সঙ্গে। রাতে কি ফোয়ারা খুলে যায় !

পলা সময় নিল। বলল, 'হেঁয়ালি ছাড়ুন, শিশিরদা। ওসব আপনাকে মানায় না। প্র্যাক্টিকাল হন।'

'বলছ ? তোমার দিদি বলত অন্য কথা। সে তোমার চেয়ে বড়ো ছিল।'

'দিদি, দিদি, দিদি ! আর কোনো কথা নেই !'

'বউ যেন কারুর মরে না ! এই তো ?—চলি—'

দরজার ছায়া ডিঙিয়ে অন্ধকারের শুরুতে পৌঁছে গেল শিশির। পিছনে তাকিয়ে দেখল পাল্লা দুটো কাছাকাছি টেনে এনেছে পলা—সেখানে সে নিজে। পিছনে আলো। অন্ধকার বেশি হলে সে অক্লেশে মিলিয়ে যেতে পারত।

'গা গরম দেখলাম। আজ রাতে আপনার জ্বর আসতে পারে—'

'দেখি—'

চমৎকারভাবে পা ফেলে এগিয়ে যেতে পারল শিশির, বলল না 'চলি।'

জ্বর ? আসতে পারে মানে কি সম্ভাবনা ? একই কথা অন্যভাবে প্রায়ই বলত শ্রীলা। তার কাছাকাছি পৌঁছুবার জন্যে দুটো দরজাকে টেনে এনেছিল পলা, জানে কি, বাকি ব্যবধানটুকুই পেরুনো যায় না ! এ-রকম কতোবার সেও কি অভ্যাস করেনি ! পিছনে আলো রেখে এই রকম কতোবার সেও কি লক্ষ করেনি শ্রীলাকে। বোঝা যায় না, হয়তো এটাই ঠিক—গুটিয়ে নিতে নিতে ক্রমশ হারিয়ে যায় পরিপ্রেক্ষিত। এদিক ওদিক খুঁজে শুধু হাওয়া কেটে বেড়ায় নির্জন হাত, তপ্ত কপালের নাগাল পায় না তবু।

অনেক রাতে বাড়ি চিনে ঠিকই পৌঁছে যেতে পারল শিশির। যেমন পৌঁছুত। হাত-পা-চেতনায় ভূকম্পন হলেও ঘরবাড়ি কি নড়ে যায় লক্ষ্য থেকে, কখনো ?

'হ্যাঁ রে, চিত্ত, কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে তোর কি অসুবিধে হবে খুব ?'

'একা থাকবে ?'

এগিয়ে এসে পা থেকে জুতো জোড়া ছাড়িয়ে নিল চিত্ত। মায়ায় হাসল শিশির—শ্রীলা যাবার পর যত্নআত্তিটা হঠাৎ বেড়ে গেছে যেন।

'ধর, যদি কলকাতা ছেড়ে চলে-টলে যাই কোথাও—'

'যেও।' কাঁচাপাকা চুল থেকে দ্যুতি বের করল চিত্ত, 'মন তোমার চাকরি করে না—'

'তা ঠিক।' চুপ করে থেকে খানিক পরে শিশির বলল, 'মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। আজ কিছু খাব না। কেউ ফোন-টোন করেছিল নাকি ?'

'হ্যাঁ। গুহ মেমসাহেব। তোমার নাকি খাবার কথা ছিল !'

'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে।'

বেডরুমে ঢুকে আলো জ্বালল শিশির। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়ে দিল আবার। আজ রাতে জ্বর আসবে তার। যদি আসে, একই বিছানায় অনেক বেশি জায়গা নিয়ে শুয়ে থাকবে চুপচাপ। একই সুঘ্রাণ নিয়ে। চুপচাপ শুনতে পাবে নিজের নিঃশ্বাস—যার মানে বেঁচে থাকা ! রোজই কি বৃষ্টি পড়ে ! জাহাজের গল্পে এতো অবিশ্বাস কেন তোমার ! তাড়াতাড়ি বড়ো হও, দেখবে সত্যি সত্যিই তার হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে তোমাকে। বড়ো কষ্ট, বড়ো আনন্দের সেই স্পর্শ তুমি চিনে নিও।

গুড নাইট, চন্দন। গুড নাইট, পলা। চন্দনকে দেখো। গুড নাইট—গুড নাইট—

ঠোঁটে সিগারেট। অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দেশলাইয়ের শব্দ। নাম্বারটা মনে আছে, ৪৪—। খুব বেশি ভাবনার সময় না নিয়ে টেলিফোনটার দিকে হেঁটে গেল শিশির।

রিং হয়ে যাচ্ছে। এখন অনেক রাত, হবেই। অপেক্ষা? নেভার মাইণ্ড, আমার সময় আছে। গুহ কি ধরবে? যদি ধরে—

'হ্যালো—।' ঈষৎ জড়ানো গলা রম্ভার, 'হ্যালো!'

হাসিটা বরফকুচির মতো ছেঁচে গলা দিয়ে নামিয়ে দিল শিশির। ভারী ও বিশেষ অন্য রকম গলায় প্রত্যুত্তর দিল, 'হ্যালো—।' তারপর চুপ করে তাকিয়ে থাকল সিগারেটের ছোট আগুনটার দিকে।

'হ্যালো! কে—! প্লিজ স্পিক্ আউট, হ্যালো—'

শুনে, খুনী যেভাবে দ্বিতীয় চেষ্টার দিকে যায়—চটপট সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে নিল শিশির। তারপর গাল তুবড়ে চক্রাকারে ফুঁ বাজাতে লাগল স্পিকিং এণ্ডে।

'আচ্ছা ঝামেলা তো! হ্যালো! কী চান আপনি—!'

নিরুত্তর থেকে ও চুপচাপ হেসে ক্রমাগত ফুঁয়ের জোর বাড়াতে লাগল শিশির। রাত বলেই সম্ভবত, শব্দটাকে মনে হচ্ছে দূরাগত—হাওয়া কেটে কেটে ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছে।

॥ চার ॥

সাত দিনে অল্প পুরনো হয়ে গেল শিশির। আঠারো দিনে আরো। তেত্রিশ দিনে তার চেয়ে আরো কিছু বেশি। এমনও হতে পারে, সে যেখানে ছিল— ও যেমনভাবে, সেখানে, ঠিক তেমনিই আছে—একটিই দিনের অনুভূতি নিংড়ে নিংড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে বিপুল নিঃসময়ে। যেখানে-যেখানে ফোঁটা পড়ে ঠিক সেইখানে জন্ম নেয় এক-একটি দিন। সময় কী, বুঝতে পারে না ঠিক ঠিক, তার প্রবাহও না। মনে মনে নিজের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা চিরে বের করে আনে সহবাসের সুখ-দুঃখ, টের পায় বুকের খুব আড়ালে আস্তে আস্তে বয়ে যাচ্ছে বিচিত্র ক্বাথময় নদী এক। এইভাবে—যেতে-যেতে—একদিন-না-একদিন ঠিক পৌঁছে যাবে সে। কোথায়? 'জানি না। জানি না তো!' তবে, যাবে। আশ্চর্য, স্মৃতি তবে এতোখানি ছিল!

প্রফেসান, কেতা আর টেলিফোনের ব্যস্ততাময় বিশাল সমুদ্রে, দ্যাখো, আস্তে আস্তে কেমন দ্বীপের মতো ভেসে উঠছি আমি! সেখানে সব মাটি পলিমাটি, বীজ গ্রহণের জন্যে নৈঃশব্দ্যে উদার হয়ে আছে সারাক্ষণ। অদৃশ্য পিওনের হাতে সেখান থেকে প্রতিদিন পুঙ্খানুপুঙ্খ চিঠি পাঠায় সে—খামের মুখ বন্ধ করে তার ওপর খুব দাগিয়ে লিখে দেয়, 'গোপন'। তবুও নিশ্চিত হতে পারে না। তাই, চিঠি যতোক্ষণ না পৌঁছয়, অক্ষম তর্জনী তুলে প্রত্যক্ষ সব কিছুকে শাসিয়ে যায় সে, সাবধান! গোপনীয়তা রক্ষণীয়। তখন ঘাস মাটি নির্জনতার গন্ধে আরো একটু বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস—পৃথিবী যতো পুরনো হয়, সে ততোই নতুন হয়ে ওঠে আরো। চুপচাপ লক্ষ করে কীভাবে পেকে উঠছে তার জুলপির চুল, বুক থেকে আল্গা ঢলঢলে হয়ে যাচ্ছে শার্ট, চশমার কাঁচের আড়ালে ক্রমশ

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে চোখ দুটো। মাঝে মাঝে শীত এসে ছুঁয়ে যায় শরীর। একা শকুনের ভঙ্গিতে সে শুধু তাকিয়ে থাকে টেলিফোনের দিকে। না বাজলেও বাজে, মাথার ভিতর ঝনঝন শুরু হতেই বুঝতে পারে আসছে—আসছে—। শূন্য ও সাদার মধ্যবর্তী জায়গা এটা, সঙ্কেতে তৎপর হয় হাত। 'হ্যালো—'

'দিস ইজ পাকড়াশী।'

'কে! ও, মিস্টার পাকড়াশী! বলুন?'

'আমি কী বলব! বলবে তো তুমিই—'

'আমি! এবাউট হোয়াট!'

'কী জ্বালাতন!' বিরক্তির পরিবর্তে হে-হে-হে শব্দে হাসল পাকড়াশী। জের টেনে বলল, 'না হয় একটা বিরিভমেন্ট হয়েইছে, তা বলে এতো ফরগেটফুল হলে চলে! কাম অন, ইয়ংম্যান! আমি ফ্ল্যাটটার কথা বলছি। কিছু ঠিক করলে? কবে ছাড়ছ?'

তখুনি জবাব না দিয়ে খানিক রিসিভারটা কানে ছুঁইয়ে রাখল শিশির। অন্য হাতে প্যাড ও পেনসিলটা টেনে নিল কাছে। ভাবল। সাদা কাগজের ওপর আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে পদ্মফুলের আকার। পাকড়াশী চুপচাপ আছে শুনে আরো একটু সময় নিয়ে লিখল 'পদ্মছাপ গেঞ্জি ও জাঙিয়া ব্যবহার করুন।' তারপর, 'বাস্টাড!'

'মিস্টার পাকড়াশী, কলকাতা শহরে কি আর কোনো ফ্ল্যাট নেই?'

'কেন থাকবে না! নিশ্চয়ই আছে—।' টাইয়ের নট্‌টা ঠিকঠাক করে নিল পাকড়াশী, সম্ভবত এখুনি কোর্টে বেরুবে। বলল, 'বাট আই ওয়ান্ট এ ফ্ল্যাট উইথ এ স্টেটাস!'

'স্টেটাস! ফ্ল্যাটের আবার স্টেটাস থাকে নাকি?'

'কেন থাকবে না!' পাকড়াশী নিচু হয়ে এলো, 'মানুষের স্টেটাস থাকলে ফ্ল্যাটেরও আছে। রাজভবনের স্টেটাস নেই? প্রেসিডেন্ট হাউসের? নাঃ, তুমি দেখছি একেবারেই ব্যাকডেটেড!'

'হতে পারে। নো আইডিয়া—।' শিশির চুপ করে গেল।

'হ্যালো—হ্যালো—'

'শুনছি। বলুন?'

'আইডিয়াটা সুষির, বুঝলে! বলল, শিশির রে ওই ফ্ল্যাটে ছিল বললেই লোকে মাথা নাড়বে—'

'সুষি কে?'

'ওঃ, শিশির! ইউ আর ট্রাইং টু বি ইমপসিবল্। সুষি, মানে আমার শালা-বউ। এই পরশুই তো আলাপ করিয়ে দিলাম ক্লাবে!'

'সরি। সেদিন আমি একটু ড্রাঙ্ক ছিলাম বোধ হয়। নামটা খেয়াল করিনি—'

'নেভার মাইন্ড! ও-রকম একটু-আধটু হয়ই। তা ভাই, কেমন লাগল সুষিকে?'

কম কথার লোক, সাধারণত প্রয়োজন বুঝে সময় নেয়। আল্‌গা চোখে ঘড়ির কাঁটা দুটো লক্ষ করল শিশির। তিনটে প্রায়। আজ সম্ভবত দেরি করে ফিরেছে লাঞ্চ থেকে। ড্রাঙ্ক। কিন্তু, সেটা আমার দোষ নয়। ড্যাম ইওর সুষি, আমাকে নষ্ট করছ কেন!

ফোনটা কি রেখে দেবে? উত্তেজনায় পিঠ সোজা করে বসল শিশির। যেমন সে ভুলে যায় প্রায়ই—বাস্টার্ড কথাটা এখন সহজেই গলিয়ে দিতে পারে। দেবে কি?

'হ্যালো—শিশির—?'

'বলুন—'

'সুষি তো কলকাতায় নতুন ; অ্যাজ ইউ নো, অনেক দিন বিদেশে ছিল। বাংলাটা তো ভুলেই গেছে প্রায়। সত্যি কথাটা ভাই, সি হ্যাজ জাস্ট বিন লনচড্ হিয়ার। তাই তোমাকেই জিজ্ঞেস করছিলাম—সুষিকে কেমন লাগল ?'

শিশির পিছিয়ে এলো। এগুলো কি খুবই জরুরী কথা ! কিংবা, কথা যাই হোক, জবাব দেবার দায়িত্ব কি তার ? প্রায় অপরিচিত একটি যুবতীকে নিয়ে তারই বা মাথাব্যথা হবে কেন ? পাকড়াশী নতুন কিছু ভাবছে না তো !

এসব নিয়ে অল্প ইতস্তত করল শিশির, টেলিফোনের দূরত্বে যতোটা করা যায়। তারপর, খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ভালোই তো !'

'শরীর ভালো, মন ভালো, সুষি ভালো—ভালোর অবসেসানে আটকে যাচ্ছ তুমি, শিশির !'

এখানেই শেষ হয় না। কেঁচোর ভঙ্গিতে এগিয়ে পিছিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কথাগুলো—মানে থাকছে না কোনো। সেই একই ব্যাপার—স্যাণ্ডহ্যামের চেয়ারে বসিয়ে বন্দুকের নল পরিষ্কার করছে পাকড়াশী, সুযোগ মতো হাত দেবে ট্রিগারে ! ব্যালান্স-শিটে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর তলায় নাম ছাপা হয় ঘন কালিতে। অ্যাণ্ড হোয়াট ইউ আর ?—জাস্ট এ ম্যানেজার ! যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারও ওপরে আছে দু' ধাপ তিন ধাপ, সেখানে দাঁড়িয়ে বারো গজ হাত বাড়িয়ে দিল পাকড়াশী—মাটি খুঁড়ে সদ্য তুলে-আনা ওলের মতো আড়ষ্ট মাটি লেগে আছে তখনো ; কন্‌গ্র্যাচুলেসান্‌স শিশির। ওয়েলকাম টু দি বোর্ড। তখন দরকার ছিল ; আজ ? কার জন্যে !

থেমে থেকে যাবার পথ খুঁজছে কেঁচোটা। নুন ছড়াবার জন্যে শক্ত মুঠোটা আস্তে আস্তে শিথিল করে দিল শিশির।

'ওপিনিয়ন চাইছেন ? ওয়েল, সি ইজ স্যুইট অ্যাণ্ড—অ্যাণ্ড কোয়াইট বেডেব্‌ল্।'

'কী বললে ? বেডেব্‌ল ! হাঃ—হাঃ—হাঃ—, মানে যথার্থই শয্যাসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত, কী বলো ? অ্যা— ?'

থরে থরে হাসছে পাকড়াশী, যেন এর চেয়ে ভালো রসিকতা আর কখনো শোনেনি ! এই আমার পৃথিবী ! আকস্মিক অভিমান কোনো রকমে সংবরণ করে নিঃশব্দে ঝরে গেল শিশির। হয়তো স্বচ্ছন্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে পারে এখন। পারে কি ? ভয় হয়, আবার যখন তুলবে, হাসিটারই জের পাবে না তো !

'হতে পারে—', হাসতে হাসতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে পাকড়াশী বলল, 'তুমি যখন বলছ নিশ্চয়ই তা হবে। হোয়েন ইউ সে ইট বিকাম্‌স্ এ কমপ্লিমেন্ট !'

'জানি না। রাখছি তা হলে—'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—। থ্যাঙ্ক ইউ। ওই ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি জানিও।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার পরও অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকল শিশির। সাদা আয়তনে হাড়ের শূন্যতা—অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ? যদি তাই হবে, তা হলে তার—টেলিফোনের—মধ্যে দিয়ে এতোক্ষণ কী করে চালিয়ে গেল সে পাকড়াশীর সঙ্গে ! প্রয়োজনহীন এই সব কথা, আর শব্দ—এর কোনোটাই তাকে নিয়ে যাবে না বেশি দূর, আদৌ কি নিয়ে যাবে কোথাও ! আদ্যন্ত বিরক্তি থেকে তবু যে সে এড়াতে পারল না নিজেকে,তা কি শুধু প্রলোভন—নিজের কণ্ঠস্বরের ?

হতে পারে, নাও হতে পারে। এই মুহূর্তের বিভ্রম চিন্তার অনিশ্চিতি থেকে বেশি দূর এগোতে দিল না তাকে।

এয়ারকন্ডিসান-করা ঘর, তবু দলছুট একটা মাছি কোনো ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে—উড়ে উড়ে ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে নাকমুখের সামনে দিয়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে যতোটা সম্ভব ধোঁয়া গিলে গলার মধ্যে তার ঘনতা অনুভব করল শিশির—ফুসফুসের দিকে নেমে যাবার আগেই মাছিটাকে লক্ষ করে ছুঁড়তে লাগল অনর্গল। ধোঁয়া। ওপর থেকে নিচে নেমে, আবার ওপরে উঠে, কোনাকুনি থেকে সমান্তরালে পৌঁছে তার আত্মরক্ষার প্রয়াস শেষ হতে না হতেই শিথিল হয়ে এলো ধোঁয়ার রেশ। কপালের ঠিক মাঝখানে এবার তার পায়ের হিজিবিজি স্পর্শ অনুভব করল শিশির। মাথা নাড়তেই মাছিটা আবার চলে গেল দূরে—প্রায় এক গজ দূরত্বে গিয়ে নিজস্ব গণ্ডীর ভিতর ওড়াউড়ি করতে লাগল। দেখে, রোখ চেপে গেল শিশিরের। স্থান পরিবর্তন করে মাছিটা এবার ছুটে আসছে কপালের দিকে। জমিয়ে রাখা ধোঁয়াটা তাক বুঝে আবার ছুঁড়ে দিতেই কোনাকুনি কাত হয়ে নিচের দিকে নেমে গেল—ঈষৎ দিশেহারা শিশির আবিষ্কার করল সেটা বসে আছে পেপারওয়েটের ওপর—ক্ষীণ সুতোর মতো পা থেকে ঝেড়ে ফেলছে যুদ্ধের স্বেদ, পরাজিত ধোঁয়া অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। টুকরো-টুকরো বিশৃঙ্খলতা থেকে নিজেকে জড়ো করে এনে শ্রীলার মুখোমুখি দাঁড়াল শিশির।

একটার পর একটা ঘর ঘুরে একটু আগেই শেষ বেডরুমটায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা। শ্রীলা কি ক্লান্ত ? আদলের স্বাভাবিক বিষণ্নতা থেকে প্রায়ই তাকে টেনে তুলতে পারে না শিশির—যদি না সে স্বেচ্ছায় হেসে ওঠে। এখনও সেই রকম খুঁজল।

'তিনটে বেডরুম নিয়ে এর কার্পেট এরিয়া কতো জানো ? আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিট ! ভাবতে পারো !'

শ্রীলা ঘাড় নাড়ল। সত্যিই হেসে উঠল এবার।

'আড়াইটে লোকের জন্যে তিনটে বেডরুম ! আমাকে তুমি কোথায় রাখবে, তুমি আর চন্দনই বা কোথায় থাকবে !'

কথাটায় হেঁয়ালি ছিল, বুঝতে পেরেই কিনা কে জানে, শিশির কিছু বলবার আগেই শ্রীলা গুটিয়ে আনল নিজেকে। বলল, 'এতো বড়ো বড়ো ঘর, এতো জায়গা দেখলে সত্যিই ভয় করে !'

দেওয়ালের পালিশে আদরের হাত বোলাতে বোলাতে শিশির বলেছিল, 'যেটাকে তুমি ভয় বলছ সেটা আসলে খুশি। আচমকা দেখলে এ-রকমই হয়। দু' চার দিন থাকো, দেখবে ভালো লাগছে। চাই কি আমাকে নিয়ে একটু গর্বও বোধ করতে পারো !'

এ-রকম হাসিতে আরো বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে শ্রীলা—অনিচ্ছুক ঠোঁট সবটা নেয় না বলেই বোধ হয় ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে। শিশিরের দৃষ্টিকে কোনো আমল না দিয়েই বলল, 'যখন তোমার এসব কিছুই ছিল না—মনে আছে, একটা মাত্র ঘরে থাকতাম ঠাসাঠাসি করে ? তখনও কি তোমার জন্যে কম গর্ব ছিল !'

'ওঃ, শ্রীলা ! আমি সে-সব বলিনি। এটা ইমোসানের ব্যাপার নয়, এটা স্টেটাস—দি প্রুফ অফ মাই সাকসেস। বাড়ি, গাড়ি, কমফার্ট, এমনকি এক ইঞ্চি এক্সট্রা ফ্লোর স্পেসও—সব আমাকে পেতে হয়েছে যুদ্ধ করে ! কোথায় আমি চাইছি আরো—আরো এগোতে—'

'আর কী পাওয়া বাকি আছে তোমার !' শ্রীলা হঠাৎ বলল, 'সাম্রাজ্য !'

'অ্যান এমপায়ার। লোকে আমাকে দেখুক আর বলুক, হিয়ার্‌স্ হি, শিশির রায় !'

এসব কতোদিন আগেকার কথা ? চার বছর ? তিন বছর ? অ্যাশট্রের একান্ত থেকে উড়ে-যাওয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে সময়টা ছুঁতে চাইল শিশির। পারল না। স্মৃতি—এইভাবে—ছাড়িয়ে যাচ্ছে সময়কে, হয়তো তাকেও। তখনো আসবাবহীন ঘরের মাঝখান থেকে বড়ো জানলার দিকে হেঁটে যাচ্ছে শ্রীলা—চারিদিকে নীল ও রোদ্দুরের মাখামাখি, অফুরন্ত হাওয়া এসে ভেঙে দিয়ে যায় তার আলগা খোঁপা। দুই বাহু তুলে আবার সেটাকে জায়গায় নিয়ে যেতে যেতে কী ভেবে তুমি উদাসীন হয়েছিলে সেদিন !

শ্রীলা বলল, 'কিছু পেতে হলে কিছু হারাতেও হয়। তুমি কী হারাবে— !'

আনমনে হাসল শিশির। হারানো কাকে বলে ? শরীরের শোক ? বিস্মৃতি ? নাকি তোমারই মুখের রেখা, অস্পষ্ট আদল নিয়ে শুধু যাওয়া—শুধু হেঁটে যাওয়া একান্তে, তোমার দিকে ! মজা এই, আগে আগে যে-তোমাকে পেতে হতো বাড়ি ফিরে বা বাড়ি ফেরার চিন্তার মধ্যে, শরীরের চিন্তায়, শীত-কাতরতায় স্তন-নাভি-উরুর সংলগ্ন হতে ঘষামাজা অন্ধকারে, প্রয়োজনে, অসুখে-অসুখে, ভোরের ঘুমের মধ্যে, ছেড়ে-যাওয়া বিছানা-বালিশে—বিভিন্ন উপলক্ষের মধ্যে দিয়ে ; উপলক্ষহীন, আজ তার সবই ক্রমশ মিশে যাচ্ছে আমার মধ্যে, রক্তে, সারাক্ষণে ঘেরা আমার সময়ে। তোমার সর্বস্ব নিয়ে লুকোতে চাইছ আমার আড়ালে—বুকে জড়িয়ে যাচ্ছে তোমার নিঃশ্বাস, দু' ঠোঁটের স্পর্শ চোখের মতো ফুটে উঠছে চামড়ায়— ; বলতে না, ওইভাবে 'সেফ্' লাগে ! আমি তো যাচ্ছি না কোথাও !

এই দ্যাখো, বসে আছি, কাজ নেই কোনো। কিংবা, কাজ হয়তো আছে—অনেক ডিক্টেসান দিয়েছি আজ সকাল থেকে, ফোনে কথা বলেছি অনেকগুলো, একটা খুব কনফিডেনসিয়াল ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আধঘণ্টা কাটিয়েছি হার্টলের চেম্বারে ; আমার ঔদাসীন্য থেকে স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠছে সব ! এখন মাঝেমধ্যে ডুব দিলেও কেউ কিছু বলে না আমাকে—তারা জানে যে ডিসিপ্লিন্‌ড, তাকে ডিসিপ্লিন ভাঙার সুযোগ দেওয়া উচিত। এক্সপোর্ট অর্ডারের ব্যাপারটা নিয়ে শীঘ্রিই টোকিও যাচ্ছে গুহসাহেব—আমারই তো যাবার কথা ! তবে, এবার না হলেও, পোল্যান্ডের অর্ডার সামলাতে যেতেই হবে আমাকে। ফেরার পথে—। কাজের সুখ্যাতি আর সুবিবেচনা শীঘ্রিই আমাকে নিয়ে যাবে আরো এক ধাপ উঁচুতে ; এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে হয়তো খুব শীঘ্রি চলে যাবো অনেক বেশি ফ্লোর স্পেসে ছড়ানো আর একটা বিশাল ফ্ল্যাটে। নতুন-নতুন গ্যাজেটস-এর খবর রাখো কোনো ? দু' বছরেরও বেশি দিন হলো ব্যবহার করছি এ-গাড়িটা ; আর নয়—কনস্যুলেটের ছেড়ে-যাওয়া একটা ডাটসুন শুনছি এসে যাবে তাড়াতাড়ি। যদিও লেফট্-হ্যাণ্ড ড্রাইভ ; কিন্তু, সত্যি সত্যি, ওটা তো অস্বস্তি ছাড়া কিছু নয় ; ক'দিন শুধু অভ্যাসের দরকার। তোমাকে বলিনি বাড়ির ভিতরের সেই টেলিফোনটার কথা—বেডরুম আর লিভিংরুম আর স্টাডির মধ্যে যা যোগাযোগ রাখবে চমৎকার। ধরো, খুব কাজের চাপ, স্টাডিতে বসে ফাইল ঘাঁটছি আর নোট করে যাচ্ছি—রাত কতো হলো ?—মাঝরাতের ঘুম থেকে জেগে উঠে তুমি দেখছ আমি পাশে নেই, তখন, হাত বাড়িয়ে ৩৩ ডায়াল করে খোঁজ নিতে পারো, 'এখনো জেগে আছো !' আমার সাম্রাজ্য সত্যি সত্যিই ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে— ; একে কি হারানো বলে ? লোকে সত্যিই বলছে, হিয়ারস্ হি ! পাকড়াশীকে চেনো তো ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই—সলিসিটর, ডিরেক্টর, বাস্টার্ড নাম্বার ওয়ান। টেলিফোনে আজ তাকে খুব অপমান

করলাম—সুষি তার শালা-বউ ; তবু লোকটা হজম করল সব ! হাসতে হাসতে বলল, হোয়েন ইউ সে ইট বিকাম্‌স্‌ এ কমপ্লিমেন্ট । একে কি হারানো বলে !

চন্দন প্রায়ই জিজ্ঞেস করে কবে তাকে বাড়ি নিয়ে আসব । তাকে বলেছি, এবার আমরা নতুন একটা জায়গায় যাবো, যেখানে সবই সুন্দর আরো । তোমার প্রশ্রয়ে সে যে কতো পাকা পাকা কথা বলে, জানতাম না আগে—কী অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তোলে উদাসীন ভঙ্গি ! বলল, 'শুধু মা-ই আর যেতে পারবে না সেখানে !'

এতো ঝানু, ধুরন্ধর চরিয়ে বেড়াই, তবু একটা শিশুর অভিমানের কাছে হেরে যাই কেন, বারবার ! অনেকটা ভেবে নিয়ে বলতে হলো, 'মাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি ; সেখানে গেলে পাবে— ।'

'তুমি বড়ো মিথ্যে কথা বলো, বাবা ! মা তো পুড়ে ছাই ! মনে নেই— ?'

মনে আছে, সব মনে আছে । অতোটুকু ছেলেকে কি বলা যায় সব, স্পষ্ট করে ! আমি তো জানিই, সে যখন বড়ো হবে, আর জানতে পারবে সব—সে তার বাবাকে ঘৃণা করবে । আমি চাই চন্দন ঘৃণা করুক আমাকে ; তাই বারবার আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখি তার কাছে—নিঝুম, ঘুমন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, তোর দুর্ভাগ্য তুই আমার ছেলে ! সে তো তোমারও ছেলে ; শ্রীলা ; রাতের স্বপ্নে তোমার গন্ধের আকর্ষণে সে যখন পাশ ফিরবে—মার বদলে হাত ঠেকে যাবে বালিশে, তুমি তাকে বোলো, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে । বোলো, মানুষ সব পারে, কিন্তু সন্তানের ঘৃণা সহ্য করতে পারে না কখনো !

কী বলছ, এসব বলে মিথ্যে স্তোক দেওয়া নিজেকে ? রাত বারোটার ময়দানে দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে চোখ মারা ? হতে পারে । সত্য কে চেনে ? সত্য কি তোমার মৃত্যুও !

একটু দাঁড়াও, চশমার কাঁচটা যেন কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে, মুছে নিই । এ-রকম হয় আজকাল, মাঝে মাঝে । দেওয়াল বা নির্দিষ্ট কিছু-না'র দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হয়, চোখের মণি দুটো বড়ো হচ্ছে ক্রমশ—বড়ো হতে হতে ক্রমশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে । চোখের কোণে যে টিউব থাকে, আমি সতর্ক হতেই, তারপর সেটা তীব্রভাবে ছুটে যায় মণির দিকে । ঝাপসা হয়ে আসার ব্যাপারটা তার পরে—

যাক । ঘৃণার কথা হচ্ছিল । আমি জানি, যতোই আঘাত পেয়ে থাকো, যতই শুকিয়ে উঠে থাকো, তুমি আমাকে ঘৃণা করোনি । যদি করতে, তা হলে মৃত্যুর আগে ফিরে আসতে না আমার কাছে । মৃত তোমাকে নিয়ে আমি যে কী কী করেছিলাম—লোকজনকে সে-সব চেঁচিয়ে বললেও, বলা যাবে না তোমাকে । শুনে নির্ঘাত বলতে, ন্যাকা ! আমি তো জানিই, শেষ দিকে লজ্জায় ক্রমশ আড়াল খুঁজতে তুমি—নাকি ক্লান্তিতে ? ধারণা হয়েছিল এমনকি দেওয়াল, আলো, হাওয়া, জানলা-দরজার পর্দাও তাকিয়ে আছে তোমার দিকে—বুকের বোতাম খোলা—তোমার উথলে-পড়া স্তনের দিকে, স্পর্শে যে শীত ছাড়া আর কিছু চেনেনি ! 'আমি পুরনো হয়ে গেছি, শিশির । আর কতো দিন !'

এমনকি হতে পারে, সত্যি নয়—যা ভাবছি ও ভেবে চলেছি, সবই আমার ভুল ! ঘৃণার ওপর আত্মশোকে বারবার হাত বুলোতে তুমি—, ভুলও সেই জন্যে ! না হলে হঠাৎ সেদিন—ঠিক কোন দিন ?—কেন তুমি খুঁজতে এসেছিলে আমাকে ; কেন বলেছিলে আমাকে কিছু না জানাতে ! এক-একদিন দূর থেকে তুমি যখন অন্যমনস্ক দেখতে আমাকে, ও হাসতে 'কেন হাসছ ?'র উত্তর দিতে 'কিছু না' বলে, রহস্যময়, তেমনি তোমার ওই আসা ও ফিরে যাওয়ার উপলক্ষ কে জানাবে ? যে পারত, ওই মেয়েটি—কণা, তাকে তুমি মানা

করেছিলে। তা সত্ত্বেও সে যদি আমাকে বলত—বলা উচিত ছিল, কারণ তার প্রথম লয়ালটি থাকা উচিত আমার প্রতি, আমি তার বস্, অন্তত আভাসও যদি দিত, তা হলে, হয়তো পৃথিবী আজ অন্য রকম হতো। কেমন ? যে-রকম ছিল ? হয়তো আমি ঠিক জানি না।

তবে, কণাকে আমি ক্ষমা করিনি। তাকে ট্রান্স্ফার করে দিয়েছি অন্য ডিপার্টমেন্টে, অন্য ও বয়স্ক একজনের কাছে : চুপচাপ।

পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে চিঠি পেয়ে কণা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছিল। এমনিতে কাছে ঘেঁষে না ; বিশেষত সেদিন সন্ধের পর থেকে, চলাফেরায় গোড়ালিটা ঢেকে নিত আর একটু—চোখের দৃষ্টি থেকে বুঝবে না কিছু, এমন ন্যাকা আর কোন মেয়ে ! যাক, হঠাৎ সে চলে এলো আমার চেম্বারে, কিছু না-জানিয়ে, নিজেই।

'আমার কিছু কথা ছিল—', বলে সোজাসুজি তাকাল আমার দিকে।

চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'বসুন।'

কণা বসল না ; জানি তো, যে দাঁড়াতে এসেছে তাকে বসতে বলাই ভদ্রতা। অল্প ইতস্তত করে বলল, 'মিস্টার রে, আমি একটা চিঠি পেয়েছি—'

'জানি, ট্রান্স্ফারের। সুখবর।'

আমার ঠাট্টায় আমল দিল না কণা, বলল, 'আমাকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন কেন !'

'লোকে কী বলছে ?' হেসে জিজ্ঞেস করলাম আমি। একদিন সন্ধ্যায় যার মুখোমুখি বসেছি অনেক—অনেকক্ষণ, তার সম্পর্কে এটুকু লিবার্টি কি নেওয়া চলে না ! তার আগে কণা নিয়েছিল।

'ভাবছে, আমি ইনএফিসিয়েন্ট—'

'আরো অনেক কিছু ভাবছে—।' এই সময় একটা সিগারেটের দরকার ছিল। 'ভাবছে, ব্যাপারটা প্ল্যানড্, চোখে ধুলো দিয়ে একটা ঘটনাকে হাসাপ্ করার চেষ্টা ! ভাদুড়ীকে জিজ্ঞেস করুন—আপনি তো তার ভাইঝি'র সঙ্গে পড়তেন !'

যা সত্যি নয় তা নিয়ে রটনার কথায় পুরুষদের অনেক আগে টান লাগে মেয়েদের অপমানবোধে, কণা কি একসেপ্সান ? মুখের পাংশু ভাব মনে পড়িয়ে দিল সে আমাকে 'অন্তর্যামী' বলেছিল ; সেদিন মিনিবাসে উঠে সে যখন হাত নাড়ল ঈষৎ, আমি তাকে 'দেখা হবে' বলিনি। এর পরেও কি কথা আছে ?

বললাম, 'মিস রায়চৌধুরী, আপনার চাকরিটা স্যাণ্ডহ্যামের, আমার নয়। দি ট্রান্স্ফার ইজ কোয়াইট ইন অর্ডার।'

আমার ছুরিতে এখন অনেক শান ; আমি জানি এ-রকম শাস্তি আরো অনেককে দিতে হবে। রম্ভাকে—যে করেই হোক দশ-বারো ঘন্টার স্মৃতি ফেরত পেতে হবে আমাকে ; পাকড়াশীকে ; এ-রকম আরো অনেককে ; দ্যাখো, তাদের কীভাবে আমি চিনে নিচ্ছি ক্রমশ। নিজেকে ? ও-কে, ও-কে। সে দেখা যাবে। আমার সময় থেমে থাকলেও বুঝতে পারি সময় চলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আমিও—আমি দাঁড়িয়ে থাকলেও ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। একদিন, সে যবেই হোক—খুব তাড়াতাড়ি একদিন, আমার দাঁড়াবার জায়গা আর একটু বদলে যাবে, আর একটু রুক্ষ কিংবা ক্ষমতাশীল হয়ে উঠবে পৃথিবী। ততো দিনে আমিও বদলে যাবো। কী বলছ, অসার ? কল্পনা ? রোম্যান্টিক ? হতে পারে, নাও হতে

পারে। আমি ঠিক জানি না। আলজিভ ছুঁয়ে দ্যাখো, জ্বরে একাকার হয়ে যাচ্ছি আমি—শরীরময়, যখন-তখন। আমি ঝিমিয়ে পড়ছি। আর সেই অখণ্ড ঝিমুনির মধ্যে কে যেন ডেকে তুলছে আমাকে, 'জেগে আছো তো ?' আমার কানে এখন একটাই শব্দ : উইডোয়ার—ইউ ব্লাডি উইডোয়ার ! ইউ ব্লাডি সান্ অফ এ বিচ উইডোয়ার ! বলতে কি, প্রেমে পড়ে গেছি।

হঠাৎ বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সেদিন। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলাম, বিদ্যুতে ফালা-ফালা হয়ে যাচ্ছে আকাশ, যাকে বলে অঝোর ধারা, তাই, জানলা দিয়ে মুহুর্মুহু ছাঁট ঢুকছে ঘরে—মেঝের অনেকটাই বুঝি ভেসে গেল। শেষ বর্ষায় এ-রকম নামে, প্রায়-ভোরে, যখন আশ্রয়ের জন্যে তাড়া নেই কোনো—এইভাবে কতো রাত যে পার করেছি গাঢ় ঘুম আর অচেতনে, জানলা বন্ধ করার দায়িত্ব আমি আর কবে নিয়েছি ! আজও চেষ্টা করলাম না কোনো। বার দু'তিন চিত্তর নাম ধরে ডাকলাম। সাড়া নেই—সে থাকে অনেক দূরে, বৃষ্টিতে প্রত্যাহত কণ্ঠস্বর ফিরে এলো নিজেরই কানে, বাজতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। তখনই মনে হলো ফ্ল্যাটটা যেন বড্ড বেশি বড়ো—শব্দ হারিয়ে যেতে পারে যথেচ্ছ, থামবার মতো এখানে স্টেশন নেই কোনো। তখন যে প্রায়-ভোর তা আমি বুঝলাম কী করে ! ইন্দ্রিয় যা বুঝে নেয়, অনুভূতি কি তা পারে ? এসব ভাবতে ভাবতে—অনেকক্ষণ—বৃষ্টির রেশ ক্রমশ পাতলা হয়ে এলো কানে ; উঠে আলো জ্বেলে দেখলাম সওয়া চারটে। আবার আলো নিবিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। থেমে আসছে, খুচরো কিছু রেণু তবু উড়ে আসতে লাগল চোখেমুখে—জোরালো হয়ে উঠল হাওয়া, পুব দিক ঈষৎ লালচে হয়ে উঠেছে যেন। স্তব্ধ চারিদিকের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে থেকে ঝুঁকি নিয়ে ডেকে উঠছে দু' একটা পাখি—যেখানে লাল তার তীর ঘেঁষে একটা কাক উড়তে গিয়েও ডানা মুড়ে ফিরে গেল আবার। এই সব দেখতে দেখতে হঠাৎই মনে হলো, সময়টা ধরতে পারছি—তোমাকেও, আমার ঘুম ও জেগে ওঠার সন্ধিতে দাঁড়িয়ে একটু আগেও ছটফট করছিলে তুমি ; এইমাত্র চলে গেলে !

কী জানি কেন, একটা পাগলামি চেপে বসল মাথায়। আলো জ্বেলে ড্রয়ার খুঁজে ধূপকাঠির প্যাকেটটা বের করে একটা জ্বেলে দিলাম ঘরে। চন্দনের গন্ধে ঘরটা আস্তে আস্তে ছেয়ে যেতে স্বস্তি হলো কিছুটা ; বৃষ্টি থেমে আসছে, কিংবা থেমেই গেছে হয়তো—শব্দে তার জোর নেই কোনো। অন্ধকারে ফুটি-ফুটি ভাব নিয়ে থমকে আছে ভোর। হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি, কোনো রকমে রাতের পোশাকটা ছেড়ে, চটি গলিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আমার চারপাশ দিয়ে বয়ে গেল এলোমেলো ধূপের গন্ধ।

চিত্ত ঘুমোচ্ছে। ঠেলে তুলে বললাম, 'আমি বেরুচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

ঘুম চোখে হকচকিয়ে উঠল চিত্ত, হাই তুলতে তুলতে তাকাল চারপাশে।

'এ কী ! এতো রাতে কোথায় যাচ্ছ ?'

'রাত নয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে—।' বললাম, 'ভগবান বুদ্ধের নাম শুনেছ, ঠিক এই সময় সংসার ত্যাগ করেছিলেন তিনি—।'

চিত্ত আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল।

'কী আমার সংসার রে ! বউ গেল মরে, ছেলে রইল দূরে, এখন ইনি চলেছেন ভগবান বুদ্ধ হতে !'

ধূপের গন্ধ তখনও অনুসরণ করছে আমাকে। হেসে বললাম,'দেরি হলে ভেবো না, ঠিক ফিরে আসব।'

রাস্তা ফাঁকা। দয়ালু হাওয়া চারিদিকে, কোথাও কার্পণ্য নেই এতোটুকু, আজ ভোরে ফুটপাথও আমাকে ডেকে নিল সাদরে। ভোরের আলোয় বুঝে নিলাম, বারো বছরে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি পৃথিবীর—ভোরের রঙে নয়, হাওয়ার ধরনে নয়, এখনো শালপাতা ওড়ে ফুটপাথে স্বচ্ছন্দ গতিতে, কাক ও কুকুরে মিলে ভাগ করে নেয় উচ্ছিষ্ট, রাস্তা ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ে যায় গলিতে, ঝনঝন শব্দে দিন ঘোষণা করে ভোরের প্রথম ট্রাম—তবু সব আলাদা মনে হয় কেন! আমি জানি, আর একটু পরেই খাতা হাতে বেরুবে তুমি, ঘুমচোখে অনির্দিষ্ট কাজল নিয়ে হাঁটতে শুরু করবে খুব শান্ত ভঙ্গিতে। আমাদের দেখা হবে।

কতোক্ষণ এবং কীভাবে জানি না ; দেখি দাঁড়িয়ে আছি অতনুদের দরজায়। কলিং বেলে হাত দিয়েছিলাম কি ? মনে পড়ে না। ভিতর থেকে রঞ্জনার কিছু বা শঙ্কিত 'কে! কে!' শুনে মনে হলো, হয়তো। এতো ভোরে কেউ সুসংবাদ আনে না।

'দরজা খোলো, রঞ্জনা। আমি শিশির।'

'ও মা, শিশিরদা, কী হলো আবার!'

কাঠ ও লোহার শব্দে বুঝলাম ব্যস্ত হচ্ছে রঞ্জনা—আমি শুধু খারাপ খবর— ! ভেবে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। দরজা খুলল।

সারা রাতের বীজঘুমে ভরে আছে রঞ্জনা ; কপালের চুল সরিয়ে, কিঞ্চিৎ আঁচল গুছিয়ে অতনুকে ডাকল, 'শুনছ, শিশিরদা—'

'কে, শিশির ? আয়, আয়— ?'

অভ্যাস থেকে কথা বলল অতনু, যেমন বলে—ধ্বনি অনুসরণ করে, আমি যে এসেছি তা বুঝতে তার আরো দেড় দু' মিনিট লাগার কথা।

'কী হলো, শিশিরদা ? এতো ভোরে, হঠাৎ!'

'এমনিই, হঠাৎ মনে হলো তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি।' বলে এড়িয়ে গেলাম তোমাকে ; বললাম, 'আর কোথায় যাবো! তাই তোমাদেরই কাছে—'

'আসুন, আসুন— ।' রঞ্জনা জায়গা ছেড়ে দিল—অনেকটা, তাড়াতাড়ি জানলা খোলার জন্যে ব্যস্ত হলো। মনে পড়ল, আমাদের জানলাটা খোলা ছিল কাল, সারা রাত বৃষ্টি হয়েছিল—এরা কি জানে!

'বাব্বা, এ তো দেখছি দিব্যি অন্ধকার আছে এখনো!' জানলার দিকে তাকিয়ে অতনু বলল, 'এ-সময় ফেরারিরা ঘাঁটি বদল করে। তুই কোত্থেকে ?'

'পালিয়ে এলাম—'

'পালিয়ে!'

'এলাম।' বলে হাসলাম আমি, 'খুব একটা ভুল করিসনি। তা তোর গপ্‌পো-টপ্‌পে এমন সময় কেউ এসেছিল নাকি! না হলে আমাকেই লাগিয়ে দে না!'

'তোকে!'

'কেন, আমাকে কি খুব ফেল্‌না মনে হয় তোর! একটা স্ট্রাগল, একটা সাক্‌সেস, একটা হেলপ্‌লেসনেস্ খুঁজে পাস না! তারপর, ধর, এই হঠাৎ বিপত্নীক হয়ে পড়া—এটা তো একটা ক্লাইম্যাক্স—'

এগুলো কি আমার কথা, বা আমারই কথা ? না। আমার সব মনে ছিল—কখন এসেছি, কীভাবে এসেছি, প্রায়-ভোরের বৃষ্টি, ধূপের গন্ধ, সব কিছু। হাতে কোনোক্রমে ধরা খাতা, পায়ে ভোরের জড়তা, তুমি আসছ। আমাদের দেখা হবে। এমনকি ফিরে গিয়ে ছাই ছাড়া আর কিছুই দেখব না সেখানে, তাও। তবুও উপায়হীনভাবে এই সব চালিয়ে যেতে হচ্ছিল অনর্গল, পাছে ধরা পড়ি। একটু আগেই সময় নিয়ে আচমকা একটা কথা বলে ফেলেছিল অতনু, শুনেছ কি ? কথাটা ভুল নয় ; কারণে তফাত থাকলেও পালানোর ধরনটা বোধ হয় সকলেরই এক। ভাঙার ধরনটাও।

অতনু তখনো নিঃশব্দ, ও কিছু ভেবে যাচ্ছে দেখে বললাম, 'যদি আরো জানতে চাস, শুরুটাও বলে দিতে পারি। ধর, এইভাবে—একদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ খুব ঝরঝরে বোধ করল শিশির—'

থামিয়ে দিয়ে অতনু বলল, 'দেখছি সত্যিই একটা ক্যারেক্টার হয়ে উঠছিস তুই ! দেখি কিছু একটা লাগানো যায় কি না। তবে বিপত্নীক-টিপত্নীক ব্যাপারটায় কি জুত হবে খুব !'

আমি বললাম, 'বিপত্নীক তো একটা কথা, একটা শব্দ। শব্দেরও আগে আছে অভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতার শেষে শব্দ। নিজের পায়ে দাঁড়ালে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অভিজ্ঞতাটাকে। যেমন ভালোবাসা—'

'দাঁড়া, দাঁড়া—।' টেবিলের ওপর পা তুলে অতনু বলল, 'তুই দেখছি বার্ট্রাণ্ড রাসেলকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিস ! গপ্‌পো-টপ্‌পো থাক, এভাবে ভাবলে তো পাগল হয়ে যাবি একদিন !'

কেন জানি না, অতনুর ভাবভঙ্গি দেখে খুব হাসি পেয়ে গেল আমার। বললাম, 'পাগল একবার হলে তো মানুষ থাকে না ; কিন্তু, পাগলের আগের হিস্ট্রি তো মানুষের ! মানুষ তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন নয় ! পাগল কী ?'

এইমাত্র প্রত্যূষ ছিল, এই তা সকাল হলো। হকার কাগজ দিয়ে গেল।

'পাগল পাগলই—', অতনু চেঁচিয়ে বলল, 'রঞ্জু, তাড়াতাড়ি চা দাও। এ দেখছি আমাকেই পাগল করে ছাড়বে !'

হেঁসেল থেকে রঞ্জনা বলল, 'শুনেছি। পাগল কেউ দু'বার হয় না।'

মানুষ এখনো সুখে আছে দেখলে বুক ভরে যায় ; দেখি, সুখের ভিতর থেকে আরো বেশি সুখ বের করে আনছে তারা—যেমন এনেছিল, গতকাল ও আজকের মধ্যে তফাত নেই কোনো। ফুল ফোটা ও ঝরার মধ্যে তারতম্য দূরে ; ডাল খালি থাকছে না কখনো। তার মানে আগামী কালও এখানে কিছু হবে। হেঁসেল ঢুকে পড়ছে বসার ঘরে, বসার ঘর কান পাতছে বেডরুমে, বেডরুম হাসছে হেঁসেলের দিকে তাকিয়ে। এ-সবের সামনে এসে তবু আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় কেন ; দরজা খুললেই কেন শুনতে হয়, এ কী !

নিজেকে আড়াল করার জন্যে চায়ের কাপে মুখ দিলাম আমি। আঁচলে গলার ঘাম মুছছে রঞ্জনা—গুমোট, আবার বৃষ্টি নামবে হয়তো। দাঁড়িয়ে কেন, রঞ্জনা ! বোসো ; যে-হাতে সেদিন সাজিয়েছিলে শ্রীলাকে— তোমার সে-হাত আমি চিনি। কাল কী হবে জানি না, তবে আমার আজকের দিনটা হয়তো ভালো যেতে পারে। বোসো, তোমার ভিতরের নারীকে একটু দেখি।

রঞ্জনা বলল, 'কতো দিন পরে এলেন শিশিরদা ! খেয়ে যান আজ ?'

'খেয়ে যাবো কি, অফিস নেই— ?'

'একদিন অফিসে না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না—', অতনু কাগজ পড়ছিল, মুখ তুলে, তারপর সোজা ঝাড়া হাত-পা হয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, 'খেয়ে যা—, থেকে যা আজকের দিনটা। ছেলেটাকে আনলি না কেন, ও ব্যাটাকেও তো দেখিনি অনেক দিন।'

'মামাবাড়িতে আছে। ভালোই আছে মনে হয়—'

'দু' মাস তো হতে চলল! আর কতো দিন রাখবি, পর হয়ে যাবে না তো!'

আগে কি আপন ছিল, কার ছিল ? ভেবে, আমি বললাম, 'দেখি—'

রঞ্জনা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার বলল, 'চন্দনকে কিছু দিন আমার কাছেও তো রাখতে পারেন, শিশিরদা ?'

'বেশ তো', বলতে যাচ্ছিলাম আমি, ভেবে বললাম, 'দেখি—'

'সবই দেখি আর দেখি— !' বাইরে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে রোদ্দুর, রঞ্জনার চুল ছুঁয়ে এইমাত্র একঝলক হাওয়া উড়ে এলো মুখে। দেখতে দেখতে অতনু বলল, 'খেয়ে যা। আমি সিক্ হচ্ছি আজ, কলেজে যাব না। বাজারটা করে আনি তা হলে—'

'চল, আমিও যাবো—'

'তুই কেন! তুই বোস, দাড়িটাড়ি কামিয়ে আলগা হয়ে নে। আর এক কাপ চা খা। আমি যাবো আর আসব।'

অতনু হেঁটে গেল ভিতরের দিকে। কিছু মনে পড়ার ধরন থেকে রঞ্জনা হঠাৎ বলল, 'শুনছ, কাঁকড়া এনো। শিশিরদা ভালোবাসে—'

কথার পর কথা, আরো কথা। মেঝেয় পা মুড়ে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে রঞ্জনা, মুখের এক দিকে আলো তার অন্য দিকটাকে ফুটিয়ে তুলেছে আরো। অতনু চলে যাবার অনেকটা পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কাঁকড়া ভালোবাসি তুমি তা জানলে কী করে !'

'শ্রীলা বলেছিল—', চিরুনিটা তুলে নিয়ে মুখ ফেরাল রঞ্জনা, 'ক' বছর পরে খাচ্ছেন, দু' বছর ? সেবার শ্রীলা রান্নাঘরে ঢুকে বলল, কাঁকড়া রেঁধেছিস ! তা হলে ওকে একটু বেশি করে দিস, ভালোবাসে—'

'অন্যের বাড়িতে এসে স্বামীর তদারকি—', বললাম, 'এসবও করত নাকি ?'

'আমরা আবার অন্য হলাম কবে, শিশিরদা ! ও তো বলে হস্টেলে থাকতে জ্বর-টর হলে আপনি নাকি ওর হাত-পা টিপে দিতেন ! অন্য মনে করলে কেউ এসব করে !'

ভিতরে বাসন পড়ার শব্দ। রঞ্জনা উঠল।

বললাম, 'জানি, আমি অনেক বদলে গেছি—'

আজ সকালে অফিসে আসার আগে জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে হঠাৎই মাথা খারাপ হলো। দেড় দু' মাসে তিন-চার সেট শার্ট ট্রাউজার্স ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরছি, কাচা ও ইস্ত্রির চাপে শুভ্রতা ক্রমশ সাদা ও সাদা থেকে বিবর্ণ হয়ে গেছে ; এইভাবে চললে লোকে কি বলবে না, শালা বউকে মেরে সন্ন্যাসী সাজছে ! এই কি শিশির রে'র আউটফিট ! রাগ হলো তোমার ওপর, চিত্তকে ডেকে বকাবকি করলাম একচোট, 'রাস্কেল, কাজ কমে গিয়ে আলসেমি বেড়ে গেছে আরো ! এগুলো দেখতে পারো না একটু !' চিত্ত বলল, 'আলমারি-টালমারি খুঁজে দ্যাখো তো !' বললাম, 'কী আছে না আছে আমি জানব না ! সেখানে আর নতুন কী থাকবে !' চিত্ত বলল, 'থাকতেও পারে। দ্যাখো। আমার যেন মনে হচ্ছে যাবার আগের দিন কিছু কেনাকাটা করেছিল—'

তোমার ওয়াড্রোব খুলতেই বেরুল। চিত্তকে বললাম, 'ঠিক আছে। যাও—'

এসব হেসে-খেলে চলে যাবে আরো তিন-চার মাস ; কী ভেবেছিলে তুমি—, তারপর স্বাবলম্বী হয়ে যাবো ? অভ্যস্ত হয়ে উঠবো তোমার পাঠানো দুঃখে ! নাকি চেয়েছিলে আরো তিন-চার মাসের আয়ু !

তোমার পছন্দ ছিল। অফিসে তার ঘরে ঢুকতেই গুহ বলল, 'আজ তোমাকে বেশ ফ্রি লাগছে, অনেক দিন পরে। টাইটা নতুন বুঝতেই পারছি, শার্টটাও কি নতুন ?'

কী বলব বুঝতে না পেরে হেসে এড়িয়ে গেলাম। সব কথা সবাইকে বলা যায় না। জানি, তোমার কথা উঠলেই গুহ পুলিস আর হ্যারাসমেন্টের কথা তুলবে—আশা করি পুলিস তোমাকে আর হ্যারাস করেনি ! বুঝি না, এতো মাথাব্যথা কেন !

'আপনি যাচ্ছেন তা হলে— ? ক'দিন ?'

'যাচ্ছি তো। ধরো দিন পনেরো। তার বেশি নিশ্চয়ই নয়।'

'ঘুরে আসুন—'

হেসে ঠোঁটে পাইপ গুঁজল গুহ, দেশলাই খুঁজল ; হাত কাঁপছে অল্প।

'লাইফ হ্যাজ বিকাম প্রিসাইজলি ডাল—সব যেন বেসুরো বাজছে। অ্যাম আই গ্রোয়িং ওলড !'

'নট রিয়েলি—'

'তোমার চেয়ে বারো বছর অন্তত।' নিঃশ্বাস টেনে ছাড়তে ভুলে গেল গুহ, সময় ছাপ ফেলছে মুখে। না তাকিয়েই বলল, 'স্ট্রেঞ্জ থিংস আর হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড ! আমার স্ত্রী—বুঝলে—মাঝে মাঝেই একটা অদ্ভুত টেলিফোন পায়। কল রিসিভ করলেই ঝড়ের শব্দ—যেন একটা ঝড় আসছে— ! ইভন্ অ্যাট পাস্ট মিডনাইট ! কী জানি, আমি তো কখনো শুনিনি !'

'মনের ভুল নয় তো !' হাসি লুকিয়ে বললাম, 'কিংবা কোনো বদমাইসের কাজ—'

'বদমাইসি বোঝা যায়—', চিন্তিত গলায় বলল গুহ, 'তা নয়। ইট্স জাস্ট আ সাউণ্ড ! ঝড়ের শব্দ !'

বুকের ভিতর একটা খলবলে হাসি উঠতে উঠতে থেমে এলো কাশিতে।

সব ঠিক আছে। দ্যাখো, পৃথিবী এখনো চলছে আমার পরিকল্পনামতো। যদি একে হারানো বলে, আমি তার ওপর দিয়েই পাতছি আমার সেতু। আমি জানি আমাকে কী করতে হবে ; জানি, কীভাবে—এমনকি ঘুমের মধ্যেও সেই অদৃশ্য সেতুর ওপর দিয়ে চলবে আমার নিঃশব্দ পারাপার। গুম্-গুম্-গুম্-গুম্, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, এই রকম বা এই ধরনের কোনো শব্দ কি আপনারা শুনেছেন আগে ? যদি না শুনে থাকেন, নিশ্চিত হতে পারেন—শুনবেন একদিন। ঘুমে, কিংবা কিছু-নয় এমন কোনো পরিস্থিতির ভিতর, হঠাৎ ; কিন্তু, তার আগে নিশ্চিত হতে হবে কেন ও কে ও কীভাবে, যে-রকম আমি—, অসহনীয় এই অবস্থাটাকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

চারটের কিছু পরে উঠে পড়ল শিশির ; চন্দনকে কথা দিয়েছে আজ তাকে নিয়ে বেরুবে। করিডোর পেরুবার সময় কণাকে খুঁজল, পেল না ; চোখাচোখি হতেই মাথা নামিয়ে নিল ভাদুড়ী—, হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই, সেদিন ওর সঙ্গে গভীর শোয়াশুয়ির পরই আমার সন্দেহ হয়, এরপর কণাকে আমার সঙ্গে অ্যাটাচড্ রাখলে ব্যাপারটা জানাজানি হবে এবং একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হবে অফিসে, তাই তাকে চালান করে দিলাম অন্যত্র। কী বলছেন ? অফিসেই ঘরে ঢুকিয়ে একটু-আধটু চুমু-টুমু— ? শিশির রে অতো কাঁচা

লোক নয় ? যা বলেছেন ! এখন তো আর বউ নেই, ফ্ল্যাটেও অঢেল বিছানা, তো সন্ধের পর যদি পুরো ব্যাপারটাই চালানো যায়--, টুকটাকের ব্যাপারটা তো ফালতু ! গ্রেট !

'হাই, লিজ !'

'হ্যালো—'

কাঁচ। কাঁচের দরজা। প্লাস্টিকে চিরসবুজ। লিফ্‌ট। পুশ্‌ দি বাটন। শব্দ। ছবি। ছবির মুখ…

'সেলাম সাব।'

ভঙ্গি।

চার। তিন। দুই। এক…জি।

'হ্যালো, শিশির—'

'হ্যালো—'

'খবর কী ?'

'ফাইন। থ্যাঙ্ক ইউ। ক্যুড হ্যাভ বিন ওয়ারস্‌।'

সিঁড়ি। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ? ফুটপাথ। বিকেল…

রোদ্দুর এই সময় ভালোবাসা চায়, হাওয়ায় ঢলঢলে হয়ে ওঠে কলকাতা—ভিড়ে আক্রান্ত হবার আগে যে যার খুঁজে নেয় নিজেকে। হঠাৎ নিঃসৃত ধুলোমাটির গন্ধ চকিত হয়েই ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে দূরে। আরো কী কী হয় যেন ! হতে থাকে—মন কেমন করে ? অগোছালো মেঘে থমকে-থাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে ! হতে পারে। তুমি কি এই সময়েই এসেছিল সেদিন, ফিরে গিয়েছিলে !

টাইটা খুলে রাখল। ফার্স্ট থেকে সেকেণ্ড গিয়ারে যেতে যতো সময় লাগে তার চেয়ে দ্রুত থার্ড ও টপে পৌঁছে গেল শিশির ; হলুদ ও লালের তারতম্য থেকে নিশ্চিত লালে পৌঁছুবার আগেই দুরন্ত পেরিয়ে গেল একটা শক্ত ট্রাফিক। কির কির করছে চোখের কোণ, স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে শার্টের হাতায় চশমাটা মুছে নিল একবার। লোকে বলে র‍্যাট রেস, কমবেশি সেখানে অনেক প্রতিযোগী—আই ডোন্‌ট কেয়ার ; কিন্তু গতির প্রয়োজন যেখানে নিজেরই বিরুদ্ধে, নিজেকেই জিইয়ে রাখার জন্যে, তাকে কী বলবে ? মৃত্যু ? সে কেমন ! রক্তে আর থ্যাঁতা মাংসে অচেতন একটা দেহকে নিয়ে উটকো কিছু লোকের ছুটে আসা—গেছে-না-এখনো-আছে নিয়ে কানাকানি ? টেলিফোন ? খবর-কাগজের বাঁ দিকের পাতায় এক সি-এম নিউজপ্রিন্ট :

RAY: On July 27, 1976, in Calcutta suddenly, Sisir of Sandham Limited. Deeply mourned by...?

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, অ্যাঁ ! তোমার জন্যে শোক করবে বলে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে সবাই ! বাস্টার্ড ! বরং দ্যাখো, তুমি নেই, না-জেনে ভোরের হকার কেমন গলিয়ে যাচ্ছে কাগজ, নিখুঁত ভাঁজের মধ্যে এক সি-এম ব্যাপ্তি নিয়ে পড়ে আছো তুমি—বেলা যতো বাড়ে ততোই শুকিয়ে নির্ভার হতে থাকে সে—এক-একটা হাওয়া এসে তাকে শিখিয়ে যায় ডানা-ভাঙা পাখির চেষ্টা। ক্লান্ত, একসময় তবু ঠিকই উড়ে যায়।

আজ কতো তারিখ—সাতাশ ? না আঠাশ ?

'তুমি হাসছ কেন, বাবা ?'

'না। এমনি—'

'এমনি-এমনি কেউ হাসে নাকি !'

'কেন হাসবে না ! এই তো, আমিই—', হাসিটা বিস্তৃত করে চন্দনের পিঠে হাত রাখল শিশির, আসতে দেরি হলো নাকি ?'

'না। আমি এইমাত্র বাইরে এলাম। পলামাসি বলল তুমি আসছ কি না দেখতে—'

'বেশ করেছ।' পা দুটো ক্রশ করে গাড়িতে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল শিশির। ধোঁয়া গিলে, দূর থেকে দেখার ভঙ্গিতে তাকাল ছেলের দিকে—তুই কি শুকিয়ে যাচ্ছিস, চন্দন ? বলল, 'তারপর চন্দনবাবু, আজ কী কী করলে বলো ?'

'কী আবার ! লুডো খেললাম—', বলে বনেটের দিকে ঘুরে এলো চন্দন, 'বাবা, তুমি বলেছিলে আমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দেবে—'

'শিখবে ? বেশ তো, এখনই এসো না !'

কোমর ধরে ছেলেকে গাড়িতে তুলে দিল শিশির ; স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসিয়ে নিজে বসল বাঁ পাশে।

'এই যে দেখছ, এটা স্টিয়ারিং, গাড়ি চলার সময় এটা যেদিকে ঘোরাবে সেদিকেই চাকা ঘুরবে। আর এই হ্যাণ্ডেলের মতো জিনিসটা, এটা গিয়ার। এবার নিচে তাকাও—ডান দিকে অ্যাকসিলারেটর, মাঝখানে ব্রেক, আর বাঁ দিকে ক্লাচ। কী, দেখছ তো ?'

ফ্যালফ্যালে মুখ, চোখাচোখি হতেই চন্দন বলল, 'আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছ না কেন, বাবা ?'

হঠাৎ প্রশ্নে কী বলবে এক মুহূর্ত ভেবে পেল না শিশির। তারপর খুব আস্তে বলল, 'নিয়ে যাব, খুব শীঘ্রি একদিন নিয়ে যাব—'

পলা। চড়া এসেন্সের গন্ধে মুখ ফেরাল শিশির—আঁচলের ভাঁজ সামলাতে সামলাতে নেমে আসছে দ্রুত।

'দেরি করলাম নাকি খুব ?'

'না, তেমন কী—'

'আজকের বিকেলটা বেশ সুন্দর। কেমন হাওয়া দেখেছেন ?'

পাশ ঘুরে এসে দরজা খুলে চন্দনকে একটু সরিয়ে দিল শিশির ; নিজে উঠতে উঠতে বলল, 'উঠে পড়ো।'

পলা সামনেই বসবে। একবার পিছনের সম্পূর্ণ খালি সিটটার দিকে তাকিয়ে চাবি ঘোরাল শিশির, ফার্স্ট গিয়ারেই এগিয়ে গেল অনেকটা। পলা বলল, 'কোন দিকে যাচ্ছেন ?'

'কোথায় যাবে, চন্দনবাবু ?'

'জানি না—', হাই তুলতে তুলতে চন্দন বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে—'

'শরীর খারাপ লাগছে না তো ?'

'না। তুমি আস্তে চালিও, বাবা। অ্যাক্সিডেন্ট কোরো না যেন !'

পলা বলল, 'কী পাকা ছেলে রে বাবা !'

এখনো মনে আছে। সেকেণ্ড থেকে থার্ডে চেঞ্জ করার সময় গিয়ার ফেঁসে গেল, দ্বিতীয়—না, তৃতীয়—চেষ্টায় সেটাকে জায়গায় এনে একটা নিঃশ্বাস চাপল শিশির। অঙ্কটা একই ; তবু তিনজনের থেকে একজন সরে যাচ্ছে সারাক্ষণ ! দু'জন কি পরস্পরকে চেনে ! চন্দন শ্রীলারই ছেলে—এটা সে ভুলে যায় কেন !

তা হলে টপ গিয়ারই ভালো, ভেবে, অসহিষ্ণু হবার দিকে ঘুরে যায় শিশির—এসেন্সের নির্লজ্জ গন্ধ এলোমেলো করে দেয় তার নিঃশব্দ গতি। চন্দনের মাথাটা হেলে এসেছে তার বগলের কাছে, নড়েচড়ে আর একটু জায়গা ছেড়ে দিল শিশির ; ঘুমো, নিশ্চিন্তে ঘুমো। তুই আছিস, অ্যাক্সিডেন্ট হবে কী করে! না থাকলে ? চানস্ নেওয়া যেত ?

'ও যে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল!'

'দেখছি তো—'

সময় নিয়ে পলা বলল, 'বাড়ির সামনে এসেও বাড়িতে ঢোকেন না কেন, শিশিরদা ?'

'কেন, তা তুমি জানো।'

বিকেল শেষ হয়ে এলো প্রায়। এটা ঠিক কোন দিক ? পাশ দিয়ে সাঁ-শব্দে একটা লরি পেরিয়ে যেতে শিশির ভাববার চেষ্টা করল, ঠিক আর কতো দূর গিয়ে সে আবার ফেরার কথা ভাবতে পারবে!

'সব ঠিক হয়ে যাবে যদি একটা ঘটনা ঘটে যায়—'

'জানি—'

'জানেন!'

অল্প হাসল শিশির। থেমে বলল, 'যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি—।' তাকাল না।

ঠাসা গলায় পলা বলল, 'সম্ভাবনার কথা চেঁচিয়ে বলতে নেই।'

'ল অফ প্রবাবিলিটি। একটি মৃত্যু দেখেও তুমি টলোনি!'

'সেটা তার দোষ।' বলার ধরনে শরীর ছড়াল পলা, 'নিজের জিনিস কেউ চেয়ে পায় না। সেটা আঁকড়ে থাকতে হয়—'

'দিদিকে বলেছিলে এ-কথা ?'

'নিজের কথা অন্যকে বলতে যাবো কেন!'

'বাঁচালে।' অক্লেশে বলল শিশির, 'আমি একাই তা হলে তার অন্য ছিলাম না!'

জবাব পেল না। জানে তো, একটা জায়গায় এসে সবই থেমে যায়।

॥ পাঁচ ॥

এইভাবে, ক্রমশ সাবলীল হয়ে ওঠে পৃথিবী আর-এক পৃথিবীতে—তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে সব কিছু চিনে নেয় শিশির। সমস্ত হাওয়া এসে ক্রমশ ছুঁয়ে যায় তাকে, মাংস থেকে ক্রমশ আলাদা হতে থাকে হাড়, ধূপের গন্ধময় আচ্ছন্নতা এমনকি বেলার রোদ্দুরেও চুপিসারে ডেকে আনে গভীর মধ্যরাত। ফার্স্ট গিয়ার তুলে ক্লাচ থেকে পা টানতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গ, অ্যাকসিলারেটরের গর্জন শাসিয়ে ওঠে দূরের লোকজনকে—সাবধান, এগোবে না! খেলাচ্ছলে ক্ষণিক এঁড়ে বাছুরের মতো টালমাটাল লাফিয়ে উঠে থেমে যায় গাড়িটা। বিপন্ন, গ্যারাজ করে, খুব দূর দিয়ে ছুঁড়ে দেয় চাবিটা— : সবই না হারিয়ে যায় একদিন, তুমি বলেছিলে ? সন্ধেবেলায় লিভিং রুমের দূরত্ব পার হতে গিয়ে ফিউজড় ফ্লুরোসেন্টে চোখ আটকে যায় তার। আর ততো বিষণ্ণ লাগে না। দূরত্ব পেরিয়ে যায় অনায়াসে, হেসে—কী আর এমন অন্ধকার! আয়নায় তাকিয়ে দ্যাখো চোখ

দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আরো—বেশ্যার চোখের নির্নিমেষ সাদা থেকে বহু দূরে, পরিস্ফুট হাড়ের রেখায় স্বেচ্ছায় ডুবড়ে যেতে চাইছে চোয়াল, জুলপির ধূসর ক্রমশ দখল করে নিচ্ছে কানের দু'পাশ। গুম-গুম-গুম-গুম—স্বতোৎসারিত শব্দে প্রায় একই সময়ে ঘুম ভেঙে যায় তার। অভ্যস্ত চোখে লক্ষ করে খোলা জানলার বাইরে সময়-সন্ধির অন্ধকার। সেখানে বৃষ্টি পড়ে।

'হ্যালো— ? কে, চন্দন ? কেমন আছ ?'

'ভালো। তুমি কি আজ আসবে ?'

'দেখি—'

'বাবা !'

'কিছু বলবে ? বলো—'

'শকুন নাকি বাচ্চার গলায় ডাকে ?'

'তা হবে। হঠাৎ শকুন পেলে কোথায় !'

'আমাদের দেওয়ালে আজ সকালে একটা শকুন এসে বসেছিল। পলামাসি বলল, নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গন্ধ পেয়েছে—'

'তা হবে—। তারপর ? উড়ে গেল ?'

'না। শেষে অর্জুনমামা বন্দুকের আওয়াজ করতে বড়ো ডানা মেলে উড়ে গেল। তখনই ডাকছিল—'

'আচ্ছা ! ব্রেভ ! তোমাকে আমি একটা বন্দুক কিনে দেবো—'

এইভাবে, হাওয়া উড়ে যায় ক্রমশ দুঃখের দিকে। শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায় শব্দ—ধ্বনির মধ্যে ধ্বনি ; একান্তে নিজের হাঁটা-চলার শব্দ সোচ্চার হয়ে ওঠে কানে—লীন উপলক্ষ থেকে ধ্বনি এসে বিঁধে যায় বুকে, জেগে আছো ? নিজেই সম্মোহিত, বিড় বিড় করে বলে ওঠে শিশির, আছি। অপেক্ষায় আছি—। তুমি কি শুকিয়ে যাচ্ছ ?—জানি না। তুমি কি ধর্মান্তরিত হচ্ছো ?—জানি না ; জানি না তো ! তবে ? —শুধু বুঝতে পারছি, আমার দিনমান আটকে যাচ্ছে স্মৃতির খেলায় ; শুধু দেখতে পাচ্ছি, চেনাশোনা শব্দগুলো থেকে শীতের পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে অর্থ ; নতুন তাৎপর্য নিয়ে আবার ফিরে আসছে তারা।

এইভাবে !

একদিন, কী ভেবে, পরপর তিন দিন অফিসে গেল না শিশির। নতুন প্যাডে, কলমে নতুন কালি ভরে একই চিঠির খসড়া করতে লাগল বারবার। মনঃপূত হচ্ছে না। শব্দের প্রতারণা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলল চারপাশে—সাদা গোলা-পাকানো খসড়ার কাগজগুলো তুলোর বলের মতো খড়খড় শব্দ তুলে জায়গা বদল করতে লাগল মন্থর হাওয়ায়। সেই শব্দে কান পেতে রেখে চমৎকৃত সুখে ছিমছাম হয়ে উঠল শিশির, হাসল মনে মনে,—গিনিপিগ নিয়ে তোমার পরীক্ষা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, স্যাণ্ডহ্যাম ! আমার নির্ভুল চিঠি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে তোমার ঠিকানায়। অনেক দিয়েছ তুমি, আর নয়—এবার বিদায় ! কী বলছ, অভাব ? বাজে কথা রাখো ! তুমি কারও স্মৃতি নও, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের ছাপা কাঠিন্যে জুতো ঘষলেও ক্ষইবে না এতোটুকু ! ধন্যবাদ তোমাকে—ধন্যবাদ তোমার হাড়ের তৈরি টেলিফোন আর সাদা দেওয়ালকে। আমার জায়গায় যে আসবে তাকে লক্ষ করার জন্যে দরজার ফাঁক দিয়ে এক-একটা মাছি

পাঠিয়ে দিও মাঝে মাঝে ; ফুলে ফেঁপে ঢোল হোক তোমার ব্যালান্স শিট্ ! আমি ? চলে যাবে, ঠিক চলে যাবে। খানাখন্দে মুখ গোঁজা এতো যে মানুষ, দেখছ না, দুঃখহীনভাবে কেমন ক্রমশ তারা চলে যাচ্ছে চলে-যাওয়ায় গা ভাসিয়ে ! সে কি খুবই কষ্টকর—এই চলে যাওয়া !

তারপর সমস্ত ফ্ল্যাট জুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার পা দু'টি—আলো হাওয়ার ঝকঝকে প্রস্তুতি সত্ত্বেও শীতল মেঝে থেকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা এসে শরীরে অদ্ভুত এক স্বাদ ছড়াতে লাগল শিশিরের। চোখ ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ঐশ্বর্য ! চাকচিকাহীন, কিছু বা মলিন, অস্পষ্ট ধুলোপড়া সে-সবের গায়ে মাঝে মাঝে আদরের হাত বোলাতে লাগল সে। তোমরা আমাদের ছিলে—এতো দিন ; আমার নিজস্ব ছিলে কি ! শুনে, বুক-সেল্ফের ওপর থেকে স্পষ্ট চোখ মারল জাপানী গেঈসা। তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ হেসে গেল শিশির। লাভ নেই। যদি পারো, কেটে পড়ো স্বেচ্ছায়—আত্মহত্যা কোরো না। মর্গের অন্ধকার রূপহীন করে দেবে তোমাকে। সে বড়ো কষ্টকর।

যেন বহু কাল এ-রকম উচ্ছলতা বোধ করেনি শিশির। সেই একবার দেখেছিল ফ্ল্যাটের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ; তারপর আর প্রত্যক্ষ করেনি কিছু। অথচ, এই তার সাম্রাজ্যের অংশ ! ভেবে গলাভর্তি মজা উঠে এলো শিশিরের। কাছেপিঠে কেউ নেই ; নির্বান্ধব চারিদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল চিত্তকে।

'ডাকছিলে ?'

'হ্যাঁ। মিউজিয়ামে গেছিস কখনো ? হেঁটেছিস ?'

'কেন !'

'মেঝেয় পা দিয়ে দ্যাখ সে-রকম ঠাণ্ডা কি না ! যেন শরীর বেয়ে উঠে আসতে চাইছে !'

'তা অবশ্য—', ভেবেচিন্তে চিত্ত বলল, 'ঠাণ্ডা একটু আছে। মোজেইকে হয়।'

একটু চুপ করে থেকে শিশির বলল, 'মেঝেয় শুতে তোর বউদি খুব ভয় পেত। গোটা শীতকাল ঘুরে বেড়াত পায়ে মোজা পরে।'

'তা একটু সর্দির ধাত ছিল বইকি। হাসতে হাসতেই হাঁচত যখন-তখন !'

'তাই বুঝি ! থেমে থেকে, সময় নিয়ে জনান্তিকে বলল শিশির—হাসতে হাসতে, 'বিয়ে-থা তো করলে না ! তা হলে বুঝতে একটু-আধটু সর্দি আর জ্বরটর না হলে, চোখ ছলছল না করলে মেয়েরা মেয়ে হয়ে ওঠে না।'

কোঁ-কোঁ শব্দে কলিং বেল বাজছে। কে ! কে হতে পারে ! শব্দটায় চোখ রেখে নিজেই হেঁটে গেল শিশির।

পাকড়াশী। একা নয়। সঙ্গে শিখার মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে সুষি ; তার একাগ্রতা এড়াতে আঁচল টানল বুকের। স্যুইট, অ্যাণ্ড বেডেব্‌ল ! অকারণ, তবু শেষ শব্দটা তলপেট ঘুরে উঠতে লাগল বুকের দিকে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে, পিছনে ওটা কে ? ও, ছোট শালা ! হ্যালো !

'অফিস-টফিস যাচ্ছ না। শুনলাম জ্বর হয়েছে—', বাঞ্ছিতের ভঙ্গিতে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে পাকড়াশী বলল, 'খবর কী তোমার ?'

টান-টান দাঁড়িয়ে শিশির বলল, 'খবর ? সুখবর আছে—ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিচ্ছি—'

'কী বললে— ? ইউ আর নট জোকিং !' বসতে গিয়েও দ্বিধা হলো পাকড়াশীর, হাসিমুখে শিশিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ-পাড়ায় ধুলো বেশি নাকি ?'

'না, ঝাড়া হয়নি।' ঠাণ্ডা গলায় বলল শিশির, 'আপনি হঠাৎ এসে পড়বেন ফ্ল্যাটের খোঁজে, জানতাম না তো!'

আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, দরজা জুড়ে। মাঝখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে সুষি। কপাল জুড়ে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়তে একটা সম্ভাবনায় সোজা হতে লাগল শিশির। আজ না হোক, কাল, কিংবা আর-একদিন, ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেবো। বাট, পাকড়াশী, ইউ হ্যাভ টু পে ফর মাই স্টেটাস। ইউ হ্যাভ টু পে ফর দি ইনসাল্ট। আমি, শিশির রায়—অপমান ভুলি না।

সোফাটা শেষ পর্যন্ত দখল করে নিল পাকড়াশী।

'বীরেশ্বরের সঙ্গে কি আলাপ হয়েছে তোমার? আমার ছোট শালা—'

'ওয়েলকাম।' শিশির ভেবেছিল হাত তুলবে নমস্কারের ধরনে—অভ্যাস কখনো কখনো স্বয়ংক্রিয় করে তোলে; তার আগেই 'হ্যালো' বলে থেমে গেল বীরেশ্বর। ব্যবহারে অদ্ভুত নির্লিপ্ত, কোথাও কোনো প্রবণতা আছে বলে মনে হয় না।

স্বাভাবিক অভ্যাসে শিশির বলল, 'মিস্টার পাকড়াশী, চা কফি কিছু—'

'নো, থ্যাঙ্কস্। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

সুষি বসছে না; সম্ভবত বীরেশ্বরের হাবভাব গোপনে নিষ্ক্রিয় রাখছে তাকে। লোকটিকে কি ক্লাবে দেখেছিল সেদিন! হয়তো; হয়তো দ্যাখেনি—সেদিন সে ড্রাঙ্ক ছিল; পরে পাকড়াশী মনে করিয়ে দেয়।

সিলিং ও দেওয়াল ছুঁয়ে ঘুরছে সুষির চোখ—সেই সঙ্গে কোমরের পেলবতা, আয়তের আকারে সেখানে ক্রমাগত আলো ফেলে যাচ্ছে রোদ্দুর। দ্বীপ বলতে ওইটুকু। এই মুহূর্তের অসতর্কতায় জলের মধ্যে শিশির তার আশেপাশে ঘুরতে লাগল।

'সত্যি!' সুষি বলল, 'কী সুন্দর ফ্ল্যাটটা আপনার!'

শরীর! লিভিং-রুম জুড়ে আশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে তার সুগন্ধ; মাংসের ভিতর পিঁপড়ের নৈঃশব্দ্যে হেঁটে চলেছে সজীব ক্বাথ—স্পর্শে পাপড়ি মেলার মতো ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে! সুষি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে একদিন শ্রীলা এসে দাঁড়াত। শ্রীলা—যে শিশির রায়ের স্ত্রী। ছিল? এখনো আছে? জানি না। আজকাল আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু, আমি স্টেটাস চিনি। সেটা ভিতরের ব্যাপার—যে-রকম টান, রক্তে উজ্জীবিত হতে হতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। চেনানো যায় আঙুলের হাড়ে তৎপরতা মিশিয়ে। বাইরে থেকে তুমি তা কিনতে এসেছো, সুষি! আই ডোন্ট মাইণ্ড। পাবে। কিন্তু, তোমার সঙ্গে ওই লোকটা কে! ওই যমদূতের মতো লোকটা! উইথ দ্যাট ইনফারনাল লুক! ও কি সত্যিই তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে উচ্চাশা কিংবা গভীর—গভীর এক নিরাপত্তার দিকে—যেখানে বৃষ্টি আছে, আকস্মিক জেগে ওঠা নেই! আমি, শিশির রে—আমিও কি পেরেছি!

পাকড়াশী তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।

'এটা ভালো খবর। তবে, আমি কিন্তু ফ্ল্যাটের খোঁজে আসিনি, শিশির।' একটু থেমে, দম নিল পাকড়াশী, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম ঘুরে যাই একবার। আমার ইনভিটেসান পাওনি? আসছ তো পার্টিতে?'

শিশির হাসল। মেঝের ওপর দিয়ে খড়খড় শব্দ তুলে জায়গা বদল করছে তুলোর বলগুলো। শব্দে কান পেতে অন্যমনস্ক, বলল, 'দেখি—'

'দু' তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে।'

'দেখি—'

প্রিটেনসান! বাংলাটা কী? চাতুরী? হবেও বা। লোকটা জানে না, শব্দের নেপথ্য থেকে খসে যাচ্ছে ব্যবহার; স্মৃতি জুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে—, কী! এমন মধুর! জানে না, শিশির রায় আর স্যাণ্ডহ্যাম লিমিটেড এক নয়। জানে না, গোপন অস্ত্রে শান দিচ্ছে সে, যে, যে-কোনো একজন— খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবী চিনে নেবে তাকে।

তোমাকে বলিনি, ঝাপসা ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছে ক্রমশ—আজকাল আমি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। দেখি, চারিদিকের ব্যস্ততা আর ছুটোছুটি আর শব্দের মধ্যে থেকে সময় খুঁটে খুঁটে তুলে নিচ্ছে এক একজনকে—কেউ দেখছে না, কেউ বুঝতেও পারছে না। চলমান বাস থেকে পড়ে সেদিন একটা মানুষ চলে গেল তার চাকার তলায়। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম বাসটার গাদাগাদি ভিড়। এতো, যে কোনটা কার বুক, কোনটা কার হাত-পা, কোনটা কার মুখ বা কোনটা সেই মুখের জামা—চেনা যায় না। লোকটা চাপা পড়বার পরও ভ্রূক্ষেপহীন ভয়ঙ্কর গতিতে বহু দূর পর্যন্ত ছুটে গেল বাসটা। দেখি মৃত্যুর আগে ঊর্ধ্বে হাত তুলে শেষ কিছু ধরবার আকাঙ্ক্ষায় একা মানুষটি মোচড় দিচ্ছে তার শরীরে—আশপাশ থেকে হা-হা করে ছুটে আসছে লোকজন, তারা কেউই সেই বাসের যাত্রী নয়। কেন যেন আমার মনে হলো, এতো গাদাগাদি জড়াজড়ি করে ছিল—তবু, ওদের কেউ কি মনে করতে পারবে, যে গেল সে কে? কেমনই বা তার মুখের আদল! যদি না পারে, তবে কেনই বা এই পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা—কেন দৌড়, কেন পোশাকের সচ্ছলতা!

এক-একদিন খুব ভোরে উঠে প্রায়ান্ধকারে বেরিয়ে পড়ি আমি। তখনো ট্রাম ছাড়ে না, পাখি ডাকবে কি না নিশ্চিত হতে পারি না। স্তব্ধ চারিদিকের মধ্যে আমার নিঃশব্দ হেঁটে চলার দিকে তাকিয়ে আচমকা ডেকে উঠে আবার পেটে মুখ গুঁজে দেয় কুকুর। তখন অন্ধকারের ভিতর থেকে নিঃশব্দে উঠতে থাকে শব্দ—আমি এগিয়ে যাই আস্তে আস্তে, সেই নির্দিষ্ট রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই, অপেক্ষা করি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অনুভব করি এতো কালের সব রোম ক্রমশ ঝরে যাচ্ছে আমার শরীর থেকে—ক্রমশ দেখতে পাচ্ছি নিজেকে, যে-আমি বিশুষ্ক, শ্বেত, আগাগোড়া লীন! জানি তো, আর একটু পরে ভোর হবে, আর-আর দিক থেকে উড়ে এসে ভিড় করবে অন্যান্য পাখিরা—মানুষের পর মানুষ, তাদের সহানুভূতিতে উচ্ছিষ্ট হবে হাওয়া—এতো চ্যাঁচামেচি কেন চারিদিকে! তারা বোঝে না, এ আমার স্বেচ্ছারূপ, চলে যাচ্ছি ভেবে আমি সত্যিই কাতর হচ্ছি না!

একদিন খুব মজা হলো। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ তাকিয়ে আছি দূরে, হঠাৎ চোখে পড়ল, হাতে পুরনো ছাতা, আটপৌরে পোশাকের এক বৃদ্ধ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে এক-একজনকে কী জিজ্ঞেস করে নিচ্ছে যেন। আমাদের ফ্ল্যাটের নিচে এসে থেমে গেল লোকটি, রোদ আড়াল করার জন্যে হাত দিল কপালে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'শিশির রায় কোথায় থাকে, বাবা?'

গলা শুনে চেনা লাগল। বেশ কিছুক্ষণ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম—নীরদ ভট্টাচার্য। তোমার মনে আছে? বলেছিলে 'পাষাণ', স্কুলে পড়াত। হ্যাঁ, রবাহূত এসেছিল সেদিন, আমাদের বিয়ের রাতে। কেন যে এখনো মনে রেখেছে আমাকে!

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দরকার তাকে?'

'আছে, খুব জরুরী দরকার— ।' লোকটি তবু চিনতে পারল না আমাকে ।

ভাবলাম, যেতে বলি । তারপর ভাবলাম, থাক । না চিনুক, এতো দিন ধরে নামটা তো মনে রেখেছে ; কে আর রাখে ! আর, ওই না-চেনার ব্যাপারটা, ওটা চোখের দোষও হতে পারে ।

বললাম, 'ওপরে উঠে আসুন । আমিই শিশির ।'

'তুমিই ! শিশির !'

হঠাৎই যেন কেমন দিশেহারা ভঙ্গি ফুটে উঠল তার । ব্যস্তভাবে বলল, 'তোমাকে নামতে হবে না, বাবা ! আমিই আসছি—'

শূন্য চোখ মেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল নীরদ ভট্টাচার্য—ফ্যাকাশে তার চোখে দীপ্তি নেই কোনো, তবু । ভাবলাম, দৃষ্টি দিয়ে যে চিনতে পারে না, কী, মানে হয় তার এই চেয়ে থাকার, কী মানে হয় এইভাবে নম্বর মিলিয়ে চলে আসার ! নীরদ কি বুঝতে পারল আমাকে ? জানি না । তবে তার প্রশ্ন ছুঁয়ে গেল হঠাৎ ।

'শিশির, তোমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন, এটা কি সত্য ?'

বললাম, 'হ্যাঁ ।'

শুনে ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল নীরদের ; স্তব্ধতা থেকে বলে উঠল, 'তা কী করে হয় ! তোমার যে স্ত্রী, তাঁর তো কোনো দুঃখ থাকার কথা নয়—'

কথাগুলোর মানে যে কী, বুঝতে পারলাম না ঠিক ঠিক । মনে হলো, লোকটা হয় পাগল না হয় অভিনেতা—না হলে এতো দিন পরে এসব বলতে হাজির হবে কেন ! ভাবছি কী করে বিদায় করব, দেখি, বিড়বিড় করছে লোকটি—সেই অবস্থাতেই ভাঙতে শুরু করল । তাড়তাড়ি ধরে তাকে বসালাম সোফায় । বললাম, 'এমন করছেন কেন ! সামান্য একটা মৃত্যু বইতো নয়—মানুষ কি আত্মহত্যা করে না !'

'করে । তবু, তোমার স্ত্রী— ! কী শিক্ষা তবে পেয়েছিলে তুমি ! আমিই বা কী দিলাম ! মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে—'

আপন মনে ঘুনঘুন করে কেঁদে উঠল লোকটা । তারপর ফুঁপিয়ে । প্রায় ছানিপড়া তার দুটি চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল ক্রমশ—দেখে হাত-পা শূন্য হতে লাগল আমার ; অভিভূতের মতো বসে পড়লাম তার পাশে । লোকটি আমার হাত চেপে ধরে বলতে লাগল, 'যার কিছু নেই, তার শুধু বোধ থাকে, অহঙ্কার থাকে । আমার কী থাকল, শিশির !'

তারপর যখন খেয়াল হলো, দেখি, আমার কাঁধের কাছে নীরদের মাথা ; প্রায়ান্ধ তার চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে আমার বুক আর জামা, ধূসর ধুলোভরা চুল থেকে উঠে আসছে জরার গন্ধ—সে-সব কিছুই স্পর্শ করছে না আমাকে । সম্মোহিত করে রেখেছে তার খরার মাঠের মতো রেখাকীর্ণ মুখ, তার শব্দহীন কান্না ।

কোন বোধ, কোন অহঙ্কারের কথা বলে গেল লোকটি ! এই যে কান্না—সে কার জন্যে ! তোমার ? আমার ? নাকি দু'জনেরই জন্যে ! নাকি ভুল থেকে যাচ্ছে আমার বোঝায় ! আমি বা তুমি উপলক্ষ শুধু—এ-সবের গভীরে আছে আরো বড়ো কোনো তাৎপর্য ! লোকটা কেঁদে যাচ্ছে—একা ; নিজেরই শোকে !

তবু তার কান্নায় বুক পেতে অনেকটা হালকা লাগল নিজেকে । শুনলে তোমার হাসি পাবে, মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই ছোট্টটি হয়ে ফিরে গেছি দেশ-গাঁয়ে—সামনে ছোটবেলার নদী, ভাঙনের স্পর্ধাহীন তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে তার সরল ঢেউ ! নীরদ

ভট্টাচার্যকে আমি চিনি না ; সেও কি আমাকে— ? তবু আমাদের দু'জনের মধ্যে দিয়েই বয়ে যাচ্ছে সেই একই স্রোত ! অনেক দিন পরে আমার চোখে জল এলো—শ্রীলা, আমি তো তোমার জন্যেও কাঁদিনি ! অনেক দিন পরে অর্থহীন একটি মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে গেলাম অনেক দূর। খেয়াল করিনি, কখন, কিছু না বলেই চলে গেল লোকটা—যে-রকম যায়। আমি তখনো হাঁটছি, একা—ঘাস-মাটি-নির্জনতার গন্ধে ভরা অন্ধকারে।

আরো একটু পুরনো হয়ে গেল শিশির—দিনে দিনে, আরো একটু বিষণ্ণ আর হাল্‌কা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দ্যাখে সে, ট্রাম, বাস, দৃশ্যমান গতির দিকে তাকিয়ে বিভোর হয় ; দ্যাখে মানুষজন—এক-একজনের মুখ এক-এক রকম, তবু সব মুখগুলিই যেন শেষ মুখটির মতো ! কিংবা সে কিছুই দ্যাখে না—তার বুকের ভিতর তিরতির করে বয়ে যেতে থাকে কোন শৈশব থেকে ফিরে-পাওয়া নদী এক ; শানানো অস্ত্রের ওপর হাত রেখে ভুলে যায়, কেন ! শুধু ভাবে। ভেবে যায়। অনির্দিষ্ট হাসি চমৎকার আড়াল খুঁজে নেয় তার ঠোঁটের কোণে। অতনু, সত্যি একটা গপ্‌পো হয় না আমাকে নিয়ে ? যার শুরু আছে, শেষটা পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ ! কিংবা, সত্যিই যার শেষ নেই কোনো—দিক্‌চিহ্ন নেই ! কী বলছিস, শুদ্ধতা ? সেই দিকে যেতে হবে ? সেটা কোন দিকে ? কেউ জানে না ! কী বলছিস, চিনে নিতে হবে ! হয়তো। আমি ঠিক জানি না।

॥ ছয় ॥

এইভাবে।

যেতে যেতে ক্রমশ একদিন আবার পুরনো সিঁড়িতে পা রাখল শিশির। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছে স্তব্ধ আলো ; মনে হয় বহু দিন পা পড়েনি কারও। দেওয়ালের ছিমছাম মসৃণতায় বসতে গিয়েও পিছলে যাচ্ছে পোকা ; অন্য দিক দিয়ে বাতাস কেটে উঠে যাচ্ছে লিফ্‌ট্‌, মিহি শব্দের রেশ শেষ হচ্ছে মেহগনির দরজায়—সেখানে ব্রাশের নেমপ্লেট, মনে হয় মুখ দেখার জন্যে এইমাত্র মেজে গেছে কেউ ; স্পর্শমাত্র স্তনের বোঁটার মতো সচকিত হচ্ছে কলিং বেল—শান্ত তার শব্দে টুং-টাং ঝরে পড়ছে রক্ত। এসব দৃশ্য ও শব্দে চোখকান খুলে রেখে মনে মনে হেসে নিল শিশির। আমার বারো ঘন্টার বিস্মৃতি, তোমাদের ক্ষমা করেছি। তোমরাও আমাকে ক্ষমা কোরো। যে নিজেই হেরে গেছে তাকে আর প্রলোভন দেখানো কেন !

'ডেকেছিলে ?'

'এতো দিন কোথায় ছিলে, শিশির ?'

'এতো দিন !' ভুলো গলায় বলল শিশির, 'জানি না তো ! জেনেও কি লাভ আছে !'

জবাব না দিয়ে খুব কাছে ঘেঁষে আসার চেষ্টা করল রম্ভা, যতো কাছে এলো সম্মতি ছুঁয়ে যায় শরীর।

'অনেক দিন পরে এলে। আমাকে কেমন দেখছ শিশির ? একটু মোটা হয়েছি কি ?'

'কিলোর দরে হলে বলতাম দামী হয়েছ—'

'ঠাট্টা করছ !'

'না। বাঃ!' সটান বেডরুমে ঢুকে এসে শিশির বলল, 'কভারটা তো বেশ! নতুন কিনলে?' বলতে বলতে বিছানার ওপর পড়ে-থাকা লাইটারটা তুলে নিল মুঠোয়, 'গুহসাহেবের খবর রাখো! ফিরছে কবে?'

'এখানে আবার গুহর কথা কেন!' রম্ভা বলল, 'শুধু আমাকে তোমার ভালো লাগে না, শিশির!'

'ভালো না লাগলে আসব কেন!'

'আসো অভ্যাসে—'

'অভ্যাসে!'

'তা বইকি! ন্যুডের চেষ্টা থেকে উঠে গেল রম্ভা; দূর থেকে বলল, 'রেমি মার্টিন আছে। চেখে দেখবে নাকি একটু?'

'থাক। আর একদিন হবে—।' শিশির হাসল। একটা সিগারেট জ্বেলে ধোঁয়া টেনে বলল, 'আমার পেছনে এতো খরচা করবে কেন! পোষাবে কি!'

সত্যিই কি সে কথা বলছে অন্য ভাষায়, অন্য স্বভাবে!

কাছে আসতে গিয়েও আবার দাঁড়িয়ে পড়ল রম্ভা। অ্যাঙ্গেল বেছে নিয়ে বলল, 'তুমি বদলে গেছো, শিশির! কেমন যেন ডাল হয়ে গেছো!'

'বলছ? তা হবে হয়তো।' অক্লেশে বলল শিশির, 'আমার ব্রাইটনেসটাকেই তুমি খুঁজেছিলে, আমাকে নয়। এখন কী হবে!'

জবাব দিল না। হেঁটে যেতে যেতে রম্ভা বলল, 'বোসো—'

চুপচাপ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল শিশির। বাথরুমে জল পড়ার ঝিরঝির শব্দ থেকে তালগোল পাকিয়ে উঠে আসছে বৃষ্টির শব্দ—আলোয় মুখ ঘষছে অন্ধকার। অন্ধকার? হতে পারে।

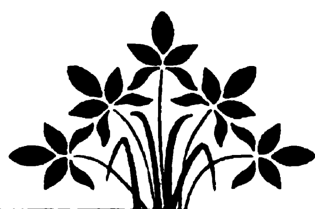
এলোমেলো বোধ থেকে মাথাটা হেলিয়ে দিল সে, ক্লান্তির দিকে; হাতটা টেনে আনল কপালের ওপর। নিঃশ্বাসে বরফকুচি মিশিয়ে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল বুকের দিকে।

ঘুম আসছে, ঘুম। কিংবা, ঠিক ঘুমও হয়তো নয়—অদ্ভুত প্রশান্তিতে ছুটি খুঁজছে রক্ত, যেন বহু দূর বিস্তৃত মাঠের নির্জনতায় যথেচ্ছ বিশ্রামের জন্যে বাছ-বিচারের প্রয়োজন নেই কোনো। বিস্মৃতি জুড়ে অসংখ্য পাখির এলোমেলো ওড়াউড়ি, স্মৃতি; নৈঃশব্দ্য কোলাহল করছে কানে—তুমি কি ভালো নেই, শিশির?

অ্যাশট্রের ভিতর সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে চুপচাপ হাসল শিশির।

না, বেশ আছি। এখন এখানে আছি; একটু পরে উঠে যাবো। দ্যাখো, কেমন সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছে এক-একটা দিন! কী মধুর নিঃস্বতায় মিশে যাচ্ছে নিঃশ্বাস, স্মৃতি মিশে যাচ্ছে স্মৃতিতে। কাল যেখানে ছিলাম, আজ ঠিক সেখানে নেই। ঘাস মাটি নির্জনতার গন্ধে ভরা এই অন্ধকারে চুপিসারে আরো একটু এগিয়ে যাব কাল—

একে কি হারানো বলে!



উড়োচিঠি

উড়োচিঠি

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
জুন ১৯৭৮ (আষাঢ় ১৩৮৫)
প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ১০·০০ । প্রচ্ছদ : অলোক ধর

উৎসর্গ :
শ্রীমতী কৃষ্ণা তালুকদার
সুচরিতাসু

॥ এক ॥

আজ ভোরে একেবারে অন্য রকম হয়ে উঠেছে আকাশ। ঠিক কী রকম. বোঝা যায় না। তবে অন্য রকম ; আগে কখনো চোখে পড়েনি, এমন। পাতলা জলকালির আভা থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে আবছা নীলের দিকে, তারও মধ্যে থেকে কখনো উঁকি দিচ্ছে স্বচ্ছ লাল—মিহি ভয়েলের নিচে হাতের তালু মেলে ধরলে যে-রঙ উঠে আসে। লম্বা দেবদারু আর কী সব গাছের মাথা ডিঙিয়ে যে জায়গাটা বেগুনির আভা-লাগা লালে রূপান্তরিত হচ্ছে ক্রমশ, ওটাই বোধ হয় পুব দিক। একসঙ্গে অনেকগুলো চড়ুই কিচিরমিচির করতে করতে এইমাত্র ছুটে গেল ওই দিকে। ওদের পিছনে পিছনে দু'টি টিয়া। ওরা যেদিকে, তারই আশেপাশে কোনোখানে জ্বলজ্বল করছিল একটি তারা, এক্ষুনি হারিয়ে গেল কোথায়! হয়তো ছুটে গেলে ওই গাছ-গাছালির মাথায় বা পার্কের ভেজাভেজা ঘাসে এখনো আবিষ্কার করা যাবে তারাটিকে। ঘাসের আগায় কিংবা গাছের পাতায় এখনো কি লেগে আছে টুকরো কাচে জড়ানো তার জ্বলজ্বলে দীপ্তি! কে জানে! বয়সে আরও ছোট হলে ছুটে গিয়ে দেখতে পারত। একবার গিয়েছিল, সে অনেক দিন আগেকার কথা। হঠাৎ হারানোর রহস্যটা অবশ্য কোনো দিনই বুঝতে পারেনি।

আজ ভোরে 'কে জানে'র অনিশ্চয়তা ছুঁয়ে গেল টুপুরকে। তারাটি সে লক্ষ করেছিল সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়। নার্সিং হোমের লিফ্ট যদিও সারাক্ষণই চলে, তবু ভোরের এই সময়টা নামতে গিয়ে টুপুর দেখল প্রায় জনাবারো মেয়ে-পুরুষ তখনই গাদাগাদি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে লিফ্টের সামনে। টানা বারান্দা ধরে এগিয়ে আসছে আরও দু'জন। আত্মীয়-স্বজনদের থাকাথাকির ব্যাপারে এখানে নাকি খুব কড়াকড়ি। কাল সন্ধেয় নীলার 'পেন' শুরু হয়েছে শুনে সে যখন আসবে বলেছিল, অল্প ইতস্তত করেছিল ছোড়দা। কড়াকড়ির জন্যেই তার আর ছোট বউদির মা'র থাকার জন্যে স্পেশাল পারমিসান করাতে হয়েছিল। এখন ফেরার সময় দেরি হবে বুঝে সিঁড়ির পথ ধরেছিল টুপুর।

ছ'তলা সিঁড়ির একদিকে কাচের দেওয়াল, নামতে নামতে কাচে মুখ চেপে ধরে প্রায় ফরসা হয়ে আসা বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্য সব অস্পষ্টতার মধ্যে হঠাৎ তারাটিতে চোখ আটকে গেল টুপুরের। কে জানে কেন, মনে হলো, মেয়ে হলে মা হতে হয়। আজ থেকে আগের চেয়ে একটু বদলে গেল ছোট বউদি। অতো যে লাজুক, তবু খানিক আগে দেখবার জন্যে তুলতুলে বাচ্চাটাকে যখন কাছে দিয়ে গেল নার্স, শিখিয়ে দিল আলতো কাছে ধরে কীভাবে দুধ দিতে হয়, একটুও লজ্জা না পেয়ে হাসিমুখে কেমন নির্লজ্জ হয়ে গেল নীলা! সদ্য জেগে-ওঠা চোখে টুপুর ওর অনেকটাই দেখেছে। নীলা তার চেয়ে ঠিক চার বছরের বড়ো ; আজ যেমন তেমনি ছোড়দার বউ হয়ে আসার পর—কালরাত্রির দিনও টুপুর তার সঙ্গে ছিল। আজ দেখল, বাইরে থেকে যা বোঝাত তার চেয়ে অনেক বড়ো আর সুন্দর তার

বুক। নীলা না পাক, সে নিজেই লজ্জা পেয়েছিল। আচমকা সিরসিরানি নেমে গিয়েছিল গোটা শরীর বেয়ে।

দৃশ্যটা মনে পড়তে আর একবার কেঁপে গেল টুপুর।

আজ ভোরে হাওয়ার দাপটও যেন বেশি—চারিদিক খোলা পেয়ে তুর্কিনাচন লাগিয়েছে। ফিনফিনে হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাথার চুল। ডান হাতে তাদের সামলাতে গিয়ে আঁচল উড়ে গেল বাঁ কাঁধ থেকে—অবাধ্যর মতো অনেকটা এগিয়ে গেল হাওয়ায়। যাক। এই ভোরে, এই চমৎকার হাওয়ার মধ্যে টুপুর নিজে আর ওই গাছ, পাখি, আকাশ আর পার্কের রেলিং ছাড়া কেউ কিছু দেখতে আসছে না। দেখলেই বা হতো কী! এসব কোন মেয়েরই না থাকে! কলেজের বারান্দায় একদিন এই রকম আচমকা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল সে, গল্প করতে করতে থমকে তাকিয়েছিল রজত, একেবারে হাঁ-করা চোখে। টুপুর বলেছিল, 'অ্যাই, অমন অসভ্যের মতো তাকিয়ে আছিস কেন!' বলতে বলতে গুছিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। 'তুই কী সুন্দর, টুপুর!' থমকানো গলায় বলেছিল রজত ; আর কিছু নয়। একটুও দেরি না করে টুপুর বলেছিল, 'তুই কী ন্যাকা রে! একেবারে বোম্বাই-মার্কা!' যেন ভেংচানি দিতে পারলেই সুবিধে হতো। দু'জনেই হেসে উঠেছিল একসঙ্গে। সুন্দর কথাটার মানে বুঝেছিল পরে। ক্লাসে গিয়ে, তারপর, অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছিল টুপুর, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ভালোবাসা হয় না।

এসব অনেক দিন আগেকার কথা। রাস্তা খোলা পেলে যেমন হাওয়া—তেমনিই হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে চলে এলো কাছে। না হলে এ-রকম কতোবারই তো আঁচল উড়ে যায়—সবাই কি সব সময় হাঁ করে গেলার জন্যে তাকিয়ে আছে তার দিকে! না উড়তেই, শুধু অভ্যাসের বশে, কতোবার যে কাঁধের ওপর ঠিকঠাক করে নিতে হয় আঁচল! এখন যেমন নিল। কী মনে পড়ায় ব্যাগ থেকে ছোট চিরুনিটা বের করে বুলিয়ে নিল চুলের ওপর। আবার আঁচল তুলে মুখটা মুছে নিল ভালো করে, আলতো জিব বুলোল ঠোঁটের ওপর—যাতে রাত-জাগা, খড়ি-ওঠা ভাবটুকু মুছে যায় স্পষ্ট। এই ভোরে, এই সদ্য জেগে-ওঠা রাস্তায় কেউ দেখছে না তাকে। তবু না ভেবে পারল না টুপুর, সে মেয়ে—মেয়ে, মেয়ে ছাড়া কিছু নয়। তাকে আড়াল খুঁজতে হবে।

তাই নিয়ম। এটা সে আগেই বুঝত। আজ বুঝছে আরও ভালো করে। হাওয়ায় ভোরের গন্ধ ; ঘাস পাতা ভিজে ধুলোয় মেশা সেই গন্ধ ছাপিয়েও, তবু, আর একটা গন্ধ বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে তাকে। মেয়ে হওয়ার গন্ধ, মা হওয়ার গন্ধ। মেয়ে হলে মা হতে হবে। হাল্কা পায়ে পার্কের রেলিং ঘেঁসে আরও অনেকটা চলে এসে যখন হঠাৎই আবার নার্সিং হোমের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল, বাড়িটা চোখে পড়লেও ঠিক কোন ঘরটায় তারা ছিল চিনতে পারল না—যেতে যেতে ভাবল টুপুর, গন্ধটা একটানা। কিংবা মেয়ে হওয়া ও মা হওয়ার মধ্যে গন্ধের তফাতটুকু এতোই সূক্ষ্ম, কিংবা ডেটল, বরিক-তুলো আর লাইজলের গন্ধে মিশে এমনই এলোমেলো যে, তফাতটা সত্যিই ধরা যায় না। বুঝে নিতে হয়। কিংবা ধরা যায় মুখের দিকে তাকিয়ে, বুকের দিকে তাকিয়ে। একটু আগে নীলাকে দেখে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে সে। কতো সহজে বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিল ছোট বউদি—যেন এই রকমটিই সে করে আসছে এতো দিন। তারপর নার্স যখন বলল, 'এখনো দুধ দেবার সময় হয়নি, হলে বলে দেব—', সেই মুহূর্তে, মনে পড়ল, চোখে কেমন ঝিমুনি এসেছিল নীলার, মুহূর্তের জন্যে আলস্যময় ঘোলাটে চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। ঠিক

যে তাকেই দেখেছিল তা নয় ; তবু এক রকম অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল টুপুর। লজ্জায় ? হয়তো। এতোটা পরে সব মনে থাকার কথা নয়। শুধু মনে আছে, হঠাৎ শীতের মতো কী একটা ঢুকে পড়েছিল শরীরে। তখনই সে চলে আসার কথা ভাবে। কোনো দিকে না তাকিয়েই দেওয়ালকে উদ্দেশ করে বলে, 'চলি—'

তখনই কোনো উত্তর দেয়নি নীলা। দেবার কথাও নয়। ওর বাচ্চাকে বুকে ধরে রাখার একাগ্রতা থেকেই টুপুর বুঝেছিল, নীলার জগৎ ছোট হয়ে এসেছে—এখন নিজেকে উজাড় করে দেবার চেষ্টা করছে ; টুপুরের থাকা না-থাকায় কিচ্ছু যাবে আসবে না। আশ্চর্য, কিছু না বুঝেও এই কথাটি সে ভেবেছিল কী করে !

লেবার রুম থেকে নীলাকে এখানে আনবার পর মাসিমা সেই যে সোফার ওপর ঘুমোতে গেল সুখে, তার ঘুম ভেঙেছে এই একটু আগে। এখন কেবিনের লাগোয়া টয়লেটে। রাত দেড়টায় ডেলিভারির খবর পাবার পর ছোড়দা আর দাঁড়ায়নি ; সকালে ভিজিটিং আওয়ার্সের আগে সম্ভবত আর আসবে না। একা ঘরে অনভ্যস্ত চোখে ছোট বউদির ওই নতুন রূপের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছে। টুপুর এখন কী করবে !

অনেকক্ষণ পরে নীলা বলল, 'তোমার দাদা কখন আসবে কিছু বলেছে ?'

টুপুর আঁচ করল নীলা জানে শেখর কখন আসবে। তবু জানতে চাইছে, হয়তো তার মুখে শেখরের কথা শুনতে ভালো লাগবে। এমনও হতে পারে আর কোনো প্রসঙ্গের অভাব থেকে নীলা এখন যে-কোনো কথা বলত। খবর দেবার মতো করে সে বলল, 'সকালেই আসবে—'

'ওকে বোলো, যা যা আনার সব যেন গুছিয়ে নিয়ে আসে—'

টুপুর ঘাড় নেড়েছিল। জানত, সে কিছু না বললেও ছোড়দা ঠিকই আনত।

'তুমি কি আজ আর আসবে ?'

'দেখি—'

'অসুবিধে হলে আসতে হবে না—'

নীলা চলে গেছে একটা আলাদা জগতের মধ্যে। কাছাকাছি বয়সের ননদ, ভাবটা তার সঙ্গেই ছিল বেশি। আগে 'তুই' বলত, আজ 'তুমি'। হয়তো এ-রকমই হয়। একদিনেই অনেকটা বয়স বাড়িয়ে নিল নীলা—বড়ো চেহারার ভার ঢুকে গেছে মগজেও। যেতে যেতে টুপুর ভাবল, কী আশ্চর্য, এসব সে-ও ভাবছে ; নীলার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও আজ অনেকটা বড়ো হয়ে গেল নাকি !

একটু অন্যমনস্ক ছিল হয়তো। একটু আড়ালে। চোখের সামনে থেকে হুস করে কিছু একটা সরে যেতে সম্বিৎ পেয়ে বুঝল দিন শুরু হয়ে গেছে—ফুটপাথ থাকতেও সে হাঁটছিল রাস্তার ওপর দিয়ে, আর এক হাতের এদিক-ওদিক হলেই বাসটা চাপা দিয়ে যেতে পারত তাকে। কী হতো তা হলে ! ভাবতে না ভাবতে ঠা-ঠা রোদ্দুরে হেসে উঠল চারিদিক। সাবধানে হাঁটো, টুপুর, আশপাশের সবটাই কিছু ভোরের মতো স্বচ্ছ, সুন্দর আর নির্জন নয়। ইচ্ছাহীন নয়। বিপদ জানিয়ে আসে না।

ফুটপাথে উঠতে উঠতে এভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগছিল টুপুরের। এই মুহূর্তে বলে নয়, যখনই একা তখনই কি সে কথা বলে না নিজের সঙ্গে ! ভোর জড়িয়ে একটু আগে যা যা ভাবছিল—সেই ভাবনাগুলো—সত্যি বলতে সেও তো নিজের সঙ্গে কথা বলা। হয়তো সকলেই বলে, সকলের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ একা করে নেয়

নিজেকে। চোখ-কান-অনুভূতি খাড়া করে রাখলে এ-রকম অনেক কথাই শোনা যায়।

রোদ উঠলেও হাওয়ার টান যায়নি। উড়ন্ত আঁচলটাকে সামলাবার ছলে মুঠো-করা ডান হাতটা একটুক্ষণ বুকের সেই জায়গায় ছুঁইয়ে রাখল টুপুর, যেখান থেকে, সে ভাবছিল, ছিটকে বেরোয় কথা। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল, যেভাবে সাবধান হতে হয়। অন্যমনস্কতায় যে ভুল করেছিল একটু আগে, আর তা করবে না। ট্রাফিক সচল ; বন্ধ হলে রাস্তা পেরিয়ে ওই দিকের বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে। বাসে উঠবে। দূরত্ব বেশি নয় ; দেখতে না দেখতে বাড়ি।

দূরত্ব বেশি নয়, তবু, একটু আগে সত্যিই যদি সে চাপা পড়ত ওই ডবলডেকারের নিচে, তা হলে কী হতো! কাছাকাছি নার্সিং হোম ছিল, হাসপাতালও দূরে নয়। তবু সে এসব জায়গাগুলোতেই যে যেত তার নিশ্চয়তা ছিল না কোনো। থাকলেও, সম্ভবত নিজে টের পেত না কিছু। এই রকম হঠাৎ আঘাতে মেয়ে হওয়া না-হওয়ায় যায় আসে না কিছু। বাসের চোখ নেই, মন নেই, অনুভূতি তো নেই-ই। শুধু আছে গতি, আর পিষে ফেলার ইচ্ছে ; কী হলো না হলো তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কোনো। ভবানীপুর থানার সামনে একদিন এ-রকম একটি বাসকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল টুপুর, চাপা দেওয়া না-দেওয়ার মধ্যে তফাত ছিল না কোনো। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে ঘটনা ঘটাতে পারে তা বুঝিয়ে দিয়েছিল স্পষ্ট। টুপুরের কিছু হলেও সে দাঁড়িয়ে থাকত ওইভাবে। যা হবার হয়ে যেত—তার মানে মৃত্যু, তার মানে সে যা যা হতে পারে, তার কিছুই আর হয়ে উঠত না।

বাব্বা, ভাবলে কাঁটা দেয় গায়ে!

বাসে উঠে, বাসটা ছেড়ে দেবার পর সিটে বসে, অনেকটা সহজ হয়ে এলো টুপুর। অনেকটা খোলামেলা আর নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল, বেঁচে থাকায় সার্থকতা আছে। হুট করে মরে যাবার চেয়ে ধীরেসুস্থে বেঁচে থাকা অনেক ভালো—অনেক সুখের আর আনন্দের। সুখ কাকে বলে তা অবশ্য সে জানে না। হয়তো এটাই ঠিক, ভালো লাগার ছোটখাট অনুভূতিগুলো জড়িয়েই সুখ। এই কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ভাবনা যেসব সুখের মধ্যে টেনে নেয় তাকে, তার কিছুই তো পাওয়া হয়নি এখনো! আস্তে আস্তে বয়স যতো বাড়বে, তার অনেকগুলোই ধরা দেবে একে একে—কান্নার আবেগ থেকে যেমন সত্যি সত্যিই ক্রমশ জলে ভরে ওঠে চোখ, টলটল করে, তারপর ঝরে পড়ে একসময়।

দুর ছাই, এ কি একটা ভাবনা হলো! সুখের কথায় চোখের জলের উপমা আসে কী করে! কথায় কথায় নীলা একদিন বলেছিল, 'তোর বয়সটাই কুড়ি হলো, টুপুর, মাথাটা খুকির।' ঠিকই বলেছিল। নীলা বোধ হয় সুখের একটা নতুন ধাপ পেরিয়ে এলো আজ। আশ্চর্য, কীভাবে মানুষের শরীরের ভিতর ক্রমশ জন্ম নেয় আর একটা মানুষ ; তুলতুলে তার শরীর জুড়ে কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, অবুঝ তার ঠোঁট দু'টি ঠিকই চিনে নেয় কোনখানে আছে বেঁচে থাকার রহস্য। না, হোক না কান্না, সুখের সঙ্গে কোথায় যেন এর একটা গোপন সন্ধি আছে। কাল রাতে, নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল ছোট বউদি, জল গড়িয়ে পড়ছিল চোখ দিয়ে, মাসিমা জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে খুব!' তখনও তো চোয়াল শক্ত করে মাথা নেড়েছিল নীলা—না, না! এতো যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েও তা হলে ধরা দেয় সুখ! সে কেমন!

ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হলো শরীর। মরে যাবার ভাবনায় যেভাবে কাঁটা দিয়েছিল সারা গায়ে, এই কাঁপুনিটা তার চেয়ে আলাদা। যেতে যেতে নিজের আবিষ্কারে নিজেই

অবাক হলো টুপুর। আজ তার হলো কী, কতো সহজে প্রত্যেকটা অনুভূতি চিনে নিতে পারছে আলাদা করে! মরে যাবার ভাবনা থেকে একটুও জট না পাকিয়ে সরে আসছে বেঁচে থাকার ভাবনা—যেন সত্যি সত্যিই মরতে মরতে বেঁচে এলো সে ; যেন মরে যাবার যন্ত্রণাটা পুরোদস্তুর টের পেয়েছে বলেই বেঁচে থাকার ভাবনাটা চাগিয়ে উঠছে আরও। চোখের সামনে একটি জন্ম দেখলে কি এ-রকমই হয়! আর কারুর হয়েছে! দেখতে দেখতে আবার স্পষ্ট হচ্ছে ছোট বউদির চোখ জড়িয়ে আসা, আবেগে অস্ফুট গলা। যেন নীলার একারই নয়, নীলাকে ভাবতে ভাবতে তার নিজেরও শরীরে খুলে গেছে অনেকগুলো পাপড়ি। নিজের মধ্যেই বড়ো লাগছে নিজেকে।

কাল রাত ন'টায় তাকে নার্সিং হোমের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল রজত। যাবার তাড়ায় জোর পায়ে হাঁটছিল টুপুর। রজত ঠাট্টা করল, 'এমনভাবে হাঁটছিস, যেন তোর জন্যে তোর বউদির ছেলে হওয়া আটকে আছে!' এসব কথায় গম্ভীর হতে হয়। 'ফাজিল!' টুপুর বলেছিল, 'মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানিস না! যা, বাড়ি যা।' রজত বলল, 'কী করব বল! মেয়ে তো দেখিনি!' কাল না হয়ে আজ হলে রজতকে বলা যেত। যেত? যেত কি! অনেকক্ষণ পরে, ভাবতে ভাবতে, এই প্রথম নিজেকে ধাঁধায় জড়িয়ে ফেলল টুপুর। সব কথা সবাইকে বলা যায় না। এসব কথা তো নয়ই।

ছ'টা বাজেনি এখনো। রোদ উঠলেও ভোর-ভোর ভাবটা লেগে আছে চারিদিকে। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট, বাড়িগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ফুটপাথ দিয়ে যারা হাঁটছে, তাদের সব্বাইকেই মনে হচ্ছে অনেক দূরে যাবে, পায়ে ব্যস্ততা নেই কোনো। বাসের গা ঘেঁসে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ছুটে গেল কাগজের হকার। রাস্তা জুড়ে দানা খুঁটছে পায়রারা, বাসের হর্ন শুনে ঝটপট উড়ে গেল সব দিকে। সকালের বাস, লোকজন একেবারেই নেই প্রায়। স্টপে যাত্রী না থাকলে থামছে না, ছুটছে স্পিড তুলে, খানাখন্দে গা ঝাঁকিয়ে। সে এখন নিচে বা আশেপাশে নেই। ঝাঁকুনির জন্যেই সম্ভবত আলস্য লাগছে চোখে, ছোট ছোট হাই গলার মধ্যে উঠেই নেমে যাচ্ছে আবার। আর একটু পরেই নামতে হবে। ভালো হতো যদি এইভাবে ভাবনাগুলোকে নিয়ে চলে যাওয়া যেত অনেক দূর। কিন্তু, না—তা হবার নয়। তুমি যতো দূরেই যাও না কেন, গণ্ডীকাটা দাগটাও ছুটবে সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি ভর্তি পেয়াদা, খোঁজ-খোঁজ পড়ে যাবে চারিদিকে।

এমন নয় যে আজই হঠাৎ তার দূরে যাবার ইচ্ছে হলো ; কিংবা একা-একা নিঃসঙ্গ সুখে ভেসে যাবার। টুপুর দেখেছে, যখন আর যেখানেই হোক, এ-রকম ভাবনাগুলো গড়াতে পারে না বেশি দূর। যেতে যেতে হঠাৎই থমকে দাঁড়ায় এক জায়গায় এসে। তখনই মনে হয়, ভাবনাগুলো আছে, গতি নেই কোনো। তখনই মনে হয়, সবই ঘুমের মধ্যে ভাবা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা।

নিজের মনে অল্প থিতিয়ে এলো টুপুর। ফুটন্ত বুদ্বুদগুলো ফেটে গিয়ে সর পড়তে শুরু করেছে। মেয়ে হলে মা হতে হয়—একটু আগে সে কি ভেবেছিল এ-কথা! নীলাকে দেখে নিজেকেও টেনে নিয়ে গিয়েছিল নীলার জায়গায়! নীলা প্রত্যক্ষ, সে তো তা নয়। হওয়া আর হতে পারা'র মধ্যে এই দূরত্বও তো অনেক দূর। ঠিক ঠিক যাওয়া যায় কি!

ওই দ্যাখো, রাস্তার ধারে একটি দোতলা বাড়ির জানলা খুলছে। এক পাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাত চোখে পড়ল টুপুরের—চেহারাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই বাসটা তাকে টেনে নিয়ে গেল অনেক দূরে। দৃশ্যটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় একলা

হাতটাকেই সে ছুঁয়ে এলো আবার : স্পষ্ট কোনো অবয়ব ধরা পড়ল না।

ফুলশয্যার পরের দিন দুপুরে একা পেয়ে নীলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বউদি, কী হলো বলো ?'

এক রাতেই চোখমুখ অন্য রকম হয়ে গেছে নীলার ; মুখের কথা আর চোখের দৃষ্টি এক হচ্ছে না কখনো। এটা লক্ষ করেই কৌতূহলটা আরও চাগিয়ে উঠেছিল মাথায়। অন্যমনস্ক, হাই তুলতে তুলতে নীলা বলল, 'জিজ্ঞেস করছ কেন !'

'এমনি।' টুপুর বলল, 'আ-হা, বলোই না !'

'এভাবে জিজ্ঞেস করতে নেই—'

'কেন ?'

হাতটা কনুই ভেঙে আড়াআড়ি কপালের ওপর রেখে একটু ভাবল নীলা।

'টুপুর, তোমার জীবনেও একদিন এই দিনটা আসবে। সেদিনই জেনে নিও। আমি যদি সব বলে দিই, সেদিন কোনো মজা পাবে না।'

বলতে বলতে বুকের ওপর আঁচল টেনে দাঁতে নখ কাটতে শুরু করেছিল নীলা। ভারিক্কি এই চালটা অবশ্য ছোট বউদির পুরনো। শুনে, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে টুপুরের হঠাৎ মনে হয়েছিল, তার আর নীলার মাঝখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দিনটা। দিন গুনছে। বেড়ার এদিক-ওদিক যেন। ভাবতে না ভাবতে ওর গাল টিপে দিয়ে হেসে উঠেছিল নীলা।

'তুই খুব সরল, টুপুর। যদি খুব শোনার ইচ্ছে থাকে, আর একদিন বলব।'

টুপুর অবশ্য আর জিজ্ঞেস করেনি কোনো দিন। ভাবত, যদি মজা না পায় ! যদি সত্যি সত্যিই হারিয়ে যায় মজাটা, কনুই-ভাঙা হাতটা অমন সুখী লোকের মতো কপালের ওপর রাখতে পারবে কি !

এগোতে এগোতে, এইভাবে, কতোবার যে সে থমকে দাঁড়ায় ! আর যাওয়া হয় না। কিংবা, কিছুই বুঝতে না-পারা একবুক মন-খারাপ নিয়ে ইচ্ছে করে যেদিকে খুশি চলে যেতে। অবেলায় ঘুম ভেঙে উঠে যদি দেখে ঘরবাড়ি খালি করে সবাই চলে গেছে সিনেমা দেখতে—জানলার বাইরে খুব দ্রুত পড়ে আসছে বিকেল তখন যেমন মনে হয়, সে এখানে কেন !

খুব মন খারাপ করা গলায় রজত একদিন বলল, 'জানিস টুপুর, মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে সব কিছু। মনে হয় স্যুইসাইড করি।'

'স্যুইসাইড করবি ! কোন দুঃখে !'

'তুই বুঝবি না।'

রজত এমনভাবে তাকাল যেন ফেলনা কিছু দেখছে, টুপুর একটা নন-এনটিটি। রাগ নেই, তবু কী যেন ছিল চোখে। চাউনি-বদলটা টুপুর বেশ ভালোই বুঝতে পারে।

'বুঝব না কেন ! বল ?' চকিত বদলটাকে আড়াল দেবার চেষ্টায় নিজেকে আলগা করে দিল টুপুর। পাশাপাশি এই যে ছেলেটা, তাকে দেখে টান হবার কারণ নেই কোনো। তবু যে কেন টানে !

খানিক চুপচাপ হেঁটে রজত বলল, 'তুমি শালা মেয়ে। তোমার কোনো দুঃখ নেই, স্ট্রাগল নেই। পরিষ্কার শাড়ি-জামা পরে ফিটন-চড়া হয়ে ঘুরছ।'

ময়দানের মধ্যে রেড রোড। ব্রিটিশ কাউনসিল থেকে বেরিয়ে হাঁটছিল মাঠের গা ঘেঁসে। টুপুর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল।

'শুধু শুধু গালাগালি করছিস কেন ! এই জন্যে ডেকেছিলি ! তুই কে রে !'

থমকানো ভঙ্গি দেখে মনে হলো রজত এতোটা ভাবেনি। তাড়াতাড়ি সামাল দেবার জন্যে লম্বা হাত বাড়িয়ে পিঠে রাখল টুপুরের।

'রাগ করিস না। অনেক দিন শালা বলিনি কাউকে, তাই বললাম। জেগুার ঠিক করলে আরও খারাপ শোনাত।'

আজকাল কেউ গায়ে হাত দিলে কেমন জ্বালা করে চামড়ার নিচে। ঠিক জ্বালা না হলেও অস্পষ্ট কিছু। শান্ত জলে ঢিল পড়ার মতো কিছু একটা ছড়িয়ে যায়। এমনকি রজতকেও বড়ো লাগে। হাতে জলের গ্লাস এগিয়ে দেবার মুহূর্তে সাবধানে ছাড়িয়ে নিতে হয় আঙুলগুলো।

এই তো কিছু দিন আগে, বিয়ের পর নতুন বর নিয়ে বেড়াতে এসেছিল শর্মিলা। কথায় কথায় বেশ ভাব জমে গিয়েছিল অশোকের সঙ্গে। ওই, কথার মধ্যেই, জলের গ্লাসটা অশোকের হাতে এগিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে উঠেছিল টুপুর—অশোকের এগিয়ে আসা আঙুলগুলো হঠাৎ রূপান্তরিত হয়েছিল হাড়ে। স্পর্শ এড়াবার জন্যে দ্রুত আঙুল সরাবার চেষ্টা করতেই গ্লাসটা পড়ে গেল হাত থেকে। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে খেয়াল হলো ঠিক হয়নি। 'তেষ্টা বেড়ে গেল—', তারপর, টুপুর যখন কাচ কুড়নোর জন্যে ঝুঁকেছে, অশোক বলল, 'এরপর কিন্তু আর এক গ্লাসে হবে না।' কেন, তা বোঝেনি টুপুর। ছোঁয়া-কাতর এই ভাবটা যতো দিন যাচ্ছে ততোই যেন বেড়ে যাচ্ছে আরও।

রজতের হাতটাকে চটপট সরিয়ে দিতে দিতে একসঙ্গে যতোটা পারা যায় আশেপাশে তাকিয়ে নিল টুপুর।

'রাস্তার মাঝখানে কী যা তা করিস ! কেউ দেখলে কী ভাববে বল তো !'

'কী ভাববে ! প্রেম করছি ! তুই মাইরি হাসালি।' ঝকঝকে ভাব থেকে অন্যমনস্ক হয়ে এলো রজতের গলা, 'কাকা নোটিস দিয়েছে। আমার এখন অনেক প্রব্লেম। তোমার সঙ্গে প্রেম করতে বেরোইনি—'

স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে প্রেম হয় না। কখনো মনে হলে ভাবনটা নুইয়ে দেয় তাকে। রজত তার অনেকটাই দেখেছে—ভেবে, টুপুর ফিরে এলো নিজের মধ্যে। আরও দুটো স্টপ, তারপর নামতে হবে। রাত জাগার জন্যে এই যে ঘোর-ঘোর ভাব, এটা কাটানোর জন্যে বাড়ি গিয়ে সোজা উপুড় হতে হবে বিছানায়। অন্তত ঘণ্টাদুয়েক। বারোটা দশের আগে ক্লাস নেই। এখনও তার অনেক—অনেক দেরি।

নামবার আগে গলা দিয়ে পরপর অনেকগুলো হাই নামিয়ে দিল টুপুর। তার ধরনে ছিল ওঠার ভঙ্গি ; সম্ভবত তাই লক্ষ করে এতোক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে এগিয়ে এলো কাছে। টিকিট কাটার নামে, ওই দ্যাখো, এ লোকটাও কেমন দেখে নিচ্ছে তার আঁচল ঠিকঠাক আছে কি না। অতো পারা যায় না !

দিব্যি সকাল হয়ে গেছে চারিদিকে। লোকজন ফুটে উঠেছে এখানে ওখানে। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটরের যা ছুটোছুটি, এখন সাবধানে রাস্তা না পেরোলে নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট হবে। এই ভাবনাটায় ভয় নেই—ভিড়ের জন্যেই কি ! ফাঁকা রাস্তায় আচমকা ডবলডেকারটা গায়ের ওপর এসে পড়ায় কী ভয়ই না পেয়েছিল তখন, সত্যি ! এখন মনে হচ্ছে সবই স্বাভাবিক। চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল ট্যাক্সিটা, সহজ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল টুপুর। রাস্তা পার হলো। সামনেই ফুটপাথের ওপর লাল লেটারবক্সটা। কাল সন্ধেয়

ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল রজত। আগেই কথা হয়েছিল। খানিকটা হেঁটে এসে, বাসে ওঠার আগে ওকে এক প্যাকেট চারমিনার কিনে দিয়েছিল টুপুর। দোতলায় উঠে, টিকিট কেটে, ছোড়দার দেওয়া দশ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে তার থেকে দুটো দিয়েছিল রজতকে। এটা তার ভালোই লাগে।

'নে ব্যাটা, বেগার। এটা তোর বখশিস।'

'বাঁচালি, টুপুর। আমার যা অবস্থা যাচ্ছে না!' টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে রজত বলল, 'আশীর্বাদ করি, তোর বউদির রোজ একটা করে ছেলে হোক!'

যখন বলে এইভাবেই বলে। টুপুরের মনে পড়ে সে যখন ফ্রক পরত, তখনই কখনো-সখনো রজত তার হাঁটু দেখেছে। হয়তো হাঁটুর ওপরেও খানিকটা। আজকের মতো এতোগুলো শাড়ি ছিল না তখন। এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত রজত; বাসে দেখা হয়ে যেত প্রায়। সরস্বতী পুজোর দিন প্রতিমা সাজাতে গিয়ে ভাব হয়ে গেল। তারও কিছু দিন পরে একদিন পুলিসের গাড়ি এলো স্কুলে। ওরা দেখল, অনিচ্ছুক ছাগলের মতো গলার দড়ি ছিঁড়ে বেরুবার চেষ্টা করছে রজত; জামার কলার চেপে ধরেছে একটা কনস্টেবল, আর একজন টানছে হাত ধরে। বুটের খটখটানি তুলে বেটন হাতে ইন্‌সপেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, কোমরের বেল্টে খোলসপরা রিভলবার। স্কুল কম্পাউণ্ড থেকে যতোই এগোচ্ছে কালো গাড়িটার দিকে, ততোই চিৎকার করছে রজত, 'স্যার, আমাকে বাঁচান। স্যার, আমি কিছু করিনি—'

গোটা স্কুলের সমস্ত ক্লাসই উঠে এসেছে বারান্দায়। টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হেডমাস্টারমশাই। ইতিহাসের মৈত্রেয়ীদি এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ কী, মাস্টারমশাই, ছেলেটাকে তো মেরে ফেলবে! আপনি প্রতিবাদ করছেন না কেন!'

'আমি প্রতিবাদ করবার কে! পুলিসের অর্ডার!' বললেন হেডমাস্টারমশাই, 'একটা নিরীহ ছেলেকে এইভাবে ধরে নিয়ে গেল! জাস্টিস কি আমার হাতে— !'

ওইভাবে গেঁথে গেল রজত। সেদিন কয়েকটা নতুন শব্দ শিখেছিল টুপুর। আর বুঝেছিল, সব ঘটনার পিছনে কারণ থাকে না।

দিনটা মনে আছে আরও একটা কারণে। সেদিন, অসময়ে হঠাৎই সে ভিজতে শুরু করে—লজ্জা মেশানো এক রকম অস্বস্তিতে গরম হয়ে ওঠে মুখের ভিতরটা, অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় থমথম করতে থাকে শরীর। শুধু সেদিনই নয়, তারপর থেকে বেশ কয়েক দিন রাতে ঘুরে-ফিরে স্বপ্ন দেখত রজতকে। তারপর—

ভুলে গিয়েছিল? হয়তো। সত্যি বলতে, কোন ভাবনা, কার ভাবনাটাকেই সে আঁকড়ে থাকছে! একটু আগে ভেবেছিল ছোট বউদির কথা; ইতিমধ্যে কখন ঢুকে পড়েছে রজত, খেয়ালই করেনি। আবার যাকে নিয়ে শরীর, মন, স্বপ্নের এতো ছড়াছড়ি, দু'তিন মাস যেতে না যেতে সেই রজতই আবার হারিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

আমি তখন রোজই শাড়ি পরি—লিখলে এইভাবেই লিখত। অনেক দিন পরে একদিন বিকেলে সে, শর্মিলা আর ঈপ্সিতা গড়িয়াহাটের মোড়ে ফুচকা খাচ্ছে, ঢ্যাঙা চেহারার রোগাটে একটা ছেলে হাসি-হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা বুঝতেই পারেনি কিছু, ভেবেছিল মোড়ে আড্ডা-দেওয়া দল থেকে কেউ সাহস দেখাতে এসেছে। কাছে দাঁড়িয়ে দু' একটা টিপ্পনী কাটবে, চলে যাবে। শর্মিলাই খেয়াল করল প্রথমে; মুখভর্তি ফুচকায় বিষম খেতে খেতে বলল, 'আ-রে, রজত না!'

'আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছেন। আমার নাম রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায়।' স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তারপর, ফুচকাওলাকে অর্ডার করল, 'দেখি, এদিকেও একটা ঠোঙা বাড়াও।'

অবাক চোখে রজতের ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে করতে টুপুর বলেছিল, 'তুমি বেঁচে আছ ?'

'কী একটা প্রশ্ন, মাইরি ! আমি গেলাম মরে, আর সেই আনন্দে তোমরা খাচ্ছ ফুচকা !'

ঈপ্সিতা কথা বলে কম, লাজুকও। কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'এতো লম্বা হয়ে গেছ যে চেনাই যায় না !'

রজত টলল না একটুও। ঠোঙাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কী করব ! পেঁদিয়ে লম্বা করে দিয়েছে। আর কী জানতে চাস ?'

ঠিকই, ভুলে গিয়েছিল। তবু, একটু ধরিয়ে দিলেই এসব ছবি পুরোপুরি ধরতে পারে টুপুর। যে-কোনো সময়। স্মৃতি যেন ডাকনাম, যে যখনই ডাকুক, তাকাতে হবে পিছন ফিরে। অ্যালবামের ছবিগুলো যেমন, সবগুলোই মনে পড়িয়ে দেয় বয়স, কিংবা বয়সমেশা কোনো কোনো ঘটনা। সেই যে ইজের-পরা খালি গায়ে বাগানে দাঁড়ানো ছবিটা—কেউ জানে ডান হাত দিয়ে কেন সে বাঁ হাতের কাঁধ ও কনুইয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গা আড়াল করে রেখেছিল ! টুপুর জানে। টিকে শুকিয়ে ওই জায়গায় ফুটেছিল চাকার মতো দুটো গোল বড়ো দাগ—যেন ক্যামেরা সবচেয়ে আগে চোখ ফেলত ওই দাগগুলোয়, সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার হতো।

দাগ দুটো কবে যে মিলিয়ে গেল খেয়ালই করেনি। তার বদলে অন্য জায়গায় ফুটেছে অন্য দাগ। হাত দিয়ে আর সব আড়াল করা যায় না। সত্যি, সবই কেমন বদলে যায়। সকলেই যায় ? কাল এক রকম ছিল ছোট বউদি, আজ একেবারে অন্য রকম। টুপুর শুধু তার বাইরেটাই দেখছে ; আর দেখছে শরীর থেকে যে বেরিয়ে এলো তাকে। ভাবলেও সিরসির করে ওঠে গা—যেন সে নিজেই অভিজ্ঞতাটা পার হয়ে এলো। কিছু জিজ্ঞেস করলেই ছোট বউদি বলবে, জানতে চাইছ কেন ! তার মানে মজা কেটে যাবে। তা ছাড়া, এখন সে বোঝে—অনেক কিছুই বোঝে। এসব কথা অমন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করা যায় না।

একটা নিঃশ্বাস চাপল টুপুর। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন ভারী হয়ে উঠেছিল বুকটা ; হাল্‌কা হয়ে নিল। যতো এগোচ্ছে ততোই মন্থর হয়ে আসছে পা দুটো, ঢুলুঢুলু করছে চোখের পাতা। ঘুমোবার জন্যে আনচান করছে শরীর। বাড়ির কান থাকলে বলত, কাছে এসো। রাস্তা যেন আর ফুরোতেই চায় না !

সেদিনও, আরও অনেকটা হেঁটে সে আর রজত গঙ্গার ধারে রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসেছিল দোতলায়। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বহু দূর নদীর জল, দূরে কাছে অনেকগুলো জাহাজ—কোনটা কোথা থেকে এলো, কোনটা কোথায় যাবে, তাদের স্থির হয়ে থাকা থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

শূন্য কফির কাপে চুপচাপ সিগারেটের ছাই ঝাড়ছিল রজত। মন খারাপের কথাটা সে আগেই বলেছিল। অনেকক্ষণ পরে, সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে, জিজ্ঞেস করল টুপুর, 'এই জাহাজগুলো কোথায় যাবে বলতে পারিস ?'

মুখ না তুলেই রজত বলল, 'সমুদ্রে—'

'এটা একটা উত্তর হলো ?'

'কেন হবে না ! জাহাজ সমুদ্রেই যায়। গহন, গভীর সমুদ্রে।' চোখ ফিরিয়ে এবার

জাহাজগুলোর দিকে তাকাল রজত, 'আমি এখনই সেখানে পৌঁছে গেছি—'

'ন্যাকামি করিস না।' টুপুর বলল, 'চল, ওঠ। সন্ধে হয়ে আসছে—'

রজত যেভাবে উঠে দাঁড়াল, মনে হয় তারই যাবার তাড়া বেশি। টুপুরকে বেরুতে দিল আগে।

সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ধপধপ শব্দ হয়। একাকার হয়ে যায় জলের শব্দের সঙ্গে। পিছন থেকে রজত বলল, 'তোর যাওয়াটা ঠিকই আছে—'

'কোথায়?'

'শ্বশুরবাড়ি।' হাল্‌কা গলা রজতের। নিচে এসে বলল, 'তখন আমি এখানে এসে একা-একা জাহাজ দেখব।'

'তুই একটা বিয়ে করে নে, রজত। তা হলেই আর কোনো প্রব্লেম থাকবে না—'

কথাগুলো মনে পড়ায় নিজের মনেই হেসে উঠল টুপুর। সামনে বাড়ি। সিঁড়ি। কলিং বেলে হাত দেবার আগে যতোটা সম্ভব গুছিয়ে নিল নিজেকে। নার্সিং হোম থেকে ফিরছে, জানে, দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষুনি একরাশ প্রশ্ন ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। জ্যাঠাইমা, মা, জ্যাঠামশাই, আর—ছোড়দা তো আছেই। বেচারা শেখর। কাল অনেক রাত পর্যন্ত অনেকটা সময় সিগারেট মুখে পায়চারি করেছে গেটের সামনে রাস্তায়। লেটেস্ট বুলেটিন পাঠাবার মতো এক-একবার নিচে গিয়ে খবর দিয়ে আসছিল টুপুর। ডেলিভারি নর্মাল হয়েছে ও দু'জনেই ভালো আছে শুনে এমন ভঙ্গি করল, যেন এই ক'ঘণ্টা তার কাঁধের ওপর দু' মণ ভারী পাথর চাপিয়ে রেখেছিল কেউ। 'বাব্বা, বাবা যেন আর কেউই হয় না—', কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল টুপুরের; বলেনি। হাসতে হাসতে, এইভাবে, কখনো সে জড়িয়ে যায় মায়ায়।

দরজা শেখরই খুলল। উৎসুক মুখ দেখে মনে হয় এতোক্ষণ সে টুপুরেরই অপেক্ষায় ছিল।

'কী ব্যাপার! এতো হাসছিস যে!'

পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে অল্প গম্ভীর হবার চেষ্টা করল টুপুর। স্লিপার দুটো পা থেকে র‍্যাকের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'ছেলে হলো তোমার, আমি শুধু শুধু হাসব কেন!'

ফিরে এসে চুলের গোছা ধরে টানল শেখর।

'খুব ফাজিল হয়েছিস!'

'ছাড়ো, তোমাদের জন্যে সারা রাত ধকল সইতে হলো। দশ টাকায় এতো হয় না, বুঝেছ!'

'তাই বল!' শেখর বলল, 'ঠিক আছে। কী চাস বল?'

'বলব?' কোনাকুনি শেখরের মুখের দিকে তাকাল টুপুর, কিছু ভাবল যেন। তারপর বলল, 'আগে কী দিয়ে ছেলের মুখ দেখবে, সেটা ভাবো। আমারটা পরে হবে। তোমার বউ ওদিকে তোমাকে দেখার জন্যে ছটফট করছেন।'

গলা শুনে মা, জ্যাঠাইমা—দু'জনেই ছুটে এসেছেন ততোক্ষণে। জ্যাঠাইমা বললেন, 'কেমন দেখলি, টুপুর?'

আড়ে তাকিয়ে টুপুর দেখল চোখেমুখে আগ্রহ নিয়ে শেখর দাঁড়িয়ে আছে তখনো। না শুনে নড়বে না। কিন্তু, ওইটুকু বাচ্চার আবার ভালো মন্দ কী, একটা তুলতুলে মাংসের পিণ্ড বইতো নয়, বাকি সবই তো ঝাপসা। কিন্তু সেটা এখানে দেবার মতো খবর নয়।

কিছু একটা বলবার আগে হাসল টুপুর। বলল, 'ছোড়দারই মতো। নাক নেই—'

'নাক থাক না থাক, বংশের বাতি।' মা বলল, 'তুমি মেয়ে, দু' দিন বাদে চলে যাবে বিয়ে হয়ে। ওই-ই থাকবে—'

কোন কথা থেকে কোন কথা! মাকে শুনিয়ে জ্যাঠাইমা বললেন, 'এখন থেকেই আর বিয়ে বিয়ে করে নাচিও না তো, চাঁপা। কর্তা তো বলেই দিয়েছে, ও নিজে না চাইলে বিয়ে দেবে না।'

'তা বললে হয়!' কথাটা পাশ কাটিয়ে গেল মা, 'নে টুপুর, মুখটুখ ধুয়ে নে। চা দিচ্ছি। আমরা আবার নার্সিং হোমে যাব—'

পর্দা সরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল টুপুর। ঠাট্টা-ইয়ার্কি থেকে কথাগুলো কেমন বেঁকে গেল মান-অভিমানের দিকে। এটা হয়, প্রায়ই—যদিও উপলক্ষ থাকে না তেমন। এ-বাড়িতে ছেলেমেয়ের চেয়ে বুড়োবুড়ি বেশি; স্বত্ব নিয়ে, তাই, সব সময়েই চলে এক অবুঝ খেলা। কে কাকে ধরে রাখবে, কে যাবে! নীলা হাসপাতালে, তাই শেখর এসে উঠেছে এখানে। না হলে বউ নিয়ে সে থাকে আলাদা ফ্ল্যাটে, আলাদা সংসারে। ছাড়াছাড়ির এই ব্যাপারটা কেউই সহজ মনে নেয়নি। বিশেষত জ্যাঠামশাই। টুপুর লক্ষ করেছে, ছেলে আলাদা হবার পর থেকেই কথা কমে গেছে জ্যাঠামশাইয়ের।

দেওয়ালের দু' দিকে দুটো ছবি। বাবার। আর ডাম্বলের। তার চেয়ে দু' বছরের ছোট। যখন মারা যায় টুপুর তখনও ছোট। অ্যালবামে ছাড়া আর কোথাও কোনো স্মৃতি নেই তেমন। শুধু শেখরকে নিয়ে যখন এলোমেলো দুঃখে চুপ করে যায় সবাই, তখন মনে হয়, হয়তো ডাম্বল বেঁচে থাকলে এই দুঃখটা কাটিয়ে ওঠা যেত। আর মন খারাপ করে ভাইফোঁটার দিনে, যখন অন্য কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসে শাঁখের শব্দ। গতবার, মনে আছে, সারা সকালটা সে কাটিয়ে দিয়েছিল বিছানায় শুয়ে, মাঝে মাঝে ডাম্বলের ছবির দিকে তাকিয়ে। কিন্তু, বাবা এখনো জ্বলজ্বলে। যেন যে-কোনো দিন রাতের প্লেনে ফিরে ঘুমন্ত তাকে কোলে তুলে নিয়ে শুরু করে দেবে হৈ-চৈ!

এই মুহূর্তে মার দুঃখটা ছুঁয়ে যায় টুপুর। ফর্সা আঁচল দিয়ে কখনো-সখনো মা যখন একমনে বাবা আর ডাম্বলের ছবি দুটো মোছে, বড়ো করুণ লাগে তাকে। কী দরকার বিয়ে-টিয়ের, ভাবে মাঝে মাঝে। স্কুলে দেখেছে, কলেজ ইউনিভার্সিটিতেও দেখছে, বিয়ে না করে অনেকেরই চলে যাচ্ছে দিব্যি। কিন্তু, মা যখন থাকবে না? জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাইও চলে যাবেন?

মাঝে মাঝে সব এমন শূন্য লাগে কেন! কেন মনে হয়, এই সব সম্পর্কের মধ্যেও কোথাও আছে অপূর্ণতা, এদের ওপর সত্যি সত্যিই কি আর নির্ভর করা যায়! বরং প্রত্যেককেই আলাদা করে খুঁজে নিতে হয় নিজের জগৎ, নিজের সঙ্গী। কেন, তা ভাবতে গেলে এলোমেলো ভাবনায় জট পাকিয়ে যায় চিন্তাগুলো, থই পাওয়া যায় না।

চা নিয়ে এলেন জ্যাঠাইমা।

'হ্যাঁ রে, সারা রাত তো জেগে কাটালি। আজ কি কলেজ যাবি?'

টুপুর ঘাড় নাড়ল।

'চানটান করে ঘুমিয়ে নেব একটু। ক্লাস তো অনেক দেরিতে—সেই বরোটায়—'

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল টুপুর। জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে একটাই সরলরেখা; সত্যি, তার নিজের ওপর, ভাবনাগুলোর ওপর কন্ট্রোল নেই কোনো।

'শর্মিলা ফোন করেছিল তোকে—।' দরজার বাইরে শেখরের গলা, 'ফোন করতে বলেছে।'

টুপুর জবাব দিল না। সময় নিয়ে, শেখর আছে না গেছে আন্দাজ করে বলল, 'ছোড়দা, তোমার কী কী নিয়ে যাবার ছিল নার্সিংহোমে, সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে যেও—'

॥ দুই ॥

ফেনাভর্তি গালের ওপর রেজর বসাতেই হাত নেমে এলো কনুই পর্যন্ত। এতোটুকু জোরের দরকার হলো না। দিশি ব্লেডে এ-রকম মসৃণতা এর আগে লক্ষ করেনি রজতশুভ্র। নাকি তার মনটাই খুশি আছে, এখন যা করবে তাই মনে হবে ভালো—ফুরিয়ে-আসা টিউব থেকে টিপে টিপে পেস্ট বের করার মতো মেজাজ খারাপের সময় যে-কোনো কাজেই যে জোর লাগে, তার দরকার হবে না।

ঘরে আলো কম। আকাশে বোধ হয় মেঘ আছে, সেই জন্যে আলোটা কম লাগছে আরও। না হলে আয়নায় নিজেকে অতোটা মলিন দেখাত না। টানা পনেরো মাস জেলে কাটিয়ে একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল চেহারা। প্রায়ই মার খেয়ে আর যা তা চিবিয়ে যখন বেরিয়ে এলো, রোগা, গালভাঙা, ঢ্যাঙা ভাবটা ছাড়া তখন নিজেকে নিজেই আর চিনতে পারত না ঠিক ঠিক—শরীরের ভিতর প্রকাণ্ড এক পুরুষ যেন ঢুকে পড়েছিল ইতিমধ্যে। অবুঝ রাগে সারাক্ষণ রি-রি করত শরীর ; চোখে ফুটে উঠত আক্রোশ। আর যখনই এ-রকম হতো, রজত টের পেত, শরীর আর মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে দারুণ অসহায় ভাব। একদিন না একদিন প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে, ভাবত ; কিন্তু কার ওপর এবং কীভাবে, বুঝতে পারত না ঠিক। এই ক'বছরে সেই সারাক্ষণ কুঁকড়ে-থাকা ভাবটা কেটে গেলেও রাগটা যায়নি এখনো। থেকে থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

দাড়ি কামিয়ে, মুখটা ভালো করে দেখার জন্যে আলোর স্যুইচ টিপে দেখল জ্বলছে না, ফিউজ্‌ড হয়ে আছে বাল্‌বটা। কালও বাড়ি ফিরে দেখেছিল ঢাকা বারান্দায় আলো নেই। ব্যাপারটা তিতিবিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাল্‌ব বদলানোর কথা ভাববে না কেউ। এই বারান্দাটা রজতই ব্যবহার করে বেশি, সুতরাং শম্ভুনাথের গরজ হবে না চট করে। যখন তখন আলো নিবিয়ে আর ফিউজড বাল্‌ব না বদলে মিতব্যয়িতার মানে শেখায় শম্ভুনাথ। মিতব্যয়িতা না হাতি! আসলে কঞ্জুষ, হাড় কঞ্জুষ। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেকে খড়্গপুরে হস্টেলে রেখে এঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছে। খরচাপাতি যা করার করছে সল্ট লেকের বাড়িতে। এখন বাল্‌বের কথা বলতে গেলেই অন্য কথা তুলবে। পয়সা আসুক। তারপরেই শুরু হয়ে যাবে বক্তৃতা।

আলোর অভাবে মুখের ঔজ্জ্বল্য খুঁজে না পেলেও সদ্য-কামানো গালে হাত বুলিয়ে খুশি হলো রজত। গাল ফুলিয়ে শিস দিতে লাগল। কথায় কথায় বক্তৃতা দেবার ব্যাপারটা ছাড়া শম্ভুনাথকে খারাপ লোক বলা যায় না। নিজের কাকা বলে নয়, সত্যি বলতে, ঠিক এতোটা কেউ করে না। সে জেলে থাকতে থাকতেই কৃষ্ণনগরে দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিল বাবা। রিটায়ার করেছিল তারও অনেক আগে। দাদা উঠে গেল সরকারী ফ্ল্যাটে। ছাড়া

পাবার পর দাদা তাকে সঙ্গে রাখতে রাজি হয়নি। সরকারী চাকরি, তার ভয়-ভাবনা আছে ; এমন ছাপ-মারা একটা ভাইয়ের সঙ্গে থাকা মানেই যখন-তখনের ঝুঁকি। আসলে দাদা আলাদাই থাকতে চেয়েছিল। রজতকে রাখা মানে শুধু কিছু দিনের জন্যে পোষা নয়, যতো দিন না পাশ করে চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ততো দিন তার সমস্ত হেপা পোহানো। এই অবস্থায় কাকাকে ধরেছিল বাবা। এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল শম্ভুনাথ।

দেখতে দেখতে পাঁচ ছ' বছর কেটে গেল এখানে। আরও কতো দিন কাটাতে হবে জানা নেই। তবে বেশি দিন নিশ্চয়ই নয়। আর এক-দেড়টা বছর কোনো রকমে কাটাতে পারলেই এম-এ-টা তরে যাবে। তারপর একটা চাকরি, তারপর নিজের মতো করে জীবনটাকে ভাবা। অনীশদা বলেছে, মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করতে পারলে এই বাজারেও একটা চাকরি জোটানো খুব অসুবিধে হবে না। জোরটা, রজতের মনে হয়, অনীশদার নিজেরই। মাসে ষাট টাকার টিউসানটা জুটিয়ে দিয়েছিল এক কথায়। ভাগ্যিস দিয়েছিল, এই এক্সট্রা ইনকামটা আছে বলেই রজতবাবুর ব্যালান্সশিট রেড শো করছে না এখনো। না হলে মাসে মাসে দাদা যে ষাট টাকা দেয়—অর্থাৎ দৈনিক দু' টাকা, তা দিয়ে চালাতে হলে শনিপুজোর থালা পাততে হতো রাস্তায়।

এসব যখন আলাদা করে ভাবে, কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে রজতের। যারা ভলোবাসে বা একটু দয়ামায়া দেখায়, ইচ্ছে করে তাদের জুতো পালিশ করে দিতে। তখন মনে হয় ভাগ্য ব্যাপারটা সত্যিই ভুয়া নয়—অলক্ষ্যে থেকে ভগবান বা কেউ একটা কার কী হবে তার ছকটা পাল্‌টে দিচ্ছে ক্রমাগত। যদি তা না হতো, তা হলে, এই যে অনীশদা—অনীশদার মতো একটা মানুষকে সে পেত কী করে ! নিতান্তই দাদার বন্ধু ছিল, কালেভদ্রে আসত বাড়িতে। শরতের ভাই হিসেবে তাকে চিনত বা চিনত না। তারপরেই, সম্পর্কটা যেন বদলে গেল কী করে ! পুলিসে টেনে নিয়ে যাবার পর প্রায় তিন মাস বাড়ির লোকজন বা চেনাশোনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রথম দেখা করতে এলো অনীশদা ; বলল, সহ্য করে থাক, আমি তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। মনে আছে, অযাচিত এই আশ্বাসে কান্নায় গুমরে উঠেছিল সে। তারপর থেকে অনীশদাই আসত, প্রায়ই ; বার দুয়েক বাবাকে এনেছিল সঙ্গে। দাদা আসেনি। জেল থেকে বেরিয়ে দেখতে পেল দাদার একটা নতুন ছেলে হয়েছে ; তার মানে, সে যখন জেলে দাদা তখন নিজের মনে ছেলে তৈরি করছিল। হয়তো এই রকমই হয় ; রক্তের সম্পর্ক-টম্পর্ক এগুলো শুধুই কথার কথা—ঠেকায় পড়লে বোঝা যায়, ঠেকায় পড়লে যার যার ভিতরের চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। অনীশদার মধ্যে থেকেও, সত্যি, একটা আলাদা চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর, এই টিউসানটা না পেলে দৈনিক দু' টাকার হিসেবে কী করত সে ! কচি কচি দাড়ি রাখত, ছেঁড়া, ময়লা জামার কলার উঁচিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরত রাস্তায়। দৈনিক চার টাকার হিসেবটাই কি খুব মধুর ! দুঃ-শা-লা, এর চেয়ে একটা লেবার ক্লাস-টল্লাসে জন্মালে ভালো হতো, খালি গায়ে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ানো যেত রাস্তায়—ইনহিবিসান থাকত না কোনো। জেলে, যেদিন মারের চোটে তার কনুইয়ের ওপর মাংস ফেটে রক্ত বেরুচ্ছিল, প্রায় জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছিল সে, সুখন নামে একটি ছেলে বলল, ভদ্দরলোকদের ছেলেদের লাগে বেশি। নরম চামড়া তো ! আমাকে দ্যাখো. খুন করেছি, কিন্তু সাবুদ নাই কোনো। খালাস হয়ে আবার শালা খুন করব ! রজত ভেবেছিল, সে খুন-টুন করেনি কোনো, জানেই না কেন ধরে আনা হলো তাকে। তবে যদি ছাড়া পায়, খুন তাকেও করতে হবে।

ঠিকই বলেছিল সুখন—ভদ্দরলোকের ছেলে ! তাই এতো বায়নাক্কা ! শক্ত হয়ে ওঠা চোয়াল দুটো আলগা করতে করতে প্রায় হারিয়ে-যাওয়া খুশির ভাবটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল রজত । ছেলে তো নয়, বাচ্চা ! নামের বাহারই চিনিয়ে দিচ্ছে মাখনতোলা জিনিস একখানা ! কেষ্টনগর থেকে পাঠানো বাবার চিঠিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকে—শ্রীমান রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায় । একা রজতে থই মেলে না, তার সঙ্গে আবার শুভ্র এসে জুটেছে ! ইনহিবিসান আসবে না ! এসব ভাবলেই তো ঠাণ্ডা মেরে যায় সব কিছু !

একদিন বৃষ্টিতে, মনে আছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে রিক্সায় উঠেছিল সে আর টুপুর । এমনি, খেয়াল হয়েছিল, তাই । ইচ্ছে ট্রাম-রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে নেমে পড়বে । কিছুটা জোরই করেছিল সে ; আর, তার মনের কথাটা বুঝেই যেন হ্যাণ্ডেলে ঠুং-ঠাং ঘণ্টি মারতে মারতে পিছন পিছন হেঁটে আসছিল রিক্সাটা । গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে জোর ছিল না তেমন, টুপুরও রাজি হয়ে গেল । ওই সিকি মাইল রাস্তা যেতেই রিক্সাওয়ালা দু' টাকা চাইল । রজত বলেছিল, 'হামলোগ স্টুডেন্ট হ্যায় । কনসেসান রেট বোলো—'

রিক্সাওয়ালা বলল, 'কনসান কেয়া বাবু, হাম ভি তো গরিব আদমি—'

টুপুর বলল, 'চ চ । আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব—'

'তুই কেন ! আমার প্রেস্টিজ নেই !'

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে—', টুপুর বলল, 'রিক্সাভাড়া নিয়ে দর-দস্তুরে প্রেস্টিজ এমনিতেই থাকে না ।'

'দেখ, ভাই', তখন রিক্সাওয়ালাকে বলল রজত, 'যদি দু' টাকা লেগা তো এই মহিলাকো গলার হার ছিনতাই করকে ভাড়া দেনা পড়ে গা । এক টাকা মে জায়গা ?'

তাতেই রাজি হয়ে গেল । টুপুর আগে, সে পরে । গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে মাথার চুল ভিজে গেছে ততোক্ষণে । ওঠবার পর রিক্সাওয়ালা পর্দা নামাতে যাচ্ছিল, রজত হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'দু' টাকা যেদিন দিতে পারে গা, সেদিন পর্দা নামায় গা ।' টুপুরকে বলল, 'দিস ইজ কল্‌ড প্রেস্টিজ !'

জড়োসড়ো, তবু বলেছিল টুপুর, 'দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, উঠলে পারতিস ।'

'ও ব্বাবা, ট্যাক্সি ! ট্যাক্সিতে উঠলেই আমার প্রেম করতে ইচ্ছে করে—'

'ফাজিল !' কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়েছিল টুপুর । তাড়া দিয়ে রজত বলেছিল, 'এই ভাই, জলদি চল । ইয়ে দিদিমণি লজ্জা পাতা হ্যায়—'

'রাস্তা বহুৎ পিছল হ্যায় বাবু—'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো পর্দা নেহি টানা—'

'কী ফাজিল !' হাসিতে ঠোঁট কামড়ে বলেছিল টুপুর, 'এই সব লোয়ার ক্লাসের লোকেদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে লজ্জা করে না !'

'কে লোয়ার ক্লাস !' সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেছিল রজত, 'ও আমার চেয়ে সলভেন্ট । দেখবি ? রিক্সাওয়ালা, রোজ কেতনা রোজগার হোতা হ্যায় ?'

'ও কোই ঠিক নহি হ্যায় বাবু । কভি সাত-আট রূপেয়া হোতা হ্যায় কভি দশ-বারো ভি হো যাতা হ্যায়—'

'দেখলি ! আর আমি ? নো ফ্লেক্সিবিলিটি । ফোর রুপিজ, ডেলি ।'

'সেই জন্যেই—', টুপুর বলেছিল, 'কোনো মেয়েই প্রেম করবে না তোর সঙ্গে ।'

'যা বলেছিস—'

শেষবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আনমনে শিস দিতে দিতে সেদিনের গোটা দৃশ্যটা পেরিয়ে এলো রজত। কলেজ দেরিতে। তবু চান-টান যা করার সেরে নিতে হবে তাড়াতাড়ি, ন'টা বাজতে না বাজতে ফুরিয়ে যাবে কলের জল। তা ছাড়া, এতোটা সময় এই চাপা একতলা বাড়িতে থাকলেই কোনো না কোনো কাজে ফাঁসিয়ে দেবে কাকিমা। তার চেয়ে তাড়াহুড়ো দেখানো ভালো। পড়াশুনো ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব পায় এ-বাড়িতে, কলেজ আছে শুনলে কাকিমাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একবার বেরুতে পারলে অজুহাতের অভাব হবে না। আজ টিউসানও নেই। ভাবছিল অনীশদার ওখানে ঘুরে যাবে। বাসস্টপে শিখা বউদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল—'ব্যাপার কী, অনেক দিন দেখি না!' বলতে গেলে বলেই রেখেছে আজ যাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে পল্লবদের বাড়ি, সেখান থেকে—। হ্যাঁ, অনীশদার বাড়ি টেলিফোন আছে, সেখান থেকে—। অল্প এলোমেলো হয়ে গেল রজত।

হয়তো ঠিকই বলেছিল টুপুর, প্রেম-ট্রেম করা তার হবে না। অবশ্য সে-জন্যে সে যে খুব চিন্তিত তাও নয়। প্রেম ব্যাপারটা সত্যিই সে বোঝে না তেমন। ভাবসাব দেখে মনে হয় অনেকেই বোঝে। চার-পাঁচ মাস আগে বিয়ে হয়ে গেল শর্মিলার ; কিন্তু বিয়ের আগেও বেশ কিছু দিন ধরে ঘোরাঘুরি করেছিল একজনের সঙ্গে। নাকভর্তি সর্দি, অথচ নাক টানা যাচ্ছে না এমন একটা থমথমে মুখে ঘুরত সারাক্ষণ। বিয়ের সময় মনেই হলো না টান-ভালোবাসা ছিল কোথাও। ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিল একসঙ্গে, কথা উঠল।

'এক একটা মেয়ে এ-রকমই হয়।' পিনাকী বলল, 'চিট করে—'

'তোকে কেউ করেছে বুঝি!' বেনারসী গায়ে সাজলে মেয়েরা হঠাৎই ভরে ওঠে। হাসিটা আরও মানিয়ে গেল টুপুরকে।

'আমায় করলে রিভেঞ্জ নিতুম।'

পিনাকী সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে দেখে টিপ্পনী কাটল পল্লব, 'কী করতিস! অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়তিস? তারপর ধরা পড়লে রজতের মতো পুলিসের ধোলাই—'

কথাটায় জ্বালা আছে। পল্লবকে শেষ করতে না দিয়ে গম্ভীর হলো রজত।

'এসব ডিসকাসানে আমাকে টানবে না—'

ঈপ্সিতা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বলল, 'শর্মিলা ঠিকই করেছে। বিয়ে একবারই হয়। সেটা বুঝেসুঝে করতে হয়। সিকিউরিটি আছে কি না ভাবতে হয়। শর্মিলার বর এঞ্জিনিয়ার, দুর্গাপুরে ভালো চাকরি করে। বিলিতি ফার্ম। গাড়ি আছে—'

'চেহারাটা চোয়াড়ে।' পিনাকী বলল, 'গাড়োয়ান মার্কা—'

'চেহারাটাই একটা মানুষের সব নয়। কী বল, টুপুর?'

ঈপ্সিতার গম্ভীর-গম্ভীর ভাব দেখে টুপুর বলল, 'আমি বাবা ওসব বুঝি না। বিয়ে আসুক, তখন দেখা যাবে—'

ঈপ্সিতা আর টুপুর, তারপর, উঠে গিয়েছিল ট্রামে। অভাবের জায়গাটা ভরে উঠেছিল বেনারসী আর সাজগোজের গন্ধে। সেই হাওয়া টেনে চুপচাপ আরও অনেকটা হেঁটে গিয়ে পিনাকী বলল, 'মেয়েরা অনেক বেশি ম্যাচিওরড্ হয়, বুঝলি। ওদের দেখলি, কীরকম রাইপ লাগছিল আজ—যেন তৈরিই হয়ে আছে বিয়ের জন্যে!'

কথাগুলো কানে নিলেও জবাব দিল না কেউ। খানিক পরে পিনাকী বলল, 'রজত, ঈপ্সিতা কি অন্য কোথাও লাইন দিচ্ছে মনে হয়?'

রজত হাসল। কী বলবে তখনই বুঝে উঠতে পারল না। প্রেম-প্রেম বাতিক আছে পিনাকীর, জানে অনেক দিন ধরেই ওর ঈপ্সিতার ওপর দুর্বলতা। মাঝে খুব ঘন ঘন ঈপ্সিতার বাড়ি যেত। একদিন ঈপ্সিতা বলেছিল, 'যখন তখন ওইভাবে যাও, আমাদের অ্যালসেসিয়ানটা কিন্তু খুব ফেরোসাস!' কথায় কথায় পিনাকীই বলে ফেলেছিল একদিন। তাতে বাড়ি যাওয়া কমলেও হাল ছাড়েনি। নিজেদের মধ্যে তুইতুকারি চললেও ঈপ্সিতাকে 'তুমি' বলে ও। শালা ন্যাকা! চেহারাটা ভালো পিনাকীর, ওর ধারণা ওতেই হবে। লাইফে হবে না! তবে, আজ বোধ হয় একটু ঘা খেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে রজত বলল, 'শুনলি তো, শুধু রাজেশ খান্না মার্কা চেহারা হলেই হবে না। সিকিউরিটি চাই—বিলিতি ফার্মে চাকরি চাই—'

জবাব না দিয়ে চুপচাপ নিজের ভিতর গুটিয়ে গিয়েছিল পিনাকী।

রজত ভাবল, পিনাকীর মতো মন খারাপ-করা সমস্যা তার নেই। তবে এটা ঠিক, এরা—টুপুর, ঈপ্সিতা, পল্লব, পিনাকী, চন্দনা, অসিতরা আছে বলেই সে অনেকটা আছে। বাড়ি থেকে বেরুনো থেকে আবার বাড়ি ফিরে আসার মাঝখানের সময়টুকু না থাকলে হাঁফ ধরত নিঃশ্বাসে। একা থাকার সময়গুলোয় কী যেন একটা ভর করে তার ওপর—পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিরতির করে এক রকম জ্বালা, জট পাকিয়ে যায় ভাবনাগুলো, মাথাটা, মনে হয়, শূন্য থেকে শূন্য হয়ে যাচ্ছে আরও। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর গোড়ার দিকে খুব হতো এটা। এখন অনেকটা কমে গেলেও জ্বালা-ধরা অনুভূতিটা ফিরে আসে প্রায়ই। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে নিজেকে, কেন! কী করেছিলাম! এইভাবেই থাকতে হবে আমাকে! ভাবতে ভাবতে, চোখের সামনের সাদা দেওয়ালটা শুধুই সাদা হয়ে যায় আরও। এসব কথা কাউকে বলা যাবে না; বললেও যে বুঝবে তার মানে নেই কোনো। যা করার তাকে একাই করতে হবে।

বাইরে বোধ হয় রোদ উঠেছে চড়া। ঘরের মধ্যেটা হঠাৎই আলো হয়ে উঠল। সোঁদা দেওয়ালে ফি-বর্ষায় পলেস্তারা খসে যায় অনেকটা করে; অবসর সময়ে চুন-বালি-সিমেন্ট মিশিয়ে নিজের হাতে প্লাস্টার করে শম্ভুনাথ। এ-বছর এখনো সে-রকম কিছু করেনি, হয়তো চোখে পড়েনি। পরিচ্ছন্ন রোদ্দুর লেগে চুন-বালিখসা দেওয়ালটাই অন্য রকম লাগছে এখন—যেন অসুখের বিছানা ছেড়ে এইমাত্র পা রেখেছে মাটিতে। খানিক সেদিকে তাকিয়ে থেকে চটপট তৈরি হয়ে নিল রজত। শম্ভুনাথের গলা পাচ্ছে; বোধ হয় বাজার করে ফিরল। তার মানে কাকিমাও রেডি। বাল্‌বের ব্যাপারটা নিয়ে এখনই বললে ভালো হতো; বলা কি উচিত হবে? একটা বাল্‌ব বই তো নয়, ইচ্ছে করলে সে নিজেই কিনে নিতে পারে। পারে না?

কী আছে না আছে দেখার জন্যে মানিব্যাগটা খুলেছে, দরজার বাইরে শম্ভুনাথের গলা পেল।

'রজত আছ?'

'আছি—।' তৈরি হয়েই ছিল, ব্যস্ত হাতে জুতোর ফিতে বেঁধে বাইরে এলো রজত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শম্ভুনাথ; ধুতি, গেঞ্জি ও না-আঁচড়ানো কাঁচাপাকা চুলে বয়সের চেয়ে বেশি বুড়ো লাগছে এখন। চশমাটা ঠিক যেখানে থাকা উচিত সেখানে নেই। হাতে পাতা-খোলা খবরের কাগজ, মনে হয় পড়তে পড়তেই উঠে এসেছেন।

'কিছু বলছেন?'

বলার আগে আপাদমস্তক রজতকে দেখে নিলেন শম্ভুনাথ। চশমাটা বসিয়ে নিলেন জায়গামতো।

'আজকের কাগজটা দেখেছ ? প্রাইভেট টিউটরের বিজ্ঞাপন ?'

শুনেই তেতো হয়ে গেল মুখটা। শম্ভুনাথের মুড বুঝবার জন্যে যে সময়টুকু দরকার এখন তা পাবে না। টাইমিংয়ে গণ্ডগোল হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি একটা অজুহাত না পেলে বেরুতে দেরি হয়ে যাবে।

গম্ভীর হয়ে রজত বলল, 'না—'

'কেন, দেখনি কেন ! কাগজটা তো তোমার মাথার কাছেই ছুঁড়ে দেয়—'

'দেখা হয়নি আজ। পড়ছিলাম।'

'পড়াটা গৌণ। বুদ্ধিমান লোকেরা প্রয়োজনটাকেই প্রাধান্য দেয়। বিজ্ঞাপনটা দেখ, আজকেই যোগাযোগ করো—'

কাগজটা তার দিকে এগিয়ে ধরেছিলেন শম্ভুনাথ, না নিয়ে ঈষৎ পিছিয়ে গেল রজত।

'একটা টিউসান তো করছি। আবার একটা ধরলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে—'

'ক্ষতি হবে !' কিছু রাগ কিছু বিস্ময় মিশিয়ে অদ্ভুত চোখে খানিক রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শম্ভুনাথ। তারপর, যেন কী বলবেন ভেবে না পেয়ে হাঁটতে লাগলেন পিছন ফিরে। বারান্দায় অনেক দিনের পুরনো একটা ইজিচেয়ার পাতা থাকে সব সময়—কেউ বসে, কেউ বসে না ; তবে এই মুহূর্তের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হবে শম্ভুনাথ ওইখান থেকেই উঠে এসেছিলেন। বসে, আর তার দিকে তাকানো প্রয়োজন মনে করছেন না।

'ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে—', থেমে থেমে বললেন শম্ভুনাথ, 'যে একবার খুন করে সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না। পড়াশুনা করে কি জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে ! ওই ছাপ দেখে কে দেবে চাকরি !'

রাগটা আসছিল। রজতের মনে হলো শরীরের ভিতরে কোথায় কী একটা ঘটে যাচ্ছে। ঘটনার চাপে বেঁকে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় সে বলল, 'আমি খুন করিনি—'

'হতে পারে ; সে আমিও জানি। কিন্তু, পুলিসের খাতায় যে-কথা লেখা আছে, তুমি আমি কেউ তা মুছতে পারব না। এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে। নিজে ভুগবে, অন্যদেরও ভোগাবে। এখনও ভোগাচ্ছ—'

'ভোগাচ্ছি !' নিজের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার আগে কথা হারিয়ে ফেলল রজত। ছোটবেলা থেকেই এই রকম, যা প্রায় এই রকম মুহূর্তে তার সমস্ত অনুভূতি এসে জড়ো হয় চোখে। এখনও তাই হলো। চাপা কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'আগে বললে পারতেন। চলে যেতাম। আমি কাউকে ভোগাতে চাই না—'

'চলে যাবার কথা হচ্ছে না।' একটু জোর দিয়েই বললেন শম্ভুনাথ, এতোক্ষণ পরে তাকালেন রজতের দিকে, 'তোমার বাবার কাছে আমি ঋণী, আমি তোমাকে চলে যেতে বলতে পারি না। কিন্তু, আমিই শেষ কথা নয়। তোমার নিজের দাদাই তো তোমাকে রাখতে চায়নি, মাসে মাসে টাকা দিতেও তার কষ্ট হয়। কে ভাববে তোমার কথা !'

'কাউকেই ভাবতে হবে না—', এতোক্ষণ ধরে তৈরি-হওয়া কথাটা বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। চোয়াল শক্ত করে রজত বলল, 'ভাবার দরকার নেই।'

'ভালো কথা। আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো।'

আর কিছু না বলে অত্যন্ত দ্রুত দরজার দিকে হেঁটে গেল রজত। আড়ালে থেকে কাকিমা বোধ হয় শুনছিল সব, এখন হতচকিত গলায় বলে উঠল, 'এ কী, খেয়ে যাবি না!'

'না'

'কী বলো তো তুমি। কী দরকার ছিল এসব কথা বলার!'

'যা বলেছি ওর মঙ্গলের জন্যেই বলেছি।' শম্ভুনাথ উঠে দাঁড়ালেন, গলা কাঁপছিল। বললেন, 'শুধু রাগ দিয়ে সব কিছু বোঝা যায় না।'

দরজা খুলে অল্প দাঁড়াল রজত, পিছনে তাকাবে কি না ভাবল। না। তারপর বেরিয়ে, সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দৌড়ে গেল রাস্তায়।

এখন হাঁটছে। এখন তার মাথায় কিছু নেই। না স্মৃতি, না শ্রদ্ধা, না পিছুটান। কিংবা, কিছু নেই বলাও হয়তো ভুল, এখন শারীরিক আবেগ ছাড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত বোধবুদ্ধি। অ্যাট্রোপিন দেবার পর যা হয়, চোখের মণি দুটো বড়ো থেকে আরও বড়ো হয়ে আশপাশের দৃশ্যগুলিকে ঝাপসা করে দিচ্ছে ক্রমশ। তার পরের কয়েকটা মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না সে। যেতে যেতেই হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে দুটো হাতে গলার কণ্ঠা চেপে ধরে ওপরে তাকাল, আকাশের দিকে অসহায়ের মতো, ঝলমলে রোদ্দুরে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। এই মুহূর্তে এই মুহূর্তটি ছাড়া তার সামনে আর কিছু নেই। মাথাভর্তি অন্ধকারের ছুটোছুটি সহ্য করতে করতে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল রজত। একটুক্ষণ, তারপরে আরও একটু সময়। চারিদিকে এতো আলো, এতো শোভা, এমন স্বাভাবিক ব্যস্ততা—এর মধ্যে নিজেকে এতো একা লাগছে কেন। সত্যি সত্যিই কি তার ভবিষ্যৎ নেই কোনো। যার ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমান আঁকড়ে থাকাও কি তার পক্ষে খুব জরুরী। যে-রঙটা সে চেনে না, সত্যি সত্যিই কি তার ছাপ চিরকাল লেগে থাকবে তার গায়ে। যে খুন হয়েছিল, সে-লোকটাকেও যদি সে চিনত!

ঝাপসা হয়ে আসা চোখের ভিতর দিয়ে দেখা তার চারিদিকের প্রকৃতি ও পরিবেশে আস্তে আস্তে প্রশ্ন ও অভিমানগুলো ছড়িয়ে দেয় রজত। এতো ব্যস্ত চারিদিক, এতো শব্দময় ও স্বার্থপর যে সেগুলো পৌঁছয় না কোথাও। এমনকি, একটু পরে, তার নিজেরও মনে হয় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব কিছু—জলের অবরোধ এড়ানোর জন্যে পিঁপড়ে যেমন অবরোধের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত শুধুই শুঁকে বেড়ায় বিষাদ, তেমনি, সমস্যা মনে হচ্ছে বলেই শরীরময় প্রখর জ্বালা নিয়ে সে ঘুরছে তার আশেপাশে, পৌঁছচ্ছে না কোথাও। শম্ভুনাথ বলেছিলেন, যা বলছে সবই তার ভালোর জন্যে, কিন্তু, সত্যি সত্যিই, এটা কীরকম ভালো ভাবা! ক্যান্সারের রুগীকে ডেকে বলা, মৃত্যু অনিবার্য, তাই তোমাকে বাঁচানোর জন্যে চলেছে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা! এর চেয়ে যদি মৃত্যুটাই পাওয়া যেত আরও তাড়াতাড়ি, বাঁচা যেত আতঙ্ক নিয়ে এই রাজসুখে বেঁচে থাকার অপেক্ষা থেকে! কী করবে? আত্মহত্যা?

ধুত! নিজের ভিতর থেকেই একটা হঠাৎ-খুশি সুড়সুড়ি দিয়ে যায় সারা শরীরে, এতো সব আকর্ষণের মধ্যে থেকে যদি মরেই যাই হুট্‌ করে, তা হলে করা হলো কী! একটা মিথ্যে নিয়ে কী হবে কী হবে ভাবতে ভাবতে ফেটে যাব দুম্‌ করে! পুলিস কি তার বাপের চাকর যে খুন করা সত্ত্বেও শেষমেশ ছেড়ে দিল তাকে! এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই নিশ্চয়ই কোথাও আছে একটা খুঁত—ছুরি চালিয়ে সেই ফুটোটাকে বড়ো করতে হবে আরও। সেটাই তার বাঁচার পথ।

বাঁ হাতের ঝটকায় চোখ মুছে নিল, তারপর ডান হাতের ঝটকায় আবার। জুত না হওয়ায় সকালে কামানো গাল ও কপালের ওপর ঘষে ঘষে বুলিয়ে নিল রুমাল—এঃ, একেবারে কেঁদেই ফেলেছিলুম! অনুভূতি বলে দিচ্ছে চোখ দুটো লালচে হয়ে আছে এখনো—হঠাৎ দেখে যে-কেউই বলতে পারবে কিছু একটা হয়েছিল। যদি জিজ্ঞেস করে, কী, সে কি বলতে পারবে, এই, মানে, কাকা বলছিল আর একটা টিউসান করো ; তো আমি বললাম, একটা তো করছিই, আর একটা করলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে ; তো কাকা তখন বলল, পড়াশুনো করে হবে কী—জজ ম্যাজিস্ট্রেট ! তাই থেকেই গরম। তখন জেলখানার ছাপের কথা উঠল। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। আমি কি সত্যিই খুনী ! কাকা বলল, না। বাবার কাছে ঋণী বলে তাড়াতে পারবে না বাড়ি থেকে। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী ! এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে—যেখানে ফার্স্ট অ্যাভেলেবেল অপারচুনিটিতেই পোঁদে লাথি মেরে বিদেয় করে লোকে, সেখানে একটা লোক ধরে আছে আঁকড়ে, এমন লিবারেল কাকা কোথায় পাবে ! বাবা রজতশুভ্র, সত্যি বলো তো, শম্ভুনাথের সঙ্গে যখন ধুমধাড়াক্কা চলছে, তখন কড়াইয়ের ছ্যাঁকছোঁক শব্দ আর ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ পেয়েছিল কি না ! খুব তো মেজাজ দেখিয়ে বেরিয়ে এলে, ফিরে যাবে নাকি ?

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রজত ভাবল, নাঃ, এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। ফিরে গেলে ওই টিউসানের খোঁজে বেরুতেই হবে তোমাকে। এই তো লাইফের হাল, এনজয়মেণ্ট বলতে কিছু নেই—খালি ঘুরে বেড়াও দুটো রোজগারের ধান্ধায় ! ডানায় ইঁট বেঁধে ওড়া যায় নাকি ! চেনাশোনার মধ্যে কারুরই এমন কপাল নয়, তারই বা এমন হবে কেন ! তা ছাড়া, ব্যাপারটা ঠিক শম্ভুনাথকে নিয়ে নয়। ওই ছাপটা আছে, থাকবে ; ওই ছাপটা শম্ভুনাথের গায়ে নয়, তার গায়ে। সত্যিই তো, একটা সরকারী চাকরি-টাকরির ব্যাপার যদি হয়, তা হলেই পুলিস ভেরিফিকেসানের প্রশ্ন উঠবে—কোনো দিন কোনো কেসে জড়িয়েছিল কি না! অ্যাঁ, খুন ! পনেরো মাস কাটাতে হয়েছিল জেলে ! সরি, নো ভেকানসি। উই ওয়াণ্ট এ ক্লিন স্লেট !

অপমানটা নেমে গেছে, এখন আসছে রাগ। ভীষণ রাগ। ইচ্ছে করলে ও হাতে ছুরি থাকলে রজত এখন হাতের শিরাগুলো কেটে ফেলতে পারে। কিংবা, সত্যি সত্যিই খুন করতে পারে যে-কোনো একজনকে। সেই একজনটা কে—কে হতে পারে ! এতো বছর পরে মুখগুলি মনে নেই আর, স্মৃতি একাগ্র করে ভাবলেও মনে পড়ে না ঠিক ঠিক। এক একদিন রাতে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে যখন ঘুম আসে না অনেক রাত পর্যন্ত, হঠাৎ বৃষ্টিতে নির্জন আর এলোপাথাড়ি শব্দ ওঠে চারিদিকে, খোলা জানলার লম্বা গরাদগুলোর দিকে তাকিয়ে সে শুধু অপেক্ষা করে চুপচাপ। নৈঃশব্দ্যের শব্দটা ঠিকই আছে, মনে হয়, এবার অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসবে একটি চেহারা—তার কাঁধে রাইফেল, অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে হাঁটু দুটো একসঙ্গে জোড়া, হাত দুটো মুঠো করা, আদলহীন মুখে নিষ্ঠুর অন্ধকার মাখানো। একটা বরফের টুকরো গড়িয়ে যায় মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, আস্তে আস্তে ; বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর জখম হওয়া জায়গাটা ব্যথা করে ওঠে হঠাৎ। এবড়ো-খেবড়ো মাংসে নিবদ্ধ যন্ত্রণাটা একাই সহ্য করে সে—যেন ওই অংশটা তার শরীরের নয়, আলাদা। তবু, মা যেমন শিশুর, তেমনি, একা যন্ত্রণাটা নিজের মধ্যে ক্রমশ টেনে নেয় রজত। আস্তে আস্তে হাত বোলায় জায়গাটার ওপর, নিরুপায় দুঃখে কঠিন হয়ে ওঠে চোয়াল দুটো। জেল থেকে বেরুনোর পর শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতটা পরীক্ষা করে ডাক্তার

বলেছিল, নার্ভগুলো ইনজিওরড হয়েছে, কিছু তো করার নেই এখন। মাঝে মাঝে পেন হতে পারে। সেটা সহ্য করতে হবে। এই মুহূর্তে আত্মস্থ, ডান হাতে বাঁ হাতের ওই জায়গাটা চেপে ধরে দুঃখটা পেরিয়ে গেল রজত। অভিজ্ঞতা বলে দেয় ব্যথাটা সব সময় থাকে না—এক একসময় অনেক দিন ধরে থাকে না, কিন্তু উত্তেজিত হলেই চাগিয়ে ওঠে হঠাৎ।

ট্রাম থেকে নামার পর রজতের খেয়াল হলো ট্রামে উঠেছিল। বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল খুব ; তবু বুদ্ধি এলোমেলো হয়নি এতোটুকু। এটাই অনীশদাদের স্টপ। তার মানে টানা প্রায় পনের মিনিট অন্যমনস্ক থাকলেও ঠিক জায়গায় ঠিক সময়টিতে সে নেমে পড়তে পারল। এইভাবে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়টিতে সে যদি সত্যিই পৌঁছে যেতে পারে—এই অপমান আর হার্ডশিপের মধ্যে দিয়ে, সত্যি, একটা দারুণ ব্যাপার হয় তা হলে ! পারবে না ! কী রে, পারবি না ? এইভাবে, প্রশ্নটাকে ইচ্ছে করে, এক রকম দ্বিধায় দুলতে দুলতে ফুটপাথ ধরে খুব শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল রজত। যদি অনীশদার সঙ্গে দেখা হয়, আজ সে স্পষ্টই বলবে কথাটা। এভাবে আর টানা যাচ্ছে না নিজেকে। একটা কিছু করা দরকার—যা হোক একটা কিছু, যাতে সে নিজেই হয়ে ওঠে।

অনীশদা দাঁড়িয়ে ছিল ব্যালকনিতে, আগেই দেখতে পেয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল।

'আয়। অনেক দিন পরে—'

'আপনি বাড়িতে ?'

'দু' দিন ছুটি নিয়েছি। একটু জ্বর মতন হয়েছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা। একটু পরে অবশ্য বেরুতে হবে একবার।' দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েও আবার পুরোটা খুলে দিল অনীশ, 'পিকিউলিয়ার রোদ্দুর। আসছে, যাচ্ছে। ওয়েদারটা ভালো, কী বল !'

'ওয়েদার ?' ডিভানে বসতে বসতে রজত বলল, 'দেখিনি—'

'হ্যাঁ, তোরা তো আবার এসব দেখিস না।' ভিতরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে গলার স্বর তুলল অনীশ, 'শুনছ, রজত এসেছে—।' তারপর বেতের সোফা টেনে বসল, 'চান করতে ঢুকেছে। কাল দেখা হয়েছিল শিখার সঙ্গে ?'

সকালের কাগজটা টেনে নিয়ে সটান সেই বিজ্ঞাপনটায় চোখ রেখেছিল রজত। পড়তে পড়তে মাথা নাড়ল।

'কী খবর তোর ?'

সিগারেট ধরাচ্ছে অনীশ। দেশলাইটা সম্ভবত ড্যাম্প-ধরা। পরপর দুটো কাঠি নষ্ট হয়ে তৃতীয়টি জ্বলল।

রজত বলল, 'এই—, চলে যাচ্ছে।' বলে আবার কাগজটায় চোখ রাখল এবং ভাবল, মাইনে যতোই দিক, উত্তর কলকাতায় টিউসান করতে গেলে, প্রতিদিনই তার বিকেল আর সন্ধেটা নষ্ট হয়ে যাবে। টিউসান করে যখন বাড়ি ফিরবে—ভাবনাটা সম্পূর্ণ হলো না। রাস্তায় কোনো মোটরের হর্ন ফেঁসে গেছে, একটানা বিশ্রী শব্দটা ঢুকে গেল মাথার ভিতর।

'কী ব্যাপার রে ! দেখে মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে !'

ঘুরে তাকাল রজত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাঁজে ভাঁজ করতে লাগল কাগজটাকে। অনীশদার সামনে ধোঁয়ার আড়াল। একটা চোখ আধবোজা করে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। ভিতরে ভিতরে একটু নড়ে গেল রজত। আজকাল এ-রকম হয় ; যখন যা ভাবে

সবই মনে হয় ব্যক্তিগত। এখনও টের পেল, জ্বালাটা ফিরে আসছে।

'অনীশদা, টিউসানে হবে না। আমার একটা চাকরি দরকার।'

'চাকরি ! চাস ?' কেটে কেটে উচ্চারণ করল অনীশ, 'হঠাৎ ?'

'হঠাতের কী আছে !' পিঠ সোজা করে বসল রজত, 'এমন মিজারেবল্‌ভাবে লাইফ কাটানো সম্ভব নাকি ! একটা ভিখিরির লাইফও এর চেয়ে স্মুথ ! এভাবে বাঁচা যায় না।'

অনীশ তাকিয়েছিল ওর দিকে। বলল, 'বাড়িতে ঝগড়া করেছিস ?'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না রজত। গুটিয়ে নিল নিজেকে। তারপর হঠাৎ বলল, 'আমাকে কেন হাজতে নিয়ে গিয়েছিল বলতে পারেন ?'

অনীশ হাসল। মাথা নিচু করে। সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল খানিক।

'লোকে বলবে ভাগ্য। আমি বলি সমাজব্যবস্থার গলদ। এখানে এটাই স্বাভাবিক—'

'সমাজব্যবস্থা ! শালা, শুয়োরের বাচ্চা ! আমিও দেখে নেব। আমি সত্যি সত্যিই খুন করব !'

অনীশ দেখল, রজত উঠে দাঁড়িয়েছে, কাঁপছে, মুঠো শক্ত আর চোয়ালটা ভাঙা, চোখ থেকে গড়ানো জলের ফোঁটাগুলো দাঁতে কামড়ানো জিবে টেনে নেবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। যেন এখুনি একটা ভয়ানক কিছু করে ফেলবে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওর কাঁধ দুটো চেপে ধরল অনীশ। চেষ্টা করল বসাতে।

'ছি, রজত ! দ্যাটস্‌ ভেরি ব্যাড ! তুই তো ভালো ছেলে, তুই এমন উত্তেজিত হলে চলবে কেন ! কী হয়েছে বল আমাকে—ব্যাপারটা বুঝতে দে !'

দু' হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুর ওপর নুয়ে এলো রজত। নিজেকে প্রশমিত করার চেষ্টায় ফোঁপাতে লাগল।

'আপনি বুঝবেন না—'

'ঠিক আছে।' ওর মাথায়, পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অনীশ বলল, 'একটা ইয়ং ছেলের এভাবে নিজের ওপর কন্ট্রোল হারানোও ঠিক নয়। রজত, কাম ইওরসেলফ্‌ !'

সেই একই ভঙ্গি, ডান হাত ও বাঁ হাতের ঝটকায় নিজেকে সামলে নিল রজত। তাড়াহুড়ো করে রুমালটা বের করল পকেট থেকে। লজ্জিতভাবে হেসে বলল, 'সরি, অনীশদা !'

অনীশ খুব গম্ভীর। পাশ থেকে উঠে হেঁটে গেল উল্টো দিকের খোলা ব্যালকনির দিকে। হাত থেকে ধোঁয়া উড়ছে, রজত দেখল, ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে আছে অনীশ। সত্যি, এভাবে কন্ট্রোল হারানো উচিত হয়নি। তার ওপর ওই যে আজেবাজে কথাগুলো বলে ফেলেছিল—হয়তো আবেগের মাথাতেই, তবু অনীশদা নিশ্চয়ই কিছু ভাবতে পারে। হোপলেস্‌ ! আমি একটা হোপলেস !

'কী, কখন এলে ?' পর্দা ঠেলে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল শিখা, ভিজে চুলের জট ছাড়াতে চিরুনিটা মাথায় ধরা। অনীশের দিকে চোখ যেতে বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি ওখানে !'

অনীশ ফিরে এলো তাড়াতাড়ি, গম্ভীর। একবার শিখার দিকে তাকিয়ে, সোজাসুজি দেখল রজতকে।

'তোর কলেজ নেই আজ !'

'যাব।'

'এখানেই খেয়ে যা।' অনীশ বলল, 'শিখা, চট করে চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে এসো

তো। আমাকে একটু বেরুতে হবে—'

অনীশের বলার ধরনে শিখা কিছু আঁচ করার চেষ্টা করল। তারপর রজতকে বলল, 'বোসো, আসছি—'

হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল অনীশ। বসতে বসতে আবার প্যাকেটটা তুলে নিল হাতে।

'সিগারেট খাবি ?'

'না।'

'কেন ? খাস তো ?'

'আপনি খান—'

'শ্রদ্ধা !'

বেঁকিয়ে হাসল অনীশ। এবার এক কাঠিতেই ধরিয়ে নিল আর একটা সিগারেট।

'তোকে একটা কথা বলি। বলতে পারিস জ্ঞানের কথা—', হাসিটা ছড়িয়ে দিয়ে অনীশ বলল, 'লাইফ, মিজারেবল, এসব কথা বলছিলি তো ! লাইফ আসলে একটা উড়োচিঠির ব্যাপার। একদিন না একদিন সকলেই পায়। কেউ সুখের খবর পায়, কেউ দুঃখের। যে যেমন পায় সেইভাবেই চলে। জিজ্ঞেস করবি কাকে ! কে পাঠাচ্ছে তা তো জানতে পারছে না কেউ ! তবে সেটাই শেষ নয়। যার মনের জোর আছে, চিঠির বয়ান সে ঠিক পাল্টে নিতে পারে। অসুবিধে হয়, দেরি হয়, তবু পারে—'

কথাগুলো মন্ত্রের মতো মিশে যাচ্ছে কানে। অনীশদা কথা বললে এক রকম জোর পাওয়া যায় মনে। কেন, সে জানে না। হয়তো এটাই সত্যি, আজও সে এই জোরটা পাবার জন্যেই ছুটে এসেছিল এখানে। মাঝখান থেকে সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল ! মাথা নিচু করে আপাতত অনীশের কথায় কান পেতে রাখল রজত।

'নার্ভ টেন্‌সড্‌ হয়ে আছে—এই কথাগুলোর মানে ঠিক এখুনি বুঝতে পারবি না হয়তো।' অনীশ বলল, 'কিন্তু এগুলো মনে রাখিস। যেমন করেই হোক মাটি কামড়ে পড়ে থাক। ফ্রাসট্রেসান মানেই তো পিছিয়ে পড়া—'

'কে আবার পিছিয়ে পড়ল ! রজত নাকি ?' ট্রে-তে চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শিখা বলল, 'সকালেও তোমার দাদার টেম্পারেচার ছিল। গলা শুনে মনে হচ্ছে এখন আর নেই—'

ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে অপ্রতিভ গলায় অনীশ বলল, 'এতো তাড়াতাড়ি হয়ে গেল চা !'

'জল চাপিয়েই এসেছিলাম—'

রজত লক্ষ করেছে, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক ছাড়াও ওদের দু'জনের মধ্যে কেমন একটা স্নিগ্ধ মায়া খেলা করে, প্রায়ই। আপাতত তার ও অনীশদার মধ্যে আলোচনাটা একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছিল বলেই কিনা কে জানে, এই মুহূর্তের স্তব্ধতা থেকে দ্রুত বেরুতে চাইল অনীশ। চা-টা শেষ করল তাড়াতাড়ি।

'আমি বেরুচ্ছি। রজত, তুই খেয়ে যাস—'

শিখা জিজ্ঞেস করল, 'কতো দূর যাবে ?'

'দ্বিজেনদা অসুস্থ। দেখে আসি একবার—'

'সে তো অনেক দূর !'

'বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

অনীশ ভিতরে গেল। বোধ হয় তৈরি হতে। শিখা বলল, 'রোদ লাগিও না। ছাতা নিও—'

সামনে শিখা বসে। রঙ ততো ফরসা নয়, তবু মুখের ডৌল আর স্বাস্থ্যের জন্যে সব সময়েই সুন্দর দেখায়। এখন আরও। তিন হাত দূরত্ব থেকে রজত তার সদ্য-ছাড়ানো একপিঠ চুলের ভিজে গন্ধ পাচ্ছে। সিঁথির দিকে তাকালে মনে হয় সব মেয়েরই সিঁদুর পরা উচিত ; না হলে সম্পূর্ণতা আসে না। সম্পূর্ণতা ! এই যে সে হুট্ করে ভেবে ফেলল, কথাটার মানে কী ! ঠিক জানে না। এ-রকম অনেক কথা, অনেক ভাবনা চৈতন্য জুড়ে রিনরিন করে ওঠে মাঝে মাঝে, তাদের অর্থ স্পষ্ট হয় না কখনো। এমনও হতে পারে এই মুহূর্তে শিখার দিকে তাকিয়ে সে সুখের কথা, শান্তির কথা ভেবেছিল। এমন একটা কিছুর কথা, যার পায়ের কাছে সারাক্ষণ লুটিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

অনীশ বেরিয়ে এলো। ছাতাটা ঠিকই সঙ্গে নিয়েছে। যেতে যেতে বলল, 'রজত, আর একদিন আসিস—'

ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল শিখা। এইভাবে নিশ্চয়ই প্রায়ই সে দাঁড়ায়। একজন চলে যায়, আর একজন দেখে। শুধুই অভ্যাস, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই ; তবু ব্যাপারটা গুলিয়ে দেয় রজতকে। মনে হয়, এই জগৎ, এই সম্পর্ক ও স্বাভাবিকতা থেকে সে অনেক দূরে। তার সবই এলোমেলো,অগোছালো—তার কী হবে তার নিশ্চয়তা নেই কোনো। অনীশদা বলল মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে। কোন মাটি !

'চলো, আমরা ভিতরে যাই।' শিখা বলল, 'খাবার তাড়া নেই তো ? কলেজ কখন ?'

'কোনো তাড়া নেই। ভাবছি আজ যাব না !'

'কেন !'

'মনটা ভালো নেই, বউদি। কেমন বোকা-বোকা লাগছে নিজেকে।'

'ও মা, সে কী !' শিখা হেসে ফেলল, 'নিজেকে নিজেরই বোকা লাগছে ! অদ্ভুত তো !'

রজতও হাসল। খানিক আগেকার জমাট বেঁধে থাকা ভারটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে মাথা থেকে। এখন অনেকটা হাল্‌কা, অল্প সুড়সুড়ি লাগলেই হেসে উঠতে পারে হো-হো করে।

'আমার হয় এ-রকম। মাঝে মাঝে। বোকা লাগে। তখন রাগও হয়।'

'তোমার দাদাকে বোলো। নিশ্চয়ই এর একটা ব্যাখ্যা বলে দেবে—।' রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল শিখা। গ্যাস খুলে আগুন জ্বালছে বার্নারে, 'কাণ্ড দেখলে লোকটার ! কাল সারা দিন জ্বরে হু-হা করেছে। আজ একটু কমতেই আর তর সইল না !'

রজত চুপ করে থাকল। ভালোবাসায় মান অভিমান থাকে ; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও। এটা তার পড়া কথা, কিছু বা দেখা। যদি কোনো দিন সেই জায়গায় পৌঁছয়, হয়তো বুঝতেও পারবে। 'বিয়ে যে কী সুখের, বুঝবি না !' বিয়ের পর শর্মিলা বলেছিল টুপুরকে। কথায় কথায় ফাঁস করে দেয় টুপুর। শুনে রজত বলেছিল, 'এমনভাবে বলছিস যেন সুখটা তোরই ! মেয়েগুলো জন্মন্যাকা !' টুপুর বলেছিল, 'মাঝে মাঝে তোকে কথামালার শেয়ালটার মতো লাগে। আঙুরফল টক।'

হঠাৎ-হাসিতে সুড়সুড়ি লাগল গলায়। ইতিমধ্যে রান্না নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শিখা। ভাজা তেল আর পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধে খিদে-খিদে ভাবটা চাগিয়ে উঠল। কথাটা

এখনই বলা যাবে না শিখাকে। বরং সে অন্য কথা ভাবল।

'বউদি, একটা ফোন করব ?'

'হ্যাঁ, করো না—'

ফোনটা বেডরুমে। ডায়াল করতে এনগেজড্ সাউণ্ড পেল। রিসিভার নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করল একটু। আবার এনগেজড্। কে যে কথা বলে এতো !

বিরক্ত হয়ে ফিরে এলো রজত।

'হয়ে গেল ?'

'না, এনগেজড্।'

'টেলিফোনের এই এক ঝামেলা !' আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো শিখা, 'তোমার সেই বন্ধুর খবর কী ? টুপুর ?'

'ভালো।'

'একদিন আসবে বলেছিল, এলো না তো !'

রজত চুপ করে থাকল।

'একদিন নিয়ে এসো। বরং তোমরা দু'জনে খেও। আমি তো একাই থাকি, আমার ভালোই লাগবে।'

'খাওয়াবেন, সত্যি !' উচ্ছ্বাসের গলায় বলল রজত, 'বউদি, আপনি গ্রেট ! টুপুর দু' দিন ওদের বাড়িতে খাইয়েছে। আমি কী করে ডাকি বলুন ! আমার তো বাড়িঘর নেই—প্রেস্টিজ থাকে না !'

'নিজেকে সব সময় অতো ছোট করে দেখ কেন !'

কথাটা পুরোপুরি শেষ করার আগেই শিখা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

রজত উঠে এলো। ডায়াল করার আগে আদরে চুমু খেল রিসিভারটাকে। রিং হচ্ছে। ঠোঁট দুটো পয়া বলতে হবে।—'হ্যালো !' পুরুষের গলা। বোধ হয় জ্যাঠামশাই।

'টুপুর আছে ?'

'কে তুমি— ?'

'রজত—'

'ধরো, দেখি—'

ধরে থাকল। এ-লোকটা অন্য বুড়োদের মতো নয়। কথা বলে কম। স্বাস্থ্য ভালো করার জন্যে একবার তাকে সাঁতার কাটার পরামর্শ দিয়েছিল।

'হ্যালো—'

'হয়েছে কিছু ?'

'কী ! ও, হ্যাঁ। ছেলে—। কী লাভলি দেখতে ! তোর কী খবর, এখন ফোন করছিস ?'

'ছেড়ে দেব ?'

'ছাড়ার কথা বলিনি। কী দুর্ভোগ দ্যাখ ! কার না কার ছেলে হবে, সারা রাত জাগতে হলো আমাকে ! ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—'

'ঠিক আছে, তোর যখন ছেলে হবে আমি রাত জাগব।'

'মারব এক চাঁটা ! ফাজিল ! মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শিখিসনি !'

'তুই মেয়ে হলি কবে থেকে !'

'তাই তো !' একটু থেমে গেল টুপুর। তারপর, 'এই শোন না, শর্মিলা ফোন করেছিল

একটু আগে। পিকনিকটা হচ্ছে— । আসছিস তো ? ওরা ইউনিভার্সিটিতে আসবে বলল ।'

রজত জবাব দিল না।

টুপুর বলল, 'কী ব্যাপার ! এই রজত ?'

'যাব কি না বলতে পারছি না। মন ভালো নেই।'

'তোর ওই এক কথা—মন, মন, মন ! শোন না ! শর্মিলা বলল, ওর বরের একজন কোলিগ এসেছে—সন্দীপ না কি নাম। সেও যাবে—'

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রজত, 'এঞ্জিনিয়ার ?'

'কী করে বুঝলি !'

'তোর জিবে জল পড়া দেখে। এঞ্জিনিয়ার শুনলেই তোদের জিবে জল পড়ে—'

'এটা যে বুঝতে পেরেছিস, রজত, সত্যি, তোকে আমার ইন্টেলিজেন্ট ভাবতে ইচ্ছে করছে।'

'যা খুশি ভাব।' রিসিভারটা কান বদল করে নিল রজত, 'শোন, তোর একটা নেমন্তন্ন আছে—'

'নেমন্তন্ন ! কিসের !'

'শিখা বউদি একদিন তোকে খাওয়াবে বলেছে—'

'ও, লাভলি !' টুপুর হাই তুলল, 'উপলক্ষটা কী ? ওঁদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি বুঝি ?'

'না। তোর বউদির ছেলে হয়েছে বলে।'

'যাঃ !'

'রাখছি। গিয়ে কথা বলব।'

'ঠিক আছে—'

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো ফাঁকা ; মনে হলো আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারত। গলায় স্বাদ আছে টুপুরের, একটু ছোঁয়াতেই উপুড় করে দেয় নিজেকে। কেউ কেউ সত্যিই সুখে আছে, রজত ভাবল, যেমন টুপুর। থাক। ওর পাশে যখন হাঁটে, এক-একদিন নিজেকে চাকর বা দারোয়ানের মতো লাগে। লাগুক। একটু আগে সে ঠাট্টা করেছিল। জানে তো, টুপুর মেয়েই। যেদিন ও চলে যাবে, এগিয়ে গিয়ে বলবে, ধন্যবাদ টুপুর। অনেক দিন তুই আমার অক্সিজেনের কাজ করেছিলি।

স্টিলের গামলায় চাল ধুচ্ছে শিখা। টেলিফোনের কথাবার্তা নিশ্চয়ই ওর কানে যায়নি। রান্নার জায়গা থেকে ভেসে আসছে মাছের ঝোলের গন্ধ। এক একটা রান্নার এক একরকম গন্ধ ; এক একটা পরিবেশের এক এক রকম চেহারা। নাক-চোখ খাড়া রাখলে সহজেই চেনা যায়। অনীশদা বাইরে ; এখন এ-বাড়িতে যে নৈঃশব্দ্য, শম্ভুনাথের ওখানেও তা অপ্রাপ্য নয়। তবু, দুই নির্জনতায় আপাতমিল থাকলেও, কোথায় আছে একটা পার্থক্য, অনুভূতি দিয়ে যা স্পষ্টই চিনে নেওয়া যায়। রজত ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো সবই নির্ভর করে কে কীভাবে দেখছে তার ওপর।

কাজ করতে করতেই শিখা বলল, 'কথা হলো ?'

'হ্যাঁ।'

শিখা ঘরে ঢুকল এবং আবার ফিরে এলো। আগুনের কাছাকাছি ঘোরাফেরার তাপেই সম্ভবত ঘাম ফুটেছে কপালে। গলতে শুরু করেছে সিঁদুরের টিপটা। আঁচল তুলে আলতোভাবে বুলিয়ে নিল গলায়।

'অনেক দিন থেকেই একবার বেলুড়ে যাব ভাবছি। রবিবার সময় হবে তোমার ?'

'রবিবার !' একটু ভাবল রজত। তারপর বলল, 'রবিবারেই যাবেন ?'

'পারবে না ? অবশ্য একাও চলে যেতে পারি। অনেকটা দূর তো, সেই জন্যেই—'

'না, না। আপনি বললে যাব।' অপ্রস্তুত গলায় রজত বলল, 'আসলে রবিবারে একটা পিকনিকে যাবার কথা হচ্ছে—'

'তা হলে বরং আর একদিন যাব। পিকনিক তো আর রোজ হয় না।'

আশ্বস্ত হলো রজত ! সেভাবে বললে সে হয়তো শিখার অনুরোধ এড়াতে পারত না। এর আগেও কয়েকবার এখানে ওখানে গেছে শিখা বউদির সঙ্গে। বেলুড়ে, দক্ষিণেশ্বরে কিংবা অন্য কোথাও। কোনো উপলক্ষ থেকে নয়, প্রায় অকারণে শিখা যেন তাকে এসব যাত্রার সাক্ষী রাখতে চায়। যাতায়াতের সময়টুকু ছাড়া বস্তুত দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক থাকে না কোনো। জায়গায় পৌঁছে আপনমনে মন্দিরের ভিতরে চলে যায় শিখা। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক থেকে খুঁজে নেয় তাকে। হাতে পুজোর ফুল ও প্রসাদ। একদিন তার মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিল, 'যখন পুজো দিই, তোমার কথাও বলি—'

রজত জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলেন ?'

'প্রার্থনার কথা আর কাউকে বলতে নেই।' অল্প রহস্যময় গলায় বলেছিল শিখা।

আজও রজতের এই সব মনে পড়ল। শিখা চুপচাপ ; এখন কিছু বলতে হলে রজতকেই বলতে হবে—যে-কোনো কথা। খানিক ওকে লক্ষ করে বলল, 'বেলুড়ে যেতে আপনার খুব ভালো লাগে, না।?'

'ওই আর কী। মনটা ভালো হয়। তা ছাড়া—', শিখা হাসল, 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো ! ছেলেপুলে নেই যে সেই নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আর তোমার দাদাকে তো দেখছ, এই আছে এই নেই—'

শিখা একটা নিঃশ্বাস চাপল। উঠতে উঠতে বলল, 'বোসো, ভাতটা চাপিয়ে দিয়ে আসি—'

কথাটা গেঁথে গেল মনে—এই আছে এই নেই। এমনিতে হাসিখুশি উচ্ছল শিখা বউদি কথাবার্তায় প্রায়ই অস্পষ্ট করে রাখে নিজেকে, ব্যাপারটা নতুন দেখছে না রজত। যতো না বলে তার চেয়ে ভালোবাসে শুনতে। কিন্তু আজ যেন একটু বেশিই ডুবে আছে নিজের মধ্যে। স্পষ্ট করে কিছু বলল না বটে, তবু এসব কথার মধ্যে দিয়েই শিখার মনের ফাঁকা জায়গাটুকু ছুঁয়ে এলো রজত। চারিদিক ঘেরা ভেজা লাবণ্যের মধ্যে সেই জায়গাটায় চিকচিক করছে শুকনো বালি। মেঘ করে না, বৃষ্টি পড়ে না—সেখানে সারা দিন জুড়ে দুপুর।

হঠাৎই এক বিষণ্ণতা এসে নিজের থেকে আলদা করে দিল রজতকে—অস্পষ্টভাবে হলেও, টের পেল, বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথম শীতের মতো কিছু একটা। আগে থেকে এর কোনো প্রস্তুতি ছিল না মনে। একটু আগে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে—নির্ভরতার জন্যে যাদের কাছে ছুটে এসেছিল, এখন দেখছে তারাও দাঁড়িয়ে আছে নদীর অন্য পারে। পারাপারের সূত্র নেই কোনো। তবে কি এটাই সত্যি, কেউই ভালো নেই—কেউই পৌঁছুতে পারছে না কোথাও ! দুঃখময় একই উড়োচিঠি ঠাণ্ডা বুলিয়ে যাচ্ছে সকলের বুকে ! পারস্পরিক এতো সুখ, শান্তি ও ভালোবাসার মধ্যে থেকেও

অনীশদা শিখা বউদির সংসারে মাঝে মাঝে এমন ছায়া নেমে আসে কেন ! কেন মাঝে মাঝে মন্দিরে ছুটে যায় শিখা বউদি, কার জন্যে কোন প্রার্থনা রেখে আসে নিঃশব্দে !

নাঃ, পুরো ব্যাপারটাই যেন কেমন গোলমেলে, যতো ভাবছে ততোই জট পাকিয়ে যাচ্ছে আরও । আবার এরই মধ্যে দ্যাখো কেমন দুম করে একটা বাচ্চা হয়ে গেল টুপুরের বউদির ! সাত বছরে বড়ো বউদির হয়েছে তিনটি । এই জন্যেই ভগবান-টগবানে তার বিশ্বাস হয় না কখনো । দেখা হলে বলত, স্যার, জাজমেন্টগুলো বড্ড একপেশে হয়ে যাচ্ছে । মানুষ আপনার কাছে ন্যায় চায়, তার বদলে দিচ্ছেন দুঃখ । এই দুঃখই একদিন ঘৃণায় পরিণত হবে, তারপর রাগে । তারপর কী হবে আমি জানি না । শিখা বউদি হয়তো চাপা দুঃখে মনে মনে কেঁদে যাবে সারা জীবন । কিন্তু, আমি ছাড়ব না । আমি তো জানিই আমার প্রতিপক্ষ ভগবান-টগবান নয়, মানুষই । হাতে ক্ষমতা পেয়ে ভগবান ভাবছে নিজেদের । একদিন না একদিন আমি তাদের চিনে নেব । সেদিন শালাদের গায়ের ছালচামড়া থাকবে না ।

দুঃখময় রাগে কনুইয়ের ওপরে উঁচুনিচু চামড়াটায় হাত বোলাতে লাগল রজত । প্রায় অকারণ জ্বালা করতে লাগল চোখ দুটো ।

টুকটাক কাজে এদিক ওদিক করছে শিখা । এখন ঘরে । খাবার ঝামেলা এখানে না রাখলেই ভালো হতো । মনে হচ্ছে শিখা বউদির মন ভালো নেই আজ—হয়তো অভিমান হয়েছে অনীশদার এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ায় । এমন একা একা সত্যিই কারও সময় কাটে না ।

ভিতর থেকে বসার ঘরে চলে এলো রজত । দেওয়ালে তৈরি র‍্যাকে বইয়ের পর বই ঠাসা । অদ্ভুত অদ্ভুত নাম । রজত একটা বই দেখল—টরচার । টেনে বের করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গলা পেল শিখার ।

'তুমি এখানে ! আমি ভাবছি গেল কোথায় !'

'রান্না হয়ে গেল ?'

'প্রায় ।' শিখা বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে নাকি ?'

রজত ভাবল বলে ফেলে । মুখে বলল, 'না— ।'

জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছে শিখা । রজত শিখাকে । শিখার আড়াল পেরিয়ে রোদ ঢুকছে ঘরে । কার মতো যেন ! হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ধরনে ঘুরে তাকাল শিখা ।

'এই, লুডো খেলবে ?'

'খেলতে পারি—'

'চলো । ভাত হতে তো সময় লাগবে । তোমার দাদা যদি এসে পড়ে একসঙ্গেই না হয় বসে পড়ব ।'

ডাইনিং টেবিলের ওপর থেকে গ্লাস-ট্‌ম্ব্লারগুলো সরিয়ে লুডোর ছক পাতল শিখা ।

'আমি কিন্তু সবুজ নেব ।'

'আমি লাল ।' রজত বলল, 'আপনিই চালুন প্রথম '

উঠল না । শিখার হাত থেকে ঘুঁটিটা নিয়ে নাড়তে নাড়তে রজত বলল, 'মনে হচ্ছে ছয়ই পড়বে—'

শিখা বলল, 'আমার এবারও পড়বে না ।'

ঘুঁটিতে পাঁচ । রজত বলল, 'আর এক দান নেবেন নাকি ?'

'না বাবা, দরকার নেই । যার যার নিজের লাক । দয়া দেখানোর দরকার নেই—'

রজতের দুই। ঘুঁটি নাড়তে নাড়তে ঠোঁট টিপে হাসছে শিখা। ছয়। নড়ে বসল।

'তুমি টুপুরকে ভালোবাসো ?'

'না—'

শিখা দান ফেলল। এবার পাঁচ ঘর থেকে গুটি বের করতে করতে বলল, 'লুকোচ্ছ কেন। আমার কাছে বলতে লজ্জা কী!'

রজত বলল, 'আমার কোনো ফিলিং নেই।'

শিখা এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এখন ওর চারটে গুটিই বাইরে। রজত আটকে আছে একটাতেই।

শিখা জিজ্ঞেস করল, 'কে বড়ো ? তুমি, না ও ?'

'আমিই। আমার দেড়টা বছর নষ্ট হয়েছিল।'

শিখা মাথা নাড়ল। এলানো চুল শুকিয়ে গেছে এখন, খোঁপা করে তুলে দিল ঘাড়ের ওপর।

'মন দিয়ে খেল। আর গুটি বেরুচ্ছে না কেন ?'

'না পড়লে কী করব!'

তখনই ছয় পড়ল। শিখা বলল, 'দেখলে তো! যার কথা ভাবছ সেই বাঁচিয়ে দিল!'

'কী আশ্চর্য!' অপ্রস্তুত গলায় বলল রজত, 'আমি কারুর কথা ভাবছি না—'

'নিশ্চয় ভাবছ।' চাপা ঠোঁটে হাসছে শিখা। আর একটা দান ফেলে বলল, 'কাউকে ভালোবাসাটা দোষের নয়। তবে অমন তুইতুকারি করলে কোনো দিনই জানতে পারবে না কিছু।'

এর পরের দুটো দানই পরপর ছয় ফেলল রজত।

'এই তো!' যেন হঠাৎ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল শিখা। ছড়া কেটে বলল, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এলো বান। কী, বলেছিলাম না!'

শিখার সুস্মিত মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রজত। সে ভুল বা মিথ্যে বলেনি, ভালোবাসাটাসার ব্যাপারটা সত্যিই সে বোঝে না—সে টুপুরই হোক বা আর যে-কেউ, কারুর জন্যে তার মনে আলাদা আবেগ নেই কোনো। আর টুপুরের সঙ্গে যে একটু বেশি ভাব, সেটা ভালোবাসা হতে যাবে কেন! ভালো লাগা আর ভালোবাসা কি এক ? তবে, রজত ভাবল, এই মুহূর্তে শিখা বউদির সরল হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে যে-কোনো কথাই সে মেনে নিতে পারে। ঠাট্টা-ইয়ার্কির মধ্যে লুডোর ছকে দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শিখা যেন তার চাপা দুঃখটা পেরিয়ে যাচ্ছে। রজত ভাবল, খেলাটা চলুক।

খেলার মায়ায় ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল অনেক। দুটো ক্লাসেরই সময় পেরিয়ে গেছে তখন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্যান্টিনে পল্লবকে পেল রজত। শুনল, শর্মিলারা গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সঙ্গে অশোক আর তার বন্ধু সন্দীপও ছিল। ওরা দল বেঁধে কোয়ালিটিতে গেছে। টুপুর, ঈপ্সিতা, পিনাকী, অসিতও। সে রজতের জন্যেই অপেক্ষা করছিল এতোক্ষণ। এখন একসঙ্গে যেতে পারে।

রজত বলল, 'তুই চলে যা, আমি যাচ্ছি না—'

'কেন!' ঘাবড়ানো গলায় বলল পল্লব, 'যাবি না কেন ?'

'আমার ইচ্ছে। কোথাকার কে অশোক, সন্দীপ—আমি তাদের পেছনে ফেউ ধরব কেন!'

'তোর মধ্যে একটা কমপ্লেক্স গ্রো করছে, রজত !'

'ঠিক আছে। কমপ্লেক্স আছে বলেই আমি শালা আমি। না হলে ওদের গাড়ির সোফার হতাম—'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল রজত।

॥ তিন ॥

ভোর না হতেই আজ ঘুম ভেঙে গেল টুপুরের। ঠিক স্বাভাবিক জেগে ওঠা নয়—হঠাৎ, চমকে, এক আঘাতে। টের পেল কীরকম একটা অস্বস্তিতে কাঠ-কাঠ হয়ে এসেছিল গলা, শুকনো জিবটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে ও চাইছিল যতোটা সম্ভব আর্দ্রতা টেনে আনতে। ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে আছে চিবুকের নিচে থেকে সারা গলা ও বুক, ঘাম চোখের কোলে ও ঘাড়ের পিছনে—অনেকক্ষণ ধরে একটানা ঘেমে গেলে যেমন হয়, স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে বালিশটা।

এমন হবার কথা নয়। পাখা চলছে ফুল স্পিডে, ক্বচিৎ কখনো তার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দে প্রখর হয়ে উঠছে রাতের নৈশঃব্দ্য। আর শব্দ বলতে টাইমপিসের একটানা টিকটিক। ওদিকের খাটে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে চাঁপা, অন্ধকারে আবছা তার সাদা কাপড়ে জড়ানো শরীর—ঘুমের ঘোরেই একটা বড়ো নিঃশ্বাস চেপে পাশ ফিরল। সাধারণত মা তার আগে ওঠে, চা তৈরি করে ডাক দিলে সে। চাঁপার মাথার দিকের জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় খানিকটা—সেখানে তারা-টারা চোখে পড়ে না কিছু ; বরং অন্ধকারটা যেন একটু বেশিই থমথমে। আর কোথাও শব্দ নেই কোনো। কোথাও কিছু নেই, তবু ঘামে ভেজা গলায় হাত বোলাতে বোলাতে টুপুরের মনে হলো, এই রকম সময়ে টেলিগ্রাম আসে। যেমন এসেছিল বাবার বেলায়। টুপুর তখনো ঘুমিয়ে। তাকে ডেকে তুলে বুকে জাপটে ধরেছিল মা—যেন কেউ কেড়ে নিতে এসেছে, ওগরানো গলায় বলেছিল, না, তোকে আমি এ-খবর শুনতে দেব না। কতো দিন আগেকার কথা ! কেমন হঠাৎ চলে আসে এক-একটা খবর, দিশে পাওয়া যায় না !

আজকাল যখন তখন লোড শেডিং হয় বলে মাথার কাছে টর্চ নিয়ে শোয় টুপুর। এখন, বিছানায় উঠে বসার কিছুক্ষণ পরে, টর্চ জ্বেলে টেবিলের ওপর রাখা টাইমপিসটার ওপর ফেলল। প্রায় সাড়ে চারটে। তার মানে আরও ঘণ্টা খানেকের আগে সকাল হবে না। চোখে ঘুমের জড়তা না থাকলেও মুখটা লোনা লাগছে এখনো—আর সেই সঙ্গে মন আর আর মাথা জুড়ে অস্বস্তির রেশ, যার প্রভাবে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল তার।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল টুপুর। আঁচল দিয়ে চেপেচুপে চোখ, কপাল, গলা মুছল। স্বপ্নটা যেন এখনো লেগে আছে চোখে—এখনো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে দরজার কলিং বেল বেজে ওঠার তীক্ষ্ণ শব্দ। ওই শব্দেই ঘুম ভেঙে যায় তার। সেটা কিছু নয়। কিন্তু, তার আগের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনাগুলো ! হাড়ের মতো সাদা জ্যোৎস্নায় থমথম করছে ফাঁকা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, ট্রাম লাইনের ওভারহেড তারে জরির ঝিলিক। সে আর রজত দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে। তারপরেই কোত্থেকে কী হয়ে গেল ! দেখল ফাঁকা

রাস্তা দিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে রজত আর তার পিছনে তাড়া করে আসছে একটা অ্যামবাসাডর। স্টিয়ারিংয়ে বসে হাসছে সন্দীপ, তার পাশে সে, পিছনে অশোক, শর্মিলা, ঈপ্সিতা আর কে কে যেন—আরও স্পিড বাড়ানোর জন্যে বিশ্রী গলায় চিৎকার করছে তারা। তারপরেই অন্য রকম হয়ে গেল সব—ভীষণ রক্তাক্ত আর ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে ভেসে উঠল রজত, তখনো ছুটছে প্রাণপণে, উঠে আসছে তাদের সিঁড়ি দিয়ে, আর তার পিছনে পিছনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তাড়া করে আসছে পুলিসের ইউনিফরম পরা কয়েকটা লোক। দরজার সামনে এসে মাথা ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ল রজত—একেবারে বিপর্যস্ত যিশুখ্রিস্টের ভঙ্গি—বাঁ হাতটা আটকে গেছে কলিং বেলের বোতামে।

স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু অন্ধকার ঘরে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে হঠাৎ আবেগে গলা বুজে এলো টুপুরের, চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। স্বপ্ন হলেও, এসব ঘটনার কোনো না কোনো সূত্র নিশ্চয়ই আছে—যেমন গাড়িটা, গাড়ির মধ্যে যারা ছিল সবাই, ঝড়ের গতিতে সন্দীপের গাড়ি ড্রাইভ করা, বাসস্টপে তার আর রজতের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, সবই সে চিনতে পারে হুবহু। কিন্তু, এ-রকম কেন হলো যে খেয়াল খুশিতে ছোটানো গাড়িটা শেষ পর্যন্ত তাড়া করে গেল রজতকে চাপা দেবার জন্যে আর তারপরেই রক্তে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল সে! কী মানে হয় এসব অ্যাসোসিয়েসানের? নাকি ছোটবেলায় স্কুলে দেখা রজতকে টেনে হিঁচড়ে পুলিসের নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটাই এতো দিন পরে তালগোল পাকিয়ে ফিরে এলো স্বপ্নে! রজত, তোদের বাড়িতে তুই এখন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস! দ্যাখ, তোর কথা ভেবে এই ঘুটঘুটে রাত্তিরে কেমন কষ্ট পাচ্ছি আমি! অথচ, সেদিন, আমি যখন ফিরে এসে দাঁড়ালাম সামনে, তুই কি না সোজা বলে দিলি, যাদের সঙ্গে গিয়েছিলি, তারা তোকে পৌঁছে দিল না কেন! আরও খারাপ কথা বলেছিলি! তোর মুখে ফুটে উঠেছিল গোঁয়ার্তুমির ছাপ, যেন পারলে খুন করে ফেলবি আমায়! এই জন্যেই কেউ পছন্দ করে না তোকে! আমি? আমার কথা ছেড়ে দে। তবে, তোর সঙ্গে এই ভাবের ব্যাপারটা তো চিরকাল থাকবে না। একদিন না একদিন আমি চলে যাবো। তখন টের পাবি কে তোর কথা ভাবে—কে তোর খোঁজ রাখে।

অল্প শব্দ করে হাই তুলল টুপুর। উঠে দাঁড়াল।

শব্দেই সম্ভবত জেগে উঠেছিল চাঁপা। অন্ধকারে বলল, 'এখনই উঠলি, টুপুর আমি তো অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছি—'

'এমনি উঠলাম, মা। ঘুম ভেঙে গেল।'

'চা খাবি?' শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করল চাঁপা, 'করে দেব?'

'তুমি ঘুমোও। মোটে সাড়ে চারটে। এখনো অনেক রাত আছে—'

চাঁপা বলল, 'পাখাটা একটু আস্তে করে দে তো। শীত শীত করছে—'

পায়ের কাছে চাদর রাখা থাকে, তবু গায়ে দেবে না চাঁপা। অথচ রোজই বলে শীত করে রাতে। আন্দাজে রেগুলেটরের পয়েন্ট কমিয়ে দিয়ে এসে চাদরটা মায়ের গায়ে বিছিয়ে দিল টুপুর।

'আমি এখন পড়াশুনো করব তুমি যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ো না।'

দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখল আলো জ্বলছে শেখরের ঘরে। খটকা লাগল। এই অসময়ে তার জেগে থাকার কথা নয়। অল্প দাঁড়িয়ে থেকে ডাকবে কি না ভাবল টুপুর। তারপর বাথরুমে গেল।

স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে, তবু তার বিষণ্ণতা মন ছুঁয়ে আছে এখনো। বেসিনের কল খুলে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল টুপুর। অন্ধকার থাকলেও ভোর হয়ে আসার আলাদা স্বাদ আছে একটা, তার স্পর্শ আছে নৈঃশব্দ্যে ও হাওয়ায়, কলের জলে, এমনকি গাঢ় ঘুমে জ্যাঠামশাইয়ের মৃদু নাক ডাকার শব্দে। আর ওই যে নিচের রাস্তা দিয়ে হর্ন দিতে দিতে দ্রুত চলে যাচ্ছে ট্যাক্সিটা—দেখতে না পেলেও তার চলে যাওয়ার ধরনে। ঠাণ্ডা জলে ভেজা চোখ মুখ ঘাড়ে বাথরুমের ভেনটিলেটর বেয়ে আসা হাওয়ায় ছোঁয়া লেগে একটা তরতাজা ভাবে ছেয়ে এলো শরীর। ভারী মিষ্টি এই পেস্টের গন্ধটাও, এক নিমেষে তাড়িয়ে দিল মুখের লোনা ভাবটাকে। এখন ভাবতে অবাক লাগছে ওই রকম একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার!

স্বপ্ন সে নতুন দেখছে না, বলতে গেলে ঘুমের মধ্যে কেউ না কেউ বা একসঙ্গে অনেকে প্রায়ই ছুঁয়ে যায় তাকে। বেশির ভাগই যাদের সঙ্গে সারা দিন কাটায় তারা, কখনো বা মা, জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই। কিছু দিন আগে একদিন বাবা এসেছিল স্বপ্নে—অদ্ভুত স্বপ্ন, মনে আছে এখনো—জরির ফিতে বাঁধা একটা রঙচঙে প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে বাবা, সে কিছুতেই ধরতে পারছে না! সেদিন সারাটা সকাল মন খারাপ হয়েছিল তার, বাবার ছবিটার দিকে তাকাতেই মনে পড়ে যাচ্ছিল দৃশ্যটা, মাকে বলবে ভেবেও বলতে পারেনি। এসব ব্যাপারে মা বড়ো টাচি। কলেজে গিয়ে ঈপ্সিতাকে গল্প করেছিল। 'মরা মানুষের স্বপ্ন দেখা ভালো নয়।' একটু গম্ভীর করে বলেছিল ঈপ্সিতা, 'অসুখ করে।' টুপুরের অবশ্য তা মনে হয়নি, বরং বাবার জন্যে দুঃখটা কেমন পবিত্র হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মনে—প্রায় সারাটা দিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে। তা ছাড়া আর যা দ্যাখে সবই সাধারণ আর মজার স্বপ্ন। একবার একটা শিংওলা সাদা গরু ল্যাজ তুলে তাড়া করেছিল তাকে—আঁতকে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল বিছানায়। এসব ভাবলে নিজেকে কেমন ক্যাবলা মনে হয়। অনেক দিন পরে আজ সে একটা ভয়ঙ্কর আর গোলমেলে স্বপ্ন দেখল, কেন কে জানে! কিছুটা হালকা হয়ে টুপুর ভাবল, আজ পিকনিকে যাবার সময় রজতের সঙ্গে দেখা হলে বলবে, 'কী রে ব্যাটা যিশুখ্রিস্ট, রাতবিরেতে কলিংবেল টিপিস কেন!'

না না, এসব বলা যায় না। কথায় কথায় যদি সন্দীপ বা অশোকের কথা ওঠে, সে বড়ো লজ্জার ব্যাপার হবে। অন্যেরা শুনলে ঠাট্টা করতে পারে। যা সব ফাজিল! বিশেষত শর্মিলা—বিয়ের পর থেকে এতো অসভ্য-অসভ্য কথা বলে, কোনো কথাই যেন আটকায় না মুখে! এই তো সেদিন—রেস্টুরেন্টে বসে হাত দেখছিল সন্দীপদা, তারটা দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি খুব সরল।' 'সেটা বলার জন্যে অতোক্ষণ হাত ধরে রাখার দরকার হয় নাকি!' ফস করে বলে বসল শর্মিলা, 'যেভাবে নাড়াচাড়া করছেন আমি তো ভাবলাম, বলবেন, আপনার হাতটা কী নরম!' শুনে কান লাল হয়ে গিয়েছিল টুপুরের, তখনই মনে হয়েছিল সন্দীপের হাত থেকে কী একটা ছড়িয়ে গেল তার শরীরে! সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়ে সন্দীপ বলল, 'এভাবে বলা যায় কিছু!'

ঘটনাটা মনে পড়ায় এখনো অল্প রোমাঞ্চ বোধ করল টুপুর। সেই সঙ্গে কিছুটা জ্বালাও। কথাগুলো পিনাকী বা অসিত কেউ তুলেছিল রজতের কানে। ওরা চলে যেতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রজত বলল, 'ভাগ্য জানবার জন্যে হাত দেখানোর দরকার কী! সবই তো জানা। সন্দীপদা না হোক, ওই রকমই একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে তোর। তারপর চলে যাবি দুর্গাপুর, ভিলাই বা আসানসোলে। তারপরে ভ্যাদভেদে মোটা হয়ে কলকাতায় ফিরে

ইভনিং শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবি বরের সঙ্গে। দেখা হলে বলবি, কী রে, ভালো আছিস ? আয়, আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—এই তো !'

সাধারণত হয় না, তবে সেদিন একটু রাগই হয়েছিল টুপুরের। ভুরু তুলে বলল, 'তোর হিংসে হচ্ছে ?'

'হিংসে ! কোন দুঃখে ! আমার ডাল লাগে—বোরিং লাগে। মনে হয় মিথ্যে এদের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছিল !'

'তবে কি তোর ইচ্ছে মতো চলতে হবে ! এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন আমি তোর কেনা !'

মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে রজত বলল, 'রাস্তা পড়ে আছে, তবু আমার সঙ্গে হাঁটছিস কেন ? যা, চলে যা—'

বিকেলের ওই সময়টা রাস্তায় লোকজন ছিল না বেশি, তাই বাঁচোয়া। তবু এতোটা ভাবেনি টুপুর। আর না দাঁড়িয়ে একটু বা তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়েছিল বাসস্টপের দিকে। দাঁড়িয়েই ছিল। একটার পর একটা বাস এলো এবং চলে গেল, তবু ওঠেনি। কেন তা বুঝতে পারেনি। রাগে, দুঃখে ভোঁ ভোঁ করছিল কানদুটো। তবে এটা বুঝেছিল ঝাঁঝ দেখিয়ে ওর সঙ্গে পারা যাবে না ; আজ ওর জন্যে অপেক্ষা করা হয়নি—আজ আরও পারা যাবে না।

মিনিট দশেক পরে কোথা থেকে ফিরে এসে পাশে দাঁড়াল রজত। আরও একটা বাস চলে যাবার পর বলল, 'বাসস্টপটা প্যাঁচার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা নয়। চল, হাঁটি—। আমার খিদে পেয়ে গেছে—'

সঙ্গ ধরে টুপুর বলল, 'গেলেই পারতিস ! সকলেই খেলো—'

'তোর পয়সায় খাই বলে সকলের পয়সায় খাব এটা ভাবসি কেন !' রজত বলল, 'ওই লোকগুলোকে তো আমি চিনিই না ভালো করে !'

'তা হলে খিদেয় কোঁকা—'

রজত হাসল। গলার স্বর পাল্‌টে বলল, 'আর ঘ্যান ঘ্যান ভালো লাগছে না মাইরি। আইটেমগুলো বল তো ? তুই কী খাওয়াতে পারিস দেখি—'

এই রজতকে কিনা দেখল ক্ষতবিক্ষত ! ভাগ্যিস স্বপ্ন আজেবাজেই হয়।

ট্রাম চলার শব্দ। বাইরে বোধ হয় ভোর হয়ে আসছে, যদিও ভেনটিলেটর দিয়ে যতোটা দেখা যায়, বাইরেটা এখনো পুরোপুরি অন্ধকার। একটু আগে ঘর থেকে বেরুবার সময় মা চা করে দেবার কথা বলেছিল—সত্যি, এই সময় এক কাপ গরম চা পেলে কী ভালো যে লাগত। কিন্তু সে-জন্যে মাকে আর ডাকাডাকি করতে ভালো লাগছে না এখন। এমনিতেই শুতে শুতে বেশ রাত হয়ে যায় মার, শুলেও যে ঘুম হয় না ভালো, অনেক দিন মাঝঘুমে জেগে উঠে মার এপাশ ওপাশ করা দেখে বুঝতে পারে টুপুর। সংসারের মধ্যে থেকেও তখন ভীষণ একা লাগে মাকে। জ্যাঠাইমা বকেন মাঝে মাঝে, 'নিজেকে তুমি বড়ো বেশি কষ্ট দাও, চাঁপা ! আমাকেও কিছু করতে দাও। একটু বিশ্রাম নিলেও তো পার !' মা হেসে বলে, 'কাজ ছাড়া এ পোড়া কপালে আর কী নিয়ে থাকব দিদি !' শুনে এমনকি জ্যাঠাইমাও চুপ করে যায়। টুপুর বোঝে, বাবা যাবার পর থেকেই একটা সব-হারানো ভাব পাথরের মতো চেপে বসেছে মার বুকে, ভারী সেই পাথরটা নড়ানোর সাধ্য নেই কারও। ঝোড়ো হাওয়ার মতো এক-একটা দিন সেই পাথরটার ওপর দিয়ে বয়ে যায় শুধু, দাগ পড়ে না

কোথাও।

না, মাকে জাগিয়ে লাভ নেই। বরং নিঃশব্দে কিচেনে ঢুকে সে নিজেই চা-টা করে নিতে পারে।

আজ রবিবার, পিকনিক। কাল আবার টিউটোরিয়াল আছে। বেরুবার আগে এখনো অনেকটা সময়—এই ফাঁকে নিজের কাজটা এগিয়ে নিতে পারে। না হলে ফিরে এসে আবার সেই পড়া নিয়ে বসা!

শেখরের ঘরে আলো জ্বলছে এখনো। বাথরুমে যাবার সময়ও একই ব্যাপার দেখেছিল। দরজাটা খোলা, পাখার হাওয়ায় পর্দাটা দুলছে অল্প অল্প। এমন কি হতে পারে, আলো জ্বেলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল শেখর, তারপর ভুলে গেছে নেবাতে! নাকি জেগেই আছে?

ওর দরজার সামনে গিয়ে ভিতরটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল টুপুর।

'ছোড়দা, জেগে আছ নাকি?'

'কে টুপুর?' পরিষ্কার গলায় জবাব দিল শেখর, 'কী ব্যাপার রে! আয়—'

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে টুপুর দেখল পিঠে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে শেখর। ঝোলানো হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। সিগারেটের টুকরো আর দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিতে ভর্তি অ্যাসট্রেটা দেখলেই বোঝা যায় এইভাবে অনেকক্ষণ জেগে আছে। টুপুর অবাক না হয়ে পারল না।

'ঘুমোওনি!'

'না। ঘুম আসছিল না।' হাঁটুমুড়ে সোজা হয়ে বসল শেখর, 'মনটা ভালো লাগছিল না—'

টুপুর অনুমান করল, কেন। কাল রাতে খেতে বসেই জ্যাঠাইমার কথা শুনে বুঝেছিল ছোড়দাকে নিয়ে আবার একটা টানাপোড়েন চলছে বাড়িতে। নীলা আর বাচ্চাকে আজ ছেড়ে দেবে নার্সিং হোম থেকে। জ্যাঠাইমা বলেছিলেন, এখানে এনে তুলতে। ছোট বউদির ইচ্ছে অন্য রকম—সে বাপের বাড়িতে থাকবে মার কাছে, বাচ্চার যত্নআত্তি ওখানেই ভালো হবে। কথার ঝোঁকে একটু বেফাঁস বলে ফেলেছিল ছোড়দা, তাতেই অভিমান বেড়ে গেল জ্যাঠাইমার।

'বউমার মা-ই মা, আর তোর মা, কাকিমা এরা কেউই নয়! নাকি এখানে এলে তোর ছেলের যত্ন কিছু কম হতো!'

অপ্রতিভভাবে শেখর বলল, 'আমি তা বলিনি, মা। নীলার ইচ্ছে—'

'তুই কী বলবি!' ধরা গলায় জ্যাঠাইমা বললেন, 'বিয়ে যখন আমরা দিয়েছি, দোষ আমাদেরই। কোলে-কাঁখে করে মানুষ করলাম, বিয়ে দিতে না দিতেই পর হয়ে গেল ছেলে। এখন শ্বশুরবাড়ি যা বলবে তাই হবে। আমরা মরে যাই, তখন টের পাবি কে আপন কে পর!'

জ্যাঠামশাই সাধারণত এসব কথায় থাকেন না। তবু জ্যাঠাইমার গলা চড়তে বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর থেকে। এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বউমার যেখানে ভালো লাগে সেখানে যাবে। এ নিয়ে এতো কথার কী আছে!'

'তুমি থামো!' শাড়ির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে জ্যাঠামশাইয়ের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা।

টুপুর বুঝেছিল আজকের ঘটনাটা কিছু নয়, আসলে পুরনো অভিমানের জের টানছেন জ্যাঠাইমা। অনেক দিন চুপ করে থাকার পর যে-কথা বলার নয় অভিমান আজ তাই বলিয়ে নিল।

ভাতের থালা সামনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল শেখর। বেশ কিছুক্ষণ। দেখাদেখি, অস্বস্তিতে, টুপুরও। মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে খাওয়া ছেড়ে উঠে যাবে ছোড়দা। শেখরের পিঠে হাত বুলিয়ে চাঁপা বলল, 'দিদির কথায় মন খারাপ করিস না, শেখর। এখন বউমাকে ওখানেই নিয়ে যা। বাচ্চাটা একটু বড়ো হোক, তারপর নিয়ে আসিস এখানে—'

শেখর বলল 'আমি কী ঝামেলায় পড়লুম বলো তো!'

'সংসার মানেই তো ঝামেলা বাবা!' প্রশ্রয়ের গলায় বলল চাঁপা, 'ওরই মধ্যে মানিয়ে চলতে হবে। নে, খেয়ে নে এখন। এঁটো থালা মুখে বসে থাকতে নেই—'

শেখর খেয়েছিল ঠিকই, সে প্রায় না-খাওয়ারই মতো। তারপর চুপচাপ গিয়ে ঢুকেছিল নিজের ঘরে।

আপাতত শেখরের রাত-জাগা, ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলবে ভেবে পেল না টুপুর। আস্তে আস্তে বলল, 'এমন ঘটনা সব বাড়িতেই হয়। শুধু শুধু মন খারাপ করে কী করবে!'

'ভাবছি বিয়েটা না করলেই ভালো করতাম। বিয়ে করেই যতো অশান্তি!'

'তোমার আবার বেশি বেশি!' সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল টুপুর, 'মুখ-টুখ ধোবে তো ধুয়ে নাও। আমি চা করে আনছি—'

সুখ কাকে বলে? দুঃখ? এর কোনটার শুরু কোথায়? কোনটার শেষ কোথায়? নাকি যে যেমনভাবে দেখে নেয়—যে যেমনভাবে বুঝে নেয়, একের ভিতরেই জড়িয়ে আছে অন্যটা। বার্নারে দেশলাই কাঠির ছোঁয়া লাগতেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন, টুপুর দেখল, লালচে হলুদের ভিতরে গোপনে মুখ ঘষছে নীলের আভা। এক ঠমকে জ্বলে উঠেছিল বলেই একসঙ্গে এতোগুলো রঙ দেখতে পেল সে, না হলে আগুন আর কবে আগুন ছাড়া অন্য কিছু! দেখতে দেখতে একটা অন্য রকম ভাবনা অন্যমনস্ক করে দিল তাকে।

দ্যাখো, কেমন বিশ্রীভাবে শুরু হলো আজকের দিনটা। প্রথমে ও-রকম আজেবাজে একটা স্বপ্ন। তার রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই দেখতে হলো ছোড়দার বিষণ্ণ মুখ! অথচ, সত্যি বলতে, শেখরের জীবনে আজকের দিনটাও হতে পারত একটা সুন্দর দিন। নার্সিং হোম বলতেই তো ক্লোরোফর্ম, অসুখ-অসুখ, ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। পেটের খোল থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চাটার জন্যে সেটা আর একটা বড়ো খোল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আজই প্রথম সে পৃথিবী বলতে যা বোঝায় তার সংস্পর্শে আসবে। চোখে দৃষ্টি এলে, অনুভূতি প্রাণ পেলে ক্রমশ টের পাবে পৃথিবী জায়গাটা, পৃথিবীর আলো হাওয়াটা কেমন! তারপর বড়ো হবে আস্তে আস্তে। মানুষের আবির্ভাব যে কতো সুন্দর আর রোমাঞ্চকর, জন্ম-মুহূর্তে তা বুঝতে পারে না মানুষ। তবে, সেদিন, নীলার বুকে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে থাকতে দেখে টুপুর অনুমান করে নিয়েছিল, ঠিক একইভাবে সেও এসেছিল একদিন, ঠিক একইভাবে সেও একজনকে নিয়ে আসবে একদিন। এইভাবে, যারা নিয়ে আসে, তারাও তো চলে যায়—তবু তাদের স্মৃতি থেকে যায় যারা থেকে গেল তাদের বুকে আর মুখের আদলে। এই যে সুখের যাত্রা, ছোড়দার বেলায় তার শুরুতেই এমন বেসুর বাজছে কেন! কেমন বলল, বিয়ে না করলেই ভালো করতাম! তার মানে তো এই যে, তা হলে বাচ্চাটাও

আসত না ! ইস্, ওই নরম তুলতুলে একরত্তিটাকে জড়িয়ে এখনই এসব না ভাবলেই কি নয় ! ছোট বউদিই বা কী রকম ! নার্সিং হোম থেকে সোজা বাপের বাড়ি না গিয়ে দু' একদিন এখানে থেকে গেলেই পারত । তাতেই মন ভরে যেত জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইয়ের । একেই তো এমন পেল্লায় বাড়ি থাকতেও বিয়ের প্রায় পরপরই আলাদা হয়ে গেল ছোড়দা—তা নিয়ে এখনো হা-হুতাশ যায়নি !

এসব যখনই ভাবে তখনই নীলা সম্পর্কে একটা আলাদা প্রশ্ন দেখা দেয় মনে । সেই বিয়ের সময় থেকেই নীলার সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা কম নয়, বলতে কী, নীলাকে তার ভালোই লাগে । কিন্তু, যখনই শোনে শেখরের এই অন্ধবদ্ধ দশার সবটাই নীলার জন্যে, তখনই কেমন খিচড়ে যায় মনটা । তা হলে এটাই বোধ হয় সত্যি, যে-কোনো মানুষকেই ওপর-ওপর দেখে যা মনে হয়, আসলে সে তা নয় । চামড়ার পর চামড়ার স্তর খুলতে খুলতে বেরিয়ে পড়ে এক-এক রকম চেহারা । তার কোনোটা কালো, কোনোটা ভালো । কিন্তু, এতো দেখে শুনে বুঝে যদি এক-একটা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, তা হলে তো ডিটেকটর বসাতে হবে মনে—যন্ত্র যেমন যেমন বোঝাবে সেই বুঝে এগোতে হবে তোমাকে । এতো পারা যায় !

না, যায় না, মনে মনে বলল টুপুর, কিছুতেই যায় না । সুখ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, কোথায় তা ভাগাভাগি করে নেবে, খুশি হবে, না সবাই যেন মেতে উঠেছে কতো তাড়াতাড়ি দুঃখের পোশাকটা ফিট করে নেওয়া যায় গায়ে !

চা হাতে শেখরের ঘরে ঢুকে দেখল তখনো একইভাবে শোয়া । টুপুরকে দেখে গড়িমসি ভাঙতে ভাঙতে উঠে দাঁড়াল, হাই তুলল । চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বলল, 'আজকাল তুই বেশ কাজের মেয়ে হয়ে উঠেছিস !'

'অকাজের লোক বেড়ে গেলে কাউকে কাউকে কাজের লোক হতেই হয় ।' টুপুর বলল, 'আমি বাপু তোমাদের মতো অমন মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে পারি না ।'

'বটে !' শেখর বলল, 'তোর চা কোথায় ?'

'আছে—'

'এখানে নিয়ে আয়। একটু গল্প করি । তোর পিকনিকে বেরুনো কখন ?'

'সাতটায় বেরুলেই হবে—'

রিস্টওয়াচে চোখ রাখল শেখর ।

'এখনো অনেক দেরি ।'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল টুপুর । ভোর হচ্ছে । কালচে লালের ভিতর থেকে ক্রমশ ফরসা হয়ে উঠছে আকাশ । কাক ডাকছে থেকে থেকে । একটা অন্য রকম হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে ঘরের মধ্যে । অল্প ঠাণ্ডা মেশানো । এমন হাওয়ায় মন ভালো হয় ; মা বলে, ঠাণ্ডা লাগে । আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে হাল্কা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টুপুর ।

দেখে মনে হচ্ছে এরই মধ্যে কিছু একটা ভেবে নিয়েছে ছোড়দা, মন্দের ভালো কিছু একটা । না হলে গুমোট ভাব কাটিয়ে অতোটা খোলামেলা হতে পারত না । আহা, বেচারা ! দোটানায় পড়ে ওরই অসুবিধে হচ্ছে বেশি । এমন কেন হবে ! বলতে গেলে বাচ্চাটার ওপর জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইয়েরই তো অধিকার বেশি, ওদেরই তো বংশধর । মনে মনে অভিমানটা সেই জন্যেই । আসলে ছোড়দারা যদি এ-বাড়িতে থাকত তা হলে আজ এতো

সব প্রশ্নই উঠত না। ব্যাপারটা ছোট বউদিকে একটু বুঝিয়ে বললেই তো পারে! টুপুর কি বলবে? না, টুপুর ভাবল, ছোড়দা অন্য কিছু ভাবতে পারে। তা ছাড়া, ওটা ওদের নিজেদের ব্যাপার, ওরাই বুঝে নিক।

ফিরে এসে খাটের ওপর বসল টুপুর। অন্ধকার থাকলে থাকে, একেবার যেতে শুরু করলে তর সয় না আলোর। দেখতে দেখতে কেমন পরিষ্কার হয়ে উঠল চারিদিক! সেদিন প্রায় এই সময়েই সে নার্সিং হোমের সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছিল। তখনো আকাশে জ্বলজ্বল করছিল একটা তারা।

'ছোড়দা, তোমার ছেলের কী নাম রাখলে?'

'নাম!' চোখ তুলে তাকাল শেখর, 'ভাইটাল প্রশ্ন। নামের ব্যাপারটাই তো ভাবা হয়নি এখনো! তুই কিছু ভেবেছিস নাকি?'

'অমি বলি, ওর নাম দাও সিদ্ধার্থ।'

'সিদ্ধার্থ! হঠাৎ!'

গৌতম বুদ্ধের নামে নাম। শুনলেই মনে হয় ভালো হবে, সুন্দর হবে—'

শেখর হাসল। বলল, 'ওই নামের প্রচুর বাজে লোকও তো আছে!'

'তা থাকতে পারে।' টুপুর বলল, 'তুমি তো নাম দেবে নামের অ্যাসোসিয়েসান থেকে। যেমন ধরো গান্ধী বা লেনিন। যদি অন্য কারও ওই নাম শোনো, নামের ইমেজটাই মনে আসবে প্রথমে—'

'ঠিক।' চা-টা দ্রুত শেষ করল শেখর। হাসি-হাসি মুখে তাকাল বোনের দিকে, 'তোর ছেলের নাম আমি লেনিন রাখব।'

'বাজে কথা রাখো!' অল্প আড়ষ্ট বোধ করল টুপুর, 'কোথায় বিয়ে তার নেই ঠিক!'

'বলিস কী রে! তোর কুষ্ঠিতে আছে আগামী এক বছরের মধ্যে বিয়ে। তার তোড়জোড়ও তো শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে—'

'যাঃ! যতো ফালতু কথা!' টুপুর উঠে দাঁড়াল, 'আমার বয়ে গেছে এখন বিয়ে করতে—'

'তা আমি জানি না।'

শেখর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। ধোঁয়া টানল জোরে। তারপর চোখ বন্ধ করে হাসতে লাগল মিটিমিটি।

'তোর বন্ধু শর্মিলা তো ফোন করেছিল কাকিমাকে। তার বরের কোলিগ, সন্দীপ না কি নাম—খুব ভালো ছেলে। কাকিমা তো আমাকে খোঁজখবর করতে বলল।'

টুং-টাং করে কী একটা বেজে গেল টুপুরের বুকের ঠিক মধ্যিখানে। হঠাৎই মনে হলো নিঃশ্বাসটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে নেই। টিপটিপ করে উঠল কপাল আর রগের দু' পাশে।

নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল টুপুর। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমার বিয়ের জন্যে শর্মিলার এতো মাথা ব্যথা কেন! বিয়ে আমি করব না এখন!'

'এই দ্যাখো, রেগে যাচ্ছে! তোকে বলাই আমার উচিত হয়নি!'

'হয়ই নি তো!' টুপুর বলল, 'তোমাকেও কোনো খোঁজখবর করতে হবে না।'

'বেশ। করব না। আমিও মনে করি বিয়ে করা না করাটা যার যার নিজের ইচ্ছে।' সময় নিয়ে বলল শেখর, 'কাকিমাকে আবার কিছু বলিস না যেন। তোকে বলতে মানা

করেছিল ।'

খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকল টুপুর। বসে থাকার ইচ্ছে থেকে নয় ; সত্যি বলতে, এমনই হঠাৎ এই সব কথাবার্তা হয়ে গেল যে বুঝতে পারছিল না ঠিক কোন সময়টিতে উঠে চলে যাওয়া যায় । লজ্জা, রাগ, অবাকভাব—সব মিলিয়ে কিম্ভূত হয়ে আছে মনটা, চক্রাকারে বেড়ি দিয়ে রেখেছে কোমরে, যেন উঠলেই চেপে বসিয়ে দেবে আবার। একবার মনে হলো শেখর নয়, যেন সন্দীপই দাঁড়িয়ে আছে সামনে—বিয়ের প্রস্তাব করে অপেক্ষা করছে সে কী বলে শোনার জন্যে । ছোড়দা যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ধরেই নিতে হবে ঘটকালি করার জন্যে পাকাপোক্ত হয়ে নেমেছে শর্মিলা, গোপনে গোপনে এরই মধ্যে কথা বলেছে মার সঙ্গে । আর মা-ই বা কেমন ! ছোড়দার সঙ্গে কথা বলবার আগে একবার তাকেও তো বলতে পারত !

ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল টুপুরের । নিজেকে বুঝতে না পারার জ্বালায় প্রায় জল এসে গেল চোখে ।

শেখর বোধ হয় ওর মনোভাব আন্দাজ করতে পারছিল । কাছে এসে বলল, 'তুই কি ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছিস ? আচ্ছা মেয়ে তো— ! আমি একটা কথার কথা বলছিলাম—'

'থাক ।' ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল টুপুর, সোজা তাকাল শেখরের দিকে, 'সবাইকেই জানা আছে ।'

'আ-রে !' মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে শেখর ঘাবড়ে গেছে বেশ । অপ্রতিভ হেসে বলল, 'এমন করার কী আছে ! আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব ।'

'কোনো দরকার নেই । তুমি নিজেরটা ম্যানেজ করো আগে, তারপর আমার ব্যাপারে এসো ।'

গরম লাগছিল । আঁচলটা গলা থেকে খুলে নিল টুপুর । কী বলতে কী বলে এলো শেখরকে, বিশেষত ওই শেষের কথাগুলো—ছোড়দা নিশ্চয়ই ভাববে । সত্যি সত্যিই এ-ব্যাপারে শেখরেরই বা করার ছিল কী ! শর্মিলা হয়তো সত্যিই ফোন করেছিল মাকে ; মাও যেমন—ঝটপট খোঁজ করতে বলে দিল ছোড়দাকে ! সাদাসিধে মনে কথাগুলো তাকে বলে ফেলে হয়তো নিজেকেই একটু হাল্‌কা করে নিতে চেয়েছিল শেখর । ঝোঁকের মাথায় আজেবাজে কয়েকটা কথা বলে সেই ভাবটাকেই কি আর একটু বাড়িয়ে দিল না টুপুর !

ফাঁকা ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে ক্রমশ নিজেকে সইয়ে নিল টুপুর । এখন অনেকটা স্বাভাবিক—এখন মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক কিছুই বলেনি শেখর । শর্মিলা যে এমন একটা কিছু ভাবছে বা করতে চাইছে এটা তার আগেই বোঝা উচিত ছিল ।

সেদিন, ফেরবার পথে, মনে পড়ল, পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অশোক আর সন্দীপ যখন সিগারেট কিনছে—ঈপ্সিতা গাড়ির সামনে, আর পিনাকী, অসিত, পল্লবরা গুজগুজ করছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তাকে আলাদা করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল শর্মিলা, 'সন্দীপদাকে কেমন লাগল তোর ?'

'ভালো—'

'ভালো মানে কী ?' শর্মিলা বলল, 'পছন্দ হয় ?'

তখনই কথাটার মানে ধরতে পারেনি টুপুর । ওরা ফিরে আসছে দেখে বলল, 'পছন্দ অপছন্দের কী আছে !'

আসলে সন্দীপের ওই হাত দেখা আর শর্মিলার টিপ্পনী—দুটোই আবার করে ফিরে এসেছিল তার কাছে। কথা এগোয়নি।

এখন সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে গিয়ে সারা শরীরে স্পষ্ট সিরসিরানি টের পেল টুপুর। এই রকমই একটা অনুভূতি সেদিন সন্দীপের হাত থেকে টেনে নিয়েছিল সে।

আপাতত পর্দা সরিয়ে আবার শেখরের ঘরে ঢুকল টুপুর। শূন্য কাপ দুটো তুলে নিল দু' হাতে। সোজাসুজি না তাকিয়েও বুঝতে পারল পাতলা একটি হাসি লেগে আছে শেখরের মুখে। বইটা আবার টেনে নিয়েছে হাতে। মনে হচ্ছে তার কথাগুলোকে আদৌ আমল দেয়নি। না দিলেই ভালো।

টুপুর বেরিয়ে যাচ্ছিল। কী ভেবে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছোড়দা, আমিও কিন্তু সিরিয়াসলি কিছু বলিনি তোমায়—'

নিজের কানেই অন্য রকম শোনাল কথাগুলো। শেখর বলল, 'গলা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে—'

॥ চার ॥

গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের উল্টো দিকে বাস থেকে নেমে পল্লব দেখল কেউ কোথাও নেই। তখন সাতটা বাজতে পাঁচ। সাতটা থেকে সোয়া সাতটার মধ্যে সকলেরই এসে পৌঁছুনোর কথা। এখান থেকেই দুটো গাড়িতে যাওয়া হবে রাজপুরে পিকনিট স্পটে। অশোকের কোনো আত্মীয়ের একটা বাগানবাড়ি আছে ওখানে। আইডিয়াটা শর্মিলার।

এখন নিজেকে একা দেখে অল্প একটু ফাঁকা বোধ করল সে।

একটা সময় শর্মিলার প্রতি একটু-আধটু আকর্ষণ বোধ করত পল্লব। যতোই বন্ধু হোক, মেয়েদের গায়ে আছে একটা অন্য রকম গন্ধ, এটা-ওটা দিয়ে শরীর ঢাকাঢাকির মধ্যে আছে এক ধরনের রহস্য—ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ বা সায়ার লেস এক চিলতে চোখে পড়লেই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা কেমন যেন বদলে যেতে চায়। এই বদলটা শর্মিলার ব্যাপারেই যে কেন বোধ করত সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারেনি কোনো দিন। তবে, ব্যাপারটা নিয়ে যখনই সে একটু ভাবাভাবি শুরু করেছে, ঠিক তখনই ধৃতিকান্ত নামে এঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিল শর্মিলা। একদিন দু'জনকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে চাপা দুঃখ নিয়ে দৃশ্যটা এড়িয়ে যায় পল্লব। আর একদিন আর্টস্ বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে আর পিনাকী—দেখল অল্প এলোমেলো ভঙ্গিতে ট্যাক্সি থেকে নামছে শর্মিলা, ধৃতিকান্ত বসে আছে ভিতরে। তার আগের দুটো ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিল শর্মিলা—তাদের দেখে এড়িয়েই যাচ্ছিল প্রায়, পিনাকী ডাকল। শর্মিলা বলল সকাল থেকেই তার ভীষণ মাথাধরা আর জ্বর-জ্বর লাগছিল, তাই আসতে পারেনি। পল্লব জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ধৃতিকান্ত কি ডাক্তার? কিন্তু শর্মিলাকে ঠোঁটে জিব বুলোতে দেখে চুপ করে গেল। শর্মিলার নিচের ঠোঁটটা কমলালেবুর কোয়ার মতো ফোলা আর লালচে, অল্প রক্তও যেন লেগে আছে সেখানে। শর্মিলা এড়াতে চাইল তাদের। 'কিছু বুঝলি?' ও চলে যাবার পর পিনাকী বলল, 'ধৃতিবাবু আজ ফাটিয়ে দিয়েছে।' পল্লব জবাব দেয়নি, ঘটনাটা কল্পনা

করে কেমন ঘেন্না লাগছিল তার। কিন্তু আকর্ষণের ব্যাপারটা যেমন কোনো দিন বলেনি কাউকে, তেমনি ঘৃণাটাও চেপে রেখেছিল নিজের মধ্যে।

এর তিন-চার মাস পরেই বিয়ে হয়ে গেল শর্মিলার। আর সেই ছেলেটা—ধৃতিকান্ত—হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল কোথায়! এরও কিছু দিন পরে একদিন গড়িয়াহাটের মোড়ে একটি ন্যাড়ামাথা যুবককে দেখে চেঁচিয়ে উঠল অসিত, 'ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ!' ওরা দেখল, ধৃতিকান্ত—চাঁচাপোছা মাথার জন্যে মুখের আদল বদলে গেছে খানিকটা, তবু চেনা যায়। ধৃতিকান্ত রাস্তা পেরিয়ে অনেকটা চলে যাবার পর পিনাকী বলল, 'দিনকাল কেমন পাল্টে গেছে দেখেছিস! আগে বাবা মা মারা গেলে লোকে মাথা ন্যাড়া করত। এখন প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেলে মাথা কামিয়ে ফেলে!' কথাটায় মজা পেয়েছিল সকলে, এমনকি সেও। হাসতে হাসতে রজত বলেছিল, 'পিনাকী, তুই বেশি তড়পাস না। ঈপ্সিতার বিয়ে হয়ে গেলে তোকেও ভুরু কামাতে হবে—'

যাই হোক, এখনো মাঝে মাঝে শর্মিলার কথা ভাবলে একটু উদসীন হয়ে পড়ে পল্লব। কেন যেন মনে হয়, পৃথিবীতে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে তার, আর শর্মিলাও এসেছে সময়ের আগে। যদি তারা দু'জনেই আসত ঠিক সময় মতো, তা হলে অন্য রকমও হতে পারত ব্যাপারটা। তার বদলে কী হলো! রাত বারোটায় সে যখন পড়ার বইয়ের পাতায় ঝুঁকে থাকে, মনঃশ্চক্ষে দেখতে পায় দুর্গাপুরের কোনো এক বাড়ির কোনো এক ঘরের বিছানায় মুখে ব্রণের দাগওলা একটা দামড়া লোক ছিনিমিনি খেলছে শর্মিলাকে নিয়ে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে অবুঝ জ্বালায় একদিন পল্লব নিজের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরেছিল। অথচ, নিজেই বুঝতে পারে, তার ভাবনায় কিংবা ব্যবহারে যুক্তি নেই কোনো। শর্মিলার সঙ্গে কোনো দিনই তেমন একটা মেলামেশা করেনি সে, বরং টুপুর বা ঈপ্সিতা বা চন্দনা তার অনেক কাছের। রূপ বা চেহারা-টেহারার কথা বললে টুপুর বা ঈপ্সিতার ধারে কাছে লাগে না শর্মিলা। তবে! শুধুই মন? নাকি ভাগ্য? সেদিন রেস্টুরেন্টে বসে ওরা যখন সন্দীপকে দিয়ে হাত দেখাচ্ছিল—একমনে এই কথাগুলো ভেবে যাচ্ছিল পল্লব। সেদিন আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তার, বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব একেবারে বাজে কথা, চিন্তার দিক থেকে এই মেয়েগুলোর সঙ্গে তাদের কোথায় একটা তফাত আছে। শাড়িতে যেমন পাড় আর আঁচল থাকতেই হয়, তেমনি ওদের মনের মধ্যেও আছে একটা প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নটা ভেঙে বেরুতে পারে না কিছুতেই। তা ছাড়া, অশোক আর সন্দীপকে নিয়ে যে-রকম মাতামাতি করছিল ওরা, তাতে মনেই হয়নি তার বা পিনাকী বা অসিত সম্পর্কে ওদের মনে কোনো ফিলিং আছে! চিংড়ি কাটলেটে ছুরি বসাতে বসাতে একবার মনে হয়েছিল পল্লবের, প্লেটে খানিকটা থুথু ছড়িয়ে ওটা অশোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এই যে স্যার, আজকালকার ছেলেদের টেস্ট-ফেস্ট নিয়ে অনেক কথাই তো বলছেন, একবার এটা চেখে দেখুন তো! রজত সেদিন ঠিকই করেছিল না গিয়ে—রজতটা তাদের চেয়ে অনেক ব্যাপারেই অনেক বেশি ম্যাচিওরড্; অনেক কিছুই বুঝে নিতে পারে আগেভাগে। বেচারার লাইফে ওই পুলিসের ঝামেলাটা না থাকলে ভালো হতো। মাঝে মাঝে কথাবার্তায় এমন ভায়োলেন্ট হয়ে যায়!

টিনের ছাউনির নিচে চা সিগারেটের দোকান। তার সামনে টানা বেঞ্চিতে বসে গল্প গুজব করছে বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টরা। কেউ আসছে না দেখে এক ভাঁড় চা কিনে নিল পল্লব। তিতকুটে স্বাদ। দু' চুমুক দিয়েই বল গড়ানোর মতো কায়দা করে ভাঁড়টা গড়িয়ে

দিল রাস্তায় ; তক্ষুনি একটা প্রাইভেট গাড়ি চাকার তলায় গুঁড়িয়ে গেল সেটা। হায় ভাঁড়, তোমার কোনো প্রাণ নেই ! দৃশ্যটায় চোখ রেখে একটা সিগারেট ধরাল পল্লব এবং ভাবল, রজত কি আসবে ! সেদিন তো বলেছিল, 'ওসব অশোক সন্দীপের ব্যাপারে আমি নেই। এই ধরনের পিকনিকে লিবার্টি থাকে না।' ওটা অবশ্য একটু বাড়িয়ে ভাবছে—পিকনিকটা একটা আউটিং মাত্র, লিবার্টি থাকবে না কেন ! তবে, যা গোঁয়ার, নাও যেতে পারে। টুপুর অবশ্য বলেছিল, 'ঠিক যাবে। আমি যাচ্ছি তো !' রজত বলেছিল, 'তোর যাওয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক !' টুপুর বলল, 'কেন মিছিমিছি র‍্যালা নিচ্ছিস, রজত ! যদি না যাস, তা হলে বুঝব তোর সঙ্গে আমার কোনো আণ্ডারস্ট্যান্ডিং নেই— ।' ব্যাপারটা ওই পর্যন্তই হয়ে আছে। এক টুপুরই শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ করতে পারে ওকে। পল্লব ঠিক বুঝতে পারে না ওদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা কী রকম। রজত যা ছেলে তাতে প্রেম-ট্রেম ন্যাকামির মধ্যে যেতে চায় না কখনো। টুপুরটাও সরল আর খোলামেলা, ঈপ্সিতার মতো কেঠো নয়। বোধ হয় এই ব্যাপারটাই ঠিক, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং—একটা বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে ওদের মধ্যে, তাতেই টেনে নিয়ে যায়। রজতটা লাকি। মনে হচ্ছে টুপুরই শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসবে ওকে। যদি না আসে, পল্লব ভাবল, তা হলেও কি সে যাবে ?

ওই যে, পিনাকী আসছে। হাতে এয়ারলাইন্‌সের ব্যাগ। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রাস্তা পার হলো পল্লব।

'কতোক্ষণ এসেছিস ?'

'এই তো, মিনিট পাঁচ সাত।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে পিনাকী জিজ্ঞেস করল, 'আর কেউ আসেনি ?'

'আর কেউ মানে তো ঈপ্সিতা ?'

'দুর মাইরি, ঈপ্সিতা ঈপ্সিতা করে তোরাই কেসটা কেঁচিয়ে দিবি দেখছি !' পকেট থেকে চিউইংগামের প্যাকেট বের করল পিনাকী, 'খাবি ?'

'পরে খাবো। এই একটা সিগারেট খেলাম ; মেজাজটা আছে—'

একটা দোতলা বাসের ওপর থেকে মুখ বের করে হাত নাড়ছে অসিত। পল্লবও হাত নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কেঁচিয়ে দিলাম মানে ?'

'দাঁড়া, বলছি।' মুখে চিউইংগাম পুরে দিল পিনাকী। ব্যাগের জিপ খুলে একটা ক্যামেরা বের করে উল্টেপাল্টে দেখে আবার ভরে রাখল ব্যাগে। মুখটা এঁটে দিল।

অসিত এসে পড়েছিল। বলল, 'ভালো করে লোড করে এনেছিস তো ?'

পিনাকী ঘাড় নাড়ল। তারপর পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করে দিল।

'শালা রাজেশ খান্না !' পিনাকীর থুতনি নেড়ে দিয়ে অসিত বলল, 'আর কিছু তো লোড করতে পারবে না। তুমি শুধু ক্যামেরাই লোড করে যাও—'

ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না পিনাকী। হাসতে হাসতে বলল, 'কাল একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছে—'

'বল, শিগগিরি বলে ফ্যাল !' বুক পকেট থেকে গোটা তিনেট সিগারেট বের করে একটা পল্লবের দিকে বাড়িয়ে দিল অসিত, একটা নিজের ঠোঁটে চেপে, বাকিটা রেখে দিল পকেটে, 'ইন্ডিয়া কিংস্। বড়দার প্যাকেট থেকে ঝেড়ে দিয়েছি।'

'শোন—', ব্যস্তভাবে বলল পিনাকী, 'কাল সন্ধেবেলায় বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে ঈপ্সিতার

সঙ্গে দেখা। সঙ্গে ওর মা ছিল। ঈপ্সিতা তো মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, আমি শালা কোনো পাত্তা না দিয়ে ঢিপ করে ওর মায়ের পায়ে একটা পেন্নাম ঠুকে দিয়ে বললাম, মাসিমা, ভালো আছেন? ওর মা তো ড্যাম গ্ল্যাড! কী বলব মাইরি, রেগুলার আমার পিঠ থাবড়াতে লাগল। বলল, তোমাকে অনেক দিন দেখিনি! বাড়িতে আসো না কেন? মাঝে মাঝে কলেজ-ফেরতা খুকুর সঙ্গেও তো চলে আসতে পারো—'

'ব্যাস, এই!' সিগারেটে টান দিয়ে অসিত বলল, 'মাকে তো পটালি, অ্যালসেসিয়ানটাকে ম্যানেজ করবি কী করে?'

'দ্যাখ, কুকুর-ফুকুর কোনো ব্যাপার নয়। ওর মা যদি ফেভারে থাকে—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে পিনাকীর পিঠে একটা থাপ্পড় কষাল পল্লব।

'তোর শাশুড়ির মেয়ে আসছে—'

দূর থেকে কাছে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছিল ঈপ্সিতা আর চন্দনা। কালো পেড়ে হাল্‌কা সবুজ সিল্কের শাড়ি ঈপ্সিতার গায়ে, আঁচল উড়ে যাচ্ছে উল্টো দিকের জোর হাওয়ায়। চন্দনারটা পুরো লাল, পাড়ে খয়েরি থাকলেও থাকতে পারে। ময়লা রঙের জন্যে ঈপ্সিতার সঙ্গে কনট্রাস্টটা ভালোই ফুটেছে। ঈষৎ নার্ভাসভাবে চুলে হাত বুলিয়ে শার্টের কলার ঠিকঠাক করে নিল পিনাকী।

'ঈপ্সিতাটা রিয়েল মাল!' অসিত বলল; 'বুক দেখেছিস— !'

পিনাকী গম্ভীর হয়ে বলল, 'এসব ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না—'

'আগে কুকুরটাকে ম্যানেজ কর, তারপর কথা বলিস।'

পল্লব বলল, 'কী হচ্ছে কি নিজেদের মধ্যে!'

'অসিত প্রায়ই এ-রকম কথা বলে। বন্ধু বলে আমি কিছু বলি না।' রাগ ও অভিমান মেশানো গলায় পিনাকী বলল, 'টুপুর কি কম মাল! তাকে নিয়ে তো কিছু বলো না কখনো!'

'তাতে তোর কী! টুপুর কি তোর ইয়ে—'

পিনাকী কিছু বলতে যাচ্ছিল, পল্লব ভুরু কুঁচকে তাকাতে চুপ করে গেল। ওরা অনেকটা কাছে এসে পড়েছে।

তিন থেকে পাঁচ হয়ে ওরা ছড়িয়ে দাঁড়াল। ঈপ্সিতা যেন ইচ্ছে করেই একটু তফাত রেখে দাঁড়িয়েছে। ছায়ার জন্যেও হতে পারে। কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল।

চন্দনা বলল, 'আর একটু হলেই তোদের পিকনিকের দফা রফা হতো। একটা ট্যাক্সি প্রায় চাপা দিয়ে যাচ্ছিল আমায়!'

'কী ভাগ্যিস দেয়নি!' বুক পকেট থেকে সিগারেট বের করে হাতে ঠুকতে ঠুকতে অসিত বলল, 'আমি বিধবা হয়ে যেতাম।'

'আ-হা! এতো আনসিমপ্যাথেটিক তোরা!' চন্দনা বলল, 'কালো শার্ট পরে এসেছিস কেন? তোকে তো এখনই বিধবা-বিধবা লাগছে।'

'মেড ইন জার্মানি। শার্টটা খারাপ?'

'না রে, বেশ আনইউজুয়াল। একটু খালাসি-খালাসি লাগে এই যা।' চন্দনা হাসল, 'কে দিল?'

'খালাসির বড়দা প্রেজেন্ট করেছে—'

'আমাদের জন্যেও কিছু আনতে বললে পারিস! এই পল্লব, তুই এতো চুপচাপ কেন?'

'কিছু না। এমনিই—'

দূর থেকে তাকিয়ে ঈপ্সিতা বলল, 'দু' তিন দিন থেকেই তোকে গম্ভীর দেখছি। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে—'

পল্লব হাসল। জবাব দিল না। রজত না এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত স্বস্তি হবে না। সোওয়া সাতটায় পৌঁছুতে আর দেরি নেই বেশি। অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তার দিকে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল পল্লব।

পিনাকী এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। ঈপ্সিতাকে কথা বলতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ঈপ্সিতা, চিউইংগাম খাবে ?'

'কী ?'

'চিউইংগাম—'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ঈপ্সিতা।

'সক্কালবেলায় কেউ চিউইংগাম খায় না—'

'চিউইংগামের আবার সকাল বিকেল কী !' পিনাকী মরিয়া হয়ে বলল, 'মুখটা ফ্রেশ থাকে।'

ঈপ্সিতা মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাসি লুকোতে চন্দনাও। অসিত বলল, 'বোল্ড্ হলে উইকেট আঁকড়ে থাকার মানে হয় না, পিনাকী। তুই পেন্নামটাই চালিয়ে যা—'

পিনাকীর চোখমুখ কাদা। ফুটপাথ থেকে ব্যস্তভাবে ব্যাগটা তুলে নিয়ে ও দৌড়ে গেল রেলিংয়ের দিকে। ওখান থেকেই ডাকল, 'পল্লব, শোন—'

ঠিক তক্ষুনি জোরালো বাঁক নিয়ে পরপর একটা অ্যামবাসাডর আর একটা ফিয়াট ব্রেক কষতে কষতে থেমে দাঁড়াল ওদের সামনে।

প্রথম গাড়িটার দরজা খুলে চটপট নেমে এলো শর্মিলা।

'তোরা এসে গেছিস ?' চোখ খুলে একবার সকলের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, 'টুপুর আসেনি ?'

চন্দনা এগিয়ে এসে বলল, 'রজতকেও তো দেখছি না—'

'রজত এলো না এলো তাতে কিছু যায় আসে না। অতো সাধাসাধি কে করবে !'

ততোক্ষণে অশোক, সন্দীপও নেমে এসেছিল গাড়ি থেকে। শর্মিলাকে চিন্তিত দেখে সন্দীপ বলল, 'রজত কোন জন ?'

'আপনি দেখেননি। সেই যে, যাকে পুলিসে নিয়ে গিয়েছিল—'

'আই সি।'

সন্দীপ একটা কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি করল। পাশে অশোক, আঙুলের ফাঁকে সিগার জ্বালিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। চোখমুখ ফোলা দেখে মনে হয় এইমাত্র উঠে এলো ঘুম থেকে।

অল্প দূরে পল্লবকে সঙ্গে নিয়ে পিকনিকের প্রথম শটটা নেবার তোড়জোড় করছিল পিনাকী। ওরা এসে পড়ায় নিরস্ত হলো। পল্লব দেখল এগিয়ে গিয়ে ঈপ্সিতার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছে শর্মিলা—ভীষণ ব্যস্ত আর চিন্তিত যেন, এসেই ছটফট করতে শুরু করেছে। ওর আগের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল পল্লব। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'ওই মেয়েটাকে আমি একদিন ঝাড়ব।'

'কেন !'

'রজত সম্পর্কে কীভাবে বলল শুনলি ! বন্ধুকে বন্ধু বলে পরিচয় দিতে পারে না—যেন পুলিসে ধরেছিল এটাই রজতের একমাত্র পরিচয় !'

'ঝাড়াঝাড়ির মামলায় যাস না। ওর হাসব্যান্ডের চেহারাটা দেখেছিস, তোর মতো দুটোকে একসঙ্গে—'

'রাখ।' অল্প হাঁ করে দু' আঙুলে ঠোঁটের কোণ ঘষতে লাগল পল্লব। তারপর বলল, 'মেজাজের বারোটা বাজিয়ে দিল। রজত না এলে আমি আজ যাচ্ছি না। অসিতকে বলছি। তুইও যাবি না—'

'বাড়িতে নো মিল করে এসেছি।'

'তোর সেন্‌স্ অফ ডিগনিটি কম। এই জন্যেই ঈপ্সিতা তোকে পাত্তা দেয় না— ।' সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল পল্লব, বলতে না বলতেই চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হঠাৎ। প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'আ গিয়া গুরু—'

এইমাত্র একটা ট্যাক্সি এসে থামল ওদিকের রাস্তায়। রজত নামল, সঙ্গে সঙ্গে টুপুর। মুহূর্তের জন্যে দ্রুত ধাবমান একটা ফাঁকা বাসের আড়াল হয়ে গেল ওরা।

বাসটা পেরিয়ে যাবার পর রজত তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এলেও যেখানে নেমেছিল ট্যাক্সি থেকে সেখানেই খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে যে যেখানে ছিল তাকিয়ে দেখে নিল টুপুর। সবুজ পাড় হলদে জমির শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ। বাহুল্যবর্জিত, একটু বা গম্ভীর আর অন্যমনস্ক—হাঁটায় তাড়া নেই কোনো। ফিয়াটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক আর সন্দীপ, তাদের দিকে সোজাসুজি না এসে না.অন্য গাড়িটা ঘুরে চন্দনা ঈপ্সিতাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে কিছু বলবার আগেই শর্মিলা ছুটে এসে বলল, 'এতো দেরি করলি !'

'দেরি ! মোটে তো সাড়ে সাতটা—'

'তাড়াহুড়োর জন্যে সন্দীপদা বেচারার ভালো করে চা খাওয়া হলো না ! দেরি হবে জানলে তাড়া করতাম না—'

'আমরা দাঁড়াচ্ছি, তুই চা খাইয়ে নিয়ে আয়।' রহস্য করে হাসল টুপুর, 'নাকি তোর সন্দীপদার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ?'

'কী ব্যাপার বল তো ! এতো কাটা কাটা কথা বলছিস !' শর্মিলা বলল, 'ঝগড়া করলি নাকি রজতের সঙ্গে !'

'রজত থাকলেই কি ঝগড়া হয় ! দেখলি তো ট্যাক্সিতে এলাম—'

'সেটা না করলেই ভালো করতিস !'

অনেকক্ষণ ধরেই একটা কথা না ভাববার চেষ্টা করছে টুপুর, ঠিক সেই কথাটিই তাকে ভাবিয়ে দিল শর্মিলা। কানের পিছনে তাপের সঞ্চার হতেই ও বুঝতে পারল লাল হয়ে উঠছে মুখ ; দূরে তাকিয়ে দেখল সন্দীপ, অশোক, পল্লব, অসিত, রজত, সবাই মিলে কখন জটলা তৈরি করে ফেলেছে একটা, আর একটু দূরে চুল আঁচড়াচ্ছে পিনাকী। সন্দীপের মুখ এদিকে—চোখাচোখি হবার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল টুপুর। শর্মিলা এখনো জানে না সে জানে। এমন কি হতে পারে সন্দীপকেও ও কিছু বলেছে ইতিমধ্যে ! তা হলে সত্যিই লজ্জা হবে। মনের ভিতর চকিত ডুব দিয়ে টুপুর ভাবল যদি সব ঠিকঠাক চলে তা হলে ওই লোকটা, সন্দীপ, হঠাৎ একদিন তার স্বামী হয়ে যেতে পারে। তখন এই বাধো বাধো ভাবটা থাকবে না—তার সব কিছুর ওপর একমাত্র হয়ে দখল বসাবে ও। এই যে দেরি হয়ে যাচ্ছে

বলে হুট্ করে ট্যাক্সিতে উঠে বসল রজতের সঙ্গে, তখন আর তা চলবে না। তার শোয়া বসা ওঠা সবই তখন ওর অধিকারে। সব কিছু! সবই? সে কেমন ব্যাপার! অনেক দূর অব্দি ভাবতে গিয়ে অজানা অনুভূতিতে গা সিরসির করে উঠল টুপুরের। শর্মিলার কথার জের তখনো তিরতির করছে মাথায়। চুপ করে থাকা মানেই তো ধরা দেওয়া! সে বড়ো বাজে হবে।

তেমন কিছু না ভেবেই টুপুর বলল, 'হুকুম মেনে চলতে হবে নাকি!'

'তোদের এই খুনসুটির ব্যাপারটা বুঝছি না!' ঈপ্সিতা কথা বলল এবার, 'একটা ঘোঁট আছে মনে হচ্ছে!'

'ঘোঁট আবার কী! কথাটার জবাব দিলাম।'

এতো নিচু গলায় কখনো কথা বলে না টুপুর। আজই বলছে। চেরা চোখে খুঁটিয়ে টুপুরকে দেখতে লাগল ঈপ্সিতা। তার আড়ালে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে মনে হলেই রোখ চেপে যায় কেমন। যেমন এখন। শর্মিলা-টুপুরের মধ্যে এমন কথা বিনিময় আগে কখনো শুনেছে বলে মনে পড়ল না। শর্মিলার বিয়ের পর টুপুরের সঙ্গে বেশি করে মিশছিল সে; এখন মনে হচ্ছে আজও দান ছাড়েনি শর্মিলা।

অল্প জ্বালা বোধ করল ঈপ্সিতা। গাড়ি দুটো ওদের, তেমন জানলে সেও গাড়ি দেখাতে পারত শর্মিলাকে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন পিকনিকে নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে দিচ্ছে সবাইকে!

ছেলেদের পুরো দলটা এখন মিলেমিশে একাকার; এগিয়ে আসছে এদিকেই। অশোক হাতছানি দিতেই শর্মিলা ছুটে গেল।

'টুপুর, আজ তোকে প্রেগন্যান্ট উয়োম্যানের মতো লাগছে—যাকে বলে টেম্পটিং।' চন্দনা বলল হঠাৎ, 'সত্যি বলছি, ছেলে হলে প্রেমে পড়ে যেতাম!'

'মেয়েতেই দোষ কী! লেসবিয়ান হয়ে যা—'

'সেটা তোর সঙ্গে!' ঈপ্সিতার দিকে চোখ ঠারল চন্দনা।

টুপুর বলল, 'যতো অসভ্যতা! ওরা শুনবে—'

তিনজনেই তাকিয়ে দূরত্বটা আঁচ করার চেষ্টা করল। মাথা গুনছে সন্দীপ। বোধ হয় দুটো গাড়িতে জায়গা হবে কি হবে না তাই নিয়ে। আজকের দিনটা সুন্দর। ঝকঝকে আকাশ, রোদের তাপ কম, হাওয়াও দিচ্ছে থেকে থেকে। এই রোদ ছিল, আবার এক্ষুনি ঘন হয়ে ছায়া ছড়াল চতুর্দিকে। অনেক উঁচুতে তাকিয়ে টুপুর দেখল ছোট্ট হয়ে ডানা ভাসিয়ে রেখেছে কয়েকটা চিল। হাতখানেক লম্বা একটা অ্যারোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। ওর ভিতর নিশ্চয়ই মানুষ আছে—হয়তো অনেকগুলি মানুষ। তারা কারা? দূর থেকে কি চেনা যায় কে কেমন! অতো দূর আকাশে এখন রোদ না ছায়া কী করে বোঝা যাবে!

ঈপ্সিতা ও চন্দনার দিকে তাকিয়ে অল্প ঠোঁট ফাঁক করে হাসল টুপুর।

'বিয়ে করে শর্মিলাটা বেশ সুখী হয়েছে—'

'অমন সবাই হয়।' ঈপ্সিতা বলল, 'বিয়ের জল গায়ে পড়লে প্রথম প্রথম সবাইকেই সুখী লাগে—'

'সে-কথা নয়—', টুপুর বলল, 'ধর যদি অশোকের সঙ্গে না হয়ে সন্দীপের সঙ্গে বিয়ে হতো শর্মিলার?'

'সন্দীপ কোন দুঃখে বিয়ে করত শর্মিলাকে !'

'কেন ?'

'কেন আবার !' মোটা করে বলল ঈপ্সিতা, 'শর্মিলার যা হয়েছে যথেষ্ট !'

চন্দনা বলল, 'যাই বল, আমার কিন্তু সন্দীপকেই বেটার লাগে। বেশ হ্যান্ডসাম আর সোবার—'

একবার পিছনে তাকিয়ে নিয়ে হাসিটা আড়াল করে নিল টুপুর।

'তা হলে তুই লেগে যা—'

'মহাদেবীরা, আপনারা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন ? না যাত্রা শুরু ঘোষণা করা যাবে ?'

কথার ফাঁকে অসিত কখন এলো খেয়াল করেনি কেউই। আর, সত্যি সত্যিই, সকলেই যখন এসে গেছে তখন আর দেরি করা কেন ? ওরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

'চারজন মেয়ে, ছ'জন ছেলে। টোটাল দশজন।' শর্মিলা বলল, 'কে কোন গাড়িতে উঠবে উঠে পড়ো।'

'দ্যাট্স্ এ গুড সাজেসান।' অশোক বোধ হয় এই প্রথম মুখ খুলল, 'ট্যু অ্যান্ড থ্রি—এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা যেন ঠিক থাকে। আমি অবশ্য অ্যামবাসাডরের ড্রাইভার !'

'আমি ফিয়াটের। পছন্দ তো ?'

কথাটা সন্দীপের। টুপুর লক্ষ করেনি ছুটোছুটির মধ্যে কখন ও সন্দীপেরই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে দেখল, হাসি-হাসি মুখ করে তারই দিকে তাকিয়ে আছে সন্দীপ—যেন প্রশ্নটা তাকেই। আকস্মিক শীতে কেঁপে উঠল টুপুর।

জবাব না দিলে খারাপ দেখায়। কিন্তু, দেখল ইতিমধ্যেই এক একজন করে উঠতে শুরু করেছে গাড়িতে। টুপুর হাসল এবং এলানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ভালো ?'

'ভালো আর কোথায় ! এসেই তো দেখছি বন্ধুদের সঙ্গে কনফারেন্সে— !'

'যাঃ !'

আর দেরি করা ঠিক নয়। টুপুর নিশ্চিত জানে, ফিয়াটটা সন্দীপই ড্রাইভ করবে এবং সেই জন্যেই সে ফিয়াটে উঠবে না। ওই যে, পল্লব অসিতরা উঠে গেল অ্যামবাসাডরে, রজতও উঠবে। ব্যাগ তুলে আনছে পিনাকী। পিনাকী পৌঁছুবার আগেই প্রায় পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে রজতের শার্টের কলারটা চেপে ধরল টুপুর।

'পাজি ! শিভালরি জানিস না ! আমি পড়ে রইলাম !'

'তুই উঠিসনি ! আমি ভাবলাম আজ তোরা লেডিজ সিট দাবি করবি—'

'পাজি !'

শর্মিলা আগেই জায়গা করে নিয়েছে অশোকের পাশে। পিছনের সিটে অসিত আর পল্লব, রজত ওইখানেই বসবে। ভেবে, দরজা খুলে, শর্মিলার পাশে বসে পড়ল টুপুর।

শর্মিলা কথা বলছিল অশোকের সঙ্গে। হঠাৎ টুপুরকে দেখে বলল, 'তুই এখানে এলি ! ওখানে কে থাকল ?'

পিছনে তাকিয়ে দেখল সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে তখনো। ফিয়াটের পিছনের সিটে একা ঈপ্সিতা ; সামনে চন্দনা। পিনাকী তার এয়ারব্যাগ নিয়ে ও-গাড়িতে উঠতে গিয়েও ফিরে আসছে আবার।

'তোরা সব এখানে উঠলি ? আমি একা ও-গাড়িতে যাব ?'

'একা কেন বাবা !' অসিত বলল, 'তোমার তো ভালোই হলো। ক্যামেরা লোড করে এনেছ, এখন দু' হাতে ফটো খিচে যাও। এখানে আর জায়গা কোথায় !'

'আচ্ছা, ঠিক আছে—', কিছু না বুঝেই আবার ফিয়াটের দিকে দৌড়ে গেল পিনাকী। সন্দীপও উঠল, হাত রাখল গিয়ারে। অশোক ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সন্দীপ, ক্যান উই স্টার্ট ?'

'হ্যাঁ, চল।' বলেই বলল সন্দীপ, 'ওয়েট, ওয়েট—'

পিনাকী জায়গা করে নিলেও ঈপ্সিতা নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। এ-গাড়িতে এসে অনুনয় করে বলল, 'এই লক্ষ্মীটি, তোরা কেউ একজন ও-গাড়িতে যা না !'

'কী হলো ?' বলেই বুঝতে পারল শর্মিলা, 'উফ্, প্রব্লেম !'

'ঠিক আছে, তুই এখানে বোস। আমি যাচ্ছি ও-গাড়িতে—'

গম্ভীর মুখে নেমে যাচ্ছিল, অসিত ওর হাত চেপে ধরল।

'যাবি না। অশোকদার ফরমুলায় এ-গাড়িটা একেবারে ব্যালান্সড্ হয়ে আছে। তুই নামলেই চাকা পাংচার হয়ে যাবে।'

চোখেমুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে ঈপ্সিতা বলল, 'প্লিজ—'

শর্মিলা বলল, 'টুপুর, তুই যা না—'

'না—না—'

'ঠিক আছে। চন্দনাকেও এখানে আসতে বলছি। আমরা দু'জনেই ও-গাড়িতে যাই—'

নামবার জন্যে ব্যস্ত হলো শর্মিলা। অসহায় চোখে একবার রজতের দিকে তাকাল টুপুর। ঈপ্সিতার কথায় যায়নি, এখন ওকে যেতে বলা ভালো দেখায় না। তখন ভাবল, আজকে দিনটা শুরু হয়েছে অন্য রকমভাবে, আজ যেন সবই অন্য রকম হবে। এবং নেমে এলো।

চন্দনাকে এ-গাড়িতে পাঠিয়ে শর্মিলা উঠে গেল পিছনের সিটে, পিনাকীর পাশে টুপুর পৌঁছুবার আগেই বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'তুই সামনে বোস—'

মাথা ঝুঁকিয়ে সন্দীপ ডাকল, 'আসুন—'

একটু আগেই টুপুর জেনেছে, আজ সবই অন্য রকম হবে। না হলে, এই সরাসরি সন্দীপের পাশে বসাটা কিছু নয় ; ওই গাড়িতে গিয়ে এঁটে বসবার পরও আবার এখানে ফিরে আসা—এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা আছে। একা শর্মিলাকে দোষ দিয়ে লাভ কী ? পিনাকীর দেরি করা, ঈপ্সিতার নেমে যাওয়া, আসতে গিয়েও রজতের থেমে পড়া—তা হলে তো এদের সবাইকেই জড়াতে হয়। এমন তো নয় যে এরা সবাই একসঙ্গে তার মনের ভিতর ঢুকে পড়ে একই সময়ে ছুঁয়ে দেখেছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছড়ানো তার লজ্জাটাকে—সুযোগ বুঝে তাকে নিয়ে খেলা করল একটু। তা কী করে হবে ! এর মধ্যে রজত ছিল, আর যে যা'ই করুক—রজত অন্তত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তার সঙ্গে। ও-গাড়ি থেকে নেমে আসবার সময় যখন তাকিয়েছিল রজতের দিকে, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, একবার ডাকলেই রজতও নেমে আসত ঠিক। এতোই যখন অদলবদল হলো তখন পিনাকীটাকেও পাঠিয়ে দেওয়া যেত ও-গাড়িতে ; ঈপ্সিতা কি আর একবার করতে পারত ও-রকম। ঈপ্সিতা নির্লজ্জ আর অভদ্র হতে পারলে সে কেন একটু নির্লজ্জ হয়ে ডেকে নিতে পারল না রজতকে ? এ-রকম তো কতোবারই ডেকে নেয় ! আজ কি সত্যি

সত্যিই দিনটা অন্য রকম হবে ঠিক ছিল ! নাকি লজ্জাই তার দ্বিধাটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আরও—তখন, সেই মুহূর্তে, না-জেনে না বুঝেও সে চাইছিল, ওই গাড়িতে সন্দীপ আছে, ওখানে যেতে হলে রজতকেও টেনে আনার মানে হয় না কোনো ! হয়তো এটাই সত্যি, সে চায়নি । মাঝে মাঝে নিজেকে বুঝতে এতো অসুবিধে হয় !

ভাবনার মধ্যে গাড়িটা কখন স্টার্ট করে ছুটির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে সাঁ-সাঁ করে—খেয়াল হতে প্রায় অন্যমনস্কভাবে একবার পাশে তাকিয়ে দেখল টুপুর । সন্দীপের চোখ সামনে, স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে খুব মন দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটাকে । আজ রবিবার, তার ওপর এখনো সকাল বলেই বোধ হয় রাস্তা ফাঁকা । এইভাবে চললে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যাবে । চন্দনা বলেছিল, হ্যাণ্ডসাম আর সোবার ; চন্দনা যেখানে বসেছিল, এখন সে-ই বসে আছে সেখানে । বুকের মধ্যে একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ভেঙে ছড়িয়ে দিতে দিতে টুপুর ভাবল, হয়তো এই রকমই হয় । যদি তা না হতো, তা হলে এখন, ঠিক এই সময়ে, সে আর রজত ব্যাণ্ডেল কিংবা ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনে উঠে বসতে পারত !

প্ল্যানটা রজতেরই ছিল । সকালে কথামতো লাল ডাকবাক্সটার সামনে এসে পৌঁছেছিল ঠিক সময়ে । বলতে কী, ভোররাতে শেখরের সঙ্গে ওই সব কথাবার্তার পর মনের বিশৃঙ্খলা নিয়ে এতোই ছড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে যে গুছিয়ে বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে যায় ।

'তুই বলেছিস বলেই এলাম ।' রজত বলল, 'আমার একেবারেই যেতে ইচ্ছে করছে না । অস্বস্তি লাগছে ।'

'চল না, বাবা ! সবাই-ই তো যাচ্ছে—

'তোর খুবে ইচ্ছে ?'

'খুব বলে কিছু নয় । বেরিয়েই যখন পড়েছি—'

খানিকটা হেঁটে এসে রজত বলল, 'টুপুর, শোন, বেরিয়েই যখন পড়েছিস বলছিস, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই আজ !'

'ও মা ! কোথায় ?'

'ব্যাণ্ডেল কিংবা ডায়মণ্ডহারবার । ট্রেনে ! দাদার টাকাটা কাল পেয়েছি, আমার সঙ্গে আছে । কোনো অসুবিধে হবে না । কাল ওদের বানিয়ে বলে দিস একটা কিছু—'

'শর্মিলাকে তো চিনিস না !' অল্প ভেবে বলল টুপুর, 'দেরি দেখলে বাড়িতেই চলে আসবে খোঁজ করতে । তখন ? বাড়িতে তো বলে এলাম পিকনিকে যাচ্ছি ।'

'ও ।' যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে থেমে দাঁড়াল রজত, 'তা হলে তুই বাড়ি চলে যা—একটা কিছু বলে কাটিয়ে দিস ওদের । আমি ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক বাদে ঘুরে আসছি ।'

'না, রজত থাক ।' টুপুর বলল 'বলেইছি যখন, যাই । একবেলার তো ব্যাপার ! তোর সঙ্গে আর একদিন যাব ।'

তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার জন্যে রজত নিজেই তারপর ট্যাক্সি ডেকেছিল । ওই গাড়িতে বসে রজতের অস্বস্তিটা এখন নিশ্চয়ই বেড়ে যাচ্ছে আরও । হয়তো এরই জন্যে আজ আবার চেঁচামেচি করবে ।

টুপুর দেখল, অ্যামবাসাডরটা এগিয়ে গেছে অনেক দূর । অশোকের পাশে ঈপ্সিতা, তার পাশে চন্দনা । ওরা পিছনে । এখান থেকে চিৎকার করলেও শুনতে পাবে না ।

'এই পিনাক, তুই এতো চুপচাপ কেন ?' গাড়ি আর রাস্তার শব্দ ভেদ করে এইমাত্র কথা

বলল শর্মিলা, 'একেবারে গোঁজ হয়ে বসে আছিস ?'

'একটা হারমোনিয়াম এনে দিলি না কেন, চেঁচিয়ে গান গাইতাম !'

বেসুরো গলা পিনাকীর, রাগটা আড়াল করতে পারে না। বেচারা ! শর্মিলা ওর জানুর ওপর হাত রাখল, তারপর আদর করার মতো বুলিয়ে গেল আস্তে।

'তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব। ব্যাপারটা কারুরই ভালো লাগেনি !'

'এটা ইনসাল্ট্ ! আমি কি সেধে—'

'জানি।' সন্দীপ আছে দেখে তাড়াতাড়ি ওকে থামিয়ে দিল শর্মিলা, 'আমরা তো সবই দেখলাম। এতো ডাঁট ভালো নয়।'

'ডাঁট কী করে ভাঙতে হয় আমি জানি—'

পিনাকী থামছে না দেখে শর্মিলা ওর উরু খামচে ধরল, তাকাল ভুরু পাকিয়ে। বোধ হয় বুঝেছে। তখন হাসল সহজ করে।

'তুই ক্যামেরাটা এনে ভালোই করেছিস, পিনাকী। এতো তাড়াহুড়োর মধ্যে করতে হলো সব—আমাদের কারুরই মনে পড়েনি।'

'যা বলেছ—', সন্দীপ বলল, 'পিকনিকে গেলে, কিন্তু তার কোনো স্মৃতি ধরে রাখা গেল না, সে বড়ো বাজে ব্যাপার।'

'স্মৃতি তো মনে।' শর্মিলা বলল, 'তার জন্যে ছবি তুলে রাখার দরকার কী !'

'মনেরটা মনেই থাকে, সে তো সকলকে দেখানো যায় না।' মিরারে ভাসছে পিনাকীর আধখানা মুখ, সেদিকে তাকিয়ে চুপচাপ হাসল সন্দীপ, 'এক্সট্রা রোল এনেছ তো ?'

পিনাকী ঘাড় নাড়ল। কোনো রকমে বলল, 'হ্যাঁ—।' ক্যামেরার ব্যাপারটা এতোক্ষণে সম্পূর্ণ গুলিয়ে গেছে তার মাথায়, রাগে আর অপমানে এখনো রি-রি করছে শরীর, আশেপাশে কেউ না থাকলে এতোক্ষণে হয়তো সজোরে ক্যামেরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিত রাস্তায়—যাতে চৌচির হয়ে টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। কাজে তা করতে না পারলেও টুকরোগুলো ছড়িয়ে গেছে বুকে। অথচ, কাল থেকেই কতো আগ্রহ নিয়ে ছবি তোলার ইচ্ছেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করেছিল সে ! সন্ধেবেলায় ঈপ্সিতা আর ওর মার সঙ্গে দেখা হবার পরই ছবি তোলার আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল তার—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিল্ম কিনতে ছুটে গিয়েছিল দোকানে। সবই শালা ফালতু, বেলুনের মতো ফাঁপা—এক ছুঁচেই চুপসে গেল ! মনে মনে রোজই সে অনেকবার চুমু খেত ঈপ্সিতাকে, হাত বোলাত ওর মসৃণ কপালে, টানা ভুরুতে আর নরম গালে। এখন ইচ্ছে করছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে ওই জায়গাগুলো অন্য রকম করে দিতে। এতো দিন বন্ধুদের সব ঠাট্টা-ইয়ার্কি হজম করে গেছে একদিন হুট্ করে কিছু একটা হয়ে যাবে ভেবে : ভেবেছিল, এই করতে করতেই একদিন ঈপ্সিতা ডেকে নেবে তাকে। কিন্তু, আজ সে গাড়িতে উঠতেই যেভাবে নেমে গেল ঈপ্সিতা, কোনো বন্ধু কেন, একটা কুকুরও তাতে অপমান বোধ করত। এই মেয়ের পিছনে এতোকাল ঘুরঘুর করে কাটিয়েছে সে—টানা দু' তিন বছর !

পিনাকীর ইচ্ছে করছে স্যুইসাইড্ করতে। ঘটনাটা সকলের সামনে ঘটল বলেই আরও ছোট লাগছে নিজেকে। এখনো দেখা হয়নি কারও সঙ্গে, কিন্তু, দেখা হলে ওরা গায়ে থুতু-টুতু দেবে না তো ! ইস্ ! কী দরকার আর পিকনিকে গিয়ে ! নেমে যাবে ?

দুঃখে অস্থির, দিশেহারার মতো ঠোঁট কামড়ে ধরল পিনাকী। উরুর ওপর থেকে হাতটা এখনো তুলে নেয়নি শর্মিলা—বোধ হয় ভুলেই গেছে। লম্বা আঙুলে জ্বলজ্বল করছে আংটির লাল পাথর, বোধ হয় ওয়েডিং রিং। হাতটা শর্মিলার কেন! সান্ত্বনা দিচ্ছে? সত্যি, মেয়েগুলোকে কিছুতেই বুঝবার উপায় নেই! এই ধৃতিকান্তর সঙ্গে রগড়ারগড়ি করল কিছু দিন, তারপরেই অশোককে বিয়ে, আবার এখন হাত বোলাচ্ছে আমার উরুতে! যেভাবে চলে এলো এ-গাড়িতে, সন্দীপের সঙ্গেও কিছু আছে কি না কে জানে! বরং টুপুর পাশে এসে বসলে একটু গল্পটল্প করা যেত। সন্দীপের পাশে অমন কাঠ হয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না টুপুরের। শর্মিলাকে কি বলবে, তুই উঠে যা—টুপুরকে বসতে দে এখানে?

পিনাকী হঠাৎ কোণের দিকে সরে যেতেই চমকে হাতটা সরিয়ে নিল শর্মিলা। মনে হচ্ছে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে এখন। বেচারা! বোকা বলেই আজ অমন ঘা খেলো!

'সন্দীপদা, আমরা কতোটা এলাম?'

'অনেকটাই।' ঘড়ি দেখে বলল সন্দীপ, 'প্রায় আধঘণ্টা। কিন্তু, তোমরা আমাকে শুধু ড্রাইভার করে রাখবে জানলে আমি আজ আসতাম না।'

'ও মা, তা কেন!' শর্মিলা বলল, 'আপনিই আজকের চিফ গেস্ট। আপনি এলেন বলেই যাওয়াটা হলো।'

'তাই কি?' সন্দীপ হাসল। থেমে বলল, 'একজনকে তো ম্যানেজ করলে। কিন্তু আর একজনের ব্যাপার কী? উনি কি রবিবার কথা বলেন না?'

'কে! টুপুর?' শর্মিলা সময় নিল একটু, 'আমি কেন! যে যার পাশের জনকে ম্যানেজ করবে। ওর দায় আপনার।'

'আ-হা!' টুপুর জানত, এই সব কথাবার্তায় ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়বে সে, তখন আর উপায় থাকবে না। এই সন্দীপের সঙ্গে খুব খোলামেলাভাবে কথা বলেছিল ক'দিন আগে; অথচ, লজ্জা আজ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছে তাকে। ঠিক এই মুহূর্তটিতেও সন্দীপের হাত থেকে ছিটকে আসা পুরনো বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল তার সর্বাঙ্গে। আড়ষ্ট গলায় বলল, 'আমি কি বলেছি কথা বলব না!'

'বলেননি। কিন্তু বলছেনও তো না!'

সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সন্দীপ, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল টুপুর, কথা বন্ধ করলেও হাসিটা লেগেই থাকে ওর ঠোঁটের কোণে। পাশের রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে একটা বেয়াড়া ট্রাক সামনে এসে পড়ল, হর্ন দিতে দিতে সাবধানে সেটাকে পাশ কাটিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল সন্দীপ। গিয়ার বদলে স্পিড্ তুলল। অ্যামবাসাডরটা হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল কোথায়, আবার দেখা যাচ্ছে দূরে। যেভাবে পিঠ সোজা করে বসেছে সন্দীপ, মনে হয় আগের গাড়িটার পুরো নাগাল না-পাওয়া পর্যন্ত কথা বলবে না আর। ওর লম্বা, রোমশ হাতটায় চোখ রাখল টুপুর। আলাদা করে দেখলে পুরুষ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। রিস্টওয়াচটা আকারে বড়ো, কিন্তু এমনভাবে কব্জি আঁকড়ে আছে যেন ঠিক ওই হাতটার জন্যেই তৈরি হয়েছিল। দেখতে দেখতে লজ্জাটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল টুপুর। হাওয়ায় এলোমেলো আঁচলটা গুছিয়ে নিল কাঁধের ওপর।

'আপনার বোধ হয় ওই গাড়িতে যাবার ইচ্ছে ছিল—', সন্দীপ বলল, 'আমি কিন্তু জোর করে আনিনি—'

'জোর করবেন কেন! আমি নিজেই এসেছি—'

'নিজেই !' একবার টুপুরের দিকে তাকিয়ে নিল সন্দীপ, 'আচ্ছা !'

শর্মিলা বলল, 'এরপর আবার জিজ্ঞেস করবেন না যেন আপনার টানে কি না !'

সন্দীপ হেসে উঠল উঁচু গলায়। নিঃশব্দে হলেও, দেখাদেখি টুপুরও। এখন অনেকটা সহজ লাগছে।

'না, তা করব না। তবে—', সন্দীপ বলল, 'লেট মি টেল ইউ দি ট্রুথ। আমি কিন্তু মনে মনে চাইছিলুম উনি এ-গাড়িতে আসুন—'

'সে কী, কেন !' পিছন থেকে ঝুঁকে এসে টুপুরের পিঠে খোঁচা দিল শর্মিলা, 'এই পক্ষপাতের মানে কী ?'

'তা তো জানি না ! যা সত্যি তাই বললাম। বলতে পারো ইচ্ছা—ইচ্ছাশক্তি—'

পিনাকী হঠাৎ বলল, 'হাত দেখতে জানেন। মন্ত্রতন্ত্রও জানেন নাকি ?'

'না, ভাই। তা হলে তো অনেক ব্যাপারই ম্যানেজ করতে পারতাম। তোমার ব্যাপারটাও।' এতোক্ষণে যেন পিনাকীর প্রসঙ্গে ফিরে আসবার চেষ্টা করল সন্দীপ, 'অনেস্টলি ! বলতে পারো হাফ-মন্তর। ওই টুপুর নামটার মতো—'

টুপুর বলল, 'তার মানে !'

'আপনার ভালো নামও কি টুপুর ?'

'তাই-ই তো !'

'হলো না। ওর আগে একটা টাপুর আছে। সেদিন আলাপ হবার পর থেকেই ভাবছি—বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে। ঠিক কি না, বলুন ?'

'জানি না।'

কানের লতি ছুঁয়ে নিজেকে আবার গুটিয়ে নিল টুপুর। ঢেউ-তোলা নদীর মতো কী একটা বয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে, কখনো বা অল্প ধাক্কায় মাটি খসিয়ে যাচ্ছে পাড়ের। ঠিক বুঝতে পারছে না এসব কথা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে। ঠিকঠিক মানে না বুঝেও ঝিনুক কুড়নোর মতো কেন সে প্রত্যেকটা কথাই তুলে রাখছে কানে। এই কি ভালোলাগা ?

এই মুহূর্তে মনের সমস্ত দ্বিধা নিয়ে পৃথিবীর আলো হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে এক রকম ঐশ্বর্য ; বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে টুপুর দেখতে পায় তার বিভিন্ন রঙ খামখেয়ালি অনুভূতি হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার লুকানো শরীর ও শরীরের ভিতর তালাবন্ধ ছোট ছোট ঘরগুলোকে। দূর থেকে চোখ তুলে নিয়ে পাতা বুজে রাখে সে ; যাওয়ার এই দুরন্ত গতি থেকে উঠে আসা হাওয়ার সামনে সম্পূর্ণ অবারিত করে দেয় নিজেকে—যা ইচ্ছে করুক তারা ; যেমনভাবে ইচ্ছে খেলা করুক তাকে নিয়ে। বড়ো পল্‌কা তার অবরোধ—কখনো নড়ছে আর অসম্মতি জানিয়ে ছটফট করছে কখনো ; কিন্তু, হাওয়া অল্প ঝোড়ো হলেই নির্দ্বিধায় খুলে দেবে নিজেদের। গাছের পা বেয়ে গড়ানো আঠার মতো তাদের ভিতর থেকে ঝরে পড়বে এক রকম সুখ ! কেমন ধরন তার সে বুঝতে পারে না একটুও, বুঝতে পারে না তার আবির্ভাবের রহস্য। প্রায় সুখকর এক রকম অনুভূতির মধ্যে সে শুধু চিনে নেয় নিজের অন্ধকার প্রস্তুতিগুলোকে। মনে হয় এরই জন্যে তৈরি হয়েছিল সে ; এই যে বাস্তব-অবাস্তব কল্পনার রঙে এতোকাল ধরে চকচকে করেছে তার সমগ্র অস্তিত্বকে, তা শুধুই এই অনুভূতির সামনে নিজেকে চিহ্নিত করার জন্যে। ইচ্ছে করছে এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে নিজেকে, আরও অনেকক্ষণ। এইভাবে একটার পর একটা দিন চলে গেলেও এতোটুকু কষ্ট হবে না তার। এখন সে কথা বলবে না বা অন্য কিছুও করবে

না—টানটান করে বাঁধা তারে বেজে উঠছে যে-ধ্বনি সে একাই কান পেতে রাখবে তাতে। এসব বলা যায় নাকি কাউকে ? সে বড়ো লজ্জার ! না, টুপুর পারবে না।

সত্যি সত্যিই তারপর কী হলো, কে কী বলল, ঠিক ঠিক শুনতে পেল না টুপুর। গাড়িটা একজন চালাচ্ছে বলেই অনুভব করছে তার উপস্থিতি, না হলে সে একা।

সাড় পেল শর্মিলার ডাকে।

'কী রে, যাবি তো বল ?'

'কোথায় !'

'তুই কী ভাবছিস বল তো ! এতো কথা—আমি দুর্গাপুর যাবার কথা বলছিলাম আমার সঙ্গে। যাবি ?'

'তোর ওখানে ? সে তো আগেই বলেছিস।' থেমে থেমে বলল টুপুর 'দেখি। গেলেই হয়। মাকে বলতে হবে—'

'সে আমি বলব।'

'সন্দীপদার অফারটা দারুণ—', পিনাকী বলল, 'তিন ঘরের একটা পুরো কোয়াটার্স, বুঝলি টুপুর, রজত-টজতকে বলি। আমরা দল বেঁধে যেতে পারি।'

ভুরু তুলে রজতের দিকে তাকাল শর্মিলা। কিছুটা অস্বস্তি মেশানো।

'ঈপ্সিতাকেও নিবি তো ?'

পিনাকী মুখ ঘুরিয়ে নিল। খানিক চুপচাপ। প্রশ্নটা নিজেই হারিয়ে গেল।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, 'তুই কবে যাচ্ছিস দুর্গাপুরে ?'

'সন্দীপদা আর ও কাল ফিরবে। আমি হয়তো আরও তিন চার দিন থাকব।' শর্মিলা বলল, 'কলকাতা ছাড়তে একদম ভালো লাগে না।'

'আপনি কালই যাচ্ছেন ?'

অসাবধানেই সম্ভবত, কথাটায় একটু জোর দিয়ে ফেলেছিল টুপুর। সন্দীপ ফিরে তাকাল। হাসল।

'সে-রকমই তো ঠিক আছে। আমি এসেছিলাম পাশপোর্ট ঠিক করাতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও কাজ ছিল কিছু। হয়ে গেছে—। ওখানে অনেক কাজ।'

'সন্দীপদা আবার জার্মানি যাচ্ছে, জানিস তো !'

আগের প্রশ্নটার জেরেই তখনো ঘামছিল টুপুর। শর্মিলার কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে গেল আবার। বেলা বাড়ছে ; কিছুক্ষণ থেকেই রোদ্দুরের তাপ টের পাচ্ছিল। শহর ছাড়িয়ে এসেছে অনেকক্ষণ ; এদিকে দু' ধারে মাঠ, পুকুর, গাছগাছালি থাকলেও হাওয়া কম। কাচের ভিতর দিয়ে মুখোমুখি রোদের ঝাঁঝ এড়ানোর জন্যে ঈষৎ বেঁকে বসল টুপুর, হাত বাড়িয়ে কভারটা নামিয়ে নিল একটু। সোজা যেতে যেতে রাস্তাটা হঠাৎই ঘুরে গেছে ডান দিকে। ওদের গাড়িটা খানিক আগে পর্যন্তও চোখেচোখে ছিল, এখন আবার দেখা যাচ্ছে না। টুপুরের মনে হলো, এবার থামা দরকার।

'সন্দীপদা, জোরে চালান।' শর্মিলা বলল, 'ওদের তো দেখাই যাচ্ছে না আর !'

'ফলো করার কথা ছিল—। অশোকই স্পিড মেনটেন করছে না।' সন্দীপ খাড়া হয়ে বসল। হাত তুলে চিবুক মুছে নিল, 'বোরিং লাগছে, তাই না ? উই নিড সাম থ্রিল। চলো ওদের ওভারটেক করি।'

হঠাৎই ঝাঁকুনি দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করল গাড়িটা। একটা বাজার মতন

জায়গা, কিছু ভিড়—এঁকে-বেঁকে কিছুটা বেপরোয়াভাবে ভিড় কাটিয়ে গাড়িটা বের করে আনল সন্দীপ ; তারপর স্পিড বাড়িয়ে দিল আরও। সামনে একটা গরুর গাড়ি, হর্ন শুনেও যেন ঠিক করতে পারছে না কোন দিকে যাবে। সন্দীপ তবু স্পিড কমাচ্ছে না। কিছুটা ভয় পেয়েই টুপুর বলে উঠল, 'এ কী! অ্যাক্সিডেন্ট হবে যে!' এবং প্রকৃত আশঙ্কায় সরে এলো জায়গা থেকে।

গাড়িটার প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীন বেরিয়ে এসে হাসল সন্দীপ ; স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে আলতোভাবে রাখল টুপুরের কাঁধে।

'ভয় পাচ্ছ!'

সন্দীপের হাত এবং সম্বোধন দুই-ই ছুঁয়ে গেল টুপুরকে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে শর্মিলা আর পিনাকীকে দেখবার চেষ্টা করল ও। শর্মিলা রাস্তা দেখছে—এক্ষুনি যা ঘটে গেল তা লক্ষ করেছে কি না বোঝা যায় না। পিনাকীও চুপচাপ ; খানিক আগে দু' একটা কথা বললেও আবার ডুবে গেছে নিজের মধ্যে। দূরে অ্যামবাসাডরটা আবার ভেসে উঠল চোখে। একই হাসি এখনো লেগে আছে সন্দীপের ঠোঁটের কোণে। একই স্পিড গাড়িতে। রাস্তা খুব চওড়া নয়, ও-গাড়িটাও জায়গা ছাড়ছে না। স্পিডোমিটারের কাঁটা আশি ছাড়িয়ে গেল। তবু, যেভাবে হর্ন দিতে দিতে এগোচ্ছে সন্দীপ, মনে হয় যে-কোনোভাবেই হোক, ওভারটেক করবেই।

উত্তেজনায় সামনের সিটের ওপর ঝুঁকে এলো শর্মিলা।

'সন্দীপদা, বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু—'

'আমাকে ডিপেণ্ডেব্‌ল মনে হয় না!'

'পিকনিক করতে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করলে কি ভালো হবে!'

'তোমার অবশ্য দুটো ভয়—নিজেকে নিয়ে আর অশোককে নিয়ে। আমারও কি প্রাণের ভয় নেই!'

আর দু' এক মুহূর্তের মধ্যে দুটো গাড়িই একই পয়েন্টে পৌঁছে যাবে। রাস্তার ঢাল দেখে গাড়িটা কাত করে নিল সন্দীপ। টুপুর প্রায় ওর হাত ধরে ফেলেছিল, কোনো রকমে সংযত করল নিজেকে। অশোক ছাড়া ও-গাড়ির সবাই তাকিয়ে আছে পিছনে। মুহূর্তের জন্যে রজতের চোখে চোখ রাখল টুপুর। একেবারে গায়ে গায়ে। মনে হচ্ছে হাল ছেড়ে দিয়েছে অশোক। শেষ পর্যন্ত অ্যামবাসাডরটাকে পেরিয়ে গিয়ে চোয়াল ছড়িয়ে দিয়ে হাসল সন্দীপ।

'সো! উই ক্যাড্‌ মেক ইট! আশা করি অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি।'

'ও আপনাকে ছেড়ে দিল।'

'ছেড়ে দেবে কেন?' টুপুর বলল, 'পারল না বলে!'

'বাঃ! এরই মধ্যে!' শর্মিলা বলল, 'তুইও ছেড়ে দিলি নাকি নিজেকে!'

কথাটার মানে আছে। শর্মিলাকে ভ্রূকুটি করবার জন্যে পিছনে তাকিয়ে থেমে গেল টুপুর। পিছনের গাড়িটা খুব দূরে নেই। দেখল, কাছাকাছি বসে হাসাহাসি করছে অশোক আর ঈপ্সিতা, অনেকটা তফাতে চন্দনা—একটু বা থমথমে মুখ। আভাসে অসিতকে দেখা গেলেও রজত বা পল্লব কেউই স্পষ্ট হলো না।

ঈপ্সিতা বলল, 'লজ্জা করল না, বউ ছাড়িয়ে গেল আপনাকে!'

'বউ বলেই যেতে দিলাম। তা ছাড়া—', অশোক বলল, 'হঠাৎ মনে হলো দেরি করে

পৌঁছুলে আমারই লাভ।'

'কেন!'

'এই যে তুমি বসে আছ আমার পাশে—আমি একটি সুন্দরী মেয়ের শরীরের গন্ধ পাচ্ছি, থামলেই তো সব হারিয়ে যাবে! সন্দীপ এটা বুঝবে না। ওর কাছে স্পিডই সব।'

'এতো বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলেন কেন!'

চন্দনা দেখল, অশোকের হাঁটুতে চিমটি কাটল ঈপ্সিতা, যেন অশোকের সঙ্গে ওর অনেক দিনের আলাপ! গাড়িতে ওঠার পর থেকে ও একাই কথা বলে যাচ্ছে প্রায়। গোড়ার দিকে অসিত কয়েকটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছিল, তারপর থেকে সবাই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। পল্লব আর রজত আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। এ কীরকম আনন্দ করতে যাওয়া! যেন একসঙ্গে মোটরে নয়, দুটো স্টেশনের মাঝামাঝি ট্রেনের কামরায় বসে আছে ক'জন যাত্রী। এক ঈপ্সিতা আর অশোক ছাড়া কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয় না। মাঝখানে ভেবেছিল রজতদের কাউকে বলে, তোরা একজন সামনে এসে বোস, আমাকে ধরে রাখ তোদের মাঝখানে। মেয়ে হলে বুঝতে পারতিস কেন এমন ভাবছি—কেন ঈপ্সিতার পাশে বসে থাকাটা এমন অসহ্য লাগছে আমার!

গরম বাড়ছে ক্রমশ। মুঠো থেকে রুমাল বের করে গলার ওপর থুপ থুপ করে ঠুকতে লাগল চন্দনা। দেখাদেখি পুরো আঁচলটাই মুঠোয় ধরে কপালের ওপর নিয়ে এলো ঈপ্সিতা।

'সত্যি রে! কী গরম আজ!'

পিছন থেকে অসিত বলল, 'ঈপ্সিতা, চিউইংগাম খাবে?'

'ইয়ার্কি মারিস না—।'

'আছে নাকি চিউইংগাম?' অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আমি খেতে পারি—'

অসিত বলল, 'ঈপ্সিতা জানে কোথায় আছে—'

'যতো বাজে কথা!' গলায় ঝাঁঝ স্পষ্ট। অনেকক্ষণ পরে নড়েচড়ে গুছিয়ে বসল ঈপ্সিতা জায়গা ছেড়ে। যেন এতোক্ষণে বুঝতে পারল অশোকের সঙ্গে তার একটা দূরত্ব আছে এবং থাকা উচিত। অপ্রস্তুতভাবে হাসল চন্দনার দিকে তাকিয়ে।

'কী চিজ মাইরি!' চাপা গলায় রজতকে বলল অসিত, 'পিনাকীটাকে ল্যাং দিয়ে এখানে এসে রগড়াচ্ছে। অশোক আজ ওকে বোতল না চুষিয়ে ছাড়বে না।'

বিরক্তি মেশানো চোখে অসিতের দিকে তাকাল রজত, কথা বলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পিছনে কাচের গায়ে গায়ে রাখা পুরনো খবরের কাগজ জড়ানো বোতল দুটো গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঠোকাঠুকি করছে। আলগা হয়ে এসেছে মোড়ক দুটো; কালো ছিপির ওপর সোনালি হরফ—রোদ লেগে ঝাপসা। 'স্কচ্!' গাড়িতে উঠেই বোতল দুটো আবিষ্কার করেছিল অসিত, 'বড়দা তালাচাবি দিয়ে রাখে। ঝাড়া যায় না। আজ দিল খুলে হুইস্কি খাব। মাতাল হব। তারপর নিজের পাছায় নিজেই লাথি ঝাড়ব।' রজত অতশত ভাবতে পারেনি। শুধু ভেবেছিল, নিশ্চয়ই অনেক দাম। দাদার দেওয়া টাকা আর তার টিউসানের টাকা জুড়লে যা হয়, এক একটারই দাম নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বেশি। পিকনিক থেকে ফেরবার সময় বোতল দুটোর ঠোকাঠুকির ঢলঢলে শব্দটা পালটে যাবে। পিকনিক কথাটা তখনই সে বদলে নেয় ফুর্তির সঙ্গে। ভাবে, জীবন কী অদ্ভুত! কতো স্মুথভাবে এরা মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলেছে জীবনকে—যা ইচ্ছে করতে পারে, যেমন খুশি চলতে পারে। সে

কোনো দিন এদের নাগাল পাবে না। যদি চেষ্টাও করে, গায়ের ডোরাকাটা গারদের দাগটা সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে দগদগে হয়ে। এদের সঙ্গে তার কিছুই মেলে না—মিলবে না। তা হলে সে এদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন? টুপুরের জন্যে? টান? এই টানটাকে তো কোনো দিনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারেনি সে। তা হলে আজ, যখন বুঝতেই পেরেছিল আসার মানে হয় না কোনো—খামোখা টানটাকে আঁকড়ে থাকল কেন! বুকে হাওয়া টানবার জন্যে? তাও তো হলো না—এই ঈপ্সিতাটার জন্যে। পিনাকটা স্পাইনলেস, জোড়া পায়ের লাথি না খেলে কোনো দিন বুঝবে না কিছু। ঠিকই, কোনো জোর নেই এই একসঙ্গে কাছাকাছি থাকার, একসঙ্গে ঘোরাফেরা করার। যার যার নিজের নিজের; হয়তো এটাই সত্যি, এই লোকগুলো ইচ্ছে করলেই এক লাথিতে ভেঙে দিতে পারে বন্ধু-বান্ধব, টান-ভালোবাসা, সব কিছু। সিকিউরিটির লাথি, সুখের লাথি! ঈপ্সিতা ঠিক জানে কার সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয়।

রাগটা প্রশমিত করার জন্যে দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেটটা ট্রাউজার্সের পকেট থেকে বের করল রজত। ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে তাকে বেগার বলে ডাকে টুপুর—আজও সকালে কিনে দিয়েছে দু' প্যাকেট, বোধ হয় ঠিকই বলে। রাগের মধ্যেই কেমন যেন হাসি পেয়ে গেল রজতের।

'পল্লব, সিগারেট খাবি?'

অসিত নিজেই একটা তুলে নিল প্যাকেট থেকে। পল্লব চুপচাপ। মাথা নেড়ে না বলল। অশোককে বলে লাভ নেই কিছু। এর আগে একবার বলেছিল, ব্র্যাণ্ড চেঞ্জ করে না।

সিগারেট ধরিয়ে বুকভর্তি ধোঁয়া টানল রজত। তখনই মনে পড়ে গেল।

'চন্দনা, তোর মা কেমন আছে?'

অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম তাকেই কেউ জিজ্ঞেস করল কিছু। রজত। পরপর দুটো ঢোঁক গিলে চন্দনা বলল, 'একটু ভালো—'

'তোমার মা অসুস্থ নাকি?' অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'গলব্লাডারে স্টোন না কি!' ঈপ্সিতা বলল, 'তাই না?'

তখনই একটা সিদ্ধান্ত নিল চন্দনা। জবাব দেবে না। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'সেই জন্যেই কি তুমি এতো চুপচাপ?'

না। সে-জন্যে নয়। তবু কোনো জবাব দিতে ইচ্ছে করল না চন্দনার। এ বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার, এই দলটায় সে আছে, থেকেও তবু নেই। থাকলে কে আর যেচে চুপচাপ হয়ে যায়!

পরপর ঢেউগুলো উঠে আসছে বুক থেকে. গলা পর্যন্ত পৌঁছেই নেমে যাচ্ছে আবার। তা হলে তুই লেগে যা—সকালে বলেছিল টুপুর। তারপর টুপুর নিজেই চলে গেল ওখানে। ওই গাড়িতে থাকলে পিনাকীকে বলতে পারত, ছায়ার পিছনে ঘুরে কী হবে! আয়. আমার একাকিত্বে তুই একটু জড়িয়ে থাক। কিন্তু, সবই গোলমাল হয়ে গেল কেমন, ঠিক যেমনটি হয়ে এসেছে এতোকাল। শর্মিলা গেছে; ঈপ্সিতা যাবে, টুপুরও যাবে। পাঁচ বোনের ছোটো হয়ে শুধু অপেক্ষা করে যেতে হবে তাকে। অন্যদের কিছু না হলে তারও হবে না। তখন নিজেকে চালানোর জন্যে একটা চাকরির খোঁজ করতে হবে। উপায় একটাই, যদি ইতিমধ্যে কেউ তুলে নেয় তাকে। তেমন কি আছে কেউ?

ভাবনাগুলো টেনে নিয়ে যায় অনেক দূর। গাড়ির এঞ্জিনের তাপ আর বাইরের তেতে-ওঠা রোদ্দুরের জন্যে নয়, চন্দনা জানে মাথার ভিতর হঠাৎ দড়ির খেলা শুরু হবার অনেক কারণ থাকে। সবগুলোর নাম জানা নেই তার। তবে ভারসাম্যের এদিক ওদিক হলেই আগেভাগে একটা ব্যাপার বুঝতে পারে—এক মুহূর্তের জন্যে দপ করে লোডশেডিং শুরু হয়ে যায় গোটা পৃথিবীতে, তারপর সেই অন্ধকারটাই আবার একে একে ফিরিয়ে দিতে থাকে সব—দৃশ্য, ঘ্রাণ, স্পর্শ, উপস্থিতি, সব। মাথা ঘোরে ; শরীরে অন্ধকারের এই চমকটা ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। দ্রুত ঘেমে ওঠে হাতের চেটো। অনেক সময় সামলে নেয়, যখন পারে না তখন তারপর কী হয় বুঝতে পারার আগেই আবার ফিরে যায় অন্ধকারে। ডাক্তার বলে হিস্টিরিয়া। এই বয়সে নাকি অনেক মেয়েরই হয়, বিয়ে হলে ঠিক হয়ে যায়। এখন হাতের চেটোয় ঘাম এবং মাথার মধ্যে তাপ অনুভব করে নিজেকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেল চন্দনা। এখনই যদি সে-রকম কিছু একটা ঘটে যায় বিশ্রী ব্যাপার হবে। ওরা কেউ কোনো দিন দেখেনি আগে। তা ছাড়া, এটাই কি এসব হবার সময়!

উদ্বেগটা বেশি হতে নড়ে উঠে প্রায় সকলের দিকেই দিশেহারার মতো তাকাল চন্দনা।

'কী রে, অমন ছটফট করছিস কেন!' অবাক হয়ে অসিত বলল, 'খিদে পেয়ে গেল নাকি?'

'মাথা ঘুরছে।' গা গুলিয়ে চন্দনা বলল, 'জল ছিল না?'

ওয়াটার বটলটা পল্লবের পায়ের কাছে। তাড়াতাড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল চন্দনার হাতে। ওর পিঠ ধরে চেপে বসিয়ে দিল রজত। হাতে জল নিয়ে জোরে জোরে কপালে মাথায় ছিটোতে লাগল চন্দনা। খানিকটা ঢেলে নিল গলায়। ভিজে হাতটা মাথায় চুলে বোলাতে বোলাতে বলল, 'ঠিক আছে। আর কিছু হবে না—'

ওয়াটার বটলটা ফেরত দিয়ে সিটের কাঁধে হাতের ওপর কপাল পেতে দিল চন্দনা। ঢেউগুলো নেমে যাচ্ছে তলার দিকে। আঃ! দুঃখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে দুঃখিত হয় না কেউ। হাসে। ভগবান, আজ যেন কিছু না হয়!

ইতিমধ্যে গাড়ির স্পিড যতোটা সম্ভব মন্থর করে এনেছিল অশোক। সেকেণ্ড গিয়ারে প্রায় সেইভাবেই এগোতে এগোতে বলল, 'গরমে। রোদটা হঠাৎ কেমন চড়চড়ে হয়ে উঠল দেখেছ! আর ড্রাইভ করতেও ভালো লাগছে না।'

চন্দনা যেদিকে, রোদটা সেদিকেই বেশি। তাদের দিকটায় ছায়া। পল্লব ভাবল, চন্দনাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনা যায়। তার আগে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতো দূর?'

'বেশি নয়। মিনিট পাঁচেক। সন্দীপরা বোধ হয় পৌঁছেই গেছে—'

পল্লব আর কিছু বলল না। মনে হচ্ছে সামলে নিয়েছে চন্দনা। আপাতত থাক, যা করার ওখানে গিয়েই হবে।

এই রাস্তাটা কাঁচা এবং সরু। দু' দিকে চাষের জমি কলা আর আম কাঁঠাল দিয়ে ঘেরা। মাটির রাস্তা গরুর গাড়ির চাকায় দেবে গেছে এখানে-ওখানে—তার ওপরেই সদ্য-পড়া মোটরের চাকার দাগগুলো চেনা যায় স্পষ্ট। বেশ কিছুটা রাস্তা সামনে তাকিয়ে দাগগুলো অনুসরণ করল ঈপ্সিতা, ফিয়াটটার দেখা পেল না। দূরে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে পাকা ইঁটের দেওয়াল, মাঠের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিকের লাইন চলে গেছে ওই দিকে। সম্ভবত ওইটাই। দেখতে দেখতে ঈপ্সিতা বলল, 'আমার কিন্তু খিদে পাচ্ছে খুব।'

অশোক হাসল।

'আগেই খবর দেওয়া আছে। ব্রেকফাস্ট রেডি থাকবে—'

'সারা রাস্তা যে-রকম বকরবকর করলি, খিদে পাবারই কথা। তার ওপর যা মুটিয়েছিস! মোটাদের আবার বেশি খিদে পায়!'

খানিক আগেকার অস্বস্তি কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিল ঈপ্সিতা, অসিত উসকে দিল। এখন বলে নয়, গোটা রাস্তাটাই পিছনে লেগে আছে ও। খোঁচা দেবার সামান্য সুযোগও হাতছাড়া করেনি। ঈপ্সিতা বুঝতে পারে কেন ও এ-রকম করছে। পিনাকীর সঙ্গে তার ব্যবহারটা পছন্দ করেনি, হয়তো রেগেও আছে খুব। রজত আর পল্লব যে-রকম চুপচাপ, হয়তো ওরাও ক্ষুব্ধ। ছেলেগুলো চট করে জোট বেঁধে নেয়। এখন যে-কোনোভাবে তাকে যতোটা ছোট করা যায় তাতেই খুশি হবে। এ-রকম হবে জানলে সে কিছুতেই ও-গাড়ি থেকে চলে আসত না—বড়ো জোর চন্দনার সঙ্গে জায়গা বদল করে নেওয়ার কথা ভাবত। তাতেও অখুশি হতো পিনাকী; তবে ব্যাপারটা এমন জানাজানি হতো না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কেন যে সে এই রকম একটা ব্যাপার করল, নিজেই বুঝতে পারছে না এখনো! টুপুরকে নিয়ে শর্মিলার বাড়াবাড়ি দেখে! হতেও পারে! সত্যি, এমন ছটফট করছিল শর্মিলা, যেন টুপুরের জন্যেই এই পিকনিকটা! তা হলে আমাদের গলা বাড়িয়ে ডাকা কেন! তার ওপর হ্যাংলার মতো পিনাকী গায়ে এসে পড়ছে দেখেই কেমন গোলমাল হয়ে গেল সব। পরে অবশ্য ভেবেছিল আড়ালে ক্ষমা চেয়ে নেবে পিনাকীর কাছে—ক্ষমা চাওয়াই তো আর ভালোবাসা দেখানো নয়। এতোক্ষণ ধরে তাই কথা বলে বলে ব্যাপারটা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল; না হলে এতো কথা কবে আর সে বলে! কিন্তু, অসিত যা করছে সেটাও কি বাড়াবাড়ি নয়! অমন সুন্দর ফিগার তার—যে দেখে সেই চেয়ে থাকে, তাকে কি না বলল মোটা! এটা ডেলিবারেট, অশোকের সামনে তাকে ছোট করার চেষ্টা। কাছে থাকলে ঠাস করে চড় বসাত গালে। ছি, ছি; অশোক একটা বাইরের লোক—আজ আছে কাল থাকবে না। সে কী ভাবল!

প্রচণ্ড রাগে মাথার মাঝখান অব্দি শিস উঠে গেল ঈপ্সিতার। গরম হয়ে উঠল কানদুটো। কী করবে না করবে ভেবে ছটফট করতে করতে অশোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখেছেন, কী অসম্ভব বখা!'

অল্প গম্ভীর হয়ে গেল অশোক। যেন শুনতে পায়নি এইভাবে গিয়ার চেঞ্জ করায় ব্যস্ত হলো।

'কথাটা অশোকবাবুকে না বলে আমার বাবাকে বললে বাবা তোকে পেট ভরে খাইয়ে দিত।'

'তার মানে!' বিব্রত গলায় অশোক বলল, 'বেশ তো হচ্ছিল নিজেদের মধ্যে। তোমার বাবা আবার এর মধ্যে এলেন কোত্থেকে!'

'আমার চার দাদার সবাই এতো ব্রিলিয়ান্ট যে বাবা তার ছোট ছেলেটিকে বখা করতে চায়—'

'তুই থামবি, না এক্ষুনি নামিয়ে দেব গাড়ি থেকে!' অসিতের জামার পিঠ চেপে ধরেছে রজত, রীতিমতো অসহিষ্ণু চোখমুখ, 'তোর বাপের খবর কেউ জানতে চায়নি!'

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়ে অসিত বলল, 'রেগে যাচ্ছিস কেন! আমি ঠাট্টা করছিলাম!'

হাতটা সরিয়ে নিল রজত।

'সারাক্ষণ ব্যাজার, ব্যাজার, ব্যাজার ! তোরা যা তা হলে ! আমি নেমে যাচ্ছি—আমার মেজাজ ভালো নেই।'

চেঁচামেচিতে সোজা হয়ে বসেছিল চন্দনা। বলল, 'সত্যি অসিত, কী বল তো তুই !'

'ঠিক আছে, এগ্রিড। আমি ভালো ছেলে হয়ে যাচ্ছি। ঈপ্সিতা, তুই আমার মাথায় চারটে চাঁটি মার—'

বলতে বলতে ঈপ্সিতার কাঁধের কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিল অসিত।

'বালাই ষাট ! একেই অমন নিরেট মাথা। চাঁটি মারলে আরও নিরেট হয়ে যাবে।'

ঈপ্সিতা হেসে ফেলেছিল। গাল ফুলিয়ে অসিতের মাথায় জোরে জোরে তিনবার ফুঁ দিয়ে বলল, 'যা। ক্ষমা করলাম। বোকাটাকে বলিস যেন স্যুইসাইড-টাইড না করে।'

কিছুটা অবাক কিছুটা মজার চোখে যতোটা পারে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল অশোক। চকিত ঘড়ির দিকে চোখ পড়ায় স্পিড বাড়িয়ে দিল।

'ইউ আর এ স্ট্রেঞ্জ লট ! আমরা এ-রকম ছিলাম না !'

'স্ট্রেঞ্জ লট !' পল্লব মুখ খুলল হঠাৎ, 'মানে !'

'আমরা অন্য রকম ছিলাম—'

'জেনারেসান গ্যাপট্যাপ বলছেন নাকি ?' আবার শর্মিলা ঢুকে পড়েছে মাথায়। ঈষৎ তিক্ত গলায় পল্লব বলল, 'ওগুলো ফালতু। বুড়োরা বলে—'

'আমি নিজেদের কথা বলছি—'

এগোল না। কথার মাঝখানেই থেমে গিয়ে বাঁ দিকের গেটের মধ্যে সাবধানে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল অশোক।

সামনে আঙুল তুলে চন্দনা বলল, 'ঐ দ্যাখ—দ্যাখ—'

বাংলো প্যাটার্নের একতলা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফিয়াটটা। আরও কাছে বাগানের ধারে একটা করবী গাছে মুখোমুখি তাকিয়ে দুটো কাঠবিড়ালী—সেদিকে ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে পিনাকী। চন্দনা ওকেই দেখাল। শর্মিলা, সন্দীপ, টুপুর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ফিয়াটের বুটি থেকে স্যুটকেস বের করছে একটা বুড়ো মতন লোক। ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল ছ'সাতটা ঘুঘু।

গাড়িটা ওইখানেই পার্ক করল অশোক। চাবি বন্ধ করে হাসতে হাসতে সটান হাত তুলে দিল ঈপ্সিতার কাঁধে।

'শেষ। আর তো সুন্দরী মহিলার সঙ্গ পাওয়া যাবে না—'

'পুষিয়ে দেবে। সারা দিন তো পড়ে আছে।'

ভুরু নাচিয়ে সলজ্জভাবে অসিতের দিকে তাকাল ঈপ্সিতা।

'আবার !'

রজত নেমে পড়েছিল ততোক্ষণে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দৌড়ে গেল পিনাকীর কাছে।

'ওরা কোথায় রে ?'

ভিউ-ফাইণ্ডারে চোখ রেখে বাঁ দিকে হাত তুলে পিনাকী বলল, 'ওই তো, পুকুরটার দিকে—'

সেইভাবে তাকাল রজত। ওদিকে অনেকগুলো ঝাঁকড়া-মাথা গাছ ডালপালা বাড়িয়ে আড়াল করছে আকাশ। রোদ নেই। দেখল, ছায়ার মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে টুপুর

আর সন্দীপ। ছায়াটা মিশে গেছে ওদের হাঁটার ধরনেও।

রজত এগোতে যাচ্ছিল। কী ভেবে থেমে দাঁড়াল, দৃশ্যটায় চোখ রাখল আবার। ঠিক এমনভাবে এর আগে কোনো দিন টুপুরকে লক্ষ করেনি ও ; টুপুরের শরীর আর ওই হাঁটার ধরনটাও। দেখেনি বলেই এখন কেমন আলাদা লাগছে ! একটু বা অচেনা।

একটুক্ষণ দেখে চোখ দুটো নামিয়ে নিল রজত। আবার তুলল। দু' বগলে কাগজে মোড়া বোতল দুটো নিয়ে অশোকের পিছনে পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে অসিত। ওদের পিছনে ঈপ্সিতা আর চন্দনা। পল্লব আসছে এদিকেই। সম্ভবত সিগারেট চাইবে।

বুকের মধ্যে অল্প চিনচিন করে উঠল রজতের। কিছু না ভেবেই সিগারেটের প্যাকেটটার জন্যে হাত ঢোকাল পকেটে।

॥ পাঁচ ॥

ক'দিন পরে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে অসম্ভব ফাঁকা আর শূন্য লাগতে লাগল রজতের। মাথাটা ভোঁ-ভোঁ, হাত-পাগুলো আলগা আলগা, কিচ্ছু করার নেই—এমনকি গুছিয়ে ভাববার মতো ইচ্ছেটাও হারিয়ে গেছে কোথায় ! এ-রকম বড়ো একটা হয় না কখনো। সাধারণত একটা না একটা কিছু ভাবতে ভাবতে প্রতি রাতে ঘুমোতে যায় সে ; ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে ওঠার পরও সারা দিনের মতো করে গুছিয়ে নেয় নিজেকে। কখনো ছটফট করে জ্বালায়, কখনো শিস দেয় খুশিতে—বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা বলে আপন মনে, কিংবা পড়াশুনার কথা ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয় বইয়ের মধ্যে। এ-সবের কোনোটাই আজ স্পর্শ করল না তাকে। ঢিলেঢালা, অন্যমনস্ক, কিন্তু সত্যিকারের কোনো বিষয় নেই মাথার মধ্যে। যেন ঘুমের মধ্যে শরীরে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে কেউ তার বোধ, স্মৃতি, সক্রিয়তার সবটুকু শুষে নিয়েছে গোপনে।

একটু আগেই চা দিয়ে ঠেলা দিয়ে গেছে কাকিমা। ঘুম ভেঙে বিছানায় কোমর ভেঙে বসে বার কয়েক হাই তুলল রজত। তারপর আবার কিছুক্ষণ জেগে জেগেই গড়িয়ে নিল বিছানায়। ভালো লাগল না। তখন উঠে চটপট মুখ ধুয়ে প্লেট ঢাকা চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিল মেঝে থেকে। বিছানায় বসে প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সব পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে গেল দ্রুত। কোনো খবরটাই আকর্ষণ করল না। আবার প্রথম পাতায় ফিরে আসতে আসতে রজত ভাবল, জীবন এমন একঘেয়ে, কোথাও কিছু ঘটছে না তেমন—তবু খবরের নাম করে বড়ো টাইপে ছোট টাইপে রোজই এমন রাশি রাশি অক্ষর তৈরি হয় কী করে ! কেনই বা হয় ! কী যায় আসে তার পেরুর ভূমিকম্পে বা রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা সফরে, মোহনবাগানের জেতা হারায় বা চিফ সেক্রেটারির অদল-বদল বা গঙ্গায় একটা নতুন জাহাজ ভাসলে। 'সমাজকে ঢেলে সাজাতে হবে—', কে বাবা ! ও, মন্ত্রীর লেকচার ! কারবার দ্যাখো—একটা পুলিস কর্তব্যপরায়ণতার মেডেল পেয়েছে তাও ছেপে দিয়েছে বড়ো বড়ো করে। কিন্তু, বিনা কারণে যখন তাকে টানতে টানতে হাজতে নিয়ে গিয়ে অমানুষের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে রক্ত বের করত পুলিসগুলো, সেটা কই ছেপে বেরোয়নি তো ! যতো সব বুজরুকি ! এই যে হুট করে শর্মিলার সঙ্গে দুর্গাপুরে চলে গেল

টুপুর, কিংবা তার মন খারাপ—শূন্য হয়ে আছে মাথাটা, ভালো লাগছে না কিছুই, খবরের কাগজ তার খবর রাখে না। রাবিশ ! যেখানে থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল ঠিক সেই দিকে তাক করে কাগজটা ছুঁড়ে দিল রজত। পাতাগুলো উড়তে লাগল হাওয়ায়। একটা লুজ পাতা উড়তে উড়তে চলে গেল চৌকাঠ পেরিয়ে।

কাল রাতে ফিরতে দেরি হয়েছে অনেক। বিকেলে কলেজ-ফেরতা সে আর পল্লব গিয়েছিল টুপুরদের বাড়ি। টুপুরের মা বলল, 'ফেরেনি এখনো। ফিরলে তো কলেজেই যেত, তোমরাও দেখতে পেতে।' তারপর যত্ন করে চা আর সিঙাড়া খাওয়াল তাদের। টুপুরদের বাড়িতে কেউ জোরে কথা বলে না। রজত দেখেছে, কেমন একটা মোলায়েম মুখ করে থাকে সবাই, রাগ করে না কখনো। কিন্তু, খুব সুন্দর করে বলা সত্ত্বেও মাসিমার কথাগুলো কেমন গোলমেলে লেগেছিল কাল—'কলেজে যেত' আর 'দেখতে পেতে'র পর নিঃশব্দে তাদের দিকে তাকিয়েছিল আর একটি কথাও, 'তা হলে এতো খোঁজ করা কেন !' রজত জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, দু' দিনের জায়গায় পাঁচ দিন হয়ে গেল, কী এতো বেড়ানো তার দুর্গাপুরে ! পারেনি। টুপুর আর তার মা এক নয়। টুপুর হলে রাগে একটা চড় বসিয়ে দিতে পারত গালে। কিন্তু, এখানে অন্য রকম, চা সিঙাড়া খেয়েই ফুরিয়ে যাবে সব কথা—যেমন এসেছিল তেমনিই চুপচাপ নেমে যেতে হবে সিঁড়ি দিয়ে। তারপর রাস্তা। রাস্তা। ওই একটা জায়গাই যথেচ্ছভাবে সমস্ত আবদার মেনে নেয় তার। কী রে ব্যাটা, রাস্তার ছেলে, চাপা ক্ষোভটা চায়ের সঙ্গে গলা দিয়ে নামাতে নামাতে নিজের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল রজত, খোঁজ পেলি ? এবার ওঠ। দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিতে এসে টুপুরের মা বলল, 'দ্যাখো, আজ সন্ধের ট্রেনে হয়তো ফিরে আসবে।' ইচ্ছার মধ্যে সমস্ত রক্ত জড়ো করে রজত ভেবেছিল, হ্যাঁ, তাই। ফিরতেই হবে।

রাস্তায় নেমে পল্লব বলল, 'রজত, একটা কথা বলব তোকে ?'

পল্লব আজকাল খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে। যতো দিন যাচ্ছে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে আরও। সেদিন পিকনিক থেকে হঠাৎই বাসে চড়ে ফিরে এসেছিল কলকাতায়। সঙ্গে রজতও ছিল ; কিন্তু সে চলে এসেছিল অন্য কারণে—পুরো ব্যাপারটাই বিচ্ছিরি লাগছিল বলে, এমনকি টুপুরকেও ; তা ছাড়া, গোড়া থেকেই তো তার যাবার ইচ্ছে ছিল না কোনো ! চলে যাবে চলে যাবে ভাবছিল, পল্লবই লাটাই ধরিয়ে দিল হাতে। কেন ? ও তো নিজেই গিয়েছিল !

এখনো প্রশ্নটা করল খুব সিরিয়াস গলায়। রজত বলল, 'বল না ?'

'তুই টুপুরের পেছনে ঘোরা ছেড়ে দে—'

কথাটা এমনই হঠাৎ বলল যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জোগাল না মুখে। একটু অপ্রস্তুতভাবে রজত বলল, 'আমি কারুর পেছনে ঘুরি না।'

'জানি, তুই কারুর পেছনে ঘুরিস না। তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সোজা, সবচেয়ে সেনসিবল। তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো। তাই সবাই তোকে পছন্দ করে। তোর একটাই ট্রাবল—তুই নিজেকে বুঝতে পারিস না।'

'সবাই সব কিছু বুঝতে পারে না।'

'হ্যাঁ। কিন্তু টুপুর তোকে টানছে, এটা ভালো নয়। যদিও তুই বুঝতে পারিস না—'

'টুপুর কি খারাপ ?'

'না। তাতে কিছু যায় আসে না।'

পল্লব চুপ করে গেল দেখে রজত বলল, 'বন্ধুত্ব খারাপ কেন !'

'বন্ধুত্ব ! একটা মেয়ের সঙ্গে !' পল্লব হাসল, 'আমি সাত দিন কলকাতায় না থাকলে তুই আমার খোঁজ করতিস না !'

'করতাম।'

'না হয় করতিস ছেলেয় ছেলেয় ব্যাপারটা অন্য।' অল্প থেমে কিছু ভাবল পল্লব। তারপর বলল, 'তুই, টুপুর দু'জনেই অ্যাডাল্ট। ওকে বিয়ে করতে পারবি ?'

'ছাড়। তুই আজকাল খুব বেশি নাটক নভেল পড়ছিস—'

'কথাটা এড়িয়ে যাস না !'

'চাল নেই চুলো নেই, শালা বিয়ের কথা ! ওভাবে মিশি না। ওসব ভাবিও না।'

'তুই ভাবিস না। কিন্তু টুপুর ভাবে, ওর মা ভাবে। এই নিয়ে একটা প্ল্যান-ট্যান চলছে—। আমি বুঝতে পারি।'

'তুই শালা সবজান্তা !'

পল্লবের পিঠে একটা থাপ্পড় বসাল রজত। একটু সরে গিয়ে আবার পাশে ফিরে এলো পল্লব। সিগারেট নিয়ে রজতকে দিল, নিজে ধরিয়ে নিল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দু' দিনের জায়গায় তিন দিন হলে তুই ছটফট করিস, কিন্তু একটা মায়ের কোনো চিন্তা নেই ! এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবি ?'

'চিন্তা নেই এটা ভাবছিস কেন ! আমাদের বলবে ! হয়তো চিঠিফিঠি দিয়েছে—'

রজত থমকে গেল। পল্লব যেভাবে ভাবছে সে সেভাবে ভাবে না। এতো ভাবারই বা আছে কী ! একটা মেয়ে বিয়ে করলে করতেই পারে। টুপুরও পারে। কিন্তু, টুপুরকে সে চেনে—সে-রকম কোনো ব্যাপার থাকলে নিশ্চয়ই জানাত তাকে। সে কি ঝামেলা করত, না বলত ! একটু কষ্ট হতো হয়তো—যেমন হচ্ছে এখনো, টুপুর যে তার অনেকটা ! কিন্তু, সেটা তো শেষের ব্যাপার। তেমন তেমন হলে মন খারাপ করবে কিছু দিন, তারপর সহ্য হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তার চেয়েও আরও বড়ো কষ্ট নিয়ে এখনো কি প্রতিদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে না সে !

রজত বলল, 'তুই বলছিস বল, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটার কোনো গুরুত্ব নেই।'

'তা হলে ভালোই—'

পল্লব চুপ করে গেল। সিগারেটটা মুঠো করে ধরে টানছে ঘনঘন—থামছে, যেন জুত হচ্ছে না তেমন, একটা পুরো আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া এখন টেনে নিতে চায় বুকে। ওর অস্থির ভাবটা লক্ষ করতে করতে হাঁটতে লাগল রজত। মনে হচ্ছে পল্লব একটা ধন্দের মধ্যে পড়েছে—এতোক্ষণ টুপুরকে নিয়ে যা বলল সে-সবও উঠে এলো সেইখান থেকে। ও দ্বিধায় থাকল।

সিগারেটটা টোকা মেরে রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়ে রজতের দিকে তাকাল পল্লব।

'তোকে একটা কথা বলিনি। কাউকেই বলিনি অবশ্য—'

'কী ?'

'আমি সেদিন শর্মিলাকে চুমু খেয়েছি—'

রজত একটা ধাক্কা খেল। বন্ধুদের মধ্যে এই প্রথম সে এ-রকম একটা অভিজ্ঞতার কথা শুনছে। চেটোর তলায় দেশলাইয়ের আগুন জ্বেলে ধরলে যেমন তাপ ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতিতে, তেমনি একটা উত্তাপ ছুঁয়ে গেল তাকে। আরও কয়েক পা এগিয়ে গিযে জিজ্ঞেস করল, 'কবে ?'

'পিকনিকের দিন।'

'গুল।'

'আপন গড় বলছি।' পল্লব ওর কাঁধ ছুঁলো। মুখে হাসি নেই একটুও, বরং কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল দুটো। তারপর বলল, 'কিছু ভেবে করিনি। তোরা সবাই মাঠের দিকে ছিলি, অশোকও। আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে একটা ঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ছে শর্মিলা। আমার কী হয়ে গেল হঠাৎ, ঘরের মধ্যে ঢুকে জাপটে ধরলাম ওকে। আমার মাথার মধ্যে আগুন ছুটছে তখন। শর্মিলা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কী করছিস! আমি বললাম, ধৃতিকান্ত যা করেছিল, অশোক যা করে। তারপরেই ওর মুখের ওপর মুখ নিয়ে গিয়ে চেপে ধরলাম ঠোঁট দুটো। শর্মিলা বাধা দিল না, জিব ঢুকিয়ে দিল আমার মুখে। ওর বুক দুটো ঘষে যাচ্ছিল আমার বুকে। আমার ভীষণ ভয় লাগছিল। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি, শর্মিলা ডাকল। শাড়ির আঁচল ঘষে ঘষে ও তখন ঠোঁটের কষ তুলছে; এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, লক্ষ্মী সোনা, কাউকে বলিস না প্লিজ, তা হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি তখন হাঁ, শরীরের ভিতর রক্তটা ফুটছে টগবগ করে, আরও কিছু করতে ইচ্ছে করছিল। শর্মিলা এগিয়ে এসে বলল, কথা দে, বলবি না কাউকে! আমি বললাম, ঠিক আছে। শর্মিলা বলল, চলে যা, এক্ষুনি চলে যা। কেউ এসে পড়বে—'

পল্লব এমনভাবে থামল, যেন এইমাত্র হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে আসছে শর্মিলার ঘর থেকে। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'একটা সিগারেট দে তো!'

'কারবার!' রজত বলল, 'সেই জন্যেই পালিয়ে এসেছিলি? ভয়ে?'

'ভয়ে নয়, ঘেন্নায়। আমি দেখলাম তারপরেও খুব স্বাভাবিকভাবে ঘুরছে শর্মিলা, হাসছে, কথা বলছে। দূর থেকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকালেও অ্যাভয়েড করছিল আমাকে। তখন থেকেই আমার মনে হতে লাগল জানাজানি হবার ভয়টাই ওর সব। না হলে ও যা-তা করতে পারে। নিজের ওপর বা ওর স্বামীটার ওপর কোনো শ্রদ্ধা নেই। মেয়ে জাতটাকে চেনা যায় না মাইরি!'

'যায়। সবাই তোর শর্মিলা নয়, সবাই এক রকম নয়। তা ছাড়া—', দৃঢ় গলায় বলল রজত, 'দোষটা তোর। তুই ওর ঘরে ঢুকেছিলি, ওকে জাপটে ধরেছিলি। ও তোকে ডাকেনি। আমি ওর দোষ দেখি না—'

'ও বাধা দিতে পারত, চ্যাঁচাতে পারত—'

'তা হলে তুই এখন গপ্পো মারতে পারতিস না—চোয়াল ভেঙে পড়ে থাকতিস হাসপাতালে। ও ঠিকই করেছে। কোনো ঝামেলায় যেতে চায়নি। তুই শালা ন্যাকামি করিস না!'

'তুই সবাইকেই টুপুর ভাবিস! কিন্তু তুই নিজে কতোটা চিনিস টুপুরকে?'

'যা চিনি তাতেই হবে—', হঠাৎ কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রজত, চোখ পাকিয়ে তাকাল পল্লবের দিকে, 'তুই কী বলতে চাস বল তো?'

পল্লব একভাবে উঠেছিল, রজতকে বেঁকে দাঁড়াতে দেখে চুপসে গেল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধরে ফেলল রজতের।

'তুই রাগ করছিস! টুপুর খারাপ হবে কেন! আমি বলছি টুপুর যদি হঠাৎ বিয়েটিয়ে হয়ে চলে যায়—'

'যায় যাবে।' ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রজত। বলল, 'কবে পান্তা ভাত খাবো তার নেই ঠিক, এখন থেকে নুন জোগাড় করে রাখো!'

পল্লব চুপ করে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ হাসি ফুটে উঠল মুখে। তারপরেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগল হো-হো করে।

'হাসছিস কেন! আ-রে!'

'ওই কথাটা—নুন জোগাড় করো। হাঃ—হাঃ—হাঃ—'

আশেপাশের কিছু লোক যেতে যেতে তাকাচ্ছে তাদের দিকে; অমন পাগলের মতো পল্লবকে হাসতে দেখে হেসেও ফেলছে কেউ কেউ। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। অপ্রতিভভাবে ওর হাত ধরে টানল রজত।

'চল, চল! হাসবি পরে—'

'ওফ্, পেট ফেটে যাবে! ছাড়লি একখানা বম্‌শেল!' ঝুঁকে, হাঁটু চেপে ধরে নতুন করে আসা হাসির বেগটা চাপা দিল পল্লব, 'কার কথা রে? গান্ধীর নাকি? লবণ আন্দোলনের সময় বলেছিল?'

'না। আমার বাবার। মাকে বলত।' রজত বলল, 'দিদির যখন দশ বছর বয়েস, তখন থেকেই মা বিয়ের জোগাড় করতে বলত, বাবাও রেগে যেত—'

'তোর বাবা একটা জিনিয়াস।' পল্লব বলল, 'ঠিকই বলেছিস তুই। আমাদের অবস্থাটাও তাই, বুঝলি, শুধু নুন জোগাড় করে যাচ্ছি—। কী লাভ! যে যেখানে যায় যাক। দেখিস, সময় এলে আমরাও লাট্টু ঘোরাব। ভাবলেই তো মন খারাপ!'

চা-টা ঠাণ্ডা। এক চুমুকেই শেষ করে রজত ভাবল আর এক কাপের জন্যে কাকিমাকে বলবে কি না। মাথাটা ধরে আছে; কাল বিকেল আর সন্ধের কথাগুলো মনে পড়ছে ঠিকই—কিন্তু আর কোনো জুত নেই কোথাও! মনে পড়ছে, পল্লবের খেয়ালে তারপর ওরা একটা এয়ার-কণ্ডিসান করা সেলুনে ঢুকেছিল—চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে, কফি খেয়ে, সিনেমা দেখেছিল নাইট শোয়ে। বাড়ি ফিরে ঘুম। এখন, এই সকালে, আর ভালো লাগছে না কিছু। গা জুড়ে আলস্য, নিজেকে নিয়ে এগোনো যাচ্ছে না কোথাও; যেন এখনো দাঁড়িয়ে আছে সিনেমায় দেখা দি এন্ড-এ—এরপর যেতে হলে পিছোতে হবে শুধু!

পুরো বিরক্তিতে একটা সিগারেটের প্রয়োজনে আঁকুপাঁকু করে উঠল শরীর। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ার টেবিলের দিকে ছুটে গেল রজত, চারমিনারের প্যাকেটটা তুলে নিল হাতে। খালি। খালি কেন! কখন খেয়ে ফেলল শেষ সিগারেটটা! রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় অবস্থা বুঝে দু'চারটে কিনে রাখে, কাল কি তার কিছুই মনে পড়েনি! ধুত্ শালা! শূন্য প্যাকেটটা দুমড়ে মুচড়ে গোলা পাকিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলল রজত, তার ওপরেই লাথি কষাল একটা—গোটা দুনিয়াটাই বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে তার সঙ্গে, এক্ষুনি একবার বেরিয়ে গিয়ে সিগারেট না কিনলে মরে যাবে।

দেওয়ালে টাঙানো ব্রাকেট থেকে গত রাতে পরা শার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে গলিয়ে নিল রজত, বোতাম লাগাতে গিয়ে দেখল দুটো ছাড়া সব বোতামগুলোই ছেঁড়া। রাগটা বেড়ে গেল। বোতামের ঘরে আটকে থাকা বাসি সুতোয় টান দিয়ে রজত ভাবল, পল্লব ঠিকই বলেছিল। একটা চিটিফিটি লিখলে কি হাতে ফোঁড়া গজাত! সেদিন তো খুব ন্যাকামি করে করে বলে গেলি মোটে দু' দিন! ঠিক আছে, ফিরে আয়, কীভাবে রগড়ানি দিতে হয় আমি জানি। এইভাবে তার ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল অল্প। মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে দ্রুত

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শম্ভুনাথের ঘরের জানলা বন্ধ। বারান্দায় রে ..ছে, কিন্তু সমস্ত বাড়ি জুড়ে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রজত ডাকল, 'কাকিমা ?' সাড়া পেল না। তখন আবার ডাকল, 'ও কাকিমা— ?'

শোবার ঘর থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলো সুধা।

'তুই উঠেছিস ?'

'আমি একটু বেরুচ্ছি—'

'কোথায় ?'

কাকিমার মুখে একটা ছায়া, কিসের বোঝা যায় না। একটু তাকিয়ে থেকে রজত বলল, 'কাছেই। এখুনি ফিরে আসব। দরজাটা লাগিয়ে দাও—'

'একটা ওষুধ এনে দিবি ?'

'কার ?'

'তোর কাকার—'

আবার সুধার মুখের দিকে তাকাল রজত। এসব মুহূর্তে কী করতে হয়, কী বলতে হয়, সে ঠিক জানে না। কেমন খাপছাড়া লাগে নিজেকে। ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, 'দাও—'

'একটু দাঁড়া, বাবা। আমি প্রেসক্রিপসানটা এনে দিচ্ছি—'

রজত ফিরে এলো। পা ঝুলিয়ে বসল বিছানায়। মন ছেয়ে যাচ্ছে গ্লানিতে। কেমন মানুষ এরা, ভাবল, বাড়িতে থেকেও সে নেই—সে-জন্যে শাসন নেই কোনো, একটা ওষুধ আনতে হলেও এমনভাবে বলে যেন দয়া চাইছে ! অথচ সে এদেরই আশ্রিত ! আমি কি স্বার্থপর, না অমানুষ হয়ে যাচ্ছি দিন দিন, রজত ভাবল। হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন টিউসান নিয়ে কথা কাটাকাটির পর শম্ভুনাথের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি সে, কথাও বলেনি। এটা কি ঠিক হয়েছে !

অল্প অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রজত। চৌকাঠের ওপর কাকিমার পা পড়তে খেয়াল হলো।

প্রেসক্রিপসান আর কুড়িটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে সুধা বলল, 'এক দোকানে না পেলে একটু ঘুরে দেখিস—'

'এ তো সেই হার্টের ট্যাবলেটটা দেখছি !' কাগজটায় চোখ বুলিয়ে রজত বলল, 'কী হয়েছে ?'

'সেই বুকে ব্যথা। কাল সারা রাত ঘুমোতে পারেনি।'

'তোমরা কীরকম বুঝি না ! আমাকে ডাকলে পারতে—'

রজতের গলায় অভিমানের সুর। সুধা এগিয়ে এলো কাছে। অল্প হেসে বলল, 'আচ্ছা এবার ডাকব—। তুই তো ফিরলিই অতো রাত্রে. খেলিও না ভালো করে !'

'যতো বাজে ব্যাপার তোমাদের !' আক্ষেপে মাথা নাড়ল রজত, 'এখন কি ঘুমোচ্ছে ?'

'না। শেষ রাতে ঘুমিয়ে ছিল। এখন আবার উঠেছে—। বোতামগুলো ছিঁড়লি কবে ?'

'ও কিছু নয়—'

শার্টের খোলা জায়গাটা হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল রজত।

সুধা বলল, 'কাল তোর বাবা এসেছিলেন।'

'কখন ?'

'বিকেলে। এই নিয়ে দু' দিন তোর সঙ্গে দেখা হলো না।'

'চিঠি দিয়ে এলেই পারে। আমি কি হাত গুনব!'

'ছেলের কথা শোনো! এভাবে বলে?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সুধা। মায়া-মাখানো হাসি—বুক ছুঁয়ে যায়, অর্থ বোঝা যায় না তবু। রজত চোখ নামিয়ে নিল।

'তোর বাবা যে এতো চিঠি লেখেন, একটারও জবাব দিস? কেমন ছেলে তুই!'

'ওসব বোলো না আমাকে। কী লিখব! শ্রীচরণেষু লেখার পর আর কিছু মনে আসে না—'

'ছি, রজত! বুড়ো মানুষ, তোর জন্যে ছুটে আসেন বারবার, কষ্ট হয় না! মাকেও তো লিখতে পারিস! দু'একদিনের জন্যে ঘুরে আসিস না কেন!'

'যাবো। কলেজ বন্ধ হলে যাবো।' ছটফট করে উঠে দাঁড়াল রজত; অপরাধীর গলায় বলল, 'চলো, কাকাকে দেখে আসি একবার—'

'জামাটা খুলে দে। আমি বরং বোতামগুলো বসিয়ে দিই চটপট।'

জামাটা খুলে দিয়ে শম্ভুনাথের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে এতোক্ষণের ভাবনাগুলো সব কেমন গুলিয়ে গেল রজতের। এইমাত্র অনেকগুলো কথা বলেছে সুধাকে, একটু বা অনুযোগের সুরে—অভিমানও করেনি কম। হাসিমুখে সব মেনে নিল সুধা, হাসিমুখে জবাব দিল, যেন শম্ভুনাথের অসুস্থতার খবরটা তাকে না জানিয়ে ভুল করে ফেলেছে। যদি এমন হতো, কিছু বলত না সুধা, সে-ও জানতে পারত না কিছু, রোজই যেমন চান-টান করে বেরিয়ে যায় তেমনি বেরিয়ে পড়ত আজও—আর ইতিমধ্যে ঘটে যেত যে-কোনো অঘটন, তা হলে শম্ভুনাথের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কী জবাবদিহি করত সে! আমাকে জানানো হয়নি? মৃত্যুর আগে শম্ভুনাথ কি ভেবে যেতেন, চারিদিকে অবাঞ্ছিত যে-ছেলেটিকে আশ্রয়ের আড়াল দিয়ে এতো দিন বাঁচিয়ে রাখলেন তিনি, তাঁর জন্যে সে কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি! এইভাবে, যার উদ্দেশে শ্রীচরণেষু পর্যন্ত লিখে বারবার থেমে যায় সে, এগিয়ে যাবার ভাষা পায় না কোনো—প্রত্যক্ষভাবে না হলেও একটা তাচ্ছিল্যে ভরে ওঠে মন, কোন প্রত্যাশায় বৃদ্ধ সেই মানুষটি প্রায় একই ভাষায় সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে সপ্তাহে দু'টি করে চিঠি পাঠায় তাকে? কী বোঝাতে চায় ওই সাদামাঠা অর্থহীন সুখ-দুঃখের কথা সাজিয়ে? তার কি ক্লান্তি নেই কোনো, কিংবা জবাব পৌঁছয় না বলে কোনো অভিমান বা অপমানবোধ? অনেক দিন হলো চিঠিগুলো উল্টেপাল্টে দেখে অবহেলায় সরিয়ে রাখে রজত। দ্বিতীয়বার মনেও পড়ে না সেগুলোর কথা। তারপর নিঃশব্দে হারিয়ে যায় কোথায়! এইভাবে, যদি হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে যায় চিঠি আসা, একবারের জন্যেও কি তার মনে হবে, কিছু একটা থেমে গেল, বন্ধ হয়ে গেল চিরকালের মতো! এই যে শ্রীচরণেষু কথাটা ভেবে যায় সে, তারই বা মানে কী? অভ্যাস?

উর্ধ্বশ্বাস টেনে ক'মুহূর্ত নিঃশ্বাসটা বুকের মধ্যে ধরে রাখল রজত, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বাবার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করল। তারপর মার। অস্পষ্ট আদল ভেসে উঠল চোখে—ক্রমশ আরও খানিকটা। তবু ধরা পড়ল না এই মুহূর্তে হাসলে বা দুঃখিত হলে ঠিক কীরকম দেখতে হবে তাদের! এই মুহূর্তে তার যেমন হঠাৎ মনে পড়ল তাদের কথা, অতো দূর দূরত্ব থেকে তাদেরও কি মনে পড়ছে তার কথা! নাকি সেখানেও সেই অস্পষ্টতা—নিষ্পত্র গাছের মতো একটা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকে সারাক্ষণ, পাতা নড়ে

না, ছায়াও ছড়ায় না। হঠাৎ মনে পড়ে যায় বাবার সঙ্গে শম্ভুনাথের এখানে উঠে আসার প্রথম দিনটি। তার আগের দিন রাতে বাবা আর দাদায় কী কথা হয়েছিল সে জানত না ঠিক, তখনো এতোটা হয়ে ওঠেনি। ভোর না হতেই তাকে নিয়ে ট্রামে উঠেছিল রোগা, লম্বা কুঁজো হয়ে যাওয়া লোকটি। হাতে ডাঁটি-বাঁকানো পুরনো ছাতা, পায়ে কাদা-শুকনো রবারের জুতো, সাবানকাচা পাঞ্জাবিতে শ্রী নেই কোনো। হাঁটছিল জোরে জোরে, অকারণ, যেন খুব দেরি হয়ে গেছে। না-রোদ সকালে তাকে ছাতার নিচে টেনে নেবার সে কী চেষ্টা! আত্মস্থ, মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করে বলছিল, এতো বড়ো সংসারে জায়গা হবে না একটু! সবাই কি আর ফেলে দেয়। শম্ভু নিশ্চয়ই রাখবে। নিজেকেই বলা—বড়ো অসহায় অথচ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সেই গলা—যেন ভেঙে গেছে পারাপারের সেতুটা, তবু যেতেই হবে, তাই সাঁতার না জেনেও শুধু প্রার্থনায় ভর করে খলবলে জলস্রোতে নেমে পড়েছে বাবা!

হাতটা ব্যথা করতে শুরু করেছে আবার, সিরসির করে উঠল চোখের তল। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রজত ভাবল, আজই বাবাকে চিঠি লিখবে একটা—যে-কোনো চিঠি, যদিও বিষয়টি জানা নেই তার।

পিঠের পিছনে উঁচু করে বালিশ দেওয়া, বিছানায় আধশোয়া হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন শম্ভুনাথ। বিবর্ণ মুখে রাত জাগার ক্লান্তি। গেঞ্জি-পরা বুকটা ওঠানামা করছে অল্প। কেন জানে না, লোকটির সামনে এলেই আড়ষ্ট বোধ করে সে, সঙ্কোচে কুঁকড়ে যায় শরীর। এখনো ডাকবে কি ডাকবে না ভেবে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। তারপর ডাকল, 'কাকা!'

চোখ খুললেন শম্ভুনাথ, আধখোলার মতো করে। আবার বন্ধ করে আবার খুললেন—যেন বহু কালের ঘুম টানছে তাঁকে, চেষ্টা করছেন জড়তা কাটিয়ে উঠতে। চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন বন্ধ জানলাটার দিকে।

'বুকের ব্যথাটা নাকি আবার শুরু হয়েছে?'

'জানলাটা খুলে দিতে পারো?'

বিছানায় হাঁটু ভেঙে উঠে জানলাটা খুলে দিল রজত। আলোয় ভরে উঠল ঘরটা। রোদে শুকনো বালির মতো চিকচিক করছে শম্ভুনাথের গালের কুচি-কুচি দাড়ি। অলস চোখদুটো তুলে এবার তাকালেন সোজাসুজি।

'কে বলল? কাকিমা?'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল রজত।

শম্ভুনাথ বললেন, 'চিন্তা কোরো না। আমার কিছু হবে না—'

'একটা ই-সি-জি করালে হতো না!' ইতস্তত করে বলল রজত, 'ডাক্তারকে খবর দেব?'

'এখন থাক। ওষুধটা খাই—পরে দেখা যাবে।'

লোকটা এই রকমই। গোঁ ছাড়েন না। অসুস্থতাকেও পরাজয় ভাবেন। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে এখন কী বলবে ভেবে পেল না রজত! এমনকি চলে যাবে কি না, তাও নয়। শুধু বুঝতে পারছে সোজা তার দিকে তাকিয়ে আছেন শম্ভুনাথ। মাথা তোলা যায় না।

'তুমি কেমন আছো?'

'ভালো—'

থেমে গিয়ে বাইরে তাকালেন শম্ভুনাথ। রোদ দেখছেন। এমনও হতে পারে দৃষ্টিটা

উপলক্ষ, এর পরের কথাটির জন্যে শব্দ খুঁজছেন তিনি। এবার চলে যাবে কি না ভাবল রজত। পারল না। এই পরিস্থিতিতে যাওয়া না যাওয়াটা যেন সম্পূর্ণই নির্ভর করছে শম্ভুনাথের কথার ওপর।

'কাল তোমার বাবা এসেছিলেন—'

রজতের অস্বস্তি লাগল। এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভালো হতো। এখন আর পারা যাবে না। সময় নিয়ে চোখ তুলল সে।

'কিছু বলছিল ?'

'না।' আবার জানলার দিকে। আলোও কখনো কখনো মলিন করে দেয় মানুষকে। সেদিকে তাকিয়েই বললেন, 'ক্রন্দন করছিলেন—'

'কেন ?'

'জানি না।' এই স্বরটাই স্বাভাবিক। দু' হাতে মাথার মাঝামাঝি চুল চিরে দু' দিকে নামাতে লাগলেন শম্ভুনাথ। একটু বা উত্তেজিত। খানিক পরে বললেন, 'তোমার জন্মের আগে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে পৃথিবীতে, সেগুলো জানলে বুঝতে—'

'আমি এসব বুঝি না।' প্রায় ভয় পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রজত, 'কান্নাকাটি আমার ভালো লাগে না। আছেই বা কী !'

'যে-মানুষ কাঁদতে এসেছে সে কাঁদবেই।' শম্ভুনাথের গলা ভারী হয়ে এলো, 'বাপ হয়েছেন, কাঁদবেন না !'

'আমার জন্যে ?' মরিয়া হয়ে রজত বলল, 'আমি তো খারাপ নেই—'

'এ-কথাটা তুমি তাঁকে বুঝিও।'

আবার মাথার চুলে হাত নিয়ে গেলেন শম্ভুনাথ। ঈষৎ লালচে হয়ে উঠছে মুখ—সম্ভবত জোর করে চাপতে চাইছেন কোনো আবেগ, কোনো কথা।

রজত একটা সুযোগ পেল।

'বুকে ব্যথা। এতো কথা বলবেন না। আমি যাচ্ছি—'

বলতে বলতেই বেরিয়ে যাচ্ছিল রজত। শম্ভুনাথ ডাকলেন, 'শোনো—'

রজত ঘুরে দাঁড়াল।

'এদিকে এসো। আমার কাছে।'

হাত বাড়িয়ে ওর কব্জিটা একবার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেন শম্ভুনাথ। ছেড়ে দিলেন আবার। রজতের মনে হলো জ্বরও আছে। কাছে ডাকার রহস্য বুঝল না।

'অসুস্থ না হলে আমিই তোমার কাছে যেতাম। কয়েকটা কথা বলার ছিল—'

আবার চুপ করে গেলেন শম্ভুনাথ। একটু পরে বললেন, 'তোমার দাদার অ্যালাউন্স না কী একটা কাটা গেছে, মাসে মাসে তোমাকে টাকা দিতে অসুবিধা হচ্ছে। তুমি আর ওর কাছে নিও না। এখন থেকে আমিই তোমাকে দেব টাকাটা। তোমার চিন্তা করার কিছু নেই—'

কথাগুলো আলাদা আলাদা করে কানে তুলল রজত, তারপর ভুলে গেল। কী যেন একটা হতে থাকল মাথার ভিতর। অবর্ণনীয় এক রকম অনুভূতিতে শরীর কাঁপিয়ে সে তাকিয়ে থাকল শম্ভুনাথের বালি-লাগা মুখের দিকে। ক্রমশ ভিজে এলো চোখের পাতা। কান্না সে একদম পছন্দ করে না—এটা ভাবতে গিয়ে, নিজেকে নিরস্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, টপটপ করে জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে।

'তুমি তোমার বাবার স্বভাব পেয়েছ ! সহজেই কাতর হও । এসব আছেই—', আবার হাত বাড়িয়ে রজতের কব্জিটা ধরে ফেললেন শম্ভুনাথ । শান্তভাবে বললেন, 'আমি এখনো অনেক দিন বাঁচব—আমি তোমার ভালো দেখে যাবো—'

চোখটা মুছে নিল রজত । তবু বেশ কিছুক্ষণ একটা লালচে আভা লেগে থাকল চোখে । এই চোখে দেখলে এখন সবই অন্য রকম লাগছে । ক্রমাগত গতি বদল করছে নিঃশ্বাস । একটা বড়ো কিছু ঢুকে গিয়ে ভরতে ভরতে খালি করে যাচ্ছে বুক । সেখানে হাত বুলিয়ে দেখল বোতামের ঘরগুলো খালি নেই আর । শরীরের এই স্বাদ, মাথার ভিতরের এই সব অনুভূতি নিয়ে ইচ্ছে করে কোথাও মাথা পেতে রাখতে । অনেক, অনেকক্ষণ । বুঝতে পারে নিজের বোধ আর অনুভবগুলো নিয়ে একা-একা হাঁটতে পারে না কেউ—এলোপাথাড়ি হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস । এতো দিন হয়ে গেল, আমার কথা তোর মনে পড়ে না, টুপুর ? কী পেয়ে গেলি সেখানে ! ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরাল রজত, হাঁটতে লাগল অন্যমনস্ক । রোদের ভিতর দিয়ে এখন অনেক দূর অব্দি দেখতে পায় সে । গাছগাছালির ভিড়ে সেখানে আড়াল হয়ে থাকে রোদ—ছায়ার ওপর দিয়ে নিঃশব্দ হেঁটে যায় দুজন ।

সকালের ভোঁতা, কিছু মনে-না-পড়া ভাবটুকু আর নেই । ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়েছে মায়াময় আলস্য—গ্রহণ করবার জন্যে প্রখর হয়ে আছে অনুভূতিগুলো । একই সময়ে কেমন পলকা লাগছে নিজেকে—যেন সে যা ছিল তা নেই আর, যেখানে ছিল সেখান থেকে চলে এসেছে অপরিচিত কোনো জায়গায় । এখানে সবই ভেজা-ভেজা । অনেক দিন পরে দয়ামায়ার ছোঁয়াটাকে বৃষ্টিভেজা জামার মতো গায়ে জড়িয়ে নিল রজত । বড়ো দুঃখী মনে হলো নিজেকে । বেঁচে থাকার প্রয়োজনগুলো যে কেড়েকুড়ে নিতে পারে না, প্রতি পায়ে নির্ভর করতে হয় কারো না কারো দয়ার ওপর—একটি সঙ্গের জন্যে কাতর হয়ে অপেক্ষা করতে হয়, দুঃখী ছাড়া সে আর কী ? অথচ সে কি এমন হতে চেয়েছিল, কোনো দিন বুঝতে পেরেছিল এ-রকম হবে ! ঠেকে ঠেকে যে-অবস্থাটা সহ্য হয়ে আসছিল ক্রমশ, কেন মনে হচ্ছে আবার তাতে একটা ওলটপালট হবে ! আজ সকালে কি আবার উড়োচিঠি পেয়ে গেল সে ?

কাছাকাছি ওষুধের দোকানে ট্যাবলেটটা পেল না । প্রেসক্রিপশনে চোখ বুলিয়ে কাউন্টারের লোকটি পত্রপাঠ বিদায় করতে চাইল তাকে—'সাপ্লাই নেই, দেখুন আর কোথাও পান কি না !'

কাগজটা ভাঁজ করে পকেট রাখতে রাখতে রজত দেখল কাউন্টারের পাশে টেবিলের ওপর চকচক করছে টেলিফোন । মনে হয় এইমাত্র ঝাড়ামোছা হয়েছে, সারা রাত বিশ্রামের পর এখন আবার বিনিময়ের জন্যে তৈরি । ডায়াল করলেই রিং হবে । তারপর ওপাশ থেকে—

'একটা ফোন করতে পারি ?'

লোকটি একইভাবে বলল, 'চাবি নেই—'

বুঝতে সময় লাগল । কাগজ পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকটি, উদাসীন মুখ, আর একবার অনুরোধ করলে হয়তো বলবে, সাপ্লাই নেই । অন্য সময় হলে রজত বলতে পারত, ধাপ্পা ! আমার চোখ নেই ! হয়তো ধমকেই কাত হয়ে যেত লোকটা । কিন্তু এখন সে দেখছে লালচে দৃষ্টিতে, ভিজে নবম হয়ে আছে গা, ইচ্ছে করলেও বেঁকে দাঁড়াতে পারবে না ।

মুচকি হেসে বেরিয়ে এলো রজত। যে করেই হোক শম্ভুনাথের ওষুধটা জোগাড় করতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। কাছেপিঠে টেলিফোন না পেলে হয় পোস্টাপিসে, না হয় চলে যেতে হবে অনীশদার বাড়ি। অফিসের কাজে দিন দুয়েক হলো দিল্লি গেছে অনীশদা, শিখা বউদি একা—তার ওপর শুনেছিল শরীর ভালো নয়। যাওয়া দরকার। কালই যেতে পারত, পল্লবের সঙ্গে সেলুনে ঢুকে আর নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল বেমালুম। সাপ্লাই নেই বলতে কী বোঝায়! যদি একেবারেই পাওয়া না যায়? তা হলে বাড়ি না ফিরে এক্ষুনি ছুটতে হবে ডাক্তারের চেম্বারে, বদলে নিতে হবে প্রেসক্রিপসানটা। তাতে একটু দেরি হবে। তা হোক, ওষুধটা চাই-ই।

সামনে ইউনিক ফার্মেসি। এখনই বেশ ভিড়। ওষুধটা চাইবার আগেই কাউন্টারে মাথা গলিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল টেলিফোন আছে কি না। নেই। ওষুধটা পেয়ে গেল। যাক, দেরি হবে না। প্রেসক্রিপসানটা জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে করতে রজত ভাবল, এখনই একবার চলে যাবে নাকি অনীশদার বাড়ি? না, থাক। পাঁচ দিন পারলে আরও কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই পারবে।

ওষুধটা নিয়ে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল কানে। একটুও দেরি না করে ছুটে গিয়ে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল রজত।

'একটা ফোন করতে পারি?'

লোকটি তাকাল, ঠিক ততোক্ষণ, যার মধ্যে যে-কোনো উত্তর ভেবে নেওয়া যায়।

'কথা বলছে। অপেক্ষা করতে হবে।'

'ঠিক আছে—'

'খুচরো আছে? পঞ্চাশ পয়সা?'

রজত ঘাড় নাড়ল। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ। লোকটি বলল, 'যান—'

কাউন্টারের পাশ দিয়ে ডক্টর-মার্কা ঘরে ঢুকে ঝপ্ করে রিসিভারটা তুলে নিল রজত। হাতটা কাঁপতে লাগল অল্প। যাক, এনগেজড্ নয়। পৃথিবীর মধুরতম শব্দটি ভেসে এলো কানে। রিং হচ্ছে।

'হ্যালো—'

'টুপুর আছে?'

'ও তো ফেরেনি—'

'ফেরেনি!'

'না। তুমি কে?'

জবাব না দিয়ে রিসিভার-ধরা হাতটাকে দূরে নিয়ে গেল রজত। এক মুহূর্ত। তারপর নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল জায়গা মতো। পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। চারিদিকে সাইলেন্স টাঙানো। নিঃশব্দে। রাস্তা পার হলো। নিঃশব্দে। আর একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে ফুটপাথের পানের দোকানের সামনে দড়ির আগুন দেখতে পেয়ে মনে মনে হাসল সে। দেশলাইও শব্দ করে।

যাক। নিঃশব্দে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে রজত ভাবল, শম্ভুনাথের বুকের ব্যথাটা তো কমুক। কতো দায়িত্ব তাঁর—বেঁচে থাকা জরুরী। তার ভালো দেখার জন্যে এখনো অনেক দিন বেঁচে থাকবেন শম্ভুনাথ। এখন থেকে মাসে মাসে ষাট টাকার দায় বেড়ে গেল কাকার। মাসে মাসে ষাট টাকার দায় থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে দাদা। একেবারে ক্লাস টুয়ের অঙ্ক।

ষাট। ষাট ! হাতে রইল'র ঝামেলাটুকু পর্যন্ত নেই। তার আড়ালে কতো সহজে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। তাকে নিয়েই সব—অথচ এসব ডিসিসানের কোথাও সে নেই। ষাটে ষাট, মেলালেই হলো। আচ্ছা তো, এর জন্যেই সক্কালবেলায় জহর গাঙ্গুলির স্টাইলে নাটক করে গেল লোকটা ! জানলাটা খুলে দাও, কাছে এসো, তোমার জন্মের আগে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে পৃথিবীতে—অ্যাঁ ! শুনে সেও ঝপাঝপ জল বের করল চোখের ! এ তো শালা জেনারেসার গ্যাপের ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য ! ফিল্‌ম্-টিল্‌ম্ হয়ে যাবে নাকি !

ট্যাবলেটের স্ট্রিপটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে হাত নিসপিস করে উঠল রজতের। কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে। খলবলে একটা হাসি উঠে এলো গলায়। নিঃশব্দে। পল্লব শালা ঠিকই বলেছিল, বাপটা একটা জিনিয়াস। পয়লা নম্বরের ফক্কিবাজ—কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো চোখের জল ফেলে যায় গোপনে। কী যেন ডায়লগটা ? যে-মানুষ কাঁদতে এসেছে, সে কাঁদবেই ! কী ডায়লগ মাইরি, শরৎচন্দরকেও ছাড়িয়ে যায় ! আমার জন্যে ? কাঁদবেই যদি, তা হলে বাপ হতে গিয়েছিলে কেন ? কে বলেছিল জন্ম দিতে ? তখনই নুনের জোগাড় করে রাখোনি কেন ! আরও তো অনেক বাপ আছে, কারুর ছেলেরই ভাগ্য তো ষাট টাকার নাটকে দাঁড়িয়ে থাকেনি ! তুমি দায়ী, তুমিই কালপ্রিট। শুরু করতে হলে তোমাকে দিয়েই—

কানে তালা লাগার মতো একটা নৈঃশব্দ্য যাবতীয় রাগের স্তব্ধতা নিয়ে ঝন্‌ঝন্ করে বাজতে লাগল রজতের কানে। রাস্তা ভর্তি লোকজনের মধ্যে একা হতে হতে তার মনে হলো মাথার ভিতর শিরার জালগুলো ফাঁপতে ফাঁপতে মোটা হয়ে উঠছে কেঁচোর মতো, যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে। বুঝতে পারল না কেন এমন নিঃশব্দ চারিদিক ! কেউ কি পারে না এটা ভেঙে দিতে ! কেউ কি পারে না ?

একটা কুকুর শুয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। প্রায় জ্ঞানশূন্য রাগে প্রচণ্ড একটা লাথি ছুঁড়ল রজত। ছিটকে উঠে অনেকটা দূর পর্যন্ত তেড়াবেকা হয়ে দৌড়ে গেল কুকুরটা—অপ্রস্তুত কিছু লোকজন ছুটে গেল এদিকে ওদিকে— দম বন্ধ করে রজত শুনল কুকুরটা চিৎকার করছে পরিত্রাহী গলায়, কর্কশ সেই আওয়াজে খানখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে স্তব্ধতা।

মনে মনে হাসল রজত। চ্যাঁচা শালা, কুকুর। আমি তো মানুষ !

লম্বা চেহারার একটি যুবক ছুটে এলো তার সামনে। ফিটফাট পোশাক, বোধ হয় অফিস যাচ্ছে। গায়ে ভুরভুর করছে সেন্টের গন্ধ।

'কী ব্যাপার, দাদা ? কামড়াবে না !'

হেসে মাথা নাড়ল রজত। কামড়াবে। সুতরাং, প্রস্তুত থাকো। নিঃশব্দ চোখ তুলে তাকাল লোকটির মুখের দিকে। মনে মনে বলল, কুকুর বলে বেঁচে গেল। তুমি হলে ফিনিশ হয়ে যেতে।

কিছু না বলেই চলে গেল যুবকটি। যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখল তাকে। হাসতে হাসতে আরও একটু এগিয়ে গেল রজত। খুব অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল, খুব ভোরবেলায় একটা ট্রেন ছাড়ে ধানবাদ থেকে। আসে দুর্গাপুরের ওপর দিয়ে—কলকাতা আর কতো দূর ! তখন ভাবল, সকালের গাড়িই ভালো। যদি একা আসে, রাতবিরেতে না ফেরাই ভালো—খচ্চরে ভরা চারিদিকে, তোর সরল মুখের মর্যাদা দেবে না কেউ। এতো দূর অস্পষ্টতার ভিতর দাঁড়িয়ে আমি হয়তো টেরই পাবো না কিছু। না, সকালেই ভালো। যদি

তাই হয়, তা হলে এখন সে ট্রেনে। আমি তৈরি হয়ে বেরুতে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে হয়তো। যদি সব ঠিক ঠিক চলে, অনীশদার বাড়ি থেকে আর একটা ট্রাই নেবে।

দরজা খুলতেই সুধার হাতে ওষুধের স্ট্রিপটা তুলে দিল রজত। সঙ্গে প্রেসক্রিপসান আর খুচরো টাকাপয়সা। সকালে যে-রকম দেখেছিল তার চেয়ে এখন একটু অন্য রকম লাগছে সুধাকে। হাসিখুশি। বোধ হয় বিনা ওষুধেই ব্যথা নেমে গেছে শম্ভুনাথের। অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। একপলক দেখে নিজের ঘরের দিকে হেঁটে গেল রজত।

সুধা জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি আর ?'

'না। আমি এখুনি বেরুব।'

'এতো সকালে !' উল্টো দিকে তাকিয়েও রজত অনুভব করল সুধার হাসি পিঠ ছুঁয়ে যাচ্ছে তার, 'বাড়িতে তোর মন টেকে না, না ?'

'মন-টন বুঝি না। ওসব তোমাদের—', অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো বেরিয়ে এলো রজতের মুখ দিয়ে, 'বুড়োটা এবার এলে বলে দিও কান্নাকাটি নাটক আমার ভালো লাগে না। আমার জন্যে ভাববার দরকার নেই। আমারটা আমিই বুঝব—'

'কী হলো তোর, হঠাৎ !'

'হবে আবার কী, কিছুই না। ভাত পাওয়া যাবে এখন ? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

সুধা কী বলল না বলল শোনা প্রয়োজন মনে করল না রজত। কিছুই বলেনি, হয়তো তার কথার ধরনে আহত হলো একটু। হু কেয়ার্‌স্ !

বিছানাটা ইতিমধ্যে গুছিয়ে দিয়েছে সুধা। চাদরের ওপরে ডোরাকাটা রোদ। টান-টান করে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেই সেটা চেপে বসল বুকের ওপর। অনীশদা বলেছিল মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে। কোন মাটি ? চারিদিকে শুধু জল আর জল, প্রতি মুহূর্তেই হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে আরও। তীর দেখা যায় না। এই জল সাঁতরে যাবেই বা কোন দিকে ? নাকি এলোপাথাড়ি হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হুস্ করে তলিয়ে যাবে একদিন ! খুব কি ক্ষতি হবে পৃথিবীর ? মনে তো হয় না। এই ঘর, এই বিছানাটা খালি হয়ে যাবে হয়তো—বন্ধ জানলার গায়ে চুপচাপ অপেক্ষা করবে রোদ। ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে সুধা ভাবছে, শম্ভুনাথ তো খান না, কী লাভ একার জন্যে এই কাকভোরে উঠে উনুন ধরানোর, চায়ের জল চাপানোর ? ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাবে আলস্যে। বাপটা তো এখনই রিহার্সালি দিয়ে যাচ্ছে কান্নার, হয়তো ডেডবডি দেখে উপুড় হয়ে চিল্লাবে কিছুক্ষণ—মরাকান্না বলে কথা আছে না একটা ?—আস্তে আস্তে ভেবে নেবে, নুলোর চেয়ে চুলো ভালো। বুড়ো বয়সে জোর কমে আসে স্মৃতির, এক-একটা বিকেলে যখন বাঁশি বাজিয়ে স্টেশন ছাড়িয়ে যাবে কেষ্টনগর লোক্যাল, একবারও কি ভাববে বহুকাল কলকাতা যাওয়া হয় না। মা ? তার মুখ মনেও পড়ে না, কথা প্রায় বলেই না বলে গলার স্বরও। তবে, এই একটা জায়গায় দ্বিধা থেকে যায় অল্প। মনে পড়ে, জেল থেকে বেরুনোর পর গভীর রাতে উঠে এসে হাত বোলাত তার হাতের ক্ষতটায়—হ্যাঁ রে, লেগেছিল খুব ? এমনিতে চুপচাপ, কিছু দিন পরেপরেই যখন জিজ্ঞেস করত, মনে হতো স্নেহ, মায়া, দুঃখবোধ পেরিয়ে রক্তে জড়িয়ে গেছে প্রশ্নটা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে হঠাৎ। হয়তো এবারও তাই হবে। এমনও হতে পারে, প্রশ্ন থাকবে না কোনো—শুধু স্বাভাবিকের চেয়ে অন্য রকম হয়ে যাবে শ্বাস-প্রশ্বাস। বুকে ব্যথা নিয়েও আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবার দায় থাকবে না শম্ভুনাথের। আর কে ? দাদা ? ঋণটা থেকে যাবে, এই যা। খারাপ লাগবে বটে অনীশদা আর শিখা বউদির। পুজো

দেওয়ার লিস্টি থেকে কেটে যাবে একটি নাম, অনীশদার অভাব কাটানোর জন্যে একা-একা লুডোর ছক পেতে নিয়ে বসবে শিখা বউদি—খেলবে কি ? কী ভাববে অনীশদা, এর চেয়ে হাজতে মরলেই ভালো করতিস ! আর কে ? পল্লব, অসিত, ঈপ্সিতা, পিনাকী, চন্দনা ? টুপুর ? একজনও কি আছে, রজত নেই বলে পৃথিবী শূন্য মনে হবে যার কাছে, যেখানে যখন চলে যাবে, সেখানে, ঠিক তখনই থেমে যাবে যার দিনরাত ? টুপুর ? না। পাঁচ দিন থেকে পাঁচ মাস, পাঁচ মাস থেকে পাঁচ বছর, পাঁচ বছর থেকে পঞ্চাশ বছরে চলে যাওয়া খুব বেশি কঠিন নয়। সময় টাল খাবে না কোথাও।

ভাবনাটা জড়িয়ে গেল। একেই বলে আঙুলে গোনা যায়—পাঁচ আঙুলের কুড়িটা দাগও ছুঁতে পারে না। চেনাশোনা সব মুখগুলির সামনেই প্রশ্ন ঝোলানো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাবলীল চোখে রাস্তার লোকজন দেখতে লাগল, গতি অব্যাহত রেখেই যতোটা দেখা যায় দেখতে লাগল প্রতিটি মুখ। একই রাস্তার ওপর দিয়ে এই যে হাঁটছি আমি তোমাদের সঙ্গে, একই রোদ মাথায় করে, একই সঙ্গে ট্রামে-বাসে উঠব, টিকিট কাটব একই কণ্ডাকটরের কাছ থেকে—তা হলে, তোমরা কারা ? আমাকে চেন ? কী সম্পর্ক তোমাদের সঙ্গে আমার ? যদি মরে যাই, বল হরি হরি বোলের কাঁধে চড়া খাটটার দিকে আড় চোখে তাকাবে হয়তো। আমার কথা ভাববে কি ? তোমরা কি বুঝতে পারো, অন্য সকলেই যখন বেঁচে আছে তখন আমার পক্ষেও বেঁচে থাকাটা কতো জরুরী ! না, পারো না। কেউ পারে না। পারে না বলেই খুব তাড়াতাড়ি একটা ডিসিসান নিতে হবে আমাকে। বাঁচা, না মরা ? বাঁচতে হলেই প্রতিশোধ নিতে হবে, নিজের চামড়ায় উল্টে-পাল্টে ঘষে ঘষে শান দিতে হবে ছুরিতে, তাতে যদি দাগটা ওঠে। তা না হলে মরা। খুব কঠিন কিছু নয়। সাধারণ মেয়ে-বউরাই এটা-ওটা খেয়ে টেঁসে যাচ্ছে দিব্যি, আমি তো লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলে—একটা উপায় খুঁজে পাবো না ! তবে, হ্যাঁ, যদি মরতেই হয়, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, ওসব ন্যাকামিতে যাবো না। স্পষ্টই দায়ী করে যাবো। কাকে ?

একটা ধাঁধার মতো লাগছে পুরো ব্যাপারটা। যতো দিন যাচ্ছে ততোই আরও উদ্ধত হয়ে উঠছে রাগ, কিন্তু সেটা যে কার প্রতি বুঝতে পারছে না ঠিক। এমনই বা হবে কেন ! অনীশদা বলেছিল একদিন, শত্রু এই ঘুণধরা সমাজটা, ঘা দিতে হবে এটাকেই। এ তো সেই মিনিস্টারের বুকনির মতোই শোনাচ্ছে—আজ সকালেই না পড়েছিল কাগজে ! ও মশাই, সমাজ ব্যাপারটা কী ? সমাজ কি এই মানুষগুলো, ওই পুলিসগুলো, কিংবা, ওই মিনিস্টারগুলো ? সবই তো ছাইঠাসা কাকতাড়ুয়া—একই রকম চোখমুখ, এঁড়ে বকনায় তফাত করা যায় না কোনো। ঘা-টা দেবো কাকে !

একটু বা ঘোর নিয়ে অনীশের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল রজত। বেল টিপল।

'আ-রে এসো। আমি ভাবলুম কে !' দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শিখা বলল, 'আর একটু দেরি করলেই বেরিয়ে পড়তাম। কী ব্যাপার, এতো গম্ভীর কেন ?'

'কিছু নয়। এমনিই। বেরুচ্ছিলেন ?'

'ডাক্তারের কাছে। ফোন করেছিলাম, বলল এক্ষুনি চলে আসতে।'

এতোক্ষণ ভুলেই ছিল প্রায়, শিখাই যেন ডায়াল করে দিল। থেমে থেমে, কিন্তু স্পষ্ট, রিং হতে লাগল মাথায়। রজত বলল, 'এখনো ভুগছেন ? কোন ডাক্তার ?'

'সেই যে—বালিগঞ্জে, ডক্টর মিসেস সোম। একবার গিয়েছিলে না আমার সঙ্গে ?'

মুখ দেখে মনে হয় না কোনো রোগ-টোগ আছে শিখার, ভুগছে। বরং শ্রী ফেটে আলোয়

ঝিকঝিক করছে চোখদুটো। রজতের ইচ্ছে করল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ওই চোখদুটোর দিকে। ঘাড় নাড়ল। গিয়েছিল।

'অনীশদা ফিরছেন কবে ?'

'সকালে ট্রাঙ্ককল করেছিল। কাল না হলে পরশু তো নিশ্চয়ই।' সম্ভবত অন্য কোনো খুশিরও কারণ আছে শিখার। হাসিটা জিইয়ে রেখে বলল, 'চা খাবে ? এসেছ যখন বসে যাও একটু ?'

'বউদি, একটা ফোন করব ?'

'করো। চা খাবে ?'

'থাক।'

শিখা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছ কোথায় বলো তো ? কলেজে ?'

'কলেজে ?' কাচুমাচু ভাব করে হাসল রজত। ট্রাউজার্সের পকেট থেকে রোল-করা খাতাটা বের করে বলল, 'যাবো বলে সঙ্গে নিয়েছি। যাবো কি না জানি না।'

'তা হলে চলো না আমার সঙ্গে। সেখান থেকে চলে যেও। তুমি থাকলে একটা ট্যাক্সিও ধরে দিতে পারবে—'

'ঠিক আছে।'

রজত ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে অপেক্ষা করল খানিক। একটু ভাবল। গতকালের হিসেবটাই মনে আছে তার। পাঁচ দিন নয়, আজ ছ'দিন। যদি ফিরে আসে—, না, টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না। খরচোখে নাম্বারগুলোর দিকে তাকিয়ে একলক্ষ্যে আঙুলটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল রজত। ডায়াল করল। রিং হচ্ছে। এটা অসময় নয়, তবু ফোন ধরতে এতো দেরি হবে কেন !

'হ্যালো—'

জ্যাঠামশাই সম্ভবত। আশ্বস্ত হলো রজত।

'টুপুর আছে ?'

'ও তো দুর্গাপুরে গেছে—'

'ও।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়েও কী ভেবে আঁকড়ে থাকল রজত। গভীর গলায় বলল, 'ফেরেনি !'

'না। কে কথা বলছ ?'

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না শিখাকে। হয়তো পাশের ঘরে কিংবা ডাইনিং টেবিলের সামনে। নিশ্চয়ই কান পেতে নেই। তারও তাড়া আছে।

'পল্লব। টুপুরের বন্ধু।'

'ও। টুপুর তো ফেরেনি।'

'কবে ফিরবে ?'

'আজ সকালে ট্রাঙ্ককল করেছিল। বোধ হয় দু-তিন দিন পরে। কিছু—'

নামিয়ে রাখল। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। একমনে দাঁড়িয়ে রিস্টওয়াচের ব্যাণ্ড লাগাচ্ছে শিখা। হাতটা মুঠো করা। কাছাকাছি পৌঁছে রজত বলল, 'চলুন—'

চোখের পাশ দিয়ে শিখা দেখল তাকে।

'মৌরি খাবে ?'

রজত হাত পাতল। বন্ধ মুঠোটা উপুড় করে দিল শিখা। মৌরির গন্ধ, পাশাপাশি হাঁটছে

ভিজে চুলের ঠাণ্ডা সুগন্ধ। চাবিটা নিয়েছে কি না দেখার জন্যে ব্যাগ খুলল শিখা। নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে, বাইরে থেকে টেনে দিল দরজাটা। ঠেলে দেখল। রজত ভাবল, এই একটা চ্যালেঞ্জের ভিতর দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করে নিতে পারে সে। ঘুসি মারলে হাত ফেটে যাবে। পায়ের জোরে ভাঙবেই। তাতে শব্দ হবে বিকট। কাঠ বলেই হবে। সব ভাঙার শব্দ হয় না।

নিজেকে যতোটা সম্ভব স্বচ্ছন্দ করে নিল রজত। শিখা নেমে গেছে কয়েক ধাপ। দ্রুত ও পরপর কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এলো সে।

'অনীশদা ট্রাঙ্ককল করেছিলেন!'

'হ্যাঁ। একেবারে ভোরে।' শিখা বলল, 'আজ ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে—'

'কেমন লাগে?'

'কী?'

'দূর থেকে ভেসে আসা কারুর গলা শুনতে— ?'

'ভালোই তো লাগা উচিত।' শিখা রহস্য করল, 'সবই নির্ভর করে কে করছে তার ওপর, কী বলছে তার ওপর। তোমার কেমন লাগে?'

'আমার!' রজত হাসল। বলল, 'আমার তো টেলিফোন নেই। থাকলে বুঝতে পারতাম।'

শিখা বলল, 'যার গলা শুনতে চাও, সে যেখান থেকেই কথা বলুক, একই রকম লাগবে।'

'বোধ হয়—'

হাঁটছিল সামনে তাকিয়ে। হঠাৎই 'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি' বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল রজত। ট্যাক্সিটার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ধরে দৌড়ল খানিক। দাঁড়াবার পর নিঃশ্বাসটা সইয়ে নিতে নিতে ভাবল, দু-তিন দিনের মধ্যে আর টেলিফোনের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না।

'তুমি খুব পয়া তো!'

'আমি নয়। আপনি—'

'তুমিই। এই সময় রাস্তায় নেমে—', থেমে গিয়ে শিখা বলল, 'সামনে কেন! তুমিও এখানে এসো—'

শিখার পাশে বসে রজত বলল, 'বালিগঞ্জ—'

'এই, শোনো! ধরো তো?'

ডান হাতের দুটো আঙুল আলাদা করে বাড়িয়ে দিয়েছে শিখা, একটা ধরতে হবে। অল্প ইতস্তত করে দুটোর মধ্যে ছোটটাকে ছুঁয়ে দিল রজত। হাতটা টেনে নিল শিখা। তারপর চুপচাপ হয়ে গেল। হাসিটা এখনো লেগে আছে ঠোঁটে। বাইরে তাকিয়ে রাস্তা দেখছে, কিংবা কিছুই দেখছে না। ওদিকটায় ছায়া, তবু শেষ রাস্তাটুকু দ্রুত হেঁটে আসার জন্যেই সম্ভবত, ঘাম চিকচিক করছে কানের তলায়। রজত মুখ ফিরিয়ে নিল। আজ নিয়ে ছ' দিন হলো, আরও দু' দিন হলে আট দিন হবে। তিন দিন হলে ন' দিন। সময় থেমে থাকে না। রজত বলল, 'আমায় বোঝাচ্ছিস কেন!'

'বুঝতে চাইছিস না বলে।' টুপুর বলল, 'দুটো দিন তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে—'

'হঠাৎ শর্মিলার কাছে?'

'বন্ধুর কাছে বন্ধু যায় না!'

'তুই শর্মিলার বাড়িতেই যেতে চাইতিস না !'

'জায়গটারও টান আছে—, আগে যাইনি।'

'তাই বল !' জের টেনে রজত বলল, 'ডায়মণ্ডহারবার, ব্যাণ্ডেল—এসব জায়গাও তো যাসনি কখনো ?'

রাস্তা। টুপুর থেমে দাঁড়াল।

'সব ব্যাপারে তোর কাছে কেন জবাবদিহি করতে হবে বল তো ?'

রজত তাকাল ওর দিকে। বিকেলে সুন্দর হয়ে ওঠে টুপুর, ছায়া ছড়ালে আরও। কাছে থাকাটাই তখন হয়ে ওঠে দূরত্বময়। রাগটা চেপে রাখতে হয়। এখনো তাই করল। ওকে পাশে আসার সময় দিয়ে বলল, 'আমি কিছুই জানতে চাইনি। তুই-ই বলছিস !'

'বেশ করছি বলছি। তোকেও শুনতে হবে।'

'চল, চা খাই—'

বেয়ারা পর্দা টেনে দিয়ে গেল। রজত সরিয়ে দিল আবার। হাসতে লাগল আপন মনে। চায়ে চুমুক দেবার আগে বলল, 'ঘামছিস। ঘামটা মুছে নে—'

আঁচল তুলে আলগোছে কানের তলাটা মুছে নিল টুপুর।

'কাল হঠাৎ ওইভাবে চলে এলি কেন !'

'ভালো লাগছিল না—আমি যেতে চাইনি—'

'ওরা কী ভাবল !'

'ওরা !' সোজাসুজি টুপুরের চোখে চোখ রাখল রজত, 'ও, ওরা ! কী যায় আসে—'

টুপুরও দেখছে তাকে। দেখতে দেখতে ওর হাতে হাত রাখল। পর্দা নেই, একবারের জন্যে রজত ভাবল হাতটা সরিয়ে নেবে। এতো দিন রঙটাই দেখেছে, আর নিটোল আঙুলের নড়াচড়া। ছোঁয়াছুঁয়িও হয়নি তা নয়। কিন্তু, রাখল এই প্রথম—সেটা বুঝবার জন্যেই রজত সময় নিতে লাগল।

'ক'দিন থেকে তোকে আমার খুব ভয় লাগছে !'

'ডায়লগ দিস না।'

'সত্যি।' বেয়ারাটা ঘুরঘুর করছে। টুপুর নিজেই তুলে নিল হাতটা। থেমে থেমে বলল, 'কেন জানি না !'

'হেঁয়ালি ছাড়। শর্মিলাটা ন্যাকা। ওর সঙ্গে অতো কিসের !'

'শর্মিলাকে টানছিস কেন ?'

'চা খেয়েছিস ? ওঠ !'

টুপুর হঠাৎ বলল, 'না। আমি উঠব না এখন। তোকেও বসতে হবে—'

বোধ হয় এসে গেল। নড়ে উঠে শিখাকে দেখল রজত। কানের পাশ দিয়ে ঘামটা নামছে রেখা হয়ে। শিখা তৈরি।

'ব্যাস, ব্যাস, এইখানে—'

ভাড়া দেবার জন্যে ব্যাগ খলুল শিখা। ঘড়ি দেখে বলল, 'দেরি হয়নি—'

'আমি বাইরে দাঁড়াব ?'

'কেন ! এসো ?'

চেম্বারে লোক কম নেই। অধিকাংশই মহিলা। ভিতরের দরজাটা আধ-ভেজানো, তার ওপর হাল্‌কা সবুজ পর্দাটা পুরো টানা। অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে ভিতর থেকে, মনে

হয় পেসেন্ট আছে। একটি মাঝবয়েসী নার্স শিখার হাতে ভিজিটরস্ স্লিপ এগিয়ে দিল। শিখা বলল, 'কলমটা দাও তো ?'

গোটা গোটা লেখা শিখার, ঈষৎ হেলে পড়ে বাঁ দিকে। ওমনি টুপুরেরও। তিন দিন যার অপেক্ষা করার কথা চুপচাপ, সে এতো মিল খুঁজে পাচ্ছে কেন ! নাকি সে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়—নদীগুলো নেমে আসছে মোহানার দিকে ! গভীর জলের সম্মোহনী হাত-পাগুলো অবশ করে ফেলছে ক্রমশ ; একটু পরেই ডুবে যাবে টুপ করে।

পর্দা সরিয়ে নার্সটি ভিতরে ঢুকল এবং বেরিয়ে এলো।

'যান—'

উঠে দাঁড়িয়ে শিখা ডাকল, 'এসো—'

'আমি থাকি না ?'

পলকের জন্যে দোমনা হলো শিখা। ভাবল।

'এসো। আমার দেরি হবে না—'

রাশভারী চেহারা। চোখে মেয়েদের পক্ষে অস্বাভাবিক মোটা ফ্রেমের চশমা। কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে অল্প। ইশারায় বসতে বলার আগে রজতের দিকে তাকালেন একবার। তারপর সামনে বসা মেয়েটির দিকে।

'ইউরিন রিপোর্টটা নিয়ে এসো আগে। পজিটিভ কি না দেখতে চাই।'

মেয়েটি উসখুস করে উঠল।

'নিজেই তো বুঝতে পারছি—'

'পেসেন্ট সব বুঝে নিলে ডাক্তারের দরকার হয় না।'

গলা শুনে বোঝা যায় মিসেস সোম নয়, নামের আগে ডক্টর বসানো। কথার শেষে দাঁড়ি—যার মানে আর কোনো কথা নয়।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। চুলে ঈষৎ খড়খড়ে ভাব থাকলেও সব মিলিয়ে ভালো। চিন্তায় নরম হয়ে আছে মুখ, গলায় নীল শিরার আভাস। ব্যাগ খুলে বলল, 'আপনার ফি ?'

'পরে হবে। রিপোর্টটা নিয়ে এসো—'

চেয়ার ঠেলে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল মেয়েটি। এতোক্ষণের মধ্যে একবারও তাদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না।

'মেয়েটিকে দেখলে ? কনসিভ করেছে। কিউরেট করাতে চায়। নিজেই চলে এসেছে—'

রজত মাথা নিচু করে নিল। কথাটার মানে জানে, সেই জন্যেই অস্বস্তি। শিখা বোধ হয় খুবই ছেলেমানুষ ভাবে তাকে, না হলে টেনে আনত না। অন্তত এইখানে। এখনই কি উঠে যাওয়া যায় ? মেয়েটির মুখ ভাবতে গিয়ে গলার নীল শিরাটাই শুধু ভেসে উঠল চোখে।

'এ-রকম প্রায়ই আসে আজকাল। লিগালাইজড্ হলেও এতোটা ভাবা যায় না।' চশমা নামিয়ে বাঁ হাতে চোখ রগড়ালেন ডক্টর মিসেস সোম। এগুলো স্বগতোক্তি—চোখ এখনো পর্দার দিকে। বললেন, 'আনম্যারেড। চাকরি করে। বয়স মোটে চব্বিশ ! জীবন উপভোগ করছে না নষ্ট করছে বুঝতে পারি না। একেবারে প্রফেসানাল অ্যাটিচুড। ফিয়ের টাকা নিয়ে এসেছে—'

কথাগুলো শুনতে শুনতে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল রজত। না পাওয়া পর্যন্ত শিখার দিকে তাকানো যাবে না।

'অনীশ ফিরছে কবে ?'

শিখা জবাব দেবার আগেই উঠে পড়ল রজত।

'বউদি, আপনি সেরে নিন। আমি বাইরে আছি—'

বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যারা বসেছিল তাদের সকলেই তাকাল তার দিকে। প্রশ্নে প্রখর দৃষ্টিগুলো, আমল দিল না রজত। সম্ভবত এখনো হাঁটছে মেয়েটি। আজ হোক কিংবা কাল আবার ফিরে আসবে এখানে। আবার ফিরে যাবে। চব্বিশ হলে প্রায় তার সমবয়সী কিংবা একটু বড়ো। হাবেভাবে আরও। এতো আত্মবিশ্বাস পেল কোত্থেকে। তার জোর তো ভেঙে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই—জলের মধ্যে অসহায় হাত-পা ছুঁড়ছে শুধু, পৌঁছুতে পারছে না কোথাও। বোধ হয় ওই চাকরিটা—চাকরিটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে। মানি মেক্স এ ম্যান—হেলপ্স্ হিম টু মেজার হিমসেল্ফ, ইভন্ হিজ সোল। কার কথা ?

রজত একটা সিগারেট ধরাল। চেম্বারের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল রোদের দিকে, একদৃষ্টিতে। এবং ভাবল, তফাত আছে। মেয়েটির গায়ে ছাপ নেই কোনো।

চাপা হাসিমুখে বেরিয়ে আসছে শিখা। ভোরের ঠাণ্ডায় অলস হাতে গায়ে চাদর টেনে নেওয়ার মতো ধীরেসুস্থে ওর হাসিটা দেখতে লাগল রজত। মেয়েদের কলকব্জা অনেক বেশি, একদিন পার্কের বেঞ্চিতে বসে পল্লব বলেছিল, খুলে দেখিস—ঘড়িও হার মানবে। হয়তো ঠিকই। রজত বুঝতে পারল না তখন সে শিখার ইচ্ছামতোই আঙুলটা ছুঁয়েছিল কি না।

'তুমি এখানে। আমি ভাবলাম—'

'চলে গেছি ?' রাস্তার আধখানা ছায়া, ছায়ার দিকে শিখাকে সরে যেতে দিল রজত। কথা আসছে না। এমনিই বলল, 'যাবো কোথায় ? যাবার জায়গা কমে আসছে—'

চোখ তুলে কিছু আঁচ করার চেষ্টা করল শিখা।

'কলেজে যাবে না ?'

'যাবো। আপনি কি বাসে, না— ?'

'যদি উঠতে পারি।'

কথা। তার পরে কথা। তারও পরে কথা। ভেবে চুপ করে থাকল রজত। ফুটপাথ জুড়ে দোকান, দোকান ও বাড়ির মাঝখানের জায়গাটুকু গিসগিস করছে ভিড়ে। ওরই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে থেমে হাঁটতে লাগল শিখার সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবে বাসস্টপ পর্যন্ত যাবে, অপেক্ষা করবে বাসের, শিখা উঠবে। এই কাজগুলোর ভিতর দিয়ে শিখাই এগিয়ে যাবে, যেমন এতোক্ষণ এগোল। সে ? শুধুই স্থান পরিবর্তন—জল দিয়ে ঘেরা গণ্ডীর ভিতর পিঁপড়ে যেমন একদিক থেকে আর একদিকে ঘুরে ঘুরে শুধুই জল শুঁকে বেড়ায়, বেরোতে পারে না। কী লাভ হলো সঙ্গ দিয়ে শিখাকে ? সময় কাটানো ? সময় তো কেটেই যায়। দেখতে দেখতে যাদের কেটে যাবার কথা, সেই দুটো দিন এখন ছ' দিনে পৌঁছে রুমাল নাড়ছে নাকের ওপর, গন্ধটা ঢুকে পড়ছে নাকে। সব সুগন্ধেই তো আর নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না।

শিখা চলে যাবার পর একা-একা আরও খানিকটা হাঁটল রজত। একা-একা বাসে উঠল। সে ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। কণ্ডাকটর নেই, এমনকি ড্রাইভারও নেই। কোনোখানে বাসস্টপ নেই। ওঠানামা নেই। বাসটা এগিয়ে যাচ্ছে তবু ঊর্ধ্বশ্বাসে, জিব বের করে। থামবে, যদি পাহাড়ের মতো কোনো একটা দেওয়াল সামনে এসে দাঁড়ায়—ধাক্কা

লেগে ভয়ঙ্কর শব্দে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

মাথার ভিতর সেই শব্দটা শুনতে পেল রজত। লাফিয়ে উঠে টান দিল দড়িতে। একবার, দু'বার, তারপর যন্ত্রের ধরনে বারবার।

'গাড়ি থামান—'

বাসের সমস্ত যাত্রী এখন তাকিয়ে আছে তার দিকে। কণ্ডাকটর ছুটে এসে বলল, 'স্টপে নামতে পারেন না!'

দাঁতে দাঁত ঘষল রজত। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। বাসটা থেমে গেছে। মুঠো শক্ত করে রজত দেখল রক্ত ভেসে যাচ্ছে লোকটার মুখ। না, এ নয়। কিছু বলল না। আস্তে আস্তে নেমে পড়ল বাস থেকে।

পোস্টার পড়েছে বিল্ডিংয়ের দেওয়ালে। 'শিক্ষাব্যবস্থা পাল্‌টাতে হবে।' নিচে হিজিবিজি। 'ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানের পুতুল নয়।' মানে কী? চোখ গেল পরেরটায়, 'শোষণের আর এক নাম পরীক্ষা।' কার পরীক্ষা? কে শোষণ করছে? কাকে? কথাগুলোর গা থেকে শব্দ বেরুচ্ছে ঠং ঠং করে, ওই বাসের ঘন্টির মতো। থামছে না। অল্প হেসে এগিয়ে গেল রজত। শালা! প্যান্ট খুলে ফোয়ারা ছোটানোর মতো কথা ফুটে উঠছে সবখানে!

'এই রজত—রজত?'

থেমে দাঁড়াল। ঈপ্সিতা।

'কালা নাকি রে! শুনতে পাস না?'

রজত হাসল। ঈপ্সিতার ভুরু ফেটে কয়েকটা স্ট্রাইপে ভাগ হয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গালের ওপর। হেসে বলল, 'কালা হয়ে গেছি—'

'তোর চোখদুটো এমন ঘোলাটে কেন! জ্বর? না, খেয়েছিস কিছু?'

'দ্যাখ—'

রজত হাত বাড়িয়ে দিল। জ্বর দেখার মতো করে ওর হাতটা ছুঁয়ে দেখে ঈপ্সিতা বলল, 'জ্বর নয় তো! একদম ঠাণ্ডা।'

'মুখ শুঁকে দেখতে পারবি? কিছু খেয়েছি কি না?'

'অসভ্য।' লজ্জিতভাবে আশেপাশে দেখে নিয়ে চোখ তুলল ঈপ্সিতা। বলল, 'সত্যি, এতো লাল কেন চোখদুটো!'

রজত এগিয়ে গেল। ক্লাসের সময় হয়ে এসেছে। ঈপ্সিতাও এগোচ্ছে। পা রাখল সিঁড়িতে। ভরা চেহারা, মেপেজুপে মাংস বসানো। রেডি-টু-ওয়্যার। ওয়্যার! গেঞ্জি? না জাঙিয়া?

'টুপুরের খবর রাখিস?'

'ফেরেনি এখনো।' বেঁকিয়ে হাসল ঈপ্সিতা, 'সেই জন্যে কাঁদছিলি নাকি?'

'কেঁদেছিলাম। আজ সকালে—'

'টুপুরের জন্যে!'

'না। তোদের সকলের জন্যে। সকলের হয়ে অ্যাডভান্স কান্না।' ঠোঁটে যতোটা পারে হাসি ফুটিয়ে রজত বলল, 'কিন্তু সবই আমার জন্যে, নিজের জন্যে—'

'পাগলা! তুই সত্যিই পাগলা!'

ক্লাসের সামনে বারান্দায় অনেকের জটলা। পল্লব, অসিতকে দেখতে পেল রজত। মেয়েগুলো ভিতরে। ডেস্কের ওপর বসে হাত নেড়ে চন্দনাকে কী বোঝাচ্ছে পিনাকী, খুব

মন দিয়ে শুনছে নন্দিতা, বসুন্ধরা আর অজিত। ঈপ্সিতাও জুটে গেল ওখানে। ব্ল্যাকবোর্ডে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'নুন জোগাড় করে রাখো'। একটু দাঁড়িয়ে লেখাগুলো পড়ল রজত। পল্লব এগিয়ে এলো।

'পড়ছিস কী! তোরই বাণী।'

'যতো বাজে ব্যাপার! মুছে ফ্যাল—'

'ইউনিয়নের ইলেকসান, সবাই শালা স্লোগান মারছে। আমাদেরটাও মেরে দিলাম।'

'মুছে ফ্যাল।'

পল্লব বলল, 'তোর চোখটা লাল কেন রে!'

'জানি না। জ্বর-টর হবে হয়তো।' চেপেচুপে চোখের পাতা বন্ধ করল রজত, খুলল. আবার বন্ধ করল। তারপর, খুলে, জিজ্ঞেস করল, 'খুব লাল?'

'খুব নয়। তবে লালই—'

'মেজাজটা ভালো নেই। বোধ হয় কিছু হবে—'

বেল পড়ে গেছে। ওরা ক্লাসে ঢুকল, জায়গা নিয়ে বসতে লাগল। ঈপ্সিতার পাশে জায়গাটা খালি। বসবার আগে দু'দিকে সাজানো ডেস্ক ও বেঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রজত পল্লবকে বলল, 'মুছে দে—'

ওপাশে চন্দনা। পাশাপাশি অজিত, পিনাকী, অসিতরা। চন্দনা বলল, 'কথাগুলোর মানে কী রে?'

ডাস্টার হাতে বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পল্লব বলল, 'গান্ধীজী বলেছিলেন—লবণ আন্দোলনের সময়। ইতিহাস পড়িসনি?'

ঠিক তখনই ব্যস্তভাবে তিন চারটি ছেলে ঢুকে পড়ল ক্লাসে। ইউনিভার্সিটিরই। মুখ চেনা। বোঝা যায় ইলেকসানের ব্যাপারে। লম্বা চেহারার খয়েরি পাঞ্জাবি পরা ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কার ক্লাস?'

অজিত বলল, 'বিজয়বাবুর—'

'উনি বোধ হয় আসেননি আজ।'

খানিক চুপ করে থেকে খয়েরি পাঞ্জাবি বলল, 'যাক। আমরা কিছু বলবার জন্যে এসেছি। আমার নাম দিলীপ দত্ত। ইনি সুদীপ চ্যাটার্জি। আমাদের প্রেসিডেন্ট। সুদীপ কিছু বলবে—'

ওরা তাকিয়ে থাকল। রজত দেখল সুদীপ ছেলেটি স্বাস্থ্যবান, গায়ে স্পোর্টস্ শার্ট, ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছে বোতামগুলো। কনফিডেন্স? হতেও পারে। কিন্তু, ভোট চাইতে এসে বলার কী আছে! এসব দেখলে গা জ্বালা করে।

স্বাস্থ্যবান ছেলেটি গলা খাঁকারি দিল, চোখ ঈপ্সিতার দিকে। আবার গলা খাঁকারি দিয়ে হাসল। চোখ নামিয়ে চাপা গলায় ঈপ্সিতা বলল, 'ইডিয়েট!'

'বন্ধুগণ—'

রজত জিজ্ঞেস করল, 'তুই চিনিস নাকি?'

'না। দেখলেই হাসে!' ঈপ্সিতা ফিসফিস করল, 'লোফার। একবার পৌষমেলায় আমাদের পিছু নিয়েছিল। টুপুর জানে—'

'বন্ধুগণ, বলার কথা বিশেষ নেই। আমরা আশা করি, আপনারা আমাকে আর দিলীপকে ভোট দেবেন। কেন ভোট দেবেন? এই কারণে যে, আজকে ছাত্রসমাজের যে অবস্থা, যে

দুর্দশা, যে-ধরনের শোষণ চলছে তাদের ওপর, ডিসিপ্লিন আর পরীক্ষার নাম করে প্রতিষ্ঠান যেভাবে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে গোটা ছাত্রসমাজকে—তার থেকে মুক্তির জন্যে চাই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন, চাই উচিত নেতৃত্ব, চাই—'

'আপনি কি মুক্তিদাতা !'

গোটা ক্লাস দেখল রজত উঠে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো মুঠো করে রাখা ডেস্কের ওপর—কাঁপছে। পিছন থেকে উঠে এসে ওকে বসাবার চেষ্টা করল পল্লব, 'রজত ! বোস—'

'ছাড় ! এসব বুজরুকি আমার জানা আছে—'

থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল ছেলেটি। এবার সোজাসুজি রজতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে !'

'মানে সোজা।' ডেস্কে ঘুঁসি ঠুকল রজত, 'ভোট চাইতে এসেছেন, ভোট চেয়ে চলে যান। বুলি ছিটোবেন না—'

ঈপ্সিতা ওর গায়ে ঘেঁষে এলো ; রজতকে চেনে। দেখল, ওদিকে অসিত, পিনাকীও উঠে দাঁড়িয়েছে। চন্দনা বলল, 'কী করছিস রজত ! চুপ কর !'

'এসব কথা শুনলে গা জ্বালা করে—'

'কী বললেন !' ছেলেটি হঠাৎ এগিয়ে এলো দু' পা। বুকখোলা শার্টের কলার মুঠো করে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'গা জ্বালা করলে বেরিয়ে যাও। এটা তোমার বাপের জায়গা নয়—'

চোখের পলকে ঘটনাটা ঘটে গেল। কেউ কিছু বুঝবার আগেই নিজের জায়গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ছেলেটির পেট লক্ষ করে প্রচণ্ড লাথি ছুঁড়ল রজত। ছেলেটি গড়িয়ে পড়ল টিচার্স ডেস্কের ওপর, ডেস্কসুদ্ধ ঘেঁসটে পিছনে সরে গেল কিছুটা—যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল চোখদুটো। তারপরেই উঠে এলো টলতে টলতে।

রজত এগিয়ে যাচ্ছিল, খয়েরি পাঞ্জাবি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে। রজত চেঁচিয়ে বলল, 'সরে যান ! শালাকে খুনই করে ফেলব আজ—'

কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই স্পোর্টস শার্ট পরা ছেলেটি ঘুঁসি চালাল রজতের মুখ লক্ষ্য করে। ওরা দেখল, পাল্‌টা দেবার জন্যে শরীর টান করে দাঁড়িয়েছে রজত ; এক মুহূর্ত, তারপরেই নাকমুখ বেয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো রক্ত। ওপর দিকে মুখ তুলে হাঁ করল রজত, এলোমেলো হাত বাড়িয়ে ডেস্ক চেপে ধরার চেষ্টা করল—ঝিমঝিম করে উঠল মাথা। ভারসাম্য হারিয়ে টাল খেয়ে পড়ছিল, একই সঙ্গে চন্দনা, পল্লব আর ঈপ্সিতা ধরে ফেলল ওকে ! মুখটা চন্দনার বুকে। মুঠোয় চুল চেপে ধরে ওর মুখটা তুলে ধরেই শিউরে উঠল পল্লব। ঈপ্সিতা ককিয়ে উঠল, 'কী হলো, রজত—এ কী হলো তোর !'

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকল। তারপরেই দ্রুত বেরিয়ে যেতে ব্যস্ত হলো ইউনিয়নের দলটি।

পিনাকী এতোক্ষণ কিছু বলেনি। শুধু চোখ দুটো স্থির করে রেখেছিল স্পোর্টস শার্টের ওপর। ছেলেটি পালাবার চেষ্টা করতেই ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরল দু' হাতে। ওই অবস্থাতেই ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল দেওয়ালের দিকে। এতোকাল চুল আঁচড়েছে, এক্সারসাইজ করেছে, ভিটামিন খেয়ে গেছে শুধু স্বাস্থ্য আর চেহারার জন্যে। পাত্তা পায়নি।

কাঁধ ও হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠতেই সে চিনতে পারল নিজেকে। রাগে অস্ফুট গলায় বলল, 'আমার নাম পিনাকী। তুমি যতো বড়ো লিডারই হও, আজ তোমার লাশ পড়ে থাকবে এখানে—'

লাথির চোটেই কাহিল হয়েছিল ছেলেটি। এখন গলায় পিনাকীর সাঁড়াশির মতো দশটা আঙুলের চাপে জিবটা বেরিয়ে এলো—মনে হলো চোখ দুটোও বেরিয়ে আসছে কোটর ছেড়ে।

'পিনাক, ছেড়ে দে ! মরে যাবে !' পিনাকীর হাত দুটো ধরে ছাড়াবার চেষ্টা করল অসিত, 'রজতকে দ্যাখ। ছাড়, ছেড়ে দে ! মরে যাচ্ছে—'

'মরুক শালা ! মরে যাক।' অপ্রকৃতিস্থ গলা পিনাকীর, 'আমরা কি কুত্তার বাচ্চা ! শুধু মারই খেয়ে যাবো !'

খয়েরি পাঞ্জাবি এতোক্ষণ বিভ্রান্তভাবে ছুটোছুটি করছিল। পিনাকীকে সামলানো যাচ্ছে না দেখে থাপ্পড় মারল নিজেরই কপালে, তারপর হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'দাদা, ছেড়ে দিন, ক্ষমা চাইছি—আমরা ক্ষমা চাইছি—ওদিকে একজন সিরিয়াসলি ইনজিওরড—ওকে দেখুন—'

পিনাকী শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না। চারিদিকে ভিড়, গোলমাল শুনে ছুটে এসেছে আরও অনেকে। স্থির চোখে স্পোর্টস্ শার্টের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল জল গড়াচ্ছে ছেলেটির চোখ দিয়ে, লালা বেরোতে শুরু করেছে ঠোঁটের কষ বেয়ে। হয়তো সত্যিই মরে যাবে এবার। হঠাৎই মনে হলো, মেরে কী লাভ ! তখন হাত দুটো আলগা করে নিল। আর কোনো দিকে না তাকিয়ে ছুটে গেল রজতের দিকে।

'মরে গেল নাকি রে !'

পল্লব কোত্থেকে জল নিয়ে এসেছিল। রজতের ঘাড়ে মাথায় ছিটোতে ছিটোতে বলল, 'সেন্স্ নেই মনে হচ্ছে। ব্লিড করছে। ফেটে গেছে মনে হয়—'

বিড়বিড় করে কী বলল পিনাকী বোঝা গেল না। তাকাল ঈপ্সিতার দিকে। রজতের একটা হাত মুঠোয় ধরে ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে ঈপ্সিতা, যেন হাতের ঠিক ওই জায়গাটুকুতেই প্রাণ থাকে। হঠাৎই বুক ভরে গেল তার। বলল, 'কিছু হবে না—কিছু হবে না—'

এতোক্ষণের এতো ঘটনার মধ্যে চন্দনাই শুধু চুপ। সেই তখন থেকেই রজতের মুখটা ধরে রেখেছে বুকে। ঘামের মতো কুলকুল করে রক্ত নেমে যাচ্ছে বুকে। ব্লাউজটা ভিজে গেছে পুরো। যাক। এই অনুভূতিটা আলাদা—যেন এই অনুভূতিটার জন্যেই এতোকাল হ্যাংলার মতো প্রার্থনা করেছিল সে। চুপচাপ থেকে শরীরের সমস্ত উত্তাপ বুকের মধ্যে জড়ো করে রজতের শরীরে সঞ্চার করতে চাইল চন্দনা, চিবুক চেপে ধরল মাথায়। তিন-চার মিনিট হয়েছে কি হয়নি, তবু মনে হচ্ছে অনন্তকাল পেরিয়ে গেল। এ-ভাবনার মানে হয় না কোনো, তবু, আজ টুপুর নেই বলে খুশিই হলো ও।

পুরো ভিড়টাই এখন ওদের ঘিরে। ওরই মধ্যে হঠাৎ ভিড় সরাতে শুরু করল খয়েরি পাঞ্জাবি। অসিত বলল, 'সর, সর। ডাক্তার এসেছেন। দেখতে দাও—'

॥ ছয় ॥

একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। যেভাবে কালো হয়ে এসেছিল আকাশ আর মেঘ ডাকছিল ঘনঘন, মনে হচ্ছিল থামবে না সহজে। বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই থেমে গেল। রোদও উঠল। এখন আকাশের দিকে তাকালে মনেই হবে না এতো জোর বৃষ্টি নেমেছিল। টুকরো টুকরো মেঘ এখনো ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে ; কিন্তু, ওগুলো যে দুর্বল, ঝকঝকে নীলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না তা দেখলেই চেনা যায়। এখন বিকেল। পশ্চিমে গিয়েও সূর্য তার বাতিল হওয়া খেলাটা শুরু করতে চাইছে আবার।

বৃষ্টি হয়ে গরমটা গেছে। ঠাণ্ডা না হলেও খোলামেলা একটা হাওয়া বইছে, থেকে থেকেই ওড়াউড়ি করছে দাপটে। না হলে এখানকার গরম সত্যিই পচা। বিশেষত দুপুরবেলায়। বারান্দা, ব্যালকনিতে খসখস টাঙিয়ে যতোই জল স্প্রে করো আর ঘর অন্ধকার করে পাখা চালিয়ে দাও ফুল স্পিডে—তাপ কমবে না সহজে। এয়ার-কন্ডিশনার থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু, শর্মিলাদের কোয়ার্টার্সে একটাই মেশিন, ওদের বেডরুমে লাগানো। গরম লাগবে ভেবে প্রথম দিন টুপুরকে জোর করে শুইয়ে দিয়েছিল ও-ঘরে, অশোক আর শর্মিলা উঠে গিয়েছিল গেস্টরুমে। এর আগে কখনো ঠাণ্ডা ঘরে শোয়নি টুপুর। রাত্রে আরামে ঠেসে ঘুমোলেও ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যাবার পর টের পেল নাক বুজে গেছে, গলার ভিতর কেমন একটা কাঁটাফোটা ভাব, টিসটিস করছে শরীর। পরের দিনই ঘর বদল করে নিল। চলে এলো গেস্টরুমে। এক প্রান্তের এই ঘরটা পেয়ে ভালোই লাগছিল টুপুরের। একার জন্যে আলাদা একটা ঘর—দরজা বন্ধ করলেই নিজস্ব। সবচেয়ে লোভনীয় ওই ব্যালকনিটা। এসে দাঁড়ালেই নিচের বাগানটা চোখে পড়ে পুরোপুরি, তা ছাড়াও একটা গোটা আকাশ আর অনেক দূর পর্যন্ত দুর্গাপুর, কারখানার চিমনি, রাস্তা, হাল প্যাটার্নের সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর গাছগাছালি। বিশেষত, আকাশে জিব-ছোঁয়ানো ওই লম্বা চিমনিটা—সকাল দুপুর রাত যখনই তাকাও সারাক্ষণ ম্যাজিসিয়ানের মতো লাল আগুন আর ধোঁয়া উগরে যাচ্ছে মুখ দিয়ে। ওটা রাবণের চিতা, প্রথম দিন ঠাট্টা করে বলেছিল অশোক। পরে অবশ্য বুঝতে পারে।

বৃষ্টির পর চুপচাপ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল টুপুর। যখন যেদিকে ইচ্ছে সরিয়ে সরিয়ে রাখছিল চোখদুটো, তবে নির্দিষ্ট কিছুই দেখছিল না। কোয়ার্টার্সের সামনে গেটের পাশে উঁচু দেবদারু গাছটা বৃষ্টির জলে ধুয়ে ভরে উঠেছে লাবণ্যে—রোদে ঝলমলে চুড়োটার সবুজে রুপোলি আভা, যতো নিচের দিকে গেছে ততোই পাতাগুলো ক্রমশ সবুজ হয়ে উঠেছে আরও। বাগানের গাছগুলো সুন্দর করে ছাঁটা, রঙ-বেরঙের ফুলের টব ছড়িয়ে আছে নানা দিকে—সবই ডিজাইন করে সাজানো। বৃষ্টির ঝাপটায় লনের ওপর খসে পড়েছে দোপাটির পাপড়ি। এটা ফুলের সিজন নয়, তবু নিঃসঙ্গ একটা গোলাপ ফুটে আছে টবে ; বিষণ্ণতা মাখানো তার দুধে-আলতা রঙ। লনের ডান দিকের কোণে একটা কাঠচাঁপার গাছ। এদিকের ঘাসবন ; কিংবা, ছায়া ছড়িয়েছে বলেই হয়তো ঘন লাগছে আরও। ভিজে ঘাসমাটির গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সবুজ একটা গন্ধ ভেসে আসছিল থেকে থেকে। অপরিচিত এই গন্ধটাই আরও অচেনা করে দিচ্ছিল সব কিছু। এই মুহূর্তের নির্জনতায় একটা রহস্য আছে—মন খারাপ করে দেয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেই কেমন যেন আস্তে

আস্তে চেপে বসে বুকের ওপর।

রেলিংয়ে আলতো হাত রেখে, শরীরটা পিছনে ঠেলে, সামান্য ঝুঁকে বাগানের দিকে তাকিয়েছিল টুপুর—অন্যমনস্কতার মধ্যে একটার পর একটা এলোমেলো ভাবনা ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে, অথচ গুছিয়ে ভাবছে না কিছুই ; হঠাৎ লনের ওপর চোখ পড়তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভয়ে ছমছম করে উঠল সারা গা। একটা সাপ ! লম্বায় প্রায় হাতখানেক কিংবা আরো বড়ো, কালো আর হলদেয় মেশানো ছিট-ছিট রঙ। কাঠচাঁপা গাছের তলা থেকে বেরিয়ে লনের ভিজে সবুজের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলো অনেকটা, তারপর মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে গেল ওইখানে সাজানো ফুলের টবগুলোর আড়ালে—চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বেরিয়ে এলো আবার। গোলাপের টবটার পাশে এসে ফণা তুলল। এখন দুলছে লেজে ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে। জিব দেখাল ; কালো পুঁতির মতো তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো পরিষ্কার দেখতে পেল টুপুর—রোদ পিছলে যাচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে ; মনে হলো ওইভাবে ফণা তুলে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। একটু পরেই আবার ফণা গুটিয়ে এঁকেবেঁকে এগোতে লাগল গেটের দিকে।

টুপুর সাপ চেনে না। কলকাতার বাড়িতে সাপ বেরোয়নি কখনো ; জ্যান্ত সাপ দেখেছে চিড়িয়াখানায় আর রাস্তার ধারে সাপুড়ের খেলায়। ইউনিভার্সিটির লাগোয়া পুকুরের পাশে একবার মাথা থ্যাঁতলানো একটা মরা সাপ দেখে গা গুলিয়ে উঠেছিল শুধু। তবু, এই মুহূর্তে সাপটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো বিষাক্তই হবে। গোখরো কিংবা কেউটেও হতে পারে। ওইটুকু জীব, কিন্তু, হিংস্র চেহারায় সূর্যের আলোটাকেও ম্লান করে দিচ্ছে যেন !

নিচের তলার ফ্যামিলিটা ছুটিতে গেছে, এখানে এসে পর্যন্ত দেখছে কোয়ার্টার্সের জানলা-দরজা সব বন্ধ—লেটারবক্সটা গাদাগাদি হয়ে আছে চিঠিতে। গা ধুতে বাথরুমে ঢুকেছে শর্মিলা, বেরুলে টের পেত। ঘড়ি নামের যে-লোকটা শর্মিলাদের কাজকর্ম করে, বৃষ্টি থামবার পরপরই সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে বাজারে। লনের পাশে লাল সুরকির প্যাসেজের ওপর এখনো লেগে আছে চাকার দাগ। আশেপাশে আর কেউ নেই কোথাও, চিৎকার করে ডাকলেও শুনতে পাবে না কেউ। সে দাঁড়িয়ে আছে দোতলায়, এখান পর্যন্ত সাপটার এগিয়ে আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তবু ভয়ে আর আশঙ্কায় হিম হয়ে এলো বুক। দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে গেটের কাছাকাছি পৌঁছে আর একবার মাথা তুলল সাপটা, তারপরেই গেটের তলা গলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ওদিকটায় পাঁচিলের আড়াল, আর দেখা যাচ্ছে না। তবু, আরও কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকল টুপুর। বিড়বিড় করে বলল, 'লতা—লতা—লতা—।' সাপ দেখা ভালো নয় ; খুব ছোটবেলায় এই মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়েছিল মা।

বেতের গোল চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল টুপুর, নিচে রেলিংয়ে চিবুক পেতে রাখল। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না ঠিক। কাল রাত থেকেই একটা অস্বস্তি ছুঁয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। সাপটা এখনই দেখল ; কিন্তু কাল রাতে দেখা স্বপ্নটার মানে কী ! এখনো মনে পড়ছে, এই কোয়ার্টার্স, ওই দেবদারু গাছ আর কাঠের গেটটা হানা দিয়েছিল ঘুমে। ঈষৎ লম্বাটে, কালো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে, তারের জাল দিয়ে ঘেরা তার ভিতরটা দেখা যায় না। চারিদিকে আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। হঠাৎই একটা রোগা মতন ছেলেকে নির্দয়ভাবে টেনে হিঁচড়ে ওই গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগল কয়েকটা ষণ্ডামার্কা লোক। তাদের গায়ে কালো পোশাক—জ্যোৎস্নার আলো

সত্ত্বেও কোনো মুখই স্পষ্ট নয়। ছেলেটি চিৎকার করে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসল টুপুর। লোনা স্বাদে ভরে আছে মুখ, ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে উঠেছে গলা—অন্ধকার ঘরে কাচের দরজার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্না। একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে দ্রুত, তার শব্দ। শব্দটা অনেকক্ষণ লেগে থাকল কানে। আস্তে উঠে ব্যালকনির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল টুপুর। বাইরে শব্দহীন নিশুতি। শুধু ওই উঁচু চিমনিটা আগুনের জিব বুলিয়ে যাচ্ছে আকাশে।

আবার বিছানায় ফিরে উত্তেজনাটা সইয়ে নিতে লাগল টুপুর। স্বপ্নটা চেনা ; স্পষ্ট বুঝতে পারছিল কতো বছর আগেকার একটা দৃশ্য ওলটপালট হয়ে ফিরে এসেছে তার কাছে। কিন্তু কেন, ওই দৃশ্যটাই বা কেন !

অন্ধকার আবেগে বালিশে মুখ গুঁজে শরীরের কাঁপুনি টের পেল টুপুর। ঠিক কান্না নয়, তবে কান্নারই মতো। কেন এইভাবে হঠাৎ-হঠাৎ জাগিয়ে দিস আমাকে ! এতো দূরে চলে এসেছি, সেখানেও তুই ! আসবিই যদি, এ-রকম বীভৎস হয়ে আসিস কেন ! একটু ভালোভাবে সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো আসতে পারিস না ! কোন ভয় তুই দেখাতে চাস আমাকে ! আমি কি আড়াল দেবো তোকে, দিয়ে যাবো ! আমাকেও তো চলে যেতে হবে একদিন না একদিন, নাকি তখনো এইভাবে জ্বালাবি আমাকে ! কেন এই অসম্ভবের পিছনে সারাক্ষণ ছুটে বেড়ায় তোর চিৎকার ? এইভাবে আর্ত, অনিচ্ছুক ঘুমের মধ্যে আবার ফিরে যেতে যেতে টুপুর ভেবেছিল, এসব কথা কোনো দিন বলা যাবে না রজতকে। যদি যেত, তা হলে অন্য রকম হতো জীবন। তা হলেও কি সে ছুটে আসত এখানে ? এ কেমন টান, যা শুধুই ঘুরে ঘুরে বৃত্ত কেটে যায় চারপাশে, জড়ায় না কখনো ? নাকি পুরনো অনুভূতি থেকে স্বাদ নিয়ে নিয়ে নিজেই জালটাকে বড়ো করেছে সে—যতো দিন যাচ্ছে ততোই জড়িয়ে পড়ছে তাতে ; রজত এসবের কিছুই জানে না ! জানলেই বা হতো কী ? স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে কি ভালোবাসা হয় ! যদি হয়, তারপর ? ফুটো নৌকোয় কতো দিন পাল তুলে রাখা যায় ! এতো জেনেবুঝেও তবু কেন যে মন-কেমন করে ! না, দরকার নেই এখানে—এই ভার নিয়ে এখানে থাকার মানে হয় না কোনো। সকালেই অনেকগুলো ট্রেন আছে, শর্মিলাকে বলবে তাকে তুলে দিতে, সে একাই ফিরে যেতে পারবে।

রাতের মনে রাত চলে গেল। কেমন ব্যাপার দ্যাখো, কিছুই যদি ইচ্ছেমতো হয় ! এতো ভেবেও এই বিকেলে আমি বসে আছি এখানে ! আজ ফেরা হলো না, কাল হবে না—তার পরের দিনও নয়। আমার কি ইচ্ছে নেই, জোর নেই কোনো ! তারও পরের দিন বুঝি কলকাতায় যাবে অশোক, সে যতোক্ষণ না নড়ছে ততোক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে এখানে ! ওই ট্রাঙ্ককলটাই মাটি করে দিল সব। কাল রাতে ওরা ঠিক করল পরেশনাথ বেড়াতে যাবে শনিবার, কেন যে রাজি হতে গেল তাতে। সন্দীপও বলেছিল বলে ? হতে পারে। মা ভাববে, কথা ছিল দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে—চিঠি দিলে হয়তো পৌঁছুবে না সময়মতো। সেই জন্যে ট্রাঙ্ককল। তখনই কয়েকবার চেষ্টা করল অশোক, না পেয়ে সকালের জন্যে বুক করে রাখল লাইন। মাঝরাতে অমন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার পর টুপুর ভেবেছিল, কাজ নেই পরেশনাথ গিয়ে—আজই সে ফিরবে কলকাতায়, যে করেই হোক। শর্মিলাকে বলবে, ট্রাঙ্ককলের দরকার নেই, এখানে ভালো লাগছে না আর—আমি ফিরে যাবো। হলো না ! এমনিই শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল ! ঘুম ভাঙল অশোকের দরজা ধাক্কায়—'তাড়াতাড়ি ! তোমার মা— ।' ছুটে গিয়ে দেখল যা বলার সবই

শর্মিলা বলে ফেলেছে ততোক্ষণে ; রিসিভারটা হাতে নিয়ে 'মা ?' বলবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো চাঁপার, 'শুনেছি। দু' দিন পরেই এসো। ভালো আছো তো ?' ঘুম-জড়ানো মাথায় সব ইচ্ছে জট পাকিয়ে গেল কেমন, মরিয়া গলায় জিজ্ঞেস করল টুপুর, 'মা, কেউ খোঁজ করেছিল আমার ?' বড্ড ডিসটারবেন্স লাইনে, শুধু নিজের গলাই শুনতে পেল সে—চাঁপা কী বলল বোঝা গেল না! ওদিক থেকে যান্ত্রিক গলায় অপারেটর বলে উঠল, 'সিক্স মিনাট্স্ ওভার।' তারপরেই কেটে গেল লাইন।

সূর্যটা বোধ হয় ডুবতে শুরু করেছে, আলো মলিন হতে তাই মনে হলো টুপুরের। কলকাতার মতো নয়—সকাল, দুপুর, রাত সবই এখানে চেনা যায় আলাদা করে। আর, রাত মানেই রাত, ছোটবেলায় বইয়ে পড়া ছমছমে শব্দগুলো জোট বাঁধতে শুরু করে একসঙ্গে। তবু, অল্প ছায়াছড়ানো বিকেলের আলোর দিকে তাকিয়ে টুপুর ভাবল, রাতই ভালো—আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিন পেরিয়ে যাবে সে। ছ' দিন হয়ে গেল, কাল ভোরে জেগে উঠলে পা দেবে সাত দিনে। আরও চব্বিশ ঘণ্টা পরে আট দিন, তারপর—। খুব ভালো হতো যদি ওষুধ দিয়ে কেউ তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখত। দু' তিন দিন—ঘুম ভাঙতেই নিজেকে আবিষ্কার করত কলকাতার ট্রেনে। এমন হবে জানলে একটা চিঠি দিতে পারত রজতকে। যা ছেলে, হয়তো গুরুত্বই দিত না কোনো! দেখা হলে বলত, স্ট্রেট প্রেমপত্তর ঝেড়ে দিলি! যাঃ, প্রেমপত্র হবে কেন! সে বড়ো লজ্জার! এমনিই চিঠি, ছোট্ট চিঠি, নিচে আরও ছোট্ট করে লেখা টুপুর—। কোনো মানে হতো না সে-চিঠির, তবু।

দুঃখের মধ্যে নাক ঘষে যায় সুখ। মন খারাপ ঢেউ তুলে যায় বুকে। শব্দ হয় না কোনো। একা পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে টুপুর। ঠিক বুঝতে পারে না, কেন সে শর্মিলার কথায় হুট করে চলে এসেছিল এখানে, কেন এক কথায় রাজি হয়ে গেল মা! কেন সে নিজেই ভেবে দেখল না, সত্যি সত্যিই এই যাওয়ার কোনো মানে হয় কি না। সন্দীপের জন্যে ? এক দিনের একটু ভালো লাগাকে চিরদিনের মতো বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ? যদি তাই হয়, এ ক'দিনে তো অনেক বেড়ানো হলো একসঙ্গে, অনেক কথা—মাইথন যাবার রাস্তায় একই গাড়িতে পাশাপাশি বসে গিয়েছিল তারা, অন্য গাড়িতে শর্মিলা আর অশোক ; তবুও কেন মনে হচ্ছে এই মেলামেশার কিছুই স্বাভাবিক নয়, এর সব কিছুর মধ্যেই কেমন একটা হ্যাংলামো জড়ানো! কেন মনে হচ্ছে সে শুধুই পেতে চাইছে—পাবার ইচ্ছেটা যতো তীব্র, দেবার জন্যে ব্যস্ত নয় ততো! তবে কি সন্দীপের সঙ্গে দেখা হবার পর নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে মনে একটা ধারণা গড়ে তুলেছিল সে—সযত্নে হাত বুলিয়েছে সেই ধারণাটার গায়ে ; বিয়েটা হতেই হবে এই ভেবে একটা স্বাচ্ছন্দ্য থেকে পা বাড়িয়েছিল আর একটা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ? ওরা যে অ্যারেঞ্জড বলে, তা কি এই ? তা হলে সন্দীপ কেন, কেন সে অপেক্ষা করতে পারবে না আরও কিছু দিন ? হয়তো বহু দিন! যে-জীবনটা এখনো পড়ে আছে তার জন্যে, তা কি এতোই খারাপ ? এ কেমন ভালো লাগা যা খুশি হয়ে ওঠে সান্নিধ্যে, অথচ আড়াল হলেই একাকার হয়ে যায় যে-কোনো অনুভবের সঙ্গে ? এসব জেনেও যদি মেনে নিই, তা হলে, দেখতে দেখতে আমিও কি হয়ে যাবো শর্মিলার মতো ? কিংবা, তার চেয়ে একটু ভালো, বা একটু খারাপ ? শর্মিলার মতো! আ-হা, কী জীবন!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল টুপুর। দূর থেকে সাইকেলের ঘণ্টি শুনে দেখল, ঘড়ি

আসছে। মাঝবয়েসী মানুষটা। নিজের মনে কাজ করে যায় সারাক্ষণ, কাজ করতে করতেই গুনগুন করে, হাসে। কাছেই বেনাচিতি না কোথায় নিজের ঘরসংসার আছে তার। রাত্রে চলে যায়, ভোর না হতেই ফিরে আসে আবার। কখন যায়, কখন ফিরে আসে—এ ক'দিনে বুঝতে পারেনি টুপুর। সে তো সারাক্ষণই দেখছে! মানুষটা ভালো, বোঝা যায় না সুখী না দুঃখী। বুঝতে দেয় না। বললে কি ঘড়িই পারবে না তাকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিতে।

এভাবে ভালো লাগে না। এতোক্ষণের চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা বুকের মধ্যে পাকিয়ে উঠতেই ঠোঁটে হাত চাপা দিল টুপুর, হাই তুলল। সকালে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি, ভাবল, এবার শর্মিলাকে বলবে, পরেশনাথ থাক। না হয় পরে আসা যাবে আবার। তুই যা ভাবছিস তা নয়—আমার আর এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না এখানে। আমার ফেরার ব্যবস্থা কর।

গেট খুলে ভিতরে ঢুকল ঘড়ি। এক হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল, অন্য হাতে একসঙ্গে অনেকগুলো মুরগী ঝোলানো। তাকে দেখে হাসল, হাত তুলে দেখাল পাখিগুলো।

'তন্দুরী বনেগা। আজ রাত কো পার্টি হ্যায় না যশবীর সিং সাবকো কোঠি মে—'

টুপুর হাসল। জানে। অশোকদার বন্ধু যশবীর, কাজ করে একসঙ্গে। পরশু এসেছিল বউ রেশমীকে নিয়ে, অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-চৈ করে গেল। হালে বাইরে গিয়েছিল সুইডেন না কোথায়—কী সব ফিল্ম্-টিল্ম্ নিয়ে এসেছে সঙ্গে, দেখাবে। রাতে ওর কোয়ার্টার্সেই ডিনার। রেশমী মেয়েটা সুন্দর; যেমন অ্যাট্রাকটিভ, তেমনি স্মার্ট। তাকেও যেতে বলেছে। টুপুর জানে, ওটা ভদ্রতা। না গেলেও কিছু নয়। ওরা যায় যাক। এতো হৈ-চৈ ভালো লাগে না—আজ তার একা থাকতেই ভালো লাগবে।

সাইকেলটা গায়ে ঠেসিয়ে রেখে মুরগীর মাথা গুনছে ঘড়ি। বোধ হয় হিসেব মেলাতে পারছে না। লনের ওপর সাইকেল আর মানুষের কিম্ভূত ছায়া। একটু আগে দেখা সাপটার কথা মনে পড়ে গেল টুপুরের। উঠে দাঁড়াল।

'এই ঘড়ি—', কাঠচাঁপার গাছটার দিকে আঙুল তুলে টুপুর বলল, 'উধর সাপ কিঁউ হ্যায়?'

'সাপ!' মুরগী গোনা ছেড়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল ঘড়ি, আশেপাশে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলো একটু, 'কিধর মেমসাব?'

'ওই গাছকে তলাসে বার হোকর লনসে চলা গিয়া—'

টুপুরের আঙুল লক্ষ্য করে গেট পর্যন্ত তাকিয়ে সায় দিয়ে মাথা নাড়ল ঘড়ি। গুরুত্ব দিল না তেমন। বলল, 'সাপ তো জরুর হ্যায়—'

টুপুরের মনে হলো লোকটি তার ভাষা বুঝতে পারছে না। হয়তো এখনো আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে সাপটা, যে-কোনো সময়েই বেরিয়ে আসবে আবার। যাকে সামনে পাবে তাকেই ছোবল মারবে। যেন এখনো দেখতে পাচ্ছে তার কালো জ্বলজ্বলে চোখদুটো, ফণাটাও! অল্প কেঁপে উঠল টুপুর। লোকটা বুঝছে না কেন, ওর কি ভয়ডর নেই!

আর কিছু বলবার আগেই চলে যেতে যেতে একগাল হাসল ঘড়ি। বলল, 'সাপ মুরগী নেহি খাতা—সাবলোগ খাতা—'

কোন কথার কী উত্তর! টুপুর হেসে ফেলল। আচ্ছা বোকা তো!

ঘরের মধ্যে থেকে শর্মিলা বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস, টুপুর?'

দু' হাতে দু' কাপ চা, গায়ে আলগা করে জড়ানো শাড়ি। ব্লাউজ পরেনি এখনো। চায়ের

গন্ধ ছাপিয়ে ভুরভুর করছে সাবানের সুগন্ধ। গা ধুতে এতোটা সময় লাগে না—দেরির কারণটা বোঝা গেল। চা তৈরি করছিল শর্মিলা।

ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে টুপুর বলল, 'আমি একটা সাপ দেখলাম!'

'সাপ! কোথায়!'

'ওই গাছটার তলা থেকে বেরিয়ে গেটের বাইরে চলে গেল। মনে হলো গোখরো—'

'গোখরো!' একবার কাঠচাঁপার গাছটার দিকে তাকিয়ে নিল শর্মিলা। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তুই সাপ চিনিস?'

'না।'

'তবে!' চায়ে চুমুক দিতে দিতে পুরো লনটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল শর্মিলা। কথাটা হাল্‌কাভাবে বললেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না যেন, খুঁজছে। পরে বলল, 'বর্ষায় শুনেছি হেলে সাপটাপ বেরোয়। আমি কখনো দেখিনি—'

'হেলে সাপের ফণা থাকে?'

'তাও তো জানি না। বোধ হয় থাকে না—', শর্মিলা বলল, 'ঘড়িকে বললি? কী বলল?'

'ও আমার কথা বুঝতেই পারেনি—'

'কাল বলব তো!'

দু'চারজন করে মানুষ দেখা যাচ্ছে ক্রমশ। ক্রিং-ক্রিং বেজে উঠছে সাইকেলের ঘন্টি। ক্বচিৎ মোটরের হর্ন। তার মানে ছুটির সময় হলো। এরপর আস্তে আস্তে লোকজন বাড়বে; কিছুক্ষণের ব্যস্ততা, শব্দ। অন্ধকার হলেই থেমে যাবে আবার। এখনই পড়ে এসেছে বেলা। টুপুর দেখল, আগুনের জিব থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আকাশে উড়ে যাচ্ছে ছোট বড়ো রাশি রাশি ফুলকি। এখনো সাদাটে ভাব যায়নি; অন্ধকার গাঢ় হলে পুরোপুরি লাল হয়ে যাবে রঙ। সেদিন মাইথন থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়েছিল—অনেক দূর থেকেই দেখেছিল টুপুর, নিরাকার আকাশে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আভা ছড়াচ্ছে আগুনটা। তারা আসছিল, চুপচাপ—শব্দ বলতে ওই গাড়িতেই যেটুকু। সন্দীপ বলল, 'রাতের অন্ধকারে সবই কেমন অন্য রকম লাগে, না?' হয়তো লাগে, টুপুর ঠিক জানে না—হয়তো সমস্তই নির্ভর করে সবই-টা কী, তার ওপর। জবাব না দিয়ে সন্দীপের স্টিয়ারিং-ধরা হাতটার দিকে তাকাল ও। সেদিন পিকনিকে যাবার সময় একভাবে ভেবেছিল, আজ কিছুই ভাবল না। সময় সব ভাবনা যত্ন করে তুলে রাখে না। শুধু দেখল, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে রিস্টওয়াচের রেডিয়াম। সময়ই জেগে থাকে।

চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ করল টুপুর। শর্মিলাও শেষ করেছে ইতিমধ্যেই। দুটো কাপই তুলে নিয়ে ঘরে রেখে এসে আবার জায়গায় দাঁড়াল টুপুর। শর্মিলার চোখ চিমনিটার দিকে। আকাশ আরও একটু কালচে হলে আগুনটা লাল হবে আরও। এটা অশোকের বাড়ি ফেরার সময়। কোন ভোরে বেরিয়ে যায়—দুপুরে খেতে আসে ঘণ্টাখানেকের জন্যে, তারপর বেরিয়ে যায় আবার। এর ওপরেও যখন-তখন আছে; টেলিফোন এলেই হলো, ছোটো। একা-একা সারাদিন কী করে যে কাটায় শর্মিলা! কীরকম জীবন এদের! অশোক তো সন্ধে হলে রোজই মদের গ্লাস তুলে নেয় হাতে! চেহারাটাও অন্য রকম হয়ে যায় তখন, মনে হয় নিজের ভিতরে ডুবে গিয়ে ভাবছে কিছু—এমন কিছু যার সঙ্গে সম্পর্কটা তারই একার। আর কেউ এসে পড়লে অবশ্য অন্য কথা। প্রায়ই আসে—কিংবা ওরাও

যায় ; সন্দীপ আছে ; তারপর, সেদিন যেমন যশবীর এসেছিল । হৈ-চৈ জমে ওঠে । তখন শর্মিলাও গ্লাস তুলে নেয় হাতে । ভাবা যায় ! জোরজার করায় সেদিন সেও অবশ্য একটু ব্র্যাণ্ডি চেখে দেখেছিল ; 'ব্র্যাণ্ডি রুগীরাও খায়—', সন্দীপ বলল, 'ওতে দোষ নেই ।' টুপুর জানে, শেখরও খায় মাঝে মাঝে—বলে তো ব্র্যাণ্ডি ! কান আর পায়ের চেটো গরম-গরম লাগতেই এক চুমুকে তলানিটুকু শেষ করে সরিয়ে রেখেছিল গ্লাসটা । যশবীর বলল, 'কাম, হ্যাভ অ্যানাদার ।' সে গা করেনি ।

'কিছু ঠিক করলি ?'

'কী ?'

শর্মিলা তাকাল ; এমনভাবে—যেন এরই মধ্যে উত্তরটা আশা করেছিল । একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'জানিসই তো সন্দীপদা বাইরে যাবে । তার আগেই—মাসিমাকেও একটা কিছু বলতে হবে তো !'

'যা বলার আমিই বলব ।' আড়াল না রেখে বলল টুপুর, 'তুই এতো ব্যস্ত হচ্ছিস কেন !'

শর্মিলা কী বুঝল কে জানে, চুপ করে গেল । তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'সন্দীপদাকে তোর ভালো লাগেনি ?'

'ভালো লাগবে না কেন !' টুপুর হাসল, 'আমার কাউকেই খারাপ লাগে না—'

'তাই বুঝি !' একটু বা অবাক শর্মিলা, কথাটা রহস্য না সত্যি বুঝবার চেষ্টা করল—একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লনের দিকে । ভাবতে ভাবতেই বলল, 'বিয়েটা যার যার ভাগ্যে । তোর ভাগ্য ভালো, তাই এমন একটা সম্বন্ধ এসে গেল । ফেলে দিলে ঠকবি—'

'আমি এখন ওসব ভাবছিই না— ।' কথা বলতে ভালো লাগছিল না টুপুরের । তবু শর্মিলা সিরিয়াস দেখে হাল্‌কা করার চেষ্টা করল, 'তোর সন্দীপদার কুষ্ঠিটা দেখিস তো, সেখানে আমিই আছি কি না—'

'কুষ্ঠি দেখে বিয়ের দিন চলে গেছে ।' পরের কথাটা আগেই ভেবে নিল শর্মিলা । বলল, 'সকাল থেকেই মনমরা দেখছি তোকে ! কী হয়েছে বল তো !'

'কবে বাড়ি ফিরব ভাবছি—'

'বাড়ি ! এই ট্রাঙ্ককল করলি সকালে—পরেশনাথ যাবার প্রোগ্রাম হলো— !' টুপুরের কাছে ঘেঁসে এলো শর্মিলা, কী ভেবে হাত ছোঁয়াল কপালে, 'ব্র্যাণ্ডি খাবি একটু ? চাঙ্গা লাগবে ।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না টুপুর । দেখল, ঘড়ি এসে দাঁড়িয়েছে নিচে। হাতে রক্ত-মাখানো ছুরি । ওপরে তাকিয়ে শর্মিলাকে বলল, 'তিশ পিস্‌ নিকালা, মেমসাব—'

'ঠিক হ্যায় । বানাও— ।' গায়ের কাপড়টা ঠিকঠাক করে নিল শর্মিলা । ঘড়ি চলে যেতে বলল, 'লোকটা কাজের—'

'তোরা মদ খাস কেন ?'

'মদ ! কী গাঁইয়া কথা রে বাবা ! ড্রিঙ্কস্‌ বল— !'

'ওই হলো ।'

'এখানে সবাই খায় ।' শর্মিলা বলল, 'লোকগুলোর খাটুনি এতো—রোজগার করতে করতে জিব বেরিয়ে যায় । রিল্যাক্সড হবার জন্যেও তো একটা কিছু দরকার—'

হয়তো । চুপ করে থাকল টুপুর । এরই মধ্যে বদলে গেছে ঘাস ও সুরকির রঙ ; পশ্চিম দিকের আকাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে কমলা আভা । কাঠচাঁপার গাছটা ঝুঁকে গেছে

আরও, ঘন ছায়ার জন্যেই সম্ভবত, পাশের দেওয়াল বা নিচের মাটি আলাদা করে চেনা যায় না। সাপটাকে যখন দেখেছিল তখন রোদ ছিল, আর একটু পরেই অন্ধকার হবে—যদি আবার ফিরে আসে দেখা যাবে না। ভেবে কেমন যেন গা সিরসির করে উঠল টুপুরের। এক যদি রেডিয়ামের মতো জ্বলজ্বল করে চোখদুটো!

'ওই রজতটার সঙ্গে মিশেই তুই অমন হয়ে গেছিস। এর চেয়ে যদি পল্লবের সঙ্গে মিশতিস—বেশ স্মার্ট—'

শর্মিলা অন্যমনস্ক ; নিজেকেই শোনাল যেন। প্রসঙ্গটা ধরতে পারল না টুপুর। রাগও হলো।

'ওদের টানছিস কেন!'

'এমনিই।' নিজেকে আড়াল করে গেল শর্মিলা হেসে বলল, 'আসলে কী জানিস, বিয়ের আগে ছেলেদের এক রকম লাগে, বিয়ের পরে আর এক রকম!'

'কী করে বুঝব! বিয়ে তো হয়নি—'

'হবে, হবে। হলে বুঝবে আমার পছন্দটি কেমন!' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টুপুরের গাল টিপে ধরল শর্মিলা, নাক ঘষে দিল ঘাড়ে। বলল, 'তখন দেখবি বিয়েটাও মদ—'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টুপুর।

'হঠাৎ এতো খুশি হয়ে উঠলি!'

'বলব কেন!' শর্মিলা রহস্য করল। তারপর ব্যস্তভাবে বলল, 'বাথরুমে যাবি তো যা, এইবেলা তৈরি হয়ে নে। অশোক এলেই কিন্তু আমরা বেরুব—'

'আমি যাচ্ছি না—'

'কেন!'

'এমনিই। ভালো লাগছে না।' টুপুর বলল, 'তোরা ঘুরে আয়। আমি বাড়িতেই থাকব।'

'এই একা বাড়িতে!'

'একা কেন? ঘড়ি থাকবে তো!'

'ওকে আজ একটু ছুটি দেবো ভাবছি। কোথায় যাত্রাপার্টি এসেছে—দেখে আসুক।'

'তা হলে একাই থাকব—'

'একা বাড়িতে তোমাকে রেখে যাবো আমি?'

'কী হয়েছে, কলকাতায় কতো দিন একা থাকি—'

'এটা কলকাতা নয়।' শর্মিলা বলল, গলায় শাসন মেশানো, 'আমার কথাও তো শুনবি একটু! আমি বলেছি নিয়ে যাবো তোকে। সবাই যাচ্ছে ; না গেলে ভাববেই বা কী!'

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে টুপুর বলল, 'ভালো না লাগলে কী করব!'

'গিয়ে দ্যাখ তো, গেলেই ভালো লাগবে।' সোজাসুজি তাকিয়ে বলল শর্মিলা, 'ভালো না লাগলে ফিরে আসিস আমার সঙ্গে—'

কথাটা শেষ হবার আগেই দূরে গাড়ির হর্ন শুনল ওরা। চেনা আওয়াজ। অশোক ফিরছে। গাড়িটাকে কোয়ার্টার্সের কাছাকাছি আরও খানিকটা এগিয়ে আসতে দিল শর্মিলা। তারপর ভিতরে যেতে যেতে বলল, 'তৈরি হয়ে নে—'

এই এক অসুবিধে তার! টুপুর ভাবল, তেমন করে জোর খাটাতে পারে না কোথাও। সাত-পাঁচ এতো যে ভাবে, তবু কোনো ভাবনাটাকেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে না

শেষ পর্যন্ত। মন খাড়া করে যে ধরে থাকবে একটা কিছুকে, তা আর হয় না। মনটা খারাপ হয়ে যায় আরও। মনে হয় এতোটুকু প্রতিরোধ নেই তার—নেই নিজস্ব কোনো দুর্গ, ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে যার আড়ালে। একটু আগেই রজতকে নিয়ে একটা খোঁচা দিল শর্মিলা। মিলের ব্যাপারই যদি হয়, রজত তো তার একেবারে উল্টো! নিজে যেটা বুঝবে, যেটা গোঁ ধরবে, তার বাইরে কেউ তাকে নড়াক দেখি এক চুলও! অথচ, সে? পারত না কি শর্মিলাকে বলতে, কে কী ভাবল আমার যায় আসে না কিছু; এই যে মন—এটা আমার, আমারই, এর মান-অভিমান-ইচ্ছা-অনিচ্ছা তোর ওই যশবীরের পার্টিতে যাওয়ার চেয়ে কিছু কম বড়ো নয়! অন্তত আজ, এই মুহূর্তে, এই মনটাকে আমি চিনতে পারছি আগের চেয়ে অনেক ভালো করে। তোরা তোদের আনন্দ নিয়ে থাক—একে নিয়েই একা-একা দিব্যি সময় কেটে যাবে আমার। আমি যাবো না।

না, আমার কিছু হবে না। আমি শুধুই ভেবে যাবো। মনজোড়া কথা নিয়ে আজ বাদে কাল ফিরে যাবো কলকাতায়; কাউকে কি বলতে পারব কিছু?

চাপা অভিমান নিয়ে এরপর অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল টুপুর। যেন সে শুধুই ভেবে যাচ্ছে, তার হয়ে তাকে গুছিয়ে দিচ্ছে আর কেউ। সে-ই বলল, জলজরি পাড়ের ওই কালো শাড়িটা পরো, টুপুর, তোমাকে মানবে। কপালের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট করে টিপ এঁকে নাও একটা; ঠোঁটে হাল্‌কা ন্যাচারাল কালার। কেউ বলবে না মন খারাপ বলেও তুমি সেজে এসেছ। তবে, এই সাধারণ সাজেও তুমি সুন্দর। কপালের ডান দিকে চিরুনিটা বুলিয়ে নাও তো, ব্যাস। ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ বেরিয়ে আছে—ব্লাউজের হাতাটা গলার কাছে টেনে নাও অল্প। আর কিছু নয়। নিজেকে স্বাভাবিক করো। আজ যাও। শর্মিলাকে যা বলেছ তাতেই তার বুঝতে পারা উচিত তোমার কাছে ফিরে যাওয়াটাই এখন সবচেয়ে জরুরী। তুমি না চাইলে কে আটকাবে তোমাকে! যেন একটা কলের পুতুল—বুকের ওপর হাত রাখল টুপুর, মার শেখানো, কোথাও যাবার আগে যেমন করে। তারপর এগিয়ে গেল।

অশোক দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির সামনে। দেখেই বলল, 'বাঃ।'

লজ্জিতভাবে বলল টুপুর, 'খারাপ লাগছে?'

'ডিভাস্টেটিং! বলব?' চোখ বুজে ভাববার ভান করল অশোক, 'দ্য নাইট হারসেলফ্ হ্যাজ কাম ডাউন উইথ অল হার বিউটি!'

শর্মিলা পিছনেই উঠছিল, টুপুরকে দেখতে দেখতে মন বদলাল। সামনের দরজা খুলে অশোকের পাশে বসতে বসতে বলল, 'শিফনটা পরলি না কেন! মানাত!'

'যেটা সামনে পেলাম, পরলাম।' সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকাল টুপুর। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ভেবে পরিনি—'

'টুপুর তো যেতেই চাইছিল না—! সাধতে হলো।'

'কেন?'

প্রশ্নটা তাকেই। তবু চুপ করে থাকল টুপুর।

পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে পলকের জন্যে তাকে দেখে নিল অশোক।

'তোমারই তো যাওয়া দরকার। না গেলে একটা এক্সপিরিয়েন্স মিস করতে—'

টুপুর শুনল। আধখানা মন দিয়ে জবাব দেওয়া যায় না সব কথার। দরকারই বা কী! বরং সে চুপ করে থাকবে, এইভাবে, ওই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করল টুপুর। ক্লান্তি। সবচেয়ে ভালো হতো যদি ঘুমোতে পারত।

পাঁচ মিনিটও নয় বোধ হয়। ওরা পৌঁছে গেল। দরজা খুলেই তাকে দেখে হাত ধরে টেনে নিল রেশমী।

'আমরা ভীষণ খুশি—'

এরই মধ্যে এসে পড়েছে অনেকে। সকলের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, 'সন্দীপদা আসেনি?'

'এসে যাবে—।' যশবীর বলল, 'হি র‍্যাং আপ। একটু আটকে পড়েছে, বাট হি উইল কাম।'

'ব্যস্ত হবার কী আছে!' শর্মিলার দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, 'ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও টুপুরের—'

'আয়।' শর্মিলা বলল, 'ইনি মিস্টার রেড্ডী, আনম্যারেড। অলোক দত্ত। খেয়ালী—মানে মিসেস দত্ত। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস প্যাটেল—।' পরিচয় শেষ করে হাসল শর্মিলা, 'আর একজন আসবে। তাকে তুই আগেই চিনিস!'

ভালো লাগে না বারবার একই ধরনের কথা। বিকেলে অতো কথার পরও কেন যে জের টেনে চলেছে শর্মিলা বোঝা যায় না। নিজেকে গুটিয়ে নিল টুপুর। হাতে হাতে গ্লাস দেখে মনে হচ্ছে এরা আগেই এসেছে। সবাই খায়, কথাটা ভুল বলেনি শর্মিলা। মেয়েরাও? অশোকের হাতে গ্লাস তুলে দিল যশবীর। এক দিকে উঁচু টেবিলের ওপর আর একটা টুল চাপানো, তার ওপর প্রোজেকটর। সোফা ও চেয়ারগুলো যেভাবে সাজানো তাতে মনে হয় সামনের দেওয়ালটাকেই পর্দা করবে। শেখরের বিয়ের পর বিয়ের ছবিগুলো এইভাবে দেখানো হয়েছিল তাদের বসার ঘরে। এখানে কোন ছবি? গ্লাস হাতে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রেড্ডী—একটু বা ঝিমুনো, তবু পলক পড়ছে না চোখের। চোখ ফিরিয়ে নিল টুপুর। রেশমী ছুটে এসে বলল, 'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ টুপুর? কী দেবো?'

এরা স্বামী-স্ত্রী বাংলাটা ভালোই বলে। টানটা যদিও অন্য রকম। টুপুর বলল, 'কিছু না—'

'কিছু না কেন? ইউ মাস্ট হ্যাভ সামথিং!'

টুপুর শর্মিলার দিকে তাকাল, কিছুটা অসহায়। ততোক্ষণে রেশমী ওকে বসার ঘরের সংলগ্ন গ্রিল-দেওয়া জায়গাটায় নিয়ে এসেছে, ওখানেও কতকগুলো রঙিন, গদি-আঁটা চেয়ার। গ্লাস হাতে খেয়ালীও এসে পড়ল। শর্মিলা বলল, 'ব্র্যাণ্ডি খা না! আগেও তো খেয়েছিস?'

'আমি বরং কোল্‌ড্‌ ড্রিংক্‌স্‌ কিছু খাই—'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন ভাই!' খেয়ালী নিজের গ্লাসটা তুলে দেখাল, 'রেশমী, গিভ হার ব্র্যাণ্ডি!'

শর্মিলা বলল, 'আমি কিন্তু হুইস্কি—'

রেশমীর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে একটুক্ষণ নাকের কাছে ধরে রাখল টুপুর। আমি বদলে যাচ্ছি না তো? ভাবল, খাবো? তারপর একসঙ্গে অনেকটা গিলে ফেলে গলা ও বুকের অতর্কিত জ্বালায় চোখ বন্ধ করল, আবার খুলল—যেন একটা খেলা; ঈষৎ হেসে গ্লাসে চুমুক দিল আবার।

'অতো তাড়াতাড়ি খাস না!' শর্মিলা বলল, 'মাথায় চড়ে যাবে—'

'কিচ্ছু হবে না।' রেশমী বলল 'টেক ইট ইজি! ফিল হোমলি। এখানে কোনো অসুবিধা

নেই—'

হাত ধরে একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিল রেশমী। খেয়ালীও বসল। টুপুর দেখল, মিসেস প্যাটেলও এসে দাঁড়িয়েছে। শাড়ি পরার ধরনটা আলাদা। একটু লক্ষ করে বুঝল, বাচ্চা হবে। এখনই বোঝা যায়।

'তুমিই বলছি—', খালি গ্লাসটা রেশমীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খেয়ালী বলল, 'খুব চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বলো তো তোমাকে ?'

প্রশ্নটা শুনেও শুনল না টুপুর। ওর শাড়ির আঁচলটা হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কী দেখছে মিসেস প্যাটেল। রেশমী পাশের ঘরে—ও-ঘর থেকে হঠাৎ ভেসে এলো উঁচু গলার হাসি। টুপুর একটা জ্বালা অনুভব করল, আলতো হাত তুলে ছুঁয়ে দেখল বাঁ কানের লতিটা। হাতের আঙুল না কানের লতি—কোনখানে উত্তাপ বেশি ? মাঝে মাঝে এইভাবে নিজেকে আদর করতে ভালো লাগে, ইচ্ছে করে ভুলে যেতে সব কিছু—একটু আগেই গাড়িতে আসতে আসতে যেমন ঘুমের কথা ভেবেছিল। আঙুল দুটো লতি থেকে আলাদা করল না টুপুর। ওইভাবেই চুমুক দিল গ্লাসে। খেয়ালী তখনো তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কোথায় ?'

'ভাবছি, মনে পড়ছে না—'

শর্মিলা বলল, 'সাউথ ক্যালকাটার মেয়ে। রাস্তা-ঘাটেই দেখেছ হয়তো—'

'না।' অল্প ঘোর-লাগা চোখ খেয়ালীর, 'গঙ্গার ধারে ওই রেস্তোরাঁটা—কী যেন নাম— !'

'সেখানে আবার কবে গেলি, টুপুর ?'

উত্তর না দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে রাখল টুপুর। একটা নয়, যেন একসঙ্গে দুটো মাথার ভার তার কাঁধের ওপর। চোখের পাশ দিয়ে দেখল গ্লাস শেষ করে আর একটার জন্যে নিজেই টেবিলের ওপর রাখা গ্লাস আর বোতলগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শর্মিলা। দেখাদেখি ও-ও শেষ করল। দেখল, সে আর রজত আগে পরে হয়ে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। উঠছে, না নামছে ? মাথাটা দু'পাশে একটু দুলিয়ে নিল টুপুর। মনে মনে বলল, ঠিক করিনি। ওর হাত থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিল খেয়ালী। রজত, কাল—কাল—অবশ্যই কাল ; তার আগে পর্যন্ত একটু একলা থাকতে দে আমাকে ! এইভাবে, কানের লতি থেকে ভারী হাতটা কোলের ওপর নামিয়ে আনল টুপুর। সামনে রেশমী—ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেছে হাতটা।

'না। আর না—'

'হ্যাভ ইট ! আমরা সকলেই খাচ্ছি—'

'নো। প্লিজ !'

'কাম— !' জোর করে হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল রেশমী। শব্দ করে চুমু খেল কপালে, 'ইউ আর সো স্যুইট ! আই ফিল লাইক মেকিং ইট !'

সকলেই হেসে উঠল একসঙ্গে। মিসেস প্যাটেল হাততালি দিয়ে বলল, 'দ্যাটস্ ইট ! মেক ইট—'

শব্দগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে ঢুকতে লাগল কানে। কথা হারিয়ে যাচ্ছে, কিংবা তার মানে বোঝা যাচ্ছে না কোনো। ভারী মজার অবস্থা তো ! নিজের মনেই হাসতে হাসতে গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিল টুপুর। অস্পষ্টভাবে ভাবল, কী আছে ! ব্র্যাণ্ডি রুগীরাও খায়। কে

বলেছিল ? কে বলেছিল যেন ! ভাবনাটা ধরে রাখতে পারল না।

শব্দ মিশে যাচ্ছে শব্দে। হাসি হাসিতে। আলো অন্ধকারে। অন্ধকারটাই গড়িয়ে যায়—আশেপাশের সমস্ত জায়গা অন্ধকারে মিশে ছোট হতে হতে ঢুকে পড়ে মাথার মধ্যে। একা লাগে। একা।

ঠিক কতোক্ষণ পরে জানে না, উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা টলে গেল টুপুরের। প্রাণপণে সামলে নিয়ে দু' পায়ের ওপর নিজেকে দাঁড় করাল কোনো রকমে। তারপর হাঁটতে লাগল।

'এই, টুপুর ! কী হয়েছে !'

শর্মিলার গলা। চেপে ধরেছে হাতটা। টুপুর বলল, 'আমি বাড়ি যাবো—'

'বাড়ি কেন !' ওকে বসাবার চেষ্টা করল শর্মিলা, 'তখনই বলেছিলাম ওভাবে খাস না !'

'মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে—', মুখে হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল টুপুর, 'গা গুলোচ্ছে। বাড়ি যাবো।'

'বমি করবি ?'

'না। বাড়ি—কেন কথা বলছিস এতো !'

টুপুর এগোবার চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি ধরে, অশোককে ডাকল শর্মিলা।

'ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে ।' ব্যস্ত হাতে ব্যাগ খুলে বাড়ির চাবিটা অশোকের হাতে তুলে দিল শর্মিলা, 'নভিসদের নিয়ে যা হয় ! আমি ওকে ধরছি, তুমি আমাদের পৌঁছে দাও—'

অশোক দু'জনকেই দেখল। তারপর বলল, 'এখানেই শুইয়ে দাও না—। কী টুপুর, শরীর খারাপ লাগছে ?'

বরফ-জলের বাকেটে হাত ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি টুপুরের কপালে বুলিয়ে দিল রেশমী। কয়েকবার। হাতটা নিয়ে গেল ঘাড়ে। টুপুর হাসল। বলল, 'না, না—। আমার কিছু হয়নি।'

'দ্যাট্স্ লাইক এ গুড গার্ল !' চাবিটা পকেটে রাখতে রাখতে অশোক বলল, 'খারাপ লাগলে বোলো। পৌঁছে দেব—'

যশবীর এতোক্ষণ বিব্রতভাবে লক্ষ করছিল ওদের। টুপুরকে কিছুটা স্বাভাবিক দেখে বলল, 'নো মোর ড্রিঙ্ক্স ফর হার। লেট্স স্টার্ট দ্য ফিল্মস—'

'গুড আইডিয়া !' টুপুরের হাত ধরে টান দিল খেয়ালী। টলছে। বলল, 'শুধু চোখদুটোই খুলে রেখো ভাই, আর কিছু—'

শর্মিলা একটা নতুন গ্লাস তুলে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, 'ডোন্ট বি সিলি ! আয়, টুপুর, আমার সঙ্গে আয়—। সন্দীপদাটা যে কী, এখনো এলো না !'

ওরা বসবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিবে গেল। শর্মিলার পাশে বসে টুপুরের মনে হলো ঠাণ্ডা জলের আরাম কাটিয়ে আবার ভারী হয়ে উঠছে মাথা—ঘোরটা উঠে আসছে দ্রুত। ঠিক একটু আগে যেমন হয়েছিল। অল্প এলিয়ে বসল ও। লক্ষ করে ওর হাতে চাপ দিল শর্মিলা, 'সোজা হয়ে বোস। নাম্বার কাউন্ট কর, ঠিক হয়ে যাবে—'

শর্মিলার ওদিকে অশোক। বলল, 'আবার কী হলো ?'

'কিছু নয়।' গ্লাসে চুমুক দিল শর্মিলা। টুপুরকে বলল, 'বেশি শরীর খারাপ লাগলে বলবি—'

'ক্লোজ ইওর আইজ, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন—', প্রোজেকটরের পিছন থেকে যশবীর বলল, 'উই আর কামিং টু এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড নাও। দ্য ওয়ার্ল্ড অফ লাভ! নাউ, প্লিজ ওপেন—'

পর্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কয়েক জোড়া যুবক-যুবতী। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই তারা পরস্পরের দিকে ঘুরে উলঙ্গ করতে শুরু করল নিজেদের। তারপর—

চোখ বন্ধ করল টুপুর। আবার খুলল। মনে হচ্ছে শরীর জুড়ে মাথা ছাড়া আর কিছু নেই; মাথাটা কেউ চেপে বসিয়ে দিচ্ছে ঘাড়ের ওপর। আর একটু পরেই অন্ধকার হবে। হঠাৎ উঠে-আসা একটা বমির ভাব চাপা দিল টুপুর। মনে হচ্ছে ক্রমশ তলিয়ে যাবে একটা গভীর গর্তের মধ্যে—তারপর আর উঠতে পারবে না। নিজেতে ফেরবার চেষ্টায় ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে ও বলল, 'ছি, এসব কী! এই দেখাতে এনেছিলি!'

'ন্যাকা!' চাপা বিরক্তির গলায় বলল শর্মিলা, 'ঘ্যান ঘ্যান করিস না—'

পর্দা জুড়ে রঙিন মাংসের চিৎকার। অন্ধকারে চোখ সরিয়ে নিতে গিয়ে টুপুরের মনে হলো, পাশের সোফায় বসে খেয়ালীর বুকে মুখ ঘষছে দত্ত। খেয়ালীই তো! দত্ত তো? অমন করছে কেন লোকটা! প্রশ্নগুলো দানা বাঁধবার আগেই হারিয়ে গেল। ও চোখ বন্ধ করল এবং ঘোরের মধ্যেই শরীর জুড়ে একটা ঠাণ্ডা ভয় অনুভব করতে করতে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি—'

'আঃ! ইম্‌পসিব্‌ল্!' শর্মিলা অশোককে বলল, 'দাও, ওকে বাড়ি পৌঁছে দাও—'

টুপুর ওঠার ভঙ্গি করতেই শর্মিলা ওর হাত ধরে টানল। ঘর জুড়ে স্তব্ধতা। মাংসের চিৎকারে মনে হচ্ছে দেওয়ালটাই ফেটে পড়বে এবার। কিংবা পর্দাটা। দৃশ্যটা এড়িয়ে গেল অশোক। একবার ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যাবে না?'

'না—'

'ও একা থাকতে পারবে?'

'পারবে, পারবে!' পর্দায় চোখ রেখে অদ্ভুত গলায় বলল শর্মিলা, 'ল্যাচ টেনে দিলেই হবে। তুমি ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যেও—'

বলতে বলতে গলা জড়িয়ে এলো শর্মিলার, হঠাৎ কপাল চেপে ধরল অশোকের কাঁধে।

'বিহেভ ইওরসেল্‌ফ্!' আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অশোক, 'আমি আসছি—'

টুপুর উঠে দাঁড়িয়েছে ততোক্ষণে। অশোক ওর কব্জি চেপে ধরল; তারপর প্রায় টেনেই এগিয়ে নিয়ে গেল অনেকটা। সামনে দিয়ে যাবার সময় মিসেস প্যাটেল বলল, 'ইউ শুডন্‌ট্ হ্যাভ ব্রট হার হিয়ার।'

'টেক ইট ইজি—'

একইভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল অশোক। রেশমী ছুটে এলো। থমথমে মুখ। খসে পড়া আঁচলটা ঠিকমতো গুছোতে পারছে না টুপুর, হাত রাখছে এলোমেলো। আঁচলটা গুছিয়ে দিয়ে পিঠে হাত রাখল টুপুরের।

'পুওর গার্ল! আমার এতো খারাপ লাগছে!'

অশোক হাসল। টুপুরের মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। হাতে অল্প ঝাঁকুনি দিতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'পারবে যেতে?'

মাথা নাড়ল টুপুর। নিজেই চেষ্টা করল এগোতে।

'নেভার মাইন্ড। ইট্স্ ও-কে। আমি ফিরে আসছি—'

সুবিধে এইটুকু, জায়গাটা সমতল। দোতলা হলে নামাতে অসুবিধে হতো, অশোক ভাবল, যেভাবে দ্রুত নিজেকে হারিয়ে ফেলছে মেয়েটি তাতে এই মাথা-নাড়া ভাবটুকুও কতোক্ষণ থাকবে বলা যায় না—দোতলায় তুলতে অসুবিধে হবে। গেট পেরিয়ে গাড়ি পর্যন্ত এসে অল্প দ্বিধায় পড়ল সে, তখন কী করবে! টুপুরের একটা হাত তখন থেকেই ধরে রেখেছে শক্ত করে। তাপটা হুইস্কির কিংবা পেরিয়ে আসা দৃশ্যগুলোর নাকি এই মেয়েটিরই শরীরের, বুঝতে পারল না। শুধু অনুভব করল গরম হয়ে উঠেছে মুঠোটা। একটু দাঁড়িয়ে হাতে ঝাঁকুনি দিল অশোক, 'টুপুর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? আমরা গাড়িতে উঠছি—'

জবাব না দিলেও কথাটা যে শুনেছে বোঝা গেল টুপুরের টান হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। মাথাটা আবার ঝুঁকিয়ে ফেলবার আগেই চটপট হাতে দরজা খুলে ওকে ভিতরে ঠেলে দিল অশোক। না, এখনো বেহুঁস হয়নি একেবারে; হলে কাত হয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিত না। এই হুঁসটুকু থাকতে থাকতেই পৌঁছুনো ভালো। তাড়াতাড়ি উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল অশোক; বাড়ির চাবিটা ঠিকঠাক পকেটে আছে কি না দেখে নিল। লোকটাও দিন বুঝে যাত্রা দেখতে বেরিয়েছে! না গেলে, যতোই খারাপ দেখাক, মদত দিতে পারত কিছুটা। ইতিমধ্যে ফিরে এলে ভালো। যদি না ফিরে থাকে, এবং এইভাবে পাশ-আউট করে মেয়েটি, তা হলে হয়তো পাঁজাকোলা করেই তুলতে হবে ওপরে। কিছুটা বিরক্ত, কিছুটা উত্তেজিতভাবে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল অশোক।

সিটের মাথায় একটা হাত আড়াআড়ি পাতা। মাথাটা রেখেছে তার ওপর। গাড়ির দুলুনিতেই সম্ভবত সাড় পেয়ে সোজা হয়ে বসল টুপুর।

'শর্মিলা কোথায়!'

'সে তো বসে রইল ওখানে। তুমিও থেকে গেলে পারতে—'

বলতে বলতে থেমে গেল অশোক; দেখল, মাথাটা আবার টলে আসছে টুপুরের। তারই কাঁধের দিকে। সরিয়ে দিতে গিয়ে কী ভেবে নিরস্ত হলো ও। থাক। কালো শাড়ি ব্লাউজে মোড়া শরীরের মধ্যে মুখ আর হাত দু'টিই যা সাদা। আচ্ছন্ন আলোয় সেই সাদাতেও লেগেছে অন্য রকম আভা। নাকে একটা গন্ধ লাগছিল—নিশ্চয়ই চুলের। গন্ধটা টানে।

মুখ ঘুরিয়ে আস্তে ওর চুলের গন্ধ নিল অশোক; নিঃশ্বাস টানল জোরে। এইভাবে কয়েকবার। গন্ধটা নিঃশ্বাসে মিশে যেতেই একরকম অবসাদের মধ্যে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল তার। সন্ধেবেলায় বেরুবার সময় কী বলেছিল মনে আছে এখনো—মনে মনে সেই কথাটিই বদলে নিল একটু, দ্য নাইট হারসেল্ফ্ হ্যাজ কাম ডাউন উইথ অল হার ফ্রেশ! ফ্রেশ! হাসতে লাগল। সন্দীপ, দিস ফ্রেশ বিলংস টু ইউ! এই মেয়েটাকে তোর সঙ্গে জুতে দেবার চেষ্টা চলছে—লাগলেই ছুটবি বাঘের মতো; রিস্ক নিয়েও সেদিন যেমন চাপ দিয়েছিলি ফিয়াটের অ্যাক্সিলারেটরে। এই মেয়েটা তোর। আটকে পড়ে মিস করলি। না হলে পাঁজাকোলা করে তুই-ই নিয়ে যেতে পারতিস ওপরে। আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতে পারতিস বিছানায়। সকালে উঠে যখন শুনত কী হয়েছে, কার কোলে চড়ে উঠে এসেছে ওপরে—শুনে কি লজ্জা পেত? রোমাঞ্চিত হতো? বুঝি না। কিন্তু, নিশ্চয়ই তোর দিকে এগিয়ে যেত অনেকটা! আর, যদি আমাকে নিয়ে যেতে হয়! কী হবে? লজ্জা পাবে,

দু'একবার সরি-টরিও বলতে পারে—ব্যাস, ফিনিশ ! তফাতটা আগেই হয়ে গেছে। আমি যে বিবাহিত ! নো চার্ম। নতুন করে কাউকে কিছু দেবার নেই, পাবারও নেই—কেউ আশাও করে না কিছু ! ম্যারেজ মেক্‌স্ এ ম্যান পুওর !

একটা হাসি উঠে এলো অশোকের গলায়। শব্দে না ফুটে সেটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল গোটা শরীরে।

কোয়ার্টার্সের সামনে এসে কাঁধের ওপর থেকে টুপুরের মাথাটা সরিয়ে দেবার আগে এক মুহূর্ত গন্ধটা ধরে রাখল অশোক।

'টুপুর— ?'

জবাব পেল না। তখন ওর গালে হাত দিয়ে চোয়ালটা নেড়ে দিল অশোক, 'টুপুর— ?'

'কী বলছেন !' অল্প মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল টুপুর। চোখ খুলল।

'এসে গেছি— ।' ইচ্ছে করেই একবার হর্ন দিল অশোক যদি কেটে যায় নেশাটা। তারপর বলল, 'নামতে পারবে তো ?'

ঘোরলাগা চোখে খানিক আশেপাশে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল টুপুর। আঁচলটা পড়ে গিয়েছিল, দু' হাতে জড়ো করে ধরল বুকের ওপর।

'শর্মিলা কোথায় ?'

'ওখানে। যেখান থেকে এলে—', বলতে বলতে গাড়ি থেকে নামল অশোক, গেটটা খুলে আবার ফিরে এলো গাড়িতে। দেখল, সিটের ওপর হাত, হাতের ওপর কপাল, টুপুর ঢলে পড়েছে আবার। গাড়িটা ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে অশোক ভাবল, আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে ওপাশের দরজাটা খুলে দিল অশোক। কিছু ভেবে তুলে নিল ওর হাতটা।

'নেমে এসো—'

'আমি পারব।'

টুপুর নেমে এলো। প্রায় স্বচ্ছন্দে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো অশোকের, স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে। মাঝখানে কয়েকটা সিঁড়ির ব্যবধান। দরজা। পকেটে হাত দিয়ে চাবিটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সে।

টুপুর দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো খাড়া, তবু কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরটা অল্প দুলছে যেন। চোখদুটো লনের দিকে। কী দেখছে বোঝা যায় না। ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই কপালে ঘাম ফুটতে লাগল অশোকের। মিহি জ্যোৎস্নার আলোয় অন্ধকার কাটেনি। অন্ধকারে অন্য রকম হয়ে ওঠে মেয়েরা। ঠিক কেমন ? ভাবতে গিয়ে শিরা কেঁপে উঠল। কিছু না ভেবেই এগিয়ে গেল অশোক।

'চলো—'

'ধরতে হবে না—'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল টুপুর। টলতে টলতে প্রায় সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়াল। মাথাটা আবার ঝুঁকে এলো বুকের ওপর।

'পারবে না—'

চোখ তুলবার চেষ্টা করল টুপুর। পাতা যেটুকু খুলল তার মধ্যে দিয়েই পরিষ্কার রক্তাভা দেখতে পেল অশোক। মনে হচ্ছে বসবার চেষ্টা করছে। আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়ার

উপক্রম করতেই এক হাতে ধরে ফেলল কোনো রকমে। তারপর ক্লান্তভাবে মাথাটা ঠেলে দিল পিছনে।

অশোক তৎপর হলো। ডান হাতে টুপুরের পিঠ ঘিরে, ওর বাঁ হাতটা তুলে জড়িয়ে নিল নিজের গলায়।

'পারবে না—কিছুতেই পারবে না—'

'শর্মিলা কোথায়!'

জিব দিয়ে কোনো রকমে ঠেলে দিল কথা দুটো। জবাব দিল না। ওঠবার ঝোঁকেই ওকে নিয়ে চার-পাঁচটা সিঁড়ি উঠে এলো অশোক ; পরের দু'তিনটে ধাপ উঠবার আগে দম নিল। মাথা হেলে পড়েছে টুপুরের। চোখ বন্ধ। খুব কাছে বলেই খানিক আগেকার ফেলে আসা গন্ধটা আরও গাঢ় হয়ে ফিরে এলো নাকে। পরপর মনে পড়ল অশোকের, তাকে ফিরে যেতে হবে এবং ফিরিয়ে আনতে হবে শর্মিলাকে। তার আগে কতোক্ষণ কীভাবে কাটবে জানা নেই। ভাবনাটা এলোমেলো করে দিল তাকে। যতো দূর সম্ভব টুপুরের শরীরটা টেনে দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলো ও। দরজা খুলল। স্যুইচ টিপে আলো জ্বালল। দরজাটা পিছনে ঠেলে দিয়ে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাল ওকে।

'একটু দাঁড়াও। তোমার ঘরের আলোটা জ্বেলে দিই—'

চারিদিক নিঝুম-করা আচ্ছন্নতার মধ্যে টুপুরের মনে হলো একটা মুঠো এখনো চাপ দিয়ে যাচ্ছে তার ডান বুকে। গরম হয়ে আছে জায়গাটা। কিংবা, ভুলও হতে পারে। এ কেমন অনুভূতি! অশোক কি আলো জ্বালার কথা বলল ? ঠিক বুঝতে পারছে না। শুকিয়ে-ওঠা গলার ভিতর থেকে কথা বের করার প্রাণপণ চেষ্টা করল সে। আর একটু এগোলেই বিছানায় পৌঁছুতে পারবে। মাথাটা ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই দিকে। কোনো রকমে মাথা তুলে বলল, 'আমি নিজেই যেতে পারব—'

অশোক কিছু বলবার আগেই কয়েক পা এগিয়ে গেল টুপুর। কয়েক পা মাত্র। তারপরেই থেমে দাঁড়িয়ে গেস্টরুম আর ডাইনিং হলের মাঝখানের দরজাটা ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল। মাথা নাড়তে লাগল ঘনঘন। একটা কিছু হচ্ছে—আদ্যন্ত শরীর থেকে সমস্ত অনুভূতি তপ্ত হয়ে ছুটে চলেছে মাথার দিকে। একবার পড়লেই উঠতে পারবে না আর। এক্ষুনি আলো জ্বালার কথা শুনেছিল, তা হলে এমন অন্ধকার কেন!

'তুমি পারবে না, টুপুর! চলো—'

'পারব।' এই প্রথম খানিকটা সচেতন হবার চেষ্টায় অশোকের হাতটা গা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল টুপুর, 'কেন ধরছেন। বলছি তো পারব!'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে গেস্টরুমের দরজাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল টুপুর। তারপরেই এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।

অন্ধকার। বালিশে মুখ ডুবিয়ে টুপুরের মনে হলো বালিশের রঙ কালো। কালো ছাড়া কোথাও রঙ নেই কোনো। উল্টে-পড়া বোতল থেকে এক দিকেই গড়িয়ে পড়ার মতো পা থেকে মাথার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে কালো ঘুম। ঘুম। শুধু ঘাড়ের কাছে তিরতির করছে একটা অস্বস্তি—সেটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে কানের তলায়, গালে। অস্বস্তিটা বেশি হওয়ায় পাশ ফিরল টুপুর।

'কে!'

'কেউ নয়। তুমি ঘুমোও, টুপুর—'

'অশোকদা ?' চোখ খুলতে গিয়ে মনে হলো জড়িয়ে গেছে আঠায়। অস্ফুটে বলল টুপুর, 'শর্মিলা কোথায় ?'

'আসবে—'

অন্ধকার। শরীরে ঢুকে পড়ছে অন্ধকার ; শরীর থেকে ছুটে যাচ্ছে মাথার দিকে। নিঃশ্বাস থমকে গেছে এক জায়গায়—সুড়ঙ্গহীন বুকের মধ্যে টুপুর টের পেল তার এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো। অস্পষ্টভাবে অনুভব করল একরাশ পিঁপড়ে পিলপিল করে ঘুরছে তার চামড়ার ওপর, হাল্‌কা অথচ তপ্ত শুঁড় বুলিয়ে যাচ্ছে কপালে, গলায়, বুকের কাছে। ক্রমশ নাভির দিকে তাদের হাঁটাচলা টের পেল টুপুর। জানুর ওপর অস্বস্তি শুরু হতেই ছটফট করে সে বলল, 'কে হাত দিচ্ছে আমার গায়ে !'

'কেউ নয়। তুমি ঘুমোও।'

দু' একবার মাথাটা তোলবার চেষ্টা করল টুপুর। কোমর ভেঙে উঠে বসল বিছানায়। এখন আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে নিজেকে। বুকের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট হাত তুলে ব্লাউজের খোলা হুক্‌টা লাগাবার চেষ্টা করল সে, আঁচলটা মুঠো করে তুলে আনল বুকের ওপর। চোখদুটো খুলে রাখবার চেষ্টায় ঝাঁকুনি দিল মাথায়। তারপর বলল, 'আপনি এখানে কেন ! আপনি যান—'

অশোক হাসল একটু। কাঁধদুটো ধরে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করল ওকে, মাথাটা চেপে ধরল বালিশে। মুখ নামাতে নামাতে বলল, 'ঘুমোও—'

॥ সাত ॥

ক'টা দিন হাসপাতালে কাটিয়ে বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠল রজত। এও এক হাজত, তবে তফাত আছে। মারের বদলে ভিটামিন। ক্যাবিনের বিছানায় শুয়ে, ভালোমন্দ খেয়ে আর পরিচ্ছন্ন ঘুমিয়ে মনে হয় ওজনও বেড়ে গেছে খানিকটা। কালই তো, ট্রাউজার্সের বোতাম আঁটতে গিয়ে টান পড়ল কোমরে—বোতামটা শেষ পর্যন্ত ঘরবন্দী করতে গিয়ে বেগ পেতে হলো। কী রে বাবা, ভুঁড়ি হয়ে গেল নাকি ? এতো রক্ত বেরুনোর পরেও ! মার খেয়ে মোটা হয়—এ-রকম শুনেছ কখনো !

নিজের সঙ্গে এই রকম ইয়ার্কি করতে করতে খুশিতে ছেয়ে উঠছিল মন, এরই মধ্যে দুঃখ নেমে এলো ঝুপ্ করে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল রজত। নীলে সবুজে মিশে অদ্ভুত শান্ত চারিদিক যতো দূর চোখ যায় মনে হয় সব বাড়িগুলোরই রঙ করা হয়েছে নতুন, সব গাছেরই পাতা ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে। একটুও তাপ না ছড়িয়ে ঝলমল করছে রোদ। চমৎকার হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আকাশের তলা দিয়ে। এ-দৃশ্যে চোখ রেখে ক্রমশ বেড়ে ওঠে বাঁচার লোভ। মনে হয় দাগটা ভুয়া ; কিংবা, যদি সত্যিও হয়—এসব দৃশ্যের আড়াল থেকে উঠে এসে খুব তাড়াতাড়ি কেউ মুছে দিয়ে যাবে একদিন। তবু তার ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে সিনেমায় দেখা ছবি এসব, তার জগৎটা আলাদা। খুব শীঘ্রি সে পৌঁছে যাবে সেখানে !

প্লাস্টার তোলা গালের খসখসে চামড়ার ওপর আস্তে আস্তে হাত বোলাল রজত।

নিজেকে লুকিয়ে নিঃশ্বাস চাপল। পনেরো দিন পরে আজ সে ছাড়া পাবে। নাকের পাশে ক্ষতটা যদিও পুরোপুরি সারেনি এখনো, তবু ব্যথা নেই কোনো। কাল বিকেলে ডাক্তার নিজে টিপেটুপে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, বাড়ি যেতে পারবে ?' রজত ঘাড় নেড়েছিল। তার মানে সে এখন সুস্থ ; একটু পরেই এক্স-রে হবে একবার, তার পরেই চুকেবুকে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু, লাভ কী ? দিন গুনতে গেলে হিসেবটা গুলিয়ে যাবে এখন। কুড়ি দিন, না একুশ দিন ? কিছু এদিক ওদিক হলেও ক্ষতি নেই। মনে হচ্ছে এইভাবে পেরিয়ে গেছে অনন্তকাল—দিনের হিসেবে ধরা যায় না সময়টাকে। মনে হয়, এখানে তবু একটা অজুহাত ছিল, শাসন ছিল ; বাড়ি ফিরে গেলেই তো আবার সেই একা।

ভাবনাটা দুলিয়ে দিল রজতকে। বালি খুঁড়লে শূন্য জায়গাটা আস্তে আস্তে ভরে ওঠে জলে, তেমনি দুঃখটাও। কান্নায় কান্নায় ভরে উঠে লাফাতে থাকে বুকের মধ্যে, ভয় দেখায় যে-কোনো সময় উথলে পড়ার। স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে হয়তো—যাকে বলে বেঁচে ফিরে এলো ; কিন্তু লাভ কী ? কলকাতায় ফিরে এলি, এতো কাছে ; তবু এতো দিনে একবারের জন্যেও কি তোর মনে হলো না, টুপুর, রজতটা মরে যেতে পারত ! একটা কুকুর গাড়িচাপা পড়লেও তো মন খারাপ হয় মানুষের ! নাকি এমন কিছু পেয়ে গেছিস তুই, ঘুমের ওষুধের মতো যা তোকে ভরিয়ে রাখছে সারাক্ষণ—এখন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাববার সময় নেই !

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না রজত। কেমন গোলমাল লাগে সব কিছু। জানলা থেকে বেড়ে সরে এসে আস্তে আস্তে হাতপাগুলো ছড়িয়ে দিল সে, মাথাটা নামিয়ে রাখল বালিশের ওপর। অনীশদা একটা বই দিয়ে গেছে—পড়বে ভেবেও এ-পর্যন্ত শুরু করতে পারেনি একবারও। যতোক্ষণ কেউ কাছে থাকে, মনে হয় ভালো ! তারপরেই ছেঁকে ধরে বিষণ্ণতা। ইচ্ছে করে না কিছু, ভাবনাগুলোও হয়ে ওঠে এলোমেলো। সেই রকম, এখনো, এলোমেলোভাবে বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সংকল্পের মতো কী একটা দপ্ করে জ্বলে উঠল মনের মধ্যে। আজ ছাড়া পাবো, রজত ভাবল, তা হলে আজই—আমাকে তুই এড়াতে পারবি না টুপুর ! এই পৃথিবীটার সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা আমি ভুলিনি ! আমি জানি, সহজে কিছুই আসবে না আমার কাছে। যদি না আসে, আমি ছিনিয়ে নেব।

অল্প উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল রজত। চোয়াল শক্ত হতেই টের পেল যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা মুখমণ্ডলে—বিশেষত ডান চোখের নিচের সমগ্র অংশে আর নাকের পাশে, ওপরের দাঁতের মাড়ি ভিজে উঠছে আঠা-আঠা থুতুতে। তার মানে সেনসিটিভ হয়ে আছে জায়গাটা, শিরার টান সহ্য করতে পারছে না এখনো। ডাক্তার বলেছিল, এখনো দু' মাস সাবধানে থাকতে হবে খুব, এই ধরনের ইনজিউরিতে যে-কোনো সময় ব্লিডিং শুরু হতে পারে আবার। সেটা ভালো নয়।

ক্রমশ নিজেকে সইয়ে নিল রজত। নিজেরই হাতে মমতা মিশিয়ে কপাল থেকে হাতটা টেনে আনল চোখের ওপর, আস্তে আস্তে বোলাতে লাগল চোয়ালে, গালে, নাকের পাশে। পল্লব নিতে আসবে সেই দুপুরের দিকে। তার আগে রিলিজ লিখে দেবে ডাক্তার। এই সময়টা কিছুই না করে চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারে সে। ছিমছাম রোদ এসে পড়েছে ক্যাবিনের হাল্কা সবুজ দেওয়ালে—হাওয়ায় পর্দার কাঁপন রোদটাকেও কাঁপিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। দেখতে দেখতে মনটা অন্য রকম হয়ে গেল রজতের। যদি সত্যিই মরে যেতাম, ভাবল, সবুজ এই রৌদ্দুরের সঙ্গে দেখা হতো না কোনো দিন। ভাবতে ভাবতে

আলস্যে বইটা পাশে সরিয়ে রাখল সে, বন্ধ করে রাখল চোখদুটো।

সত্যি, কেমন অদ্ভুতভাবে ঘটে যায় ঘটনাগুলো! সেদিন ওই ছেলেটিকে আক্রমণ করবার আগে একবারের জন্যেও তার মনে হয়নি এমন একটা কিছু ঘটবে। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল সে একা নয়—লক্ষ মানুষের শক্তি জড়ো হয়েছে তার শরীরে আর আক্রোশে ; তখন যে-কোনো বাধাই সে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। তারপর, অতর্কিত ঘুঁষিটা যখন মুখে এসে পড়ল, পিঠে ছুরিবেঁধা যন্ত্রণায় টান-টান শরীরটা উঠতে চাইল ওপরের দিকে, প্রায়ান্ধকারে সে বুঝতে পেরেছিল মৃত্যু আসছে। সকাল থেকে সারাক্ষণ এই মৃত্যুর কথাই ভেবে যাচ্ছিল সে—এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়বে ভাবেনি। তারপর কী হয়েছিল মনে নেই। চোখ খুলল এখানে, এই হাসপাতালে। তখনো ঝিমঝিম করছে মাথা। কাচের ওপর বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত, মুখগুলি ঝাপ্‌সা। ক্রমশ স্পষ্ট হলো তারা—ক্রমশ অনুভব করল, এখন সে কথা বলতে পারবে না। মাথায় রাখা হাতটা ছুঁয়েই বুঝতে পারল, সে ভুল করেছিল, ওটা চন্দনার হাত। ওদিকে ঈপ্সিতা। শম্ভুনাথ। পল্লব, পিনাকী, অসিত। একটু একটু করে মনে পড়ল সব। সে তার পরিচিত পরিবেশেই অছে। কিছুই বদলায়নি তেমন। খানিক চেয়ে থেকে দেখতে দেখতে আনমনা দুঃখ এসে আবার ঝাপ্‌সা করে দিল সব।

ওরা আসে। প্রায় নিয়মিত, রোজই আসে পল্লব, পিনাকী অসিত। কথা বলে। যেন ওষুধ, ইঞ্জেকসানের সঙ্গে সঙ্গে ওদের উপস্থিতিটাও দরকার। ক্যাবিনে জায়গা বড়ো কম, বসবার ব্যবস্থা নেই তেমন। কেউ পায়ের কাছে, কেউ মাথার কাছে—দাঁড়িয়ে থাকে কেউ। ভিড় বেশি হলে চলে যায় বারান্দায়, উঁকি দেয় মাঝে মাঝে, ফিরে আসে আবার। ওদের দিকে তাকিয়ে বুনো আবেগে চোখে জল এসে যায় রজতের ; চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে ওরা আমার, ওদের ধরে রাখার জন্যে আরও বড়ো ঘরের দরকার। মনে হয় হলঘরের মতো লম্বা চওড়া হয়ে ক্রমশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা—একার নিঃশ্বাসে কুলোচ্ছে না সেখানে। কথা বলা বারণ, তাই অন্ধ ঠোঁট আর জিবের সমস্ত ইচ্ছে সে ফুটিয়ে রাখে চোখে। হাসে। কে জানে কেন, সকলকেই মনে হয় নতুন। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সিরসির করে ওঠে চোখের কোণদুটো—কে কী বলছে মুহূর্তের জন্যে গুলিয়ে যায় কেমন। দেওয়ালে তাকিয়ে মনে মনে একটা হিসেব ধরে রাখতে চায় রজত। ভাবে ওরা চলে গেলে জানলা দিয়ে অন্ধকারটা দেখতে পাবে সে। তারপর রাত হবে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাবে আর একটা দিন। কতো দিন হলো যেন!

'ব্লাউজটা রেখে দিয়েছি। দেখাবো তোকে—।' চন্দনা বলল একদিন, 'বাব্বা! এ তো রক্ত তুই পেলি কোথায় রে!'

হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল রজত।

'বেস্ট পারফরমেন্স তোর—', পল্লব বলল চন্দনাকে, 'তোকে সেদিন সুচিত্রা সেনের মতো লাগছিল।'

'যাঃ! কী যে বলিস। ভয়ে আমার কী যে হচ্ছিল তখন!'

'আর পিনাকটা ?' অসিত বলল, 'ছেলেটাকে ফিনিশ করে দিয়েছিল প্রায়। রজত, তুই যদি পিনাককে দেখতিস তখন!'

ঈপ্সিতা বলল, 'ঠিকই করেছিল। আমারই মারতে ইচ্ছে করছিল—'

পিনাকী হাসল চুপচাপ। তাকাল ঈপ্সিতার দিকে। হাসতে হাসতেই বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু মেলে।'

চোখের কোণ দিয়ে পিনাকীকে দেখল ঈপ্সিতা। একটু লজ্জাও পেল যেন। তারপরেই তড়বড় করে বলে উঠল, 'তা বলে ভেবো না আবার পিকনিক করতে গেলে আমি তোমার পাশে গিয়ে বসব।'

পিনাকীর ভাবান্তর হলো না কোনো। যেমন হাসছিল, তেমনিই, বলল, 'রজত ভালো হলে একটা পিকনিক অ্যারেঞ্জ করতে হবে। এক্সক্লুসিভ। শুধু আমরাই থাকব। ওসব অশোক সন্দীপ-ফন্দীপ জুটলেই শালা ঝামেলা শুরু হয়ে যায়!'

রজতের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তোরা আমাকে এতো ভালোবাসিস কেন, তারপরেই ভাবল, তাকে একা কেন! ওরা যে যেভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে, তাকে জড়িয়ে একটা সুতো টানলে সকলেই টের পাবে। নদী ভাবলে একটাই স্রোত, ঢেউগুলোই যা আলাদা মনে হয়। ভাবতে ভাবতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে। ঠোঁট ছুঁয়ে গেল হাওয়া। না বলবে না। বারণ না থাকলেও বলত না।

ঈপ্সিতা ঝুঁকে এলো কাছে, 'কষ্ট হচ্ছে কিছু? কিছু বলবি?'

ওর হাতটা আলতোভাবে ছুঁলো রজত। আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'টুপুরের খবর রাখিস?'

'জানি না। বললাম কতো করে, জবাব দিল না কোনো। রোজ তো আসেও না দেখি। কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে!'

'আমাকে বলল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যায়।' চন্দনা বলল, 'চেহারাটা দেখেছিস, কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে।'

অসিত বলল, 'যাই হোক, এটা অন্যায়। আমরা আসছি, ও তো একদিনও আসতে পারত!'

কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল পল্লব। রজতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'সেদিন বলেছিলাম না। তুই তো তর্ক করে গেলি। আসলে সবাই এক রকম। ও যা পাবার পেয়ে গেছে, এখন এড়িয়েই যাবে তোকে। তুই ভুলে যা—ভুলে যা ওকে।'

দেখতে দেখতে জ্বলে ওঠে ক্যাবিনের আলো। অন্ধকার আর আলোর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মলিন হয়ে যায় জানলার সাদা পর্দাটা।

দিল্লি থেকে ফিরেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল অনীশদা। সঙ্গে শিখা বউদি।

কেমন আলাদা মুখচোখ অনীশদার। মনে হলো ঠিক কী হয়েছে না বুঝেই একটা উদ্বেগ পুষে রেখেছিল মনে, দৃষ্টিটা তাই উদ্‌ভ্রান্ত। ধাতস্থ হয়ে বলল, 'ভালোই হয়েছে। তুই মরবি না। মার খেতে খেতে শক্ত হয়ে যাবি। আবার মারবি—'

'ও কী কথা!' শিখা বলল, 'শুধু শুধু মারামারি করা কি ভালো! কী যে বলো!'

'ঠিকই বলেছি।' অনীশ বলল, 'আমরা পারিনি—স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বুড়ো হয়ে গেলাম! তোরা পারবি—'

রজত বুঝতে পারে না, ঠিক কোন স্বপ্নের কথা বলছে অনীশদা! হয়তো আছে কিছু, ছিল; নিজের কথা তো বলে না কোনো দিন। আজই হঠাৎ বলে ফেলল।

'তুমি বড়ো সেন্টিমেন্টাল! এসব কথার মানে আছে কিছু!'

অনীশকে থামিয়ে রজতের কাছে এসে বসল শিখা। আদরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কলেজে গিয়ে মারামারি করবে জানলে সেদিন তোমায় ছাড়তাম না।'

শিখার কথায় লুকানো মৌরির গন্ধ পেল রজত। এই ব্লিকেলে চুল ভিজে নয়, তবু ভিজে চুলের গন্ধটাও। আগে যা দেখেছিল তার চেয়ে আরও খুশিখুশি আর রহস্যময় লাগে

শিখাকে। নরম আঙুলগুলো চুলের ভিতর দিয়ে শিকড় ছড়িয়ে দিচ্ছে মাথার ভিতর। মায়াময় এই স্পর্শ আর কথার বদলে কিছু দিতে ইচ্ছে করে শিখাকে। কী দেবে ? আর তো কিছুই নেই !

কেমন যেন গলা বুজে এলো রজতের। শিকড়গুলো টেনে নামিয়ে আনল বুক পর্যন্ত। মনটা হঠাৎ বুড়োর মতো হয়ে আশীর্বাদ করতে চাইল। শিখার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, বউদি, সেদিন ঠিক আঙুলটাই ধরেছিলাম তো ? পারল না। শুধু ভাবল, ঠিক ভুল জানি না। তবু আমার ইচ্ছেয় ভুল ছিল না কোনো।

অনীশ উঠে গেছে বাইরে। সম্ভবত সিগারেট খেতে। ব্যাগের ভিতর থেকে একটা গিঁটবাঁধা ছোট্ট রুমাল বের করে আনল শিখা। তারপর তার কপালে আর বুকে ছুঁইয়ে টুকরোটা গুঁজে দিল পকেটে। ছোট করে বলল, 'এটা সঙ্গে রেখো—'

'কী এটা ?'

'জিজ্ঞেস করছ কেন ?'

সেই হাসি, সেই একই রহস্য শিখার ঠোঁটে। লাবণ্যে ভরা সেই মুখটি ওরা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ভেসে থাকল রজতের চোখে। মানুষের মুখে নির্মল হাসি দেখলে জুড়িয়ে যায় বুক। তবু সে এতো অসুখী কেন ? জ্বালাটা জুড়োয় না কেন ? তখন মনে পড়ে, ছাপটা আছে—ছাপটা যায়নি। যতো দিন থাকবে ততো দিন জ্বালাটাও থাকবে।

আসেন শম্ভুনাথ। প্রায় রোজই। কথা বলেন না কোনো। একবার মুখ দেখিয়েই বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বারান্দায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসেন আবার—একটুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে যান। নিঃশব্দ তাঁর ফেরার গতি। মনে হয় আরও নিঃশব্দ, শিলার মতো মন তাঁর। কী ভাবছেন বোঝা যায় না কিছু।

একদিন সুধাকে নিয়ে এলেন শম্ভুনাথ। এসেই ঝটপট কথা বলতে শুরু করল সুধা, যেন এই তিন চার দিন আকুলিবিকুলি করছিল অপেক্ষায়।

'গুরুজনদের কথা শুনিস না ! দেখলি তো কী হলো ?'

'কী আর হলো !' মুখের বাধো বাধো ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে রজত বলল, 'কারুর হয় না !'

'যার হয় হোক। তোর কেন হবে ?'

হাত বাড়িয়ে বুকখোলা শার্টের বোতামগুলো এঁটে দিল সুধা।

না হেসে পারল না রজত। বলল, 'বোতামে তোমার এলার্জি আছে, কাকিমা ! যখনই খোলা দ্যাখো আটকে দাও !'

'যা চেহারা তোর !' সুধা বলল, 'গায়ে মাংস লাগুক, তখন যতো ইচ্ছে বুক খুলে ঘুরে বেড়াস। এই চেহারা নিয়ে কী করে যে দাপিয়ে বেড়াস !'

সেদিন বিকেল হয়েছে সবে। শুধু পিনাকীই এসেছে তখন। অন্যরাও এসে পড়বে একে একে। হঠাৎ ক্যাবিনে ঢুকে পল্লব বলল, 'একটা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তুই কেমন আছিস জিজ্ঞেস করছে—'

শুনেই শীত করে উঠল শরীর। ব্যস্তভাবে রজত বলল, 'ডাক তো !'

ক্যাবিনে ঢুকে দিশেহারার মতো চারিদিকে তাকাতে লাগল লোকটি, যেন কোথায় এসেছে ঠাহর করতে পারছে না ঠিক।

ইশারায় পল্লব আর পিনাকীকে বাইরে যেতে বলল রজত। প্লাস্টার খোলেনি এখনো, উঠে বসলেই তিরতির করে কী একটা কাঁপতে থাকে চোয়ালের ভিতর, নাকের পাশের

ক্ষতে। ডাক্তার বলেছে যতোক্ষণ পারে শুয়ে থাকতে। উঠে বসতে গিয়ে সেই অস্বস্তিটা টের পেয়েই আর উঠল না রজত। বিছানার পাশে চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বোসো—'

যেভাবে বসল তাতে মনে হলো এতোক্ষণ যেন বসবারই অপেক্ষা করছিল। বসেই নাড়ি টেপার ধরনে হাতটা ধরে ফেলল তার। বলল না কিছু।

অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল রজত। হাতটা ছাড়েনি, কথাও বলছে না কিছু। খানিক পরে চোখ ফিরিয়ে দেখল শূন্য চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দেওয়ালের দিকে ; ঔজ্জ্বল্য নেই কোনো—চোখ জুড়ে একটা ধূসর রঙ। ছানি পড়তে শুরু করেছে হয়তো। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়েও থমকে গেল রজত। ঝুলে-পড়া ঠোঁটদুটো নড়তে শুরু করেছে বুড়োর। আবজানো গলায় কোনো রকমে 'খোকা—' বলেই থেমে গেল।

রজত তাকিয়েই থাকল। অনেক দিন পরে দেখছে বলেই অচেনা লাগছে কেমন। বিশ্বাস হয় না এই লোকটাই তার বাবা। হয়তো যেমন আসে আর দেখা না পেয়ে ফিরে যায়, আজও এসেছিল তেমনি—খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

'এতো কষ্টের জীবন কেন তোমার!' বুড়ো হঠাৎ বলল, 'সে কি আমার অপরাধে!'

গলার খসখসে চামড়ায় শিরা আর খাঁজ, একটুকরো হাড় দ্রুত ওঠানামা করছে সেখানে। এর পরেই হয়তো কান্না জুড়ে দেবে! রজত বুঝতে পারে না বাবা সব সময়েই কেন অন্য রকম কথা বলে! কষ্ট ছাড়া আর কিছুই কি ভাবতে পারে না ? কেন মন খারাপ করিয়ে দেয় এতো!

একটা রাগ এসে বিনবিন করতে লাগল মাথায়। বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ—তোমারই জন্যে—, কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে। হাতটা ছাড়াতে গিয়ে জোর পেল না কোনো। ধূসর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই তার মনে হলো লোকটা আন্দাজে কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছে না, তাই হাতটা ধরে চেষ্টা করছে অনুভব করতে। আর বাঁচবে না বেশি দিন। এমন লোক শম্ভুনাথের মতো জোর দিয়ে বেঁচে থাকার কথা বলতে পারে না।

বুড়োটার জন্যে হঠাৎই কষ্ট শুরু হলো রজতের। খুব মন দিয়ে ভাববার চেষ্টা করল, এই লোকটাই তার বাবা। সুতোটা ছিঁড়ে গেছে কবে—চেষ্টা করেও কষ্টের চেয়ে বড়ো কোনো অনুভবে পৌঁছুতে পারল না সে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রজত বলল, 'চিন্তা কোরো না। আমি ভালোই আছি—'

'তোমার মাকে তাই বলব।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রজত। অস্বস্তি লাগছে—ভীষণ অস্বস্তি, এটা বোঝানো যাবে না কাউকে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আসার দরকার নেই। এবার ওঠো। ফিরবে তো! অনেকটা রাস্তা—'

বুড়ো বলল, 'আর একটু বসি—'

বসবার জন্যেই এসেছিল। বসে থেকেই চলে গেল। যাবার ভঙ্গিতে তাড়া, ফিরেও দেখল না।

পল্লব ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে রে ?'

'বাবা—'

'বাবা! তোর ? বললি না কেন, পেন্নাম করতাম একটা!'

'কী হবে!' ঠাণ্ডা গলায় বলল রজত, 'এরপর কোনো দিন শুনব মরে গেছে—'

স্মৃতি জড়িয়ে যাচ্ছে স্মৃতিতে, যেমন প্রায়ই যায়। আজ সকালেও একবুক বিষণ্ণতা নিয়ে

বিভিন্ন স্মৃতি ও সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বেলার দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎই অসহায় বোধ করল রজত, যেমন প্রায়ই করে। ঠিক ধরা যাচ্ছে না এই মানুষগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, কিংবা তার সঙ্গে এদের! এরা দুঃখে ভাসিয়ে দেয়, এরাই ছুঁড়ে দেয় অবুঝ রাগের দিকে। হাসিতে রহস্য মাখিয়ে কখনো বা টেনে নেয় স্বপ্ন ও ভালোবাসায়—মন নুয়ে পড়ে কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কে যে কী ভাবছে, ভাবছে কেমন করে, তার হদিশ মেলে না কোনো। কেন যেন মনে হয় সে আটকে পড়েছে রহস্যময় এক রাস্তার ধাঁধায়—মাঝখানের কোনো এক জায়গায়। একই মানুষজন যাতায়াতের রাস্তায় কখনো সুখে কখনো বা দুঃখিত মুখে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। সে একাই দাঁড়িয়ে আছে, কারণ সে একটু আলাদা—একটা দূরত্ব অবধি পৌঁছে হারিয়ে গেছে তার পরের নির্দেশ। কিন্তু, থেমে পড়া মানেই তো মরা! তা হলে দেওয়ালের সবুজ রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে কেন তার মনে হয় বড়ো সুখ এই বেঁচে থাকায়, বড়ো ভালো লাগে এই আলো হাওয়ায় চোখ খুলে তাকিয়ে থাকতে!

ভাবনাটা মুহ্যমান করে দিল তাকে। সময় গুলিয়ে গেল। ভাগ্য-টাগ্য বুঝি না—এই আলোয় তাকাতে হবে আমাকে, নিঃশ্বাস নিতে হবে এই হাওয়ায়।

একই সময়ে রাগে আর দুঃখে জড়িয়ে যেতে যেতে বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরের এবড়োখেবড়ো মাংসটা চেপে ধরল রজত, টের পেল যন্ত্রণাটা আসছে। বড়ো কষ্টের এই যন্ত্রণা। ডাক্তার বলেছিল, কিছুই করার নেই—শুধু সহ্য করে যেতে হবে। তা কী করে হয়? নিজেকে নিজেই জিজ্ঞেস করে রজত। উত্তরটাও পেয়ে যায় নিজেরই কাছে। চোখমুখ শক্ত করতে করতে ভুলে যায় ক্ষতটা পুরোপুরি সারেনি এখনো। ভাগ্য? সমাজব্যবস্থা? মানুষ? মারো, শালা, যতো পারো মারো। আমি মরব না। আমি শুধুই চিনে রাখছি এই ঘা-গুলোকে, আর তোমাদের। তোমরাই আমার জোর বাড়িয়ে দিচ্ছ।

দুপুরের দিকে পল্লব এসে নিয়ে গেল তাকে। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বলল, 'এতো চুপচাপ কেন রে!'

রজত বলল, 'এমনি—'

'আমি জানি, তুই একজনের কথাই ভাবছিস!'

'জানি না। হতে পারে—'

পল্লব হাত রাখল ওর হাতের ওপর। স্নেহে, মায়ায়, আবেগে। কেন জানে না, আজকাল প্রায়ই তার মনে হয়, রজতকে সে ভালোবাসে নিজের চেয়েও বেশি। ওর জন্যে সে যা হোক করতে পারে। কাউকে বলেনি, এই ভাবনা থেকেই একদিন সে ছুটে গিয়েছিল টুপুরের কাছে। বাড়ি থেকে বের করে এনেছিল রাস্তায়।

'চ টুপুর, একবার দেখে আসবি রজতকে।'

'আমি যাবো না।'

টুপুর বদলে গেছে। বদলটা টের পাওয়া যায় ওর চোখমুখের দিকে তাকালে। ভিতরটা বোঝা যায় না। কেন? তা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল। মেয়েদের সে বোঝে না। খানিক পরে বলল, 'ক'দিন বাদে রজত ছাড়া পাবে। তোর সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন কী বলবি?'

'যদি দেখা হয়, বলব।' হঠাৎ ছটফট করে উঠল টুপুর, 'এসব বলার জন্যে কেন আমায় ডেকে আনলি বল তো! আমি যাচ্ছি—'

আর কিছু না বলে, প্রায় দৌড়েই হেঁটে গিয়েছিল টুপুর।

এসব বলা যাবে না রজতকে। বললেই ক্ষেপে যাবে, তুই এতো রগড়াচ্ছিস কেন! না, বলা উচিত হবে না। তখন রজতের হাতে অল্প চাপ দিয়ে বলল, 'সেদিন আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলি। আজ আবার বলছি, ভুলে যা। না হলে আবার একটা ঘা খাবি।'

অসহিষ্ণুভাবে তাকাল রজত। চলে গেল অন্য কথায়।

'তোর কি মনে হয়, আমি একটা চোর? ডাকাত? খুনে? আমার কাছে আসতে ভয় লাগে?'

'সেন্টিমেন্ট!' পল্লব হাসল। তারপর বলল, 'আমি কি শালা ভগবান, যে বলব! দেখাটা যার যার নিজের—'

সময় চলে যাচ্ছে জবাব না দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে জোরে চালাতে বলল রজত। এবং ভাবল, এসব কিছু নয়। টুপুরকে সে চেনে। যেতে হলে বলেই যাবে।

॥ আট ॥

বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরেই রজত সুধার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শম্ভুনাথ নেই, আজ অনেক দিন পরে সল্ট লেকে গেছে বাড়ির তদারকি করতে। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে গল্পের বই পড়ছিল সুধা। হঠাৎ রজতকে দেখেই সোজা হয়ে বসল।

'কী হলো, উঠে এলি!'

'গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা ধার দেবে, কাকিমা? আমার কাছে কিচ্ছু নেই—'

'টাকা! টাকা কী করবি?'

'দরকার! খুব জরুরী দরকার। আমাকে এক্ষুনি এক জায়গায় যেতে হবে।'

'বেরুবি! এই হাসপাতাল থেকে ফিরলি, এখুনি!' বিকেল হয়ে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে সুধা বলল, 'আমি জানি না, বাপু! উনি ফিরুন, তারপর যেখানে যাবার যাস।'

'কাকিমা, তোমার পায়ে পড়ি—'

একটুক্ষণ কী ভাবল সুধা। নিঃশব্দে উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে। ফিরে এসে নোটগুলো হাতে দিয়ে বলল, 'যেভাবে যাচ্ছিস সেভাবেই ফিরে আসিস। তোর জন্যে আজ আমার কপালে দুর্ভোগ আছে—'

'দুর্ভোগ? দুর!' রজত বলল, 'কাকা কি আর সন্ধের আগে ফিরবে! আমি তখন বিছানায়—'

রাস্তায় নেমে রজতের মনে পড়ল অনেক দিন সিগারেট খায়নি। এমনিতে না খেয়ে হাঁকুপাঁকু করে বুক; এবার করেনি—সম্ভবত যন্ত্রণাটাই ভুলিয়ে রেখেছিল। আজ মনে পড়ায় ইচ্ছেটা তাড়া দিল। প্রথম নোটটা সিগারেটের দোকানেই ভাঙাল সে, ধোঁয়া গিলতেই চনমন করে উঠল শরীর। আবার টানল। তারপর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রাস্তা, লোকজন, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, শব্দ, পড়ে-আসা আলো—সব কিছু দেখতে দেখতে ও অনুভব করতে করতে বলল, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। অন্তত আজ—একদিন দয়া করো আমাকে। আমার ভালো লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগছে না। অন্তত একদিন তোমরা আমার পরিকল্পনা মতো চলো। মনে মনে, এইভাবে, হাঁটতে শুরু করল সে।

সামনে ইউনিক ফার্মেসি। ফাঁকা। কাউন্টারে সেই লোকটি। তাড়াতাড়ি গিয়ে রজত বলল, 'একটা টেলিফোন করতে দেবেন ? প্লিজ !'

লোকটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কিংবা ক্ষতটার দিকে।

কৈফিয়ত দেবার ছলে হাত তুলে চোয়ালে বুলিয়ে নিল রজত। বলল, 'অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল—'

'য্যান—'

আজ রবিবার। টুপুর থাকবে। থাকবে কি ? রিসিভারটা হাতে নিয়ে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রজত। ওষুধের দোকানের টেলিফোন, দুঃখের খবরে অভ্যস্ত হয়ে গেছো তুমি। আমার কষ্ট কি বুঝবে ! এইভাবে নাম্বারটা জারিয়ে নিল মনে। ডায়াল করল। কট করে শব্দ হলো একটা। অধৈর্য ঘাম ফুটে উঠল কপালে। ব্যস্তভাবে ডায়াল করল আবার। রিং হচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে—

'হ্যালো—'

অসুখের গলা। যেন ভেসে আসছে বহু দূর থেকে। বুকের ভিতর দ্রুত অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে এলো রজত।

'কে, টুপুর ?'

উত্তর নেই।

'টুপুর ? আমি রজত—'

'কী বলবি বল ?'

'এমন গলা কেন তোর ! কী হয়েছে !'

আবার চুপচাপ।

'টুপুর— ?'

'শুনছি তো !'

'আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করবি না ?'

একটু চুপচাপ। রজত ধরে থাকল।

'আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না—'

'শোন, তোর সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার। আমি আসছি—ডাকবাক্সটার সামনে দাঁড়াব। তুই চলে আয়—'

'আমি আসব না।'

'আয়। প্লিজ ! আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি—'

ওদিকে একটা শব্দ। এলোমেলো, গভীর ঘুমে পাশ-ফেরা নিঃশ্বাসের মতো। রিসিভারটা হাতে ধরে ঘামতে লাগল রজত। কিছুক্ষণ। আবার ফিরে এসেছে ডায়ালটোন। রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রজত। পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। সময় চলে যাচ্ছে, আর দশ মিনিটও নেই। বলল আসবে না। কেন ! আসুক না আসুক—আমাকে যেতেই হবে।

আট মিনিট। চোয়ালের নিচে ফিরে আসছে তিরতিরে অনুভূতিটা। আসুক। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল রজত, 'ট্যাক্সি—ট্যাক্সি—'। শালা ! দাঁড়াল না। ঠিক আছে, আমিও হারব না। আর একটু এগিয়ে গেলেই চৌমাথা—ওখানে নিশ্চয়ই থাকবে। অসহিষ্ণুভাবে ঘড়িতে চোখ রাখল রজত। সাত মিনিট। মাই গুডনেস্! সময়ও বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল নাকি ! ঠিক আছে, আমি হারব না। আজই হাসপাতাল থেকে

বেরিয়ে এখনো পা কাঁপছে আমার, তবু আমি পৌঁছুব। ভাবতে ভাবতে ছুটতে শুরু করল রজত। পনেরো দিন বিছানায় শুয়ে থাকা পেশীগুলো ফাঁপিয়ে তুলল—সেই একই অনুভূতি, যেন লক্ষ মানুষের শক্তি ঢুকে পড়েছে শরীরে। বাড়তি নিঃশ্বাসের জন্যে ওঠানামা করছে বুকটা। তবু ছুটতে ছুটতেই মনে হলো রজতের, সে যাচ্ছে নিজেরই গতির বিরুদ্ধে—এতো কালের মাপা দূরত্ব ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে আরও।

ঠিকই, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। হাঁফাতে হাঁফাতে পৌঁছে দরজার হাতল ধরে টান দিল রজত। খুলল না, ভিতর থেকে লক করা। ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'কাছেই—রাসবিহারী অ্যাভিনিউ—'

'অন্য গাড়ি দেখুন। আমার দেরি হবে।'

রক্ত চেপে গেল মাথায়। প্রচণ্ড রাগে সোজাসুজি লোকটার দিকে তাকিয়ে রজত ভাবল, হয় খুন না হয় ক্ষমা—এ-ছাড়া আমার আর পথ নেই কোনো। কোনটা চাও তুমি?

লোকটা দমল না একটুও। নিরেট মুখে জবাব দিল, 'বলে লাভ নেই, দাদা। দেরি হবে।'

দেরি হবে। তারও দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি ট্রাম-বাসও নেই যে উঠে পড়বে। হেঁটে? অসম্ভব। এই রাস্তাটুকু দৌড়ে আসতেই হাঁফ ধরে গেছে বুকে। তখন মরিয়া হয়ে রজত বলল, 'পায়ে ধরলে যাবেন?'

'কী মুশকিল!' লোকটার চোখে বিরক্তি ও কৌতুক। দরজাটা খুলে দিতে দিতে বলল, 'ঠিক আছে, উঠুন—'

'একটু তাড়াতাড়ি। যতো তাড়াতাড়ি পারেন—'

চাবির এক মোচড়েই দুলে উঠল ট্যাক্সিটা। ছুটতে শুরু করল। এঞ্জিনের শব্দটা বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিটের গায়ে হেলান দিয়ে বসল রজত। হাওয়া টানল। মনে হচ্ছে সে যেখানে থেমেছিল ঠিক সেখান থেকেই ছুটতে শুরু করেছে আবার—যেভাবে ছুটছে তাতে তিন-চার মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। একটু বাড়াবাড়ি হলো হয়তো—প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে ওইভাবে দৌড়নো, কিংবা, ওই পায়ে ধরার কথাটা, সত্যি, হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কেন! বলেছে আসবে না, তবু যদি আসে, অপেক্ষাও কি করবে না একটু! কী হতো দশ মিনিটের একটু ওদিকে গেলে? কুড়ি দিন, না একুশ দিন? এতো দিনই যদি অপেক্ষা করতে পেরে থাকে, তা হলে আর কয়েক মিনিটের দেরিতে কী এমন ক্ষতি হতো!

জানি না, জানি না কেন। গতির হাওয়ায় সর পড়তে শুরু করেছে গালে। আরও একটু এলিয়ে বসে মনে মনে বলল রজত, শুধু বুঝতে পারছি, তোকে আমার দরকার, ভীষণ দরকার। মনে হচ্ছে তোর সঙ্গে দেখা হবে বলেই বেঁচে উঠলাম আমি—একবারও না-দেখতে আসার অপমান সহ্য করেও এখনো ছুটছি তোর দিকে। বোকা, পাগল, যে যা ইচ্ছে ভেবে নিক আমাকে, টুপুর, তুই আয়। তুই আসবিই। আমি তোকে চিনি, তুই না এসে পারবি না।

'এই যে, ব্যাস, এইখানে—।' রাস্তার ওদিকে দেখা যাচ্ছে লাল ডাকবাক্সটা। নোটটা আগেই বের করে রেখেছিল রজত, ব্রেক কষার শব্দে হাত টান করে বাড়িয়ে দিল। খুচরোটা না নিয়েই দ্রুত কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখল। দশ

মিনিট। ঠিক দশ মিনিট। দশ মিনিট পরে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট আগে শোনা গলাটায় কান পাতল রজত। ক্লান্ত, অস্ফুট, ইচ্ছাহীন সেই স্বর কিছুই দিল না তাকে।

ডাকবাক্সের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে টুপুরদের বাড়ির রাস্তা। ওই রাস্তায় এমনিতেই লোক হাঁটে কম ; বিকেল সদ্য বলেই হয়তো এখন একেবারে ফাঁকা। বড়ো রাস্তায় এখনো রোদ থাকলেও ওখানে নেই—গোটা রাস্তাটা নম্র হয়ে আছে দোতলা তিনতলা বাড়ির ছায়ায়। খড়খড় শব্দ তুলে উড়ে যাচ্ছে কাগজের ঠোঙা, সেই শব্দে উড়ে যাচ্ছে দু'তিনটে শালিক। ফাঁকা রাস্তাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হাতে একটা সিগারেট ধরাল রজত। বুঝতে পারল না এতোক্ষণের ছুটোছুটি কী দিয়েছে তাকে। শুধু, নিঃশ্বাসটাকে সহজ করতে করতে অনুভব করল, সে ক্ষয়ে যাচ্ছে—ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশ। রাস্তা থেকে ফুটপাথে উঠে দাঁড়িয়ে লাল ডাকবাক্সটার গায়ে আস্তে হাত রাখল রজত। অপেক্ষা আগেও করেছে, এইখানে, ঠিক এইভাবে—ডাকবাক্সটার গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভাঙার অনুভূতিটা নতুন। শুধুই বন্ধুত্ব কি দিতে পারে এতোটা ?

আশ্চর্য সুখকর এক শীতে সিরসির করছে সারা গা। মন জুড়ে থম। নতুন-পাওয়া চাদরের মতো আরও অনেকটা সময় অনুভূতিটা জড়িয়ে রাখল রজত, জড়িয়েই থাকল। এখন আর কোনো তাড়া বোধ করছে না সে। একটু আগেই ছিল পাগলের ছুটোছুটি—সময় থেকে মুহূর্তগুলির দ্রুত হারিয়ে যাওয়া। তার দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়েছে সময়ও, যা নিয়েছিল তার সমস্তই ফিরিয়ে দিচ্ছে একে একে। স্মৃতি গন্ধ নিচ্ছে স্মৃতির, কথা কথার। একই চোখ কান হাত মুখ বিভিন্ন ভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন খুঁজছে রূপ। ভাষায় ঢুকে পড়ছে কণ্ঠস্বরের বদল। সবই অলাদা আলাদা করে চিনতে পারে রজত—অসংখ্য চিঠিভর্তি ডাকবাক্সের মতো ঠাসা লাগে বুকটা। ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস। অপেক্ষা করতে করতেই অন্যমনস্ক, রজতের মনে হলো বহুকাল এইভাবে এইখানে দাঁড়িয়ে আছে সে—থাকবে, আরও বহু দিন !

অন্যমনস্কতার মধ্যে লক্ষ করল ছায়া পড়েছে ডাকবাক্সের সামনে—উঠে এসে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তার নিজের ছায়ায়। ছায়াটাই চিনিয়ে দিল। অনেক শব্দ আর নিঃশব্দের মধ্যে থেকে কথাটা চিনে নিল রজত।

'এলাম—'

টুপুরের গলা। একটু ভাঙা, একটু জড়ানো—ঘুম কিংবা দুঃখের জের লেগে আছে এখনো। মুখ তুলে তাকাতেই গোড়ার কথাটা হারিয়ে ফেলল রজত। তবু, ওই শাড়িটা সে চিনতে পারছে, পিকনিকের দিন পরেছিল। ওই ব্লাউজটাও। চটিটা অন্য—যেন ভুল করে পরে এসেছে। কিছু বলার আগে পা থেকে আস্তে আস্তে টুপুরের মুখের ওপর চোখ নিয়ে গেল রজত। চোখের তলায় ওই ছায়াটাও ছিল না সেদিন। চাহনিটাও এমন ছিল কি !

তাকাবে না ভেবেও যেন অনিচ্ছা নিয়ে রজতের মুখের দিকে তাকাল টুপুর—তাকিয়েই থাকল। দৃষ্টি যতোটা পারে তার বেশি এগোতে গিয়েও থেমে আছে মণি দুটোয়। জিজ্ঞেস করল না কিছু। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, 'ডেকেছিলি কেন ?'

'বলছি—।' রজত বলল, 'বলব।' এইমাত্র পরের কথাটা খুঁজে পেল সে, 'দুর্গাপুর থেকে ফিরলি কবে ?'

'অনেক দিন—।' হাতদুটো নাভির নিচে এক করা। আঙুলে আলগা হয়ে ঝুলে আছে ব্যাগটা। চোখ ডাকবাক্সের দিকে। টুপুর বলল, 'ওরা তো সবই জানে ! বলেনি ?'

রজত মাথা নাড়ল। ওরা তোর কতোটুকু জানে। আমি জানি। আমি সব জানি। যা জানতাম না, আজ তাও জেনে গেছি। তবু অচেনা লাগছে। টুপুর, আমার ভালো লাগছে না কিছু। দু' দিনের নাম করে যেভাবে চলে গিয়েছিলি একদিন, ঠিক সেইভাবে ফিরে আয়।

সময় থেমে আছে। এখনো। শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে অবুঝ জ্বালা। রজত অনুভব করল বাল্‌বের ছেঁড়া তারের মতো কিছু একটা কাঁপতে শুরু করেছে তার বুকের ভিতরে। রাগ কিংবা দুঃখ বুঝতে পারে না, তবে এই অনুভূতিটাও সে চেনে। এক্ষুনি অন্য কিছু না হলে ফেটে পড়বে। অনুভূতিটা চাপা দেবার জন্যে এলোমেলো গলায় রজত বলল, 'কী হয়েছে তোর, টুপুর ?'

'জানি না—'

এখন রাস্তা দেখছে। সামনে রজত নেই, যেন সম্মুখহীন শূন্যতায় চোখ মেলে সেও অপেক্ষা করছে কারও জন্যে। কার জন্যে !

বুক ভারী হয়ে ওঠায় নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার তুলে নিল রজত। একটা ম্যানিকিনকে ওই শাড়ি জামাগুলো পরালে এখন সে-ও দাঁড়াত একই ভঙ্গিতে, কথা বলত টুপুরের গলায়। আগে প্রায়ই বলত, আমি কি তোর কেনা ! চলে যেতে বললে চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বাসস্টপে। কেনা না হলেও রজতের মনে হতো, কবে যেন নিজেই একটা লেবেল এঁটে নিয়েছে টুপুর। নিজেই দাঁড় করিয়ে রাখত নিজেকে। এই মুহূর্তে রাগটা এলেও কথাগুলো হারিয়ে ফেলল সে। কুড়ি একুশ দিনের দূরত্ব জোরটা কমিয়ে দিয়েছে অনেক—উধাও হয়ে গেছে বাসস্টপগুলো। এখন যদি যায়, আর ফিরবে না।

অন্ধকার হাতড়ে একটা পুরনো কথা কুড়িয়ে নিল রজত। প্রায়ই বলত। বলল, 'অমন প্যাঁচার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ! এদিকে তাকা— ?' বলতে বলতে থেমে গেল। তারপর বলল, 'আমার কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করবি না ?'

চুপচাপ থেকে হঠাৎ চোখ তুলল টুপুর। এক মুহূর্ত। এক পলকের জন্যে ওর টলটলে চোখদুটো দেখতে পেল রজত। তারপরেই দেখল, মুখ ফিরিয়ে হঠাৎই দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত, হাঁটতে শুরু করেছে টুপুর। ঠিক বুঝল না কেন ! তারপর, কিছু না ভেবেই ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল সে।

পুরোপুরি বিকেল। খানিক আগেও যেটুকু তাপ ছিল রোদে, অলক্ষ্য থেকে হাওয়া এসে কখন শুষে নিয়েছে তা। এখন বহে যাচ্ছে এলোমেলো। নির্জনতা থেকে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে রাস্তা, ক্রমশ কাছে টেনে নিচ্ছে চেনাশোনা শব্দ ও দৃশ্যগুলো। ফুটপাথে ভিড়। এরই মধ্যে দিয়ে বৈচিত্র্য-ও-তারতম্যহীনভাবে হেঁটে যাচ্ছে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। হাঁটার ধরনে তাদের আলাদা করার উপায় নেই কোনো। ওই ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার—কিছু বলাবলি করে বেঁকে গেল ট্রামস্টপের দিকে। এখন দাঁড়িয়ে আছে, দু'জনের মধ্যে দূরত্ব এক হাতের বেশি নয়। ট্রাম এলো। বিকেলের ট্রাম প্রায় খালি, ফিরে আসবে গাদাগাদি ভিড় নিয়ে। মেয়েটি আগে উঠল, তারপর ছেলেটি। ওরা পাশাপাশি বসল। নিঃশব্দে। ট্রাম লাইন ধরেই চলে। থামে, আবার চলে। অল্প ম্লান হয়ে যায় বিকেলের আলো।

পাশে রজত, তবু একা-একা রাস্তা দেখছে টুপুর। গন্ধটা লেগে আছে নাকে। সাধারণ গন্ধ, তবু কতো আদরের ! কাঁধে ছুঁয়ে যাচ্ছে কাঁধ—এতোকাল জ্বালায়নি, তাই আজও কোনো বিদ্যুৎ জ্বালছে না শরীরে। তবু ভালো লাগছে। ইচ্ছে করে শুধু এইভাবে কাছাকাছি

বসে থাকতে ; এইভাবে, নিঃশব্দে, চলে যেতে অনেক দূর। ইচ্ছে করে ওই হাল্‌কা ছোঁয়াটুকু অনুভব করতে সারাক্ষণ। কেমন ছেলে দ্যাখো ! সারাক্ষণ এতো রাগ পুষে রাখে শরীরে, আক্রোশে গুঁড়িয়ে ফেলতে চায় গোটা পৃথিবীটাকে—এই বেঁচে গেল মরতে মরতে, তবু হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এলো কেমন ! একটাও রাগের কথা বলেনি এখনো। চুপটি করে বসে আছে কাদা হয়ে—যেন সব দোষ তারই ! ইচ্ছে করে ওই কাদায় মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকতে। তা তো হবে না। রাস্তা ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, বাড়িঘরের সীমানা পেরিয়ে ফুটে উঠছে সবুজ। কতো দিনের চেনা রাস্তা, ওই বড়ো বড়ো গাছ আর অফুরন্ত হাওয়ার মধ্যে দিয়ে কতো দিন হেঁটে গেছে দু'জনে। পাগলটা প্রায়ই স্যুইসাইড করার কথা বলত—দুঃখ আছে, তবু দুঃখটাকে চিনতে পারত না ঠিক ঠিক। আর কি কখনো ওইভাবে হাঁটতে পারব পাশাপাশি ! তা তো হবে না ! কথা ফুরিয়ে গেছে, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে রাস্তা। যদি এই ট্রামেও ফিরে আসে, তাও বেশিক্ষণ লাগবে না। চুপচাপ নেমে যাবে একসময়। আর কি দেখা হবে কখনো ? লাল ডাকবাক্সটার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে যাবে রজত। সময় চলে যাচ্ছে। শরীরের ভিতর অন্ধকারটা ক্রমশ কালো হয়ে উঠছে আরও। আমি বুঝি, বুঝতে পারি—এই অন্ধকার নিয়ে হাঁটা যায় না। দোষ আমার। দোষ তোর। এতো যে ভালোবাসিস, এতো যে চেঁচামেচি তোর, তবু ভালোবাসার কথাটা চেঁচিয়ে বলতে পারলি না কেন ! আমি কি সত্যিই এড়াতে পারতাম তোকে ! দোষ তোর। আমি যখন থাকব না, জানি, খুব কষ্ট হবে তোর। আর কোনো দিন টুপুরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না তোকে। রাস্তা তো বদলায় না—ওই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যখন ডাকবাক্সটায় চোখ পড়বে, অন্ধ রাগে ছটফট করবি তুই—ইচ্ছে করবে প্রতিশোধ নিতে। না, মারামারি, খুনোখুনির মধ্যে যাস না আর। চেষ্টা করিস ভুলে যেতে। তবুও যদি মনে পড়ে, তোর শরীরের যতো রাগ আর শক্তি দিয়ে উপড়ে ফেলিস ওই ডাকবাক্সটা—

এতো দিন কাউকে কিছু বলেনি টুপুর। এতো দিন চুপচাপ থেকে নিজেকে একলা করে নিচ্ছিল ক্রমশ। চুপচাপ এগিয়ে যাচ্ছিল সেই দিনটির দিকে, শরীরের অন্ধকার যখন আর ভয় দেখাবে না তাকে—থেকে থেকে ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠবে না শরীর। চুপচাপ, নিঃশব্দে। কাল রাতের অন্ধকারে মাঝঘুম থেকে উঠে তার দিকে চাঁপার নিঃশব্দ চেয়ে থাকা দেখেই আরও বুঝেছে—সময় চলে যাচ্ছে, এইবার চলে যেতে হবে—একা। রজতের পাশে বসে আজও একা—বিশাল ঢেউয়ের মতো আবেগটা ভাসিয়ে দিল তাকে। এখনো বুঝতে পারল না সে কী করেছিল—কেন এমন হলো ; এতো দূর সংস্পর্শের মধ্যে থেকেও সব ছেড়েছুড়ে কেন তাকে চলে যেতে হবে !

এমন অসহায়তার মধ্যে আগে কখনো নিজেকে অবিষ্কার করেনি রজত। ট্রাম। আশেপাশে লোকজন। সবই তার অসহায়তা বাড়িয়ে তুলল। ওরই মধ্যে হতচকিত টুপুরের হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সে।

'তুই কাঁদছিস, টুপুর !'

'না—'

জোরে মাথা নাড়ল টুপুর। ঠিক ভেঙে পড়ার মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। হাতের উল্টো পিঠে চোখ রগড়ে, সর্দি টানার মতো জোরে নিঃশ্বাস টেনে থামিয়ে দিল সব আবেগ। তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে নামব—'

কিছু না বলে ওকে বেরুনোর জায়গা করে দিল রজত। নিজেও উঠল। কোনো দিকে না

তাকিয়ে ওর পিছনে পিছনে হেঁটে গেল ফুটবোর্ডের দিকে।

ট্রাম থামবার পর প্রায় ঘোরের মধ্যে দ্রুত হাঁটতে লাগল টুপুর। একটু দাঁড়িয়ে আঁচল বুলিয়ে নিল মুখে। আবার এগোল। হাঁটার এই ধরনটা তারই, সঙ্গ ধরার সুযোগ করে দেবার জন্যে থেমে দাঁড়াত মাঝে মাঝে। কাছে এসে টুপুর বলত, 'এতো জোরে হাঁটিস!'

'শাড়ি ছেড়ে বেলবটম পর। দেখবি, তুইও পারছিস।'

'বেলবটমের পর কী?'

'বব চুল।'

'তারপর?'

কোমর দুলিয়ে, একটু অঙ্গভঙ্গি করে রজত বলেছিল, 'আমি পারি না। অসিত থাকলে দেখিয়ে দিত।'

'তারপর কী? সিগারেট?'

'খাবি? খা না! দারুণ দেখাবে তোকে—'

অল্পক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে টুপুর বলেছিল, 'না রে, থাক। আমি যেমন আছি তেমনই থাকব।'

নেই। আজ টুপুরই ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। বারবার। টুপুরই দেখিয়ে দিচ্ছে কোন দিকে যেতে হবে। পায়ে কোনো জোর পাচ্ছে না রজত, ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে শুধু। এমনও হতে পারে এখনো দুর্বলতা কাটেনি শরীরের; তাই, মাথাটাও ছেয়ে আসছে দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে।

তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে টুপুরের পাশে পৌঁছে গেল রজত। চেনা রাস্তা। সামনে ময়দান। ভিক্টোরিয়া। এরই মধ্যে আচ্ছন্ন হতে শুরু করেছে আলো। হয়তো আর একটু পরেই অন্ধকার নামবে।

'টুপুর, তুই এমন করছিস কেন! কী হয়েছে বল?'

'বললে বুঝবি?' গতি শ্লথ করে একটু যেন স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল টুপুর।

মুছলেও সবটা মোছে না। গালে এখনো লেগে আছে জলের দাগ। চোখের তলায় ছায়াটা ঘন হয়েছে আরও, দৃষ্টি শূন্য। প্রশ্নটা বোবা করে দিল রজতকে।

টুপুর হঠাৎ বলল, 'মেয়ে হলে বুঝতিস!'

তারপর দ্রুত হলো আবার। রজত দেখল, ও এগিয়ে গেছে অনেকটা—যেন ভুলে গেছে তাকে। হাঁটার ধরনে পা দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে অল্প। এভাবে কাউকে হাঁটতে দেখলে ভয় লাগে, মনে হয় পড়ে যাবে এক্ষুনি। তবু কী যেন টানছে টুপুরকে! টানটা আছে বলেই তর সইছে না আর। এইমাত্র বেঁকে গেল ভিক্টোরিয়ার ভিতরে।

অনেকক্ষণ ধরেই ঘোরটা টের পাচ্ছিল রজত, মাথার মধ্যে অশান্তিটা টের পেল এবার। ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দ্রুত টুপুরের কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা করল ও। পুকুরটা পেরিয়ে গিয়ে চাপা চিৎকারের গলায় বলল, 'দাঁড়া—।' তারপর এগিয়ে গেল। থেমে দাঁড়িয়েছে টুপুর। চোখে চোখ রেখে রজত বলল, 'যা বলবি স্পষ্ট করে বল। ন্যাকামি ভালো লাগছে না—'

'শুনবি! আমি খারাপ হয়ে গেছি—একটা মেয়ের যতোটা খারাপ হতে পারে—', বলতে বলতে থেমে গেল টুপুর। তারপর কী হলো বোঝা গেল না। হঠাৎই রজতের কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ভাঙাচোরা মুখে টুপুর বলল, 'কী হলো তোর, রজত! ঘেন্না লাগছে না! ইচ্ছে করছে না আমাকে মেরে ফেলতে—!'

বলতে বলতেই আবার পিছন ফিরে মাঠের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে গেল টুপুর। এলোমেলো ভঙ্গি। হঠাৎই বসে পড়ে মুখ গুঁজল হাঁটুতে।

গাছগাছালির ওপর রোদ। গাছগাছালির জড়াজড়ির নিচে আড়াল হয়ে গেছে রোদ। ছায়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'জন। দৃশ্যটা মাথায় নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল রজত। তফাত রেখে বসল। বসে থাকল কিছুক্ষণ। হাঁটুতে মুখ রেখে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে টুপুর—গুম, তবু স্বাভাবিক ; তুমুল বৃষ্টি থেমে যাবার পর যেমন হঠাৎই নেমে আসে থম। রজত দেখেও দেখল না। অস্পষ্টতার ভিতরে শিখা বউদির পিছনে পিছনে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ডাক্তারের চেম্বারে। পরিষ্কার গলা মেয়েটির, আমি নিজেই তো বুঝতে পারছি ! ঘাসে ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার। ঘুঁসিটা মুখের ওপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারটা চিনতে পেরেছিল সে। মৃত্যু আসছে।

অন্ধকারে আড়াল হয়ে যাচ্ছে টুপুরের মুখ। এমন শান্ত, বোঝা যায় না কিছু। হঠাৎই বুকের ভিতরটা চিনচিন করে উঠল রজতের। কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কী ? কী ? কী ? দাঁতে দাঁত ঘষে গেল রজতের। একটা সিগারেটের জন্যে হাত ঢোকাল পকেটে, কী ভেবে বের করে আনল আবার।

'কে। সন্দীপ ?'

জোরে মাথা নাড়ল টুপুর, সেই একই ভঙ্গি। চোখদুটো দেখা যাচ্ছে না। অস্ফুটে বলল, 'না—'

'তবে ?'

'কেন জিজ্ঞেস করছিস এসব ! আমার ভালো লাগছে না— !'

'বলতে তোকে হবেই— ।' রাগে মাটি থেকে গোড়াসুদ্ধ একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে আনল রজত, মুঠোভর্তি হাতটা ছুঁড়ে দিল টুপুরের দিকে।

অল্প সরে গেল টুপুর। অন্ধকারে চোখে পড়ল টান-টান হাতটাকে আবার ঘাসের ওপর ধরে রেখেছে রজত। ভঙ্গিটা চেনা। দেখতে দেখতে শীত এসে গেল শরীরে। আবেগটা উঠে আসছে আবার। জড়ানো গলায় টুপুর বলল, 'অশোক—'

একটু চুপ করে থাকল রজত। তারপর নিষ্ঠুর গলায় বলল, 'অশোক ! না তুই নিজেই মারাতে গিয়েছিলি !'

এই মাত্র শব্দ ভেঙে গেল। এমন কি স্তব্ধতাও। ঘাস থেকে ছটফটে হাত তুলে মাথার পিছনের চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরল রজত। অন্ধকারে উঠে আসছে টুপুরের কান্না। নিঃশব্দ বলেই পিঠটা কেঁপে উঠল অমন। কাঁপুনিটা নিজের মধ্যে টানতে টানতে রজতের মনে হলো নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না—মুখ খুলে গেছে চোয়ালের নিচে ক্ষতটায়, আর অনর্গল বেরিয়ে আসছে রক্ত।

'চুপ কর, টুপুর। তোকে কিছু বলিনি— ।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রজত বলল, 'শালা তোকেই দেখেছে, আমাকে চেনেনি ! আমি ছাড়ব না—আমিও দেখে নেব। যেখানেই থাকুক, আমি ঠিক খুঁজে নেব—'

'অমন করছিস কেন !' টুপুর হঠাৎ হাতটা টেনে ধরল রজতের, 'আয়, তুই আমার কাছে বোস একটু ! যা করার আমিই করব—'

বড়ো ঠাণ্ডা হাত টুপুরের। জুড়োয় না ; সর্বাঙ্গ জুড়ে শুধু ছড়িয়ে দেয় ভয়ের মতো একটা কিছু। এই অবস্থায়, অমন ঠাণ্ডা গলায় এতোগুলো কথা কী করে বলতে পারল ও !

তবে কি এই কথাগুলো বলবার জন্যেই এতো দিন আড়াল খুঁজছিল টুপুর !

ক্রমশ বসে পড়ে রজত। ক্রমশ নুয়ে পড়ে। রাগটা চলে গিয়ে ক্রমশ একটা অন্ধকার চেপে বসে বুকে। অন্ধকারের ভিতর দিয়েই বহু দূর দেখতে পায় সে। সে-দেখায় রূপ নেই, দৃশ্য নেই কোনো। শুধু পড়ে আছে কার্ফ্যুর রাতের রাস্তা। না, সে বড়ো ভয়াবহ ব্যাপার ! সে সহ্য করতে পারবে না।

নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে টুপুর। ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা উঠতে গিয়েও থেমে যাচ্ছে বারবার। দিশেহারার মতো গাছ, ঘাস, ফুটফুটে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ নিঃশ্বাস চাপল রজত। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, কে তুমি ? কেন কেড়ে নিতে চাও আমার সব কিছু ! কেন বারবার এইভাবে মারছ আমাকে ! দ্যাখো আমার দিকে, এখনো শুকোয়নি ঘা। এতো যে মানুষ চারিদিকে, কেন আমাকে তাদের মতো হতে দাও না !

হাহাকারটা ছড়িয়ে পড়ল পাঁজরের খাঁজে খাঁজে। একটা জোনাকি শুধু উড়ে এলো তার চোখের সামনে।

'শোন, টুপুর—', অনেকক্ষণ পরে রজত বলল, 'নিজেকে খারাপ ভাবছিস কেন। এ-রকম তো কতো মেয়েরই হয় আজকাল।'

টুপর বসে থাকল। উত্তর দিল না কোনো।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল রজত। গুছিয়ে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'যা হয়েছে ভুলে যা। এসব কিছু না। একটা ছোট্ট অপারেসান করলেই সব সাফ—কেউ টের পাবে না কিছু। সকালে বেরিয়ে বিকেলেই ফিরে যাবি বাড়িতে। কাল তোকে শিখা বউদির কাছে নিয়ে যাবো। ডাক্তার চেনে—'

টুপুর এসব কথার কিছু শোনে, কিছুটা ভুলে যায়। মুখ তুলে রজতের দিকে তাকাল সে। কথা বলে যাচ্ছে, শুধু কথা। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ওর ইচ্ছে করল রজতকে ছুঁয়ে দেখতে একটু ; আর জিজ্ঞেস করতে, কী দিয়ে তৈরি তুই ? কী করে এমন সহজে চলে যাস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ! ভাবতে ভাবতে শরীরের অন্ধকার থেকে অল্প আলো এসে পড়ল টুপুরের মুখে। ঘাস মাটির গন্ধ থেকে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ও ভাবল, কাল কী হবে জানি না, তারপরে কী হবে—তাও না। তুই যতোই বলিস, হয়তো তোর সঙ্গে দেখা হবে না আর। কিংবা হলেও, এই অন্ধকারটা কি মুছবে কোনো দিন। তবু ভালো লাগছে, রজত, অনেক দিন পরে ভালো লাগছে আমার। তোকে দেখাতে পারব না, একটা পাথর যেন নেমে যাচ্ছে বুক থেকে !

আর একটু পরেই নির্জনতা থেকে আলোয় উঠে এলো ওরা। আরও কিছুটা হাঁটল। কেউই কথা বলল না কোনো। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে রজত বলল, 'ট্যাক্সি চড়বি নাকি ?'

'না—'

'না কেন।'

রাস্তার মাঝখানেই ব্যাগ খুলে আঁতিপাতি করে কী খুঁজছে টুপুর। বলল, 'টাকা নেই। সবই ভুলে যাই কেমন।'

'তোর পয়সায় ট্যাক্সি চড়ব কেন।' বুক-পকেটের ওপর এক মুহূর্তে হাত ছুঁইয়ে রেখে রজত বলল, 'হাঁটতে পারব না বলে কাকিমার কাছে ধার নিয়েছিলাম। সেই হাঁটালি।'

ভারটা কমে গেছে, তবু আলোয় এসে লজ্জা লাগছে কেমন। রজত যেন তার অনেকটাই

দেখে নিল আজ। আনমনে বুকের ওপর আঁচলটা টেনে নিতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো টুপুরের, আর একটু এগোলেই সেই নার্সিংহোমের রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে একদিন ভোরে একটি তারাকে খসে পড়তে দেখেছিল সে, হঠাৎই চিনতে পেরেছিল নিজেকে। আজ আকাশে অনেক তারা। এখনো চিনছে।

চোখের কোণদুটো অল্প সিরসির করে উঠল টুপুরের। জবাব দিল না।

একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। থামাল রজত। টুপুরকে উঠতে দিল আগে। দূরত্ব বাঁচিয়ে বসে তাকিয়ে থাকল সামনের রাস্তা, লোকজন, গতির দিকে। তারপর কী মনে পড়ায় ভাঙা চোয়ালটার ওপর হাত বুলিয়ে বলল, 'কতো দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হলো, টুপুর!'

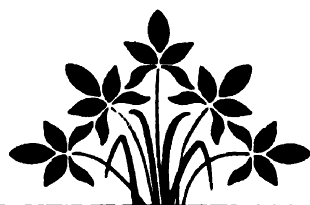
টুপুর জবাব দিল না। জবাব না দিয়েই চোখ তুলে সরে এলো কাছে। তারপর হঠাৎই আগল খুঁজে মুখটা নামিয়ে আনল রজতের বুকে। চোখ নাক ডুবিয়ে নিঃশ্বাস ছুঁইয়ে রাখল শুধু।

'আ-রে! কী করছিস!' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে নড়ে উঠল রজত, 'দেখছে। পাবলিক দেখছে—'

'দেখুক। যে খারাপ তাকে খারাপ ভাবলে কিছু হবে না।' মুখ না তুলেই একটু থেমে বলল টুপুর, 'এতো মারামারি করিস কেন! কোন দিন মরে যাবি!'

কথাগুলো কানে নিল না রজত। প্রায় চব্বিশ বয়স হলো—এতো দিন রাগ চিনেছে, দুঃখ চিনেছে। লজ্জা চেনেনি। ভালো লাগার এই সংস্পর্শটুকু বাঁচিয়ে রেখেও অস্বস্তিতে ছটফট করে পিছনে তাকাল ও। মনে হলো গোটা রাস্তা তার সব কিছু নিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। ইস্!

ওই যে, দেখা যাচ্ছে ওদের—ওই ট্যাক্সিটায়। না! এইমাত্র হারিয়ে গেল আবার। চারিদিকে এতো ভিড়!



অহঙ্কার

অহঙ্কার

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৮৬ (জুলাই ১৯৭৯)
প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৮·০০ । প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

উৎসর্গ :
মা
শ্রীমতী নীহারবালা পালিত
শ্রীচরণেষু

॥ এক ॥

ফ্ল্যাটে কান্নার শব্দ

ঘুম থেকে ওঠার জন্যে ঘড়িতে অ্যালার্ম দেবার দরকার হয় না বিমানের। তার প্রত্যহ রুটিনে বাঁধা ; তেমনি সময়ও। দিনের পর দিন অভ্যাসের ফলে সময়কে সে ব্যবহার করতে পারে যথেচ্ছ ; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—তা সে ঋতুর যে-কোনো সময়েই হোক না কেন, যে-কোনো কাজের জন্যে তার বরাদ্দের বিন্যাসে হেরফের ঘটে না এতোটুকু। শরীর-টরির খারাপ হলে বা অন্য কোনো কারণ থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে, তখনো, ব্যতিক্রমটাকে সে সামাল দেয় নিজের মতো করে। কাল যেমন হলো। রাত্রে ফিরতে দেরি হয়েছিল, শরীরটাও জুত লাগছিল না তেমন, শুতে যাবার আগে তাই বলে রেখেছিল গোকুলকে, 'দেরি দেখলে উঠিয়ে দিস—'

কিন্তু, বেলা পর্যন্ত ঘুমোবার কারণ থাকা সত্ত্বেও আজ তার ঘুম ভাঙল অদ্ভুতভাবে এবং আচমকা ; বলতে গেলে অন্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি।

তখনো ঘোর লেগে আছে চোখে। আলস্য-জড়ানো ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে আরও বেশি ঘুমে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে কেমন অগোছালো হয়ে গেল বিমান। ঘুম ও জাগরণের মাঝখানে সম্পূর্ণ আলাদা এক অনুভূতি। মনে হলো না ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে কয়েক ঘণ্টা, কিংবা এখন সকাল ; মনে হলো, গতকাল শুতে যাবার আগে সে যেখানে ছিল, সময়ও থেমে আছে ঠিক সেইখানে। শুধু সময়ই নয়, তার নিজস্ব ভঙ্গিও—বাঁ পাশে কাত হওয়া ঈষৎ টান-টান শরীর, কপালের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা হাত, একাগ্র চোখমুখ ; যতো দূর মনে পড়ে, কাল রাতে আচ্ছন্নতার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার আগেও তার ভঙ্গি ছিল প্রায় একই রকম।

বিমান বুদ্ধিমান ; নিজেকে সে সহজেই বিশ্লেষণ করে নিতে পারে। সত্যি বলতে, চৈতন্যের এই পরিচ্ছন্নতাটুকু আছে বলেই সময়ে অসময়ে প্রয়োজনমতো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধে হয় না তার। লোকে জানে সে ধীর, স্থির, স্থিতধী ; অন্তত সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হবার মতো মানুষ নয়।

কিন্তু আজ সকালের ব্যাপারটা অন্য। বোধবুদ্ধি বিবেচনার সমস্তটাই ভোঁতা করে দিয়ে মাথার ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের অস্বস্তি। চোখে জড়তা থাকলেও ঘুম যে আর আসবে না এটা সে বুঝতেই পারল। তাতে কিছু নয়। সমস্যা, এই অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে কী করে!

শব্দটা কানে আসছে তখনো ! একটানা, ঘুনঘুনে, কিন্তু অত্যন্ত মৃদু ও ঠাণ্ডা ; ইতিমধ্যে হাওয়া অল্প জোরালো হলে আড়াল পড়ে যাচ্ছে কখনো। এখনকার প্রকৃত অবস্থাটা কান্না অথবা কান্নাজনিত অভ্যাসেরই জের, তা বোঝা যায় না ঠিক ঠিক। বন্ধ করে দেওয়া কল থেকে সুতোর ধরনে জল পড়ার শব্দের মতো আশ্চর্য নিরাকার আর অন্ধকার ওই শব্দ ; কাউকে ডাকে না, কোনো অনুযোগ জানায় না, অপেক্ষা করে না কোনো সহানুভূতির। তফাত এইটুকু, কাল রাতের শব্দটা ছিল প্রায় হাহাকারের। কান্নাটা যেখান থেকে আসছে সেই জায়গাটা সে চেনে। মাঝখানে আছে মজবুত কাঠের দরজা আর কংক্রিটের দেওয়াল। হাহাকারটা এমনই ছিল যে কঠিন এই সব বাধা অতিক্রম করে বিমানের বোধ ও অনুভূতিতে পৌঁছে সব কিছু এলোমেলো করে দিতে অসুবিধে হয়নি কোনো।

আরও কিছুটা সময় একই ভঙ্গিতে কাটিয়ে উঠে বসল বিমান। তাকাল চারপাশে। খোলা জানলা দিয়ে হালকা রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ঠিক রোদও নয়, রোদের আভাস মাত্র। দেওয়ালের ঘড়িতে প্রায় ছ'টা। পুবদিক খোলা থাকার জন্যে সকালের এই সময়টায় প্রাচুর্য থাকা দরকার রোদে। সে-রকম নয়। তার মানে মেঘ আছে আকাশে। হাওয়া নেই তেমন। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে আস্তে। সেদিকে তাকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে অন্যমনস্ক হাত বাড়াল বিমান, লাইটার জ্বালার আগে গোকুলকে খুঁজল। পাশের দুটো ঘরের কোনোটাতেই যে সে নেই, ফ্ল্যাটের নৈঃশব্দ্য থেকেই তা টের পাওয়া যায় স্পষ্ট। হয়তো দুধ আনতে বেরিয়েছে, কিংবা কিচেনেও থাকতে পারে—কাল রাতের নির্দেশ অনুযায়ী বিমানকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্যে অন্তত আরও আধঘণ্টা সময় আছে তার হাতে। এই সময়টা যে গোকুল ধারে-কাছে থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক।

কী ভেবে গোকুলকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল বিমান ! সিগারেটে টান দিল জোরে। গলার ভিতর জমাট বাঁধা থেকে আস্তে আস্তে বুকের ভিতর নেমে ছড়িয়ে পড়তে ধোঁয়ার যতোক্ষণ সময় লাগে, প্রায় ততোক্ষণই কান খাড়া করে রাখল। না, ঠিকই ; শব্দটা আসছে। বাস্তবে না হলেও শব্দের পুরনো অনুষঙ্গ অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মনে ; তা নয়। যতোই ক্ষীণ হোক, এমনকি পাখার শব্দ ছাপিয়ে এখনো তার চুঁইয়ে-পড়া উপস্থিতি টের পাচ্ছে স্পষ্ট। ডিসগ্রেসফুল ! এতোক্ষণ ধরে জিইয়ে রাখার কী যে মানে বোঝা মুশকিল ! প্রায় অর্থহীনতায় পৌঁছুবার পরও কি মনে হয় কান্না কিছু দেবে !

ভাবনাটা অবসাদ এনে দিল মনে। কিছুটা খাপছাড়াভাবে বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে বিষম খেল বিমান। পরপর কয়েকবার কাশি উঠে এলো। ধোঁয়াটাকে ধাতস্থ হতে না দিয়েই উঠতে গিয়েছিল, তারই ফল। বুকের মধ্যে সামান্য চিনচিন করতে সিগারেটটা অ্যাশ্‌ট্রেতে গুঁজে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল সে। আজকাল অল্পেই অনেকের স্ট্রোক-ট্রোক হয়ে যায়, এই ভাবনা থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করায় মাসদুয়েক আগে গিয়েছিল কার্ডিওলজিস্টের কাছে। ই-সি-জি'তে কিছু না পেয়েও ডাক্তার পরামর্শ দিল, 'স্মোকিং ছেড়ে দিন। আরও বেশি ঘুমোন।' শুনে, একটুও না দমে বিমান বলেছিল, 'কিছু না হতেই—'

'ভবিষ্যতের কথাটাও ভাবতে হবে তো !'

'তা হবে।'

এইভাবে জবাব দিলেও সেদিন মনে মনে খুব একচোট হেসে নিয়েছিল বিমান। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বয়স হলো, এখনো আমি একা। আমার আবার ভবিষ্যৎ কী ! মার্কেন্টাইল ফার্মে

মোটামুটি ভালো চাকরি, এরপর কোনো প্রমোসান না হলেও চলে যাবে হেসেখেলে। কিংবা এখনো যদি হঠাৎ কিছু হয়, আর সে হয়ে পড়ে পঙ্গু—বাঁচে আরও পাঁচ-সাত বছর, তা হলেও যাবে। ভেবে কী লাভ!

এসব অবশ্য সেদিনের কথা। আজ, এই মুহূর্তে, নতুন করে কথাগুলি ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ল বিমান। কান খাড়া করে রেখে ভাবল, যাবে কি ? জীবন একার হলেও, জীবনের দায় কি একার! চলে যাওয়ার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সে কি হলফ করে বলতে পারে, ঠিক আক্ষরিক অর্থে না হলেও, আরও কাউকে কাউকেও সে সঙ্গে নিয়ে যাবে না!

আজ সকালের অন্যমনস্কতা হঠাৎই দুলিয়ে দিয়ে গেল বিমানকে। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে সেটা মুখের কাছে এনে আয়নায় দেখল নিজেকে, দেখতে লাগল। এমনিতে সুপুরুষ, সভ্যভব্য চেহারা তার ; কিন্তু দাঁত বের করে হাসলে কেমন লম্পটের মতো লাগে, সে যেমন ঠিক তেমন কি আর মনে হয়! বরং আজ, এখন বলে নয়, ইদানীংই দেখছে অল্পবিস্তর রেখা পড়তে শুরু করেছে চামড়ায়, পাক ধরেছে বেশ কিছু চুলে—ওপরে আড়াল থাকলেও ভিতরে ভিতরে প্রায়ই কুটকুট করে মাথা। চোখের তলায় ধূসর আভা সত্ত্বেও দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আরও, একভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়বে এক্ষুনি। এসব নিয়ে অবশ্য বেশি মাথা ঘামাতে রাজি নয় বিমান। জানে, এই বয়সের দ্বিধা বড়ো ভীষণ। ঠিক কাজটি ঠিকমতো করতে দেয় না, এগোবার সুস্পষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অলক্ষ্যে কখন যে টান ধরে পায়ের শিরায়—টান পড়ে মনেও, বোঝা যায় না কিছু। হঠাৎ ঝড়ে উপড়ে আসে টান-টান করে বাঁধা অহঙ্কারের খুঁটিগুলো।

এখনো যেমন। কান্নার শব্দটা আড়াল করার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও পারল না। এমনও হতে পারে, শব্দ নয়, শব্দের সংস্পর্শই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে মনে, ক্রমশ অধিকার করে নিচ্ছে তাকে।

একটু বা মরিয়া হয়ে বেসিনের কলের ট্যাপটা সজোরে ঘুরিয়ে দিল বিমান। সশব্দে ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ জলধারা, যেন সম্পূর্ণই তার ইচ্ছাধীন। খানিক সেদিকে তাকিয়ে থেকে, কুলকুচো করে, আঁজলা-ভর্তি জল নিয়ে চোখে মুখে ঘাড়ে ছিটোল সে, চেষ্টা করল আরাম বোধের পুরোটাই অনুভব করতে। হঠাৎ-রোদে ঝকমক করছে বাথরুমের দেওয়ালের নীলচে আভা-মেশানো টাইল, বাথটাবের রেলিংয়ে বসে হালকা পাখনা নাড়ছে একটা মথ। পৃথিবী সুন্দর হয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্যে। অর্থাৎ, খুব পরিচ্ছন্নভাবে আর একটা দিন শুরু করতে পারে সে, অন্যান্য দিন যেমন করে। মন কিন্তু গেল না সেদিকে। মথটা যেখানে বসে পাখনা কাঁপাচ্ছে, চোখে পড়ল তারই কাছাকাছি জায়গা দিয়ে প্রায় অস্পষ্ট, সরু-পা একটা মাকড়শা উঠে যাচ্ছে বাথটাবের দেওয়াল বেয়ে ; তারপর ক্রমশ নেমে গেল ভিতরের সাদা, শুকনো শূন্যতায়। গোকুলকে বলতে হবে, ভাবল বিমান ; তারপরেই ভাবল, সত্যি, বাথটাবটা ওইভাবে ওইখানে পড়ে আছে কেন! প্রশ্নটা নিয়ে গেল না কোথাও। একটু আগেই জল পড়ার শব্দে আরামে ছেয়ে যাচ্ছিল মন, একই শব্দে এখন টের পাচ্ছে অশ্লীলতা।

ব্যস্ত হাতে কলটা বন্ধ করে দিল সে। আবার কান খাড়া করে ভাবল, কান্নাটা কি থেমে গেছে। এইভাবে, দ্বিধান্বিত, তোয়ালেটা টেনে নিয়ে ভিজে মুখের ওপর চেপে ধরল সে। ঠিক বুঝতে পারল না হঠাৎই নিজেকে এমন অবিন্যস্ত লাগছে কেন! বস্তু-পৃথিবীর গতানুগতিক পরিবেশে অভ্যস্ত জীবনে হঠাৎই খাপছাড়াভাবে এসে পড়েছে ওই কান্নার

শব্দটা, সেই জন্যেই কি ? নাকি এই উপলক্ষের আড়ালে আছে আরও কোনো তাৎপর্য, দিনে দিনে একটু একটু করে পাওয়া সমস্ত কিছুর প্রতিই যা বাধ্য করে চোখ ঠারতে—তারপর টেনে নিয়ে যায় এক গভীর অর্থহীনতার ভিতর, যেখানে সবই মনে হয় অসার ; শুধু সঞ্চয় নয়, সবই, এমনকি দিনে দিনে গড়ে তোলা, জড়িয়ে ওঠা, ভালো মন্দের গন্ধ-মাখানো সম্পর্কগুলো পর্যন্ত !

হয়তো। বিমান ঠিক জানে না। যতোই যুক্তিবাদী মন হোক তার, এই মুহূর্তের ভাবনাগুলি নিয়ে সে শুধুই ব্যর্থ হতে পারে।

মাকড়শাটাকে দেখা যাচ্ছে না আর। অল্পক্ষণের জন্যে একটা ধাঁধা ছড়িয়ে দিয়ে আবার হারিয়ে গেছে কোথায়। বাথটাবের পরিচ্ছন্নতার মধ্যে এমন একটা খুঁত ছিল বা আছে, এখন হাজার চেষ্টা করলেও তা প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু, এটা ঠিক, সে ভুল দেখেনি, মুহূর্তের জন্যে হলেও সরু সরু পা টেনে ওই ফুঁয়ে-ওড়া প্রাণীটি হেঁটে গেছে তার মন ও মগজের ওপর দিয়ে—অন্য কোনো ভাবনা এনে সেই অনুভূতি চাপা দেওয়া যায় না। অথচ, মথটা এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তার জায়গাটিতে ; পাখনার কাঁপুনি থেমে যাবার পর এমনই স্থির তার ভঙ্গি যে মনে হয় ওটা বাথটাবেরই অঙ্গ। এরই মধ্যে কখন যে আরও জোরালো হয়ে উঠেছে রোদ, খেয়াল করেনি। চারিদিকের আলোয় চোখ মেলে দেখলে মনে হয় পিছিয়ে-পড়া সময়কে একটানে অনেকটা এগিয়ে এনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার নিজের জায়গায়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে, সেই অস্পষ্ট ধ্বনিতে কান রেখেও আনমনে হাসতে লাগল বিমান। চেষ্টা করল স্বাভাবিক হতে। ফ্ল্যাটটা যতোটা না তার চেয়ে বেশি তাকে ওপরে তুলে দিয়েছে ওই বাথরুম আর বাথটাব। 'তুমি তো ব্যস্ত মানুষ, বিমানদা, তিন মিনিটে চান সারো।' মনে পড়ে, নীপা বলেছিল, 'হঠাৎ বাথটাবের শখ হলো কেন ?'

ঠিক বাঁধা প্রশ্নের দিকে যায়নি নীপা। যেখান থেকে শুরু করার কথা, তারও ঢের আগে শুরু করলে অস্বস্তি হবেই, বিমানও তা এড়াতে পারেনি। এটুকু বুঝেছিল, নীপার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব নেই কোনো ; সে নিজেও কি জানে ! এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, 'তোমার মেয়েরও ঠিক একই প্রশ্ন—'

জবাব না পাবার জন্যে নয়, সুদেষ্ণার উল্লেখেই যেন নীপার উচ্ছলতায় আকাশ-পাতাল তফাত ঘটে গেল। এই সব সময়ে তার গলা গ্রীবা হয়ে ওঠে। কাঠ হয়ে বলল, 'খুকুও এসেছিল নাকি— ?'

এই ধরনের প্রশ্নে নিশ্চিত দ্বিধা বোধ করে বিমান, বিশেষত প্রশ্নটা নীপার কাছ থেকে এসেছে বলেই। সময় নিয়ে, আর যেন সত্যি কথাই বলছে এইভাবে বলল, 'খুকু ? এসেছিল ?' বলার ধরনে পুরনো ঘটনা মনে করার চেষ্টা থাকলেও আসলে সে লক্ষ করছিল নীপার প্রতিক্রিয়া। সাহস পেয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলল, 'আমিই কিছু বলেছিলাম বোধ হয়—'

কথা এগোয়নি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে দেখছে একবার কাঠ হলে সহজে তরল হতে পারে না নীপা, বরং অ্যানালজেসিক ট্যাবলেটের মতো একটি প্রসঙ্গের জের অসংখ্য অণুতে বিভক্ত হয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরের সর্বত্র। অভিমানে ঢুকে পড়ে অহঙ্কার। তখন ঘাঁটালে মনে হয় কথার মধ্যে অর্থই শুধু নয়, কিছুটা শরীরও প্রয়োগ করছে নীপা। 'সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তোমার জন্যে অনেক লাথিঝাঁটা খেয়েছি, বিমানদা।' একদিন বলেছিল,

'আমার সেই অহঙ্কারটুকু থাকতে দাও।'

কথাগুলো মনে আছে আজও। মনে আছে, কারণ জুতসই একটা জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল বিমান। বলতে পারত, 'যে-অহঙ্কার কিছুই দেয় না, নিজের ভিতরেই ক্ষয়ে যায় শুধু, তা রেখে লাভ কী!' বলেনি দুটো কারণে। ওই কথাটির ঘায়েই হয়তো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসত নীপা, বলত, 'সাহস আছে?'

দ্বিতীয় কারণ, সত্যিই তার সাহস ছিল না। রোগা, অসুস্থ ও ব্যর্থ জ্যোতিকে তার ভয় বড়ো বেশি। হঠাৎই মনে হয়েছিল, পৌরুষের চেয়ে স্বামিত্বের জোর অনেক পাকা। যতোই খিটখিটে ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হোক জ্যোতি—সে নিজে কী? কর্তব্য ও নীতিবোধের শিকলে বাঁধা একটা অ্যালসেসিয়ান বই আর কিছু নয়! শোভা আছে, কিন্তু সত্যিকারের শৌর্য দেখাতে গেলেই টান পড়ে গলায়।

ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে রোদ। ঘরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল বিমান। সামনে পিচের তৈরি নতুন রাস্তা। এখনো তেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। বড়ো রাস্তার দিক থেকে সশব্দে ব্রেক কষতে কষতে একটা ট্যাক্সি ঘুরে এলো এদিকে, তারপর নিমেষে উধাও হয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। ভিতরে লোকজন ঠাসা। তার পরের দৃশ্যে দেখতে পেল সাইকেল আরোহী দু'টি যুবককে—প্রায় অভ্যাসে প্যাডেল চালিয়ে পার হচ্ছে ধীর গতিতে, কথা বলতে বলতে; আরও একটু কাছে আসতে স্পষ্ট হয়ে উঠল ওদের গলা, বিমান বুঝল, ওরা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের আসন্ন ফুটবল ম্যাচ নিয়ে আলোচনায় মত্ত। দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে ওরা যতোক্ষণ সময় নিল, প্রায় ততোক্ষণই অর্থহীনভাবে তাকিয়ে থাকল বিমান। নীল রঙের লম্বা স্কুল বাসটির মুখ দেখা দিতেই ও অনুমান করে নিল বাসটি কোন বাড়ির সামনে থামবে এবং কোন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে ইউনিফর্ম পরা একটি ছোট মেয়ে। সামনের বাড়িগুলো এখনো তৎপর হয়ে ওঠেনি তেমন। জানলা খুলছে সিন্‌হাদের বাড়ির দোতলার ঘরের, সোনার চুড়ি-পরা একটি হাতে ঝলসে উঠল রোদ, বিমানের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ব্যস্ত হাতে পর্দা টেনে দ্রুত সরে গেল বউটি। বিমান চেনে, ওদের ফ্যামিলির সঙ্গে আলাপ আছে সামান্য—জানে, রাস্তায় মুখোমুখি দেখা হলে হাসবে মুখ টিপে। তবু এই মুহূর্তে যা করল তা করার দরকার ছিল কি! নাকি মেয়েলি মনের স্বাভাবিক অভ্যাস দ্বারাই চালিত হলো সে? কিছুই বোঝা যায় না।

চোখে রোদ লাগায় ব্যালকনি থেকে সরে এলো বিমান। ঘরে। অলস হাতে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলতে তুলতে কান খাড়া করল আবার। কান্নাটা কি থেমে গেছে? কিছুই বোঝা যায় না। থমথমে, অবসাদগ্রস্ত ভাব নিয়ে সোফায় বসল, সিগারেট জ্বালল। এখন, এই সময়ের নিস্তব্ধতা সে ছুঁতে পারছে স্পষ্ট, যেন বিশেষভাবে তারই জন্যে তৈরি এই নৈঃশব্দ্য—অন্য কোনো তারতম্য ঘটবার প্রস্তুতি নেই কোথাও। একটু আগে সদরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেয়েছিল: সম্ভবত ফিরে এসেছে গোকুল। এরপর কাগজ দেবে, চা নিয়ে আসবে। আসুক। এসবের জন্যে সামান্য ব্যস্ত হলো না বিমান। সিগারেটে হালকা টান দিয়ে মাথাটা এলিয়ে দিল সোফার পিছনে। দেওয়ালের প্লাস্টিক-এমালসান ফিনিশের ওপর আলো পড়ে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে রঙ। চোখ-ধাঁধানো সেই আলোর কিছুটা ঢুকে পড়ল বিমানেরও চোখে। হঠাৎই ভাবল সে, সুদেষ্ণার প্রশ্নে নীপাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল কেন, সত্যি কথাটা বলতে পারত না! নাকি তখনই তার মনে হয়েছিল মা ও মেয়ের মধ্যে চলছে একটা অদৃশ্য লুকোচুরির খেলা, স্পষ্ট করে তার কিছু বলা মানেই আড়াল থেকে টেনে এনে

দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া মুখোমুখি—তাতে দ্বন্দ্বটাই বেড়ে উঠত আরও, লাভ হতো না কারও, মাঝখান থেকে সে হয়ে দাঁড়াত অকারণ উপলক্ষ। ব্যাপারটা শোভন হতো না। সত্যি বলতে, বিমান, কী সম্পর্ক এদের সঙ্গে তোমার ?

আজ বলে নয়, প্রায় কুড়ি বছর ধরে ঘুরেফিরে একই প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়েছে বিমান, কী সম্পর্ক তোমার এদের সঙ্গে ! এমনকি সেদিনও—এই ঘরের মধ্যে বাথরুমের দিকে তাকিয়ে দাঁড়ানো সুদেষ্ণার চমৎকার স্বাস্থ্য ও ভঙ্গি এখনো সে দেখতে পায় স্পষ্ট, উত্তরের বদলে চুপচাপ নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপলক্ষ খুঁজে পায়নি সে। 'ভালোই হলো, বিমানকাকু। তুমি যা ব্যাকডেটেড, বাথটাব ইউজ করা তোমার কর্ম নয়।' এতোখানি আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে অর্জন করেছিল সুদেষ্ণা ! অবশ্য সেখানেই ও থেমে গেলে গা করত না বিমান, তার সঙ্গে কথাবার্তায় সুদেষ্ণা কোনো দিনই দূরত্ব রাখেনি। ঝড়টা এলো পরে। ইতিমধ্যে জায়গা বদল করে নিয়েছে সুদেষ্ণা। ব্যালকনির রেলিংয়ে পিঠের ভর দিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল, যাতে এই ফ্ল্যাটে—কিংবা বিমানের ওপর, তার অধিকার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই না থাকে। ঠিক ঠিক কারণ না থাকলেও অস্বস্তিতে চোখ নিচু করে নিয়েছিল বিমান। সুদেষ্ণা বলল, 'অন্ধকার বাথরুমে ঠাণ্ডা চৌবাচ্চার জলে চান করতে গা ঘিনঘিন করে। এরপর বরং উইক-এণ্ডে চলে আসব তোমার এখানে—'

কথার গতি তখন ভিতরের দিকে। যতোই স্বাভাবিক হোক, পারস্পরিক সম্পর্কে হাওয়া খেলাবার জন্যে যতোই খোলা থাক জানলা দরজাগুলো, সুদেষ্ণা কি জানে সে কী বলছে ! যেন এ-ভাবনার সমস্ত দায়ই বিমানের, ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটলেও চোখ তুলতে পারেনি সে। বাইরে ব্যালকনি জুড়ে রোদ, রোদের চেয়েও অপ্রতিরোধ্যভাবে, প্রায় অহঙ্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সুদেষ্ণা। চোখ তুললেই জবাব দিতে হবে। হ্যাঁ, কিংবা না। একটায় এগিয়ে আনা, অন্যটায় এক আঘাতে পিছিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে কোনটা তার নিজের পক্ষে শ্রেয় বুঝতে পারেনি সে। সুদেষ্ণাও এগোয়নি আর। পরে, চলে যাবার আগে বলেছিল, 'বিমানকাকু, তুমি যে কী ভুলো আর অন্যমনস্ক আজ তা পরিষ্কার বুঝতে পারলুম—'

'কেন ! অন্যমনস্ক আবার হলাম কোথায় !'

'এই শাড়িটা তোমারই দেওয়া, বার্থ ডে-তে দিয়েছিলে।' দূরত্ব বেশি নয়। এক পাট খোলা দরজা দিয়ে বেরুতে গেলে গায়ে ঠোকা লাগবে সুদেষ্ণার ; দ্বিতীয় পাটটি, সুতরাং, বিমানের হাতে ধরা। নৈকট্যের সুবাসই বুঝিয়ে দেয় সুদেষ্ণা আর খুকু নেই। আঁচল সামলে বলল, 'আজই প্রথম পরেছি। তোমার চোখে পড়ল না, কেমন লাগছে তাও বললে না !'

'তুই যা পরিস তাতেই সুন্দর মানায়।'

'রাখো। যেচে প্রশংসা চাইলে সবাই সুন্দর বলে—'

এবারও কথা জোগায়নি বিমানের মুখে। সম্ভবত যাবার তাড়া ছিল সুদেষ্ণার, লিফ্‌টের অপেক্ষা না করেই পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। যেতে যেতে বলল, 'তোমার টেস্ট আছে, বিমানকাকু। শাড়িটা ভালো, ফ্ল্যাটটাও সুন্দর। এলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।'

চুপচাপ হেসেছিল বিমান। হিল তোলা চপ্পলের ঘোড়া ছুটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সুদেষ্ণা, সঙ্গে নতুন শাড়ির মোড়কে আঁটা তার বয়স। শব্দটা একেবারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত একই হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল সে।

এসব বা এই ধরনের কথা অবশ্য নতুন বলছে না সুদেষ্ণা। অনেক দিন পরে আজ সকালে কথাগুলো মনে পড়ায় বিমান ভাবল, দু'জনের কথার মধ্যে কতো তফাত ! নীপা

শুধুই জানতে চেয়েছিল, কিন্তু সুদেষ্ণা এগিয়ে গিয়েছিল আরও—যেন সে ধরেই নিয়েছিল বিমানের একটা সমস্যা হবে, তার সমাধান করার দায়িত্ব সুদেষ্ণাকেই নিতে হবে। সুদেষ্ণা কি জানে, তেমন কোনো সমস্যা থাকলে সম্পর্কের টানাপোড়েনে নীপাই এগিয়ে আসবে আগে। এমন কি হতে পারে যে সুদেষ্ণা জানে নীপা যতোই সাহসী হোক, জ্যোতির ছায়া ছাড়িয়ে তার পক্ষে খুব বেশি দূর এগোনো সম্ভব হবে না ; অন্তত জ্যোতি যতো দিন বেঁচে আছে ততো দিন তো নয়ই ; তাই, বিমানকে বলার অধিকার তারই ! নাকি বয়স—বয়সই সব, বয়সই তাকে উদ্ধত করে তুলেছে !

বিমান জানে না। যুক্তি নিয়ে যতোই সে খেলা করুক, অন্যের মনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

কিন্তু, সাত সকালে এই সব ভাবনায় সে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে কেন ! নীপা, সুদেষ্ণা, জ্যোতি—কেউই তার কাছে নতুন নয়। প্রায় কুড়ি বছরের মতো একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে চেহারায় ও মনে সে যেমন বদলে গেছে অনেকটা, তেমনি ওরাও কম বদলায়নি। তেমনি বদলেছে চেনা অচেনা আরও হাজার হাজার মানুষ। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায় ! তা ছাড়া অনেক দিন আগেই তো সে জেনে গেছে তার জীবন জড়িয়ে গেছে এদের জীবনের সঙ্গে, যেমন যায়—ইতিমধ্যে অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে সম্পর্কটা থেকে যাবে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেও এর মধ্যে এমন আর কিছুই নেই যে, সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে এতোটা সময় পর্যন্ত ব্যস্ত সে আর কিছু না ভেবে শুধুই ভেবে যাচ্ছে ওদের কথা !

হঠাৎ অসহিষ্ণু বোধ করল বিমান। হাতের সিগারেটে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সেটা গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে, উঠে দাঁড়াল, তারপর গোকুলকে ডাকবার আগে কান খাড়া করল আবার। কান্নার শব্দ। শব্দটা আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না ; অনেকক্ষণ একাগ্র থাকার পরও কোনো ধারণায় পৌঁছুতে পারল না বিমান। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে দিন, ভোরের স্তব্ধতা থেকে জেগে উঠেছে বাড়িগুলো, রাস্তা থেকে উঠে আসছে নানা রকম শব্দ—গাড়ির, সাইকেলের ঘন্টির, এমনকি দূরে কোথাও বেজে ওঠা লাউডস্পিকারের। ওপরের কোনো ফ্ল্যাটে জোরে রেডিও খুলেছে কেউ, বয়স্ক মেয়েলি গলায় মীরার ভজন গাইবার ধরনে বৈচিত্র্য নেই কোনো। এমনও হতে পারে, খানিক আগে পর্যন্তও তার ও কান্নার শব্দের মধ্যে যে-সংযোগ ছিল, যে-শব্দের মধ্যে দিয়ে কাল রাতে শুতে যাবার আগে থেকে আজ ভোরে ঘুম ভাঙা ও তারও পরে অনেকটা সময় পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে নিজেরও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যাচ্ছিল সে, অন্যান্য শব্দের আবির্ভাবে তা হারিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বিমান ভাবল, এগিয়ে গিয়ে দেখে আসে ব্যাপারটা। তারপর ভাবল, থাক। এসব দৃশ্যে নিজেকে বড়োই অসহায় লাগে।

চা দিয়ে গেছে গোকুল। সঙ্গে খবরের কাগজ। সম্ভবত একটু অন্যমনস্ক ছিল বিমান, প্রশ্নটা মাথার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ভুলে গেল জিজ্ঞেস করতে। এমনও হতে পারে, অবচেতন মনে সে নিজেই চেয়েছিল এড়িয়ে যেতে। আপাতত দ্রুত ও পরপর বার তিনেক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কিছুটা ঝরঝরে ও চাঙ্গা হয়ে নিতে চাইল সে, মন দিল খবরের কাগজে। তেমন কোনো খবর নেই যে ঝুঁকে পড়বে। ওয়েদার রিপোর্টে লিখেছে কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, আজও কয়েক পশলা হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, কাল রাতে—হয়েছিল ? কিছু বা বিভ্রান্তভাবে দরজা ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল বিমান। রোদে মিশে গেছে অভ্রের শূন্যতা ; অনেক দূরে বাড়িগুলো ও কালচে সবুজ গাছগাছালির মাথায় যেটুকু আকাশ দেখা

যায়, নীল ছাড়া আর কোনো বর্ণ নেই সেখানে। একটু আগেই সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যালকনিতে, যতো দূর মনে পড়ে আশেপাশে কোথাও চোখে পড়েনি গতরাতের বৃষ্টির চিহ্ন। নাকি চোখে যেটুকু ধরা পড়ে তার বেশি কিছুই লক্ষ করেনি সে! হবে, হতে পারে। চটপট হাতে পরের পৃষ্ঠায় চলে গেল বিমান। ছোট-বড়ো, মোটা বর্ডার দেওয়া চাকরির বিজ্ঞাপনে ঠাসা পাতাটা, উল্টে যাবার আগে একটা বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল তার—ইউ আর দ্য পার্সন উই আর লুকিং ফর। কপির ভিতর দিয়ে কয়েক লাইন এগিয়েই ধরতে পারল প্রতারণা, চাইছে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, যার সঙ্গে তার কাজের সম্পর্ক নেই কোনো। কারণ বা সম্ভাবনার কথা না জেনেও সে আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে ঠকে গেল। প্রায় বিরক্ত মন নিয়ে পরের কয়েকটা পাতা দ্রুত উল্টে গেল সে, চা-টা শেষ করল এবং না ভেবে পারল না, যে-কোনো কারণেই হোক আজকের দিনটা শুরু হয়েছে অন্যভাবে, আগাগোড়া অস্বস্তি নিয়ে, হয়তো এইভাবেই কাটবে। প্রায় একই সময়ে তার মনে পড়ল সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট সময়ে অনেকগুলি স্মৃতি পেরিয়ে এলেও একটাও কথা বলেনি এবং কেন কে জানে, তার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো হয়ে ফ্ল্যাটটা ক্রমশ ছোট করে দিচ্ছে তাকে।

প্রায় অসহায়ভাবে এবং হঠাৎ চেঁচিয়ে গোকুলকে ডাকল বিমান। এতো জোরে যে নিজের কানেই বেসুরো বাজল। অনেকবার ডাকার পর সাড়া না পেয়ে মানুষ যেভাবে চ্যাঁচায়। বাড়াবাড়িটা বুঝতে পারল গোকুলের শশব্যস্ত ছুটে আসা দেখে। তখন, হঠকারিতা আড়াল করার জন্যে সিগারেটের আশ্রয় নিল বিমান, হাসল।

'কী হলো!'

'কিছু নয়। গলাটা বসে গিয়েছিল, ছাড়িয়ে নিলাম।' হাসিটা জিইয়ে রাখল বিমান। বারো বছরের পুরনো গোকুলকে এর চেয়ে অন্য রকম কোনো অজুহাত দেওয়া যায় না। দিলেও বিশ্বাস করবে না। পরের কথাটা বলবার আগে আরও একবার সতর্ক হয়ে নিল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে নাকি খুব বৃষ্টি হয়েছিল?'

'খুব নয়। কিছুক্ষণ। তবে জোরে—', গোকুল বলল, 'এই জন্যে ডাকছিলেন?'

বিমান মাথা নাড়ল।

'আশ্চর্য। আমি কিছু টেরই পাইনি!'

'ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। আমি এসে জানলা বন্ধ করলাম, সকালে আবার খুলে দিয়ে গেছি—'

ঘুমের ওষুধ! কাল? ভাবতে না ভাবতেই মনে পড়ে গেল কান্নার শব্দটা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঘুমের দিকে, এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তখন সরাসরি বলল, 'সকালেও শুনলাম কাঁদছে। ওরা যায়নি এখনো?'

'কখন! সেই কোন সকালে, আপনি ঘুমোচ্ছেন তখন।' একটু থামল গোকুল, তারপর ভারী গলায় বলল, 'পুলিস এসেছিল—'

'কেন!'

'হ্যাঁ। দত্ত মেমসাহেব ফোন করেছিলেন থানায়। ওরা এসে নিয়ে গেল—'

'কোথায়! থানায়?'

'তা জানি না।'

বিমান আর কিছু বলল না। বস্তুত কথার জেরেই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল এতোক্ষণ, না

হলে মনে মনে সে থেমে পড়েছে আগেই। প্রায় থ হয়ে বসে আবার কান খাড়া করল সে, ফিরিয়ে আনতে চাইল সেই পুরনো শব্দের প্রত্যক্ষকে, যার আঘাতে বেলা পর্যন্ত ঘুমোবার প্রস্তুতি সত্ত্বেও আজ সকালে হঠাৎই ঘুম ভেঙে যায় তার। তার পরেও শুনেছে অনেকটা সময় পর্যন্ত। গোকুলের কথা সত্যি হলে শব্দটা থেমে গিয়েছিল তার ঘুমেরই মধ্যে। এটা কী করে সম্ভব! তা হলে কি সবই তার মনের বিকার! যে-শব্দের প্রভাব এড়াতে কাল রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে গিয়েছিল সে, ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি তৎপরতায় সেই শব্দ তাকে জড়িয়ে রেখেছিল সারাক্ষণ, এমনকি ঘুম ভাঙার পরও তার রেশ যায়নি!

নিজের মনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল বিমান। একটু আগে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে সে প্রতারিত হবার কথা ভেবেছিল, এখন মনে হচ্ছে সে টুকরো হয়ে গেছে দুটো অস্তিত্বে—কোনো ক্ষোভ দিয়ে এই প্রতারণার ব্যাখ্যা করা যায় না।

গোকুল যেন বিমানের কথা বলার অপেক্ষা করছিল। ওকে চুপ করে যেতে দেখে বলল, 'মেমসাহেব একবার খুঁজে গেছেন আপনাকে—'

'কেন!'

'বোধ হয় সাক্ষি দিতে বলবেন। আমাকেও বলে গেছেন—'

বিমান শুনল। তারপর ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলতে ফেলতে আবার ফিরিয়ে এনে বলল, 'এতে সাক্ষি দেবার কী আছে!'

'আমিও তাই বলছিলাম। আপনি এসবের মধ্যে যাবেন না।' জোর দিয়ে বলল গোকুল, 'মেয়েছেলেদের ব্যাপার, এখন কেঁচো খুঁড়তে কোন সাপ বেরোয় দেখুন—'

ওর শেষের কথাগুলোয় কান দিল না বিমান। ব্যস্তভাবে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি এখন যাও—'

চারিদিকের শাণিত কর্মব্যস্ততায় ছেদ পড়েনি কোনো। শব্দের ভিতর শব্দ, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আরও নানা শব্দ। কিছুক্ষণ আগে হলেও এদের কোনো কোনোটিকে চেনা যেত আলাদা করে, এখন আর তা হবার সম্ভাবনা নেই। ছড়িয়ে যাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে, প্রত্যাহত হতে হতে আবার ফিরে আসছে নতুন করে। সেই সঙ্গে রোদও প্রখর হয়ে উঠছে ক্রমশ। চারিদিকের এই সব বর্ণনা থেকে নিজেকে আলাদা করার সক্রিয় চেষ্টা সত্ত্বেও পারল না বিমান। অন্যমনস্কতার মধ্যেও দেখল ব্যালকনির রেলিং টপকে এক চৌকো তরতাজা রোদ এসে থমকে দাঁড়িয়েছে তার পায়ের কাছে, অল্প তপ্ত হয়ে উঠেছে পায়ের পাতা আর আঙুলগুলো। তবু, এসবই অগ্রাহ্য করল সে, আরও কিছুটা সময় পার হতে দিল নিরপেক্ষতার ভিতর, সিগারেট ধরাল এবং ফেলে দিল—তার সামনে দিয়ে উড়ে গেল বাথটাবের গায়ে বসে থাকা মথটা, পরপর ভেসে উঠল নীপা, সুদেষ্ণা আর জ্যোতির মুখ, মিসেস দত্তের মুখ, এবং এমনকি রোদ্দুরে ঝলসে ওঠা সোনার চুড়ি-পরা একটি হাত, কিন্তু নেপথ্যের আবহসঙ্গীতের মতো মৃদু ও ঠাণ্ডা, অনুযোগহীন কান্নার শব্দটা কিছুতেই সরাতে পারল না মাথা থেকে।

আরও কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎই উঠে দাঁড়াল বিমান। হাঁটতে শুরু করল। দ্বিতীয় ঘরটির মধ্যে দিয়ে চলে এলো লিভিং রুমে। ধারে কাছে গোকুল নেই, থাকবার কথাও নয়—তৃতীয় ঘরের সংলগ্ন কিচেনের গায়ে তার থাকার জায়গা, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কিংবা ডাক না পড়লে এদিকের ঘরে ঢোকে না। সুতরাং, সে যে বিমানকে লক্ষ করবে তার সম্ভাবনা কম। করলেও, বস্তুত, যায় আসে না কিছু। তবু বিমানের এই মুহূর্তের আচরণ

থেকেই বোঝা যাচ্ছে নিজের গতিবিধির কোনো সাক্ষী সে রাখতে চায় না। আরও একটু এগিয়ে ও ইতস্তত করে সদর দরজার ছিটকিনি খুলল বিমান।

জায়গাটা ফাঁকা। তবে, কাল রাত থেকে এতোটা সময় পর্যন্ত মন জুড়ে ছিল বলেই সম্ভবত স্বাভাবিক পরিসরের চেয়ে এখন বড়ো লাগছে আরও। ইতিমধ্যে ধোয়ামোছা করার জন্যে ঝকঝক করছে মোজেইক। সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে পিছনে তাকালে ব্রাস প্লেটে বিমান মজুমদার নামটাই চোখে পড়বে। ঠিক উল্টো দিকের বন্ধ দরজার ওপর নেম-প্লেটে বাঁকানো ইংরিজি হরফে জ্বলজ্বল করছে দুটো নাম : রত্নাবলী দত্ত, অধীর দত্ত। এক দিকে সাদা দেওয়াল, অন্য দিকে লিফ্‌ট। লিফ্‌টের দু' পাশ দিয়ে নিচে নামার এবং ওপরে ওঠার সিঁড়ি। খুব সতর্ক হয়ে খানিক দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল বিমান এবং দেখল, মেঝে থেকে ফুট দুয়েক ওপরে একটা জায়গায় সাদা ঠিক আর সাদা নেই, হালকা লালের আভা লেগে আছে সেখানে। কাল লিফ্‌ট থেকে বেরিয়েই সেই অদ্ভুত দৃশ্যের সম্মুখীন হয় বিমান। মধ্যবয়সী, সাধারণ চেহারার একজন মহিলা মাথা খুঁড়ছে দেওয়ালে, সিঁথি জুড়ে সিঁদুর, গলার স্বরে হাহাকারের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে আরও নানা কথা—সেগুলো পুরোপুরি উদ্ধার করা না গেলেও ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগেনি বেশি। মহিলার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ও হাঁটুতে থুতনি চেপে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া বিষণ্ণ মুখে বসে আছে বছর দশ-এগারোর একটি ছেলে। আশপাশে ওপরের ও নিচের ফ্ল্যাটের আরও কয়েকজনকে দেখেছিল বিমান, গোকুলকেও, এবং মিসেস দত্তকে। বিমানকে দেখেই ছুটে আসেন তিনি। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার জন্যেই শুধু নয়, চোখেমুখে ফুটে ওঠা আক্রোশের জন্যেই প্রায় চেনা যাচ্ছিল না তাঁকে। 'কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন তো!' মিসেস দত্ত বললেন, 'এ নিজেকে মিস্টার দত্তের ওয়াইফ বলে ক্লেম করছে! একটা ফ্রড, বদমাইস! লাইফে শুনিনি ওঁর আগে কখনো বিয়ে হয়েছিল! তা ছাড়া—'

মিসেস দত্তের কথা শেষ হবার আগে কিংবা বিমান কিছু বলবার আগেই মহিলা হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে তাঁর পায়ের সামনে, 'আমি ওঁরই স্ত্রী, ওই তাঁর ছেলে। টাকা পাঠানো বন্ধ হতে এসেছিলাম। ভগবান সাক্ষী—', এর পরের কথাগুলো হারিয়ে যায় সেই অদ্ভুত হাহাকারের আড়ালে।

মিসেস দত্ত বা এই মহিলা, এরপর কাউকেই আর লক্ষ করেনি বিমান। তার চোখ ছিল ছেলেটির ওপর। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে অধীর দত্তের পুরো আদল। তখনই মনে পড়ে, নতুন ফ্ল্যাটে আসার মাসখানেকের মধ্যেই সেরিব্রাল স্ট্রোকে মারা যায় প্রৌঢ় অধীর দত্ত—এই বাড়িতে প্রথম মৃত্যু। মনে পড়ে, এখনো যেমন, তেমনি অধীর দত্ত বেঁচে থাকতেও সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না রত্নাবলীর, থাকত না। অধীর বা রত্নাবলী কারুর সঙ্গেই তার সামাজিক পরিচয় হয়নি ; তবে ওদের উপস্থিতি টের পেত এক একদিন বেশি রাতে, যখন মুখোমুখি ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসত গ্লাস ভাঙার কিংবা ঝগড়ার শব্দ। প্রায়ই। একদিন সকালে নিজের বেডরুম-সংলগ্ন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎই দেখতে পায় বিমান, শববাহী একটা কালো গাড়ি নিচে এসে থামল। তারপর গোকুল এসে খবর দেয়, কাল রাতে হঠাৎ মারা গেছে অধীর দত্ত।

পুরো ব্যাপারটা অনুমান করতে সময় লেগেছিল কিছুটা। অবস্থার হেরফের হয়নি কোনো। খানিক পরে মিসেস দত্তকে সম্বোধন করে বিমান বলেছিল, 'এভাবে এখানে সিন ক্রিয়েট করে লাভ কী! ওঁদের ঘরে নিয়ে যান, শুনুন, তারপর—'

'আর ইউ এ ফুল !' বিমান শুনেছিল রত্নাবলী একদা স্টেজে অভিনয় করতেন, এই মুহূর্তের অঙ্গভঙ্গিতেও সেই ধারণা স্পষ্ট হলো—যেন তিনি ধরেই নিয়েছিলেন বিমানকে এইভাবে বলা যায়, 'কোন আক্কেলে ঘরে ঢোকাতে বলছেন ! ঘরে ঢোকানো মানেই তো ক্লেম এস্ট্যাবলিশ করা !'

'হয়তো !' কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করেছিল বিমান, যাতে কারুরই কানে না যায়। তখনো তার চোখ বিষণ্ন বালকটির মুখের ওপর নিবদ্ধ, কানে শুধুই হিজিবিজি কান্নার শব্দ। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তার মনে হয়েছিল, ওই মহিলা এবং ছেলেটি শীঘ্রিই অধীর দত্তকে অনুসরণ করবে। আর দাঁড়ায়নি। নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগোতে এগোতে বলেছিল, 'তা হলে আপনি নিজেই ডিসিসান নিন।'

এখন ভাবলে বিশ্বাস হয় না, ঘটনাটা এইখানেই ঘটেছিল এবং কালই ঘটেছিল, তখন আর এই মুহূর্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র কয়েক ঘণ্টার। রত্নাবলী পুলিসে খবর দিয়েছিলেন ; গোকুলের খবর সত্যি হলে পুলিসই সরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের—হয়তো থানায়, কিংবা রত্নাবলীর ফ্ল্যাট থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে রাস্তায়। যেভাবে বস্তায় ভরে অবাঞ্ছিত কুকুরছানা বা বিড়ালকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাদের কেউ কেউ ফিরেও আসে আবার। কিন্তু তফাত আছে মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে—এরা, ওই মহিলা আর ছেলেটি, নিশ্চিত ফিরে আসবে না। এই পৃথিবীর অসংখ্য মানুষজনের মধ্যে তারা দু'জন মাত্র, সেদিক থেকে দেখতে গেলে ঘটনাটার গুরুত্ব নেই কোনো। শুধু এইখান দিয়ে যাতায়াতের সময়, একটা নিঃশ্বাস চেপে বিমান ভাবল, ঘটনাটা মনে পড়বে তার। আবছাভাবে মনে পড়বে হাঁটুতে থুতনি চেপে বসে থাকা নিরীহ বালকটিকে আর এক কপাল সিঁদুর নিয়ে মহিলার দেওয়ালে মাথা ঠোকা। এই সব ভাবতে ভাবতে বিমান দেওয়ালের আবছা লালের দিকে তাকাল এবং ফিরে এলো।

সামনে গোকুল। সম্ভবত সে বিমানের গতিবিধি লক্ষ করছিল। চলে যাবার আগে পিছন থেকে ডাকল বিমান।

'একটু চা পাওয়া যাবে ?'

'দিচ্ছি। অফিস যাবেন না ?'

'যাবো—'

আগাগোড়া ঘটনাটার মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটা রহস্যের আভাস—আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে বিমান ভাবল, সম্ভবত কোনো দিনই সে এই রহস্যের হদিস পাবে না। মনে হয়, খুব ভেবেচিন্তেই পুলিসে খবর দিয়েছেন রত্নাবলী। ব্যাপারটার একটা রেকর্ড হয়ে রইল। তার মানে এর পরেও যদি কখনো ফিরে আসে ওরা এবং ঝামেলা করে, তখন সহজেই ওদের ট্রেসপাসের আইনে ফেলা যাবে। কিন্তু, যদি অন্য রকম কিছু হয়, অর্থাৎ, ভাগ্য মেনে না নিয়ে অধীর দত্তের স্ত্রী বলে কথিত ওই মহিলা ও তার নাবালক পুত্র তাদের প্রকৃত স্বত্ব কায়েম করতে চায় এবং প্রমাণও করে, তখন ? রত্নাবলী কি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছেন ? তফাতটা, এ-ক্ষেত্রে, প্রধানত সিঁদুর থাকা এবং না-থাকা নিয়ে—

চা নিয়ে এসেছে গোকুল। কাপটা রাখতে রাখতে বলল, 'বৌদি কাল ফোন করেছিলেন—'

'কে ?'

'খুকুর মা—'

বিমান অল্প নড়ে বসল। তাকাল গোকুলের মুখের দিকে।

'কখন ? বলোনি তো ?'

'আপনি ফেরার আগে। তারপর·তো এই কাণ্ড !'

'কিছু বলছিল ?'

'ফিরেছেন কি না খোঁজ করছিলেন—'

'ঠিক আছে—'

গোকুল তখনই গেল না। অল্প অপেক্ষা করে বলল, 'ফোন করে বলব আপনি ফিরেছেন ?'

'না, থাক।'

গোকুল চলে গেল। বিমান জানে, সে অন্য রকম উত্তর আশা করেছিল। ফোন-টোন করতে ভালোবাসে ; বিশেষত পরিচিত কেউ হলে তো কথাই নেই—একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না। এমনও হতে পারে, গোকুলের জেরায় নীপা এমন কোনো কথা বলেছে—জ্যোতির অসুস্থতা বা আর কোনো বিষয়ে, যেটা বিমানকে জানানো প্রয়োজনীয় না হলেও গোকুল নিজে চিন্তিত। ফোন করার জন্যে তাই এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু, এও জানে বিমান, সে নিজেও আজ অন্য রকম ব্যবহার করছে, সুতরাং উত্তরটাও অন্য রকম হবে। নিজেই বুঝতে পারছে, তার কোনো ভাবনাই আর সচরাচরের খাতে বইছে না ; এমনকি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার যে-ক্ষমতা তার পক্ষে স্বাভাবিক, তাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। ভাবছে, কিন্তু কী ভাবছে সে-সম্পর্কেও নিশ্চিত নয় পুরোপুরি—চারিদিক আচ্ছন্ন করা ঘন কুয়াশার মধ্যে কোনো অপরিচিত গ্রাম্য স্টেশনে নেমে হঠাৎই যেমন থমকে যেতে হয়, তেমনি সেও থেমে দাঁড়িয়েছে একটা ধাঁধার মধ্যে। শুধু এটুকু বুঝতে পারে ভিতরের এই টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে এমন কোনো ইঙ্গিত, যার সঙ্গে সে নিজেও জড়িত—যে-ধাঁধা থেকে বেরুনো, হয়তো, খুব সহজ নয়। তা না হলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রায় দু' ঘণ্টা সময় এমন এলোমেলোভাবে অপব্যয় করতে পারত না। দিল্লি থেকে অ্যাটাচি-ভর্তি যে-কাগজগুলো সঙ্গে এনেছে, যতোটা সম্ভব দেখে রাখতে পারত সেগুলো। কাল প্লেনে আসতে আসতেই দেখেছিল অনেকটা এবং ভেবেছিল বাকিটা বাড়ি ফিরে সারবে। কিন্তু কার্যত কাল সেই সময় সে যেখানে ছিল এখনো সেইখানেই আছে, খাপছাড়াভাবে নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে শুধু। আর এখন—এখন তো তার অফিসে বেরুবার জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে যাবার কথা !

এইভাবে ভাবলেও কোনো উৎসাহে পৌঁছুতে পারল না বিমান। আলস্য থেকে নিজেকে টেনে তোলার জন্যে প্রায় এক চুমুকে চা-টা শেষ করল সে, আবার সিগারেট ধরাল এবং উঠে দাঁড়াল। পরবর্তী কাজ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো গেল না।

রোদে ঝলমল করছে ঘরের ভিতরটা। তবু, একটু আগে যে-ধরনের তাপ অনুভব করেছিল এখন আর তা নেই। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতেই ছায়া ছড়াতে দেখল সে ; সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মেঘ টের পেয়েছিল আকাশে, সম্ভবত মেঘ জমতে শুরু করেছে আবার। বাইরে থেকে উঠে আসছে বিচিত্র নানা শব্দ। আলোর তারতম্যে ও শব্দের আবির্ভাবে নতুন কোনো উদ্যম সৃষ্টি হলো না। মাথাভর্তি অসহায়তা নিয়ে বিমান বুঝতে পারল, পরিবেশ তাকে নিয়ে যাচ্ছে না কোথাও : বরং ঘুরেফিরে ঢুকে পড়ছে সেই একই অসারতার মধ্যে—অবাস্তব জেনেও, সেই কান্নার শব্দে।

ব্যাপারটার মীমাংসা করতে পারত এক অধীর দত্তই। সে মারা গেছে। ঘটনা থেকে

যেটুকু বোঝা যায়, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ওই মহিলাকে টাকা পাঠাত অধীর দত্ত—সম্ভবত ও ছেলেটির ভরণপোষণের জন্যে। এ-ছাড়া ওদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক ছিল কি? কিংবা থাকলেও রত্নাবলী কি তা জানতেন? হয়তো আমৃত্যু অধীর দত্ত রত্নাবলীর কাছ থেকে নিজের অতীত লুকিয়ে রেখেছিল, কোনো শর্ত না রেখেই তারা একত্র জীবনযাপন শুরু করে এবং এই সূত্রেই, একটা সময়ের পরে খুব স্বাভাবিকভাবে অধীর দত্তের সব কিছুর ওপর নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করেন রত্নাবলী। হঠাৎ ওই মহিলা ও বালকটির আবির্ভাবে নড়ে উঠেছে তাঁর সমস্ত ভিত। আবার ব্যালকনিতে পৌঁছে, সঠিক কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়েই বিমান ভাবল, এমন কি হতে পারে যে রত্নাবলী সমস্তই জানতেন, সব জেনেশুনেই বিয়ে করেন অধীরকে এবং তারপর, অধীরের মৃত্যুর পর এমনভাবে নিজের অধিকার আগলে রেখেছিলেন যে ভাবতেই পারেননি কোনো দিন সেখানে কোনো ঝড় উঠবে! ভিতরে ভিতরে টলে গেলেও তাই কাল তিনি অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন! মনে আছে, ক্লেম কথাটার ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। এমনও হতে পারে বিমানকে বোকা বলে ধমক দেবার মধ্যে নিজের কূটবুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সবই সম্ভব। সমস্যাটা, এ-ক্ষেত্রে, সিঁদুর থাকা এবং না-থাকা নিয়ে।

সিগারেটটা নিবে গেছে। অকারণ কয়েকবার সেটায় টান দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিল বিমান। শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে সেটা দ্রুত ধাবমান একটা মোটরের ছাদে পড়ে নিমেষে হারিয়ে গেল কোথায়। রাস্তা দিয়ে পরপর হেঁটে যাচ্ছে লোকজন, দেখেই বোঝা যায় এদের বেশির ভাগই অফিস-যাত্রী। কাছেই গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট—সরকারী চাকুরেদের ফ্ল্যাট। এই সময়টা তাদের অফিস যাবার তাড়ায় সরব হয়ে ওঠে রাস্তা। প্যাঁচকাটা একটা ঘুড়ি উড়ে উড়ে নেমে আসছে নিচে, সেদিকে চোখ রেখে অন্ধের মতো ছুটে আসছে এলেবেলে কয়েকটা ছেলে। ঘুড়িটা রাস্তায় পড়বার আগেই প্রচণ্ড কর্কশ শব্দের ঝাঁকুনিতে একটা মিনিবাসকে ব্রেক কষতে দেখল বিমান। সামনের লাল-হলুদ রঙের কাটা ঘুড়িটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অসহায় চোখে মিনিবাসের চাকার দিকে তাকিয়ে আছে একটা ছেলে—আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই চাপা পড়ত নির্ঘাত। ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টররা নেমে এসে ঘিরে দাঁড়াল ছেলেটিকে, উঠে দাঁড়াবার সময় দিল, যেন তখনো সন্দেহ যায়নি। তারপর, ছেলেটি উঠে দাঁড়াতেই সবকটি হাত এক সঙ্গে মারতে উদ্যত হলো তাকে। বিমান দেখল, ছিঁড়ে কয়েক টুকরো হয়ে ঘুড়িটা ক্রমশ উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়, এখন আর কোনো দাবিদার নেই। বাসটা চলতে শুরু করেছে আবার: হতবুদ্ধি ছেলেটি ফুটপাথে উঠে এসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তাকিয়ে থাকল চলে যাওয়া বাসটির দিকে। তারপর ওপরে।

সূর্য আড়াল করে উড়ে যাচ্ছে সাদা থোকা থোকা মেঘ। মেঘের নিচে কাছাকাছি দূরত্বে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছে আরও গোটাতিনেক ঘুড়ি। প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেও ফিরে এলো ছেলেটি, হাল ছাড়েনি তবু। ছেলেটির ওপর চোখ রাখতে রাখতেই বিমান হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। উল্টো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রাস্তা পেরুনোর জন্যে অপেক্ষা করছেন রত্নাবলী, হাতে চেনে বাঁধা কালো স্প্যানিয়েল। খটকা লাগল। এর আগে কখনো এভাবে কুকুর নিয়ে রাস্তায় বেরুতে দেখেনি রত্নাবলীকে, তা ছাড়া, এতোখানি বেলায় কুকুর নিয়ে রাস্তা হাঁটে না কেউ। চোখাচোখি হবার সম্ভাবনায় চোখ তুলে নিল সে। সিনহাদের বাড়ির বউটি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। বিমানকে দেখেও এবার কোনো তাড়া দেখাল না। ভিতর থেকে, মনে হলো, টেলিফোন বাজার শব্দ আসছে। হ্যাঁ,

ঠিকই। সরে আসতে আসতে বিমান দেখল মাথা নিচু করে রাস্তা পার হচ্ছেন রত্নাবলী। কাল রাতের ঘটনার পর হয়তো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যেই কুকুর সঙ্গে নিয়ে বেরুবার দরকার হয়েছিল তাঁর।

রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওদিক থেকে নীপার গলা ভেসে এলো। বিমান আগেও অনুমান করেছিল, কিন্তু, এখনই তার মনে হলো, তখন সায় দেওয়া উচিত ছিল গোকুলের কথায়। নীপার স্বভাবে অভিমান বেশি ; সহজেই এটা-ওটা ভেবে নেয়।

ত্রুটি আড়াল করার জন্যে আপাতত যতোটা সম্ভব স্বাভাবিক ও আন্তরিক হবার চেষ্টা করল বিমান।

'বলো, নীপা ? কাল ফোন করেছিলে ?'

'হ্যাঁ।' বলেই চুপ করে গেল নীপা। অর্থ করে নেবার দায়িত্ব বিমানের।

'প্লেন লেট ছিল, ফিরতে অনেক দেরি হয়েছে। তা ছাড়া—', নিজেকে গুছোতে না পেরে সরাসরি অন্য কথায় চলে গেল বিমান। ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'জ্যোতি কেমন আছে ?'

'ওপর ওপর কিছু বুঝবার উপায় নেই। আজ অফিস যাচ্ছে—'

'ক'দিন রেস্ট নিলে ভালো করত !'

জবাব পেল না। এর পরের প্রসঙ্গটির জন্যে নিজের ভিতর পর্যন্ত ডুব দিল বিমান। তার ও নীপার মাঝখানে টেলিফোনের দেওয়াল। এ-বিষয়ে কথা হয়নি কোনো দিন, তাই, বিমান ঠিক বুঝতে পারে না নীরব থাকার আগ্রহ কার বেশি, এইভাবে সংলগ্ন থেকে সময়টাকে কে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে চায় !

কিন্তু, সত্যিই এমনভাবে থাকা যায় না বেশিক্ষণ। এমনও হতে পারে পাঁচ দিন পরে কথা বলার সূত্রে নীপা ঠিক বুঝতে পারছে না আগের ঘটনা কতোটা মনে রেখেছে বিমান, কোথা থেকে শুরু করলে পৌঁছুতে পারবে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে। নাকি জ্যোতি সামনে আছে বলেই ঠিক সহজ হতে পারছে না নীপা ?

'সে কোথায় ?'

'এই তো, চান করতে গেল।' নীপা বলল, 'তুমি অফিস যাবে না ?'

'যাবো। তবে কখন যাবো ঠিক বলতে পারছি না। শরীরটা ভালো নেই—'

'আমাকে এ-কথা শুনিয়ে লাভ কী !' হঠাৎ কথাগুলো বলে সময় নিল নীপা। তারপর বলল, 'আমি ফোন করছি নিজের স্বার্থে—'

ঠিক এই মুহূর্তে এই কথাগুলি আশা করেনি বিমান। চোয়াল শক্ত করে বলল, 'এক্স-রে রিপোর্ট পেয়েছ ?'

'পেয়েছি। ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি রেখে দিলেন। বলেছেন তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'আর কিছু বলেননি ?'

'বললেন ঘাবড়াবার কিছু নেই।' নীপা যেন হেসে নিল একটু, 'সাইকোলজিস্ট হলে বুঝতে পারতেন আমার বয়সটা খুব কম নয়, এ-কথার মানে যে-কেউই বুঝতে পারে—'

ডাক্তার তাকে দেখা করতে বলেছে শুনেই ভুরু কুঁচকে উঠেছিল বিমানের, নীপার শেষের কথাটায় জটিল হলো আরও। তবু, নিজেকে লুকিয়ে সে বলল, 'সব ব্যাপারে তোমার এই সিনিকাল অ্যাটিচ্যুড ভালো নয়। জ্যোতির এই প্রথম ; আমার এর আগে

তিনবার ক্লিনিকাল টেস্ট হয়ে গেছে—'

'তুমি জ্যোতি নও—'

এই রকম সময়ে সাধারণত 'ছাড়ছি' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখে বিমান। আজ ইতস্তত করল। সে অন্তর্যামী নয়, তবু কানে টেলিফোন লাগিয়ে রেখে তার মনে হলো নীপার ঠোঁটের কোণে বাঁকা ভাবটুকু সে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। এখন নীপাকে কিছু বলা দরকার। কী বলবে বুঝতে না পেরে বিমান বলল, 'ঠিক আছে। আমি ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলব।'

'আমার থাকার দরকার আছে ?'

'দরকার হলে জানাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। রাখি ?'

'আমার কথা শেষ হয়নি এখনো।'

'বলো ?'

'খুকু কি তোমার ওখানে গেছে ?'

'খুকু! না তো! হঠাৎ এখানে আসবে কেন!'

'তা জানি না।' গলার স্বরে এলানো ভাব ফুটল নীপার, 'কাল সারা দিন মুখ ভার করে ছিল। আজ সকালেই তৈরি হলো, বেরিয়েছে একটু আগে। জিজ্ঞেস করলাম, বলল তোমার কাছে যাচ্ছে। তুমিই তো ওর ধ্যানজ্ঞান—'

'নীপা, খুকু তোমার মেয়ে—'

'আমি ঠাট্টা করছিলাম—'

বিমান হাসল, শব্দ করে ; হাসির ছুতো ধরে এড়িয়ে যেতে চাইল প্রসঙ্গটা। তারপর বলল, 'আর কখন আসবে! আমি তো অফিসে বেরিয়ে যাবো এক্ষুনি—'

'বলেছে যখন নিশ্চয়ই যাবে।' নীপা বলল, 'অপেক্ষা করো। কুড়ি বছর ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছ, আমার মেয়ের জন্যেও না হয় কিছুক্ষণ করলে—'

এবার সত্যি সত্যিই হাসল বিমান এবং হালকা গলায় বলল, 'সত্য সময় দেয় না। কিন্তু মিথ্যার জের সারা জীবন ধরেই টানা যায়।'

বিমান হাসলেও, নীপা ঠিক সহজ হতে পারল না। গম্ভীর, ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল, 'হেসো না। যদি সত্যিই কিছু না থাকে, বারবার তোমার ওপর নির্ভর করছি কেন! তোমারই বা দায় কিসের!'

নীপা যে বিচলিত, গলা শুনেই তা বুঝতে পারল বিমান। হয়তো জ্যোতিকে নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়েছে বেশি ; সেই জন্যে যে-কথাগুলির মানে হয় না কোনো, যে-কথাগুলি তাদের কাউকেই নিয়ে যাবে না কোথাও, ঠিক সেই কথাগুলি বলে আড়াল করবার চেষ্টা করছে নিজেকে। কী জবাব দেবে সে ? যার নিজের সংসার নেই, বাঁচতে হলে তাকে অন্যের সংসারে নাক গলাতে হবেই ? নাকি, সম্পর্ক থাকলেই নির্ভর করতে হয় মানুষকে ? কিন্তু, সত্যি সত্যিই তো এসব কথার মানে নেই কোনো। কিংবা, মানে যদিও বা থাকে, এদের ভিত্তি কোথায়! দশ বছর আগে একদিন জ্যোতি তাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা। দশ বছর ধরে, তারপর, যতোবারই তথ্য দিয়ে যুক্তি সাজিয়েছে বিমান ততোবারই মনে হয়েছে, অভ্যাস, অভ্যাস—অভ্যাস ছাড়া এ আর কিছু নয়। নীপাকে এসব বোঝানো যাবে না। মাঝে মাঝে সে পুরোপুরি মেয়ে হয়ে ওঠে—শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি রন্ধ্র কেঁপে ওঠে আবেগে। যেমন এখন। বিমান থেমে যাবার কথা ভাবল।

'হ্যালো— ?'
'বলো শুনছি—'
'শরীর ভালো নেই বলছিলে, কী হয়েছে ?'
'তেমন কিছু নয়। ঘোরাঘুরির ক্লান্তি আর কী ! ভাববার কিছু নেই—'
'তুমি তা হলে জানিও ?'
'হ্যাঁ। রাখছি—'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার পরও বেশ কিছুক্ষণ সেটায় হাত ছুঁইয়ে রাখল বিমান—যেন আবার তুলে কানে ধরলে নীপার গলা শুনতে পাবে। তারপর হাতটা তুলে নিতে নিতে ভাবল, এভাবে নিজেকে নিজের কাছে হাস্যকর করে তুলে লাভ কী ! নীপা যেভাবেই ভাবুক না কেন, সে তো জানে পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে ঠিক কোনখানে। আজ সকালেই ভেবেছিল, জীবন একার হলেও জীবনের দায় হয়তো একার নয়। কেন ভেবেছিল !

এই এক অস্বস্তি ! নীপার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সকালের ভার কমে গিয়েছিল অনেকটা ; কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছে সেটা ফিরে আসছে আবার। কিছুটা জোর করেই এবার নিজেকে ধাতস্থ করবার চেষ্টা করল বিমান। গোকুলকে ডাকল এবং গোকুল এলে বলল, 'খুকু বোধ হয় আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। কিছু খাবার-দাবার আছে ? না থাকলে এনে রাখো—'

গোকুল বলল, 'সবই আছে। কালই বিকেলে বাজার করেছি।'
'ঠিক আছে। আমি একটু পরে বেরুবো।'
বিমান সরে যাচ্ছিল, গোকুল বলল, 'আপনি যাবার পরের দিন দুপুরে খুকু এসেছিল—'
'কেন !'
'তা জানি না। বোধ হয় কলেজ থেকেই এসেছিল, সঙ্গে একটা ফরসা মতো ছেলে। ছেলেটা অবশ্য থাকেনি, চা খেয়েই চলে গেল—'

অরিন্দম, অনুমান করে নিল বিমান। জবাব না দিয়ে গোকুল আরও কী বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'ছেলেটা চলে যাবার পর খেতে চাইল। সারা দিন নাকি খাওয়া হয়নি !' গোকুল বলল, 'ভাত খেল, ঘুমোল। গেল সন্ধের আগে—'
'ভালো করে খাইয়েছিলে তো ?'
'সে আপনাকে ভাবতে হবে না।'
গোকুল থামল একটু। পরে বলল, 'মেয়েটার মাথায় ছিট আছে—'
'কেন !'
'খেতে বসে দেখলাম কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে বলল, ভালো রান্না দেখলেই নাকি ওর কান্না পায়। এটা কোনো কথা হলো !'

বিমান হাসল, মেপে, যাতে কথা এগোতে না পারে। জবাব দিল না। গোকুল গপ্পো করতে ভালোবাসে ; আলোচনা জিইয়ে রাখার জন্যে কোনো দিনই প্রসঙ্গের অভাব হয় না ওর। কিন্তু, তার সময় নেই। সুস্থ ও সাবলীল একটি লোক সকাল থেকে ভেসে যাচ্ছে অলস ভাবনায়, সময়ের গতিবিধির ওপর চোখ নেই কোনো, এটা ভাবতে খারাপ লাগে। বস্তুত, আলসেমি তার স্বভাববিরুদ্ধ। মনের ব্যাপারটা আছে, থাকবে, বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার

একমাত্র উপায় কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখা নিজেকে। সত্যি বলতে, কাজ আছে এবং ছিল এবং কাজের মধ্যে নিজেকে দ্বিধাহীনভাবে এতো দিন ধরে জড়িয়ে রাখার ফলেই বিমান আজ বিমান মজুমদার। হয়তো এটাও সত্যি, সে বিমান মজুমদার না হয়ে যদি আর কেউ হতো—যদি ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলো ক্রমশ এড়িয়ে যেত তাকে, সাফল্য থেকে যেত শুধুই হাতছানি হয়ে, তা হলে মনের সমস্যাগুলোও কেটে যেত একে একে। নীপা যে-নির্ভরতার কথা বলল, সেটা কি থাকত তখনো।

হয়তো থাকত, হয়তো থাকত না। তবে নিশ্চিত সে এতোটা সাবলীল হয়ে উঠতে পারত না।

শব্দগুলো আবার ফিরে আসছে চারিদিক থেকে। নীপার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময়েই বেলা ন'টার ভোঁ বাজতে শুনেছিল বিমান। তারপরেও সময় গেছে কিছুটা। বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে কামাতে ও ভাবল, এক হিসেবে ঠিকই বলেছে গোকুল, খামখেয়ালিপনায় সুদেষ্ণার জুড়ি নেই। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় নীপাকে যা'ই বলে থাকুক, হয়তো শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুবে না এখানে ; কিংবা এমন সময় আসবে যখন বিমান বাড়ি নেই। এ-রকম প্রায়ই করে। সুতরাং, সুদেষ্ণার জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। অফিসটা আগে।

এইভাবে ভাবলেও, স্থির কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল না বিমান। দাড়ি কামাল ; কিন্তু স্নানটাও সেরে নিল না সেই সঙ্গে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে পরিপাটি বিছানায় গা এলিয়ে দিল আবার, সিগারেট ধরাল, তারপর টেবিলের ওপর থেকে গতকাল এয়ারপোর্টে কেনা 'টাইম' ম্যাগাজিনটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। এখন মনে হচ্ছে মনের চেয়ে শরীরের আলস্যই বেশি। এর ফলে অফিসে পৌঁছুতে দেরি হবে। সে-জন্যে কিছু নয়, একটু পরে একটা ফোন করে দেরির কথা বলে দিতে পারে। নীপা বলেছিল, কাল সারা দিন মুখ ভার করে ছিল সুদেষ্ণা। এমনকি হতে পারে, বিমানকে কিছু বলার জন্যেই সে আসছে এখানে! যদি তাই হয়, তার অপেক্ষা করা উচিত। সুদেষ্ণাকে চেনে। নীপার মেয়ে হলেও নীপার বয়সে পৌঁছুতে তার এখনো অনেক দেরি।

অন্যমনস্কতার মধ্যে একসঙ্গে অনেকটা ধোঁয়া টেনে ফেলেছিল। বুকে চাপ অনুভব করতেই ছটফটে হাতে সিগারেটটা অ্যাশট্রের ভিতর পিষে দিল বিমান ; দম নিল। জানে, ভয় পাবার কিছু নেই। নীপা জানে, সে জ্যোতি নয়। নীপার কথা ঠিক হলে জ্যোতি এতোক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে অফিসে। হয়তো হাঁটছে রোদের মধ্যে দিয়ে, হয়তো দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে। হয়তো উঠে পড়েছে বাসে। যা'ই করুক, এইভাবে শরীরের ঝুঁকি না নিয়ে আরও কয়েক দিন বিশ্রাম নিতে পারত বাড়িতে। কে বোঝাবে ওকে, ওর যুদ্ধটা নীপা বা আর কারুর সঙ্গে নয়, শরীরের সঙ্গে। যতো দিন যাচ্ছে ততোই যেন অহঙ্কার বেড়ে উঠছে জ্যোতির ; বারণ করলে বিরক্ত হয়—নিজের স্বাতন্ত্র্য আর অধিকার প্রমাণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কে বোঝাবে, এটা ছেলেমানুষী ছাড়া কিছু নয়! বিমান ? না।

আকস্মিক মানসিক বৈষম্য এসে অধিকার করে নিল বিমানকে। মাথার ভিতর বনবনে ধাঁধা, সহজ জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎই বিশাল ঢেউয়ের আবির্ভাবে যেমন দিশেহারা বোধ করতে হয়, এখনকার অবস্থাটা অনেকটা তেমনি—নিজেকে সামলে নেবার আগেই সে ছড়িয়ে গেল দূরে। স্মৃতির পরিবর্তন সবই দেখাচ্ছে নতুন করে।

দশ বছর আগে সুদেষ্ণা ছিল অনেক ছোট। আট কি নয়ের বেশি নয়। ওই বয়সে

বাহ্যিক সম্পর্ক যেটুকু জ্ঞান এনে দেয় মনে, তার চেয়ে বেশি কোনো জটিলতায় ওইটুকু মেয়ের জড়ানো সম্ভব নয়। তবু, নীপা বা জ্যোতি নয়, বলতে গেলে সুদেষ্ণাই তার চোখ খুলে দেয় সেদিন।

চোখের ওপর হাতের আড়াল, নিঃশ্বাসে তরঙ্গ নেই কোনো। দৃশ্যটা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনল বিমান।

রাত গভীর হলে যে-কোনো শব্দই হয়ে ওঠে দ্বিগুণ জোরালো। নীপাদের ঘর থেকে তার ঘরের দূরত্ব যতোখানিই হোক না কেন, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার শব্দটা কানে পৌঁছুতে দেরি হয়নি। এরকম হতেই পারে—সেই মুহূর্তে অস্বস্তি নিয়ে নিজের ঘরে ছটফট করতে করতে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল বিমান, দাম্পত্যের সবটাই কিছু মধু-মাখানো নয়। আট-দশ বছরে জ্যোতি ও নীপা তাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে ; ওদের সঙ্গে এক হয়ে এবং ওদের থেকে আলাদা হয়ে যখন দেখত, প্রায়ই মনে হতো, যেমন তেমন করে বাঁচার মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্কের দেওয়ালে প্রতিদিনই নতুন ইঁট তুলছে ওরা, আড়াল বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে আরও। 'বয়সে বড়ো হতে পারো—', কী ব্যাপারে মনে নেই, নীপা একদিন বলেছিল, 'তা বলে সবই বুঝবে তার কী মানে আছে! ব্যাচেলারদের বাড়টা ঘটে বাইরের দিকে, শেকড়ের বাড় তোমার চোখে পড়বে কেন!' এই কথা, বা এই ধরনের কোনো কথা। বুঝতে পারত না বলেই পারতপক্ষে এসবের মধ্যে নাক গলাত না বিমান। অবরোধ ভেঙে গেল সুদেষ্ণার চিৎকারে। ছুটে এসে ওদের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিল বিমান। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে নীপার, গলায় অক্রান্ত জ্যোতির দুই প্রবল হাতের চাপে কণ্ঠরুদ্ধ সে, একটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরেছে আলনাটা, অন্য হাতে গলা থেকে জ্যোতির হাত সরাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। এক পলক দেখেই সেই অভাবনীয় পরিস্থিতি থেকে নীপাকে উদ্ধার করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। ক্রোধে উন্মত্ত জ্যোতিকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো জ্যোতি! কী করতে যাচ্ছিলে খেয়াল আছে!'

খেয়াল করা দূরের কথা, হঠাৎ বিমানের এসে পড়ায় সামান্য ভাবান্তর ঘটল না জ্যোতির। ঘটনার আকস্মিকতায় শুধু চকিতের জন্যে বিহ্বল দেখাল তাকে। তার পরেই ক্ষিপ্র হাতে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা কাচের গ্লাসটা তুলে ছুঁড়ে মারল বিমানের কপাল লক্ষ্য করে। এটা যে সম্ভব তা আগেই অনুমান করেছিল বিমান, তবু দেওয়ালে লেগে গ্লাসটা যখন ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ছে, সেই শব্দে কান রেখে সে শুধুই ভেবেছিল, এও কি সম্ভব? জ্যোতি নিরস্ত হয়নি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার জ্বালাতেই সম্ভবত, মুঠো শক্ত করে দাঁড়িয়ে সে তখন কাঁপছে থরথর করে। কোনো রকমে নিজেকে জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি আমার ব্যাপারে নাক গলাবার কে! বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এই বাড়ি থেকে—'

দশ বছর আগে স্বাস্থ্যে জোর ছিল অনেক বেশি। ইচ্ছে করলেই জবাব দিতে পারত বিমান। মন সায় দেয়নি। অপমানের চেয়ে গভীর দুঃখে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'বেশ। আমি বেরিয়েই যাচ্ছি—'

'না, বিমানকাকু যাবে না। তুমি যাও—'

সুদেষ্ণার চিৎকার শুনে ছুটে এলেও এই ঘরে তার উপস্থিতি চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। খেয়াল হলো যাবার মুখে। ততক্ষণে খাট থেকে নেমে এসেছে সুদেষ্ণা, ছোট দু' হাতের বেড়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'যাবে না, বিমানকাকু,

তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে না—'

অপরিণতের কান্না বড়ো ছোঁয়াচে। সুদেষ্ণা কি 'আগাদের' বলেছিল, নাকি 'আমাকে' ? এতো দিন পরে যা মনে পড়ে, নিজের অসহায়তাকে তখনো সে একলা করে চিনতে শেখেনি। তবে, এটা ঠিক, কান্নার আবেগ দিয়েই সেদিন তাকে মন্থর করে দিয়েছিল সুদেষ্ণা। মুহূর্তের জন্যে হলেও দ্বিধান্বিত বিমান ভেবেছিল, সে চলে গেলেই কি সব সমস্যার সুরাহা হবে! নতুন কোনো সমস্যার শুরু হবে না তো!

'শেখো। অন্তত মেয়েকে দেখে শেখো।' আক্রমণের অভিঘাত কাটিয়ে ততোক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে নীপা। গলায় ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। বিপর্যস্ত, যেন এখনো জ্যোতির হাতের ফাঁস লেগে আছে গলায়, ভেঙে যাচ্ছে কথাগুলো। বলল, 'ওইটুকু মেয়ে পর্যন্ত তোমার ব্যবহার দেখে মুখ লুকোচ্ছে লজ্জায়।'

'আমার মেয়ে হলে লুকোত না!' চাপা, বিক্ষোভ মেশানো গলা জ্যোতির। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মেয়ে যে কার তা তো জানি!'

'কী বললে! মেয়ে তোমার নয়!' যে-চেহারায় কোনোভাবেই মানায় না নীপাকে, জ্যোতির কথার শ্লেষে সেই চেহারাটাকেই যেন জোর করে প্রকট করতে চাইল সে, 'ইতর! তুমি একটা ইতর! সন্দেহে জানোয়ার হয়ে উঠেছো!'

'আর তুমি! তুমি কী ?'

'আমি!' জ্যোতি এখন কী পারে না পারে আন্দাজ করার জন্যেই যেন একটু থামল নীপা। তারপর সমস্ত বিষ উগরে দিয়ে বলল, 'আমি কী তাও বোঝাব তোমাকে। বিমানদা একা যাবে না, আমিও চলে যাবো ওর সঙ্গে—'

'নীপা, তোমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো!'

ওই পরিস্থিতিতে যে তার মুখে ওই কথাগুলো ঠিক সময়েই এসে পড়বে, নিজেও ভাবতে পারেনি বিমান। বলেছিল, 'তোমরা', কারণ মাত্রা ছাড়ানোর ব্যাপারটা আগে বলতে পারেনি জ্যোতিকে। সেদিন নিজেকে জাহির করার সেটাই ছিল বিমানের পক্ষে প্রথম এবং শেষ সুযোগ।

তার পরের অনেকটা অংশ কাদাজলে ঘোলাটে, যার ভিতর হাজার হাতড়ালেও ছুঁচ বা আংটি কোনোটাই উঠে আসে না। হাতের সব জল শুকিয়ে গেলেও লেগে থাকে আবছা দাগ ; যে খুঁজেছে সে ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না সেই চিহ্নের অর্থ। বিমান নিজেও কি পেরেছিল ? হয়তো না। সব অনুভূতি ডুবে গিয়েছিল শোকের স্তব্ধতায়। এসব ঘটনা ভাবলেই শ্মশান-প্রত্যাগত একজনকে দেখতে পায় বিমান, আদ্যন্ত শূন্য বলেই তার আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়ার ধরনে ত্রুটি থাকে না কোনো। স্মৃতি জড়িয়ে যায় স্মৃতিতে, কিংবা, এমনও হতে পারে, সেই মুহূর্তে আর কোনো স্মৃতি থাকে না বলে বর্তমানও রূপ নেয় স্মৃতির। একদিকে জ্যোতি ও নীপার আত্মঘাতী ঝগড়া, আর একদিকে সুদেষ্ণার অসহায় কান্না—প্রায়ান্ধকার একটা সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে কোনো রকমে নিজের ঘরে পৌঁছেছিল বিমান, 'বেরিয়ে যাও' কথাটা অবসেসানের মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়। ভূতগ্রস্তের স্বাভাবিকতায় নিজেকে বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে সে কি ভেবেছিল, বছরের পর বছর, প্রতিদিন, বিছানাটা নীপাই করে দিয়ে যায়! হয়তো, না হলে পরের ভাবনাটা ছুটে আসত না। নীপা তার অনেক কাজই করে দেয়, বিমান ভেবেছিল, যেগুলো সে নিজেও করতে পারত। তখন হঠাৎই মনে পড়ে, এই একই কাজ নীপা জ্যোতির জন্যেও করে। তা হলে তফাতটা

কোথায় !

প্রায় পঁয়তাল্লিশে পৌঁছেও পঁয়ত্রিশের বিমানের সঙ্কট এড়াতে পারে না বিমান। পৌঁছুতে চায় যে-কোনো একটা উত্তরে। জুলাইয়ের সকালে, রোদের আলোর মধ্যে, রাত ও নৈঃশব্দ্য ঢুকে পড়ে বুকে। হিম-লাগা শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় উঠে এসে দোল খায় গলার ভিতর, বেরুতে পারে না। যেন এখন সামান্যতম শব্দ হলেই বাজ পড়বে হঠাৎ শুরু হওয়া স্তব্ধতায়। অলসভাবে শুয়ে শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে একটু অবাকই হলো বিমান। আশ্চর্য, বয়সের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলেও স্মৃতিতে চিড় পড়েনি এতোটুকু—যা যা মনে করার তার সবগুলিই ঠিক ঠিক এসে যাচ্ছে মনে, এমনকি অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্যের শব্দগুলো পর্যন্ত। সেদিন, নৈঃশব্দ্যে কান পেতে সে কি ভেবেছিল, পারস্পরিক ঘৃণায় আবদ্ধ দুটি মানুষ, হয়তো একটু আগেই যাদের একজন খুন হতো এবং আর একজন খুন করত—একই চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও একটু পরেই তারা এমন চুপচাপ হয়ে যায় কী করে ! এই কি দাম্পত্য !

দরজাটা খোলাই ছিল। বিমান অন্যমনস্ক। একটু বা উদাসীন। না ঘুমোলেও সম্ভবত বন্ধ করে রেখেছিল চোখদুটো ; না হলে যতোই সন্তর্পণে আসুক, সুদেষ্ণার আবির্ভাব টের পেত নিশ্চয়ই। সাড় এলো সুদেষ্ণার ডাকে। স্পষ্ট চোখে তাকাতেই অবাক ; বগলে ছোট বালিশ নিয়ে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুদেষ্ণা—চোখের কোলে তখনো লেগে আছে জলের দাগ, এলোমেলো চুল, ফ্রকের বোতামগুলো সম্ভবত ঠিক ঠিক জায়গায় লাগায়নি, একটা দিকে, তাই, ঝুলে পড়েছে বেশি।

'কী হলো, খুকু !'

'আমি তোমার কাছে শোবো, বিমানকাকু।'

'চলে এলি হঠাৎ ! মা বকবে না !'

'মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—'

বিমান উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে খাটের ওপর উঠে এলো সুদেষ্ণা, জায়গামতো বালিশটা পেতে উল্টোমুখে শুয়ে পড়ল।

'মাকে বললাম পেট ব্যথা করছে। মা বলল, তোর জন্যেই যতো অশান্তি, তুই দূর হ—'

বিমান চুপ করে থাকল। নীপা-জ্যোতিরা বাড়িতে না থাকলে এর আগেও কোনো কোনো দিন সুদেষ্ণাকে পাহারা দিয়েছে সে, ঘুমন্ত খুকুকে বিমানের কাছ থেকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যাবার কথা ভাবেনি কেউ। শখ করেও কখনো কখনো থেকে গেছে খুকু। কিন্তু, আজকের ব্যাপারটা অন্য। খানিক আগে 'বেরিয়ে যাও' বলে যে-ব্যবধান সৃষ্টি করল জ্যোতি, খুকু তার অন্য পারে—ওই বাধা পেরিয়ে তার এখানে চলে আসা সম্ভব কি ! নীপা হয়তো কিছু ভাববে না ; কিন্তু জ্যোতি ? বিমানের নিজেরও কি উচিত নয় খুকুকে জোর করে ফেরত পাঠানো !

পেটের কাছে হাঁটু মুড়ে এমনভাবে শুয়েছে সুদেষ্ণা, যেন ঘুমিয়েই পড়ল। ওকে লক্ষ করতে করতে বিমান ডাকল, 'খুকু ?'

'কী বলছ ?'

'পেটে ব্যথা করছে কেন ?'

সুদেষ্ণা উঠে বসল, কোলের ওপর দুটো হাত টেনে নিয়ে বলল, 'সত্যি সত্যি ব্যথা করেনি। মা কথা বলছিল না, তাই বললাম পেট ব্যথা করছে—'

'চলে এসে ঠিক করোনি। তুমি বাবার কাছেও থাকতে পারতে—'

সোজাসুজি বিমানের চোখের দিকে তাকাল সুদেষ্ণা। থতমত মুখ।

'বাবার যা রাগ! আমাকেও মেরে ফেলুক আর কী!'

জবাব না দিয়ে কথাটা নানা দিক থেকে ভাববার চেষ্টা করল বিমান। স্পষ্টভাবে কিছুই ভাবল না। আজকের ঘটনার পরিণতিটাই শুধু দেখেছে সে, সূচনায় কী হয়েছিল এবং কেন, এখনো জানা নেই। এ-ব্যাপারে সুদেষ্ণা নিশ্চয়ই আরও অভিজ্ঞ। এটা ওর বাড়ের বয়স, সব না বুঝলেও কিছু-কিছু নিশ্চয়ই বোঝে। এখন ঘাঁটালে গলগল করে অনেক কথাই বলে ফেলবে ; সেটা অভিপ্রেত হবে না। খাট থেকে নিচে নেমে এসে সিগারেট ধরাল সে, পায়চারি করতে লাগল অন্যমনস্ক। সেইভাবেই বলল, 'বাবা তোমাকে কিছুই করত না—'

কোলের ওপর হাত, বসেছে বাবু হয়ে, চোখ মেঝের দিকে নামানো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ওটা সুদেষ্ণারই খাট-বিছানা, বিমানই আগন্তুক। ঠিক রোগা না হলেও খুকুর গায়ে মাংস কম, শরীরের গড়নে এখনো খুঁজে পায়নি নীপাকে। হয়তো বয়স হলে পাবে। কাটা-কাটা নাক মুখ ও রঙের বাহারে জ্যোতিকেই মনে পড়িয়ে দেয় বেশি। আরও একটু খুঁটিয়ে দেখল বিমান এবং ভাবল, তা হলে সন্দেহ কেন!

'বিমানকাকু—', সুদেষ্ণাও যেন অন্য কিছু ভাবছিল, হঠাৎ বলল, 'তুমি পায়চারি করছ কেন! শুয়ে পড়ো। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—'

সুদেষ্ণার কথায় হাসতে গিয়েও থেমে গেল বিমান, দেখল, মেয়েটি হাই তুলছে। ঘুমে কাদা শরীর—যেন একটু ঠেলা দিলেই ঢলে পড়বে অকাতরে। অসম্ভবও নয়। অন্য দিন এই সময় মাঝঘুম পেরিয়ে যায় খুকু, তবুও জেগে থাকার কী অপরিসীম চেষ্টা! মনে হচ্ছে এইমাত্র যে কথাগুলি বলল, সেগুলিও আর মনে নেই এখন। দেখতে দেখতে মায়ায় জড়িয়ে গেল বিমান।

'তুই ঘুমিয়ে পড়, খুকু। হাই উঠছে—'

'তুমি ঘুমোবে না কেন!'

'ঘুমোবো। সিগারেটটা শেষ হোক—'

'ঠিক তো?'

'ঠিক, ঠিক।'

সুদেষ্ণা শুয়ে পড়ল। বিমান যেদিকে, ঠিক সেদিকেই পাশ ফেরা। চোখের পাতা বন্ধ করতে করতেও করল না। মনে হচ্ছে, জোর পেয়ে গেছে কোথাও, অপলক চোখ, এখন অনেকক্ষণ না ঘুমিয়েও দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে।

'তুমি যে চলে যাচ্ছিলে, এই রাত্রে যেতে কোথায়, বিমানকাকু?'

বিমান মাথা নাড়ল, জানে না। ঠিক জবাব দেবার জন্যে নয়, সত্যিই কি জবাবটা জানা ছিল তার? সুদেষ্ণার প্রশ্ন শুনে হঠাৎই মনে হলো, এতোক্ষণের এতো সব কথার মূল্য নেই কোনো—যে-আবেগ থেকে তখন তাকে জড়িয়ে ধরে যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল সুদেষ্ণা, সেই একই আবেগ নিয়ে এখানে ছুটে এসেছে তাকে পাহারা দেবার জন্যে। এতোক্ষণের এলোমেলো কথায় নীপা বা জ্যোতি উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কী জবাব দেবে বিমান!

মনে পড়ায় বিরাম নেই কোনো। চেষ্টাহীন ও সাবলীল, যেন একটা চলচ্ছবির দিকে তাকিয়ে অনায়াসে নিজেকে চিনতে পারছে সে, ছুঁতে পারছে দশ বছর আগেকার অসংখ্য

দৃশ্য ও অনুষঙ্গ। তার কোনোটাই আবছা বা অস্পষ্ট নয়। আর ওই প্রশ্ন, 'যেতে কোথায় ?' উত্তরে না গিয়েও বুঝতে পারে বিমান, বস্তুত এতো দিনেও তার যাওয়া হয়নি কোথাও। যদি হতো, তা হলে প্রত্যক্ষ দিনের বেলায় বুকের মধ্যে রাত বাজতে শুনত না সে। যেন পাশেই শুয়ে আছে খুকু, গভীর ঘুমে অচেতন, তবু সেই অচৈতন্যের মধ্যেও যে-কোনো একটা হাতের ছোঁয়া লেগে থাকছে বিমানের গায়ে। ওই স্পর্শটুকুই তার নিরাপত্তা আর আশ্বাস। অবশ্য, আজ মনে হয়, খুকুকে কাছে রেখে সে নিজেও খুঁজেছিল যে-কোনো রকমে আত্মরক্ষার যুক্তি, না হলে, সত্যিই তো, অতো রাত্রে সে যেত কোথায়!

এই মুহূর্তে, আজকের সুদেষ্ণাকে মনে করতে গিয়ে, সেদিনের রোগাটে, ভিতু আর আতঙ্কিত, ফ্রক-পরা ছোট মেয়েটিকেই ফিরিয়ে আনল বিমান। বারবার। ফিরিয়ে আনল ঘুমের মধ্যে তার পাশ ফেরা, তার বিড়বিড় করা, কষ্টে কেঁদে ওঠা আর কুঁকড়ে থাকা শীতে। ভোররাতে তার গায়ে আদরে চাদর জড়িয়ে দিতে দিতে বিমান কি ভেবেছিল, পরস্পরের মধ্যে এতো মাখামাখি সত্ত্বেও কোনো সম্পর্কেই নেই নির্ভরতার আশ্বাস! সবই নিজেকে ভোলানোর জন্যে যে-কোনো একটা সম্পর্ক ধরে আঁকড়ে থাকা—হঠাৎ-বৃষ্টি থেকে গা বাঁচানোর জন্যে রাস্তার ধারে কোনো গাড়ি-বারান্দার নিচে ছুটে যেতে যেতে যেমন সেইটাকেই মনে হয় সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়!

টেলিফোন। শব্দ। রিং হয়ে যাচ্ছে। তিনবার থেকে চারবারের মাঝামাঝি সময়ে উঠে বসল বিমান—শীতল একটা অনুভূতি নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে; নিজেই ভাবল: মৃত যেমনভাবে জেগে ওঠে লাসকাটা টেবিলে, সকলের অগোচরে। না, ধরছে না গোকুল। সম্ভবত অফিসের কল। অন্য দিন এই সময় অবশ্যই পৌঁছে যায় সে, আজ এখনো গা-ডোবানো আলস্যে—সে-জন্যেও হতে পারে। নিশ্চিত নীপার নয়। সুদেষ্ণার? না। এমনও হতে পারে, আসবে বলে বেরিয়েও চলে গেছে অন্য কোথাও—সেই খবরটুকুই জানাতে চায়। অবশ্য সেটা জানলেও নিশ্চিন্ত হয়ে অফিসে বেরিয়ে যেতে পারে বিমান। এতোক্ষণ ধরে অন্যমনস্ক চিন্তায় নিজেকে ভাসিয়ে না রেখে অফিসের কাগজপত্রগুলো দেখে রাখতে পারলেও অনেকটা এগিয়ে যেতে পারত। শেষ পর্যন্ত ভাবনাগুলো তাকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়!

চারিদিকে তাকিয়ে চড়া রোদ্দুরের খানিকটা নিজের মধ্যে টেনে নিল বিমান।

'হ্যালো—'

'হ্যালো! মিস্টার মজুমদার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ—'

'আমি মিসেস দত্ত।' একটু থামলেন, 'চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, বলুন?'

'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। মানে—'

বিমান ভুরু কোঁচকাল এবং বলল, 'আমার সঙ্গে! কী ব্যাপার!'

'ওই কালকের ইনসিডেণ্টটা—'

'হুঁ—'

'আমি কি আসব আপনার ফ্ল্যাটে—মানে—'

বিমান শুনল 'আর ইউ এ ফুল!', তারপর কোনো দ্বিধা না রেখেই বলল, 'না। আমি

এখন ব্যস্ত। তা ছাড়া—তা ছাড়া, মিসেস দত্ত, কালকের ইনসিডেন্টের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই—আমি আপনাকে কোনো হেল্প করতে পারব বলে মনে হয় না—'

ওদিকে সাড়া নেই কোনো। সম্ভবত কথা খুঁজছেন মহিলা। হয়তো কথাগুলো একটু রূঢ়ভাবেই বলেছে, চট করে এর কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া মুশকিল। তার দায়িত্ব বিমান নিতে পারে না। 'সরি' বলে ফোন ছেড়ে দিল সে। অনেকক্ষণ পরে পূর্বাপর কাল রাতের সমস্ত ঘটনাই মনে পড়ল তার এবং নিঃশ্বাস ধরে রেখে ভাবল, তফাতটা সিঁদুর থাকা এবং না-থাকা নিয়ে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক, তার চিন্তা ও ব্যবহারে সামঞ্জস্য নেই কোনো ; এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় তার নিজেরই তৎপর হওয়া। না হলে নিশ্চিত অবিবেচনার পরিচয় দেবে। ভাবা মাত্র আবার টেলিফোন তুলল বিমান, ডায়াল করে অফিসে যোগাযোগ করল এবং বলল, তার পৌঁছুতে দেরি হবে। ফোন ধরেছিল চন্দ্রা। বলল, 'কী ব্যাপার ?'

'কিছু নয়। এমনিই—'

'সাউণ্ডস ডিফারেন্ট !' পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের গলায় কথা বলবার চেষ্টা করল চন্দ্রা, 'শরীর খারাপ নাকি ?'

'না। এমনিই—।' হয়তো আরও একটু সময় নিত বিমান, আজ কোনো মিটিং বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি না জেনে নিত ; কিন্তু, প্রায় তখনই কলিং বেলের শব্দ হতে ও ভাবল, সুদেষ্ণা ; সংক্ষেপ করার জন্যে 'রাখছি' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল তাড়াতাড়ি। গোকুল দরজা খুলেছে। সুদেষ্ণাই।

'ফেরেনি ?'

'যাও। ঘরে আছে—'

সুদেষ্ণা আসার আগেই এলো তার শরীরের গন্ধ। যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকল বিমান। মনে মনে প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কেমন যেন বিচ্যুত লাগছে ঘটনা থেকে। কখনো কখনো এমন হয়, সংস্রবহীন একটা ভাবনা এসে হানা দেয় মনে—তাড়াবার হাজার চেষ্টা করলেও যায় না। যেমন আজকের ভাবনাটা। অবসাদগ্রস্ত মনে বিমান ভাবল, সুদেষ্ণা আজ না এলেই ভালো করত।

'কবে এলে, বিমানকাকু ?'

'কাল রাত্রে। সকালেই চলে এলি ! খবর কী তোর ?'

'আমার আবার খবর !' যেমন বলে প্রায় তেমনি, তৈরি গলায় বলল সুদেষ্ণা, 'অশান্তি, বুঝলে বিমানকাকু, সংসার মানেই অশান্তি। তুমি কেমন আছো ?'

'ভালো।'

যতোক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় ততোক্ষণই সুদেষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বিমান। আঁচ করার চেষ্টা করল। এমন হাসিমুখে অশান্তির কথা সুদেষ্ণাই বলতে পারে। নীপার মেয়ে হয়েও এই একটি ব্যাপারে নীপাকে ছাড়িয়ে গেছে ও ; কথার সঙ্গে চোখমুখের ভঙ্গির মিল খুঁজতে হিমসিম খেতে হয়। এই মুহূর্তেও যেমন ; বোঝা যায় না মুখ ভার বলতে নীপা কী বলতে চেয়েছিল ! সে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনের মাঝখানে।

'আয়। এ-ঘরে আয়।'

'তোমার অফিস নেই ?'

'আছে— ।' বেডরুমে ঢুকে সোফার ওপর নিজেকে আলগা করে দিল বিমান। চারিদিকের বদ্ধ আবহাওয়া হঠাৎই ছড়াতে শুরু করেছে ; সন্দেহ নেই, সুদেষ্ণাই তাতে চিড় ধরাল প্রথম। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'নীপা ফোন করে বলল তুই আসছিস। থেকে গেলাম। না হলে এতোক্ষণ বেরিয়ে পড়তাম।'

সুদেষ্ণা ঘুরছিল। এতোটুকু সময়ের মধ্যেই একবার উঁকি দিয়েছে বাথরুমে, দ্রুত পায়ে ব্যালকনি অব্দি পৌঁছে রাস্তা দেখে এলো। সরেজমিনে তদন্ত করার ধরন। এখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'মায়ের ফোন করা হয়ে গেছে! উঃ! ভেবেছিলুম একটা সারপ্রাইজ দেবো তোমাকে!'

'সারপ্রাইজ! আমাকে!' বিমান হাসল, আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল যেন। তাকাল সোজাসুজি, 'তুই কি নতুন আসছিস ?'

'তা হলেও— ।' কোনাকুনি রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে সুদেষ্ণা। কথার পিঠে কথা সাজাতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর বলল, 'অমনভাবে তাকিয়ে কী দেখছ বলো তো!'

'তোকে। তোর মুখে অবিকল তোর বাবার আদল।'

কথায় ধার নেই কোনো, তবু একটু কেঁপে গেল সুদেষ্ণা। কানের লতি ছুঁয়ে বলল, 'নতুন দেখছ ?'

'না। নতুন নয়।'

যেন নিজেকেই বলা। ঈষৎ অন্যমনস্কতার মধ্যে লক্ষ করল সুদেষ্ণা চলে যাচ্ছে, হয়তো গোকুলের কাছে। হয়তো চা-টা দিতে বলবে। আট কিংবা দশ বছর আগে কী হয়েছিল তা ওর মনে থাকার কথা নয়। সেদিন তার ছোট হাতের আগলে বিমানকে আটকে রাখতে রাখতেই ক্লান্ত ঘুমে ঢলে পড়েছিল সে। ওই বয়সে অপমান গায়ে লাগে না। না হলে জিজ্ঞেস করত, 'বেরিয়ে যাও' বলার পরেও তুমি থেকে গিয়েছিলে কেন!

ধোঁয়াটা আটকে যাচ্ছে গলায়। ঊর্ধ্বমুখে হাঁ করে সেটাকে বেরিয়ে যেতে দিল বিমান। প্রায় অভ্যাসে সিগারেটে টান দিল আবার। কিছু না-দেখার মতো করে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল বহু দূরে।

সময় ও আলোর তারতম্য ছাড়া আর কোনো তফাত নেই ; অন্ধকার বিছানায় বসে একই দূরত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে সেদিনও সে তাকিয়েছিল দরজার দিকে। জ্যোতি তখনই এসে দাঁড়িয়েছে বা আরও আগেই এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করেনি। আবছা, কাঠের মূর্তির মতো স্থির তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি। তখন বলে নয়, যেন অনেক দিন আগেই বিমানের কাছাকাছি আসতে গিয়ে কিছু ভেবে থমকে দাঁড়িয়েছে।

অস্বস্তি কাটিয়ে বিমানই কথা বলেছিল প্রথম।

'খুকুকে নিতে এসেছো ?'

'না।' জড়ানো স্বর জ্যোতির। অন্ধকারে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের ভিতর দু'তিন পা হেঁটে এলো, এতো স্তব্ধ চারিদিকে তার ও জ্যোতির মধ্যে ঘুমন্ত খুকুর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। অপেক্ষার ধরন দেখেই বিমান বুঝেছিল খুকু যে ঘুমিয়ে আছে এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে জ্যোতি। খানিক পরে বলল, 'আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি, বিমান।'

'ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই—'

'আছে।' থেমে গিয়ে ঢোঁক গিলল জ্যোতি। পরে বলল, 'বাড়িটা যে তোর আমি তা

ভুলে গিয়েছিলাম—'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিতে পারেনি বিমান। তার কি সন্দেহ হয়েছিল, এক কথা বলতে এসে আর এক কথায় জড়িয়ে যাচ্ছে জ্যোতি ?

'ব্যাপারটা একই। আমি ভাবছি, আমাকে একটু সময় দাও—'

'ভাববার কিছু নেই।' যেটুকু দূরত্ব ছিল তা এক নিমেষে পার হলো জ্যোতি। এগিয়ে এসে অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত টেনে নিল নিজের মুঠোর মধ্যে। বিমান অনুভব করল, জ্যোতির সমস্ত শরীরের কাঁপুনি জড়ো হয়েছে ওর মুঠোর মধ্যে। গলা কাঁপছে। বলল, 'নীপাকে চেনার অনেক আগে থেকে তুই আমার বন্ধু, বিমান। আমাকে ছেড়ে যাস না।'

এই কথার কী জবাব হতে পারে ভেবে পায়নি বিমান। হাতটা তখনো জ্যোতির মুঠোয় ; ঘুমন্ত সুদেষ্ণার দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, নীপা জানে না জ্যোতি এখন কোথায়। জানলে হয়তো অন্য রকম হতো। আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, 'রাত হয়েছে। তুমি এখন যাও—।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি—'

ফিরে যাবার ধরনে কোনো অভিনবত্ব ছিল না জ্যোতির। এমনকি, বিমানের কথা শুনে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে কি না তাও বোঝা যায়নি। অন্ধকার ফিরে এসেছিল নিজের জায়গায়।

গোকুল চা দিয়ে গেল। পিছনে চায়ের কাপ হাতে সুদেষ্ণা। ঘরের মাঝখানে, ঠিক যেখান থেকে ফিরে গিয়েছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল। প্লেটসুদ্ধ ধরা কাপটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে যেতে ধরা পড়ে ওর যৌবন ; দশ বছর ধরে ক্রমাগত দেখছে বলেই ধারাবাহিকতা চেনা যায়, তা না হলে সেদিনের খুকুর সঙ্গে আজকের সুদেষ্ণার বড়ো একটা মিল নেই। শুধু ওই মুখের আদলটুকু ছাড়া। এমন নির্ভুল স্বাক্ষর, তবু যে কেন চিনতে ভুল করেছিল জ্যোতি!

চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে কাপটা তুলে নেবার আগে ক্রমশ ধোঁয়ার রেশ মিলিয়ে যেতে দেখল বিমান। খুব ভালো হতো যদি যে-কোনো অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়া যেত এখন। এখান থেকে বাইরে, তারপর গ্যারাজ থেকে পুরনো অস্টিনটা বের করে অফিসের দিকে। কাজে। এখনও কি যায় না ?

'বিমানকাকু, তোমাকে আজ এতো একা লাগছে কেন ?'

'একা!' বিমান হাসল, নিজের মনেই জড়িয়ে গেল কথার ধ্বনিতে। হাসিটা জিইয়ে রেখে বলল, 'একা লাগবে কেন!'

'তা জানি না।' দ্রুত কাছে সরে এসে কপালে হাত ছোঁয়াল সুদেষ্ণা, 'জ্বরটর হয়নি তো ?'

বিমান চিনতে পারল, সেই একই হাত। প্যাটার্ন বদলালেও ধরন বদলায়নি। তবে, চলায়, বলায়, কপালে হাত রাখায় সুদেষ্ণার স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয়ই ছিল না নীপার। ওই ঘটনার দিন সাতেক পরে কপালে প্রায় একই স্পর্শ পাবার জন্যে সত্যি সত্যিই শরীরে জ্বর আনতে হয়েছিল তাকে। কপালে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া আর একলা হাতের বালাটি ছাড়া সেদিন আর কোনোভাবেই ধরা দেয়নি নীপা। চাপা গলায় অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, 'বেরিয়ে যাও বললে বেরিয়েই যেতে হয়। থেকে গেলে কেন! আমার জন্যে ?'

কী ছিল নীপার সেই কথায় ? শ্লেষ ? অপমান ? বিমান আজও বুঝতে পারে না।

কোনো রকমে নিজের হাত তুলে নীপার হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, 'আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও—'

'না, জ্বর নেই।' হাতটা তুলে নিলেও সরে গেল না সুদেষ্ণা। খানিক তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ক'দিনেই তোমার অনেকগুলো চুল পেকে গেছে—'

'গেছে না!' জোর করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল বিমান, 'আজ সকালে দেখেছিলাম আয়নায়। এরপর আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাবো।'

'তখন তোমাকে আরও সুন্দর লাগবে—'

সান্ত্বনা নয়, সুদেষ্ণা এইভাবেই বলে। সামনে থেকে পিছনে সরে গিয়ে জায়গা করে দাঁড়াল, দু' হাতে বিমানের মাথাটা ধরে সোফার পিঠে হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'এইভাবেই থাকো। তোমার ক'টা চুল বেছে দিই—'

'তুই একটুও বদলাসনি, খুকু।'

'কেন!'

'চুল বাছার শখ তোর বরাবরের। ছোটবেলায় এই করে কত যে কাঁচা চুল ছিঁড়েছিস—'

খুব সাবধানে একটা পাকা চুল তুলে নিয়ে খেলাচ্ছলে বিমানের নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে সুদেষ্ণা বলল, 'তোমার কোন কথাটা ঠিক ? সেদিন বলছিলে আমি নাকি অনেক বদলে গেছি, আজ বলছ বদলাইনি!'

'দুটোই।'

সুদেষ্ণা আর কিছু বলল না। বেছে বেছে চুল তোলায় তার মনোযোগ স্পষ্ট হলো মাথার ভিতর নরম আঙুলের নড়াচড়ায়। হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে কানের লতি। মাঝে মাঝে কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে অন্যমনস্ক নিঃশ্বাস। বিমান লবঙ্গের গন্ধ পেল। এ-রকম প্রশ্রয়ে লোভ বেড়ে ওঠে শরীরের, ইচ্ছে করে শুয়ে থাকতে চোখ বুজে—তারপর ঢলে পড়তে ঘুমে। কিন্তু তা হবার নয়। গড়িমসি করে এরই মধ্যে সময় নষ্ট করেছে অনেকটা। কারণও ছিল। নীপা বলেছিল, সুদেষ্ণা আসবে—অন্তত যতোক্ষণ এসে না পৌঁছয় ততোক্ষণ যেন সে অপেক্ষা করে। সুদেষ্ণা এসেছে, সম্ভবত বিমান এখন প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারে।

অল্প নড়ে বসল বিমান। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সুদেষ্ণাকে।

'কাল তোর কী হয়েছিল ?'

'কাল ?' হাত থেমে গেল সুদেষ্ণার, একটু ভেবে বলল, 'কী আবার হবে!'

'সারা দিন নাকি মুখ ভার করে ছিলি ?'

'মা বলেছে নিশ্চয়ই! এতো লাগানো স্বভাব! আমাকে নিয়ে এতো মাথা ব্যথা কেন!'

ঈষৎ ঝাঁঝ-মেশানো গলা সুদেষ্ণার, অনুযোগ চাপা দেবার জন্যেই যেন থেমে থাকা আঙুলগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠল আবার। এখন ঘাঁটালে অন্য কথা বলবে। তার চেয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়াই ভালো।

বিমান অপেক্ষা করল। বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে গাছের পাতা—সবুজ লাবণ্য ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে ; রহস্যময় সেই গন্ধে নাক ডুবিয়ে ভাবল, সুদেষ্ণা বেড়ে উঠছে নিজের নিয়মে, অন্ধকার বাথরুমে ঠাণ্ডা চৌবাচ্চার জল তাকে উষ্ণ করে তুলছে আরও। নীপা বা জ্যোতির ছক তাকে ধরে রাখতে পারবে না। পুরোপুরি বেরিয়ে যাবার আগে হয়তো ধাতস্থ হবার মতো একটু জমি চায় সে, যেখানে দাঁড়িয়ে ইচ্ছেমতো নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। বিমান সেই জমি। এর মধ্যে নীপা কিংবা জ্যোতিকে টেনে এনে সুদেষ্ণাকে বঞ্চিত

করবে কেন।

'তোর সেই বন্ধুর খবর কী?' আরও একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল বিমান, 'দেখা-টেখা হয়?'

'হয় কখনো-সখনো। খুব বেশি হয় না।'

'কেন?'

'কেন-র কী আছে! আমার ইচ্ছে হলে হয়, না হলে হয় না—'

'ইচ্ছেটা কি তোরই একার?' ঘাড় ঘুরিয়ে একবার সুদেষ্ণাকে দেখে নিল বিমান। এখনো গম্ভীর, মেঘ কাটেনি। মুখ দেখে মনে হয় চুল বাছাটা উপলক্ষ, মনের ভিতর ও এখন অন্য কোথাও। হালকা গলায় বলল, 'ঝগড়া করেছিস বুঝি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো না। হঠাৎ বলল সুদেষ্ণা, 'ওকে আমার ভালো লাগে না—'

'কেন!'

'বড়োলোকের ছেলেদের টেম্পারামেন্টই আলাদা। ওরা কতকগুলো ধারণা নিয়ে জন্মায়—'

বিমান একটা ঘা খেল। এই প্রথম সুদেষ্ণা এই ধরনের কথা বলছে। কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে বলল, 'এর মধ্যে ক্লাস কনফ্লিক্ট্ এলো কী করে! আমি একদিনই দেখেছি অরিন্দমকে। ভদ্র, স্মার্ট, ইনটেলিজেন্ট। ভালো ছেলে—'

'হ্যাঁ, তাই।' সুদেষ্ণা বলল, 'একদিনই দেখেছ। তোমার চোখ আর আমার চোখ কি এক!'

এতো স্পষ্ট করে সুদেষ্ণা কখনোই বলে না। বিমান জানে কোথায় থামতে হয়। বিশেষ করে সুদেষ্ণার বেলায়। হয়তো ঝগড়া-টগড়া করেছে, দু'দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে। ওদেরটা ওরাই বুঝে নিক।

চুলের ভিতর সুদেষ্ণার তৎপর আঙুল; আলস্যে হাই তুলতে গিয়েও থেমে গেল বিমান। একটা কাচের গ্লাস উড়ে গেল তার কানের পাশ দিয়ে—দেওয়ালে ঘা খেয়ে ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। শব্দের অনুরণন মিলিয়ে যাবার আগেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো হাতটা উঠে এলো কপালে। গলার ভিতর চেপে রাখা হাইটা নিঃশ্বাস হয়ে নেমে যাচ্ছে বুকে। সব ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে না।

'খুকু, তোর চুল বাছা হলো? আমি কি অফিস যাবো না!'

সোজা প্রশ্ন; তবু সুদেষ্ণার ব্যবহারে তারতম্য ঘটল না এতোটুকু। হাতদুটো কাজ করে যাচ্ছে অনবরত ও সমানে—যেন তার সমগ্র প্রস্তুতি থেকে বিমান হারিয়ে গেছে এখন, নিজের ভাবনায় উল্টো-সোজা কাঁটা চালিয়ে ঘর তুলে যাচ্ছে সুদেষ্ণা। শরীর ছুঁয়ে আছে বিমানকে। ভঙ্গিতে তফাত থাকলেও সেই ফ্রক-পরা মেয়েটির ধরন থেকে তফাত নেই কোনো। বিমান সরে গেলেই জেগে উঠবে।

'বিমানকাকু—,' যেন বিমানের আগের কথাগুলো কানে যায়নি, এইভাবে হঠাৎ বলল সুদেষ্ণা, 'বাবার কী হয়েছে?'

'কেন!'

'তোমরা কোনো খবর রাখো না। কাল হঠাৎ বলল, খুকু, আমি খুব শীঘ্রি মরে যাবো—।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সুদেষ্ণা, তারপর কাঁপা, ভাঙা গলায় বলল, 'এসব কথা বলে কেন!'

বিমান একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গালের ওপর জলের ফোঁটা পড়ার তপ্ত অনুভূতি নিয়ে উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি।

'তুই কাঁদছিস কেন, খুকু!'

'কেন কাঁদবো না! বাবা কি আমার কেউ নয়!'

যেন বিমানের প্রশ্নের জবাবে নয়, নিজেরই মনে অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখা প্রশ্নটাকে ভেঙে ছড়িয়ে দিল সুদেষ্ণা। কান্নাটা ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে, মুখে, দাঁত-বসানো ঠোঁটে আর গোটা শরীরে।

'খুকু, আমার কথা শোন্— ।' একটা হাত ওর পিঠে রেখে, অন্য হাতে ওর হাত ধরে, নিজের খুব কাছে সুদেষ্ণাকে টেনে আনল বিমান, অনেক দিন পরে—বয়স হবার পর এই প্রথম। স্মৃতি পেরিয়ে গেল দ্রুত। মনে হচ্ছে নিজেকে ক্রমশ সামলে নিচ্ছে সুদেষ্ণা। মুঠোর উল্টো পিঠে আঁচল পাকিয়ে বুলিয়ে নিল চোখের তলায়, তবু ফোঁপানি গেল না। ওকে লক্ষ করতে করতে বিমান বলল, 'এতো বড়ো মেয়ে হলি, তবু বুদ্ধি হলো না তোর! মরা বা বাঁচা কারুর মুখের কথায় হয় না। বাবা বলল, অমনি তুই কান্না জুড়ে দিলি! বাবার কী হয়েছে না হয়েছে তুই কি তা জানিস!'

ফোঁপানি থেমে এসেছে। জোরে মাথা নাড়ল সুদেষ্ণা, যার অর্থ: না।

'একটা লোকের মাঝে মাঝে পেটব্যথা করে, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, দুর্বল লাগে। এসব উপসর্গ তো আরও হাজার হাজার লোকের। তারা সবাই মরে যায় না।'

দৃঢ়ভাবে কথাগুলো বলে সুদেষ্ণার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল বিমান ; কিছু বলে কি না শোনার জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর সরে যেতে যেতে বলল, 'তোর কথা বলার জন্যে তোর মা ফোন করেনি, বলেছে তোর বাবার কথা। আমি আজই ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করব।'

'কখন ?' অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম কথা বলল সুদেষ্ণা, 'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—'

'তুই গিয়ে কী করবি!'

'আমি জানতে চাই বাবার কী হয়েছে—'

সেই চিরাচরিত সুদেষ্ণা, খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে জেদকে দাবিতে পরিণত করতে যার দেরি হয় না এতোটুকু। মুখে রোদ পড়ে ফর্সা রঙে লেগেছে ইস্পাতের আভা ; নাকের পাটা ফুলে আছে অল্প। ছোটবেলায় এই ধরনের কান্নাকাটির পর ও পিঠে চড়ার বায়না ধরত। এখনো যদি সে-রকম কোনো প্রস্তাব করে, বিমান কি রাজি হবে ? আর, সত্যিই, সুদেষ্ণা কী বলবে ? লজ্জা করবে না ?

স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলল বিমান। নিজেকে নিয়ে এমন উদ্ভট চিন্তার সুযোগ বড়ো একটা আসে না।

'হাসছ যে!'

'হাসছি তোর রকম দেখে। তুই ঠিক কার মতো, খুকু ? মা'র মতো ? না বাবার মতো ?'

সুদেষ্ণা জবাব দিল না। কোনাকুনি তাকিয়ে আছে আড়ে-পড়া নিজের ছায়ার দিকে—এমনও হতে পারে, বিমানের কথাগুলো সে ভালো করে শোনেইনি। ঘরের মাঝখান থেকে সরে এসে আলগাভাবে বসল খাটের ওপর, ম্যাগাজিনটা তুলে নিল হাতে, যে-পৃষ্ঠাটা খোলা ছিল সেটার ওপরেই ঝুঁকে পড়ল।

'সোজা কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন, বিমানকাকু ?' মুখ না তুলেই বলল সুদেষ্ণা, 'নিয়ে যাবে কি না বলো ?'

'না, আমি একাই যাবো—'

সিদ্ধান্তের মতো কথাগুলো ছড়িয়ে দিল বিমান। একটু আগেই কান্নার আবেগে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছে সুদেষ্ণা, জানে, আবার নতুন করে নিজেকে ভরে তুলতে সময় লাগবে ওর। যদি তা না হতো, একটু অপেক্ষা করে ভাবল বিমান, তা হলে তার শেষ কথার উত্তরে আবার কথা বলত—যে-কোনো কথা। তা নয়। দেখে মনে হচ্ছে ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রেখে সুদেষ্ণা এখন নিজেকেই পড়ছে, চিনতে চাইছে নিজের আবেগ ও অনুষঙ্গগুলোকে। হয়তো তার অনেকখানি জুড়ে আছে জ্যোতি, হয়তো কেউই নেই। আকস্মিক দুর্ভাবনা কখনো কখনো শূন্য করে তোলে মানুষকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল বিমান। চোখ রাখল রাস্তায়। দিন শুরুর প্রথম ধাক্কা সামলে এখন সবই কেমন এলোমেলো—গতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে শৈথিল্য, সবই আছে, তবু লাল-হলুদ রঙের ছেঁড়া ঘুড়িটার অপ্রয়োজনীয় কাঠামো ছাড়া বিশেষ কিছুই তার চোখে পড়ল না। হিসেবমতো ওটার পড়ে থাকার কথা এদিকের ফুটপাথে, কিন্তু এখন আটকে আছে উল্টো দিকের ফুটপাথের গায়ে। রাস্তা পার হবার জন্যে কিছুক্ষণ আগে ওইখানে চেনে-বাঁধা কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রত্নাবলী দত্ত। ছেঁড়া ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে এখন কেউই বুঝতে পারবে না খানিক আগে ওটা প্রায় মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছিল, এখন হাওয়া যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকেই ছুটে যাচ্ছে। মৃত্যুর কারণ! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ সিগারেট ধরানোর প্রয়োজন অনুভব করল বিমান এবং ভাবল, আর দেরি করা উচিত হবে না। ইত্যাদি ভেবে সে ঘরে ফিরে এলো। সিগারেট ধরাল।

বিছানায় হাঁটু মুড়ে শুয়ে আছে সুদেষ্ণা ; ভুরু দুটো ঈষৎ কোঁচকানো, চোখ ছাদের দিকে। মুখের থমথমে ভাবটুকু কাটেনি এখনো। খানিক ওর দিকে চেয়ে থেকে বুকভর্তি ধোঁয়া টানল বিমান। তারপর, প্রায় কৈফিয়ত দেবার গলায় বলল, 'খুকু, তোর জন্মের অনেক আগে, তোর মায়ের বিয়ের অনেক আগে থেকেই জ্যোতি আমার বন্ধু। তুই এতো ভাবছিস কেন!'

॥ দুই ॥

নীপার তৃতীয় চোখ

সারা দুপুর গুমোট ছিল ; ভ্যাপসা ভাবটা কাটানোর জন্যে বিকেলের দিকে স্নান করতে ঢুকেছিল নীপা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল বৃষ্টি নেমেছে। কম-সম, ঝিরঝিরে নয়, বেশ জোরে—শ্রাবণের বৃষ্টি যে-রকম প্রখর হয়। মাথায় চিরুনি চালাতে গিয়েও হাতটা থেমে গেল তার। আস্তে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল জানলার ধারে। আচ্ছন্ন আকাশে বাজের ডাক। সামনে ও আশপাশে বাড়ির আড়াল, চোখ আটকে যায়। তবু, এই বৃষ্টির তাণ্ডব বুঝবার জন্যে তাকাতে হয় না বেশি দূর। মনই বলে দেয়। তার দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই যেন চেপে

নামল আরো। চোখ তুলে আকাশের অবস্থাটা আঁচ করবার চেষ্টা করল নীপা। সীসে-রঙ আবছা কিছু একটা জড়িয়ে আছে সেখানে, বুঝবার উপায় নেই। সামনে অবিশ্রান্ত জলের পর্দা। শব্দে শব্দ মিশে একটানা হয়ে উঠল ধ্বনি।

বৃষ্টির ছাঁট আসছে ঘরে। জানলা থেকে খাট-বিছানার দূরত্ব হাত দেড়েকের বেশি নয়—এখুনি একসা হবে ভিজে। চটপটে হাতে দুটো জানলার একটা বন্ধ করে দিল নীপা। আলো জ্বালল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আধ-আঁচড়ানো চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে তাকাল টাইমপিসটার দিকে। সবে চারটে। ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে এখনো ; আরও একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই। ঠিকই অপেক্ষা করবে বিমান। কিন্তু, ডাক্তার কী আর করবে!

এই ভেবেই সাত-তাড়াতাড়ি তৈরি হচ্ছিল নীপা। এখান থেকে বাসে-ট্রামে বিমানের অফিসে পৌঁছুতে কম করেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট, তাও যদি ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। বিমানকে কি ফোন করে বলে দেবে, আমি সোজা চলে যাবো, তুমি চলে এসো ডাক্তারের চেম্বারে ? তাতেও কি লাভ হবে কিছু ? এখান থেকে দুটো জায়গারই দূরত্ব প্রায় সমান। আর, সেও তো যেতে হবে বৃষ্টি পেরিয়ে!

সামান্য অসহায় বোধ করল নীপা। কেন যেন মনে হচ্ছে এই বৃষ্টিটা শুভ নয় ; বৃষ্টির আড়ালে জড়িয়ে আছে এমন কোনো তাৎপর্য, যা সে ধরতে পারছে না। শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা সম্ভাবনা। কুড়ি বছর আগে একদিন যেমন হয়েছিল, তার বিয়ের দিন—দুপুর থেকেই নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি, চলছে তো চলছেই, থামবার লক্ষণ ছিল না কোনো। সন্ধে নাগাদ লগ্ন পেরিয়ে গেল, তখনো বর এসে পৌঁছয়নি। তাকে ঘিরে এতোক্ষণ যারা ঘরের মধ্যে ছিল, উৎকণ্ঠায় তাদের সকলেই বেরিয়ে গেল একে একে। কনের সাজে একা, আস্তে উঠে গিয়ে স্থির, অকম্পিত হাতে বন্ধ জানলাটা খুলে দাঁড়িয়েছিল নীপা। অস্পষ্ট একটা সম্ভাবনা দানা বাঁধছিল মনে, তার বেশি কিছু নয়। জানলার পাশে মাঠ ও গাছগাছালি আরও দীর্ঘ ও অন্তহীন হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে দূরত্ব চিনিয়েছিল শুধু। মফঃস্বল শহরের অন্ধকার ও বৃষ্টির শব্দ তাদের সমবেত প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে দেয়নি তাকে।

কুড়ি বছর আগেকার একটা ঘটনা আজ, এই মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে একটা উপলক্ষ মাত্র। সেদিন অনেক রাতে, অন্য লগ্নে বিয়ে হয়ে যাবার পর, একান্তে তার ভয়ের কথা শুনে তাচ্ছিল্যে হেসেছিল জ্যোতি। 'বিয়েটা তো হবে তোমার সঙ্গে আমার—', হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'এর সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্পর্ক কোথায়!' হয়তো ঠিকই বলেছিল ; তখনই কোনো সম্পর্ক খুঁজে পায়নি নীপা। তারপর, হারানোর আশঙ্কা থেকে পেয়ে যাবার উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে কি বলেছিল, 'যদি আর লগ্ন না থাকত!'

হাসি পায়। এসব ভাবলে সত্যিই হাসি পায়। যেমন হাসি পায় এখনো দেওয়ালে টাঙানো তাদের বিয়ের ছবিটার দিকে তাকালে। যে-জ্যোতি আর যে-নীপাকে নিয়ে ওই ছবি, নীপা, তুমি কি তাদের চেনো। জ্যোতিও কোনো দিন তার মতো করে ভেবেছে কি না, কুড়ি বছরে কখনো তা জানবার সুযোগ হয়নি।

তবু, স্মৃতিই জোর এনে দিল মনে। জোর করে ভাবল নীপা, যতোই প্রবল হোক, বৃষ্টি তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ঠিকই থেমে যাবে। আর তখনই মনে পড়ল, ও-ঘরেও জানলা খোলা আছে ; যে-রকম বেঘোরে ঘুমোচ্ছে জ্যোতি, ওর কি জানলা বন্ধ করার কথা খেয়াল হবে। তারই বা এতোক্ষণ মনে পড়েনি কেন!

এলানো চুলের গোছা খোঁপার ধরনে ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়ে গায়ে জড়ানো শাড়িটা

গুছিয়ে নিল নীপা। এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

জ্যোতি আজ অফিসে যায়নি। গতকালও যায়নি। পরশু গিয়েছিল ; দুপুরের পর ফিরে এলো কোঁকড়ানো মুখে। চোখ কোটরে ঢোকা, ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত, ছট্‌ফট করছে অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে। খুকু কোনো দিনই বাড়ি থাকে না ওই সময়ে, হয় কলেজে যায় না হয় অন্য কোথাও। একা বিছানায় শুয়ে একটা গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আলস্যে চোখ বুজে আসছিল নীপার, কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলে ওই চেহারায় জ্যোতিকে দেখে কথা জোগায়নি মুখে। জ্যোতিও বলেনি কিছু। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়।

'কী হয়েছে। চলে এলে!'

'আর বোধ হয় অফিসে যেতে পারব না—'

কথা শেষ করার আগেই বমি করতে বাথরুমে ঢুকেছিল জ্যোতি। তারপর থেকে ছ-সাত ঘণ্টা সময় কেটেছিল বিভীষিকার মধ্যে। রাত দশটায় ডাক্তার বিশ্বাসকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো বিমান। দেখে, ওষুধ বদলে, ইঞ্জেকসান দিয়ে চলে যাবার আগে ডাক্তার বললেন, 'দেখা যাক—'

সম্ভবত ঘুমের ইঞ্জেকসান। ডাক্তার চলে যাবার পর জ্যোতির মাথার কাছে স্থাণুর মতো বসে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর ঘুমিয়ে পড়া লক্ষ করেছিল নীপা। এখনো দেখছে। সচরাচরের চোখে নয়। কুড়ি বছর ধরে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এক রকম দেখায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল চোখ, হাজার চেষ্টা করলেও এখন আর অন্য রকম করা যাবে না তাকে। তবু, নীপা জানে, সেদিন দুপুরে নিজেই শুধু অন্য রকম হয়ে আসেনি জ্যোতি, ছোঁয়াচে রোগের মতো আক্রান্ত করেছে তাকেও। বদলটা টের পাচ্ছে, শুধু বুঝতে পারছে না কীভাবে।

এখন ঘরে ঢুকে সে একটু অবাকই হলো। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে জানলার বাইরে বৃষ্টি দেখছে জ্যোতি। অদ্ভুত স্তব্ধ তার বসার ধরন। পিছন থেকে দেখলেও বোঝা যায় দৃষ্টি যদিও বৃষ্টির দিকে, তবু সীমাহীন সেই রিমঝিম শব্দ ও অঝোর ধারার মধ্যে দিয়ে সে তাকিয়ে আছে আরও দূরে, অন্য কিছুর দিকে—হয়তো কোনো দিনই নীপা যার হদিস পাবে না। কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল নীপা। এই মুহূর্তে অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য সেই নির্বস্তুর শাসন থামিয়ে দিল তাকেও। বসলে সাধারণত মেঝের দিকে ছাড়া আর কোনো দিকে তাকায় না জ্যোতি। আজই অন্য রকম দেখছে। নীপা ভাবল, দেখছে দেখুক। সে অপেক্ষা করতে পারবে।

দু' দিনে আর কোনো গোলমাল না হলেও এখানে দাঁড়িয়ে ওর চেহারার ভাঙনটা স্পষ্ট চোখে পড়ল নীপার। ঘাড়ের ওপর মাথার দিকে জেগে ওঠা ওই হাড়টা নতুন। গলার পিছন থেকে পাহাড়ী ঢালের মতো মাংসের ঢল নেমে থাকত কাঁধের দু' পাশে, আজ তার চিহ্ন নেই কোনো। সমান্তরাল দুই কাঁধের ওপর সরু গলা, তার ওপর পাতলা চুলের নির্জীব মাথা—দেখতে দেখতে হঠাৎই একটা খালি মিক্সচারের শিশির কথা মনে এলো নীপার। অল্প কেঁপে উঠল সে। এই উপমাটাই বা মনে এলো কেন! কুড়ি বছরে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে তাদের সম্পর্ক কি সত্যিই এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে জ্যোতি, তার স্বামী, সহজেই জায়গা বদল করে নিতে পারে একটা শূন্য মিক্সচারের শিশির সঙ্গে!

মনটা দমে গেল। জ্যোতি তার উপস্থিতি টের পায় কি না দেখবার জন্যে আরও

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল নীপা। তন্ময় ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে এখন আর এই ঘর, এই পরিবেশের মধ্যে নেই। ফেরাতে হলে তাকেই এগিয়ে যেতে হবে।

'উঠে পড়েছ ?'

'ও! তুমি!' পাশ ফিরে তাকিয়ে অর্থহীনভাবে হাসল জ্যোতি। খসখসে গলায় বলল, 'বৃষ্টি দেখছিলাম। অদ্ভুত!'

'বৃষ্টির আবার ভূত অদ্ভুত কী।' জ্যোতির হাসির অর্থহীনতা এড়িয়ে গিয়ে নীপা বলল, 'এমন তো রোজই হচ্ছে।'

কথার পিঠে কথা সাজানোর মতো কিছু না ভেবেই জ্যোতি বলল, 'তা হচ্ছে—'

পুবমুখো এই ঘরটা রাস্তার দিকে। সামনে অনেকটাই খোলা। জানলা অনর্গল পেয়ে অবাধে ঢুকছে বৃষ্টির জল ; এরই মধ্যে জানলার কোল বেয়ে খানিকটা জল গড়াতে শুরু করেছে মেঝেয়। জ্যোতিকে কিছু না বলে পায়ের পাতা দিয়ে ঠেলে জলটা নর্দমার দিকে সরিয়ে দিল নীপা ; জানলাটা বন্ধ করতে গিয়েও করল না। ও-ঘরে থাকতে টের পায়নি, এখন দেখল বৃষ্টিতে বৈচিত্র্য না থাকলেও মুষলধারার মধ্যে সোনালি একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সদ্য-ফোটা ভোরের প্রথম আলোর মতো এই মেঘে-ঢাকা বিকেলের আলোয় কোথায় আছে একটা পবিত্রতার আভাস, ঘরের দেওয়ালও তার প্রভাব এড়াতে পারেনি। এমনও হতে পারে, বৃষ্টি নয়, এই আলোর সম্মোহনই এতোক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জ্যোতিকে।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে জ্যোতির দিকে এগিয়ে গেল নীপা ; জ্বর দেখার মতো করে হাত ছোঁয়াল কপালে, গলায়, গেঞ্জির তলা দিয়ে লোমশ বুকে। তারপর বলল, 'চা খাবে ?'

জ্যোতি মাথা নাড়ল, না। নীপার দেখাদেখি নিজেও হাত ছোঁয়াল কপালে ও গলায় ; সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত হতে পারল না।

'জ্বর আছে ?'

'নেই। এতো ওষুধ পড়ার পর থাকারও কথা নয়।' ইচ্ছে করেই স্নেহে সোচ্চার হয়ে উঠল নীপা। খানিক আগেই জ্যোতিকে দেখে মিক্সচারের শূন্য শিশি বলে মনে হয়েছিল, ভাবনাটা যায়নি এখনো। সামনে থেকে দেখলে অবশ্য ততোটা অসুস্থ বলে মনে হয় না। একটানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ওঠার পর চোখেমুখে এসেছে টাটকা, তরতাজা ভাব। দৃষ্টির অস্বচ্ছতা না থাকলে পুরোপুরি স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যেত। মনে হয় ভয়টা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওকে দেখতে দেখতে নীপা বলল, 'বলতে নেই। আজ তুমি অনেকটা ভালো আছো—'

'জানি না।' বৃষ্টির দাপট কমে এসেছে অনেকটা, তবু থামেনি একেবারে। শব্দের একঘেয়েমিতে কান পাতলে ঝিম ধরে যায় মাথায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জ্যোতি বলল, 'একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। খারাপ স্বপ্ন।'

'কী!'

'আমাকে সুদ্ধু কারা যেন এই খাটটাকে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। খাটের মাথা ধরে বাধা দিচ্ছে বিমান। ঠিক বুঝতে পারলাম না। এই খাটটা তো বিমানের, সেই জন্যেই কি ? নাকি সত্যি সত্যিই ও আমাকে মরতে দিতে চায় না!'

'যতো উদ্ভট স্বপ্ন!' নীপার মুখ ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছিল। জ্যোতি তার দিকেই

তাকিয়ে আছে লক্ষ করে সামলে নিল এবং বলল, 'তোমার মাথায় পোকা। তাই এমন আজগুবি স্বপ্ন দ্যাখো। লোকে শুনলে হাসবে—'

'বিমান অনেক করছে—'

'বরাবরই করে।' জ্যোতি এরপর কী বলবে না বলবে বুঝতে না পেরে খাপছাড়াভাবে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলো নীপা, 'তুমিই স্বীকার করো না—'

'এবার করব। মরার আগে সার্টিফিকেট দিয়ে যাবো।'

শেষের দিকে গলার স্বর বুজে এলো জ্যোতির। বিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, না চাপা বিক্ষোভে, ঠিক বুঝতে পারল না নীপা। সত্যি হোক বা মিথ্যে, কুড়ি বছর ধরে একটু একটু করে জমে-ওঠা বিক্ষোভ এক দিনেই পরিণত হবে কৃতজ্ঞতায়, এমন ভাবা ভুল। সম্ভবত এক দিনেই কুড়ি বছরের পথ পার হতে চাইছে জ্যোতি ; তাই, যে-বোধ সহজেই চেপে রাখতে পারত মনের মধ্যে, ভাঙাচোরা শব্দের মধ্যে দিয়ে তাই বেরিয়ে এলো স্বীকারোক্তি হয়ে। বোঝা যায় না এরপর ও কোন দিকে যাবে। বেশি খোঁড়াখুঁড়ি করলে বিরক্ত হতে পারে। নির্দিষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর কথা ভাবতে শুরু করেছে জ্যোতি ; এরপর হয়তো বলবে, তোমার এতো ভাববার কিছু নেই। এতো দিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম ; আমি মরে গেলে তোমারই রাস্তা পরিষ্কার হবে।

বুকের ভিতর দুড়দাড় করে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এলো নীপা। দাঁত বসে গেল জিবে। অসংলগ্ন হয়ে ভাবল, এই কথাগুলোই বা তার মনে হলো কেন! এতো দিনের এতো কথার মধ্যেও ঠিক এই ধরনের কথা কোনো দিনই বলেনি জ্যোতি। বলতে কী, মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে নীপার, আহত অহঙ্কারবোধ থেকে সহজেই যে-কথাগুলো বেরিয়ে আসতে পারে, সেগুলো বলতে না পারার ক্ষোভেই ক্রমশ আরও কুঁজো, আরও নিরপেক্ষ হয়ে উঠছে জ্যোতি, পাথরে প্রতিহত ঢেউয়ের ফেনার মতো রোষে বক্র সমস্ত অভিমান ছড়িয়ে পড়ছে তার নিজেরই রক্তে। এইভাবে, হয়তো আজও সে ফিরে যেত নিজেরই মধ্যে। তা হলে ? জ্যোতির ওপর ভাবনার দায় চাপিয়ে নীপা কি নিজেরই মনের কোনো সম্ভাবনাকে জ্বালিয়ে নিল একটু ?

না। তা হতে পারে না। অন্যমনস্ক জ্যোতির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে শক্ত করল নীপা। মনে মনে বলল, সম্পর্ক যেমনই হোক, কুড়ি বছরে কোনো দিনও যদি তোমার মৃত্যুকামনা না করে থাকি, আজও তা করব না।

হাতের ওপর শরীরের ভর, জ্যোতি তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। এখন দেখলে মনে হয় না অল্পক্ষণ আগেই ঘাড় তুলে তাকিয়ে অভিভূতের মতো বৃষ্টি দেখছিল সে, শিশুর সারল্যে বলে উঠেছিল, অদ্ভুত! আসলে এটাই তার স্বাভাবিক ভঙ্গি—এই মাথা ঝুঁকিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকা, অদৃশ্য ব্যক্তির গলায় কেশে ওঠা, কখনো বা চুলের মধ্যে আকস্মিক হাত চালিয়ে রহস্যময় চিন্তায় ডুবে যাওয়া। কবে যে এই ভঙ্গিটার শুরু হয়েছিল আজ আর ঠিক মনে পড়ে না নীপার। তবে নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে। এই মুহূর্তে জ্যোতিকে লক্ষ করতে করতে নীপা ভাবল, দীর্ঘ কুড়ি বছরের বেশিটাই তাদের কেটে গেছে অপরিচয়ের মধ্যে—স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্র থেকে আর মাঝে মাঝে দাম্পত্যের শরীরী স্বাদ নিয়েও স্বামী-স্ত্রী হতে পারেনি। এই হওয়াটা কেমন তা কি সে নিজেও জানে! জ্যোতিও কি জানে ? এমন কি হতে পারে, এখন, এই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে সে আর জ্যোতি ভেবে যাচ্ছে একই কথা!

বৃষ্টি থামেনি। একটু আগেই মনে হয়েছিল জোর কমে আসছে, মেঘে মেঘে বিস্ফোরণের শব্দে আবার নেমে এলো ঝেঁপে। এমন বৃষ্টিতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাবার কথা। যদি সে-রকম কিছু হয়, তার বেরুতে দেরি হবে ; এমনও হতে পারে, সময়মতো পৌঁছুতে পারবে না। সেক্ষেত্রে একা বিমানের ডাক্তার সেনের চেম্বারে পৌঁছে লাভ হবে না কোনো। এক্স-রে রিপোর্ট, মেডিক্যাল রিপোর্ট, ডাক্তার বিশ্বাসের চিঠি—সবই আছে নীপার কাছে, ব্যাগের মধ্যে। এগুলোই সব। বিমানকে কি ফোন করে বলবে, আমি বেরুতে পারছি না, তুমি চলে এসো—এসে নিয়ে যাও আমাকে ? না, সেটা ঠিক হবে না। খানিক আগেই জ্যোতি বলেছিল, বিমান অনেক করছে—

হতাশ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে নীপা বলল, 'কী যে বৃষ্টি নামল ! থামার লক্ষণ দেখছি না !'

'বেশ তো চলছে, চলুক।' জ্যোতি বলল, 'ভালোই লাগছে—'

নীপা আশা করেনি জ্যোতি এখনই, এই গলায় কথা বলবে—বলবে এই কথাগুলো। সম্ভবত বিষাদ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। স্বামীর প্রকৃত মনোভাব বুঝবার জন্যে আরও কিছুটা সময় নিল ও। তারপর বলল, 'আমি ভাবছি বেরুবো কী করে !'

'কোথায় !'

'সকালে বলিনি, বিমানদার সঙ্গে ছ'টায় ডাক্তার সেনের চেম্বারে যাবার কথা !'

'বিমানের সঙ্গে। ছ'টায় ?' বাঁকা হতে গিয়েও আবার সোজা পথে ঘুরে এলো জ্যোতি, 'এখন কটা ?'

'সওয়া চারটে হবে। সময় আছে অবশ্য—'

'কী লাভ !'

'লাভ ক্ষতির ব্যাপার নয়। অসুখ হলে চিকিৎসা করাতেই হয়—'

'তা হয়।' আচমকা সংক্ষিপ্ত হলো জ্যোতি, নিজেকে গুটিয়ে নিল যেন। মাথাটা বুকের দিকে ঝুঁকিয়ে আনল আবার। তারপর হঠাৎ বলল, 'ডাক্তার বদল, খরচা, মরা ব্যাপারটা যে এতো দামী জানতাম না !'

খুব সহজে, গলার স্বরে সামান্য তারতম্য না ঘটিয়ে, কথাগুলো বলে ফেলল জ্যোতি। মনে হবে ঠাট্টা। নীরবতা সত্ত্বেও, তবু, কথাগুলো এড়াতে পারল না নীপা। জলের ওপর অস্বচ্ছ তেলের দাগের মতো 'মরা' শব্দটা ভাসতে লাগল তার মনের ওপর। বস্তুটা সে চেনে ; সরালে সরে না—প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন জায়গা বদল করে শুধু।

জ্যোতিকে নয়, নীপা এখন নিজেকেই দেখছে। দূর পাল্লার দৌড়ে জ্যোতি যেন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, নীপা নেই দেখে আবার ফিরে এসেছে ট্র্যাকে—নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবার শুরু করতে চায় খেলা। নীপার দুর্বলতাগুলো সে ভালো করেই চেনে ; জানে ঠিক কোথায়, কখন মুখ থুবড়ে পড়বে নীপা। কুড়ি বছরে নীপা তার অনেক খেলাই দেখেছে, হারতে হারতেও চাল বুঝে নিজেকে শানিয়ে নিয়েছে নতুন করে। আজ পারছে না। আজ সে প্রকৃতই দিশেহারা বোধ করল।

'একটা কথা বলব তোমাকে ?' মুখ ফুটে বললেও দ্বিধা কাটাতে পারল না নীপা।

জ্যোতি তখনো হাসছে। হাসিটা বজায় রেখেই মুখ তুলল।

'কী বলবে, বলো ?'

'আমাকে খোঁচা দিচ্ছ দাও। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবো। তাকে এসব কথা বলো

কেন !'

'কী বললাম !'

'কী বলেছ তুমিই জানো— ।' নীপা থামল । সময় নিয়ে বলল, 'যে-কথা এখন আমাকে বলছ !'

'খুকু বলেছে তোমাকে ?'

'না । আমাকে বলেনি । বলেছে বিমানদাকে—'

'বিমানদাকে !'

জ্যোতি চুপ করে গেল ; অনুযোগটা কোথায়, কোনখানে, যেন তাই মাপবার চেষ্টা করছে । হাসিটা কাঁপতে লাগল ঠোঁটে ।

'খুকু তোমার চেয়ে বুদ্ধিমতী । ও জানে তুমি কার কথা বিশ্বাস করো ।'

'জানে না ।' শুকনো ঠোঁটে জিব বোলাতে যেটুকু সময় লাগে, তার বেশি অপচয় করল না নীপা, 'ও জানে না, তুমি জানো না, কেউই জানে না—'

ঝড়টা আসছে ভিতর থেকে । নীপা নিজেকে সেই ভূমিকায় খুঁজে পেল, যেখান থেকে সহজেই কাবু করা যায় জ্যোতিকে, যেখান থেকে রাত দুটোর বিছানা হঠাৎই যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে । দূরত্ব থেকে কাছে সরে এসে হঠাৎই ঝুঁকে পড়ল অপ্রস্তুত জ্যোতির ওপর—চকিতে ওর হাত দুটো টেনে নিয়ে এলো নিজের গলার কাছে ; আবেগে ভাঙা, ছটফটে তার স্বর, যেন এই মুহূর্তে এই মুহূর্তটি ছাড়া তার আর কোনো প্রতিপক্ষ নেই ।

'দ্যাখো, দ্যাখো । হাতটাও দ্যাখো । বাক্সে তুলে রাখিনি ! কী বলবে এরপর ? শরীর বেচে তোমার চিকিৎসা চালাচ্ছি ! এই তো !'

জ্যোতি বাধা দিল না ; নীপা তাকে যেভাবে চালাতে চাইছে ঠিক সেইভাবে চলল । হাত দুটো আলগা করে দেবার পর আস্তে আস্তে ফিরে গেল নিজের জায়গায়—সেই একই ভঙ্গিতে । একই হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে । ঘরের স্তব্ধতা ফিরিয়ে আনার সব দায়িত্বই এখন তার । চুপচাপ হতে হতে বলল, 'আমি যে মরে যাবো এটা তোমার চেয়ে ভালো আর কেউই জানে না ।'

পরিষ্কার গলা জ্যোতির, উচ্চারণে ভুল নেই কোনো । যেন নীপা কিছু না বললেও ঠিক এই কথাটাই কোনো না কোনো সময়ে বলত জ্যোতি, নীপা সুযোগ করে দিল । ঘরে জানলা এবং দরজা থাকলেও এই মুহূর্তে যেন তাদের ভূমিকা নেই কোনো ; দেওয়াল আব দেওয়াল—বেরুবার পথ না পেয়ে কাটা-কাটা শব্দগুলো ঘুরতে লাগল নীপার চারপাশে ।

নীপা এতোটা ভাবেনি । উত্তেজনার মাথায় একটু আগে যা করল, এখনই বুঝতে পারছে সেটা নাটক ছাড়া আর কিছু নয় । একটা হার দুটো বালার চেয়ে একটা মানুষের দাম অনেক বেশি—সে স্বামীই হোক বা আর যে-কেউ ; নীপা, তুমি নতুন কী করেছ ! এই দাম কি শরীরও দিতে পারে । তা হলে সে এই কথাগুলো বলল কেন !

খাপছাড়া একটা অনুভূতি এসে ঝিম ধরিয়ে দিচ্ছে শরীরে । অবলম্বনের অভাবে কপালে ঘাম ফুটে উঠল নীপার । সে যতোই উত্তেজিত হোক, জ্যোতি বুদ্ধি হারায়নি । সম্ভবত আগেই বুঝে নিয়েছিল, বিচলিত না হলে কেউ এমন কথা বলে না । তাই, নীপা যতোই ওপরে উঠুক, ভ্রূক্ষেপ না করে নিচে নেমে এলো তাড়াতাড়ি । জানে, এখন আর কিছু বলবে না ও । জীবনটা কেটে গেল দাবার ছক সামনে নিয়ে । জ্যোতি তার চাল দিয়েছে ; নীপা সামলাক ।

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল নীপার। আড়াল খুঁজতে জানলার কাছে সরে এলো ও, আঁচল তুলে চেপে ধরল চোখের কোণে। সবই যখন গুলিয়ে যায় তখন দুঃখ আর রাগে তফাত থাকে না কোনো, যতোই চেষ্টা করা হোক, এক-পা-ভাঙা পুতুলের মতো যুক্তিও হেলে পড়ে। এর চেয়ে ভালো হতো যদি জ্যোতি তাকে আঘাত করত, রক্ত ঝরত—চেঁচিয়ে কাঁদবার সুযোগ পেত নীপা। সব আঘাতে রক্ত ঝরে না।

বৃষ্টি পড়ে চলেছে সমানে। জোরে তফাত হলেও এখন তা বুঝবার উপায় নেই। সম্ভবত ইতিমধ্যে মেঘ ঘন হয়েছে আরও। শিথিল ভাবনার মধ্যেও আলোর তারতম্যটুকু অনুমান করে নিল নীপা এবং ভাবল, হয়তো ঠিকই বলেছে জ্যোতি—এই-ই যদি ভবিতব্য হয় তাদের, সত্যিই কি লাভ আছে কিছু ছুটোছুটি করে। কথা শুনে মনে হচ্ছে, জ্যোতি ধরেই নিয়েছে সে আর বাঁচবে না। কুড়ি বছরের দাম্পত্যজীবনে গোড়ার কিছু দিন ছাড়া নীপা কোনো দিনই ঢুকতে পারেনি ওর মনে; আজও সে চেষ্টা করা বৃথা। তবে, হালকাভাবে বললেও, ছেঁড়া কাটা-কাটা দু'চারটে কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই জ্যোতি বোধ হয় বুঝিয়ে দিতে চাইল, মরা ও বাঁচার মাঝখানে তৃতীয় কোনো রফা নেই; বাঁচতে হলে ইচ্ছে থাকা দরকার। ইচ্ছে দাঁড়ায় যদি আগ্রহ থাকে—থাকে অবলম্বন আর নির্ভরতা। এগুলো যেহেতু নেই, সুতরাং প্রয়োজনও নেই। সুতরাং, কী লাভ।

কথাটা সীসের গুলির মতো বিঁধে গেল কানে। পিঠ সোজা করে দাঁড়াল নীপা। এসব কী ভাবছে সে!

খানা-খন্দে ভরা রাস্তার খোদলে পড়ে একটা ট্রাক বোধ হয় উঠতে পারছে না; বৃষ্টির শব্দের ক্লান্তিকর ধারাবাহিকতা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে এঞ্জিনের রাগী গর্জন। শব্দটা শুনতে শুনতে নীপা ভাবল, সে কি জ্যোতিকে বলবে, বাঁচাটা তোমার নিজের জন্যে নয়—আমার জন্যেই তোমার বাঁচা প্রয়োজন? পরমুহূর্তেই খটকা লাগল, আমার জন্যে! জোর পেল না কোনো। পরিবর্তে, অন্ধকার সিলিংয়ের মতো কুড়িটা বছর তার সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার অন্ধকারই, নীপা জানে, জোর করে টর্চের আলো ফেললে তার অনড় চেহারাটাই স্পষ্ট হবে শুধু, আলো ফুটবে না।

লাভ নেই, ভেবে লাভ নেই কোনো। চিন্তার দিক থেকে নীপা যেন জ্যোতিকেই অনুসরণ করছে এখন—কুড়ি বছরে এমন কোনো স্মৃতি নেই যে, অজুহাত হিসেবেও এই মুহূর্তে সেটাকে টর্চের মতো ব্যবহার করতে পারে। খুঁজেপেতে বের করলেও জ্যোতি কি আমল দেবে? মেঝের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সারা জীবন সে ঘুঁটি আগলে গেছে নিজের; নীপার সাধ্য কি প্রয়োজনের কথা তুলে আজ তার মনস্কতায় চিড় ধরায়!

অনেকক্ষণই নিঃশ্বাস নেয়নি। নাভির শূন্যতা থেকে বুকের দিকে এগোতে গিয়ে থেমে গেল নীপা। পিঠের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে জ্যোতি। কাপড়ের খুঁট ধরার মতো দুটো হাত নীপার দুই কাঁধে; ঘাড়ের নিচের অনাবৃত অংশে থমকে আছে জ্বরগ্রস্তের নিঃশ্বাস। চোখ অন্য দিকে ছিল, তবু খানিক আগেই নীপার মনে হয়েছিল সন্তর্পণে উঠে যাচ্ছে জ্যোতি; বাথরুমে বা অন্য কোনো খেয়ালে; এমন নিঃশব্দে ফিরে আসার প্রস্তুতি ছিল না কোনো। দিনের আলোয় শরীর একাই সক্রিয় থাকে না। এখন স্পর্শটুকু পুরোপুরি অনুভব করার আগেই ঈষৎ কুঁকড়ে এলো সে, ইতস্তত করল, বারেকের জন্যে ভাবল হাত দুটো সরিয়ে দেবে কি না, কিংবা, একই উদ্দেশ্যে সে নিজেই সরে যাবে কি না।

জ্যোতি সুযোগ দিল না। আজ তার তন্ময়তা বেশি। যেন নীপা না থাকলে সামনে যা

থাকত তার ওপরেই হাত রাখত, এইভাবে বলল, 'বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তখন একটা অদ্ভুত কথা মনে হলো—'

নীপা সাড়া দিল না, এমনকি নড়ল না পর্যন্ত। জ্যোতির আগের কথা ও পরের কথার মধ্যে বৃষ্টির শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, কথা কোনো দিকেই নিয়ে যাবে না। ভঙ্গিও। জ্যোতি যা বলবে বলুক।

'বিয়ের দিন ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। হাতেপায়ে ধরে বিমান একটা ট্যাক্সি ধরল। আমরা চার-পাঁচজন ছিলাম। সেই ট্যাক্সিটাও খারাপ হয়ে গেল মাঝরাস্তায়। আমি জানতাম লগ্ন পেরিয়ে গেছে। বললাম, থাক, পরে দেখা যাবে। বিমান বলল, না, লগ্ন আরও আছে। তুই যদি না যাস, তা হলে আমি যাবো—ওই মেয়েকে আমিই বিয়ে করব—'

নীপাকে শুনিয়ে নয়, জ্যোতি কথা বলছে নিজেরই সঙ্গে। মাঝখানে প্রবাহিত হচ্ছে দোর্দণ্ড বর্ষার ঘোলা জল ; নদীর এক পারে দাঁড়িয়ে অন্য পারটা দেখা যায় না ঠিক। শুনে মনে হয় জ্যোতি বুঝতে পারছে না ঠিক কোন জায়গা দিয়ে সে পার হয়েছিল, অথচ জায়গাটা খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। এ-ঘরে আসার আগে নীপাও পারেনি। তবে, তার বাস্তব অন্য। কথা বলবে কি না ভাবতে ভাবতেই সে ফুরিয়ে গেল।

'আজ বুঝতে পারি, সেদিন, সেই মুহূর্তেই আমি ভুল করেছিলাম।' দ্বিধাহীন, অল্প আবেগ ছোঁয়ানো স্বর জ্যোতির। নিজেকে সাজিয়ে নিচ্ছে নিজের মতো করে। বলল, 'আমার বোঝা উচিত ছিল, তুমি অপেক্ষা করে আছো বিমানেরই জন্যে।'

'তা কী করে সম্ভব!' নিজেকে লুকিয়ে বলল নীপা, 'আমি তাকে চিনতাম না।'

'আমি সে-কথা বলছি না—', সম্মোহিত গলা জ্যোতির, 'না চিনলেও তুমি বিমানকেই চাইতে—বিমানের মতো কাউকে—'

আজগুবি কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে জ্যোতি যে এই কথায় এসে পড়বে, দু' এক মুহূর্ত আগেও তা বুঝতে পারেনি নীপা। অতর্কিত আক্রমণে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো তার। পিছনে দাঁড়ানো, তবু জ্যোতির চোখ যেন তার বুকেরই দিকে—এক্স-রে যন্ত্রের প্রখর আলোর মতো ক্রমশ নেমে আসছে নিচে। আর একটু কাছে এলেই সেই জায়গা, নীপা নিজেও যেখানে পৌঁছতে পারেনি কোনো দিন। এমনও হতে পারে, কুড়ি বছরের চেষ্টায় আজই জ্যোতি পৌঁছুতে পারল সেখানে।

মনের এই হাত-পা ছাড়া অবস্থায় মরিয়া হয়ে কাঁধ থেকে জ্যোতির হাতটা সরিয়ে দিল নীপা। বিভ্রান্তের মতো বলল, 'তুমি কি থামবে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

জ্যোতি শুনল বলে মনে হলো না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও তাকিয়ে থাকল নীপার দিকে, তাকিয়েই থাকল। দৃষ্টিতে গ্লানি নেই কোনো ; রাগ বা ক্ষোভ কিছুই নেই। যেন কোনো ছবির একজিবিসানে গিয়ে এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে বিশেষ একটা ছবিতে চোখ আটকে গেছে তার, আর ফেরাতে পারছে না। একটু পরে বলল, 'নীপা, এই ক'দিনে তোমাকে যতো দেখছি ততোই ভালো লাগছে কেন!'

কুড়ি বছরের সম্পর্কে প্রত্যাশা নেই কোনো। তবু, কেন কে জানে, অনেক দিন পরে একদিন এই কথাগুলো শুনে সব প্রস্তুতি ভেঙে গেল নীপার। হঠাৎ অনুভব করল, সে জ্যোতির স্ত্রী—হিসেবমতো জ্যোতির সবচেয়ে আপনজন। একপলক ওর চোখে চোখ রেখে নামিয়ে নিতে যাচ্ছিল, পারল না। বুঝতে না-পারা ভালো লাগা ও অস্বস্তির মধ্যে টের পেল, সে জড়িয়ে গেছে জ্যোতির শরীরে—অস্পষ্ট যে দুটি হাত একটু আগেই তার কাঁধ

চেপে ধরেছিল, এখন সেগুলিই তার বাঁধন। আর কিছু বুঝবার আগেই মুখের ওপর জ্যোতির প্রায় জ্বরতপ্ত দুটি ঠোঁটের স্পর্শে ঝিমঝিম করে উঠল সর্বাঙ্গ। এতো দিনে শরীর নিয়ে অনেক খেলেছে ; কিন্তু, আজকের অনুভূতিটা নতুন। এই জ্যোতিও নতুন। সাড়া দেবার ইচ্ছে সত্ত্বেও ক্ষণিকের জন্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল নীপা এবং ভাবল, দেরি হবে, দেরি হতে পারে। মন সায় দিল না।

ঘোর লাগা চোখে জ্যোতির দিকে তাকাল নীপা।

'কী চাও !'

নিজেকে সামলে নিল জ্যোতি। নিঃশ্বাসের শব্দ আড়াল করে তাকাল দরজার দিকে। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে।

'খুকু কি ফিরবে এখন ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল নীপা। এতোক্ষণের একটানা রিমঝিম শব্দটা থিতিয়ে আসছে মনে হয়, বৃষ্টিটা চলে যাচ্ছে দূরে। সেদিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল নীপা।

'এইমাত্র চান করলাম !'

'অপবিত্র লাগবে !' আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার আগে জ্যোতি যেন দম ফেলার সময় নিল। তারপর বলল, 'থাক—'

নীপা জানে কথাটার মানে কী, জানে, সিদ্ধান্ত নিতে হলে এখনই নিতে হবে। না হলে দেরি হয়ে যেতে পারে। জবাব না দিয়ে জানলার দিকে হেঁটে গেল সে, ব্যস্ত হাতে দুটি কপাট জড়ো করে ভেজিয়ে দিল জানলাটা। ফিরে এসে জ্যোতির শরীরে যতোটা সম্ভব ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় যান্ত্রিক হাতে গলা পর্যন্ত টানা আঁচলটা নামাতে নামাতে বলল, 'যে শরীরকে এতো গালাগালি দাও, তাকেই আবার এতো ভালোবাসো কী করে।'

জানলা বন্ধ করলেও এখন বিকেল, ঘরে আলো কিছু কম নেই। সেই আলোয় নীপাকে দেখতে দেখতে স্বাভাবিকতা ফিরে পেল জ্যোতি।

'তুমি এখনো তেমনিই আছো !'

'জানি না।'

জ্যোতির ব্যবহারে সময়ের অভাব ; অবাধ্যভাবে কড়া নাড়ছে দরজায়। নীপা নিজেকে খুলে দিল।

শরীরের গন্ধ ছাপিয়ে হালকাভাবে নাকে এসে লাগছে অসুখের গন্ধ। সেটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে নীপা ভাবল, এইমাত্র জ্যোতি তাকে আগের রূপে দেখেছে। মুগ্ধতা এড়াতে পারেনি। হতে পারে, মুগ্ধতাবোধ থেকেই ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে ও, ভুলে গেছে অসুস্থতার কথা। এখন বুঝিয়ে লাভ নেই। যদি এমন হয়, তার শরীরে লিপ্ত থাকতে থাকতেই মৃত্যুতে ঢলে পড়ল জ্যোতি, তা হলে ওইগুলোই হবে ওর শেষ কথা। তখন, কুড়ি বছরে কী হয়েছে না হয়েছে ভুলে গিয়ে জ্যোতির স্ত্রী হিসেবে এই কথাগুলিই মনে রাখতে পারবে সে। হয়তো সান্ত্বনাও পাবে। পাবে কি ?

চিন্তাটায় স্থির থাকতে পারল না। শরীরের তৎপরতায় স্বাদ নেই কোনো ; যতোটা এগিয়ে ছিল ঠিক ততোটাই পিছিয়ে আসতে আসতে নির্বিকার শূন্যতায় ছেয়ে এলো মন, হঠাৎই মনে হলো নীপার, জ্যোতি সত্যি কথা বলেনি—অবলম্বন ভেবে সে যেটাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, সেটা ওর মনের কথা নয়, শরীরের কথা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, বিমান অপেক্ষা করে আছে ; যাকে নিয়ে তার অপেক্ষা আর উদ্বেগ, সে কি আদৌ

চিন্তিত। যদি তা না হয়, তা হলে বিমানই বা ব্যস্ত কেন! ইত্যাদি ভেবে বুকের ওপর থেকে জ্যোতির মুখটা সরাবার চেষ্টা করল নীপা। কুড়ি বছরের ভার বড়ো বেশি, সহজে নড়ানো যায় না।

তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ফোঁটার মতো জ্যোতি এখন ছড়িয়ে যাচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। অনুভূতিটাকে ঘৃণা করতে করতে নীপার মনে পড়ল এটা বিমানের খাট, তার ছেড়ে দেওয়া অধিকারে জ্যোতি এখন প্রতিষ্ঠা করছে নিজেকে। সম্ভাবনা সত্যি হলে এইখানে বিমানই থাকত; জ্যোতি নয়। সুযোগ নীপাই করে দিয়েছিল। বিমান মানেনি। উদাসীন হবার প্রবণতায় এখনো তার জুড়ি নেই।

বন্ধ চোখের কোণে জমে ওঠা জলটুকু আড়াল করবার চেষ্টা করল না নীপা। হাত-পা ছিতরানো একটা মরা কুমীরের ধড় লেপটে আছে গায়ে। অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল সে। তারপর জোর করে উঠে পড়ল।

'তোমার খারাপ লাগল?'

'না।'

নিজেকে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিল নীপা। এগিয়ে গিয়ে জানলাটা খুলল এবং দেখল, বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘের কালচে ভাবটুকু কাটিয়ে হালকা রোদ উঠেছে আকাশে। শরীরে ঘাম না থাকলে হয়তো বাতাসের আর্দ্রতাও টের পেত।

সামান্য অপেক্ষা করে জ্যোতির দিকে তাকাল নীপা।

'তুমি কি চা-টা খাবে?'

'না।'

'তা হলে আমি বেরুচ্ছি। খুকুর ফিরে আসার সময় হয়েছে। কিছু দরকার হলে ওকে বোলো।'

আর দাঁড়াল না। সময় নেই। শ্রাবণের আকাশ, আর একদফা বৃষ্টি নামবার আগেই তৈরি হয়ে বেরুতে হবে তাকে। ঘর থেকে বেরুবার আগে তবু দ্বিধান্বিত হলো ঈষৎ; ঘরের চারিদিকে অন্যমনস্ক চোখ বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিছু। বিমান মানেনি; আর কেউ না জানুক, খুকু অন্তত তা জানে। অভিমানে যখন-তখন বালিশ বগলে নিয়ে বিমানের কাছে ছুটে যাবার বয়স সে পেরিয়ে গেছে ততো দিনে, নারীত্বে পৌঁছুলেও নিজের সম্পর্কে সন্দেহ কাটেনি তখনো। খুকু বুঝেছিল, বিমানকে ফেরাতে হলে নীপাই পারবে। নীপা জানত না, বুঝতে পারলেও, খুকু তার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারবে না।

ভারটা এখনো চেপে আছে বুকে। আর একবার বাথরুম ঘুরে এলেও ক্লেদ যায়নি; ঘামের প্রবাহ এখন ভিতরের দিকে। ক্লান্ত হাতে দরজাটা টেনে দেবার আগে ব্যাগ খুলে কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল নীপা। তারপর হাঁটতে শুরু করল।

বৃষ্টির প্রচণ্ডতা দেখে খানিক আগে ভেবেছিল ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শেষ বেলার রোদে জীবন্ত হয়ে ওঠা রাস্তায় লোকজন ও ব্যস্ততা লক্ষ করে কিছুটা আশ্বস্ত হলো নীপা। মাপের ভুলে অনেক সময় এ-রকম মনে হয়। সময় আছে, যদি যে-কোনো একটা বাহন পেয়ে যায় আর জ্যাম না থাকে রাস্তায়, তা হলেই পৌঁছে যাবে। এতো বৃষ্টি, বিমানও দেখেনি এমন হতে পারে না।

ভাগ্য ভালো; মেন রোডে পৌঁছুতেই ট্রাম পেয়ে গেল। সোজামুখো বলে যাত্রী কম; স্টপ ছাড়িয়ে ছোটার ধরন দেখেই বুঝতে পারল যাবার তাড়া আছে। বাঁ দিকে একটা

লেডিজ সিট খালি দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল নীপা। রাস্তা অনেকটা। তা ছাড়া যেতে যেতেই ভিড় বাড়বে ; তখন চাপ সামলানো মুশকিল হবে। ক্লান্ত শরীরে এই আরামটুকু দরকার ছিল।

বসে, রাস্তা দেখতে শুরু করেছিল নীপা, হঠাৎ খেয়াল করল পাশের সিটের মহিলাটি খুঁটিয়ে লক্ষ করছে তাকে। কারণ বুঝল না। চোখ তুলে তাকাতে মহিলা বলল, 'আপনার ব্যাগ খোলা আছে—'

সত্যিই তাই। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় খুলেছিল, সম্ভবত তখন থেকেই আছে এই অবস্থায়। বন্ধ করার আগে আবার সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল নীপা ; অপ্রস্তুত হাসি মুখে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানাল মহিলাকে এবং ভাবল, হারিয়ে গেলে কী হতো। উত্তর পেল না। ইতিমধ্যে আরও তিনটে স্টপ দ্রুত পেরিয়ে এলো ট্রামটা। পিঠের কাছে স্পর্শ অনুভব করতে আড়ে তাকিয়ে নীপা দেখল, বুশশার্ট পরা একটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, সোজা তাকিয়ে আছে তার বুকের দিকে। আঁচলটা কাঁধের ওপর গুছিয়ে নিতে নিতে সরে বসল সে ; ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে উঠল অল্প। যুবকটিকে নয়, এখন ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে নিজেকেই। স্বাদটা যায়নি ; একটু আগেই সে হাত-পা ছিতরানো একটা মরা কুমীরের কথা ভেবেছিল।

ভিড় আর দ্রুত ধাবমান ট্রামের কর্কশ আওয়াজের জন্যেই সম্ভবত কেমন যেন দমচাপা লাগছে সব কিছু। নিজেকে আত্মস্থ করে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও আবার অন্ধকারে ফিরে গেল নীপা।

খুকু তখন প্রায়ই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার বায়না ধরে। আর একটি বীজের আবির্ভাবে তাই ভারসাম্যে টান পড়েনি নীপার। দাম্পত্য তখন অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। মাঝরাতে জ্যোতিকে শরীরে ঢুকতে দিয়ে নিচু গলায় নীপা বলেছিল, 'বয়স হয়ে যাচ্ছে, এখন থেকে যা করার ভেবেচিন্তে করাই ভালো—'

'কেন!'

'খুকু বড়ো হচ্ছে, ওর বিয়ের কথা ভাবতে হবে—'

'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আছে। সে-জন্যে ভাবি না।'

শরীরে শিকড় নামার অনুভূতি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নীপা বলেছিল, 'যদি আর একটি আসে!'

কিছু ভাববার সুযোগ না নিয়েই জ্যোতি বলল, 'আসবে না।'

'এ-কথা বলছ!' সত্য না হলেও অকারণ ভয়ে তখনই বুক কেঁপে উঠেছিল নীপার। কোনো রকমে আত্মসংবরণ করে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি এসে গেছে—'

'কে বলেছে!'

মাটিসুদ্ধ শিকড় উপড়ে আনার মতো নিজেকে তুলে আনল জ্যোতি। ঘরের অন্ধকারে চেহারার আদল যদিও বা ধরা পড়ে, চোখ দেখা যায় না। তবু, সেই মুহূর্তের অসম্পূর্ণতার মধ্যে নিজেকে খুঁজতে গিয়ে নীপার মনে হয়েছিল, জ্যোতির চোখ তাকেই খুঁজছে। জ্যোতিকে চেনে বলেই এই খোঁজার মানে বুঝতে অসুবিধে হয়নি কোনো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্যোতি বলেছিল, 'অসম্ভব! এ হতে পারে না!'

পরের দিন দুপুরে নীপা যখন একা—খুকু স্কুলে এবং বিমান অফিসে, হঠাৎ বাড়ি ফিরে জ্যোতি বলল, 'তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। নার্সিং হোম যেতে হবে—'

মেঘ দেখেই নীপা অনুমান করেছিল একটা কিছু হবে। কিন্তু, ঠিক এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। আকস্মিকতায় শক্ত হতে গিয়েও ভেঙে পড়েছিল সে।

'এতোই যখন সন্দেহ, তখন একেবারেই মেরে ফেলছ না কেন!'

জ্যোতি গলেনি। চোয়াল শক্ত করতে করতে বলেছিল, 'আগেরটা আগে, পরেরটা পরে—'

এরপর আর কিছু বলেনি নীপা। বিয়ের পর থেকেই লক্ষ করছে, জ্যোতির স্বভাবে আছে এক ধরনের একাধিপত্যের ঝোঁক ; ঝোঁকটা মাথায় চাপলে ও নিজেকেই মনে করে একমাত্র মানুষ। ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না কোনো। রক্ত না-পড়া গভীর ক্ষতের যন্ত্রণা নিয়ে, সুতরাং, জ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে ট্যাক্সিতে উঠেছিল নীপা, যেন সিনেমা কিংবা বাপের বাড়ি যাচ্ছে। দুজনে দু' দিক ঘেঁসে সরে বসার জন্যে মনে হচ্ছিল ট্যাক্সিতে পরিসর বড়ো কম। ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলেও নীপা অনুমান করেছিল মাঝখানের ওই ফাঁকা জায়গাটুকুই ভয়ঙ্কর ও বিস্ফোরক, অল্প খোঁচাতেই ফেটে পড়তে পারে। চুপচাপ থেকে জ্যোতি তা পাহারা দিচ্ছে।

তবু, একটা সময়ের পর নিজেকে নিরস্ত করতে পারেনি নীপা। রাগে কিংবা দুঃখে তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে তার কান ; তলপেটের প্রবল অস্বস্তি থেকে অনুভব করছিল, হয়তো নার্সিং হোম পৌঁছুবার আগেই সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। তখন অসহিষ্ণু গলায় বলেছিল, 'যাকে তোমার এতো সন্দেহ, তার দয়ায় সংসার চালাতে তোমার পৌরুষে লাগে না!'

তখুনি কোনো জবাব দেবার পরিবর্তে পাতলা হাসি ফুটেছিল জ্যোতির ঠোঁটে। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'দয়ার পরিমাণ বাড়াতে চাই না—'

কথাগুলোর মানে ধরতে পারেনি নীপা। শুধু শিথিলভাবে মনে হয়েছিল, এ-কথার দুটো অর্থ হতে পারে। দুটোর কোনটাই বোধগম্য হয়নি—সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউগুলোকে আলাদা করে গোনার মতো অদ্ভুত অর্থহীনতায় ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছিল সে। প্রায় এই সময় ট্যাক্সিটা নার্সিং হোমের সামনে এসে দাঁড়ায়।

যেতে যেতে, অন্যমনস্ক নীপা এমনভাবে নিঃশ্বাস ছাড়ল যে চকিত শব্দে আশেপাশের দু-একজন চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। মুখ টিপে হাসছে পাশের মহিলাটি। অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যেই নীপা অনুভব করল বুশশার্ট পরা যুবকটি তার জায়গা থেকে নড়েনি ; বরং ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে আরও—কোমরের নিচের একটা অংশ ছুঁইয়ে রেখেছে তার গায়ে। ট্যাক্সি থেকে ট্রামে এসে হঠাৎই মনে পড়ল নীপার, 'তুমি এখনো তেমনিই আছো—।' বোধগম্য হলো না। তখন ভাবল, এই যাওয়াটা জ্যোতিরই জন্যে। কেন!

ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। স্লোগান দিতে দিতে রাস্তা পার হচ্ছে একটা মিছিল, সম্ভবত সেই জন্যে। কব্জির ঘড়িতে ব্যস্ত চোখ বুলিয়ে, আঁচল তুলে গলার ঘাম মুছল সে—হাতটা কপালের দিকে নিয়ে গিয়েও থেমে গেল ; সিঁদুরের টিপটা ধেবড়ে যেতে পারে। তেমন কিছু নয় ; তবু, এই ভাবনাতেই নিঃশ্বাস দ্রুত হলো তার। আজই সে যাচ্ছে একা-একা ; তবু ঠিক বোঝা যায় না কেন, কুড়ি বছর ধরে জ্যোতিই তাকে চালিয়েছে! কিছু বা কাদা লাগা, তবু, খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলোর কোনোটাই টুকরো হয়নি এখনো। স্মৃতি খুঁড়লে নীপা তার সবগুলিকেই আস্ত তুলে আনতে পারে।

দু' দিন পরে, একইভাবে, নার্সিংহোম থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল জ্যোতি। একই সময়ে। নীপা জানতে চায়নি খুকু বা বিমান কেউ এই ঘটনার কথা জানে কি না। হয়তো

জানে, হয়তো জানে না—শোক বা স্মৃতিশূন্য আলস্যে চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে সে কী ভেবেছিল, আজ আর তা মনে পড়ে না। জ্যোতি যে বেরিয়ে যাবে, এটা জানত। খুকু স্কুল থেকে ফেরার পর দরজা খুলে দিয়েছিল নিশ্চয়ই, না হলে সে ঢুকতে পারত না। এগুলো ঘটনা নয়। এক একটা সময় আসে যখন শরীর হারিয়ে ফেলে সব স্বত্ব ; বাস্তব বলতে শুধু থাকে মন—কিংবা, মনও হয়তো থাকে না, অর্থহীন উপস্থিতি নিয়ে শুধু জেগে থাকে নিঃশ্বাস।

আজ মনে পড়ে না সে জেগে ছিল অথবা ঘুমিয়েই পড়েছিল। চমক ভাঙল খুকুর ব্যস্ত গলার ডাকে।

'শিগ্‌গির এসো, মা ! বিমানকাকু চলে যাচ্ছে !'

'কোথায় !'

'জানি না। কাল রাত্রে বাবা বোধ হয় কিছু বলেছিল—', অধৈর্যভাবে ওর হাত ধরে টানল খুকু, 'এসো, মা ! দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

চোখ খুলে নীপা দেখল, সন্ধে। এমন নিখুঁত তার বিস্তার যে অন্য কোনো প্রসঙ্গের জায়গা নেই। যাচ্ছে-টা গেছে হয়ে ঢুকে পড়ল বুকে। অনেকগুলো বছরের স্তব্ধতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বিমানের ঘরের দিকে ছুটে গিয়েছিল নীপা। ঘরের আলোয় অস্বাভাবিকতা নেই কোনো। খাটের ওপর চামড়ার বড়ো স্যুটকেসটা রাখা ; বসেছিল, তাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল বিমান।

'এসো, নীপ।'

'তুমি চলে যাচ্ছ !'

'হ্যাঁ—।' এখন দেখা গেল সিগারেট পুড়ছে আঙুলের ভাঁজে ; পরের কথাটা বলার আগে সিগারেটে টান দিল বিমান, 'কালই যেতাম। পরে ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করেই যাবো।'

'কেন !'

'কেন !' বিমান হাসল, তারপর বলল, 'চিরকাল এখানে পড়ে থাকব, তার কী মানে আছে ! আগেই যাওয়া উচিত ছিল—'

সেই মুহূর্তে বিমানের দৃঢ় অথচ অস্পষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কথাটা আগে, কোন কথাটা পরে—ঠিক কোন কথাটি বলার জন্যে সে ছুটে এসেছিল, সবই গুলিয়ে ফেলল নীপা। যে-অন্ধকারটা গত দু' দিন ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে, সেটাই ফিরে এলো চোখের সামনে। আয়োডিনের প্রতিক্রিয়ার মতো একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা শরীরে। সাদা শূন্যতায় চোখ রেখে নীপা বলল, 'তোমার ছেলে পেটে ধরেছি, এই অপবাদে !'

বিমান কাঁপল একটু, সিগারেটটা মেঝেয় ফেলে তার ওপর জুতো ঘষতে ঘষতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'নীপা ! বুদ্ধি হারিও না !'

'হারাবো, হারাবো—।' কুড়ি বছরে একবারই অন্ধকার আগ্রহে নিজেকে স্বাধীন করার ইচ্ছে থেকে দ্রুত বিমানের দিকে ছুটে গিয়েছিল নীপা। শরীরী আবেগে তখন বিমান ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই, দু' হাতে বিমানকে আঁকড়ে ধরে বলেছিল, 'এভাবে তোমাকে আমি যেতে দেবো না, বিমানদা ! আমি আর পারছি না—যা মিথ্যে, সেটাকেই তুমি সত্যি

করো—'

'মা !'

পাগলের ধরনে ঘণ্টি বাজিয়ে ফাঁকা লাইনের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ট্রামটা—যাত্রীতে ঠাসা থাকা সত্ত্বেও গতির চাপে দুলে উঠছে নৌকোর মতো। ঘোর লাগা চোখে এদিক-ওদিকে তাকিয়ে নীপা ঠিক চিনতে পারল না সে এখন কোথায় ! বিস্মিত, ভীত, বিরক্ত, খুকুর সেই চিৎকার এখনো ছুটে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কের দিকে—শীতে জর্জরিত নীপা ভাববার চেষ্টা করল, বিমানের কঠোর হাত কি তখনই উঠে এসেছিল তার গালে !

হয়তো। মুহূর্তগুলি হারিয়ে গেলেও অনুভবে দাগ পড়েনি কোনো।

নিজেকে সামলে নেবার আগেই নীপা দেখল, হাতে স্যুটকেস নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে বিমান। পিছনে তাকায়নি ; দরজার কাছে প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা খুকুও বাধা দেয়নি কোনো। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বসেছিল তার কাছে—স্তব্ধ, পাথর, শেষ চিৎকারে ইতিমধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলেছে নিজেকে। খুকুর দিকে তাকিয়েই এতোক্ষণের চেপে রাখা কান্নাটা বেরিয়ে আসে চোখ ফুঁড়ে।

'খুকু, তুই সব দেখেছিস !' দু' হাতে মেয়েকে ঝাঁকুনি দিয়ে নীপা বলেছিল, 'কী হয়ে গেল বুঝতে পারছিস কিছু !'

জবাব দেয়নি সুদেষ্ণা। নীপা যে শেষ অস্ত্র, সম্ভবত আগেই তা জেনে গিয়েছিল। না হলে ডেকে আনত না।

জল এখনো পড়ছে। যতোটা না পড়ছে তার চেয়ে বেশি ধরে রাখছে শরীর। কে যে কোথায় দাঁড়িয়ে বোঝা যায় না কিছু। একই নীপা সে, এখনো ছুটে যাচ্ছে একই বিমানের দিকে। উপলক্ষ জ্যোতি। আজই বলেছে সার্টিফিকেট দিয়ে যাবে মরার আগে। ঘৃণার, না অবিশ্বাসের ? নাকি কৃতজ্ঞতার ? বোঝা যায় না। খুকু জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা কি আমার কেউ নয় ? প্রশ্নটা সহ্য করতে পারেনি বিমান, তাই বলেছিল নীপাকে। জ্যোতি জানে, নীপা কাকে বিশ্বাস করে।

কুড়ি বছর পরে আজ হঠাৎ ধাঁধায় জড়িয়ে গেল নীপা। এখনই মনে হলো, সেদিন তার এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বিমানই যদি এগিয়ে আসত, সে কি ছাড়তে পারত জ্যোতিকে ! সেদিন, ওইভাবে, কেন চেঁচিয়ে উঠেছিল খুকু !

এসপ্ল্যানেড পেরুবার আগে জায়গাটা চিনতে পারল নীপা। ট্রাম খালি হতে শুরু করেছে, আর একটু এগোলেই ভরতে শুরু করবে আবার। তারও পরে নামতে হবে তাকে। বিমান অপেক্ষা করবে। দেরি হয়নি।

কোমরের খাঁজে গুঁজে রাখা রুমালটা বের করে চোখ মুছে নিল নীপা। নিঃশ্বাস টানল বুক ভরে। একটা গন্ধ উঠে আসছে—চাপা ও স্নিগ্ধ, আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে চেতনায়। ধরে রাখতে রাখতেই গন্ধটা চিনতে পারল নীপা। বৃষ্টিভেজা মাটির, আদরে সোঁদা হয়ে আছে যেন। নিকটের হাওয়া এসে সুড়সুড়ি বুলিয়ে গেল মাথার পিছনে আর ঘাড়ের অনাবৃত অংশে। এমন নয় যে এ-সবই নতুন। তবু, ট্রাম থেকে নেমে, হাঁটতে হাঁটতে আর একটা স্মৃতি পেরিয়ে গেল নীপা। রিক্সায়, সে আর জ্যোতি। পাশাপাশি।

ভোরের ট্রেন। সারা রাত তুমুল বৃষ্টির পর এলোমেলো হয়ে আছে খোয়া আর সুরকি ছড়ানো রাস্তা। ঘাট-আঘাট সামলে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল রিক্সা। দেরি আছে, তবু

স্টেশনে পৌঁছুবার তর সয়নি জ্যোতির। রিক্সাওলাকে তাড়া দিয়ে তাকাল নীপার দিকে।

'তুমি যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছ!'

ভিজে মাটির গন্ধে নীপা তখন আচ্ছন্ন, কিংবা অন্যমনস্কতাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। জানুর ওপর জ্যোতির হাতের চাপ অনুভব করেও উত্তর দিতে সময় নিল।

'ভাবছি, আমি আরও কিছু দিন এখানে থেকে গেলেই হয়তো ভালো করতাম।'

'কেন!'

'তুমি নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারতে—'

কথাগুলোর অর্থ করতে যতোটা সময় লাগে নিয়ে জ্যোতি হাসল, 'ভাবছ জলে পড়লে—!'

'তা নয়।' ভেবে বলল নীপা, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে তো কাউকেই চিনি না। বাড়িটা তোমার নয়।'

'বাড়িটাই তোমার নয়; বাকি সবই তোমার হবে—।' আশ্বস্ত করার চেষ্টায় ঘন হয়ে এলো জ্যোতি, 'বিমানদের চেনো না। চিনলে এ-কথা বলতে না! তা ছাড়া—', একটু থেমে জ্যোতি বলল, 'অতো বড়ো বাড়ির ভাড়া গুনতে হচ্ছে। মাসিমা নিজে মা বললে আমি তোমায় নিয়ে যেতাম না।'

'বাড়ি নয়, আশ্রয়।' চুপ করে থাকতে থাকতে নীপা কি জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিমান কোনজন?'

লিফ্‌টটা নিজেই ছ'তলা পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেল নীপা। ঘড়ি দেখল। এ-সময় অফিস ছুটি হয়ে যাবার কথা। তবু, বিমান থাকবে না, এটা হতে পারে না। রিসেপসানে কেউ না থাকলেও সোজা চলে যেতে পারবে বিমানের ঘরে। যদি না সে ইতিমধ্যে ঘর পাল্‌টে থাকে। প্রায় অন্যমনস্কতার মধ্যে নীপা মনে করতে পারল না শেষ কবে এসেছিল এখানে। খুকুর রেজাল্ট বেরুনোর পরেই কি? ঠিক ঠিক স্মরণ হলো না। জ্যোতির হাসির শব্দটা এখনো লেগে আছে কানে, 'বিমানকে চেনো না! সেদিন ও না থাকলে তোমার বিয়েই হতো না!'

যা ভেবেছিল তাই। রিসেপসান ফাঁকা। রোজ-উড ফ্রেম-লাগানো কাচের দরজাটা ঠেলে একজন পিওনকে দেখতে পেল নীপা; ভিজিটরস্‌ স্লিপে নাম লিখে তারই হাতে পাঠাল ভিতরে। বসতে হলো না। উঁচু হিলের ছন্দময় শব্দ তুলে করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসছে একটি মেয়ে—পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি বয়স নয়, পরনে পিকক ব্লু শাড়ি ও মানানসই ব্লাউজ, দোহারা গড়নে এবং মাপা স্বাস্থ্যে সহজেই চোখ টানে। নীপা লক্ষ করল, মেয়েটির হাতে তারই পাঠানো ভিজিটরস্‌ স্লিপ। কাছে এসে বলল, 'আপনি মিসেস চৌধুরী?'

নীপা আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এতোক্ষণের উদ্‌ভ্রান্তির জন্যেই সম্ভবত কথা ফুটল না মুখে।

মেয়েটি হাসল, এমনভাবে, যাতে মনে হয় ঠিক এই সময়েই তার হাসবার কথা। তারপর বলল, 'মিস্টার মজুমদারের ঘরে একজন ভিজিটর আছেন। মিনিট পাঁচেক; অসুবিধে হবে?'

'আমি বসছি—'

'না, এখানে নয়। আপনি আমার সঙ্গে আসুন—'

লম্বা করিডোর এগিয়ে গেছে অনেকটা। দু' পাশের দেওয়ালে হালকা হলুদের আভা,

মাঝে মাঝে প্রায় সমান দূরত্ব রেখে রোজ-উড ফিনিশের দরজা। প্রায় প্রতিটিতেই নেমপ্লেট বসানো। করিডোরের লুকানো ফ্রেম থেকে আলো এসে পড়ছে দেওয়ালে—সব মিলিয়ে মায়াময়, যেন একটা কুহক। আগে এমন ছিল না। মনে হয় রেনোভেট করেছে নতুন। আগে, যখন তারা একসঙ্গে থাকত, খুঁটিনাটি সব কথাই বলত বিমান। এখন সে প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নয়। সেই জন্যেই আসা।

কে জানে কেন, জলের ভিতর জলের পাক খাওয়ার মতো নিঃশ্বাস আজ ক্রমাগত পাক খেয়ে উঠছে বুকের মধ্যে, জায়গা খালি থাকছে না কখনো। সঙ্গে ক্লান্তি। মেয়েটির পিছনে পিছনে একটি ঘরে ঢুকবার আগে নীপা অনুভব করল ছোট একটা ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে মাথার মাঝখানে—সেখান থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিত লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়ছে রগের দিকে ও ঘাড়ের পিছনে। সাময়িক অস্বস্তিতে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলাল নীপা এবং ভাবল, জ্যোতিও কি প্রয়োজন ? সেই জন্যেই আসা ?

'আমার নাম চন্দ্রা। আমি মিস্টার মজুমদারের পি-এ।' মেয়েটি বসেছে টেবিলের ওদিকে, সামনে টাইপরাইটার, এদিকের চেয়ারে নীপাকে বসিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসল, ঠিক আগেরই মতো। বলল, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি—'

কী শুনেছে ? কী বলেছে বিমান ! জবাবে কিছু বলবার আগেই শঙ্কা ডেকে আনল নীপা ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধাতস্থ করল নিজেকে। এটা বিমানের অফিস এবং মেয়েটি অপরিচিত—এখানে কোনোভাবেই নিজেকে প্রকাশ করা উচিত হবে না।

'অফিসটা অনেক বদলে গেছে।' একেবারে অন্য কথায় গিয়ে নীপা বলল, 'আমি অবশ্য অনেক দিন পরে এলাম। আমার মেয়ে অনেকবার এসেছে—'

'আপনার মেয়েকে আমি দেখেছি। সুদেষ্ণা। ভারী সুন্দর দেখতে, সি ইজ সো ব্রাইট অ্যাণ্ড স্মার্ট !'

টেবিলের একধারে রাখা ব্যাগটা হাতে টেনে নিল চন্দ্রা, কিছু খুঁজে টুক করে মুখে ফেলল। সম্ভবত লবঙ্গ বা ওই ধরনের কিছু। এখুনি যে কথাগুলি বলল, সেগুলির উত্তর হয় না কোনো। তবু, ভদ্রতা অনুযায়ী, চন্দ্রা একাই কথা বলবে তা হতে পারে না। নীপা কথা খুঁজতে লাগল।

প্রায় তখনই ভিতরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো বিমান। সঙ্গে স্যুট-পরা আর এক ভদ্রলোক। নীপা উঠে দাঁড়াল। ইশারায় ওকে বসতে বলে ভদ্রলোককে বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিল বিমান। ফিরে এসে বলল, 'এসো—'

ওর ঘরে ঢুকে বসতে বসতে নীপা বলল, 'আমি দেরি করলাম ?'

'দেরি ? না !' বিমান ঘড়ি দেখল, তারপর প্রায় দেওয়াল-জোড়া বড়ো কাচের জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে, 'তেমন কিছু নয়। বৃষ্টি দেখে ফোন করেছিলুম ডাক্তারকে, বলেছি দেরি হতে পারে। তবে তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো।'

নীপার চোখ বাইরের দিকে। বিমানের কথায় অস্বচ্ছতা নেই কোনো, তবু দৃষ্টিটা দূরে ছড়িয়ে দিতে দিতে শেষের কথাগুলো হারিয়ে গেল ওর কানে। অন্ধকার হয়ে আসছে—ঠিক সন্ধে নামার মতো করে নয়, এই মুহূর্তে প্রকৃতিলোকের রূপ পরিবর্তনের আড়ালে কোথাও আছে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস—হয়তো কিছু হবে, কিছু হতে পারে, এখানে দাঁড়িয়ে যা অনুমান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময়ে হালকা রোদ উঠতে দেখেছিল, তারপর বিমানের অফিস পর্যন্ত রোদ্দুরের আভা ছড়িয়ে ছিল সর্বত্র,

এরই মধ্যে কখন যে ঘন মেঘে ছেয়ে এলো আকাশ। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এক রকম শূন্যতায় জড়িয়ে গেল নীপা—হাঁফানি রুগীর ধরনে নিঃশ্বাসটা গলা পর্যন্ত উঠে এসেও বেরুল না, ওঠা-নামা করতে লাগল দ্রুত। বাইরে আলোর স্বল্পতার জন্যেই সম্ভবত বৃষ্টির শুরুটা ধরা যায়নি, টের পেল জানলার কাচে জল জড়িয়ে যেতে দেখে। নীপা চোখ নামিয়ে নিল। টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েটটা তুলে চেপে ধরল হাতের মুঠোয়।

'আজ আছে কেমন ও?'

'দেখে তো ভালোই মনে হলো—'

'গুড়,' বিমান হয়তো আরও কিছু বলত, টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দে থেমে গেল। রিসিভার কানে তুলে 'হ্যালো' বলল, শুনল, তারপর 'জাস্ট এ মিনিট' বলে তাকাল নীপার দিকে।

'চা খাবে?'

নীপা মাথা নাড়ল, না—যেন ঠিক এই প্রশ্নের উত্তরেই নয়। 'না' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল বিমান। চকিতে জানলার বাইরেটা দেখে নিয়ে আবার ফিরে এলো নীপার দিকে।

'আবার নামল! রাস্তায় কি জল দেখলে?'

উত্তর না দিয়ে সময় খুঁজল নীপা, সোজাসুজি চোখ রাখল বিমানের চোখে।

'বায়োপসির কথাটা উঠল কেন! কী সন্দেহ করছে? ক্যানসার?'

এতোক্ষণ সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল অল্প; আকস্মিক প্রশ্নে পিঠ খাড়া করে বসল বিমান। একাগ্রতা ফেরাবার চেষ্টাতেই যেন, কুঁচকে উঠল ভুরু দুটো। থেমে থেমে বলল, 'আমি ডাক্তার নই, নীপা। কী হয়েছে বলতে পারব না। তবে এটুকু বুঝতে পারি, বায়োপসি করার অর্থই ক্যানসার নয়। ওটা—ওটা শুধুই একটা ক্লিনিকাল টেস্ট—'

নীপা আর কিছু বলল না। বাঁ হাতের তালু চেপে বসেছে গালে, ডান হাতের একটা আঙুল আনমনা ঘুরছে পেপারওয়েটের চারপাশে। চুপ করে থাকতে থাকতেই একটা খালি মিক্সচারের শিশি ভেসে উঠল চোখের সামনে। আর কিছু নয়, আর কিছুই নয়।

'চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি—'

বিমান উঠে দাঁড়াল; সঙ্গে সঙ্গে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে, নীপাও। বেরিয়ে দেখল চন্দ্রা বসে আছে তখনো, উল আর কাঁটায় চঞ্চল হয়ে আছে আঙুলগুলো; সম্ভবত বিমানকে দেখেই ব্যস্ত হলো দাঁড়াবার জন্যে।

'গুড়নাইট।'

'গুড়নাইট।' বেরুবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল বিমান, থেমে বলল, 'তুমি যাবে কী করে! বৃষ্টি পড়ছে—'

'সে-জন্যে ভাববেন না।' চন্দ্রার মুখে চিন্তা নেই কোনো। হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আই উইল ম্যানেজ।' বলে নীপার দিকে তাকিয়ে হাত তুলল নমস্কারের ভঙ্গিতে, 'অল দি বেস্ট।'

দরকার বলেই ছোট করে হাসল নীপা। তারপর অনুসরণ করল বিমানকে।

'জ্যোতির অসুস্থতার কথাটা ওকে আমি বলেছি—', করিডোর দিয়ে লিফটের দিকে বেশ দ্রুতই হেঁটে যাচ্ছিল বিমান, হঠাৎ খেয়াল করল নীপা পাশে নেই। থেমে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করল ও; নীপা পাশে আসতে খুঁটিয়ে তাকাল ওর মুখের দিকে। বলল, 'এতো মনমরা কেন, নীপা? সারাক্ষণ কী ভাবছ বলো তো!'

'কী আর ভাবব ! কিছুই না।'

'ভাবছ।' সামনে লিফ্‌ট। ওপরে আসার বোতাম টিপে, গতির শব্দ শুনল বিমান। হাত তুলে হালকাভাবে বুলিয়ে নিয়ে এলো নীপার পিঠে, 'সারাক্ষণ এই হারাই-হারাই ভাবটা ভালো নয়।'

'কী পেয়েছি যে হারাব !' প্রায় ভাঙা গলা নীপার। বিমান জায়গা করে দিয়েছে। লিফ্‌টে ঢুকে, দরজা বন্ধ হতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে ওপরে মুখ তুলল নীপা। লিফ্‌টটা নামতে শুরু করেছে, ক্লান্তির গতি পা থেকে মাথার দিকে। মনে হচ্ছে একবার পড়লে মাথা তুলতে পারবে না। তখন স্বগতোক্তির গলায় বলল, 'ভাবছি পেলাম না কেন !'

'নীপা !' কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল বিমান। এমনও হতে পারে, তার বলার কিছুই ছিল না। দেখল, লিফ্‌টের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে নীপা, অভিব্যক্তিহীন কঠোর মুখ, অপলক চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে অতিরিক্ত আভায়। সান্ত্বনার মূল্য নেই কোনো, তবু তেমন কিছু না ভেবেই ব্যর্থ হাতটা তুলে নীপার কপালে ছোঁয়াল ও, সেখান থেকে মাথায়।

সম্ভবত ওই স্পর্শের জন্যেই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিল নীপা। হঠাৎ ঘুরে এসে মুখ রাখল বিমানের বুকে। ঠোঁট দুটো খুলল এবং বন্ধ করল, নিঃশ্বাসের সবটুকুই বের করে দিল একসঙ্গে। চোখ বন্ধ করার আগেই সে অন্ধকার দেখেছিল।

বেশিক্ষণ নয়। লিফ্‌ট জায়গায় পৌঁছুনোর আগেই নিজেকে সংবরণ করল নীপা, দরজা খুলতে সে-ই আগে বেরিয়ে এলো বাইরে। স্বচ্ছন্দে, কোনো জড়তা না রেখে। অল্প একটু হাসি উঠে এলো ঠোঁটে।

গাড়িটা কাছেই আছে। তবু, বৃষ্টি মাপার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল বিমান। জলের দিকে হাত বাড়িয়ে ফিরে এলো। বলল, 'তেমন জোর নেই। গাড়ি পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাওয়া যাবে।'

'চলো।'

একপলক নীপাকে লক্ষ করল বিমান। অস্বস্তি ফুটল কপালে।

'হঠাৎ হাসছ যে !'

বৃষ্টির ছাঁট বাঁচানোর জন্যে আঁচলটা মাথায় তুলে দিল নীপা। ফুটপাথে নামতে নামতে বলল, 'ভাবছিলাম, আজ তোমার হাত উঠল না কেন !'

বিমান জানে না, এ-কথার কী জবাব হতে পারে, কিংবা জবাব দেবার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না। ব্যাপারটা আজও ভুলতে পারেনি নীপা, জবাব পেলেও ভুলবে না। ঈষৎ ব্যস্ত এবং অন্যমনস্ক, এগোতে এগোতে সে ভাবল, সব প্রশ্নের জবাব থাকে না।

॥ তিন ॥

সুদেষ্ণা এখন কী করবে ?

নার্সিং হোমে জ্যোতির ঘরে ঢুকে থমথমে ভাবটা সহজেই টের পেল সুদেষ্ণা। অন্য দিন যেমন থাকে, আজও তেমনি চুপচাপ শুয়ে আছে জ্যোতি—হাত-পা শিথিল, চোখ দুটো বন্ধ, জোড়া, অল্প নিচের দিকে ঝুলে-পড়া ঠোঁটে শীতের শুষ্কতা। পরিষ্কার, ঝকঝকে বিকেলে, যখন চারিদিকে কোথাও নেই মলিনতার আভাস—একটি মানুষকে এইভাবে চাদর গায়ে শুয়ে থাকতে দেখলেই ওষুধ-ওষুধ গন্ধ উঠে আসে নাকে। স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ থাকে না কোনো।

মাথার দিকে চেয়ারে নীপা। ভাঁজ-ভাঙা বাঁ হাতটা জ্যোতির বালিশে, ঠিক মাথা ছুঁয়ে নেই এখন। মনে হয় চুলে হাত বোলাতে বোলাতে হাতটা যে কখন থেমে গেছে, নীপা নিজেও তা জানে না। এখন কোলের ওপর একটা বইয়ে চোখ রেখে অন্যমনস্ক। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কোনো বই, মলাট-ছেঁড়া ও পুরনো, বাবা নার্সিং হোমে ভরতি হবার সময় ছোট গীতাটার সঙ্গে ওই বইটাও সঙ্গে দিয়েছিল মা। কী উদ্দেশ্যে জানা নেই। গীতাটা পাওয়া যাবে জ্যোতির বালিশের তলায়। সুদেষ্ণা লক্ষ করেছে, প্রায় এক মাস ধরে যখনই একা থেকে জ্যোতিকে পাহারা দেয় নীপা, চোখ দুটো ঝুঁকে থাকে ওই বইটার পাতায়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই অসংখ্যবার পড়ে ফেলেছে। অবশ্য, এমনও হতে পারে, এখন আর পড়ে না ; অভ্যাসে চোখ দুটো লাগিয়ে রাখে শুধু। এতোই তন্ময় যে সুদেষ্ণা ঘরের মাঝখান পর্যন্ত না এসে পৌঁছুনো পর্যন্ত খেয়ালই করল না।

'কী ব্যাপার !' বই থেকে চোখ তুলে নীপা বলল, 'এ বেলায় আসবি না বলেছিলি !'

'আসব না কেন !' ঈষৎ রুক্ষ গলা সুদেষ্ণার। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলল, 'ইচ্ছে করল আসতে, তাই এলাম।'

সুদেষ্ণার গলা শুনেই সম্ভবত বাইরে থেকে পর্দা তুলে ভিতরে তাকাল নার্সটি। 'ও, দিদিমণি !' বলেই চলে গেল আবার। নীপারা থাকলে খুব দরকার না হলে নার্সটি এ-ঘরে ঢোকে না। মাঝবয়েসী ও স্বাস্থ্যবতী, বেশ হাসিখুশি ; নাম অমিয়া। সুদেষ্ণার খারাপ লাগে না।

আপাতত চোখ তুলে ও জ্যোতির দিকে তাকাল।

'বাবা কি ঘুমোচ্ছে ?'

'একটু আগেই জেগেছিল। দ্যাখ না ?'

দূরত্ব থেকেই প্রথমে দেখবার চেষ্টা করল সুদেষ্ণা। গাল দুটো ভেঙে গেছে, চোখ বসে গেছে আরও, পাতলা হয়ে গেছে মাথার চুল ; কপাল খসখসে ও ধূসর ; মাংসহীন মুখে উঁচু নাকটাকে বেমানান লাগে এখন। বিছানার দু' দিক থেকে উঠে এসে হাত দুটো ছড়িয়ে আছে বুকের ওপর—সাদা ও নির্জীব, দেখলে মনে হয়, হাড়ই শরীরেব সম্বল। চাদরে ঢাকা কাঠামো দেখেই সুদেষ্ণা বুঝতে পারে কী আছে চাদরের নিচে। প্রায় এক মাস ধরে দেখছে। তবু, আজ দেখতে দেখতে নিশ্চিত হয়ে ভাবল, এতো দিন মা'র সঙ্গে যুদ্ধ করেছে—বাবার এখনকার যুদ্ধটা সময়ের সঙ্গে। হয়তো বাবাই জিতে যাবে শেষ পর্যন্ত !

নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে ব্রেসিয়ারটা আঁট লাগল সুদেষ্ণার। ওপরের হুকটা সম্ভবত আলগা ছিল, খুলে গেল। গা করল না। হয়তো ঘুমিয়েই আছে জ্যোতি, না হলে সামান্য যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে, তাতেই জেগে উঠত। আজই সকালে দেখেছিল, যন্ত্রণায় ঠোঁট কুঁচকে অধৈর্যভাবে পা ঘষছে পায়ে। তখনই ট্যাবলেট দেওয়া হয়। হয়তো তারই জের চলছে এখনো।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুদেষ্ণা দেখল, এক মাস আগে জ্যোতি যেদিন নার্সিং হোমের এই ঘরটায় এসে ঢোকে, সেদিন থেকে এ-পর্যন্ত ঘরের দেওয়াল, আসবাব, ফ্যান, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, ল্যাম্পশেড, ফুলদানি—এক জ্যোতি ছাড়া আর সবই আছে এক রকম। কোথাও বদল হয়নি এতোটুকু। হবে কি না নির্ভর করছে জ্যোতি এখানে থাকবে কি থাকবে না তার ওপর। অবশ্য, সেই বদলটুকু দেখতে সে কখনই আর আসবে না এখানে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শীত করে এলো শরীরে ; পাখার ঘূর্ণিতে জোর নেই, তবু। নীপা তাকিয়ে আছে বাইরে, ছাদের দিকে। ডান দিকের দরজা পেরুলে ছাদ। বাড়িটা পুরনো বলেই এ-রকম—খোলামেলা আর জীবন্ত ; ছোট, দম-চাপা ভাব নেই কোথাও। ওরই মধ্যে এই ঘরটা সব চেয়ে দামী আর ভালো। সারাক্ষণ আকাশ আর গাছগাছালি লেগে থাকে চোখে। বিমানকাকু বলেছিল, এখানে থাকলে ওর একা লাগবে না। সুদেষ্ণা বোঝেনি। তবে, সেদিন জ্যোতিকে এখানে রেখে বিমানের গাড়িতে ফিরতে ফিরতে হঠাৎই মনে হয়েছিল সুদেষ্ণার, একা থাকার বাইরের দিকটা দেখেছে বিমানকাকু, ভিতরটা দেখেনি। দেখলে এ-কথা বলত না। এই যে আমি আর মা আছি এই ঘরের মধ্যে—বাবার এতো কাছাকাছি, তবু বাবাকে এতো একা লাগছে কেন ! কেন মনে হচ্ছে, চোখ দুটো বন্ধ করে রাখলেও আসলে জেগেই আছে বাবা—একা যন্ত্রণা সহ্য করার আবেশে বুঝতে পারছে, এই ঘর, এই পরিবেশ, এই সব মানুষজনের সঙ্গে সত্যিই তার সম্পর্ক নেই কোনো। এগুলো কি বোঝানো যায় ; নাকি বোঝাই যায় !

একটা নিঃশ্বাস চাপল সুদেষ্ণা। একা ফিরে এলো নিজের মধ্যে। সব ঠিক ঠিক চললে নার্সিং হোমে না এসে এখন সে থাকত অরিন্দমের সঙ্গে। সেই রকমই কথা ছিল, নীপাকেও তাই বলে রেখেছিল। নীপা বেরুবার পরই হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল সব। মনে হলো, শূন্য বাড়িটার চারিদিকে অদৃশ্য অবয়ব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবা—যেন কিছু একটা ফেলে গেছে এখানে, তাই খুঁজতেই ফিরে আসা। প্রায় হু-হু করে বিষণ্ণতা এসে জুড়ে বসল মনে। নিজেকে অসম্ভব হাত-পা ছাড়া আর একা লাগতে লাগল সুদেষ্ণার, ভয়ঙ্কর একা।

কিছু না ভেবেই তখন সে ফোন করেছিল অরিন্দমকে।

'আমি আজ আসব না।'

'কেন !'

'কেন তা বলতে পারছি না। ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না !' অরিন্দম চুপ করে গেল। তারপর বলল, 'বলেছিলে সিনেমার টিকিট কাটতে, তোমাকে তুলে নিয়ে আসতে। আমি তো বেরিয়েই পড়েছিলাম প্রায়।'

'কী বলেছিলাম মনে আছে।' সামান্য বিরক্ত গলায় বলল সুদেষ্ণা, 'এখন বলছি যাবো না।'

'টিকিট দুটোর কী হবে ?'

'এতো বড়োলোকের ছেলে, সামান্য দুটো টিকিটের মায়া কাটাতে পারছ না !'

ভেবেছিল ওই কথাতেই অপমান লাগবে অরিন্দমের, ফোন ছেড়ে দেবে। তার ধার দিয়েই গেল না। বলল, 'ঠিক আছে। সিনেমায় না হয় না গেলাম। তারপর ? তুমি কী করছ ?'

'আমি নার্সিং হোমে যাবো—'

'ও।' অরিন্দম নরম হয়ে এলো, 'কিছু হয়েছে আবার ?'

'না, এমনিই।'

'তারপর ? তুমি ফ্রি হবে কখন ?'

'জানি না।'

'সুদেষ্ণা, প্লিজ !' মরিয়া গলায় বলল অরিন্দম, 'তুমি যে-কোনো একটা সময় বলতে পারো !'

এই পর্যন্ত এসে সুদেষ্ণা বুঝতে পারল, সে যতোটা কড়া হবে ভেবে ফোন তুলেছিল, এখন আর তা হতে পারছে না। তখন আর একটা কথাও তার মনে হলো, সত্যি সত্যিই, জ্যোতির অসুখের সঙ্গে অরিন্দমের সম্পর্ক কোথায় ; কেনই বা সে অকারণ চড়াও হতে চাইছিল ওর ওপর। প্রায় এক মাস নার্সিং হোম আর বাড়ি, বাড়ি আর নার্সিং হোম করে করে ক্লান্ত লাগছিল, একটু অন্য রকম হবার জন্যে নিজেই দেখা করা এবং সিনেমা দেখার কথা বলেছিল অরিন্দমকে। তা হলে হঠাৎ এভাবে ওকে অপদস্থ করা কেন !

অরিন্দম ফোন ধরে আছে। কিছু বুঝে এবং বাকিটা না-বুঝে সুদেষ্ণা বলল, 'ঠিক আছে। তুমি ওই মেট্রোর সামনেই দাঁড়িয়ে থেকো ছটা, সাড়ে ছটায়—'

'ছটা ? না সাড়ে ছটা ?'

'অতো ডিটেলে বলতে পারব না।' সুদেষ্ণা বলল, 'দেখা করার অতোই যখন ইচ্ছে, না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

'ঠিক আছে। করব।'

এখন সাড়ে পাঁচটাও হয়নি। ছটা কিংবা সাড়ে ছটার এখনো অনেক দেরি। মাসখানেকের মধ্যে তাদের দেখা হয়েছে তিনবার ; না, চারবার। এরপর দেখা করার আগ্রহ থাকলে সময় চলে যাবার পরও অপেক্ষা করবে অরিন্দম। রাগ বা দোষ দেখাতে পারবে না। হাওয়াটা ইতিমধ্যেই নিজের মতো করে পাল্‌টে নিয়েছে সে।

একা ভাবটা ফিরে আসছে। সেই সঙ্গে চাপা রাগে আনচান করছে শরীর। নীপাকে কিছু না বলে নিজের মনে ছাদে চলে এলো সুদেষ্ণা। রাগটা কেন বা কার ওপর, বুঝতে পারলেও কথা ছিল। তা না পেরে, দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে গোটা ছাদটা ঘুরে এসে এক জায়গায় থেমে দাঁড়াল সে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় বাবার ঘরটা। দেখল, খাটের ওপর বসে জ্যোতির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে নীপা। হয়তো এখন কোনো ওষুধ খাবার সময় তাই, হয়তো বাবাকে কিছু বলছে ; হয়তো কোনো কারণ নেই, এমনিই—শখ। কোনো দিন তো দু'জনে দু'জনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি ! মরণকালে হরিনাম গাওয়ার মতো, এখন ইচ্ছে হলেও হতে পারে।

সুদেষ্ণা চোখ ফিরিয়ে নিল। এই মুহূর্তের ভাবনা থেকে জোর করে সরাতে চাইল নিজেকে। ভাবল, ক্ষতি হলে মা'রই হবে সব চেয়ে বেশি। আজকাল মোটা করে সিঁদুর পরে।

এটা পুবদিক। দোতলার ওপরেও আছে খাড়া আরও তিনটে তলা ; সূর্যটা আড়াল

হয়েছে তার পিছনে। তবু আলো হয়ে আছে চারিদিক। আজ আকাশ খুব পরিষ্কার আর নীল ; সাদা, ছেঁড়া-ছেঁড়া কয়েক টুকরো মেঘ দূরে দূরে ছড়ানো। আলোয় তাপ নেই কোনো। থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছে। সুদেষ্ণা দেখল, ছাদের রেলিঙ পর্যন্ত উঠে আসা আম গাছটার ভিতরের ডালে একটা পাখি বসছে, উড়ে যাচ্ছে, আবার বসবার চেষ্টা করছে—বসা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না যেন। সেখান থেকে সরে গিয়ে আরও ঘন পাতাওলা একটা ডালে গিয়ে বসল। কোকিল। কোথাও কিছু নেই, উড়ে গেল আর একটা ডালের দিকে, একই অনিশ্চিত ধরন। একটু পরেই কোকিলটাকে দেখা গেল না আর। হাওয়ায় ভেসে আসছে হালকা একটা গন্ধ। শিউলির। চোখ তুলে বাঁ দিকের বাগানে রাখল সুদেষ্ণা। গাছটা চেনা যায়, দূর থেকে ফুল আছে কি নেই বোঝা যায় না কিছু। গন্ধটাও পরিস্ফুট নয় তেমন। তবু, শিউলির গন্ধে কাল ভোররাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বাবার। বেলায়, দেখা হলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'খুকু, এটা কি আশ্বিন মাস ?'

'না। ভাদ্রের শেষ।'

'সকালে শিউলি ফুলের গন্ধে ঘুম ভেঙে গেল। গাছটা বাগানে আছে, তুই কি দেখেছিস ?'

সুদেষ্ণা মাথা নেড়েছিল শুধু। জবাব দেয়নি।

'পুজো কবে ?' একই দিকে তাকিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করেছিল জ্যোতি।

'এখনো অনেক দেরি আছে।' সুদেষ্ণা বলেছিল, 'এক মাসেরও বেশি।'

'এতো দেরি!'

একটা ব্যথা ছড়িয়ে যাচ্ছিল জ্যোতির বিশুষ্ক মুখে। পাশ ফেরা বারণ, তবু পাশ ফেরার অবুঝ চেষ্টায় শিরা ফুলে উঠেছিল কপালে। মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে করতে চোখ বন্ধ করেছিল জ্যোতি।

পুজোর সময় তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো—কথাটা বলতে গিয়েও বলেনি সুদেষ্ণা। সে কি ঠিক জানে ? ভাবতে গিয়ে ভবিষ্যতের চেহারাটা ধরা পড়ে তার চোখে। এর আগেও পড়েছে ; তবে এভাবে নয়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে ট্রেনের হেডলাইট প্রত্যক্ষ করার মতো, এই প্রথম জ্যোতির কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিজেকে দেখতে পেয়েছিল পুরোপুরি। এক রকম ভয়-মেশানো দেখা ; ভাবা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না কোনো।

এলোমেলো ভাবনা নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুদেষ্ণা ; নীপার গলা শুনে ফিরে এলো নিজেতে। পিছনে তাকিয়ে দেখল, দরজা পেরিয়ে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে নীপা।

জায়গা থেকে না সরে সুদেষ্ণা বলল, 'কী বলছ ?'

'ডাকছি, শুনে যা একটু!'

অনিচ্ছুকভাবে দূরত্বটুকু হেঁটে গিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল সুদেষ্ণা।

'কী বলছ ?'

'এমন একলা-একলা ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন ?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

নীপা বুঝতে পারল না এরপরে কী কথা বলতে পারে, অথচ সে বলতেই এসেছিল। অসহায়ভাবে মেয়ের একটা হাত ধরে, চাপ দিয়ে টেনে আনল কাছে।

'বাবা জেগেছে, বাবার কাছে গিয়ে বোস—'

'তুমি যাও। আমি এখুনি চলে যাবো।'

'এখুনি কেন। এলিই যখন, একটু পরে যাস।' হাতটা ছেড়ে দিয়ে সুদেষ্ণার কপালের ওপর এসে পড়া ভাঙা চুলের গুচ্ছটা কানের দিকে সরিয়ে দিতে দিতে ম্লান হাসল নীপা। বলল, 'বিমানদার জ্বর, আজ আসবে না। আমি ডাক্তারের কাছে ঘুরে আসছি। আয় তুই, ওর কাছে বোস—'

এবার সোজাসুজি নীপার চোখে চোখ রাখল সুদেষ্ণা।

'জ্বর হয়েছে কে বলল?'

'নিজেই ফোন করেছিল। তুই আসার আগে। বলছিল আসতে দেরি হবে, আমিই মানা করলাম।'

'বাবাকে মেরেছ, এবার ওকেও মারবে—'

নীপা ফিরে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল সুদেষ্ণার কথা শুনে। ছ্যাঁত করে উঠল বুকের ভিতরটা। খুকু আজ ক' দিনই উল্টোপাল্টা বলছে, মন খারাপ ভেবে আমল দেয়নি কোনো। কথা নয়, কথার অর্থগুলোই এখন রক্ত ছড়িয়ে দিল মুখে। খানিক মুঠো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে আঘাতটা সইয়ে নিল নীপা। চাপা গলায় বলল, 'এসব অমঙ্গলে কথা কী বলছিস, খুকু!'

জবাব না দিয়ে চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল সুদেষ্ণা। দাঁতের ফাঁকে মাছের কাঁটা বা ওই ধরনের একটা কিছু ঢুকেছে, বেশ কিছুক্ষণ ধরে অস্বস্তিটা টের পাচ্ছিল। আপাতত জিব দিয়ে ঠেলে ঠেলে সেটাকে বের করবার চেষ্টা করল এবং দেখল নীপা চলে যাচ্ছে। মা দুঃখ পেয়েছে, ভাবল, সে তো বলতে চায়নি! তা হলেও কথাগুলো মুখ ফুটে বেরিয়ে এলো কেন? ঘুরেফিরে ভাবনাগুলো মা'র দিকেই বা ছুটে যাচ্ছে কেন!

আরও একটু পরে আস্তে আস্তে জ্যোতির কাছে ফিরে এলো সুদেষ্ণা। কাছে গিয়ে বসল। পায়ের ওপর থেকে চাদরটা বেখাপ্পাভাবে সরে গিয়েছিল, সেটা ঠিকঠাক করে দিয়ে অমিয়া বলল, 'আজ অনেক ভালো আছেন। ঘুমটা হচ্ছে। সকালে খিদেও ছিল।'

সুদেষ্ণা বা জ্যোতি, কেউই তার কথা শুনছে বলে মনে হলো না। তাড়াহুড়োয় বইটা বিছানার ওপরেই ফেলে গেছে নীপা; সেটা তুলে টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখল অমিয়া; জ্যোতির মাথার বালিশটা হেলে পড়েছিল এক দিকে, সেটাকে জায়গায় আনল; তারপর বলল, 'আমি বাইরে আছি। দরকার হলে ডাকবেন—'

সুদেষ্ণা ভাবছিল, বাবাই কথা বলবে। কিন্তু জ্যোতির ভঙ্গিতে তেমন কোনো উপলক্ষ দেখা গেল না। মেয়ের দিকে তাকানো অপলক চোখ, একভাবে তাকিয়ে থাকার জন্যেই সম্ভবত, বড়ো বেশি উজ্জ্বল। আরও একটু এগিয়ে হাতটা বাবার কপালে ছোঁয়াল সুদেষ্ণা।

'কোনো কষ্ট হচ্ছে?'

জ্যোতি মাথা নাড়ল, না। রোগা হাত তুলে সুদেষ্ণার যে হাতটা তার গায়ে সেটার ওপর রাখল; হাঁ করার পরও ঠোঁটে জিব বুলোল কয়েকবার, তারপর জড়ানো গলায় বলল, 'ভালো আছি—'

সুদেষ্ণা লক্ষ করেছে, গত কয়েক দিন ধরেই বলার কথাগুলো অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে বাবার গলায়; যে কথাটা বলতে চায়, সেটা বলতে সময় নেয় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। শ্লেষ্মা-জড়ানো ঘড়ঘড়ে শব্দ হয় একটা, যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে, মনে হয় সেইগুলোই

বাবার জীবনের প্রথম কথা। এখনো দেখল। হয়তো ভিতর থেকে বাঁচার জোর কমে আসছে বলেই এমন হচ্ছে ; একদিন থেমে যাবে।

গলা পর্যন্ত একটা আবেগ ঠেলে এলো সুদেষ্ণার। যে ভালো নেই সে যখন জোর করে ভালো থাকার কথা বলে, মুখে কথা জোগায় না কোনো। জ্যোতির কপালে, কপাল থেকে চুলে, হাতটা সক্রিয় রেখে অন্য দিকে মুখ ফেরাল সুদেষ্ণা। বিকেলের হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে জানলার পর্দা ; মেঘে গাধার রঙ, এখান থেকে যেটুকু আকাশ দেখা যায় সেখানে নীলে মিশে আছে পাঁশুটে লাল। বিকেল সন্ধে হবার আগে ওই লালটা ক্রমশ ছড়িয়ে যাবে আরও।

হাতে চাপ অনুভব করায় সুদেষ্ণা বুঝল বাবা কথা বলা চাইছে। তখন মুখ ফেরাল।

'তুই এতো চুপচাপ কেন, খুকু !'

জ্যোতির গলা এবার অনেক পরিষ্কার। সুদেষ্ণার যে হাতটা কপালে, সেটাকেও ধরে নিল মুঠোয়।

'আমার মন খারাপ—আমার কিছুই ভালো লাগছে না—'

'কেন ?'

'তুমি বুঝতে পারো না !'

জ্যোতি হাসল, আজ এই প্রথম। বলল, 'অসুখটা না হলে তুই আমার এতো কাছে আসতিস না !'

সুদেষ্ণা জানে এই কথাটার মানে কী। একা হবার মুখে মরার কথাটা তাকেই প্রথম বলেছিল জ্যোতি, যেচে। তখন আর উপায় ছিল না। হয়তো এর পরের সব কথাগুলিই এগোবে অভিমানের দিকে—অভিমান থেকে দুঃখে, দুঃখ থেকে চুপ করে যাওয়ায়। সুদেষ্ণা ওকে ফেরাবার চেষ্টা করল।

'আমরা তো সব সময় থাকি না। তোমার একা লাগে না ?'

মাথা নাড়ার আগে ভাববার সময় নিল জ্যোতি। প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে তাকাল দরজার দিকে।

'ঘুমোলে ঘুমোই। জেগে থাকলে গল্প করি। ওই নার্সদের সঙ্গে। ওরা খুব ভালো।'

কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে বসল জ্যোতির কপালে। হাত নেড়ে সেটাকে তাড়াল সুদেষ্ণা। ওপরে উঠে গিয়ে মাছিটা এখন চক্রাকারে ঘুরছে, সুযোগ পেলেই নেমে আসবে। মাছিটার ওপর লক্ষ রাখতে রাখতে সুদেষ্ণা অনুভব করল, শুধু জ্যোতিই নয়—সে নিজেও এখন অনেকটা সহজ বোধ করছে। এই বোধটা যতোক্ষণ থাকে, ততোক্ষণই ভালো।

'কী গল্প করো ?'

'সুখ-দুঃখের কথা। সাধারণ কথাবার্তা।' অল্প থেমে নিজেকে গুছিয়ে নিল জ্যোতি, 'এই যে নার্সটিকে দেখছিস—অমিয়া, বড়ো দুঃখী মানুষ। বিধবা। ওর স্বামী যখন মারা যায়, তখন ওর ছেলের বয়স পাঁচ, মেয়ের বয়স দুই। তখন থেকেই নার্সগিরি করে ছেলেমেয়ে মানুষ করছে। এখন ছেলেটা বি-কম পড়ে, মেয়েটা সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। কতো দুঃখ সয়ে যে বেঁচে থাকে মানুষ !'

জ্যোতির গলা শুনতে শুনতে ওর মুখের রেখাগুলো লক্ষ করছিল সুদেষ্ণা। এখন ঠোঁট টেনে, চোখ দুটো কুঁচকে আনতেই হাতটা আবার কপালের ওপর নিয়ে গেল।

'তুমি এতো কথা বোলো না, বাবা! দেখছ তো কষ্ট হচ্ছে!'

'ও কিছু নয়। অমন ব্যথা সব সময়েই থাকে।' মাথাটা ওপর দিকে ঠেলার চেষ্টা করল জ্যোতি ; নিঃশ্বাস নিল জোরে। ঢোক গিলল। তারপর হঠাৎই বলল, 'তোদেরও কোনো কষ্ট হবে না, খুকু। বড়ো উঁচু মনের মানুষ বিমান। ও তোদের ঠিকই দেখবে।'

হাত থেমে গেল সুদেষ্ণার। মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে শীত। জ্যোতির কণ্ঠনালীর ঘন ঘন ওঠা-নামায় চোখ রেখে বুঝতে পারল, একইভাবে প্রভাবিত হচ্ছে সে। এখন দুটোই উপায়—ভেঙে পড়ার সন্ধিতে পৌঁছেও নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে সুদেষ্ণা ভাবল, হয় ভেঙে পড়া, না হয় চেপে রাখা নিজেকে। দুটোর কোনোটাই সে করল না। দেখল, চোখেমুখে যন্ত্রণা ফুটিয়ে দম দেওয়া যন্ত্রের মতো পায়ে পা ঘষছে জ্যোতি। কোনো কথাই আর কানে ঢুকবে না এখন। আগে চুপ করে গেলে হয়তো যন্ত্রণাটা এড়িয়ে যেতে পারত। এমনও হতে পারে, যন্ত্রণার আবির্ভাব বেশ কিছুক্ষণ ধরেই টের পাচ্ছিল জ্যোতি—বলার কথাগুলো বলে এখন নিশ্চিন্তে সঁপে দিয়েছে নিজেকে!

'বাবা!' চুপচাপ গলায় একবার ডাকল সুদেষ্ণা, সাড়া পাবার অপেক্ষা করল। ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা নেড়ে যাচ্ছে অবাধ্যের মতো—পেল না। তাড়াতাড়ি উঠে অমিয়ার খোঁজে বাইরে গেল সুদেষ্ণা, একবার ডাকতেই অমিয়া ছুটে গেল ঘরে ; এখন তার কিছুই করার নেই জেনে আলগোছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সুদেষ্ণা। পর্দা কিছুই আড়াল করে না। 'সারা দিন তো ভালো ছিলেন—', ভিতর থেকে অমিয়ার গলা শুনল, 'কতোবার বলেছি, এতো কথা বলবেন না! এই জন্যেই আত্মীয়-স্বজনদের আসতে বারণ করা হয়!'

হয়তো ঠিকই বলেছে অমিয়া, দোষটা তারই। যতোক্ষণ মা ছিল চুপচাপ ছিল— ; আজ সে না এলে কাল বলত, কাল না হলে আর একদিন ; যেন নার্সিং হোমের বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রতিদিনই বলার কথাগুলো গুছিয়ে রাখে জ্যোতি। এক কথা শুরু করে, শেষ করে আর এক কথায়। 'এখানের ভিজিটিং আওয়ার্স বেশ ভালো, তোদের আসা-যাওয়া করতে অসুবিধে হয় না কোনো।' কাল যেমন বলেছিল, 'রাতবিরেতে হঠাৎ যদি কোনো খবর পাস, একা আসিস না। আগে বিমানকে খবর দিবি।'

কাল অতোটা বোঝেনি ; গুরুত্ব দেয়নি। আজকের কথাগুলোর সঙ্গে কালকের কথাগুলো মিলিয়ে দেখতে দেখতে অন্ধকারে জড়িয়ে গেল সুদেষ্ণা।

'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস, খুকু?'

'কিছু নয়। তুমি ভেতরে যাও—'

যেভাবে এসেছিল, কিছু না-বুঝে তার চেয়ে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে গেল নীপা। কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এলো আবার।

'কিছু হয়নি তো!'

'কী হলে খুশি হও তুমি!' ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে নিজেই ছট্‌ফট করে উঠল সুদেষ্ণা। নীপার মুখ ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে, পলকহীন চোখ দুটো তারই কপালে নিবদ্ধ। সুদেষ্ণা বুঝল, উচিত হয়নি। বুঝতে পারল না, কেন বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে তার! আপাতত নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টায় যতো দূর সম্ভব সহজ গলায় বলল, 'ডাক্তার কী বলল?'

'এক জ্বালায় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছি—', নীপা যেন প্রশ্নটা শোনেনি, এইভাবে বলল, 'তুই কি আমার নতুন জ্বালা হবি!'

'ওঃ, মা, আমার আর ভালো লাগছে না !' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অসহায়ভাবে নীপার দিকে ঝুঁকে এসেছিল সুদেষ্ণা, হয়তো এখুনি ভেঙে পড়ত। বারান্দার মুখে ডাক্তারকে আসতে দেখে সংযত হলো। স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত চেহারা, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, আলগা একটা হাসি প্রায় সারাক্ষণই লেগে থাকে মুখে। আগে আগে দেখলে সাহস পাওয়া যেত ; এখন কিছুই মনে হলো না। এগিয়ে আসা জুতোর শব্দে কান রেখে সুদেষ্ণা বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

'বাবা কিছু বলছিল ?'

'না।'

'সাবধানে যাস—'

বারান্দা পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি। রেলিংয়ের কারুকাজ ছুঁয়ে নামবার সময় বেঢপ শব্দ ওঠে একটা, উঠেই থেমে যায়। শব্দে ব্যঞ্জনা নেই কোনো। এমনও হতে পারে অনুষঙ্গের অভাবে সবই ভোঁতা লাগছে এখন। নিচে রিসেপসানে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সাত-আটজন মেয়ে পুরুষ ; অধিকাংশ মুখেই অভিব্যক্তি নেই কোনো। জ্যোতির অপারেসানের দিন তারা যখন অপেক্ষা করছিল এখানে, তাদের মুখে কি অভিব্যক্তি ফুটেছিল কোনো ? কে বলবে ! সম্ভবত এই একটা জায়গা, যেখানে এসে অপেক্ষা সম্পর্কে বাঁধা ধারণা খুলে যায় দরজার মতো—বোঝা যায় না বহু দূর অব্দি দেখানো সেই দরজা দিয়ে শোক, সুখ, কে এসে উপস্থিত হবে ! তবে, সেদিন না বুঝলেও, আজ নিশ্চয়ই একটা ধারণা করে নিতে পারে সুদেষ্ণা। বহু দূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতায় ছাতা-পড়া কমলালেবুর আভা, যতো দিন যাবে ততোই এই রঙটুকু স্পষ্ট হবে আরও। যতো দিন মানে ঠিক কতো দিন ?

বাগানের মধ্যে দিয়ে সুরকির রাস্তা চলে গেছে গেট পর্যন্ত। শান্ত পায়ে ও অন্যমনস্ক হেঁটে যেতে যেতে একটু থেমে দাঁড়াল সুদেষ্ণা, তাকাল শিউলি গাছটার দিকে। তারপর দোতলার ছাদের দিকে। শেষ বেলার ছিমছাম হাওয়া এসে মিশে গেল নিঃশ্বাসে। কাল সকালেও হয়তো শিউলির গন্ধে ঘুম ভাঙবে বাবার। অস্পষ্ট ও রহস্যময় সেই গন্ধে নাক ভাসিয়ে গন্ধের আবির্ভাব সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবে শুধু, বুঝতে পারবে না গাছটা ঠিক কোথায় ! মন জুড়ে ঘোরাফেরা করবে এলোমেলো অসংখ্য ভাবনা ; হয়তো ওরই মধ্যে থেকে বলার কথাটি খুঁজবার জন্যে ছট্‌ফট করবে বাবা। করবে কি ? আজ যা বলল, গত কয়েক দিন ধরে যা যা বলেছে, তার পরেও কি আর কোনো কথা থাকতে পারে !

নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে অল্প একটু দ্বিধায় পড়ল সুদেষ্ণা। এখন ছ'টা। মেট্রোর সামনে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে অরিন্দমের অপেক্ষা করার কথা। অফিস ছুটির ভিড় কাটেনি, এখন ট্রামে বা বাসে ওঠা মুশকিল। ট্যাক্সিতে যাওয়া যায় অবশ্য ; কিন্তু, একা একা, ট্যাক্সিতে ? চিন্তাটা পাল্টাতে হলো। আধঘণ্টা অনেকটা সময় ; লোয়ার সারকুলার রোড থেকে এসপ্ল্যানেড্ খুব একটা দূরত্ব নয়। সন্ধে হয়েও হতে দেরি আছে এখনো, এক দিকের আঁধারের ছায়া আলো করে রেখেছে অন্য দিকটাকে। নরম হয়ে আছে হাওয়া। বরং হেঁটে যাওয়াই ভালো, সুদেষ্ণা ভাবল, এই দূরত্বটুকু সে স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পারে।

আনমনে অনেকটা হেঁটে এলো সুদেষ্ণা। ক্রমাগতের শব্দ ও ব্যস্ততা থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখল চারিদিকের পরিচিত দৃশ্যে ব্যতিক্রম ঘটেনি কোনো। যা যেমন ছিল তেমনিই আছে—বাড়িগুলো, রাস্তাগুলো, রাস্তার আলোগুলো। ডান দিক দিয়ে এবং বাঁ

দিক দিয়ে দ্রুত বা অলস ভঙ্গিতে যারা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের মুখে বা হাঁটার ভঙ্গিতে আলাদা কোনো অভিব্যক্তি নেই। গাড়ির হর্নে বৈচিত্র্য আছে, আছে গতির পার্থক্য, তবু আলাদা করা যায় না একটার উদ্দেশ্য থেকে আর একটার উদ্দেশ্য। যেতে যেতে কেউ তাকিয়ে দেখছে তার মুখের দিকে, চলনের দিকে ; অধিকাংশই দেখছে না। এমন কি হতে পারে, তাদেরও চোখে কিংবা মনে ধরা পড়ছে না তার কোনো উদ্দেশ্য। ভাবনাটা থেমে এলো মনে, হঠাৎই, বিস্তৃত আলোর মধ্যে যেভাবে ঝুপ করে নেমে আসে লোডশেডিংয়ের অন্ধকার। কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে সুদেষ্ণা ভাবল, এই যে সে হেঁটে যাচ্ছে অরিন্দমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ? ভালোবাসা ? টান ? একদিন তাদের বিয়ে হবে ? বিয়ে তো বাবা ও মা'র মধ্যেও হয়েছিল—তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল কোনো, পারস্পরিক কোনো নির্ভরতার আশ্বাস ? যদি তাই থেকে থাকে, তা হলে সব এমন ভেঙেচুরে গেল কেন ! আগে বুঝতে পারেনি ! ওরা যদি বুঝতে না পেরে থাকে, তা হলে সে নিজেও কী করে বুঝছে, যেদিকে এগোচ্ছে সেদিকেই আছে তার নির্ভরতা !

প্রশ্ন জড়িয়ে যাচ্ছে উত্তরে। বেতালে পা ফেলার মতো, উত্তর ঢুকে পড়ছে প্রশ্নে। বিমানকাকু যে ভালো লোক, আজই বাবা বলল সে-কথা ; বাবা কি আগেই জানত ? যদি জেনে থাকে, তা হলে চলে যেতে হলো কেন বিমানকাকুকে ! মা'র জন্যে ? না, না। বয়সে ছোট হলেও সেদিন বুঝতে অসুবিধে হয়নি সুদেষ্ণার, মা যেভাবে বিমানকাকুর চলে যাওয়া বন্ধ করতে গিয়েছিল, তার মধ্যে ধরে রাখার ইচ্ছে ছাড়াও ছিল আরো কিছু। সেই আরো কিছুটা বুঝেই কি মাকে মেরেছিল বিমানকাকু ? নাকি, তার হঠাৎ-চিৎকারেই গোলমাল হয়ে গিয়েছিল সব ? শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে, সেদিন, সে-ই বা চিৎকার করে উঠেছিল কেন ! মাকে হারাবার ভয়ে, নাকি মা'র প্রতি ঘৃণায় ! বিমানকাকুকে হারাবার ভয়ে !

একটু বা জোর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আলতো হাতের ছোঁয়া লাগতেই থমকে দাঁড়াল সুদেষ্ণা। অরিন্দম।

'আরে !'

'ব্যাপার কী ! কোথায় দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল ! সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে অথচ দেখতে পেলে না !'

তখনো অরিন্দমকেই দেখছে সুদেষ্ণা। বলবার পর খেয়াল হলো, মেট্রো পিছনে ফেলে প্রায় ধর্মতলা স্ট্রিটের কাছাকাছি চলে এসেছে। তবু অবাক হলো না বা কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। চারপাশের লোকজন, দোকানপাট, হকার, সিনেমার নিওন ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে ছেড়ে-যাওয়া ভাবনার শেষটুকু ছুঁয়ে থাকল প্রাণপণে, যেন অরিন্দমের সঙ্গে এই দেখা হওয়ার দাম নেই কোনো, তাকে ফিরে যেতে হবে আবার সেই পুরনো আবর্তে ! তারপর যেদিকে হাঁটছিল সেদিকেই পা বাড়িয়ে বলল, 'চলো—'

'ওদিকে কোথায় !' ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করার ধরনে হাত বাড়িয়ে সুদেষ্ণাকে আড়াল করল অরিন্দম, 'কী ভাবছ বলো তো !'

'ক'টা বাজে ?'

'ছ'টা চল্লিশ। চল্লিশ মিনিটের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি।'

দু'পা এগিয়ে গেল অরিন্দম। দেখাদেখি সুদেষ্ণাও। হিসেব করে দেখল, আটটার আগে নার্সিং হোম থেকে বেরুবে না নীপা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে আটটা ; কিংবা ন'টাও হতে পারে। আজ বিমানকাকু নেই যে পৌঁছে দেবে। সুতরাং দেরি হবে। সকালেই আবার

বেরুতে হয় বলে আজকাল সন্ধেবেলায় বাজার ঘুরে আসে নীপা, টুকিটাকি সেরে রাখে বাকি কাজকর্মগুলো, ময়লা হয়ে আসা আলোয় বসে একমনে তরকারি কুটে যায় বঁটিতে। মাকে তখন বড়োই কাহিল লাগে—বসে থাকার একাগ্রতা দেখে মনে হয় হাত চালাচ্ছে অভ্যাসে, ফলাফলে চোখ নেই কোনো, এইভাবে কোনো একসময় হয়তো নিজেকেও কাটতে শুরু করবে! একটু আগে জ্বালার কথা বলেছে, সুদেষ্ণা বুঝতে চায়নি। সে ভেবেছিল নিজের কথা। নীপার সঙ্গে কোনো দিনই জমেনি তার, জ্যোতির সঙ্গেও না। তবু তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে জ্যোতি থাকত বলেই অস্বস্তিটা গায়ে লাগত না। জ্যোতি চলে গেলে মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবে তারা। তখন—

'কী ভাবছ বলো তো?'

'কিছু নয়।' জোর করে বর্তমানে ফিরে এলো সুদেষ্ণা। চল্লিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখার পর শুধু পাশাপাশি হাঁটার জন্যে অরিন্দমকে আসতে বলেনি। কী জন্যে বলেছিল? অরিন্দম চেয়েছিল বলে? না। তেমন কোনো কারণ ছিল না; তবু বলার সময় যে-অনুভূতিটা ছিল, এখন সেটাকেও খুঁজে পাচ্ছে না আর। চেষ্টা করে বলল, 'যে-রাস্তায় হাঁটছিলাম, সেদিকে গেলেই হতো। আবার ফিরে আসতাম। সময় কেটে যেত।'

আড়চোখে সুদেষ্ণার দিকে তাকিয়ে হাসল অরিন্দম। বলল, 'যেভাবে শুরু করেছিলে, ভাবতেই পারিনি আজ আর কথা বলবে!'

'ছ্যাবলামি রাখো। তোমার ওসব কথায় মন দেবার মতো মন আমার নেই।' বলতে বলতে থামল সুদেষ্ণা। এতোক্ষণ টান-টান ভাবনায় শক্ত করে রেখেছিল নিজেকে, অল্প আলগা হতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে হাই উঠে এলো। ক্লান্তি; আয়না থাকলে চোখের কোলে ছায়া খুঁজে পেত। অরিন্দম হাঁটছে, আস্তে আস্তে, *ঠেলাঠেলি* বাঁচিয়ে, তাকে আড়াল করে। ক্লান্তিটা পাশ কাটিয়ে সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছো বলো তো?'

'গাড়িটা ওদিকে আছে—'

'গাড়ি! গাড়ি এনেছো কেন!'

'কেন!'

'তোমার এই দেখানো ভাবটা আমার ভালো লাগে না—'

কথার ঝোঁকেই এগিয়ে যাচ্ছিল সুদেষ্ণা। অরিন্দম দাঁড়িয়ে পড়ল। এই জায়গাটায় ভিড় নেই ততো। আলো কম, সামনের রেস্তোরাঁ থেকে ছিটকে-পড়া আলোর রেশটুকু না থাকলে অন্ধকারই থাকত। ফুটপাথ থেকে ভিতরে ঢোকা বড়ো বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আরও বেশি অন্ধকারের অপেক্ষা করছে দু'টি যুবতী; সুদেষ্ণা এগিয়ে থাকলেও অরিন্দমের সঙ্গে তাদের দূরত্ব হাত দেড়েকের বেশি নয়। 'এ শালা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল কেন!' কথাগুলো কানে এসে বিঁধল অরিন্দমের, মুহূর্তের জন্যে জায়গা বদল করার কথা ভাবল, দেখল, সুদেষ্ণাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলতে হলে এখনই বলতে হবে।

'আমি কিছু দেখাতে চাই না—'

'ঠিক আছে, চলো—'

অরিন্দম একটা গলা শুনল, 'যাবি কোথায়! লড়ে যা।' তীক্ষ্ণ ও বেখাপ্পা সেই বিদ্রূপ তাকে পরের কথাটা বলতে দিল না। সুদেষ্ণা শোনেনি, শুনলেও বুঝত না। 'চলো' বলেই এগিয়ে গেছে আবার। একবার তাকিয়ে দ্রুত হলো অরিন্দম; সুদেষ্ণার পাশাপাশি এসে বলল, 'তুমি প্রায়ই এই ধরনের কথা বলো। তোমার সঙ্গে আলাপের আগেও গাড়ি ছিল,

আরও লক্ষ লক্ষ লোকের আছে—'

'ভুল হয়েছে, ক্ষমা করো।' এবার সুদেষ্ণাই দাঁড়াল। মুখে পরিষ্কার অস্বস্তি, শক্ত হয়ে এলো হাতের মুঠো দুটো। অপ্রত্যাশিত গলায় বলল, 'অরিন্দম, আমার ভালো লাগছে না—কিচ্ছু ভালো লাগছে না—'

অরিন্দম জবাব দিল না। সুদেষ্ণাকে লক্ষ করতে করতে সইয়ে নিল নিজেকে। এটা রাস্তা ; প্রকাশ্য দিবালোক না হলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজন কম নেই ; তাদের চোখ আছে। তবু, এই মুহূর্তে, হাত বাড়িয়ে সুদেষ্ণাকে কাছে টানার আগ্রহ চাপা দিতে পারল না অরিন্দম। হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'সেটা জেনেই দেখা করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার ভালো লাগবে—'

'রাস্তার মধ্যে যেটা করলে, লোকজন ভাববে কী !'

'আই ডোন্‌ট মাইণ্ড। তুমি কি কিছু ভাবলে ?'

সুদেষ্ণা জানে না। সুতরাং চুপ করে থাকল।

ওরা গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। নিজে উঠে সুদেষ্ণার জন্যে দরজা খুলে দিল অরিন্দম। পার্কিং প্লেস থেকে গাড়িটা বের করে এগিয়ে গেল খানিকটা। তারপর স্পিড কমিয়ে বলল, 'আমার কোনো প্রেফারেন্স নেই। তুমি কোথায় যেতে চাও ?'

'জানি না।'

'যদি বলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি—'

'না।'

'তবে ?'

রাস্তায় প্রায় জ্যাম। এতোক্ষণ বোঝা যায়নি ; ট্রাফিক খুলে যাবার পর রাস্তা পাবার তাড়ায় একসঙ্গে অনেকগুলো হর্ন চিৎকার শুরু করে দিল। একটা ডবলডেকার চলে যাচ্ছে প্রায় গাড়ির গা ঘেঁসে, আর একটু হলেই ধাক্কা লাগত। আশঙ্কা ও বিরক্তিতে নিজের জায়গা থেকে অরিন্দমের দিকে খানিকটা সরে এলো সুদেষ্ণা। হঠাৎ বলল, 'তোমার কোনো ইচ্ছে থাকে না কেন !'

যেন ওই কথাতেই কাজ হলো। এক ঝাঁকুনিতে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে ময়দানের দিকে বাঁক নিল অরিন্দম। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে এতোক্ষণের সব ঢিলেমি পুষিয়ে নিচ্ছে। চোয়াল শক্ত, চোখ সামনের দিকে। আবছা আলোয় রাস্তা পার হচ্ছে একটা লোক, বেপরোয়াভাবে তাকে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'শুধু ইচ্ছে থাকলেই হয় না, মন থাকা চাই—'

'তোমার মনও নেই।'

'আছে। দেখার চোখ নেই বলেই বলছ এ-কথা।' অরিন্দমের গলার স্বর বেশ ভারী, যতোটা না বলছে তার চেয়ে বেশি ভাবছে যেন। কাঁটা উঠে গেছে ষাটে। সম্ভবত নতুন পিচ ঢালা হয়েছে রাস্তায়, এখনো জমেনি পুরোপুরি। চাকার ঝাপ্‌টায় চড়চড় শব্দ উঠছে। সময় নিয়ে অরিন্দম বলল, 'খুকু, আমার মনে হচ্ছে তোমার বাবার অসুখটার জন্যে তুমি আমাকেই দায়ী করছ ! হয়তো ভাবছ, ব্যাপারটায় আমার ইণ্টারেস্ট নেই কোনো। কিন্তু, তাই কি ? তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমি দেখা করতে পারতাম, নার্সিং হোমেও যেতাম। তুমি কোনো দিনও বলোনি। দু' বছরে একদিনও আলাপ করিয়ে দেবার কথা ভাবোনি !'

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে চুপ করে গেল অরিন্দম। সুদেষ্ণা তার কিছুটা শুনেছে, বাকিটা শোনেনি। মাঠের হাওয়া থেকে উঠে আসছে এক ধরনের সজীব স্নিগ্ধতা, ঘুম

পাড়িয়ে দেয়। ভাবনাগুলো হিম হয়ে ছড়িয়ে যায় শরীরে। আধো ঘুমের আবেশ থেকে নিজেকে তুলে অপ্রস্তুত গলায় সুদেষ্ণা বলল, 'আলাপ হলে কী হতো!'

'কী হতো!' প্রশ্ন বা বিস্ময় যাই হোক না কেন, অরিন্দম সেটাকে থিতিয়ে যেতে দিল। তারপর প্রশ্ন করার ধরনে বলল, 'কিছুই যদি না হয়, তা হলে একটা আউটসাইডারের সঙ্গে আলাপ করাতে, বারবার করে ওখানে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠো কেন!'

সুদেষ্ণা একটা ধাক্কা খেল। তবু, কথাটা ঠিক ঠিক বুঝবার আগেই বলল, 'কে আউটসাইডার!'

কথার জেরেই কথা বলছে অরিন্দম। যেন সুদেষ্ণার কথাটা শোনেইনি, এইভাবে বলল, 'আমার মা'র কাছে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম কেন?'

'জানি না।'

'একটাই কারণে। সেটাই সামাজিকতা।'

অরিন্দম অন্য কথায় চলে এলো, 'ছ' মাস পরে আমার ফাইনাল পরীক্ষা। পাস করবই। কাল মাকে বিয়ের কথা বলেছিলাম—বলেছিলাম তোমার কথা ভেবে—'

'পারমিসান!'

একটু বেঁকিয়েই কথাটা বলেছিল সুদেষ্ণা, বলার জন্যে নয়। অরিন্দম অন্যভাবে নিল। স্পিড কমিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িটাকে থামিয়ে আনল রাস্তার ধারে। এখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আলো দেখা যায়। দু' ধারের ঝাঁকড়া গাছগুলোকে জায়গা করে দিয়ে রাস্তার ঢাল নেমে গেছে মাঠে, মাঠ অন্ধকারে। জোনাকির খাপছাড়া ওড়াউড়ি ছাড়িয়ে আরও দূরে তাকালে চোখে পড়ে দু'একজনকে। বাঁ দিকে একশো গজের মধ্যে থামের মতো দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের চৌখুপি। পাশ দিয়ে প্রচণ্ড স্পিডে একটা ট্যাক্সি ছুটে যাবার পর গাড়ির ভিতরে তাকাল সুদেষ্ণা। আবছা মুখ অরিন্দমের, তবু চিনতে অসুবিধে হয় না। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে ঝুঁকে এসেছে খানিকটা। ওকে দেখতে দেখতে সুদেষ্ণা আগের কথাটা খুঁজল।

'তোমার যে মন ভালো নেই তোমার প্রত্যেকটি কথা শুনেই তা বুঝতে পারছি!'

'কী বলেছি!'

'কী বলেছ!' অন্ধকারে হাসল অরিন্দম। সিটের ওপর থেকে সুদেষ্ণার হাতটা তুলে এনে, নিজের হাতটা তুলে দিল ওর ঘাড়ের পিছনে। কাছে টানল। তারপর বলল, 'পারমিসান না পেলে কি তোমাকে ছেড়ে দেবো?'

সুদেষ্ণা কথাটা শুনল না। একটু আগে অন্ধকারে তাকিয়ে দেখেছিল দু'ধারের ঝাঁকড়া গাছগুলোকে জায়গা করে দিয়ে রাস্তার ঢাল নেমে গেছে মাঠে, মাঠ অন্ধকারে। খাপছাড়াভাবে ওড়াউড়ি করছিল জোনাকিগুলো। দূরত্ব থেকে এখন সেগুলো উড়ে আসছে কাছে; সংখ্যায় অসংখ্য হয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। জ্বলার এই ধরনটা সে চেনে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো এটা রাস্তা, নির্জনতাই আড়াল নয় কোনো। চিন্তাটায় স্থির থাকতে পারল না। তার আগেই গোটা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন মুখ নিয়ে এগিয়ে গেল অরিন্দমের দিকে।

স্বাদটা নতুন নয়। আগেও পেয়েছে। তবু শরীর আজ তাকে নিয়ে যাচ্ছে অন্য দিকে। পিঠের ওপর অরিন্দমের হাত, ঠোঁটের ওপর অরিন্দমের ঠোঁট—আরও বেশি সংলগ্ন হতে গিয়েও অস্বস্তিতে কেঁপে উঠল সুদেষ্ণা। চোখ বন্ধ রেখেও ছবিটা দেখতে পেল স্পষ্ট, দু' হাতে বিমানকে আঁকড়ে ধরে বুকে মুখ ঘষছে নীপা। জ্যোতির মতিগতি বোঝা যায় না,

বিমানই তার আশ্রয়। সুদেষ্ণার আশ্রয় কে! অরিন্দম? একা ভালোবাসায় জোর নেই তার, একটু আগেই টেনে এনেছিল সামাজিকতা। নীপা বিমানকে আউটসাইডার ভাবেনি। এমনও হতে পারে, ভেবেছিল বলেই নিজেকে খুলে দিয়ে বলেছিল, যা মিথ্যে তাই সত্য হোক। কোনটা মিথ্যে।

মাথার ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়াশা, তার ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে ছেঁড়া-খোঁড়া ভাবনাগুলো। নিজের কানেই নিজের অসম্ভব চিৎকার শুনতে পেল সুদেষ্ণা। ছিটকে বেরুতে গিয়ে দেখল পারছে না, চিৎকারটা চেপে বসছে বুকে। তখন ছটফট করতে করতে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, 'ছাড়ো—ছাড়ো আমাকে—'

ঠিক কী হয়েছে এবং কেন, বুঝতে পারল না অরিন্দম। ব্যস্তভাবে গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল সুদেষ্ণা, বুঝতে পেরে তৎপর হাতে ওর হাতটা চেপে ধরল। আগের চেয়েও অনেক শক্ত করে।

'পাগলামি কোরো না!'

'কেন করব না!' সুদেষ্ণা তখন গোছাচ্ছে নিজেকে, কব্জিতে অরিন্দমের হাতের চাপ অনুভব করতে করতে নিঃশ্বাস নিল জোরে, কী ভেবে আধখোলা দরজাটা টেনে বন্ধ করল আবার। তাকাল অরিন্দমের মুখের দিকে। নিঃশ্বাস আড়াল করে বলল, 'শরীর ছাড়া আর কিছু চেনো না!'

'তোমার খারাপ লাগবে জানলে করতাম না! আমারই ভুল!'

'ভুল-ঠিকের কথা নয়।' স্বর শুনে মনে হয় সুদেষ্ণা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। দাঁত বসে গেছে ঠোঁটে, চোখদুটো হারিয়ে গেছে জলে। চাপা, কুণ্ঠিত গলায় থেমে থেমে বলল, 'যার দাঁড়াবার জায়গা নেই, তার শুধু শরীর আছে—তুমি এ-ছাড়া আর কিছু বোঝো না।'

আবছায়ায় জড়ানো মুখের রেখাগুলো, শরীর চেনা গেলেও অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয় না। যেটুকু বুঝবার গলার স্বরের ওঠাপড়া থেকেই বুঝে নিল অরিন্দম। সুদেষ্ণা অনেক কথাই বলে ঝোঁকের মাথায়, সেই মুহূর্ত থেকে আলাদা করে ভাবলে অর্থ দাঁড়ায় না কোনো। এই কথাগুলো, মনে হয়, ভেবেই বলেছে। অরিন্দম কারণ খুঁজল এবং ভাবল, দু' বছরের অন্তরঙ্গতা একটি দিনেই অর্থ বদল করতে পারে কি না। সম্ভবত পারে না। তবু, সুদেষ্ণার কথার ধাঁচই তাকে টেনে নিয়ে গেল আশঙ্কা থেকে গ্লানির দিকে।

'আমি লম্পট নই, খুকু।' গাড়িটা আবার স্টার্ট করতে করতে অরিন্দম বলল, 'আজ তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম। হয়তো তোমার ভালোই লাগত।'

সুদেষ্ণা চুপ। বসার ধরনে পাথরের জড়তা, চোখ বাইরে, অন্ধকারে—দেখে মনে হয় অরিন্দমের গাড়িতে নয়, সে চলেছে ট্যাক্সিতে। অপরিচয়ের মধ্যে কথা বলার সুযোগ নেই কোনো।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে গাড়িটাকে বড়ো রাস্তার দিকে নিয়ে গেল অরিন্দম। সেখানে পৌঁছে বলল, 'যাবে?'

'আমি এখানেই নামব।'

গাড়ি থামিয়ে অরিন্দম বলল, 'আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারতাম।'

কথা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে নেমে গেল সুদেষ্ণা। আঁচল সামলে ফুটপাথে উঠল, হাঁটতে লাগল দ্রুত। দুঃখ বা সুখ, কিছুই ভাবল না। ভাবনাটা নিয়ে গেল না কোথাও। শুধু, আবার একা হয়ে যাবার অনুভূতিতে দুলে গেল অল্প। সামনে ও আশেপাশে

তাকিয়ে দেখল, কোথাও এতোটুকু বদলের চিহ্ন নেই। ঠোঁট দুটো ফুলে আছে সামান্য, না হলে অরিন্দমের সঙ্গে দেখা হবার আগে সে যেমন ছিল তেমনিই আছে। হাঁটছে, নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে যেমন হাঁটছিল। মাঝখান থেকে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। কেন!

এর পরের অনেকটা সময়ই একটা ঘোরের মধ্যে কাটাল সুদেষ্ণা। নিশির ডাকে হেঁটে চলার মতো অদ্ভুত যান্ত্রিকতা ছেঁকে ধরল তাকে। সেই সঙ্গে অবসাদ; শরীর ও মনের সংযোগ থাকল না কোনো—একটা বাসে উঠেও নেমে এলো আবার, অন্য একটা বাসে ওঠবার আগে আরও খানিকটা হেঁটে গেল একা একা। অরিন্দমের সংস্পর্শে কিছু দিন আগে একটা স্বাদ ছড়িয়ে গিয়েছিল শরীরে, সেই স্বাদ এখনো মাঝে মাঝে ছুঁয়ে গেলেও এই মুহূর্তের বিচরণে কোথাও খুঁজে পেল না অরিন্দমকে; যেন এ-স্মৃতির দাম নেই কোনো। দামী অংশের সবটুকুই হিজিবিজি; পরিষ্কার আঙুল তুলে কোনোটিকেই সনাক্ত করা যায় না।

খেয়াল হলো বিমানের ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে। এমনও হতে পারে, নার্সিং হোম থেকে কিংবা তারও আগে থেকে তার সমস্ত উদ্দেশ্যহীনতাই ধাবিত হচ্ছিল এই দিকে, সুদেষ্ণা নিজেও জানত না। ফ্ল্যাটে পা দেবার পরই অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম নিজেকে খুঁজে পেল।

'খুব জ্বর।' দরজা বন্ধ করতে করতে গোকুল বলল, 'তুমি কি নার্সিং হোম থেকে?'

সুদেষ্ণা ঘাড় নাড়ল, মুখ ফুটে বলল না কিছু। তখনই ভিতরে গেল না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করল, এতোক্ষণের ক্লান্তি আর অবসাদ শরীরটাকে নিঃশেষ করেও ভরে দিয়েছে অন্যভাবে। উনিশ বছরের মধ্যে আর কখনো নিজেকে এতো ভারী লাগেনি। অননুভূত আবেগে গরম হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস, ঘুরপাক খাচ্ছে বুকের মধ্যে—ঘাম হয়ে ফুটে উঠছে কপালে, এতোকালের অভিজ্ঞতার মধ্যে আর তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

নিজেকে সংযত করার জন্যে কয়েকবার আঁচল টেনে কপালের ঘাম মুছল সুদেষ্ণা। সামনে গোকুল, একটু বা অবাক দৃষ্টি—যেন সুযোগ পেলেই প্রশ্ন করবে। সুদেষ্ণা এড়িয়ে গেল।

'হঠাৎ জ্বর হলো কেন!'

'হবে না!' গোকুল বলল, 'তোমার বাবার অপারেসানের পর থেকেই দেখছি রাতে ঘুমোয় না। সিগারেট টানে আর পায়চারি করে বেড়ায়। খাওয়া-দাওয়াও প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। জ্বরের আর দোষ কী!'

'আজই হলো?'

'না। কাল রাত থেকেই বলছিল, আজ অফিস থেকে ফিরে এলো গা আগুন করে।'

খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনল সুদেষ্ণা। ভাবল। তারপর পা বাড়াল।

'দাঁড়াও। আলোটা জ্বেলে দিই। ঘুমোচ্ছে বোধ হয়।' গোকুল এগিয়ে এলো সামনে, 'তোমার বাবা কেমন আছে, খুকু?'

'জানি না।' ধরা গলায় জবাব দিল সুদেষ্ণা, 'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না—'

সামনে বিমানের ঘর। পর্দার ওদিকে অন্ধকার, তবু একচিলতে বাইরের আলো যেন খেলা করছে মেঝেয়। সেই আলোটায় চোখ রেখে নিঃশ্বাস চাপল সুদেষ্ণা। কৃত্রিম কাশিতে গলা সাজিয়ে গোকুল বলল, 'খুকু এসেছে—।' তারপর পর্দার বাইরে থেকেই দেওয়ালে

হাত বাড়িয়ে স্যুইচ খুঁজল।

'আয় খুকু—', আধশোয়াভাবে বিছানায় উঠে বসল বিমান, 'একটু আগেই গোকুলকে বলছিলাম তুই আসতে পারিস—'

কথাগুলো হারিয়ে গেল কানে। ঘরের মাঝখানে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে খুঁজল সুদেষ্ণা। অপেক্ষা করল একটু। তারপর স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুত হেঁটে গিয়ে বসে পড়ল বিছানায়। মাথাটা আবার বালিশে নামিয়ে রাখছে বিমান। আলগোছে ওর একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের গালে ঠেকাল সুদেষ্ণা ; ঠেকিয়েই রাখল। তাপ আছে বোঝা যায়, তার ঘনতাটুকুই ধরা যাচ্ছে না শুধু। তা হলে কি তার নিজের শরীরের উত্তাপেই আড়াল হয়ে যাচ্ছে বিমান ? বুঝতে না পেরে জড়োসড়ো হলো সুদেষ্ণা। এখনই তার কিছু বলা দরকার মনে করে বলল, 'তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে, বিমানকাকু !'

'কিছু নয়। কালই কমে যাবে।' হাতটা টেনে নিল বিমান, ইনফ্লুয়েঞ্জা মনে হচ্ছে। তুই একটু সরে বসলে পারতিস। ছোঁয়াচেও হতে পারে—'

'হবে হোক।' কথা শোনার পরিবর্তে সুদেষ্ণা যেন সরে এলো আরও কাছে, 'কী করব বলো ? মাথা টিপে দেবো ?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। শান্ত হয়ে বোস তুই, কথা বল, তা হলেই হবে—'

একপলক বিমানের চোখে চোখ রেখে সরিয়ে নিল সুদেষ্ণা। ব্যালকনির খোলা দরজা দিয়ে তাকাল বাইরে। অনেকটা আকাশ ; যতো দূর দেখা যায় সাদা জ্যোৎস্না বিস্তৃত হচ্ছে ক্রমশ। তারাগুলো চেনা যায় স্পষ্ট। এসবের নিচে দিয়ে খুব হাল্‌কা মেঘ উড়ে যাচ্ছে দূরে। আরও দূরে তাকিয়ে নার্সিং হোমের ছাদটা দেখতে পেল সুদেষ্ণা—অবারিত জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে গাছের পাতা। জ্যোতি এসব কিছুই দেখবে না। জানলা ডিঙিয়ে ঘরে যেটুকু জ্যোৎস্না আসবে, ঘুমে আচ্ছন্ন না থাকলে হয়তো চোখ ফিরিয়ে নেবে তার ওপর থেকে। ঘৃণা কিংবা অভিমানে তার পরিধি ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। শিউলির গন্ধের কথা একবার বলেছে বলে আবার বলবে তার কোনো মানে নেই। জ্যোতি চলে যাবার পরও এসব থাকবে।

শরীরের অসহায়তা এরই মধ্যে আস্তে আস্তে সংবরণ করে নিচ্ছিল সুদেষ্ণা। সেটা ফিরে আসছে আবার। আনমনে নিঃশ্বাস চাপল সে। চাপতে গিয়ে অনুভব করল জায়গা নেই ; হঠাৎ শীত জানিয়ে সেটা ছড়িয়ে গেল শরীরে। নিজেকে নিরস্ত করার জন্যেই সম্ভবত হাত বাড়িয়ে বিমানের একটা হাত টেনে নিল কোলে। ধরে থাকল।

'তুই যখন ছোট ছিলি, খুকু, জ্বর-টর হলে সোজা চলে আসতিস আমার কাছে—', কথা শুরু করে বাঁচিয়ে দিল বিমান। বলল, 'শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছিলাম। তখন তোর জেদ বেড়ে যেত আরও। কতো দিন এমনও হয়েছে, তোর বাবা-মা বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, আমি পারিনি—'

বিমান থামল। শুকনো ঠোঁটে জিব বুলিয়ে হাসল, 'তোর একটা বাঁধা কথা ছিল। বলতিস, ঠিক আছে, যাও, ফিরে এসে আমাকে দেখতে পাবে না—'

সুদেষ্ণা দেখল, বিমান চোখ বন্ধ করছে ; হয়তো জ্বরের ঘোর জেগে থাকতে দিচ্ছে না ওকে। নীপা জানে না সে এখানে আসবে ; দেরি হবে বলে রাখলেও ভাবতে পারে। এখন তার চলে যাওয়া উচিত। এই সব ভাবা সত্ত্বেও উঠতে পারল না সুদেষ্ণা। বিমানের শেষের কথাগুলো শোনার আগেই সে ভিজতে শুরু করেছিল ; এখন ওর ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে

অনুভব করল, অসংখ্য জোনাকির আলোয় ছেয়ে যাচ্ছে শরীর—অপ্রতিরোধ্য একটা আবেগ উঠে আসছে অন্ধকারে। মুখে, গলায়, শরীরের সর্বত্র তার তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে শুনতে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সুদেষ্ণা।

'তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে কেন, বিমানকাকু!'

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়, মাথাটা তুলতে গিয়েও পারল না বিমান। সক্রিয় হতে গিয়েও থেমে এলো হাত দুটো। এইমাত্র নারীত্বে রূপান্তরিত খুকু তাকে সম্মোহিত করছে। বুকের ওপর মুখ, শরীরের চাপ থেকে বেরিয়ে আসছে শরীর। নিঃশ্বাসে তোলপাড় করছে আশ্লেষের গন্ধ। গন্ধটা চেনা। তবু, নীপার সঙ্গে সুদেষ্ণার তফাত অনেক। সেই তফাতটুকু অনুভব করতে করতে জড়িয়ে গেল বিমান। সেদিন হাত উঠলেও আজ উঠল না।

ফুলে, ফুঁপিয়ে ক্রমশ নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে খুকু। বিমান জানে, অহঙ্কার নেই—এই কান্নায় ভান নেই কোনো। সমর্পণ ছুঁয়ে যাচ্ছে অপরাধবোধ, অপরাধের প্রবণতায় মিশে যাচ্ছে করুণ ক্ষমা প্রার্থনা। ব্যর্থতার দুঃখ নিয়ে আর একটু পরে ঠিকই চলে যাবে সে ; বিমানও ফেরত পাঠাতে পারবে। হয়তো ভুলেও যাবে। তবু, যতোই ভ্রান্ত হোক, এই মুহূর্তের নিরাপত্তাবোধ থেকে ওকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না।

এই সব ভেবে চোখের জ্বালাটুকু একাই সহ্য করতে লাগল বিমান।

॥ চার ॥

ভোরের ঘটনা

টেলিফোনটা বাজছে স্বাভাবিকের চেয়ে কম জোরে। থেমে, থিতিয়ে, ক্লেশে। মনের ভুল কি না বোঝা যায় না। এমনও হতে পারে, অচৈতন্য থেকে চৈতন্যে পৌঁছে দেবার প্রক্রিয়ায় শব্দ হারিয়ে ফেলেছে সঙ্গতি—কানে যতোটা পৌঁছয় তার বেশিটাই এখন ছড়িয়ে পড়ছে পরিবেশে।

বিমান অনেকক্ষণ শুনল, কিংবা, কানে এসে পৌঁছুনোর মুহূর্তটিই ছড়িয়ে পড়ল বিপুল সময়ে। এ-বাড়িতে প্রায় প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই টেলিফোন আছে ; শব্দটা তারই ঘরে কিংবা অন্য কোথাও বুঝতে যেটুকু সময় লাগে, শুধু সেইটুকু সময় অপেক্ষা করে উঠে বসল বিছানায়। বেডস্যুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঘড়ি দেখল। দুটো পঁচিশ। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও সে জেগেছিল—কিছু দিন ধরেই যেমন চলছে, কখনো পায়চারি করে, কখনো বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসে, আর সিগারেট পুড়িয়ে, ঘুমের অভাবে যেমন তেমন করে পার করে দিচ্ছিল সময়টা। হয়তো ইতিমধ্যে তন্দ্রা এসেছিল একটু। উঠতে গিয়ে বিছানার চাদরের ওপর অর্ধসমাপ্ত সিগারেটের টুকরোটা আবিষ্কার করল সে, চোখে পড়ল আধুলি আকারের একটা পোড়া দাগ। গ্রাহ্য করল না। টেলিফোনটা বাজছে, বেজেই চলেছে তখনো—সেই শব্দে শূন্যতা ও আতঙ্ক মেশানো অদ্ভুত একটা অনুভূতি ছড়িয়ে গেল শরীরে। কিছু না ভেবেই ব্যস্ত সে ছুটে গেল সেই দিকে। কাঁপা হাতে তুলে নিল রিসিভারটা।

'হ্যালো— !'

'বিমানকাকু ? আমি খুকু—'

রক্তের খাপছাড়া প্রবাহ থেকে নিজেকে টেনে তুলল বিমান। সংযত গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি, বল— ?'

'বাবা—', বলতে গিয়ে চুপ করে গেল সুদেষ্ণা। সময় নিল। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নার্সিং হোম থেকে ফোন এসেছিল এখুনি। আমাদের যেতে বলল—'

অত্যন্ত স্পষ্ট গলা সুদেষ্ণার, প্রতিটি কথাই উচ্চারণ করল আলাদা করে ; যেন এই কথাগুলি বলবার জন্যেই এতো দিন মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল সে। এখন অপেক্ষা করছে বিমানের জন্যে। বিমান জানে না কী বলবে। ঠোঁটদুটো সহ তার গোটা শরীরই কেঁপে উঠল অল্প ; বলার আগ্রহ থেকে মূক হতে হতে রিসিভারটা নিয়ে গেল এ-কান থেকে ও-কানে। তক্ষুনি কোনো জবাব এলো না মুখে।

'হ্যালো—বিমানকাকু— !'

'বল ?'

'ফোন ধরে থাকতে ভালো লাগছে না। আমরা কী করব ?'

সুদেষ্ণার গলায় স্বাদ নেই কোনো। এখনো স্থির আছে সত্যি, তবে যে-কোনো সময়ে রিসিভার নামিয়ে রাখতে পারে। সে যা পারে এই মুহূর্তে বিমানের পক্ষে সেটা না পারা শোভন নয়। দরকার শক্ত হওয়া। মনে হচ্ছে জ্যোতি তার কাজ করেই গেছে। এবারের দান বিমানের।

'মাকে বলেছিস কিছু ?'

'বলিনি। তবে—', সুদেষ্ণা থামল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'মা জানে—'

'ঠিক আছে। তোরা তৈরি থাক। আমি আসছি এখুনি—'

'আমরা তৈরিই আছি, বিমানকাকু।'

মাঝঘুমে হাই তোলার মতো ধীর আলস্যে মিলিয়ে যাচ্ছে সুদেষ্ণার গলা, যেন বিমানের কথায় ভুল ছিল একটু, শুধরে দিল। এরপর থেমে যাবে।

বিমানের তাকে আর একটু দরকার। দরকারবোধটা তীব্র হতেই সুদেষ্ণার শেষ কথাটা আঁকড়ে ধরে ব্যস্তভাবে ডাকল বিমান, 'খুকু— ?'

'বলো ?'

'মাকে দেখিস। আমি আসছি—'

রিসিভার নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে এলো বিমান ; দাঁড়াল, গভীর মনোনিবেশ দিয়ে ভাববার চেষ্টা করল কিছু। তেমন কিছু মনে পড়ছে না, মনে পড়ছে না তেমন কাউকে, আজ, এই মুহূর্তে জ্যোতির খবর পাবার জন্যে যে উদ্‌গ্রীব থাকতে পারে। বড়ো ছোট পৃথিবী ছিল জ্যোতির ; দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছিল আরো। শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকেছিল তিনজনে। বিমান জানে না, সেই তিনজনও শেষ পর্যন্ত ছিল কি না। যেভাবে খবরটা দিল খুকু তা থেকে বুঝবার উপায় নেই ইতিমধ্যেই মারা গেছে, নাকি মৃত্যু আসন্ন। শুরু করতে গিয়েও একবার থেমে গিয়ে অন্যভাবে শুরু করেছিল সে। এমনও হতে পারে, একমাত্র খুকুই জানে জ্যোতি ঠিক কোথায়। নির্মম হতে গিয়েও সাত-পাঁচ ভেবে আরও কিছুক্ষণের জীবন দান করে গেল তাকে।

কিন্তু, ঘটনা যাই হোক, ধরেই নেওয়া যায় খবরটা খারাপ। মধ্যরাতের টেলিফোন কি

কাউকে কোনো ভালো খবর দেয় কখনো !

ভাবতে ভাবতে ঘরের দরজাটা খুলল বিমান। গত কয়েক দিনের উদ্বেগটা নেমে গেছে—ফাঁকা জায়গাটা ভরিয়ে তোলার মতো ঠিক এখনই আর কোনো প্রসঙ্গ নেই। স্মৃতিও পাশ ফেরা। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বমুখে খোলা আকাশের দিকে তাকাল সে। ক্রমাগত অনিদ্রায় ছট্‌ফট করলেও ঠিক এইভাবে আকাশের দিকে তাকানোর কথা ভাবেনি কোনো দিন ; আজই কেমন আহত বোধ করল। এখন বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ ; কাটতে কাটতে ফালিতে এসে পৌঁছেছে চাঁদ ; দূর থেকে আরও দূরে সীমাহীন নীরবতা নিয়ে সংখ্যাতীতের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তারাগুলো। আশপাশের উঁচু-নিচু বাড়ি ও গাছগাছালি জুড়ে ভৌতিক স্তব্ধতা। শুধু হাওয়াই যা চঞ্চল ; আশ্বিনের লুকানো হিম থেকে আর্দ্রতা টেনে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে এলোমেলো। শূন্য চোখে ভিজে হাওয়ার আর্দ্রতা মিশিয়ে নিতে নিতে বিমান ভাববার চেষ্টা করল, জ্যোতি মারা গেছে—সুখে দুঃখে ঘৃণায় ও নৈঃশব্দ্যে এতো কাল খুবই কাছাকাছি ছিল তারা ; আজ এই বিচ্ছেদের মুহূর্তে অন্তত দু'এক ফোঁটা জল তার ফেলা উচিত। তবু, কোনো আবেগ সৃষ্টি হলো না শরীরে বা মনে। প্রায় আহ্নিকের তৎপরতায় সময়টা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল সে এবং ভাবল, যেতে হবে। মৃত্যু ও অভাববোধের মধ্যে পার্থক্যটা থাকতে থাকতেই তার পৌঁছুনো দরকার।

চট্‌পট তৈরি হয়ে নিল বিমান। দাঁত ব্রাশ করে হাত মুখ ধুলো, জামাকাপড় বদলে নিল। কেন জানে না, হঠাৎ মনে হলো এক ধরনের পবিত্রতার বোধ ঘিরে ধরেছে তাকে—ভিতর থেকে কেউ যেন তাড়া দিচ্ছে, শুদ্ধ হও। সম্পর্কটা রক্তের হলে আজই তার অশৌচ শুরু হয়ে যেত—এমনিতেই হবে হয়তো ; কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা এখন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য দিকে। বিমান জানে না, ঠিক কোন দিকে। এতো দিনের দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের একটা আদল গড়ে তুলছিল সে, জানে সেই আদলের সঙ্গে এই মুহূর্তের অনুভবের মিল কতোখানি। এই মুহূর্তের চনমনে অবসাদের ভিতর থেকে সে শুধুই যাওয়াটাকে স্পষ্ট করে তুলল।

সামনে গোকুল। বিমান বলল, 'শুনেছ ?'

জবাব না দিয়ে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল গোকুল। কখন যে উঠল এবং কখনই যে চা তৈরি করল, টের পাওয়া যায়নি।

চায়ের কাপটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও তবু দ্বিধা করল বিমান।

'খাবো ? উচিত হবে ?'

'খেয়ে নিন। এখন কতোক্ষণ চলবে ঠিক আছে কিছু !'

'না, থাক।' বলে মেঝের দিকে তাকাল বিমান, 'কতো কালের বন্ধু ! তিরিশ বছর ? নাকি তারও বেশি !'

খানিক চুপ করে থাকল গোকুল। তারপর বলল, 'একা যেতে পারবেন ?'

'পারব না ! নিশ্চয়ই পারব।'

বিমান দাঁড়াল না আর। এতোক্ষণে তার চোখের কোণদুটো জ্বালা করে উঠল অল্প ; গলার ভিতর, টের পেল, ছোট্ট একটু অস্বস্তি বেরুবার পথ খুঁজছে। আমল না দিয়ে দ্রুত সদরের দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজাটা খুলল এবং বন্ধ করল। সামনেই লিফ্‌ট কিংবা সিঁড়ি। অনায়াসে নেমে গিয়ে পুরনো অস্টিনটা বের করতে হবে তাকে। পৌঁছুতে পৌঁছুতে দশ কি বারো মিনিট। রাতের রাস্তা নিশ্চয়ই কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

এই সব ভেবে এগোতে গিয়েও এগোতে পারল না বিমান। সামনেই লিফ্‌ট কিংবা সিঁড়ি ; তবু, অনাবশ্যক স্মৃতির আবির্ভাবে আচমকা থেমে দাঁড়াল সে। চেনা চোখে তাকাল জায়গাটার দিকে। ব্রাশের তৈরি নেমপ্লেটে এখনো জ্বলজ্বল করছে অধীর দত্ত ও রত্নাবলী দত্ত। যাদের ফেরার কথা ছিল তারা আর ফেরেনি। হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই ছিল অসত্য ; এমনও হতে পারে, সত্যের ওপরে ভাগ্যকে স্থান দিয়েছিল তারা—এক রাতের হাহাকার আর কান্না নিয়ে যায়নি কোথাও। হয়তো নিয়ে যায় না। যায় কি ? দেওয়ালে অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগটা থেকে গেছে তবু!

অকারণ খানিক অপেক্ষা করে কান্নার শব্দটা ফিরিয়ে আনল বিমান। লঘু ও দূরাগত, নিরপেক্ষ ধ্বনির মতো শব্দটা জড়িয়ে গেল তার অন্যমনস্কতায়। এতো ব্যস্ততা নিয়ে শুরু করা সত্ত্বেও মন্থর হয়ে পড়ল সে। লিফ্‌টের বদলে সিঁড়ির পথ ধরল, নামল আস্তে আস্তে, সাবধানে পা ফেলে হেঁটে গেল গ্যারাজ পর্যন্ত, গাড়ি বের করল ; তারপর, গাড়ি স্টার্ট করার আগে সিগারেট ধরিয়ে নিল একটা। আনমনে ভাবল, জ্যোতি, তোর মৃত্যুর পর এই আমার প্রথম সিগারেট ; এই আমার প্রথম গাড়ি চালানো। আর খানিকক্ষণ পরে যখন তোর বাড়ি গিয়ে পৌঁছুব, তোকে বাদ দিয়ে সেই হবে আমার প্রথম নীপা আর খুকুর সামনে দাঁড়ানো। এইভাবেই মানুষ ভাবে, এইভাবেই দিন গোনে। ভাবতে ভাবতে, শুনতে শুনতে পুরনো হয়ে যায় ক্রমশ। তখন মনে পড়ে না শুরুর ঘটনাটা কীভাবে শুরু হয়েছিল। ঘুণ ধরে স্মৃতিতেও—।

কেন ভাবল বুঝতে পারল না। সিগারেটের ধোঁয়াতেই সম্ভবত ঝাপসা হয়ে আসছিল চোখদুটো, আলগোছে মুছে নিল বিমান। সামনে ফাঁকা রাস্তা। শক্ত দু' হাতে চেপে ধরল স্টিয়ারিংটা। স্মৃতির অনেকটাই ঘুণ-ধরা, কিছু বা বিস্মৃত। গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। তবু, বিমানের অহঙ্কারে বেঁকে যাওয়া ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটে আসতে লাগল ভিখিরির মতো।

কতো কথাই যেন মনে পড়ে! নিঃশ্বাস ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও জায়গা খালি থাকে না।

মনে পড়ছে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার দিনটির কথা। মনে পড়ছে, ওই ঘটনার দিন দুয়েক পরে তার অফিসের গেটের বাইরে জ্যোতির চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। মুখে দিন দুয়েকের জমে ওঠা দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল, ক্লান্ত ও ঈষৎ রক্তাভ চোখ, যেমন-তেমন পোশাক—যেন অশৌচ দশা থেকে উঠে এসেছে সদ্য। অনেক দিনের পরিচিত মুখ না হলে বিমান না চিনতেও পারত। সম্ভবত জ্যোতিও তাই ভেবেছিল। চেনার পর, তাই, তার অস্বস্তিটা বেড়ে গিয়েছিল আরও।

'কী ব্যাপার! এখানে!'

'তোমার জন্যে—মানে—', এগিয়ে আসা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুছোতে পারেনি জ্যোতি, সম্বোধনটাও গোলমাল করে ফেলছিল। বলল, 'তুমি কি বাড়ি ফিরছ?'

'বাড়ি!' কিছু রাগ ও কিছু অবাকভাব মিশিয়ে বিমান বলল, 'বাড়ি নেই। একটা আস্তানা জুটেছে—'

'ওই হলো।'

জ্যোতি ওইখানেই থেমে গেল। এমনভাবে তাকাল, যেন তার মনে জমে আছে অনেক কথা—বলতে পারছে না ; বিমান সময়, সুযোগ দিলেই বলবে।

ঠিক মনোভাবটি আঁচ করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিমান বলেছিল, 'নিশ্চয়ই ফিরে যাবার

কথা বলবে না ?'

'বললেই কি ফিরবে ?' এতোক্ষণের জড়তা কাটিয়ে নিজের নিজস্বতায় ফিরে এসেছিল জ্যোতি, 'কোথায় আছো দেখতে চাই—'

না বলতে পারেনি বিমান। এই স্বভাবটা তার চেনা ; চেনা বলেই নতুন করে আঘাত করতে সাহস হয়নি। খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল, 'চলো দেখবে।'

রাস্তা মিশে যাচ্ছে রাস্তায়, ফাঁকা বলেই সম্ভবত দূরত্ব বেড়ে চলেছে ক্রমশ। দূরত্বের শেষে দাঁড়িয়ে আছে নীপা আর খুকু ; কীভাবে আছে, কী ভাবছে, এখান থেকে তা বোঝা সম্ভব নয়। হয়তো ভাবছে না কিছুই ; টেলিফোন বেজে ওঠার আগে যেখানে ছিল, হয়তো সেইখানেই জমে আছে ভাবনাগুলো। বিমানের আবির্ভাব কি চিড় ধরাবে তাতে ? বিমান জানে না। সম্ভবত খুকুকে নিয়ে ভয় নেই কোনো। সেদিনের ঘটনার পর এক লাফে অনেকটা বয়স বাড়িয়ে নিয়েছে যেন ; গম্ভীর হয়ে গেছে বেশ। কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও কথা বলে মেপে, জানে কোনখানে আড়াল করতে হয় নিজেকে। হয়তো দেখতে দেখতে নীপার মনে পৌঁছে যাবে সে। 'কী পেয়েছি যে হারাব !' নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল নীপা, না পাওয়ার ভাবনাটাই সেদিন তাকে দুলিয়েছিল বেশি। হারানোর ভিতর দুঃখ চেনা যায় না। বুঝতে পারবে না শোক কোথায়। ভয় নীপাকে। জ্যোতি বলেছিল, 'নীপা যেন না জানে আমি এসেছিলাম তোর কাছে। তা হলে আমি আরও ছোট হয়ে যাবো।' বিমান, জায়গা কি তুমিও খুঁজে পেয়েছো ?

উল্টো হাওয়ায় শ্লথ হয়ে আসছে গতি। দেরি হতে পারে ভেবে স্টিয়ারিংয়ের ওপর আরও ঝুঁকে এলো বিমান, চোয়াল শক্ত করল। সামনে জ্যোতি। জল মিশে যাচ্ছে জলে, কোনটা আগে কোনটা পরে আর তা চেনা যায় না।

'নীপা তোকে ভালোবাসে, বিমান।'

'সেটা কোনো খবর নয়—।'

'তোর কাছে নয়, কিন্তু আমার কাছে ?' বিবর্ণ মুখে ফুটে উঠেছে বিরুদ্ধ আভা, এই একটা জায়গায় এসে একাকার হয়ে যায় দুঃখ ও ক্রোধ। জ্যোতি বলল, 'তুই বুঝবি না। বুঝতে পারতিস বিবাহিত হলে—স্বামী হলে—। অহঙ্কার মানুষকে বড়ো ছোট করে দেয় !'

'বড়োও করে—'

'করে হয়তো। আমি জানি না।' উচ্ছন্ন গলা, বিবেকের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলছে জ্যোতি ; এখন আর ওকে গেটের বাইরে অপেক্ষারত মনে হয় না। গাঢ় গলায় বলল, 'নীপার জন্যে নয়, খুকুর জন্যে নয়—গোটা জীবনটা নষ্ট করলি আমার জন্যে ! তুই কী পেলি, বিমান ?'

'আমার পাওয়া তুমি দেখছ কী করে !'

জ্যোতি হেসে উঠল হঠাৎ ; শব্দে ফুটে ওঠার আগে সংযত করল নিজেকে।

'তুই ভগবান ন'স, বিমান। তোর অহঙ্কার বড়ো বেশি। মার খেলে বুঝবি।'

হয়তো ঠিকই বলেছিল জ্যোতি, সে ভগবান নয়। ভগবান হলে এই মুহূর্তটিকেও সে পেরিয়ে যেতে পারত অনায়াসে, কোনো দ্বিধা না রেখে। হাত কাঁপত না, অদৃশ্য ধোঁয়ায় জ্বালা করত না চোখ—দশ কি বারো মিনিট ভেবে ছুঁতে চেয়েছিল যে-সময়কে, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে এখন তাই মিশে যেত না বিপুল নিঃসময়ে। অনেক দিন আগে বলা, তবু মনে হচ্ছে জ্যোতির কথাই ঠিক ; যে-অহঙ্কারবোধ থেকে সব প্রাপ্তিকেই তুচ্ছ ভেবে দেওয়াল

তুলেছিল সে—জ্যোতিই ছিল সেই দেওয়াল। জ্যোতি যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালটাও ভেঙে পড়েছে।

ঘন করে নিঃশ্বাস টানল বিমান, আবার ছেড়ে দিল। আর একটু এগোলেই সেই রাস্তা, সেই বাড়ি। রাতের স্তব্ধতায় কুকুরের অতর্কিত চিৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও ; হাওয়ার শব্দে মিশে যাচ্ছে এঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন। এসবে নতুনত্ব নেই কোনো। ক্ষমাহীন পৃথিবী, একটি মানুষের বিদায় কোনো চিহ্নই রাখেনি সেখানে। হয়তো, এখন চিহ্নটুকু ধরে রাখার সব দায়িত্বই তার। না, তা হবে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে ফিরিয়ে দিল বিমান এবং ভাবল, সেও বদলাবে না, ভাঙবে না—সব যেমন ছিল তেমনিই চলবে। ভাবতে ভাবতে গাড়ির গতি কমিয়ে আনল সে।

কলিং বেলে হাত দেবার পরিবর্তে আস্তে দরজায় টোকা দিল বিমান। ছিটকিনি নামার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক হলো দরজাটা। সুদেষ্ণা। নিজেকে সংযত করার জন্যে সময় নিল কি নিল না, তার আগেই এগিয়ে এলো সুদেষ্ণা। শূন্য চোখ তুলে তাকাল বিমানের দিকে।

বিমান জানে না সুদেষ্ণা এখন কী করবে। একটা হাত ওর মাথায় রেখে, আর এক হাতে ওকে কাছে টেনে নিল সে। বলল, 'আমি তোর বাবার চেয়ে বড়ো, খুকু। আমি এখনো আছি—'

জবাব পেল না। মুখটা আড়াল হয়ে আছে বুকে, শরীরহীন নিঃশব্দ কান্নায় নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে সুদেষ্ণা—বিমান ঠিকই চিনল। ঠিক সেদিনেরই মতো, তবু একটু আলাদা। কান্নাটা থিতোতে দিয়ে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল বিমান। ভয় নীপাকে, অল্প আগেই সে ভেবেছিল।

'মা কোথায় ?'

বিমান এগিয়ে যাচ্ছিল, সুদেষ্ণা বলল, 'একটু দাঁড়াও, বিমানকাকু।' কাছে এসে বলল, 'কী বলবে এখন মাকে! ফোন আসার পর থেকেই কেমন যেন করছে। সিঁদুর কৌটোটা বেঁধে রেখেছে আঁচলে। একটাও কথা বলেনি, একবারও কাঁদেনি !'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনল বিমান। তারপর স্বগতোক্তি করার ধরনে বলল, 'কাঁদবে—এরপর কাঁদবে।'

দু'এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ঘরে ঢুকল বিমান। খাটের বাজুতে কপাল নামিয়ে চুপচাপ বসে আছে নীপা ; অদ্ভুত তার বসার ধরন, ভঙ্গিতে ভঙ্গি নেই কোনো। বিমানের উপস্থিতি টের পায়নি এমন হতে পারে না। কোনো চাঞ্চল্য দেখাল না তবু। সুদেষ্ণাকে বলার কথাটা সহজেই এসে গিয়েছিল মুখে, ওকে লক্ষ করতে করতে বিমান ভাবল, নীপাকে কী বলবে ! জ্যোতিকে বুঝলেও, নীপা কোনো দিনই স্পষ্ট হয়নি—স্পষ্ট করে বলতে গিয়েও থেমে গেছে বারবার। বলার কথাগুলো এখনো বেরিয়ে আসার পরিবর্তে ক্রমাগত অর্থ বদল করতে লাগল বুকে।

নীপাই উঠে দাঁড়াল। নিজেকে সামান্য গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, যেন লক্ষই করেনি বিমানকে। তারপর থেমে দাঁড়াল, দু'পা এগিয়ে এলো বিমানের দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মনে হলো বিমানের, ঘৃণায় কিংবা শোকে ভাঙার ধরনে পরিবর্তন হয় না কোনো। কাঁধটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চওড়া করে নীপার ভাঙনটাকে স্বতঃস্ফূর্ত করে দিল সে।

'সব ভুল, বিমানদা, এতো দিন তোমাকে যা বলেছি সব ভুল—', শান্ত জলে ঢিল পড়ার

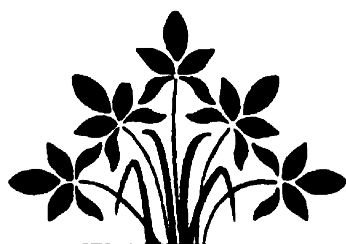
মতো কান্নার আবেগে কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে ; নীপা বলল, 'আজ বুঝতে পারছি ও আমার কতোখানি ছিল !'

একই হাতে আজ ওকে আড়াল দিল বিমান। অস্ফুট গলায় বলল, 'আমি জানতাম—'

প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে নীপা, তবু নতুন করে জড়িয়ে যাচ্ছে কান্নায়। হয়তো আরও কিছুক্ষণ কাঁদবে।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সুদেষ্ণা। বয়সের ভার তার গলায় এনেছে স্থবিরতা, এতো কাছে দাঁড়িয়েও একবার চিৎকার করার কথা ভাবল না। বিমান ভাবল, তফাতটা, সম্ভবত, সিঁদুর থাকা না-থাকা নিয়ে। স্থির হতে পারল না। তখন, নীপাকে সুস্থ হবার সময় দিয়ে বলল, 'আয়, খুকু। আমাদের যেতে হবে—'

অদ্ভুত সংযত আর দয়ালু তার গলার স্বর, আবেগহীন আর নিষ্কম্প ; সুখের স্মৃতির মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে স্নায়ুর পরতে পরতে। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে আসছে হাল্‌কা শীত-ছোঁয়ানো ভোরের হাওয়া। কেন জানে না, আজ, এই মুহূর্তে, এক রকম পূর্ণতায় ভরে যাচ্ছে মন ; নিজেরই কণ্ঠস্বর অন্য রকম অর্থ নিয়ে ফিরে আসছে নিজের কাছে, চাইছে পুনরাবৃত্তি ! জ্যোতি শুনলে হাসত।



সবুজ গন্ধ

সবুজ গন্ধ

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৮৯ (এপ্রিল ১৯৮২)
প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মূল্য : ৯·০০ । প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

উৎসর্গ :
শ্রী অরূপকুমার সরকার
প্রীতিভাজনেষু

॥ এক ॥

সঙ্গে নিয়ে কিংবা পাশাপাশি হাঁটলে এক রকম গন্ধ পাওয়া যায়। বৃষ্টিভেজা সবুজের আর্দ্রতা মেশানো, অল্প আরকের ছোঁয়া লাগা কিংবা হঠাৎ উড়ে আসা ভোরবেলার হাওয়ায় যেমন—স্নিগ্ধ ও রহস্যময়, ঠিক কেমন বোঝা যায় না। তবু চেনা যায়। চিনিয়েছিল মানসী, সেও অনেক দিন আগেকার কথা। আবির্ভাবটুকু চিনে নিতেই যেটুকু সময় লেগেছিল, তারপর আর হারায়নি। মানসী সঙ্গে থাকলেই পাওয়া যেত।

অনেক দিন আগে একদিন দীপঙ্করের কথা শুনে শব্দহীন ঠোঁট ছড়িয়ে খুব হেসেছিল মানসী। মুখে আঁচল চাপা দেবার কথা নয়, তবু দিয়েছিল। যখন তাতেও কুলোয়নি, ব্যাগ খুলে লবঙ্গ বের করে মুখে দিতে দিতে বলেছিল, 'লবঙ্গ খাবেন ? নিন—'

হাতে ছোঁয়া লাগলে শরীর জ্বলে ওঠে, কিংবা ঠাণ্ডা হয়ে যায় আরও। দীপঙ্কর বলেছিল, 'একটা কথার কথা বললাম, এতে হাসির কী আছে!'

তারা যে-রাস্তায় হাঁটছে পাশাপাশি, আশপাশ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে ক্রমাগত, কেউ দেখছে না, কেউ দেখছে, কেউ বা একটু বেশিই দেখছে, বোধ হয় তখনই তা খেয়াল করেছিল মানসী। চপল ভাবটা কাটিয়ে সরে এসেছিল আরও একটু কাছে, যতোটা কাছে এলে দুজনের কথা দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তখন বিকেল। এমনও হতে পারে সন্ধ্যা নামছিল ক্রমশ। এতো দিন পরে সব ঠিকঠাক ধরে রাখা যায় না।

'আমি একটা অন্য কথা বলব ?'

'কী ?'

'আজকে আপনার নাকটা কেমন যেন একটু বড়ো লাগছে ; নাকের ফুটো দুটো—'

'তার মানে!'

'সত্যিই। না হলে গন্ধটা পেতেন না।'

'কী মেখেছ! সেন্ট, না আতর ?'

'তাই মনে হচ্ছে ?'

'অন্য দিন পাই না, আজ পেলাম। তাই জিজ্ঞেস করছি—'

'ভালো, না খারাপ ?'

'গন্ধ খারাপ হয় না। শুধু তার রকমফের থাকে—'

শুকনো মাটি। অনেক দিন জল না পেয়ে ফাটল ধরেছে। স্মৃতি খুঁড়লে ঝুরঝুর করে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তবে, যতো দূর মনে পড়ে, সেদিন, তখন, সেই মুহূর্তে, দীপঙ্করের কথা শুনে হঠাৎই চুপ করে গিয়েছিল মানসী। নিঃশব্দে আরও খানিকটা হেঁটে গিয়ে

বলেছিল, 'আমিও পেলাম—'

'কী!'

'গন্ধ নয়।'

'তবে ?'

'বলব না।'

ঘাড় বেঁকিয়ে, আচ্ছন্ন চোখে, না দেখেও একবার দীপঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েছিল মানসী। একটুক্ষণের জন্যে আশ্চর্য অপরিচিত লেগেছিল ওকে। যেন শাড়ির পাড়ে জড়িয়ে যাচ্ছে পা ; চলার গতিও কি মন্থর হয়ে পড়েছিল ? হতে পারে, নাও হতে পারে। এতো দিন পরে সব ঠিক ঠিক মনে থাকার কথা নয়।

পরে বলেছিল, 'কিছুই মাখিনি। কিসের গন্ধ, আমি কী করে বুঝব !'

শুধু আবেগই পারে গলার স্বর এমনভাবে ভেঙেচুরে দিতে। কিছু একটা ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে, সেটা পুরোপুরি অনুভব করার আগেই, সেদিন, হঠাৎ চিবিয়ে-ফেলা লবঙ্গের স্বাদে গলা জড়িয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করের। গিয়েছিল কি ?

'দীপঙ্করদা ?'

'হ্যাঁ—, বলো—'

ঠিক সময়েই কথাটি শুনতে পেয়েছিল দীপঙ্কর। এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায় ফিরে আসতে যেটুকু সময় লাগে তার আগেই দ্রুত ভঙ্গিতে সে ফিরিয়ে আনল নিজেকে। পাশে তাপসী। হাঁটছে। তাকাতে তাকাতে ভাবল, তেমন করে কিছু বলার আগে মানসী তাকে দীপঙ্করবাবু বলে ডাকত। কতোবারই আর ! সে এমন কিছু না।

তাপসী পিছিয়ে পড়েছিল। বৃষ্টি থামলেও আকাশের থমভাব যায়নি। এখন যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়েই দীপঙ্কর বলল, 'কিছু বলছিলে ?'

'লবঙ্গ খাবেন ?'

হাল্‌কা লালের আভা মেশানো সাদা হাতের তালুর ঠিক মাঝখানে কালো পোকার মতো একটা কিছু, লবঙ্গ বলে চেনার আগে দীপঙ্কর ওর হাতের রেখাগুলো দেখল। এক একজনের হাতের রেখা এক এক-রকম হয়।

'না, থাক। তুমি খাও।'

'আমি তো খাচ্ছিই—,' টুক করে লবঙ্গটা মুখে ফেলে দিয়ে তাপসী বলল, 'এই নিয়ে তিনটে হল।'

'ভালোই তো ! মাঝে মাঝে স্বাদ বদলাতে খারাপ লাগে না—'

একটা ট্রাম চলে যাচ্ছে, উল্টো দিক থেকে আর একটা আসছে। কুক কোম্পানির ঘড়িতে চারটে পঁয়ত্রিশ। ভিড়। ট্রাফিক পুলিস হাত নামানোর সঙ্গে সঙ্গে নৈঃশব্দ্য থেকে অতর্কিতে ছিটকে বেরুল শব্দ। একসঙ্গে দুটো ডাবল ডেকার, তিনটে মিনিবাস, একটা লিমিটেড, একটা অ্যাম্বুলেন্স এবং একটার পর একটা গাড়ি দৌড় শুরু করতে না করতেই পোড়া ডিজেল আর মবিলের গন্ধে ভারী হয়ে এলো নিঃশ্বাস। ভিড়টা এগিয়ে এলো কাছে। পাশে তাপসী। একা নয়। একা ?

'রাত দুটোর সময় একদিন এইখানে এসে দাঁড়াবো—।' একদিন, ঠিক কবে মনে নেই, তবে অনেক দিন আগে, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, ট্রাম কিংবা বাসের অপেক্ষা করতে করতে, মানসী বলেছিল, 'তখন ট্রাম থাকবে না, বাস থাকবে না—শুধু অন্ধকার

থাকবে, অনেকটা জায়গা খালি পড়ে থাকবে—।' ওকে থামিয়ে দিয়ে দীপঙ্কর বলেছিল, 'একা ?' মানসী বলেছিল, 'একা কেন !'

'দিদি বলেছিল, সিগারেট ছাড়ার জন্যে আপনি নাকি লবঙ্গ ধরেছেন ?'

'ছাড়িনি। আবার ধরেছি—'

অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম ধরার মতো একটা অবলম্বন খুঁজে পেল দীপঙ্কর। ট্রাউজার্সের পকেট থেকে তোবড়ানো প্যাকেটটা বের করে একটা গুঁজে নিল ঠোঁটে। দেশলাই জ্বালল। হাসবে না ভেবেও হাসল।

তাপসী তাকে দেখছে না। বৃষ্টির মধ্যে এসেছিল, অভ্যাসে কয়েকবার মাথায় হাত বুলানো সত্ত্বেও কিছু কিছু বৃষ্টির রেণু এখনো লেগে আছে চুলে। কাঁধের ওপর শাড়ির আঁচলটা ভিজে, ব্লাউজের হাতাটা ভিজে সেঁটে আছে বাহুর সঙ্গে। আর কিছু লক্ষ করার আগেই তাপসীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো।

'দিদি জানে না আপনি আবার ধরেছেন—'

'হয়তো জানে—'

'কী করে ! বলেছেন ?'

'না। গন্ধ লুকোনো যায় না—'

দ্রুত হাঁটার দরুন পা থেকে চটিটা এগিয়ে গিয়েছিল অল্প ; দাঁড়িয়ে, আবার সেটা পায়ে গলাতে গলাতে তাপসী বলল, 'সিগারেটের গন্ধ আমার খুব ভালো লাগে—'

'আচ্ছা !'

বিস্বাদ লাগছিল। থেমে পড়ার জন্যেই একটা সুযোগ পেল দীপঙ্কর। সিগারেটটা ফুটপাথে ফেলে ঘষে দিল জুতো দিয়ে।

'বললাম বলে !'

'না। হাঁটতে হাঁটতে ধোঁয়া গেলা যায় না। বুকে লাগে।'

'তা হলে খাবেন না।'

শুনেও শুনল না দীপঙ্কর। সিগারেট-শূন্য শুকনো ও অস্বস্তিকর ঠোঁটে জিব বুলিয়ে ও ভাবল, তাপসী যেন ইচ্ছে করেই একটু আস্তে হাঁটছে। পায়ের জড়তাও হতে পারে। সোজা বা উল্টো দিকে বাসে বা ট্রামে যারা বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে তারাই মনে করিয়ে দেয় এই মুহূর্তে অসহায় বোধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। দৈবাৎ একটা ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়াবে, তেমন সম্ভাবনাও কম। যদি আসে—

দিশেহারার মতো সামনে চোখ তুলে সেই সম্ভাবনার দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলে ধরল দীপঙ্কর। নেই। ছ'টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছুতে না পারলে ভিজিটিং আওয়ার্স পার হয়ে যাবে। জোরে হাঁটলে আধ ঘণ্টার মধ্যে এই দূরত্ব অতিক্রম করা কিছুই কঠিন নয়। তাপসী কি পারবে ? তখন, এলোমেলো অস্বস্তির মধে' সে ভাবল, তাপসী সঙ্গে আছে বলেই আজ সে দ্রুত হতে পারছে না ; না হলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর জন্যে এতোক্ষণে যে-কোনো একটা উপায় ধরে নিত সে। হয়তো পৌঁছেও যেত। সেই রকমই উচিত ছিল।

'এতো কাল যার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে এখন তার জন্যে দু' ঘণ্টা সময়ও দিতে পারো না কেন !' কালই বলেছিল মানসী, 'চলে যাবো বলে তোমার উৎসাহ কমে যাচ্ছে—!'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিতে পারেনি দীপঙ্কর। সঙ্গে থাকার একটা সুবিধে আছে, সময়কে থামিয়ে কিংবা ভাগাভাগি করে রাখা যায়। একার ভার দ্বিগুণ হয়ে চেপে বসে

বুকে ; সময় ও দূরত্ব ক্রমশ সৃষ্টি করে আরও বেশি প্রতিবন্ধকতা—কমে আসে নিঃশ্বাসের জোর। দূরত্ব কমানোর জন্যে প্রাণপণে ছোটা ছাড়া উপায় নেই জেনেও ছুটতে গিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে হাত-পা। উদ্বেগে রক্তও কি পাতলা হয়ে যায় না।

'রোগটা সংক্রামক, মানসী', বলতে পারত, 'দেখছ না, আমিও ক্রমশ রুগ্‌ণ হয়ে পড়ছি!'

পারেনি। কেবিনের ভিতর আর কেউ না থাকলেও দরজা ও জানলার পর্দা আর দেওয়ালের সাদা নিষেধের আড়াল তুলেছিল তার চারিদিকে। বলার কথাটা গলার মধ্যেই ঢেউ তুলে নেমে গিয়েছিল বুকে। নিজেকে আড়াল করে, তখন দীপঙ্কর বলেছিল, 'রোগ নিয়ে দার্শনিকতা ভালো নয়, মানসী। হাঁটছ, কথা বলছ, ঘুরে বেড়াচ্ছ কেবিনের মধ্যে—এসব কথা বলার মতো কী হয়েছে তোমার!'

মানসী হেসেছিল। খুব স্বচ্ছন্দে নয়। হাসির ছলে ফ্যাকাশে ঠোঁটের কোণ দুটো কুঁকড়ে উঠেছিল অল্প। জানলার বাইরে ক্রমশ অস্বচ্ছ বিকেলের আলোর দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যাতে তার নীরক্ত মুখের উচ্ছ্বাসহীন আবেগ স্পষ্ট ধরা পড়ে দীপঙ্করের চোখে।

খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল, 'মরার জন্যে সব সময় উপলক্ষের দরকার হয় না। কী বোঝাচ্ছ আমাকে!'

অসুখ মানসীকে আরও কঠিন করে দিয়েছে, গলা কাঁপলেও শরীর দোলে না। গত প্রায় এক মাস ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছে দীপঙ্কর। হাসপাতালে মানসীর সমগ্র পরিবেশ জুড়ে স্প্রে-করা কৃত্রিম সুস্থতার গন্ধের মধ্যে নিজের সমগ্র শরীরে ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় পরিস্ফুট করে তুললেও আজকাল কোথাও খুঁজে পায় না সেই বিচিত্র সবুজ গন্ধ। ভীত ইঁদুরের তৎপরতায় তখন গুটিয়ে নিতে হয় নিজেকে। কথা হারিয়ে যায় ; নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে এলোমেলো। প্রতিদিনই, প্রায় তখনই, নির্দিষ্ট কাঁটায় পৌঁছে ফুরিয়ে যায় সময়।

চলে আসার আগে দীপঙ্কর বলেছিল, 'কাল থেকে সময়ের আগেই এসে পৌঁছুবো—'

'যদি পারো এসো।'

কথাগুলো এখনো লেগে আছে কানে। শুধু এখন বলে নয়, কাল মানসীর কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই কথাগুলো ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে। যেন ওই তিনটে শব্দের তাৎপর্য দিয়ে মানসী তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল দু' পায়ে—হয়তো ওই শব্দগুলির ভিতর দিয়েই অসুখের বিষাদ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেও দাঁড়াতে চেয়েছিল মানসী।

আর পিছনে তাকায়নি দীপঙ্কর। তবু, ক্লান্ত পায়ে সে যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, হঠাৎই তার মনে হয়েছিল, হাসপাতালের সিঁড়ি ও দেওয়াল তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে একই কথা। বিদায় অভ্যর্থনা পাবার জন্যে বসে নেই কোথাও ; সুস্থতার প্রতিশ্রুতিময় ওষুধের গন্ধে যতোই ভারী হোক এখানকার হাওয়া, তবু ওরই মধ্যে থেকে টেনে নেওয়া যায় বেঁচে থাকার আশ্বাস। বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী—তার উদার মায়াবী হাত বাড়িয়ে সারাক্ষণ চেষ্টা করছে সকলকে আগলে রাখতে, বড়ো কষ্ট এখান থেকে চলে যাওয়ায়। তারপর, হাসপাতালের গেট পেরিয়ে রাস্তায় এবং আরও দূর পর্যন্ত রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন একা হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ অনুভব করেছিল দীপঙ্কর, দূর থেকে কাছে, আরও কাছে, ক্রমশ এগিয়ে আসছে তীব্র এক সবুজ গন্ধ। নির্বিশেষ আলোয় চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছে তাকে। ইচ্ছে করলে এখন সে সেই মায়াময় গন্ধে চোখমুখ ভাসিয়ে ডুবে যেতে পারে অপার্থিব স্নিগ্ধতায়। নিজস্ব দুঃখে চোখ দুটো ভরে উঠেছিল জলে।

যেতে যেতে এই মুহূর্তেও চোখের জ্বালা এড়াতে পারল না দীপঙ্কর। সবুজ গন্ধের

আচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাবল, তাপসী মানসী নয়। এটাই বাস্তব বলে গন্ধের আবির্ভাবে সাড় নেই কোনো। হয়তো আর কোনো দিনই থাকবে না। থাকবে না ?

নির্ভেজাল এই বাস্তবকে দীপঙ্কর এখন সহজেই মেনে নিতে পারে। একটা সিগারেট ধরানোর ইচ্ছে হয়—ধরায় না, মনে পড়ে একটু আগেই সে তাপসীকে অন্য কথা বলেছিল। যেতে যেতে পরিষ্কার চোখে নিজের চারপাশটা দেখে নিল সে। অফিস পুরোপুরি ছুটি হতে আরও কিছুক্ষণ দেরি আছে, তবু আশপাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকজনের সংখ্যা কিছু কম নয়। ক্রমাগতের শব্দ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রাম ও বাসগুলি, বাদুড়ঝোলা ভিড়ের বহরে একটি থেকে আর একটিকে চেনা যাচ্ছে না আলাদা করে। এরই মধ্যে দিয়ে সে হাঁটছে—সে হাঁটছে বলেই তাপসীও হাঁটছে ; চুপচাপ—প্রায় তারই অংশ হয়ে, ট্রেলার গাড়ির ধরনে, নিজস্ব কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। হাঁটতে হাঁটতেই রাজভবন ও ট্রাফিকের জট পেরিয়ে পৌঁছে গেল রেড রোডে। ঘড়ি দেখল। চারটে পঁয়তাল্লিশ। সামনে ময়দান, তারপর ভিক্টোরিয়া, তারপর রাস্তা। চোখে না দেখলেও সচেতনভাবে একটা গোটা দৃশ্য পেরিয়ে এলো দীপঙ্কর।

'তপু , তোমার বোধ হয় হাঁটার অভ্যাস নেই—'

'আমাকে বলছেন !'

নিশ্চয়ই অন্যমনস্ক ছিল। ভব্যতা বাঁচিয়ে যতোটা সম্ভব দূরত্ব কমিয়ে দীপঙ্কর ওর কাছাকাছি চলে এলো। চুলের ওপর ইতস্তত ছড়ানো বৃষ্টির রেণুগুলো এখন আর দেখা যায় না। তাপসীর মুখে ছায়া। আলোর তারতম্যে কিনা বোঝা যায় না, তবে, হঠাৎই মনে হলো দীপঙ্করের, দূরত্ব যতো কমছে ততোই আরো গম্ভীর হয়ে উঠছে তাপসী।

'আরও একটু জোরে হাঁটলে আমরা বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারব।'

'চলুন—'

তাপসী হঠাৎই জোর বাড়িয়ে দিল ; এমনভাবে হাঁটতে শুরু করল যাতে মনে হয় এই মুহূর্তে ঠিক এইভাবেই তাকে হাঁটতে বলা হয়েছে।

দীপঙ্কর না হেসে পারল না। তবু ভাবল, সময় চলে যাচ্ছে, এটা খেলার সময় নয়। যতোটা দ্রুত সম্ভব এগিয়ে এসে তাপসীকে ধরে ফেলল।

'এভাবে ছুটলে তোমাকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে—'

'ছুটতেই তো বললেন !'

'তা বলিনি। বলেছি জোরে হাঁটতে—'

থেমে গিয়ে আকাশে তাকাল দীপঙ্কর। এক পশলা জোর বৃষ্টির পর আকাশ ফরসা হয়ে এসেছিল, এখন আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে। তারা যেদিকে, ঠিক সেদিকে বহু দূর দিগন্তে একটা ঝলসানো বিদ্যুতের রেখা জমাট বাঁধা মেঘের দেওয়াল চিরতে চিরতে হারিয়ে গেল চকিতে। চাপা মেঘের গর্জনও কান এড়াল না দীপঙ্করের। হাওয়ায় ভিজে-ভিজে ভাব। হয়তো এখুনি আবার ঝুপঝুপ করে নেমে পড়বে বৃষ্টি। দেরি হলেও খানিক আগের বৃষ্টিতে ছিল অফিসের আড়াল, ছাদ ; এখন গাছপালা, মাঠ আর রাস্তা ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই। শুধু তাপসী নয়, আজ সব কিছুই তার বিরুদ্ধে। 'কাল থেকে সময়ের আগেই পৌঁছুব—' এ-রকম কোনো প্রতিশ্রুতি কি সে দিয়েছিল মানসীকে ? হাওয়ায় কাঁপছে কেবিনের সাদা পর্দা, অর্থহীন অধৈর্য নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানসী কি ভাবছে, মৃত্যুর জন্যে সব সময় উপলক্ষের দরকার হয় না !

ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করল দীপঙ্কর এবং ভাবল, এখন তাপসীর কথা না ভাবলেও চলে। প্রায় একা আরও খানিকটা এগিয়ে এসে আবার ঘড়ির দিকে তাকাল সে। যদি ইতিমধ্যে বৃষ্টি না নামে, তা হলে সে ঠিকই পৌছে যাবে।

'অতো তাড়া করছেন কেন!' তাপসী এগিয়ে এলো, 'আমরা ঠিকই পৌঁছে যাবো।'

'বৃষ্টি আসছে।' যা বলতে চায় তা না বলে নিজেকে আড়াল করল দীপঙ্কর, 'তাড়া করিনি—!' বলতে বলতে নিঃশ্বাস নিল। সম্ভবত সে এখন একটা সিগারেট ধরাতে পারে। কিছু ভেবে থেমে গেল। একটু আগেই তাপসীর একটা ইচ্ছাকে সে পায়ের তলায় পিষেছিল, ইচ্ছে করে নয়। তখন মেনে নিলেও তেইশ বছর বয়সে পৌঁছুনো তাপসী নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভুলতে পারবে না সহজে, অর্থ করে নেবে। সুযোগ পেলেই প্রত্যুত্তর দেবে। মানসীর সঙ্গে চার বছরের মেলামেশায় সে কম শেখেনি। অভিমানে মেয়েদের জিব ধারালো হয়ে ওঠে।

নিজেকে গুটিয়ে নিল দীপঙ্কর। কথা পিছিয়ে দেয়। চিন্তার সঙ্গে ঠোঁট ও জিব জুড়ে দিলে মন্থর হয়ে পড়ে গতি। যেমন হচ্ছে ; সে যতোবারই এগোতে চাইছে—চলতে চাইছে সময়ের আগে আগে, প্রায় ততোবারই কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে। এমন নয় যে এগুলো খুবই জরুরী আলাপ। এই কথাগুলো না থাকলেও জীবন একই রকম থাকত, আজকের দিনটারও পরিবর্তন হতো না কোনো। কিন্তু, সম্ভবত সে পৌঁছে যেত মানসীর ইচ্ছেমতো। যেত না কি ?

হয়তো। হয়তো না।

ভাবনাগুলো হয়ে যাচ্ছে এলোমেলো। কেন কে জানে, নিজেরই মনে হলো, ঠিক সরলরেখায় সে হাঁটতে পারছে না।

তাড়াতাড়ি বেরুবে বলে আজ সে তিনটে থেকেই তৈরি হচ্ছিল। বৃষ্টি নামল মুষলধারায়। সেই বৃষ্টির মধ্যে চোখ চালিয়ে নিরুপায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই খেয়াল হয়েছিল দীপঙ্করের, স্বচ্ছ কাচের জানলাটা ঝাপসা হয়ে গেছে—ওই স্তব্ধতায় ঘা খেয়ে দু হাতও এগোতে পারে না দৃষ্টি, তিন দিকে কাঠের পার্টিসান ঘেরা জায়গাটা আরও ছোট হতে হতে ক্রমশ ঘিরে ধরছে তাকে। এমন হবে একটু আগেও তা ভাবতে পারেনি। অস্বস্তিতে ছটফট করতে করতে দীপঙ্কর ভেবেছিল যদি আর কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি না থামে, তা হলেও সে বেরিয়ে পড়বে।

তখনই বেয়ারা এসে স্লিপটা বাড়িয়ে দেয় হাতে : তাপসী।

বৃষ্টির চেয়েও দূরত্বময় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি দীপঙ্কর।

জলে ভাসানো চোখ-মুখ নিয়ে তাপসী তখন সামনে। টেবিলের কাচের ওপর রাখা একটি হাত, অন্য হাতটা মুখের ওপর থেকে সরে গেছে মাথায়। জল কানের লতিতে। টেবিলের ওপর রাখা ওর হাতের বালা থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে একটা রেখা তৈরি না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল দীপঙ্কর। মুহূর্তের জন্যে সে অশুভ কিছু আশঙ্কা করেছিল, মেরুদণ্ড বেয়ে আকস্মিক শীত ছুটে গিয়েছিল ঘাড় পর্যন্ত। কিন্তু, না ; তাপসীর মুখই বলে দিচ্ছে এই বৃষ্টিটা ছাড়া আর সবই চলছে ঠিকঠাক।

'তুমি ! হঠাৎ ?'

'আশা করেননি তো !' স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করলেও গলার স্বরের বিব্রত ভাব লুকোতে পারল না তাপসী। ইতস্তত করে বলল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎই মনে হলো আপনার

এখানে আসি,—আপনার সঙ্গেই হাসপাতালে যেতে পারব।'

'ঠিক করোনি।' এতো স্পষ্ট ভাষায় খুব কম সময়ই সে কথা বলে। হয়তো কঠিন হয়ে গেল একটু, ভাবতে ভাবতে ভদ্রতাবোধ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল দীপঙ্কর, 'এইভাবে ভেজা ভালো নয়—'

'এমন হঠাৎ বৃষ্টি নামবে ভাবতে পারিনি। বাস-স্টপ থেকে এইটুকু আসতেই ভিজে গেলাম—'

দীপঙ্করের চোখ জানলার দিকে। ঝাপসা, একটানা বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে তাপসীর কথাগুলো পৌঁছে গেল কানে ; কান থেকে মাথায়। প্রায় একই স্বর—স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবেই তারতম্য ঘটে যাচ্ছে শুধু। এমনও হতে পারে, মানসী একটু অন্যভাবে বলত। কীভাবে ?

অন্যমনস্ক চোখ দুটো সরিয়ে এনে আবার তাপসীর মুখের ওপর রাখল দীপঙ্কর। স্বাস্থ্য আর গায়ের রঙে হঠাৎই যেন ছাড়িয়ে গেছে মানসীকে—চোখের তারা দুটোই শুধু যা আলাদা।

একাগ্র ওই দৃষ্টির সামনে ভয় পাচ্ছে তাপসী। কিংবা লজ্জা। পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে যাচ্ছে জলের রেখা। চোখ দুটো নামিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল বালা-পরা হাতটা। হাতের মুঠোয় পেপার-ওয়েটটা চেপে ধরেছে তাপসী। হয়তো কিছু বলবে, হয়তো কিছু না বলে দীপঙ্কর কী বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করবে।

দীপঙ্কর চোখ সরিয়ে নিল। শব্দই বুঝিয়ে দিচ্ছে আরও চেপে নামল বৃষ্টি। যদি এইভাবেই চলে তা হলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জল দাঁড়াবে রাস্তায়। বন্ধ হয়ে যাবে ট্রাম বাস। জ্যাম চিৎকার করতে থাকবে চারিদিক থেকে। এর মধ্যে তাপসীকে নিয়ে কোথায় যাবে সে, কতো দূর এগোবে!

'আপনি বোধ হয় খুশি হননি, দীপঙ্করদা!'

'কেন ?'

চোখ তোলার সময় মাথা দুলে ওঠে তাপসীর, যেন যা বলছে সে-সম্পর্কে খুব নিশ্চিত নয়।

'আমার এই আসাটা—অফিসে—'

'ব্যাপারটা খুশি-অখুশির নয়—'

একই সঙ্গে কঠিন ও নরম হলো দীপঙ্কর। বেল টিপল। বেয়ারা এলে চটপট চা পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করল। তারপর, নিজের আড়াল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বলল, 'তপু, এখানে না এসে যদি তুমি হাসপাতালে যেতে, তা হলে বৃষ্টি নামার আগেই পৌঁছে যেতে। তোমার দিদি এই সময়টার জন্যেই তাকিয়ে থাকে—'

জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে থাকল তাপসী। অপ্রস্তুত বোধ করলেও দীপঙ্কর যে সরাসরি কথাটা বলে ফেলবে সম্ভবত তা ভাবতে পারেনি। মানসীর বোন হলেও বস্তুত তার সঙ্গে সম্পর্কটা কী ? অন্তরঙ্গতার ? সেও তো মানসীকে জড়িয়ে! ওই সম্পর্কের সূত্র ধরেই হঠাৎ খেয়ালে আজ চলে এসেছে এখানে। হঠাৎ খেয়ালে ? সম্ভাব্য একটা কারণ অনুমান করার চেষ্টা করল দীপঙ্কর। পেল না। তখন ভাবল, যদি এমন হয়—মানসী থাকল না, তখনো কি এইভাবে আসতে পারবে তাপসী ?

চা এসে গিয়েছিল। নিজেরটা টেনে নিয়ে দীপঙ্কর বলল, 'খাও। এতো তাড়াতাড়ি

যখন দিয়েছে, নিশ্চয়ই জিব পুড়বে না।'

একইভাবে চোখ নিচু রেখে কাপটা তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল তাপসী। ঈষৎ ঢলঢলে বালাটা নেমে এসেছে প্রায় কনুই পর্যন্ত। জল বসে টানটান লাগছে কাঁধের ওপর শাড়ির আঁচল এবং ব্লাউজের হাতা। হাতটা কাঁপছে বলেই বালাটাও কাঁপছে।

'কথাটা অন্যভাবে নিও না, তপু।' বৃষ্টির শব্দে কান রেখে দীপঙ্কর বলল, 'তুমি এসেছ, এতে আমার খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু—'

কাপটা প্লেটে নামিয়ে রাখার সময় একটু জোরেই শব্দ হলো। ভ্রূক্ষেপ না করে ব্যস্ত গলায় তাপসী বলল, 'জবাবদিহি করতে হবে না। আপনি কি বেরুবেন ?'

'বেরুবো। কিন্তু—'

'বৃষ্টি থেমে এসেছে।' জানলার বাইরে তাকিয়ে নিজের কথার সমর্থন খুঁজল তাপসী, 'খুব দেরি হয়নি, খুব সময় নষ্ট হয়নি—'

কথা শুনে মনে হয় একটু আগে হারানো জোরটা আবার ফিরে পেয়েছে তাপসী। সোজাসুজি দীপঙ্করের চোখে চোখ রেখে বলল, 'দিদির অসুখ। ক'দিন থেকেই মনে হচ্ছিল আপনি একটু একা হয়ে গেছেন, তাই ভাবলাম—'

ঠিক এই মুহূর্তে এই কথাটির জন্যে প্রস্তুত ছিল না দীপঙ্কর। কী বলবে বুঝতে না পেরে অনিশ্চিত চোখে তাকাল তাপসীর কপালের ঠিক সেইখানে, বৃষ্টির জলে হালকা প্রসাধন ধুয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যেখানে এখনো খয়েরি টিপটা এঁটে আছে গোল হয়ে। ঘাড় থেকে যতোটা নামানো যায় ততোটাই নিচু করে রেখেছে মাথা। তাপসী এখন তাপসী হয়েই এসেছে—পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, মানসীর বোন হিসেবে নয়। দীপঙ্কর তাকে আলাদা করে দেখুক।

অল্প মায়া হলো দীপঙ্করের। নিজেকেও জড়াল। সত্যিই কি তাকে খুব একা লাগে আজকাল ?

বলার কথাটা কিছুক্ষণের জন্যে মুখে এলো না দীপঙ্করের। রক্ত-মাংস থেকে মনটাকে আলাদা করে চেনবার চেষ্টা করল, যদি এইভাবে চেনা যায়। তাপসীকে দেখছে, আয়না থাকলে নিজেকেও দেখা সহজ হতো। তারপর ভাবল, ব্যাপারটাকে সহজ করেও নেওয়া যায়। তাপসী একটা অনুমানের কথা বলেছে মাত্র, জবাব চায়নি। দীপঙ্করও জবাব দেবে না।

চা-টা আগেই শেষ করেছিল তাপসী। নিজের কাপের তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে উঠতে উঠতে দীপঙ্কর বলল, 'যদি বলি একা লাগে না, বিশ্বাস করবে ?'

বৃষ্টি থেমে গেছে। জানলার বাইরে আকাশটা ফিরে এসেছে আবার। এখনো পরিষ্কার হয়নি পুরোপুরি, তবু, ওরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে নীলের আভাস। একবার সেদিকে তাকিয়ে ওঠার আগে নিজেকে একটু গোছগাছ করে নিল তাপসী।

'আমি আমার ধারণার কথা বললাম।'

'মেয়েরা ধারণা করতে ভালোবাসে।'

তাপসী হাসল। এখন ওকে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ লাগছে।

'আপনার ইয়ার্ডস্টিক কে ? দিদি ?'

'কেন, তুমিও হতে পারো।' নব ঘুরিয়ে দরজাটা ঠেলে ধরল দীপঙ্কর, 'তুমিই তো বললে—'

তাপসী দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিজে শাড়ি ব্লাউজের জল শুকোয়নি এখনো—এতো কাছে দাঁড়িয়ে যে ওর বুকের ওঠানামা দৃষ্টি এড়াল না দীপঙ্করের। ছায়া-মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীপঙ্করের দিকে। এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'অফিসে এসে একটা সুবিধেই করে দিলাম। দেরি হওয়ার জন্যে বৃষ্টির চেয়ে একটা বড়ো কারণ পেয়ে গেলেন আপনি—'

এই কথাটায় পৌঁছে আটকে গিয়েছিল দীপঙ্কর। তাপসী এগিয়ে গেছে ততোক্ষণে। লিফ্টে নিচে ; তারপর রাস্তায়। ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই একটা সম্মোহন যেন ঘিরে ধরেছিল তাকে। এখন মনে হচ্ছে, এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় তখন সে যা বলেছিল তাপসীকে, সেটা উত্তর নয়। হয়তো বলতে পারত, সঙ্গ কি পারে কারও একাকিত্ব ঘোচাতে ?

কিন্তু, মোটরের তীক্ষ্ণ হর্নের শব্দে সচকিত, দীপঙ্কর হঠাৎ ভাবল, এসব কী ভাবছে সে ! কেন ? এগুলো কি খুবই জরুরী ভাবনা ? নাকি আর কিছু ভাবতে পারছে না বলেই দুই খুঁটির ওপর পাতা দড়ির ওপর দিয়ে টালমাটাল পায়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত করছে সে—বস্তুত এগোচ্ছে না কোথাও ! দীর্ঘ দিনের চেনাশোনার মধ্যে তাপসী কি কোনো দিন বলেনি, দীপঙ্করদা, একদিন আপনাদের অফিসে আসব ? ঠাট্টা করে দীপঙ্কর কি কোনো দিন বলেনি, তপু, মানসীর অফিসটা কিন্তু আমারও অফিস, যেদিন মানসী আসবে না সেদিন চুপিচুপি চলে আসতে পারো ? ঠিক এই কথা না হলেও এই রকম কথা অনেকবারই হয়েছে। অসময়ে বৃষ্টিও কোনো নতুন ঘটনা নয়। ট্রাম, বাস, ট্রাফিকের ভিড়, কোথাও না কোথাও পৌঁছুতে দেরি হওয়া—এ-সবের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায় ! তবে কি তাপসীর কথাটাই সত্যি ! মানসীর অসুখটা একা করে দিয়েছে তাকে—এতো একা যে নিজের মধ্যে ক্রমশ আরও একা হতে হতে সে ভুলে যাচ্ছে তার চারপাশ, মানুষজন ও পরিবেশের অস্তিত্ব ! যদি এটাকেই অনুভব বলে ধরা যায়, কে দাম দেবে এই অনুভবের ? মানুষের পৃথিবীতে একার বলে আর কিছু নেই, জায়গা খালি হতে না হতেই ভরে উঠছে জায়গা। জল মিশে যাচ্ছে জলে। খানিক আগেই তাপসীকে নিয়ে অফিস থেকে বেরুবার সময় লক্ষ করেছিল, মানসী যে-চেয়ারে বসত ঠিক সেই চেয়ারে বসে লেজারের পাতা ওলটাচ্ছে তারক সরকার। আগেও লক্ষ করেছিল। প্রতিবাদ করেছিল ? তা হলে তাপসীকে নিয়েই বা এতো অস্বস্তি কেন !

কাঁচা কাঠ করাত দিয়ে চিরলে রস গড়ায়। তখন বোঝা যায় প্রাণ ছিল। তার আগে ব্যাপারটা থাকে কল্পনায়। হয়তো বা অনুমানে। হয়তো বা ধারণায়। খানিক আগে এই ধারণার ফাঁদে পা দিয়েছিল তাপসী ; ওই একই ধারণার জালে নিজেকেও সে জড়িয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ। ঠিক নয়, এটা ঠিক নয়।

হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টোরিয়া অব্দি পৌঁছে গেল ওরা। পুব দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এসে গাড়িগুলো বাঁক নিচ্ছে উত্তরে। উত্তর থেকে আসা দক্ষিণের গাড়িগুলো থেমে যাচ্ছে পরপর। সামনে ট্রাফিক পুলিসের নিষেধ। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আর একটু—। আমরা পৌঁছে গেলাম।'

'কেন ! আপনার সন্দেহ ছিল ?'

'না, তা ছিল না।' কব্জি তুলে সময় দেখল দীপঙ্কর, 'পাঁচটা পাঁচ। তপু, তোমার ঘড়িতে কটা ?'

'কমও হতে পারে।' আবার এগোতে এগোতে বলল তাপসী, ঘড়ি দেখল না। 'আসলে

এখন চারটে পঞ্চান্ন। আপনি ঘড়ি ফাস্ট করে রেখেছেন—'

'তাই কি !' দীপঙ্কর চেষ্টা করছে যাতে দুজনই একই গতি রাখতে পারে। হাল্কা গলায় বলল, 'তা হলে কি তোমাকে দশ মিনিট কম হাঁটালাম ?'

তাপসী তাকাল পাশ ফিরে। ভুরু কোঁচকাল অল্প।

'না। আপনি দশ মিনিট বেশি হেঁটেছেন।' বলতে বলতে থামল। আবার বলল, 'তার মানে কী, বুঝলেন কিছু ?'

'না—'

'তার মানে অভদ্রতা। কুড়ি মিনিট দূরত্ব রেখে হাঁটছিলেন হনহন করে। একবারও ভাবেননি আমার অসুবিধে হচ্ছে কি না !'

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল। অপ্রস্তুত ভঙ্গি।

'আই অ্যাম সরি। একস্ট্রিমলি সরি, তপু !'

'আর শিভাল্‌রি দেখাতে হবে না—', হাত বাড়িয়ে দীপঙ্করের বাহু চেপে ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিল তাপসী, নিজেও এগিয়ে গেল। চুপচাপ। একটা গাড়ি আসছে, চোখ সেদিকে।

'আমার খারাপ লাগছে আপনার জন্যে।'

'কেন !'

'অফিসের পর এই ছুটোছুটি—টেনসান। ঝড়টা আপনার ওপর দিয়েই যাচ্ছে।'

ঝড় থেমে গেলে দাপটটা বোঝা যায়—,এই রকম কোনো কথা মুখে এসে গিয়েছিল দীপঙ্করের, সামলে নিল। এটা পরের কথা।

'তোমাদেরই বা কী কম যাচ্ছে !'

দ্বিধাহীনভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল দীপঙ্কর। তাপসী লক্ষ করল না। এমনও হতে পারে, সিগারেটের গন্ধ এখন আর ওকে টানছে না। আস্তেও না, জোরেও না, এই মুহূর্তে ওর হাঁটার ধরনে যান্ত্রিক অন্যমনস্কতা ছাড়া আর কিছু নেই। মজা করে দীপঙ্কর যদি থেমে যায় এখন, হয়তো সেটাও অনুভূতি এড়িয়ে যাবে তাপসীর।

'আজ সকালে হাসপাতাল থেকে ফিরে বাবা এমন বিচ্ছিরিভাবে কাঁদছিল।'

'কেন !'

'জানি না।' গলা জড়িয়ে এলো তাপসীর। 'অতো বড় একটা লোককে একা একা ডুকরে কাঁদতে দেখলে এতো খারাপ লাগে! কী হয়েছে কিছুই বলল না !'

সম্ভবত তাপসী আরও কিছু বলবে। হাঁটার ছলে সময় নিচ্ছে। দীপঙ্কর চুপ করে থাকল।

কিছুক্ষণ থমথমে থাকার পর হাওয়া বইতে শুরু করেছে আবার। জমে ওঠা মেঘ ছড়িয়ে পড়লেও আলোয় তারতম্য ঘটেনি। তার মানে বেলা পড়ে আসছে। বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যা নামে তাড়াতাড়ি। ভিজে মাঠ উপেক্ষা করে ভিক্টোরিয়ার পিছনে গাছের শুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বসে আছে এক জোড়া যুবক-যুবতী। অল্প দূরে কাদার মধ্যে ছুটোছুটি করে ফুটবল খেলছে এক দল ছেলে। দীপঙ্কর দেখল, জোরে শট করা সত্ত্বেও বারবার জলকাদায় আটকে যাচ্ছে বলটা—কোনোবারই পৌঁছুতে পারছে না নির্দিষ্ট দূরত্বে। প্রায় ওদের গা ঘেঁসে একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে গেল দ্রুত, বাঁক নিল বাঁ দিকে। তেমন কোনো কারণ নেই, তবু চোখ এখন অ্যাম্বুলেন্সটাকেই অনুসরণ করছে। ঠিকই, ডান দিকে মোড় নেবার জন্যে রাস্তা

করে নিল। কোনো কোনো গাড়ির গন্তব্য আগে থেকেই টের পাওয়া যায়।

'দীপঙ্করদা—'

'বলো ?'

জুত না লাগায় সিগারেটটা ফেলে দিল দীপঙ্কর। তাপসী এবারও লক্ষ করল না।

'দিদির কী হয়েছে ?'

এখন রাস্তা পার হবার সময়। পুব থেকে পশ্চিমে ক্রমাগত ছোটাছুটি করছে গাড়িগুলো। কম করেও পরপর চারটে লাইন। ওরই মধ্যে এইমাত্র আসা একটি মিনিবাস ঢুকে পড়ে জ্যাম সৃষ্টি করল। প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে তাপসী। জ্যাম ছাড়ানোর জন্যে ঘনঘন হুইস্‌ল দিচ্ছিল ট্রাফিক পুলিস। গাড়িগুলো নড়ছে, এরপর রাস্তা পার হবার মতো জায়গা করে দেওয়া যাবে। মরার জন্যে সব সময় উপলক্ষের দরকার হয় না, মানসী কি বলেছিল ? রাস্তা পার হবার জন্যে তাপসীর কব্জিটা মুঠোর মধ্যে টেনে নিল দীপঙ্কর। এ-প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে। রাস্তা পেরিয়ে হাসপাতালের ফুটপাথে পৌঁছে ভাবল, কোনটা বলবে তাপসীকে ?

'জানি না।'

'জানেন ঠিকই—', অদ্ভুত কাঁপা ও বিচলিত গলায় বলল তাপসী, হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল দীপঙ্করের দিকে, 'জানেন সবই, বলতে চান না।'

এই মুহূর্তে দুজনের দৃষ্টি স্পর্শ করল পরস্পরকে। পায়ের তলায় কংক্রিটের ফুটপাথ। কেন কে জানে, দীপঙ্করের মনে হলো ফুটপাথটা দুলছে—সে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে নিচে। দৃশ্য জগতের আড়ালের ভাঙচুর ধরা পড়ে না দৃষ্টিতে। শব্দ থেমে যায় নতুন শব্দকে জায়গা করে দেবার জন্যে।

নিজের বুকে হাহাকার শুনল দীপঙ্কর। গন্ধটা ফিরে আসছে, ফিরতে ফিরতে পিছু হটছে আবার। স্থানকাল ভুলে শক্ত মুঠোয় তাপসীর একটা হাত চেপে ধরল সে।

'এইভাবে, রাস্তায়, তপু—, কী হয়েছে ! তুমি কাঁদছ কেন !'

আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছিল, তাদের কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছে ; একটু বাড়াবাড়ি হলেই দাঁড়িয়ে পড়বে হয়তো। উল্টো দিকের বাস-স্টপে দাঁড়ানো দুটি ছেলেকে এরই মধ্যে কিছুটা সন্দিগ্ধভাবে এগিয়ে আসতে দেখল।

'কিছু হয়নি—'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল তাপসী। এগিয়ে যেতে যেতে থেমে দাঁড়িয়ে রুমাল বের করল ব্যাগ থেকে। মুছে নিল চোখ দুটো। দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে হাসল অস্পষ্টভাবে।

'কী ভাবছেন ? সেন্টিমেন্টাল !'

'না, তা ভাবছি না।'

ছড়ানো অবয়বগুলোকে একত্র করে মেরুদণ্ড টান করে দাঁড়াল দীপঙ্কর ; নিঃশ্বাস নিল জোরে। আর কয়েক পা এগোলেই হাসপাতালের গেট। আবার একটা অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে আসছে। সেই আগেরটাই কি না বোঝা যায় না। ওষুধ-ওষুধ একটা গন্ধ উড়ে এলো নাকে।

'আমি একা হয়ে পড়ছি ভেবে আজ তুমি আমাকে সঙ্গ দিতে এসেছিলে, এখন নিজেই উল্টোপাল্টা কাজ করছ !'

'ইচ্ছে করে করিনি।'

'জানি। তবু—'

গেটের কাছে বাঁক নিয়ে লনে ঢুকতে ঢুকতে আড়ে দীপঙ্করকে দেখে নিল তাপসী। জল শুকিয়ে গেছে, হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় উড়ে-যাওয়া শাড়ির আঁচলটা কাঁধে চেপে ধরে সংযতভাবে বলল, 'সঙ্গ দিয়ে কী হয়! সঙ্গ কি পারে কারও একাকিত্ব দূর করতে?'

দীপঙ্কর একটা ঘা খেল। এ কেমন কথা! তাপসী ঠিক সেই কথাগুলিই বলল এর আগে বলবে বলবে করেও যে-কথাগুলি বলতে পারেনি সে।

তাপসী বলল, 'দিদিকে কিছু বলবেন না।'

'কী!'

'এই—যা হলো—'

'কী দাম এ-সবের? মানসীর কাছে?'

'দাম!'

দাঁড়িয়ে ব্যাগ খুলল তাপসী, কার্ডটা বের করে নিল।

'আপনারটা?'

'আছে—'

সন্ধে হয়ে আসছে, তবু আলো জ্বলেনি এখনো। কম্পাউণ্ড জুড়ে অগোছালো দৃশ্য—খুশি ও বিমর্ষতায় মেশা মুখগুলি পরস্পরের সঙ্গে জায়গা বদল করছে ক্রমাগত, স্থির হতে না হতেই হয়ে উঠছে পরিচয়হীন। এমারজেন্সির দিকে ছোটখাট ভিড়। ওদের সামনে দিয়ে রাস্তা কেটে দুজন নার্স ছুটে গেল সেই দিকে। ঘাস ও কংক্রিটে বৃষ্টির রেশ ছড়ানো। বকুল গাছের তলা দিয়ে হাঁটবার সময় এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল দীপঙ্করের কপালে। প্রায় তখনই জ্বলে উঠল আলোগুলো। ডান দিকে সিঁড়ি, কাল যেখান দিয়ে সে নেমে এসেছিল। আজ উঠছে। আবার নেমে যাবে। কাল আবার আসবে। ব্যাপারটা প্রায় রুটিন হয়ে গেছে। রুটিনই থাকবে। থাকবে কি?

না। নিজের মনেই বিড়বিড় করল দীপঙ্কর, না। হয় আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, না হয় থেমে যাবে। থামার জন্যেই লাল কালিতে দাগানো থাকে ছুটির দিনগুলো।

কেবিনের দরজাটা ভেজানো। আস্তে হাতে ঠেলে দীপঙ্করকে আগে ঢুকতে ইশারা করল তাপসী।

বিছানার ওপর পিঠের কাছে জড়ো করা বালিশে হেলান দিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল মানসী। দীপঙ্করকে দেখে নড়ে বসল, বইটা রেখে দিল পাশে।

'আজ কেমন আছ?'

'ভালো। সকালে ব্লাড দিয়েছে—'

কোনো জড়তা নেই গলায়। অভিমানও নেই। তাপসী ততোক্ষণে বেডের ওপর ওর পায়ের কাছে বসেছে। একটাই চেয়ার। দীপঙ্কর টেনে নিল।

'যা বৃষ্টি!' বলতে বলতে দীপঙ্করের কিছুটা থমথমে মুখের দিকে তাকাল তাপসী। বলল, 'দিদি, আজ তোদের অফিসে গিয়েছিলাম। ফিরলাম দীপঙ্করদার সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে—'

'আমি ভাবছিলাম আজ আর কেউ এলো না। যা বৃষ্টি এখানেও হলো!' অল্প একটু হাসি ছুঁয়ে গেল মানসীর ঠোঁটে। গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে হাত বেঁকিয়ে বালিশটা ঠেলে দিল ঘাড়ের কাছ বরাবর। কপালের ওপর ঝুঁকে আসা চুলগুলো সরিয়ে আলগোছে

হাতটা ফেলে দিল কোলে। তারপর একই হাসির জের টেনে বলল, 'নার্স আমাকে জানলার ধারে দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, উত্তর-পশ্চিমে কোনাকুনি তাকান। যার অপেক্ষা করছেন তাকে দেখতে পাবেন—'

হাসিতে সামান্য শব্দময় হয়ে উঠল মানসী। জোর কমেছে, তবু ধরন পাল্টায়নি কোনো। এই হঠাৎ খুশির কারণ অনুমান করা যায় না।

অস্বস্তি এড়ানোর জন্যে চোখ দুটো মানসীর মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে কেবিনের নানা দিকে ঘোরাতে লাগল দীপঙ্কর। একইভাবে জানলার বাইরে গিয়ে থামল। নিচে যতোটা অন্ধকার লাগছিল, আরও একটু ওপরে এসে এখন আর তা লাগছে না। মেঘ-ভাঙা রোদ্দুরে ফুটে আছে দিনশেষের আভা। তার থাকিয়ে থাকার মধ্যেই আরও কিছুটা ছায়া ছড়াল। তাপসীর গলা। মানসীর গলা। নীলচে লালের নিচে দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে কয়েকটা কাক। দূরে—ঠিক কোন দিকে বোঝা যায় না—প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষল একটা বড়ো গাড়ি। কাছেই কোনো রাস্তা দিয়ে একটানা হাঁক তুলে হেঁটে যাচ্ছে কোনো ফেরিওলা, কিংবা যাচ্ছে না। শব্দ থেকে শব্দে পারাপার করতে করতে হারিয়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্যে। আকাশের নীলচে লালে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারের নিজস্ব রঙ। দিন শেষ হবার একটা ধরন আছে ; এমনও হতে পারে ধরনটা পাল্টে যায় রোজই—আগে থেকে অনুমান করা যায় না। যায় ? অনুমানসাধ্য হলে মানসীর খুশির কারণ আগেই টের পেত। 'রোগ ধরার চেষ্টা করতে পারি, কারণ কী করে বলব !' এরই মধ্যে একদিন ডাক্তার বলেছিল তাকে, 'ওটা দর্শনের প্রশ্ন। অনেক সময়েই জানা যায় না।' এমনও হতে পারে যেটা জানা যায় সেটাও ভুল। এই যে এই মুহূর্তে সে ভাবছে মানসী বেঁচে উঠবে, সেটা কি ঠিক ?

ভাবনায় ঢুকে পড়ে বহুরঙ আকাশ। তারপর হারিয়ে যায় আবার। মাথার পিছন থেকে একটা যন্ত্রণা উঠে এসে চাপ দিচ্ছে রেটিনায়—অস্পষ্ট কয়েকটা বিন্দু ওড়াউড়ি করতে লাগল চোখের সামনে। শীতে ন্যুব্জ হয়ে এলো শরীর। নিজেকে ফিরে পাবার জন্যে চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরল দীপঙ্কর। কয়েক মুহূর্ত। গন্ধটা ফিরে আসছে, ফিরতে ফিরতে হারিয়ে যাচ্ছে আবার। নিঃশ্বাস একাগ্র করে দীপঙ্কর সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করল।

মানসী আজ সত্যিই খুশি। এখনো জিইয়ে রেখেছে হাসিটা।

'তুমি অমন করুণ মুখ করে বসে আছ কেন ?'

'আমি ! কেন !'

চোখের ওপর পরিষ্কার চোখ। দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পরকে ছাড়িয়ে গেল দুজনে। ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটোই বলে দিচ্ছে চুম্বনে স্বাদ থাকবে না কোনো—বাইরে থেকে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেওয়া রক্ত জোর বাড়ায় না আবেগে। সঙ্গ কি পারে কারও একাকিত্ব ঘোচাতে ?

'দীপঙ্করদা ?'

জবাব না দিয়ে তাপসীর দিকে তাকাল দীপঙ্কর। হাতে একটা কাগজ ধরা। তাপসী বলল, 'আপনি বসুন। আমি এই ওষুধটা নিয়ে আসছি—'

'তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি—'

'থাকুন এখানে। যা অন্যমনস্ক আজ, গেলে আর ফিরবেন না !'

যেতে যেতে মানসীর দিকে তাকাল তাপসী। ঠাট্টার সুরে বলল, 'যা অবস্থা দেখছি, দিদি,

এই কেবিনেই না আর একটা বেড পাততে হয়!'

ঠিকই চলে গেছে তাপসী। মানসীর চোখ দরজার দিকে। প্রায় অকারণ দরজা পর্যন্ত ঘুরে এলো দীপঙ্কর। তারপর চেয়ারটা টেনে নিল মানসীর বিছানার কাছে। ঝুঁকে এলো অল্প। চোখ বন্ধ মানসীর, বুকের ওপর থেকে এলানো হাতটা ঠিক ততোটাই পাশে সরাল যেখান থেকে সযত্নে নিজের হাতে তুলে নিতে অসুবিধে হবে না দীপঙ্করের। চারিদিকে শাঁখের শব্দ। চারিদিকে ? না তাকিয়েই বুঝল দীপঙ্কর, অন্ধকার হয়ে এলো।

আস্তে আস্তে একটা তাপ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। মানসীর হাতের তালু বেশ গরম। খানিক অনুভব করে একটা আঙুল বেছে নিয়ে নিজের দু' আঙুলে নখের ডগা টিপে ধরল দীপঙ্কর। ধরে থাকল।

'কী দেখছ ? রক্ত আছে কি নেই ?'

'না। এমনিই।'

নিরপেক্ষভাবে হাসবার চেষ্টা করল দীপঙ্কর। কাজ হলো না। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানসীর চোখ দুটো।

'দুজনে একসঙ্গে মরে লাভ আছে কিছু! তুমি বাঁচো!'

'এ-কথা বলছ কেন!'

'তোমাকে দেখে।'

দীপঙ্কর চুপ করে থাকল। ভালো থাকা মানে কি আরও একটু নিশ্চিত হয়ে সময়ের দিকে এগোনো। দেখল, আস্তে আস্তে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মানসী। চেষ্টার দরকার হয় না—হাতটা নিজে থেকেই সরে গেল হাত থেকে।

'আমি বুঝতে পারি। আমি সব বুঝতে পারি—'

গলা বুজে এলো মানসীর।

কথাগুলো ছায়া ফেলে দেওয়ালে ; ক্রমশ কাঁপতে থাকে কেবিনের পর্দায়। ফিরে যায় স্মৃতির দিকে। চিনতে গিয়েও অস্পষ্ট লাগে কেমন, মাঝখানের প্রতিবন্ধকতা বুঝতে দেয় না একদিন কেমন ছিল। যেন সবই ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা—ঝাপসা, জড়ানো, অবয়বহীন। অবয়বহীন ? নাকি ভবিষ্যৎহীন ?

গাঢ় একটা নিঃশ্বাস টেনে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল দীপঙ্কর। তার ভাবনায় যায় আসে না কিছু। মানসী সবই বোঝে।

সময় চলে যাচ্ছে। দীপঙ্কর ঘড়ি দেখল। প্রায় ছ'টা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে তাদের। ইতিমধ্যে ওষুধ নিয়ে ফিরে আসবে তাপসী। নার্স আসবে। 'আজকের মতো সময় হয়ে গেছে—', যান্ত্রিক গলায় বলবে, 'কাল আসবেন আবার।' চলে না যাওয়ার জন্যে থাকবে না আর কোনো উপলক্ষ। যতো দিন মানসী থাকবে, ততো দিনই সব কিছু চলবে এই একইভাবে। একটু আগেই সে রুটিনের কথা ভেবেছিল।

ভিতরে ভিতরে সচেতন হয়ে উঠলেও আরও কিছুটা সময় নিল দীপঙ্কর। কোনো কথা মুখে আসছে না, কোনো ব্যবহারই জোর পাচ্ছে না তেমন। তা হলেও, এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। শুকিয়ে ওঠা গলায় আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনার আগে মানসীর কপালে হাত রাখল সে। ক্রমশ ছুঁয়ে বেড়াতে লাগল মাথা, চুল, গাল, গলা। ঠাণ্ডা চোখে লক্ষ করল চাদরে ঢাকা মানসীর বুকের ওঠানামা। ঠোঁটের ওপর, চিবুকের নিচে অল্প ঘামের রেখা। একটু রোগা হয়েছে, একটু ফ্যাকাশে—মসৃণ চামড়ার আড়াল থেকে অস্পষ্টভাবে জেগে

উঠছে হাড় ও শিরা। তবু, এখনো একইভাবে সচকিত হয় আদরে। স্পর্শই বুঝিয়ে দেয় উত্তাপের জন্ম। এই সেই মুহূর্ত, যখন সময়ের নিষেধ না থাকলে অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ গাঢ় হয়ে ফিরে আসত সবুজ গন্ধ। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত আবেগে বুক ভরে উঠল দীপঙ্করের।

আগেই পাশ ফিরেছিল। দীপঙ্করের বাড়ানো হাতটা ধরে, হাতের আঙুলগুলো নিজের আঙুলে জড়িয়ে নিল মানসী। তাকাল ঘন চোখে।

'রোজ রোজ আসো কেন। এক-আধ দিন বাদ দিলেও তো পারো। অন্য কেউ আসবে—'

'মনের কথা!'

মানসী ঘাড় নাড়ল। জড়ানো আঙুলগুলো আরও একটু জায়গা খুঁজে নিল।

'তোমাকে দেখলে লোভ বেড়ে যায়। অনেক কিছু ইচ্ছে করে—'

বলতে বলতে থেমে গেল মানসী। দ্রুত সিঁড়ি ওঠার চেষ্টায় বেড়ে গেল বুকের ওঠানামা। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। চামড়ার নিচে শিরা-উপশিরার শিকড় ছড়ানো, অন্ধকার গাছ-গাছালির আড়ালে শরীরের ঘর-বাড়ি। সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে শুক্লপক্ষের আলো—স্বতোৎসারিত হতে হতে ছায়া ফেলছে মানসীর মুখেও। ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা জোর পেয়ে যায় দীপঙ্কর। মাঝে মাঝে মনে হয় ভালোবাসাই আবেগ, ভালোবাসাই রক্ত ; শূন্য হতে হতেও আবার ভরিয়ে দেয় সুখে।

দরজার দিকে তাকিয়ে সামান্যক্ষণের আড়াল খুঁজল দীপঙ্কর। তাপসীর ফেরার সময় হয়নি এখনো ; আর কেউ আসবে বলেও মনে হয় না। ভাবতে ভাবতে নিজের ঠোঁট দুটো হাল্‌কা থেকে প্রবলভাবে নামিয়ে আনল মানসীর ঠোঁটে। নিঃশ্বাসে জ্বর নিয়ে উঠে এলো মানসী—ডানা-ছাঁটা একটা পাখি ছটফট করছে ওড়ার চেষ্টায়। আটকানো যাবে না।

কিন্তু, দীপঙ্করকে থামতে হবে। এক মুহূর্ত। মুখ তুলে হাসল সে।

'তুমি বলতে, ইচ্ছের কথা মুখ ফুটে বলতে নেই। আজও বোলো না—', বলতে বলতে গম্ভীর হলো দীপঙ্কর। বলল, 'তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো। সবই পাবে।'

ঠোঁটের কোণে পাতলা একটু হাসি ফুটে উঠল মানসীর। কিছু বলবে ভেবেও থেমে গেল। করিডোর দিয়ে লোকজনের যাতায়াতের শব্দ। বিভিন্ন স্বর স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। কান সেই দিকে। অপেক্ষা করে বলল, 'তুমি আমার চেয়ে মোটে তিন বছরের বড়ো। এমন বুড়োর গলায় সান্ত্বনা দিচ্ছ কেন!'

'কে কাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে— !'

তাপসীর গলা। দীপঙ্কর দেখল, তাপসীর পিছনে এখুনি ছড়িয়ে আসা দরজার পর্দাটা স্থির হয়ে যাচ্ছে আবার। মানসীর চোখ বন্ধ। এখন আর ও কথা বলবে না। সময়ও কি আছে ?

॥ দুই ॥

বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রাজশেখরের। অবশ্য বৃষ্টি যে পড়ছেই এটা বুঝতে পারেননি আগে। তারও আগে ঘুমের মধ্যে মাথার ভিতর ও শরীর জুড়ে শুরু হয়েছিল অদ্ভুত এক অস্বস্তি। এলোমেলো হয়ে উঠছিল নিঃশ্বাস। গলার নিচে ঘাম,লোনা স্বাদে মুখ ভর্তি, টাটিয়ে উঠেছিল চোখের ওপর ভুরু দুটো। ঘুম না ভাঙলে হয়তো আরও কিছু অস্বস্তি টের পেতেন। ঘুমটা গাঢ় থেকে পাতলা হবার মুখে কান বিঁধে গেল শব্দে। শারীরিক অস্বস্তিটা ধাতস্থ করে নেবার আগে কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকলেন তিনি। পতনের শব্দে তারতম্য নেই কোনো। একটানা, অবিশ্রান্ত, মুষলধারা। মনে হলো পৃথিবী তার নিজস্ব মাপ ছাড়িয়ে পরিণত হয়েছে আরও বড়ো এলাকায়—জল স্থল একাকার হতে হতে ক্রমশ মেনে নিচ্ছে বৃষ্টির দাপট। সামনে প্রলয়। বাঁচানো যাবে না।

সামান্য কাত হয়ে না-শোয়া না-বসা ভঙ্গিতে জুত হবার চেষ্টা করলেন রাজশেখর। আজকাল যখন-তখন বিদ্যুৎ চলে যায় ; না, তা হয়নি। মশারির ভিতরে থেকেই বুঝতে পারলেন পাখা চলছে। একই বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে তাঁর স্ত্রী, গীতা। বেশি বয়সের ঘুমে লজ্জা কমে যায়, শৈথিল্য বাড়ে শরীরের। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার প্রবণতাই পরিণত হয় মৃদু নাক ডাকায়। এখনো ডাকছে। গীতা গরম সইতে পারে না একেবারে, পাখা বন্ধ হলে নিশ্চয়ই উঠে পড়ত। জানলা দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসত। দেখাদেখি তপু, লিলি, সঞ্জয়, বিজয়ও।

না, তা নয়। অস্বস্তিটা তার নিজস্ব। নড়াচড়ায় ভার যদি বা গেল, ঘোরটা কাটছে না এখনো। অল্প যন্ত্রণা হচ্ছে কপালে। নিঃশ্বাসে জড়তা। জিবটা টাকরার দিকে ঠেলে ঠোঁটে ঘষলেও লোনা স্বাদে নতুন করে মুখ ভরে যাচ্ছে আবার।

উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা জোরালো হয়ে উঠল কানে। তখন মনে পড়ল, ঘুম ভাঙার ঠিক আগে একটা স্বপ্ন ঘোরাঘুরি করছিল মাথায়। স্বপ্নটা খারাপ—ভয়ঙ্কর ছায়ার রূপ ধরে ঝুঁকে এসেছিল মুখের ওপর। ঘুম ভেঙে গেল।

অন্ধকারে দুঃখিতভাবে একটা হাই তুললেন রাজশেখর ; শব্দটা চাপা দিলেন গলায়। এই অন্ধকারে, মশারির ভিতর পুরনো বিছানার গন্ধ ও পুরনো স্ত্রীর ঘুমন্ত শরীরের গন্ধের আচ্ছন্নতার মধ্যে স্তব্ধভাবে বসে থাকতে থাকতে কোনো বিশিষ্ট অনুভূতি নাড়া দিল না তাঁকে। প্রায় ষাট বছর বয়স হলেও সঞ্চয়ের ভাঁড়ার শূন্য। স্মৃতিরও। বহু কাল বাঁচা হলো। এখন সামনে স্বপ্ন নেই কোনো—যা আছে তার নাম দায়, দায়িত্ব। এগুলি কোনো রকমে মিটিয়ে দিতে পারলেই মোটামুটি পৌঁছুনো যেত রাস্তার শেষে। এখন মনে হচ্ছে সব হিসেব মেলে না, কোথাও না কোথাও ভুল হয়ে যায় অঙ্কে। রাস্তাটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে পিছিয়ে যায় আরও।

একটা দীর্ঘশ্বাস উঠতে উঠতে নেমে যায় আবার। নতুন করে মিশে যায় হাইয়ের সঙ্গে ; ছোট ছোট ঢেউ খেলা করে বুকে—ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা শরীরে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। অনুভূতিটা চিনতে অসুবিধে হয় না কোনো। ক'দিন আগে এক দুপুরে মানসীকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফেরার পর হঠাৎ একই রকম অনুভূতিতে কেঁপে উঠেছিল সর্বাঙ্গ। প্রাণপণ চেষ্টাতেও সামলাতে পারেননি নিজেকে। গীতা, তপু, লিলি—সকলেই তখন সামনে। ওই ডুকরে কেঁদে ওঠার সামনে কেউই কথা বলতে পারেনি কোনো, স্তম্ভিত চোখে

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। কী ভেবেছিল ওরা ?

বিভ্রান্ত মুখগুলিতে উত্তর ফোটেনি কোনো। যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই পায়ে চটি গলিয়ে বাইরে ছুটে গিয়েছিল তপু ; নিশ্চিত ফোন করতে হাসপাতালে। লিলি সরে গিয়েছিল সামনে থেকে। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মুঠো শক্ত করে দাঁড়িয়েছিল গীতা ; কান্নার বেগ কমে আসতে দেখে স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'মানু কি চলে গেল ?'

প্রশ্নটাই থামিয়ে দিয়েছিল রাজশেখরকে। হঠাৎ মনে হয়েছিল কান্নার উৎস মৃত্যু নয়, ব্যর্থতা। ওরা তা বুঝবে না। বুঝবে না বলেই অন্য রকম বুঝে নিয়েছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে রাজশেখর বলেছিলেন, 'ও কথা মুখে এনো না। ওর কিছু হয়নি।'

যেন মৃত্যুটাই সহনীয় ছিল, রাজশেখরের কথা শুনে আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল গীতার মুখ। উদ্বেগে ভারাক্রান্ত চোখ। সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা হলে— ?'

'নিজের জন্যে—'

কথা বলার এমন তৎপর অভ্যাস রাজশেখরের নেই। সত্য লুকোতে পারেননি, সত্যই ফুটে বেরিয়েছিল মুখে।

আর কোনো কথা ছিল না। একই চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গীতা টের পায়নি কখন তার নিজের গালও ভিজতে শুরু করেছে। অন্যমনস্ক হাতে আঁচলটা চেপে ধরেছিল মুঠোয়।

'ভারী অদ্ভুত মানুষের জীবন !' স্বগতোক্তি করার মতো থেমে থেমে বলেছিলেন রাজশেখর, 'সন্তানের জন্মদানে তার অধিকার আছে, সন্তানকে বাঁচানোর অধিকার নেই। এ কেমন পিতৃত্ব, এ কেমন মাতৃত্ব,—রোগের সামনে যা শুধুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে !'

বরাবরই কম কথা বলে গীতা ; যা বলা হয় তার সবটুকুই শোনে কি না সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। একটা উদাসীন অন্যমনস্কতায় জড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ। রাজশেখর লক্ষ করেছেন, মানসীর অসুখের পর থেকে গীতার এই উদাসীন ভাবটা বেড়ে গেছে আরও। কাজকর্মের মধ্যে হাঁটুতে চিবুক পেতে জিরিয়ে নিতে নিতে বিড়বিড় করে নিজের মনে। কখনো হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, কিছু বলছিলে ? সেদিন রাজশেখরের বিলাপ কানে গেলেও ঠিক ঠিক শুনেছিল কি না সন্দেহ হয়। যেমন ছিল তেমনিই, চোখে মুখে ভাবান্তর ঘটেনি কোনো। একই রকমের স্তম্ভিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলেছিল, 'পুরুষমানুষের কান্না বড়ো অমঙ্গলে হয়।'

গীতা চলে যাবার পর ব্যস্তভাবে ফিরে এসে তাপসী বলেছিল, 'হাসপাতালে ফোন করলাম। কিছু তো হয়নি !'

একটা পুরো দৃশ্য পেরিয়ে এলেন রাজশেখর। পুনরভিনয়ে ছেদ পড়েনি এতোটুকু। কিছু হয়নি, কিছু হয়ও না হয়তো ; তবু মাঝখান থেকে ছকটা পালটে যায় একটু ; গতানুগতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হতে হঠাৎই চোখে পড়ে একদিন, যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে আর ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দ অন্য রকম লাগে কানে।

অন্ধকার মশারির ভিতর ভাবনার খেই হারিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন রাজশেখর। আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে ঘাম স্পর্শ করেন নিজের। কান পেতে শোনেন বৃষ্টি পড়ছে। আবছায়ায় লক্ষ করেন গীতার ঘুমন্ত শরীর। একটু আগেই নাক ডাকছিল, এখন আর শোনা যাচ্ছে না। ঘুম

পাতলা হতে হতে হয়তো জেগে উঠবে এখুনি। তখনই শুরু হয়ে যাবে রাজশেখরকে নিয়ে মাথাব্যথা! না, থাক। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একই বিছানায় পাশাপাশি শুলেও তাঁর আজকের অস্বস্তির সঙ্গে গীতার যোগ নেই কোনো। দুঃখটা একাই এসেছিল—ঘুমের মধ্যে, অতর্কিতে, এর যা কিছু অস্বস্তি তা একাই সহ্য করবেন তিনি।

মশারি তুলে বাইরে এলেন রাজশেখর। পরিষ্কার চোখের পাতা মেলে সইয়ে নিলেন অন্ধকারটা। এতোক্ষণে মনে হলো মশারির ভিতর যতোটা রাত মনে হচ্ছিল তা নয়। জানলার পাশে আলমারির আড়াল আলো বুঝতে দেয়নি। জানলার বাইরে অন্ধকার থাকলেও তাতে ঘনতা কম, রুটি-কারখানার করোগেটের ছাদ ও লম্বা চিমনিটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। মেঘ ও বৃষ্টি না থাকলে হয়তো আরও পরিচ্ছন্ন লাগত চোখে। খুব দূরে চকিত কাকের ডাক উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। সম্ভবত ভোর হয়ে আসছে।

পাশের ঘরটা মানসীদের। ভেজানো দরজাটা আস্তে হাতে ঠেলতেই খুলে গেল। পর পর দুটো বড়ো খাট। মাঝখানে নড়াচড়ার ব্যবধান রেখে জানলা ঘেঁসে আর একটা ছোট খাট। ওটা মানসীর বিছানা। ও চাকরিতে ঢোকার পর তপুও হঠাৎ বড়ো হয়ে গেল ; এক বিছানায় দু'জনকে কুলোত না। ছোট একটা তক্তপোশ কিনে এনে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিল মানসী ; তখন থেকেই তপু-লিলি, সঞ্জু-বিজু আর মানসী, এই নিয়ে ভরে থাকত ঘরটা। মানসী হাসপাতালে যাবার পর ওর জায়গাটা দখল করার কথা আর কারও মনে হয়নি।

দু' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিক স্তব্ধচোখে তাকিয়ে থাকলেন রাজশেখর। গরমের জন্যে জানলাটা খোলাই থাকে। মাঝরাতে বৃষ্টি নেমেছে, তখন সকলেরই ঘুমে অচৈতন্য থাকার কথা। উঠে গিয়ে কপাট দুটো বন্ধ করার কথা মনে হয়নি কারও। আকাশে ঘোর থাকলেও কপাট, শিক ও জালে মেশানো অদ্ভুত একটা ছায়া পড়েছে বিছানায়। মানসী থাকলে ওই ছায়া ওর গায়ে পড়ত। হাসপাতালে অবশ্য এমন কিছু হবে না। নার্স আছে, সারা রাত তার পাহারা দেবার কথা। বৃষ্টি এলে সে-ই জানলাটা বন্ধ করে দিতে পারবে। এখানে তা হয়নি। বৃষ্টির ছাঁট লেগে হয়তো এরই মধ্যে ভিজে গেছে বিছানাটা—স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে তোশক, তুলো। আজ ভোরে মানসী যদি হঠাৎ ফিরে আসে, বিছানার অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই কষ্ট পাবে। ছোটখাট অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ তার ভাবনা কুড়োয়, ভাবনাগুলো জুড়ে জুড়ে পৌঁছে যায় ধারণায়। অসুখের বিছানায় শুয়ে শুয়ে মানসী কি ভাবে, রাজশেখরের সংসার থেকে সে যা যা আশা করেছিল তার কিছুই পায়নি!

জোরে নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে গলার কাছে কী একটা জড়িয়ে যায় রাজশেখরের। জানলাটা বন্ধ করবেন ভেবেও আর এগোন না। লাভ নেই। যেমন আছে থাক। সময় চলে গেছে।

ধরে রাখা নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলেন রাজশেখর। বাথরুমে যাবেন ভেবেও পারলেন না। বিছানাটার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে মনে হবে আজই নয়, বহুকাল ধরে একইভাবে একই জায়গায় স্থাণু হয়ে আছেন তিনি। মায়া? হতে পারে। এমনও হতে পারে, স্মৃতি আজ তাঁর ঘাড় ধরে এনে দাঁড় করিয়েছে ওই জায়গায়—মনে পড়ে?

আজ নয়, আরও আগে। ঠিক কতো দিন আগে? অসুখের বালাই ছিল না তখন। একদিন রাতে হঠাৎ ফিরল না মানসী—

না, তারও আগে। রাজশেখর কিছু জানবার আগে হয়তো সবই জানত গীতা, তপুরা। সময় চলে যাবার পরও যখন ফিরল না মানসী, ওরা একটুও বিচলিত হয়নি। শুধু একটা স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়েছিল সংসার জুড়ে। দেখতে দেখতে নিশুতি হলো চারিদিক—দৃশ্যমান আলোগুলো একে একে নিবে যেতেই ছড়ানো শব্দগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে নিল অন্ধকার। রুটি কারখানার ঘড়িতে একটা বাজতে গীতার হুঁস হলো যেন। দুই হাতে ভর দিয়ে বিছানায় পা ঝুলিয়ে তখনো বসে আছেন রাজশেখর। যদি ফেরে, দরজা খুলতে হবে।

গীতা বলল, 'শুয়ে পড়ো। ও আজ ফিরবে না।'

'দেখি—', বুজে আসা গলায় শব্দ সঞ্চার করে বলেছিলেন রাজশেখর, 'যদি ফেরে। অতো বড় মেয়ে, বাড়ি ফিরল না! বিপদ-আপদও তো হতে পারে!'

'বিপদের কথাটাই আগে ভাবো কেন! অতো বড় মেয়ে বলেই নিশ্চিন্তি। নিজের দায়িত্ব ও নিজেই নিতে পারবে। তুমি শুয়ে পড়ো।'

জবাব না দিয়ে মুহ্যমান শরীর টেনে হেঁটে গিয়ে দু' ঘরের মাঝখানের দরজাটার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন রাজশেখর। সেদিন বৃষ্টি ছিল না; জ্যোৎস্নার আলো সমূহ ছায়া নিয়ে জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মানসীর শূন্য বিছানায়। কিছুক্ষণ সেই দৃশ্যে চোখ রেখে আবার নিজের জায়গায় ফিরে একইভাবে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসতে বসতে বলেছিলেন, 'দেখি। ফিরতেও পারে—'

'তুমি খামোখা চিন্তা করছ! ও ফিরবে না আজ।'

'কী বলছ!' এবড়ো খেবড়ো গাছের গুঁড়ির ধরনে গীতার আকস্মিক উঠে বসার দিকে তাকিয়ে বিহ্বল গলায় বলেছিলেন রাজশেখর, 'কেন বলছ! তুমি জানো? তোমাকে বলে গেছে?'

'বলেনি। তবু বলছি—'

ক্ষিপ্তভাবে স্ত্রীর নিঃশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজশেখর।

'কী জানো!'

'মেয়েমানুষের ইচ্ছে শাসন মানে না। যেটা স্বাভাবিক সেটাকে কেন মেনে নিতে পারো না তুমি!'

'কী বলছ!'

রাজশেখরের অনুমান তখনো কোনো বিশ্বাসে পৌঁছুতে পারেনি। শুধু জোরটা কমে যায়। গীতাও চুপ করে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে থেমে থেমে কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, 'মানুরা আজ রেজিস্ট্রি করেছে।'

'কী বলছ!'

'হ্যাঁ!' গীতা বলল, 'শুতে যাবার আগে তপু বলে গেল—'

'তপু জানত!'

গীতা উত্তর দিল না।

কপালে বাজ পড়ার শব্দে হঠাৎই সারা গায়ে আগুন জ্বলে উঠেছিল রাজশেখরের। ছটফট করতে করতে বললেন, 'কোথায় তপু! আজ ওর ছাল-চামড়া তুলব!'

সেইভাবেই উঠতে যাচ্ছিলেন, না চেঁচিয়ে রাজশেখরের হাতটা চেপে ধরল গীতা।

'চেঁচিও না!' হাঁফাতে হাঁফাতে গীতা বলল, 'ওদের ছাল-চামড়া আমরাই দিয়েছি, তুলতে গেলে আমাদেরই লাগবে। ছিঃ!'

রাজশেখর নিরস্ত করলেন না নিজেকে। তবু, কী ছিল গীতার ওই কথাগুলোয়—মুহূর্তে অসাড় হয়ে এলো তাঁর হাত-পা, সমগ্র শরীর। এতোক্ষণের ধরে রাখা শরীরটাকে আস্তে ছড়িয়ে দিলেন বিছানায়। একটা হাত উঠে এলো কপালের ওপর।

পর্যুদস্ত স্বামীকে লক্ষ করতে করতে নরম হয়ে এলো গীতা।

'বিয়ে করার ইচ্ছে তো ওর অনেক দিনই ছিল। বলেও ছিল। আমরাই দিইনি।'

'দিলে আমার মাথায় কুড়ুল পড়ত। আজ পড়ল।'

এরপর আর কথা থাকে না। থাকলেও, বলা যায় না। এমনও হতে পারে, বলার কথাগুলো অর্থ পাল্টে অস্পষ্ট ও অর্থহীন হয়ে পড়ে ক্রমশ। নিঃশ্বাস হারিয়ে ফেলে স্বাভাবিকতা।

'তুমি তোমার কথা ভাবছ, তার কথাটা একবারও ভাবলে না!' চাপা, গুমরানো গলায় পরে বলেছিল গীতা, 'কতো যে সাধ থাকে মানুষের! কিছুই মেটে না : কুড়ুল মারার দরকার কী! কোনো কোনো মানুষ কপালে দাগ নিয়েই জন্মায়।'

স্মৃতি ছায়া ফেলে স্মৃতিতে, ভুলে যাওয়া কথা থেকে বেরিয়ে আসে অর্থ। অর্থের ভার ক্রমশ ছেয়ে ফেলে রক্ত-মাংসের শরীর। আজ রাতে ঠাণ্ডা চৌবাচ্চার জলে কপাল ধুতে ধুতে প্রায় অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েন রাজশেখর। একটা দাগ আছে, নিশ্চিতভাবে আছে—সেটা এখনই খুঁজে নেওয়া দরকার।

কখনই যে তিনি সরে এলেন দুই ঘরের মাঝখানের দরজা থেকে, খিল খুললেন আর একটা দরজার, আর হেঁটে এলেন প্রায়ান্ধকার বাথরুমে, খেয়াল করেননি। খেয়াল যখন হলো তখন তিনি মাটিতে। তাঁর আগে আগে একটা শব্দ ছুটে গেল কানের ভিতর দিয়ে। কী হয়েছে না হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলেন না রাজশেখর ; এমনকি কোনো ব্যথাও টের গেলেন না। শুধু অনুভব করলেন, কী রকম একটা বোধে জড়িয়ে যাচ্ছে মাথা!

আলো জ্বেলে বাথরুমে ছুটে এলো গীতা।

'এ কী! হে ভগবান!'

আলোর সামনে কেমন একটা জোর পেলেন মনে। গীতা তুলে না ধরলে নিজেই উঠে দাঁড়াতেন রাজশেখর। ভীত স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললেন, 'কিছু হয়নি। চেঁচিও না।'

ধরে ধরে ওঁকে বাথরুম থেকে বের করে আনল গীতা। অগোছাল বেশবাস। বারান্দার তক্তপোশের ওপর রাজশেখরকে বসিয়ে নিজেকে গোছালো। দৃষ্টি তখনো ঘোলাটে। নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

'হ্যাঁ গো, কিছু হয়নি তো?'

'কী আর হবে!' বাঁ হাতের কনুইটা দেখিয়ে অল্প হাসলেন রাজশেখর, 'সামান্য লেগেছে—'

নিজের হাতে তাড়াতাড়ি স্বামীর হাতটা তুলে নিল গীতা।

রাজশেখর বললেন, 'আলোটা নিবিয়ে দাও।'

সামনে উঠোন। সিমেন্টের ওপর জল চকচক করছে এখনো। বৃষ্টিতে জোর নেই তেমন। কোথাও টিনের পাত্র বা ক্যানেস্তারার ওপর থেমে থেমে চুইয়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা—ড্রিপ, ড্রিপ—থেমে থেমে মন্থর শব্দ উঠছে একটা। ফুলের টব ছড়ানো উঠোনের দু' ধারে, বৃষ্টির জল পেয়েই সম্ভবত কোনো কোনো গাছে কুঁড়ি ধরতে শুরু করেছে, তার মৃদু সুবাস উড়ে এলো নাকে। আকাশ দেখতে গেলে ঘাড় তুলতে হয়। তবু, চারিদিকে তাকিয়ে

মনে হয় অন্ধকার থাকলেও ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। হয়তো আর একটু পরেই পাখির গলা শোনা যাবে। জ্বলজ্বলে চোখে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠোনের ওপর দিয়ে কোনাকুনি দৌড়ে গেল একটা কালো বিড়াল।

পঁয়ত্রিশ বছরের অভ্যস্ত হাতে এখনো রাজশেখরের চোট-লাগা হাতটা ডলে যাচ্ছে গীতা। বাসি শরীর থেকে উঠে আসছে পুরনো গন্ধ। কোথাও কথা নেই কোনো। রাজশেখর নিজেই টেনে নিলেন হাতটা।

'লাগেনি। লাগলে বলতাম।'

দাঁড়ানো অবস্থা থেকে তক্তপোশের ওপর পা তুলে বসল গীতা। রাজশেখরের পিঠ থেকে গেঞ্জিটা তুলে হাত বোলাতে লাগল পিঠে।

'সেদিন কাঁদলে, আজ পড়ে গেলে। আমার কপালে যে কী আছে জানি না!'

আতঙ্ক বা অভিমান, গীতার স্বরে কোনো কিছুই স্পষ্ট হয় না। চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাজশেখর। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'শ্রাবণ মাসেও তারিখ থাকে। পাঁজিটা একটু এনে দেবে আমাকে?'

'কী বলছ! পাঁজি কী করবে এই সময়!'

'থাক তা হলে। সকালেই দিও।'

গীতা চুপ। রাজশেখরের পিঠের ওপর ওর হাতটা কয়েক সেকেণ্ড থেমে থেকে আবার ওঠানামা শুরু করল।

'একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্ট্রেচারে ধরাধরি করে কারা যেন কেবিনের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে মানুকে। চাদরে ঢাকা—'

হাতটা থেমে গেল গীতার। স্বামীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঠোনের দিকে তাকাল ও। কথা বলল না কোনো।

'স্বপ্ন কি সত্যি হয়?'

'কী করে বলব!'

'আমিও জানি না। তবে—তবে অনেক সময় সত্যকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসে। তাই ভাবছি—'

তক্তপোশের ওপর হাতের ভর থাকলেও পিঠটা নুয়ে পড়েছে অনেকখানি। দু' ধারে উঁচু কাঁধের মাঝখানে মাথাটা চেপে বসানো। আর একটু ঝুঁকলেই স্কন্ধকাটা মনে হবে। লম্বালম্বি প্রকট শিরদাঁড়া থেকে চামড়া ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। আলাদাভাবে সেখানে হাত রাখতেই গীতা অনুভব করল রাজশেখর কাঁপছেন। অবলম্বন খোঁজার জন্যেই সম্ভবত হাত দুটো দু' পাশে ছড়িয়ে পড়েছে আরও।

'মানু গেলে ছ-সাতশো টাকা রোজগার কমে যাবে সংসারের। ওর দাম। মানু গেলেও অন্যরা থাকবে। এইভাবেই ভেবেছি। রক্ত তো ছিল আগে—কোথায় গেল হঠাৎ! আমাদের দাঁতে-মুখে লেগে নেই তো!'

'তুমি থামো—থামো—'

কোথাও একটা ভাঙচুর হচ্ছে; পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে মাটি। বড়ো কষ্ট সারাক্ষণ নিজের ভিতর নিজেকে আটকে রাখা। গীতাও পারল না। দু' হাতে রাজশেখরের কাঁধ দুটো চেপে ধরে কপালটা ঠুকতে লাগল ওঁর পিঠে। যদি এইভাবেই ফিরে যাওয়া যায় নিজের নির্দিষ্ট জায়গায়।

রাজশেখরের ভাবান্তর হলো না কোনো। একই ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন উঠোনের দিকে। একই দৃষ্টিতে। তারপর বললেন, 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলব, বিয়েটা দিয়ে দেবো। রেজিস্ট্রি বিয়ে কি কোনো বিয়ে! বাপের কর্তব্য আমি আর কবে করলাম!'

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে হঠাৎই চুপ করে গেলেন রাজশেখর। কাশলেন একটু। তারপর সামনে তাকালেন। তাকিয়ে থাকলেন। ভোর হচ্ছে। একটা দুটো করে ক্রমশ শোনা যাচ্ছে পাখির গলা। এরই মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে কখন খেয়াল হয়নি। রুটি কারখানার ঘড়িতে পর পর বেজে যাচ্ছে সময়—কান সতর্ক রেখেও ঠিক ক'টা ধরতে পারলেন না। আঁচল বুলিয়ে ঘাড় ও পিঠের ঘাম মুছে দিচ্ছে গীতা। সারাক্ষণ কাছে থাকার কী অপরিসীম চেষ্টা!

আবেগশূন্য বুক থেকে ভারী একটা নিঃশ্বাস উঠে এলো রাজশেখরের। সইয়ে নিয়ে বললেন, 'বয়স হয়ে গেছে, এখন রক্তের জোর কম। মাথাটা গোলমাল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কী যে বলি, কী যে করি, খেয়াল থাকে না কিছু!'

'সারাক্ষণ ভাবো বলেই এমন হচ্ছে!'

'বোধ হয় তাই!'

'রোগ হয়েছে, চিকিৎসা চলছে—', অনেকক্ষণ পরে সহজ হবার চেষ্টা করল গীতা, 'নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী! মানু ছাড়াও আরও চারটে আছে। এরপর তোমার যদি কিছু হয়!'

'আমার কিছু হবে না।' দুঃখময় একটা হাসি খেলে গেল রাজশেখরের ঠোঁটে, 'তুমি বলেছিলে, কোনো কোনো মানুষ কপালে দাগ নিয়ে জন্মায়। তাদের কিছু হয় না। দাগটাই বাড়তে থাকে শুধু।'

কথায় পেয়ে বসেছে রাজশেখরকে। না থামালে থামবে না। গীতা আমল দিল না। খানিক সময় নিয়ে বলল, 'আজ মঙ্গলবার। চলো না, ভোর-ভোর কালীঘাটে ঘুরে আসি দুজনে?'

॥ তিন ॥

একদিন সকালে ইচ্ছায় ভরে ওঠে মানসী। হঠাৎই মনে হয়, সে ঠিক জানে না কেন সে দিনের পর দিন পড়ে আছে এই হাসপাতালের বিছানায়, কিন্তু সে ঠিক জানে তার আকাঙ্ক্ষায় ভুল থাকবে না কোনো—সে ঠিক ভালো হয়ে উঠবে।

ভাবনাটা অন্য রকম করে দেয় তাকে। অদ্ভুত জোর পেয়ে যায় শরীরে—শারীরিক যে-আলস্য সারাক্ষণ ঝিম ধরিয়ে রাখত শরীরে, হাঁটু, কনুই ও কোমরে শিকল হয়ে এঁটে থাকত খিল, ঘাড়টা নুয়ে পড়তে চাইত বুকের ওপর, কোনো অলৌকিক জাদুবলে মুহূর্তেই অন্তর্হিত হয়েছে সব। পরিবর্তে বড়ো সুন্দর এক বেঁচে থাকার অনুভব শরীর ও মন জুড়ে ক্রমশ আচ্ছাদিত করছে তাকে! অনেক দিনের মধ্যে এরকম হাল্‌কা ও অভিমানশূন্য মনে হয়নি নিজেকে। নিতান্তই হাসপাতাল এটা, বাস্তবই চিনিয়ে দেয় অসুখের বিছানা—তা না

হলে সে এই সেদিন পর্যন্ত যে-রকম ছিল সে-রকমই থাকত।

হাসপাতালে থাকতে থাকতে এমনিতেই ঘুম পায় তার ; ঘুম না এলে নার্সের প্রত্যাশিত হাতে জিবে এসে আটকে যায় নীল কিংবা ধূসর বড়ি।জেগে ওঠার জন্যে নির্দিষ্ট সময় থাকে না কোনো, ঘুম ভাঙলেও জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে ঘুমের ক্লেদ। কিন্তু, অন্য রকম হবে বলেই সেদিন সকালটা তাড়াতাড়ি ঠেলে তোলে তাকে। ঝরঝরে লাগে, বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে টান লাগে না কোমরে, দিব্যি দু' হাত তুলে অগোছাল চুলটাকে খোঁপায় জড়িয়ে নেয় সে। আস্তে বিছানা থেকে নেমে সরিয়ে দেয় জানলার পর্দাটা।

সুখে নরম হয়ে আছে চারিদিক। উৎফুল্ল হওয়ায় নেই কোনো জড়তা—ইতস্তত হালকা মেঘে জড়ানো নীল আকাশ তৈরি হয়ে আছে প্রথম রোদ্দুরের আবির্ভাবের অপেক্ষায়। রঙ-বেরঙের বাড়িগুলো পেরোলে সবুজে মসৃণ গাছগাছালি, তারই ফাঁক দিয়ে ঈষৎ উত্তরে তাকালে চোখে পড়ে রেসকোর্সের মাঠ—আরও এগিয়ে ফ্লাইওভারের নির্জন কাঠামো। একসঙ্গে অনেক পাখির গলা, কোনটা কার চেনা যায় না আলাদা করে। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দ্রুত ধাবমান গাড়ির শব্দ। ব্যস্ততা আছে, চাঞ্চল্য নেই—প্রকৃতিও হয়ে আছে উদার, চোখ কান খুলে রেখে দৃশ্য ও শব্দের এই সব সৌন্দর্য নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে করতে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মানসীর অনুভূতি। বেঁচে থাকার আর এক অর্থ ভালো লাগা, সে ভাবল, অনুভূতিই বলে দিচ্ছে সে এবার ভালো হয়ে উঠবে। একটা গান গুনগুন করে উঠল মনে—শব্দে সঞ্চার হবার আগেই দমকা অথচ স্নিগ্ধ হাওয়ায় মুখ ভেসে গেল তার। ভালো লাগছে ; যে-কোনো উপলক্ষেই সাড়া দিচ্ছে শরীর। ইচ্ছে করছে এক ছুটে বেরিয়ে যেতে এই কেবিন থেকে। করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি নেমে ইয়ার্ড, ইয়ার্ড পেরোলে গেট আর রাস্তা, তারপর—। এমন তো কতোই হয়, ভাবল, হাসপাতাল থেকে রোগী বা রোগিণী নিখোঁজ, প্রায়ই পড়া যায় খবরের কাগজে! তার নামেও বেরোবে হয়তো। কিংবা, তেমন কোনো হৈ-চৈ পড়ার আগে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে পারে সে ; সঙ্গে দীপঙ্কর থাকতে পারে—রিলিজ বণ্ডে কারও না কারও সই থাকা দরকার। সত্যি সত্যিই সে যদি এমন করতে পারে, হঠাৎ চোখের সামনে তাকে দেখে খুব কি অবাক হবে দীপঙ্কর ? কী ভাববে সে ? শরীরের অসুখ এবার ঢুকে পড়েছে মাথায়! নাকি অন্য কোনো টানে ছুটে এসেছে মানসী! কদিন আগেই সে লোভের কথা বলেছিল, বলেছিল ইচ্ছার কথা। সময় চলে যাচ্ছে ; চলে যাবার আগে ছুটে এসেছে নিজেকে একটু পূরণ করে নেবার জন্যে ? যদি তাই হয়, দীপঙ্কর কি ফিরিয়ে দেবে তাকে, আবার পৌঁছে দেবে এইখানে, এই হাসপাতালের বিছানায় ? কেবিনের চার দেওয়ালের বাইরে বহু দিন দেখা হয় না তার সঙ্গে—নির্দিষ্ট সময়ে আসে, চলে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় দীপঙ্করও হয়ে উঠেছে হাসপাতালেরই একজন!

ভাবতে ভাবতেই অল্প একটু বিষাদ ছুঁয়ে গেল মানসীকে। তবু জোরটা গেল না। আকাশের নীল থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে হালকা রোদ্দুর—চারপাশের শব্দে যুক্ত হচ্ছে নতুন শব্দ। হয়তো এটাই সত্যি, ছোট একটা নিঃশ্বাস সংবরণ করে সে ভাবল, আলাদা করে ভাবছে বলেই এগুলির নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ছে তার কাছে। একদিন যখন সে আবার মিশে যাবে এ-সবের সঙ্গে, তখন আর কিছুই আলদাভাবে চোখে পড়বে না, কানে শুনবে না। একদিন! ঠিক কবে ?

শব্দে ফিরে এলো মানসী। ট্রেতে চা নিয়ে কেবিনে ঢুকেছে চাঁপা। রাতের নার্স

'আজ এতো সকালে ঘুম ভাঙল ?'

'কী জানি।' স্বচ্ছন্দে হাসল মানসী, 'কতো দিন পরে সকালে উঠলাম।'

'ঘুম হয়েছিল ?'

'খুউব।'

পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে আড়চোখে মানসীকে দেখল চাঁপা।

'আমি একবার ঘুরে গেছি। তুমি জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলে। মুখ ধুয়েছ তো ?'

চায়ের কাপটা চাঁপার হাত থেকে টেনে নিল মানসী। চুমুক দেবার আগে হাল্‌কা কামড় দিল বিস্কুটে।

'আজ সকাল থেকেই কেমন যেন ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে—'

'কী ?'

অল্প দ্বিধা বোধ করল মানসী ; ভাবল, এসব কথায় ছেলেমানুষী নেই তো! তারপর বলল, 'অসুখের আগে যেমন ছিলাম। ঘুম ভাঙলেই ঘুম ভেঙে যেত, কোনো আলস্য লাগত না, দুর্বল লাগত না।'

'ভালো তো, খুব ভালো!' চাঁপা নিজেকে ছড়িয়ে দিল, 'এইভাবে চললে তোমার ছুটি, আমারও ছুটি।'

জানলা দিয়ে রোদ ঢুকছে কেবিনে। পর্দার অস্থিরতা নিয়ে চৌকো এক টুকরো রোদ কাঁপছে বালিশের ওপর। একটা হাত সেই রোদের ওপর মেলে ধরল মানসী, দেখল উল্টেপাল্টে। আবার ছায়ায় টেনে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল আবার। রোদ্দুরই তফাত ঘটায়!

তখনো তারা নতুন ; যখন-তখন বেরুতে ভালো লাগে। একদিন সকালে ট্রাম থেকে নেমে হঠাৎ-খেয়ালে দুজনে হেঁটে গিয়েছিল ময়দানের দিকে। ছায়ায় মেশা নরম রোদ্দুরে শাসন ছিল না কোনো—চারিদিকে অনেক দূর অব্দি ব্যাপ্ত সবুজে গ্লানি নেই কোনো—মাটি থেকে উঠে আসা কাঁচা গন্ধ আশ্লেষের অনুভূতি ঘন করে তুলছে শরীরে। আশেপাশে লোকজন ছিল না বললেই হয়। পেরাম্বুলেটর ঠেলে একটা বাচ্চার পিছনে দৌড়চ্ছে এক আয়া—শিশুটি দৌড়চ্ছে, দৌড়তে দৌড়তে টালমাটাল পায়ের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, আবার উঠছে, আবার ছুটছে। ওদের ছাড়িয়ে রাস্তার দিক থেকে ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে বয়স্ক ন্যুব্জ একটি লোক মাঠ পার হচ্ছে কোনাকুনি। ধীর, সম্পর্কহীন, এক লক্ষ্যে সেই বৃদ্ধটির হেঁটে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দীপঙ্কর বলেছিল, 'মনে হয় না মানুষের জীবন খুব একার ?'

'না, হয় না।' তৈরি উত্তর এসে গিয়েছিল মানসীর গলায়, 'যাকে যখন যেভাবে দেখা যায়, তখন তেমনিই লাগে। তুমি আর কিছু দেখছ না!'

বুঝতে সময় লাগে না। ওরা তখন পেরাম্বুলেটরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। মানসী ঘন হয়ে এসেছিল ; আঙুলে জড়ানো আঙুলগুলো থেকে উত্তাপ টেনে নিতে নিতে অস্ফুট গলায় বলেছিল, 'আর কতো দিন এইভাবে শুধুই ঘুরে বেড়াতে হবে ?'

তখুনি কোনো জবাব দেয়নি দীপঙ্কর। আরও একটু হেঁটে গিয়ে বলেছিল, 'প্রশ্ন আমারও। সমস্যাটা দুজনেরই। আমি তো তৈরিই আছি, মানসী। তুমি কি পারবে বেরিয়ে আসতে ?'

তখনই বুঝতে পেরেছিল মানসী, সব প্রশ্নের উত্তর থাকে না। রোদ্দুর তাপ ছড়াবার

আগেই দুজনের মধ্যে দূরত্বটা চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি কোনো। অভিমানের বদলে অন্য কিছু আটকে গিয়েছিল গলায়। পরে বলেছিল, 'রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে মনে হয় পাঁচ-বিছানার ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে একদিন আমি বুড়ো হয়ে যাবো। তখন শরীর থাকবে না, মনও থাকবে না। চাইলেও কি আর দিতে পারব কিছু! তখন তোমারও আর ভালো লাগবে না আমাকে!'

'এসব যতো ভাববে, ততোই খারাপ লাগবে।' দীপঙ্কর বলেছিল, 'মানসী, যদি আমাদের মেলামেশা না হতো, তা হলে কি এই কথা ভাবতে?'

'জানি না।'

'আমি জানি, ভাবতে না। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারি—।' একই সঙ্গে দুজনকে সম্বোধন করে বলেছিল দীপঙ্কর, 'জীবনের একটা প্র্যাক্টিকাল দিক আছে, সকলের মুখই সেদিকে ফেরানো। তুমি তোমার কথা বললে। রোজ রাতে শুতে যাবার আগে আমি কী ভাবি জানো?'

সোজাসুজি দীপঙ্করের চোখে চোখ রেখেছিল মানসী। ভারটা নেমে যাচ্ছে; এখন সে কথা বলবে না। যা বলার দীপঙ্করই বলুক।

'ঠিক ভাবি না। হিসেব করি। নিজেদের জন্যে কতোটা এগোলাম, আরও কতো দরকার। কবে তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলতে পারব—'

'বক্তৃতা থামাবে!' মানসী হেসে ফেলেছিল। হাসি থামিয়ে বলেছিল, 'বেচারা তুমি! সত্যি, আমার যে এতো দাম জানতাম না!'

ভাবনাগুলো থেমে দাঁড়িয়েছে এক জায়গায়। সামনে অনেকগুলো রাস্তা বলেই এগোতে পারছে না কোনো দিকে। পেরাম্বুলেটরের সামনে দিয়ে টালমাটাল পায়ে ছুটছে একটি শিশু, ন্যুব্জ শরীর নিয়ে সম্পর্কহীন এক বৃদ্ধ কোনাকুনি হেঁটে যাচ্ছে দূর দিয়ে—অস্পষ্ট কিন্তু স্পষ্ট এই সব দৃশ্যের ভিতর দিয়ে মানসী তাকাল রোদ্দুরে মেলে ধরা নিজের হাতটার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখার ফলেই সম্ভবত হাতের পিঠটা তেতে উঠেছে অল্প, এগোতে এগোতে রোদ্দুর উঠে এসেছে প্রায় বুক পর্যন্ত, খেয়াল করেনি। এখনো করল না। চা-টা শেষ হয়নি এখনো; তবু আর মুখে দিতে ভালো লাগল না।

'রোদ আসছে—।' উঠে গিয়ে পর্দাটা টেনে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল চাঁপা, 'আবার কী ভাবতে শুরু করলে?'

জবাব না দিয়ে শূন্য চোখে চাঁপার মুখের দিকে তাকাল মানসী এবং ভাবল, এক রাতের জন্যে কুড়ি টাকা দিতে হয় চাঁপাকে। টাকাটা দীপঙ্করই দিচ্ছে। যখন এসব কথা বলেছিল তখন রোজই নিশ্চিত সে উপরের দিকে উঠত, সংখ্যার সঙ্গে জুড়ে দিত সংখ্যা। এখন নামছে। এখন থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত, রোজ রাতে শুতে যাবার আগে কী ভাবো আজকাল? যা ভেবেছিলে তার চেয়ে আমার দাম বেশি! নামতে নামতে যখন সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছুবে, তখন কি মনে হবে না, মানসীর জন্যে বড্ড বেশি ক্ষয় করে ফেলেছ নিজেকে!

একটা আবেগ আসছিল, জোর ক'রে সেটাকে চাপা দিল মানসী। আজ তার ভালো লাগছে; কোনো জড়তা নেই কোথাও, শরীরে দুর্বলতা নেই কোনো। হয়তো কাল আরও একটু ভালো লাগবে। তার পরের দিন আরও একটু। দীপঙ্করকে বলবে, কিছু দিন তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখো। যদি কিছু হয়, তোমার কাছেই হবে।

মনটা হঠাৎই ভরে ওঠে আবার। দোলা লাগে রক্তে। বিছানা থেকে নেমে স্বচ্ছন্দে হাঁটার চেষ্টা করে মানসী।

'চাঁপাদি ?'

'বলো ?'

'সেদিন বলছিলে ষোল বছর ধরে তুমি নাকি এই কাজ করছ ? কতো রুগী দেখেছ ? নিশ্চয়ই অনেক ?'

'অনেক না ?' চাঁপা বলল, 'এখন আর গুনতিতে কুলোয় না।'

পায়চারি করতে করতে থেমে দাঁড়াল মানসী।

'একটা সত্যি কথা বলবে ?'

হাসিটা জিইয়ে রাখল চাঁপা। বয়স্ক চোখে কৌতূহল।

'তাদের মধ্যে কতোজনকে মরতে দেখেছ ?'

চাঁপা বোধ হয় এই প্রশ্নটা আশা করেনি। ছায়া নেমে এলো মুখে। মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল খানিক। তারপর বলল, 'সত্যিই বলছি। বেশি নয়। খুব কম। হাতে গোনা যায়।' বলতে বলতে মানসীকে দেখল—কথায় কান রেখে এখনো পায়চারি করছে যথেচ্ছ। বলল, 'আজকাল চিকিৎসা কতো ভালো। কতো ভালো ভালো ওষুধ, ইঞ্জেকসান, কতো ভালো ভালো ডাক্তার। মরতে মরতে এসেও কতো রুগী যে ভালো হয়ে চলে যায়।'

কথায় পেয়ে বসেছিল চাঁপাকে। বলতে বলতেই থেমে গেল হঠাৎ।

মানসী বলল, 'মরতে কারও ভালো লাগে শুনেছ ?'

'ও মা। সে কী কথা। তবে—', চাঁপার ভঙ্গিতে মনে পড়ার ধরন। ভেবে নিয়ে বলল, 'একবার এক আগুনে পোড়া বউ এসেছিল। সাত দিন বেঁচে ছিল। সে সারাক্ষণ মরতে চাইত। তার কথা আলাদা। স্বামী চাইত না, কেউ ভালোবাসত না। ছেলেপুলেও ছিল না যে মায়া থাকবে। আমাকে বলেছিল। তা, সে আর বাঁচতে চাইবে কেন! ভালোবাসা পেলেই মানুষ বাঁচতে চায়।'

কথাগুলো শেষ করে কিছুটা খুশির ভাব নিয়ে তাকাল চাঁপা ; প্রশ্রয় পেলেই হয়তো শুরু করবে আর একটা গল্প। মানসী আমল দিল না।

সুস্থ বোধ করলেও এতোটা হাঁটাচলা করা ভালো নয় ; হোক না কেবিনের মধ্যে—তাতেও পরিশ্রম আছে। ইতিমধ্যে ঘাম জমতে শুরু করেছে গলায়। হাঁটু দুটোও সিরসির করছে অল্প। উরুতে জোর নেই তেমন। এই অসুখটা হবার পর থেকেই কেন যেন মনে হয় কোমরের পরই শুরু হয়ে গেছে হাঁটু—কিম্ভূত আকার নিয়ে ধড়টা চেপে বসছে ক্রমশ। 'মনে যাই হোক, ডাক্তার বলেছিল একদিন, 'চোখে কী দেখছেন ? আছে ? ওটা দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়।' তা ঠিক। অসুখ হলেই উপসর্গ থাকবে।

ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হাসল মানসী। খানিক বিশ্রামের জন্যে আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সরিয়ে দিল পর্দাটা। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আড়াল হয়ে যাচ্ছে রোদ. উত্তাপ টের পাওয়া যায় না। শূন্যে সমুদ্র ভাবলে ঢেউ হয়ে দমকে দমকে ছুটে আসছে হাওয়া। পরাক্রান্ত হয়ে উঠছে শব্দ। এই সবই কিছু-না-কিছু স্পর্শ করে যায় মানসীকে ; আড়াল করে না। নিতান্তই কথার কথা, কিংবা খেলো গল্প—হয়তো খুশি করার জন্যে আরও অনেককেই বলে যায় একই গল্প। তবু, চাঁপার শেষের কথাগুলোয় জড়িয়ে ছিল কী যেন মায়া, অনুভূতি জুড়ে এখনো বেজে যাচ্ছে টুং টাং করে। ভালোবাসা পেলেই মানুষ

বাঁচতে চায়। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে, বুকের মধ্যে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঙাল। তার অঞ্জলি ভরে না কখনো—আঘাতে-অসুখেও ক্রমাগত গড়িয়ে যায় রস, অভিমানে জমে ওঠে স্মৃতি, স্মৃতি আড়াল খোঁজে সম্মোহনে। তখন আর স্পষ্ট করে চেনা যায় না কিছু ; শুধু বোধটাই থাকে। কাজ করে সারাক্ষণ। বোধটাই বাঁচিয়ে রাখে।

বেঁচে থাকার অদ্ভুত বোধে এই মুহূর্তে শরীর চিৎকার করে উঠল মানসীর। টের পেল ভালোবাসার আবেগে চনমন করছে সমস্ত স্নায়ু। এই হাসপাতাল, এই কেবিন, সারাক্ষণের শাসন আর ওষুধের গন্ধ আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

'রোদে দাঁড়িও না। মাথা ধরবে।'

চাঁপার কথায় হুঁস হলো। জানলা থেকে সরে এসে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল মানসী। আঁচল তুলে মুখ মুছল চাপ দিয়ে।

'দেখছ, এরই মধ্যে মুখখানি লাল করে ফেললে কেমন!'

'গরমে চাপ দিলে এ-রকমই হয়।' মানসী এড়িয়ে যেতে চাইল। একবার শুরু করলে থামতে চায় না এরা। কিন্তু, এই মুহূর্তে সামনে আর কাউকেই ভালো লাগছে না—হঠাৎ জ্বলে ওঠা অনুভূতির তীব্রতা চাইছে একান্ত হতে। কানায় কানায় ভরে উঠেছে শরীর। চাঁপা তার কী বোঝে! তখন, অসহিষ্ণুতা থেকে সে বলল, 'জলটা ধরে দেবে? চান করব।'

'এই সকালে চান করবে?'

'সকাল আর আছে কোথায়! রোদ চনমনে হয়ে উঠেছে। আমার ইচ্ছে করছে—'

বিরক্তিটা লুকোতে পারল না মানসী। কয়েক মুহূর্ত অবিশ্বাসের চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বাথরুমে চলে গেল চাঁপা। দরজা বন্ধ করার শব্দ। প্লাস্টিকের বালতিটা ঠেলে দিচ্ছে কলের নিচে, কল থেকে জল পড়ছে, তার শব্দ। শব্দটায় কান রেখে মানসী ভাবল, জল এইভাবেই পড়ে—আকস্মিক শব্দে শুরু হয়ে ক্রমশ পরিণত হয় একঘেঁয়েমিতে। অস্বাভাবিকতা আর স্বাভাবিকতার মাঝখানে স্পষ্ট কোনো রেখা টানা যায় না। যেমন তার হাসপাতালে আসা, থাকা এবং এই থাকাটায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়া। রাস্তা চেনা আছে, সুস্থ লাগছে শরীর, জোর পাচ্ছে পায়ে—তবু ইচ্ছে করলেই, এমনকি ইচ্ছায় শরীর ভরে উঠলেও, সে আর নিজের জোরে বেরুতে পারবে না এই কেবিন থেকে। ঠিক জানে না কেন! কেন? এই ওষুধ-মাখানো চার দেওয়াল, স্টিলের খাট, সাদা পর্দা ও সাদা বিছানা-বালিশের কাছে সে কি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ! নাকি থাকতে থাকতে বিমূর্ত এই সব বর্ণনাগুলিও এক রকম ভালোবাসায় জড়িয়ে ফেলছে তাকে! ভাবতে গেলে কেমন ঘোর লেগে যায় মাথায়।

অথচ, কেবিন ঠিকঠাক হবার পর প্রথম যেদিন দীপঙ্করের সঙ্গে ভর্তি হতে এসেছিল এখানে—ভাবনায় কোনো সংস্পর্শ না থাকলেও, বিষয়টা কল্পনা করেই রাগে, অভিমানে, ঘৃণায় ছটফট করে উঠেছিল মানসী। ট্যাক্সি থেকে নেমে গেট পেরিয়ে তারা তখন বকুলগাছের তলায় ; পাশে দীপঙ্কর—স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে মানসী বলেছিল, 'যদি আরও এক ঘণ্টা পরে আসতাম এখানে, ক্ষতি হতো কিছু?'

'ক্ষতি আর কী হতো!' মুখের গাম্ভীর্য গলার স্কেলেও প্রভাব ফেলে। দীপঙ্কর বলেছিল, 'একটা সময় দিয়েছিল, সেই সময়ের আগে এলে অপেক্ষা করতে হতো। পড়ে তো থাকে না। বেশি দেরি করলে অকুপাই করে নেয়।'

মানসী একটা উত্তর চেয়েছিল ; তার জন্যে এতোগুলি কথার দরকার হয় না। যেদিকে

যাবার ঠিক তার উল্টো দিকে তখনই সে কয়েক পা এগিয়ে গেছে। দীপঙ্কর ইতস্তত করছে দেখে বলল, 'কী হলো! এসো!'

এতোক্ষণ দীপঙ্কর তাকে চিনিয়ে নিয়ে এসেছে, এবার মানসীই তাকে চেনাচ্ছে। জড়তামুক্ত পা—কিছুটা জোর করে চলা, এই ছন্দ অব্যাহত থাকলে হয়তো এখানে আসবার প্রয়োজনই হতো না। ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে দীপঙ্করের দৃষ্টি। রক্তই চালায়; রক্ত কী করে চলে কেউ জানে না। 'পঁচানব্বুইটা কেসে আমরা ফেল করি—', ডাক্তার মিত্র বলেছিলেন, 'বাকি পাঁচটা কেসই আমাদের ভরসা। কন্‌স্ট্যান্ট অবজারভেসানে রাখতে হয়। কোনো ফোরকাস্ট করতে চাই না। এখনই ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। দেখা যাক।' মানসীর কাছাকাছি পৌঁছবার আগে দীপঙ্কর ভাবল, মানসী এখন পাঁচজনের একজন এবং অনুভব করল, পঁচানব্বুই সংখ্যাটা পাষাণভার হয়ে ক্রমশ চেপে বসছে বুকে।

যে-ট্যাক্সিটায় এসেছিল, সেই ট্যাক্সিটাই এখনো দাঁড়িয়ে আছে মিটার তুলে। দরজা খুলে নির্দ্বিধায় তার ভিতরে গিয়ে উঠল মানসী।

'এসো?'

এক ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। দীপঙ্কর ঠিক করল কোনো প্রতিবাদই সে করবে না।

মানসী ওকে কাছে টানল। সন্ধে হতে দেরি আছে তখনো। যে-কোনো ট্যাক্সির মতোই ট্যাক্সিটা চলছে।

মানসী হাসল।

'অতো গম্ভীর কেন?'

'না! গম্ভীর কোথায়!'

উল্টো রাস্তায় যাত্রা, তাই সব কিছুই এখন উল্টোপাল্টা হবে। দীপঙ্করের বদলে মানসীরই হাত উঠে আসে দীপঙ্করের হাতের ওপর—তৎপর হয়ে ওঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাঞ্চল্যে। হাতটা উপলক্ষ, মনে হবে মানসী আরও কিছু খুঁজছে। সময় ভুলে গেছে, হয়তো বয়সও।

'ভেবো না। তোমায় কোনো বিপদে ফেলব না।'

দীপঙ্কর হাসল। মানসীর মুখের দিকে তাকিয়েও চোখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। তাকানো যায় না। তারপর নিজেকে প্রশমিত করে বলল, 'কিছু ভাবছি, কে বলল!'

ড্রাইভারকে যেদিকে ইচ্ছে নিয়ে যাবার নির্দেশ মানসীই দিল। এখন কব্জির ওপর চোখ রেখে ঘড়ি দেখছে। ট্যাক্সিওলা নির্জনতা চেনে। দীপঙ্কর দেখল গাড়িটা ঠিক দিকেই যাচ্ছে।

'আমার জন্যে আলাদা ফ্ল্যাট নিলে তুমি। ধরো, যদি একটা গাড়িও থাকত তোমার, তুমিই চালাতে—তা হলে এই বেড়ানোর কোনো সাক্ষী থাকত না!'

কথা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। তবে, এই মুহূর্তে মানসীর দিক তার দিক নয়। সে শক্ত থাকবে। জবাব দেবার আগে সময় নিল দীপঙ্কর।

'কেউ কেউ সব কিছু পায়; কেউ কেউ কিছু-কিছু পায়—'

বলতে বলতে থেমে গেল দীপঙ্কর; মুঠোর ওপর চাপ—শুধু সান্নিধ্য, শুধু স্পর্শের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না মানসী। দীপঙ্কর শেষ করার আগেই নিজের কথাগুলো খুঁজে পেল মানসী।

'কেউ কেউ কিছুই পায় না।'

গলাটা চেনা। অভিমান মানসীকে অন্য রকম করে দিচ্ছে। শুকনো হাওয়ার ভিতর থেকে উঠে আসছে সবুজের আর্দ্রতা মেশানো একটা গন্ধ, সাবলীলতার অভাবে ফিরে যাচ্ছে আবার। শুধু শরীরই পারে ওই অভিমান চাপা দিতে। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে একটার পর একটা দৃশ্য পেরিয়ে যায় দীপঙ্কর। যেতে যেতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার তুলে দিল মানসীর কাঁধে, ঘাড়ের পিছন থেকে চেপে ধরল চুলের গোড়া। অভিমানের পর ছুটে আসে অভিমান। সামনে অন্ধকার। অন্ধকারে গয়নার বাক্স খুলে ধরেছে মানসী। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

শার্টের একটা বোতাম খোলা ছিল। চোখে পড়তেই হাত বাড়িয়ে সেটা লাগিয়ে দিল মানসী। ট্যাক্সিওলাকে বলল গাড়ি ফেরাতে।

এবার দীপঙ্করই ঘড়ি দেখল।

'এক ঘণ্টা হয়নি এখনো—'

'যেতে যেতে হয়ে যাবে।' আঙুল দিয়ে দীপঙ্করের গালে দাগ কাটল মানসী, 'চিন্তায় তোমার দাড়ি পাকতে শুরু করেছে—'

'বয়স হচ্ছে—'

'আমাদের বয়স হবে না।'

সহজ হয়েছে ; তবু এখনো একই সঙ্গে দুটো কথা বলে যাচ্ছে মানসী। বুঝে নেবার ভার দীপঙ্করের।

দীপঙ্কর শক্ত হলো। সময় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বার বার আরও বেশি সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানসী, সেখান থেকে পিছনে ফিরে দেখছে এই বর্তমানটাকে। এমন করলে তার চলবে না। এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটাই তার কাছে জরুরী। আবেগ কিছুই দেবে না। মানসীর সংখ্যা পাঁচের মধ্যে। সামনে টলে আসছে পঁচানব্বুইয়ের বিশাল ভারী পাঁচিল, সামলাতে না পারলে ভেঙে পড়বে। শরীরে এবং মনে যতো শক্তি আছে জড়ো করে দুই প্রবল হাতে সেই সম্ভাবনাকে ঠেলে ধরল দীপঙ্কর।

'অসুখ হলে চিকিৎসা করাতে হয়। সেটাই স্বাভাবিক। তুমি যে কী করছ!'

'ভয় পেয়েছিলাম—।'

'ভয়!' অল্প ঘুরে বসল দীপঙ্কর ; মুহূর্তের তাকানোয় যতোটা দেখা যায় দেখে নিল মানসীকে, 'চিকিৎসাতেও ভয়!'

'না।'

হাতটা দীপঙ্করের জানুর ওপর রেখে ওপর থেকে নিচে টানতে টানতে নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল মানসী। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সামনে যূপকাষ্ঠ দেখলে ছাগল ছটফট করে ওঠে, পালাতে চায়। সেই রকম। হঠাৎ মনে হয়েছিল ফিরব না বলেই যাচ্ছি! এখন মনে হচ্ছে পাগলামি।'

উপমায় ধরে আসে গলা। শরীরের ওপর বিশাল পাঁচিলের ভার। নিজেকে হঠাৎ বড়ো দুর্বল লাগে দীপঙ্করের। আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি আমাকেও পাগল করবে।'

'না, করব না।' অন্য মানসী। বলল, 'ট্রিটমেন্ট নয়, মন বলছে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, তুমিই আমাকে ফিরিয়ে আনবে।'

মানসী হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ভ্রূক্ষেপহীন ঠোঁট দুটো মুহূর্তের জন্যে

চেপে ধরল দীপঙ্করের গালের ঠিক সেই জায়গায়, একটু আগেই যেখানে সে আঙুল রেখেছিল। দীপঙ্কর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সরিয়ে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'দীপু, তুমি বুড়ো হয়ে যেও না। মনটা ভালো রেখো। মাঝখানের সময়টাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো। যেদিন আমাকে ফেরত নিতে আসবে, সেদিন তোমার আজকের বয়সটাকেই সঙ্গে করে এনো। মানুষ তো কিছুর জন্যে বাঁচে, আমি তোমার জন্যেই বেঁচে উঠব!'

কী জবাব দিয়েছিল দীপঙ্কর ? মনে পড়ে না।

ছবির পর ছবি। কথার পর কথা। গল্পের নায়ক-নায়িকা ; বিশ্বাসই হয় না এই রকম একটা ঘটনাও ঘটেছিল একদিন, কিংবা, সে নিজেই বলেছিল এই সব কথা !

ঘাড়টা পিছন দিকে ঠেলে নিঃশ্বাস সহজ করে নিল মানসী। এমনও হতে পারে, ভালো লাগছে বলেই আজ সে ভাবছেও বেশি। স্মৃতিই প্রস্তুত করে রাখছে।

কাপ প্লেট ধুয়ে জাল আলমারির মাথায় তুলে রাখছে চাঁপা। একটু আগেই ওকে স্নানের জল দিতে বলেছিল।

'চাঁপাদি, আমার স্যুটকেসটা একটু এনে দেবে এখানে ?'

'জল কিন্তু অনেক আগেই দিয়েছি—।' স্যুটকেসটা বিছানার ওপর নামিয়ে দিয়ে চাঁপা বলল, 'বাথরুমে গেলে এখনই যাও। কিংবা পরে যেও। পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারবাবু এসে পড়বেন।'

'জানি।' দু' হাতে টিপে স্যুটকেসের ডালা খুলতে খুলতে মানসী বলল, 'দুধে তো আর চান করব না, জলেই করব। পনেরো মিনিট অনেকটা সময়।'

'জল দিয়েছি, সেও তো পনেরো মিনিট হতে চলল।'

দু' দিকে দু' থাক করে গোটা চারেক শাড়ি, সঙ্গে সাজানো ব্লাউজ, পেটিকোট, ব্রেসিয়ার। এসে পর্যন্ত দুটো শাড়ির ভাঁজ ভাঙা হয়নি। ইচ্ছে করেনি, উৎসাহও পায়নি। আজ পরবে। ইচ্ছে করছে আজ একটু অন্য রকম হতে। ঠিক কী রকম ? এটা-ওটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল মানসী। যে দেখবে তার আসতে আসতে সেই বিকেল সাড়ে চারটে, পাঁচটা। ততোক্ষণ শুয়ে বসে হাই তুলতে তুলতে নতুন আর নতুন থাকবে না, ভাঁজে ভাঁজে ন্যাতা হয়ে উঠবে খোল আর আঁচল।

জবাব না দিয়ে মুখ তুলল মানসী।

'তোমার কি যাবার তাড়া আছে ?'

'না। তেমন কিছু নয়।' চাঁপা বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি আজ সাজবে। সাজো না, দেখি।'

ঠোঁট টিপে হাসল মানসী। কৃত্রিম হতাশায় ঘাড় নাড়ল বার দুয়েক।

'কী ভাগ্য !'

বলতে বলতে সবুজ পাড় হলদে শাড়িটা বের করে নিল। চার কোণের এক কোণে সিঁদুরের দাগ। চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত ব্যস্ত হয়ে উঠল আবার। চোখ একাগ্র।

খোঁজাখুঁজির পর পেটিকোটের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এলো রুপোর ছোট্ট সিঁদুর কৌটোটা। টানাটানিতে আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল ঢাকনাটা, সাবধানে আঁচল বুলিয়ে সেটাকে শাড়ির ওপর রাখল। শালপাতায় লাল সুতো দিয়ে মোড়া প্রসাদী ফুল। কয়েক দিন আগে বেশ সকালে কালীঘাট থেকে ফিরে সোজা এখানে চলে এসেছিল মা। সঙ্গে বাবা। 'এটা সব সময় সঙ্গে রাখিস। মাঝে মাঝে কপালে ঠেকাস।' মা বলেছিল, 'দেখবি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবি।' হয়তো। হাত বাড়িয়ে শালপাতার পুঁটলিটা তুলতে গিয়েও থেমে গেল

মানসী। বাসি কাপড়ে পুজোর ফুল ছোঁয়া ঠিক হবে না। হবে কি ?

প্রশ্নটা আটকে গেল মাথায়। দু' এক মুহূর্তের মধ্যেই টের পেল গরম হয়ে উঠছে নাকের পাটা। ঘামটা শুকিয়ে গিয়েছিল, আবার বিজবিজ করতে শুরু করেছে চিবুকের তলায়। অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে চটপটে হাতে একটা পেটিকোট আর ব্লাউজ তুলে নিয়ে ব্যস্তভাবে স্যুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে দিল ও। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করল আয়োডিনের মৃদু জ্বালা নেমে যাচ্ছে মেরুদণ্ড বেয়ে। পিঠ টান করে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণাটা সইয়ে নিল মানসী। সময় থাকলে স্মৃতিও থাকে ; খালি জায়গা ভরে তুলবার জন্যে আলাদাভাবে কাউকে ডাকবার দরকার হয় না কোনো। একবার ঢুকলে যেতে চায় না সহজে।

গা পিঠ উন্মুক্ত করে মাথায় জল ঢালতেই কম্প দিয়ে জ্বর এলো। মানসী ভাববার চেষ্টা করল, আজ সে ভালো আছে, আজ তার ভালো থাকার কথা। যদি তা না হতো তা হলে অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগে পরিপূর্ণ ঘুমের পর আলস্যহীন জেগে উঠত না। ভাবল, সকাল থেকে এতোটা সময়ের মধ্যে একবারও হাই ওঠেনি তার, মাথা ধরেনি একবারও। অরুচি ও বমির ভাবে জিব জড়ায়নি একটুও। কাজ হলো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করল, একটু আগে টের পাওয়া সেই একই জ্বালা কাঁপুনি দিয়ে যাচ্ছে শরীরে—কিছুক্ষণ আগে সে নিজেই তাকে ডেকে এনেছে শরীরে। আগুনের একটা নিয়ম আছে, যতোক্ষণ জ্বলে ততোক্ষণ জ্বালায়ও। জলের দোষ নেই।

তবু, এই মুহূর্তে একটু এলোমেলো হওয়া দরকার। কাউকে খারাপ ভাবলে এতো নিঃসঙ্গ লাগে ! ইচ্ছে করেই প্রয়োজনের বেশি জল নিয়ে খেলা শুরু করল মানসী। শুকনো চুলের গোড়া ভিজিয়ে ঠাণ্ডা ছড়িয়ে পড়ছে কপালের দু' পাশে। মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নরম হয়ে আছে মাটি। এমন লাবণ্যে শিকড় নিজেই ছড়িয়ে পড়ে। নিজেকে ছড়াতে ছড়াতে মানসী ভাবল, এইভাবে হাসপাতালে থাকতে থাকতে যদি সে সত্যিই মরে যায় একদিন, তা হলে কি আবার কোনো দিন কারুর জন্যে কালীঘাটে পুজো দিতে ছুটবে গীতা আর রাজশেখর ? হয়তো ছুটবে না। বিশ্বাস ভাঙার জন্যে নয়।

দৃশ্যটা এখনো লেগে আছে চোখে।

সংসার নিয়ে ব্যস্ত গীতা, হাসপাতালে আসে সবচেয়ে কম। হয়তো ইচ্ছে করেই আসে না। তবু, সেই এক সকালেই যেন এতো দিনের না আসা পুষিয়ে নিতে চেয়েছিল। দুই ভুরুর মাঝখান থেকে কপাল ছাড়িয়ে সিঁথি পর্যন্ত উঠে গেছে তেল-মাখানো ধ্যাবড়া সিঁদুর ; হাতে আলগা করে ধরা প্রসাদী ফুলের ঠোঙা। চাবির গোছাসুদ্ধ এলোমেলো আঁচলটা বেয়াড়াভাবে ঝুলে আছে গলার নিচে। কেবিনের দরজা থেকে বিছানা পর্যন্ত ছুটে এসেছিল এক নিঃশ্বাসে। পায়ের কাছে বসে নিজের হাতে পা দুটোই জড়িয়ে ধরেছিল প্রথম।

'পায়ে হাত দিও না, মা !' তাড়াতাড়ি পা দুটো মুড়ে নিতে নিতে মানসী বলেছিল, 'ঠাকুরের ফুল পায়ে ঠেকবে।'

কথাটা বুঝতে পারেনি সম্ভবত। তাড়াহুড়ো করে উঠে এসে ঠোঙাটা তার কপালে ছুঁইয়ে রেখে দিল বালিশের পাশে। তারপর আবার পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়ে সেই পুরনো পা দুটোই টেনে তুলে নিয়েছিল কোলে। মানসী কিছু বলেনি, শুধু অভ্যাসে হাতটা ঠেকিয়ে ছিল কপালে। গীতার জোর তার চেয়ে বেশি।

'এখন পা দুটোতেই ভরে যায়। তুই যখন ছোট ছিলি, এই কোলেই এঁটে যেতিস পুরোটা। তখন গায়ে পা লাগত না, দোষ হতো না। পেটের ছেলের পা মাথা মায়ের কাছে

সবই সমান।'

অদ্ভুত লাগছিল গীতাকে। মুখের ভাষার সঙ্গে চোখের দৃষ্টির মিল ছিল না কোনো। কয়েক পলক গীতার চোখে চোখ রেখে হঠাৎই সন্দেহ হয়েছিল মানসীর, গীতা যা বলছে তা ভাবছে না, কিংবা যা ভাবছে তা বলছে না। প্রস্তুতিহীন ভূমিকায় নেমে নিজেকে আড়াল করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শুধু। ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার তাকে নিজের ভূমিকায় দাঁড় না করালে এই রকমই চলবে।

'এর ওর মুখে তোর কথা শুনি।' গীতা একটা নতুন কথা খুঁজে পেল, 'তুই কেমন আছিস, মানু ?'

'ভালো। দেখছ না ভালো আছি।'

'দেখে কি আর সব বোঝা যায় বাছা!'

গীতার কোলে, ওর হাতের ক্রমাগত স্পর্শে, ঘেমে উঠেছে পায়ের পাতা। জোর করে টেনে নিল মানসী ; কোমর ভেঙে উঠে বসল বিছানায়।

রাজশেখর ইতিমধ্যে চেয়ারটা টেনে এনে বসেছেন কাছে। উস্কো-খুস্কো কাঁচাপাকা চুল, মুখে ক্লান্তির চেয়ে বেশি অসহায়তা। মানসী দেখেও দেখল না। কথা ভুলে হতভম্ব চোখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে গীতা—অবলম্বনের অভাবে হাত দুটো জায়গা বদল করছে ক্রমাগত। মানসী তাকেই দেখছে। মা যখন, তখন নিশ্চয়ই একদিন তার কোলে ছিল ; তারও আগে নাড়িতে জড়ানো তার শরীরের অন্ধকারে। সূত্রটা এখন আর চেনা যাচ্ছে না—দূরত্ব আর অপরিচয়ে মেশা একটা ব্যবধান পাঁচিল তুলছে মাঝখানে। আবেগ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেও মানসী কোথাও পৌঁছুতে পারল না। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, হয়তো গীতাও পারছে না—হতভম্ব চোখের দৃষ্টিতে তাই শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এমনও হতে পারে, নাড়ির যোগ ছিন্ন হবার পর সম্পর্কটা থেকে যায় শুধু ধারণায় আর আদলে, ঘষামাজার অভাবে ধারণাটাও পুরনো হতে থাকে ক্রমশ। খেই হারিয়ে দুজনেই এখন সেই ধারণাটাকেই দেখছে—ছিড়ে যাওয়া সম্পর্কে যোগ হচ্ছে না নতুন কোনো আবেগ।

কথার অভাবে কেবিন জুড়ে স্তব্ধতা। ওরা আসার পর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল চাঁপা, এখন ওকেও আর দেখা যাচ্ছে না। চোখের কোণে জ্বালা। এক দুই হয়, দুই ছড়িয়ে পড়ে তিনে। হিসেবে ভুল নেই কোনো—খুঁটিগুলোই শুধু ছড়িয়ে পড়েছে এখানে ওখানে।

এসব সময় বড়ো অসহায় লাগে নিজেকে। পরিচিত আদলে ভুল নেই কোনো ; তবু ভাবতে হয়, এই তার মা, এই তার বাবা। এরাই কারক।

মানসী চোখ ফিরিয়ে নিল।

'বাবা তোমাকে এতো ক্লান্ত লাগছে কেন!'

'ক্লান্ত। লাগছে ?' চুরি করে হাসলেন রাজশেখর। একটু থেমে বললেন, 'ক্লান্ত লাগবে না। বয়স হচ্ছে।'

'বয়সের কথা তুমি আগে কখনো বলোনি।'

'বলিনি। তা হবে হয়তো।' সর্দি টানার ভঙ্গিতে নাক টানলেন রাজশেখর, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন বোঝা যায়। তারপর বললেন, 'এই বয়সে অনেকেই চলে যায়। আমি আছি। আরও কতো দিন থাকব জানি না। হয়তো অনেক কিছু দেখে যেতে হবে আরও।'

অর্থ লুকোবার চেষ্টায় পাল্টে যায় কথার বয়ান ; ভাষায় ঢুকে পড়ে হেঁয়ালি। ক্লান্ত

মুখগুলিতে জিব বুলিয়ে যায় সকালের আলো। ভাঙা-চোরা মুখের ওপর রাজশেখরের খাড়া নাক আর গীতার শিরা-ফোটা হাতে ঢলঢলে সাদা শাঁখাটা ছাড়া কিছুক্ষণ আর কিছুই চোখে পড়ে না মানসীর। সময় চলে যাচ্ছে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে অনেকটা সময়ই চলে গেছে। আর ফিরবে না।

'তুমি বোধ হয় একটু বেশিই চিন্তা করছ!' নিচু মুখে পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে রাজশেখরকে বলল মানসী, 'এত ঘন ঘন হাসপাতালে আসার দরকার কী! রোজই আসছ প্রায়। ওই সময়টা বিশ্রাম নিলেই পারো!'

'বিশ্রাম?' রাজশেখর হাসলেন; আর কিছু বললেন না। হঠাৎই পা দুটো নাচতে শুরু করল তাঁর।

'মানু, তুই তোর বাবাকে একটু বোঝাবি?' স্বাভাবিক গলায় গীতা বলল এইবার, 'কাল সারা রাত ঘুমোয়নি। পড়ে গিয়েছিল বাথরুমে—'

'সে কী!' উৎকণ্ঠায় নড়ে বসল মানসী।

'কিছু নয়, ওটা কিছু নয়। পিছলে পা লাগলে কখনো-সখনো পড়তে হয়। লাগাটাই বড়ো কথা।' রাজশেখর বললেন, 'চোট লাগেনি।'

'লাগেনি বলেই রক্ষে!' গীতা বলল, 'লাগলে কী হতো!'

'কী আর হতো! এসব আছেই।'

'তবু তোমার সাবধান হওয়া উচিত।' মানসী বলল, 'ব্লাড প্রেসারটা চেক করিয়ে নিও।'

রাজশেখর চুপ করে থাকলেন। মুখটা রোদের দিকে ফেরানো। পাঞ্জাবির গলার ওপরে ঘাড়ের কাছে পাকা চুলগুলো চিক চিক করছে আলোয়। খুঁটিয়ে দেখলে পুরনো চুলকুনির শুকিয়ে-যাওয়া কালচে দাগটাও চোখে পড়ে।

গীতা স্বামীকেই দেখছে। বলল, 'বলছিল তুই একটু ভালো হলে ঢাকঢোল পিটিয়ে তোর বিয়ে দেবে—'

'আঃ, তুমি কি থামবে!' প্রায় ধমকের সুরে বললেন রাজশেখর, 'এই কথা বলার জন্যে এসেছ এখানে!'

অল্প দমে গেল গীতা। হতভম্ব, সরল মুখখানিতে ছায়া ছড়াল সামান্য। তারপর বলল, 'নিজের মেয়ের কাছে মনের কথা বলব, এতে দোষের কী আছে! ইচ্ছা চেপে রাখতে নেই!'

আবার চুপচাপ। একবার রাজশেখরকে দেখল মানসী, তারপর গীতাকে। পিঠটা টান করে রাখল। একটা জ্বালা আসছে, অনুভব করল, ঘাড়ের কাছে জটলা পাকিয়ে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে মেরুদণ্ড বেয়ে। অন্যমনস্ক একটা হাত উঠে গেল শুকনো সিঁথির কাছে। আন্দাজে জায়গাটায় আঙুল বোলাতে বোলাতে ভাবল, পুজো দেওয়াটা উপলক্ষ, হয়তো এই কথাগুলি বলার জন্যেই সাতসকালে গীতাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে ছুটে এসেছেন রাজশেখর। হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু, সে ভাঙবে না।

নিজেকে জড়ো করে নিল মানসী।

'বিয়ে তো আমার হয়ে গেছে, মা! বিয়ে কারও দু'বার হয় না!'

'সে তোরা নিজেরা করেছিলি।' গীতাকে আড়াল করে উঠে এলেন রাজশেখর; আর কোথাও আড়াল নেই কোনো। ঈষৎ কাঁপা অথচ পরিষ্কার গলায় বললেন, 'জানি, তোর অনেক অভিমান। তবু, বাপ হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে—'

ভাঙার একটা ধরন আছে, পরেরটাই নুইয়ে দেয় আগেরটাকে। জড়াজড়ি করতে করতে শব্দগুলো ধসে পড়ে নিচে। মানসী তার কিছু শুনল, বাকিটা শুনল না। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল হঠাৎ। কেন যেন মনে হলো জ্বলন্ত মশাল হাতে নিজের সংসারের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে রাজশেখর—উদ্দেশ্যটা চেনে, শুধু জায়গাটাই খুঁজে পাচ্ছে না। পেলে আর থামবে না।

'কর্তব্য তোমার আরও অনেক আছে, বাবা।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মানসী বলেছিল, 'তপু, লিলি, সঞ্জু, বিজু, মা। আমার যা পাবার পেয়েছি। অভিমান থাকবে কেন!'

রাজশেখর জবাব দেননি কোনো। এক মাটি থেকে উপড়ে আনা গাছ অন্য মাটিতে পুঁতলে শিকড়ে জোর পায় না কোনো, ডালপালার ভারই তখন হয়ে ওঠে অসহ্য। মানসীর ভাবনায় নয়, অন্য কিছুর ভারে যেমন ছিলেন তার চেয়ে আরও একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন রাজশেখর। চেয়ারের দুই হাতলে রাখা হাত দুটি ছিতরানো, ঘাড়টা নেমে এসেছে বুকের কাছে। চোখ নিজেরই পায়ের দিকে। নৈঃশব্দ্যে বাধা পড়েনি কোনো। চুপ করে থাকতে থাকতে হঠাৎই একসময় মনে হয়েছিল মানসীর, শুরুতে যেমন ছিল তেমনিই—খুঁটিগুলো এখনো পড়ে আছে আলাদা আলাদা হয়ে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বড়ো বেশি।

স্মৃতি মাঝে মাঝে বড়ো কষ্ট দেয়। কোনো কোনো কথা বলার পর মনে হয় ওই একই কথা হয়তো অন্যভাবেও বলা যেত। সেদিন, হয়তো তার অভিমানটাই ছুঁতে এসেছিলেন রাজশেখর। তার বদলে ফিরে গেলেন শূন্য হাতে। এমনও হতে পারে সে একটু বেশিই ভাবছে। সংসার, অনটন আর সন্তানের মধ্যে নিজেকে ভাগ করে দিতে দিতে মানসীর জন্যে আলাদা করে ভাববার সুযোগ রাজশেখরের কম—কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কর্তব্যের কথাটা মনে এসেছিল তাঁর। ঘটনাটা ভুলতে দেরি হবে না।

কেবিনের মাঝখান পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে রোদের আভা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সেই রোদের দিকে তাকিয়ে মানসী ভাবল, পুরনো একটা ঘটনার জের টেনে দুঃখিত হবার মানে নেই কোনো। আজ তার ভালো লাগছে। এই ভালো লাগার অনুভূতিটাই যতোক্ষণ পারবে জড়িয়ে থাকবে। কাল যদি আরও একটু ভালো লাগে এবং তার পরের দিন আরও একটু—তা হলে এসব কিছুই আর মনে থাকবে না। বিয়ে দু'বার হয় না।

আয়নাটা সামনে রেখে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে চুল আঁচড়াল মানসী। চিরুনির আগায় অল্প সিঁদুর নিয়ে ছুঁইয়ে দিল সিঁথিতে। আয়নাটা নামিয়ে রেখে তাকাল চাঁপার দিকে।

'ব্যস, হয়ে গেল। আর কী সাজবো?'

চাঁপা বলল, 'সাজো না কেন! সাজলে তো ভালোই লাগে।'

'ভালো লাগে? বলছ?' কথার পিঠে কথা সাজানোর ধরনে বলল মানসী, 'পাট ভেঙে শাড়ি পরলাম, চুল আঁচড়ালাম—এতেই কি বদলে গেলাম!'

'আজ হঠাৎ সিঁদুর পরলে যে!'

'ইচ্ছে হলো, তাই।' জিবটা টাকরার দিকে ঠেলে একটা অস্বস্তি কাটাবার ভঙ্গি করল মানসী। তারপর বলল, 'ইচ্ছে অবশ্য রোজই করে।'

স্যুটকেসটা আগেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চাঁপা। এখন আয়না চিরুনিটা জায়গা মতো রেখে দুধের গ্লাস হাতে ফিরে এলো।

'বিয়ে হওয়া মেয়ে সিঁদুর পরবে, এতে ইচ্ছে অনিচ্ছের কী আছে !'

দুধটা গরম নেই ; প্রায় এক চুমুকেই সবটুকু খেয়ে নিয়ে মানসী অনুভব করল অনেকক্ষণ ধরে একটা খিদে চেপে রেখেছিল পেটে । এখন ভরা লাগছে । এরপর ব্রেকফাস্ট আসবে । তার আগে ডাক্তার । তারপর—, সম্ভবত সে ভালো হয়ে উঠছে । সময়ের হিসেবে বিয়েটা পুরনো হয়ে গেল । তবু, এখনো সিঁদুর পরতে এতো লজ্জা লাগে কেন ।

চাঁপার চোখ তার কপালের দিকে । গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে মানসী বলল, 'রেজিস্ট্রি বিয়ে তো, হাফ বিয়ে । শয্যা হলো, ফুলশয্যা হলো না । নোয়া পরলাম, শাঁখা পরলাম না । সেদিন আমার বাবা-মা এসেছিল, দেখেছিলে তো ? বলল ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ে দেবে আবার ।'

'ও মা ! বিয়ে কি বারবার হয় !' চাঁপার বিস্ময়ে ভান নেই কোনো ; একই স্বরের জের টেনে বলল, 'ছানাপোনা হয়নি এখনো, তাই রক্ষে ! হলে ছানাপোনা সমেতই বিয়ে দিত নাকি !'

শরীররটা বিছানার ওপর । হাতে ভর দিয়ে ঘাড় মাথা ঠেলে দিয়েছে পিছনে । চাঁপার কথা শুনে মানসী হাসতে শুরু করল সশব্দে। প্রায় হা-হা করে । হাসির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও দুলছে, মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে উঠল গোটা মুখ । তারপর হঠাৎই বুকে হাত চাপা দিয়ে থামাবার চেষ্টা করল নিজেকে । একসময় থেমেও গেল । একটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল কাছে দাঁড়ানো চাঁপার হাতটা । আস্তে আস্তে সইয়ে নিল নিজেকে ।

'একটু জল দেবে ?'

'দিচ্ছি ।' চাঁপা বলল, 'শোও দিকি, জল পরে খাবে ।'

কাঁধ দুটো ধরে জোর করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল চাঁপা, পা দুটো তুলে দিল ওপরে । হাতটা ঘষতে লাগল বুকের ওপর ।

চোখ দুটো কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে, আবার খুলে মানসী বলল, 'কিছু হয়নি । ছাড়ো ।'

'দুর্বল শরীরে এতো হাসি সহ্য হবে কেন !' উদ্বেগ কাটিয়ে চাঁপা জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে ?'

'না । কিচ্ছু না । হাসতে হাসতে বিষম লেগেছিল ।'

নিজেকে আরও একটু ছড়িয়ে দিল মানসী, নিজেই উঠে পাতলা চাদরটা টেনে নিল গায়ে । বালিশের পাশে রাখা মোটা গল্পের বইটা তুলে নিল হাতে । কাল কোন পাতায় থেমেছিল মনে করতে করতে বলল, 'তোমার দেরি হচ্ছে, তুমি কাজকম্ম গুছিয়ে নাও ।'

রোদ আড়াল করার জন্যে জানলার একটা পাট বন্ধ করে দিল চাঁপা । বাথরুমে গেল । ছাড়া জামা-কাপড়গুলো জল ছেঁকে তুলে রাখছে, তার শব্দ । বেলা বাড়ছে, তার শব্দ । এই সব শব্দে কান রেখে মানসী একটা পুরনো গল্পে ফিরে গেল । মন বসছে না তেমন । চারিদিকের নানা শব্দে জড়িয়ে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে অক্ষরগুলো—হারিয়ে যাচ্ছে কথার মানে । খানিক আগেকার অস্বস্তি এখন আর নেই ; তবু আলস্যে জড়িয়ে আসছে চোখ দুটো । চুলের গোড়ায় অবিরাম বিশ্রাম । স্নানের আরামই ঘুম পাড়িয়ে দেবে হয়তো ।

জোর করে চোখ দুটো টান করে রাখল মানসী । আনমনে উল্টে গেল বইয়ের একটা পাতা । সিঁথি চুলকোচ্ছে ; অনেক দিন পরে সিঁদুর পরার জন্যেই সম্ভবত আলাদা একটা অনুভূতি ছুঁয়ে আছে জায়গাটা । আলগোছে চুলকে নিল সে । এক চিলতে সিঁদুর লেগে আছে আঙুলের ডগায় । অপলকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খেয়াল হলো, এটা

দীপঙ্করের অফিসে বেরুবার সময়। হয়তো বেরিয়ে পড়েছে। হয়তো বেরুবে। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে মনে পড়বে মানসীর মুখ। হয়তো ভাববে, কেউ থাকবে না জেনেও একটা ঘর এখনো সে বেঁধে রেখেছে। কেন? এসব প্রশ্নের কি উত্তর আছে কোনো? হয়তো কিছুই ভাববে না। একজন মানুষ, একটিই ভাবনা। একই জায়গায় ইঞ্জেকসানের ছুঁচ বিধতে বিধতে জায়গাটা ভোঁতা হয়ে যায় ক্রমশ। হয়তো সেই রকম; বোধহীন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে সামান্য এলোমেলো হয়ে যাবে নিঃশ্বাস।

বইয়ের পাতায় চোখ থাকলেও অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতায় ছেয়ে যাচ্ছিল মানসী। জুতোর শব্দে সাড় এলো।

'কেমন আছেন আজ?'

ডক্টর মিত্র। গলায় স্টেথস্‌কোপ। এসেই চেয়ারটা টেনে বসে পড়লেন সামনে। পিছনে পিছনে চার্ট-বোর্ড হাতে সিস্টার।

মানসী হাসল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে নিল চোখের পাশটা।

'পাল্‌সটা দেখব।'

হাতটা বাড়িয়ে দিল মানসী। চারটি আঙুলে ধরে রেখেছেন কব্জিটা, চোখ রিস্টওয়াচের দিকে। ছেড়ে দিলেন। হাত উঠে এলো কপালে। ভরাট তালুর ডুমো ডুমো মাংসের প্রত্যেকটিকে অনুভব করা যায় আলাদা করে। একই হাতের আঙুলে এখন টেনে ধরেছেন চোখের পাতা। ছেড়ে দিয়ে চেয়ারের পিঠে পিঠটা এলিয়ে দিলেন ডক্টর মিত্র।

'এভরিথিং ও· কে·। অনেক ইমপ্রুভ করেছেন।' বিশ্বস্ত ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলেন ডক্টর মিত্র, 'নিজে ফিল করছেন না আগের চেয়ে ভালো আছেন?'

মানসী ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'আজ আছি। কাল কি থাকব!'

'থাকা তো উচিত। ব্লাড-রিপোর্ট দেখেছি, হেমোগ্লোবিন বেশ ভালো। এখন দু' দিন ব্লাড দেওয়া বন্ধ থাক।'

'বাইরের রক্ত শরীরে নিয়ে ভালো থাকা—', মানসী হঠাৎ বলল, 'এ কেমন ভালো থাকা!'

'যতোক্ষণ বাইরে থাকে বাইরের, ভেতরে গেলেই নিজের।' কথাটা শেষ করেই অন্য কথায় চলে গেলেন ডক্টর মিত্র, 'কী বই পড়ছেন?'

'সুবর্ণলতা।'

'আশাপূর্ণা দেবী? আমার স্ত্রীও খুব পড়েন। বেশ। সিস্টার আপনার টেম্পারেচারটা দেখুন। জ্বর নেই, আমি দেখেছি।'

উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর মিত্র।

'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

মানসী ঘাড় নাড়ল। না। চোখ ফেরাল না।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?'

অল্প ইতস্তত করল মানসী। বলবে কি না ভাবল।

'কবে ছাড়বেন আমাকে?'

'দেখি।' একই রকমের হাসি, মুখে ভাবান্তর নেই কোনো। ডক্টর মিত্র বললেন, 'আরও কয়েক দিন যাক। ঠিক সময়ে ছেড়ে দেবো।'

আর দাঁড়ালেন না। দরজার বাইরে ডাক্তারের চেহারাটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই

সিস্টারের হাতের থার্মোমিটার নেমে এলো মানসীর মুখের ওপর। চোখ বন্ধ করে হাঁ করার আগে একটা নিঃশ্বাস চাপল ও।

হয়তো সত্যিই ভালো হয়ে যাবে এবার। শুধু ওই 'দেখি' কথাটাই এখনো একটু অন্য রকম লাগছে কানে।

॥ চার ॥

দিন কেটে যায়। শব্দময় পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের বিরাম নেই কোনো। একই শব্দ নিয়ে আসে নানা রকম নতুন শব্দ, একই মানুষজন তাদের বৈচিত্র্যহীন হাঁটাচলা আর ক্লান্তির ভিতর নিঃশেষ হতে হতে তুলে আনে এক-একটা নতুন দিন। রোদ, বৃষ্টি, হাওয়ায় তারতম্য ঘটে না কোনো। তবু, রোদ আড়াল করার জন্যে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে ছায়ার নিচে, বৃষ্টির শীতে ঠাণ্ডা হয়ে যায় শরীর, হাওয়ায় মুখ ভাসিয়ে চলে যাওয়া যায় স্মৃতিতে। নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে এলোমেলো—মনে পড়ার সংঘর্ষে উঠে আসে ছবির পর ছবি। বহু দিনের অনাদরে কিছু বা ধুলোমলিন, তবু প্রত্যেকেই চায় সনাক্তকরণ। একা এ-সবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আরও একটু একা হয়ে পড়ে দীপঙ্কর। ক্লান্তিতে ভারী হয়ে ওঠে চোখের পাতা। তবু প্রত্যেকটিকে আলাদা করে চিনে নেয় সে, আদরে টেনে নেয় বুকে—হাঁটে সঙ্গে করে। হ্যামেলিনের বাঁশিওলা। সে যতোই হাঁটে, তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলে শোকশূন্য আশপাশের সমস্ত বিষাদ। গভীর অন্যমনস্কতার ভিতর মাঝে মাঝে টের পায় আচ্ছন্ন চারিদিক ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে আরও, আর অস্থির হাওয়ার ভিতর থেকে হাল্কা থেকে ঘন হয়ে ইন্দ্রিয়ের আশপাশে. ঘোরাঘুরি করছে বিচিত্র এক সবুজ গন্ধ। ঘুমের মধ্যে আলগোছে পাশ ফেরে সে। বালিশে মুখ গুঁজে বিড় বিড় করে, মানসী. মানসী। স্বপ্ন নিয়ে যায় না কোথাও। শুধু, প্রতিদিনের ঘুমের মধ্যে আরও একটু রক্তহীন হয়ে পড়ে মানসী।

এক রবিবার সকালে কী ভেবে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিল দীপঙ্কর। সাধারণত বিকেলেই যায় সে ; সকালটা ধরা থাকে মানসীর বাড়ির লোকজনের জন্যে। কেউ বলে দেয়নি, তবু দিনের পর দিন যেতে যেতে এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে প্রায়। বিকেলে কোনো কোনো দিন দেখা হয় তাপসীর সঙ্গে। এছাড়া, মনে করতে পারে না দীপঙ্কর, আর কারও সঙ্গে কোনো দিন দেখা হয়েছিল। প্রায় রোজই সকালের দিকে মেয়েকে দেখতে যান রাজশেখরবাবু, কখনো-সখনো মানসীর মা ও ভাইবোনেরা। নিয়ম করে রোজই যায় তাপসী। মাঝে মাঝে মনে হয় দীপঙ্করের, এটা রাজশেখরের ইচ্ছেতেই হয়েছে। মানসীকে বিয়ে করা নিয়ে যে অদৃশ্য টানাপোড়েন চলছিল তাদের মধ্যে, সেটা এখনো জিইয়ে রেখেছেন তিনি। এমনও হতে পারে, টানাপোড়েন বলে কিছুই নেই আর—সঙ্কোচই দূরে সরিয়ে রাখছে তাকে। সঙ্কোচ ? হতে পারে, নাও হতে পারে—দীপঙ্কর জানে না। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে প্রায় প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে কথার মানে। কখনো বা মনে হয় প্রত্যেকেই বুকে নিয়ে ঘুরছে আলাদা আলাদা অভিধান, একটার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই কোনো।

দেখা হলো না।

কেবিনের দরজাটা ভেজানো। ঠেলার চেষ্টা করতেই বেরিয়ে এলো একজন নার্স। মুখ চেনা। দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ গলিয়ে বলল, 'এখন ডিসটার্ব করবেন না। প্লিজ !'

নিজেকে লুকোতে পারল না দীপঙ্কর। সন্দেহ, আশঙ্কা, ভয় পরপর ছায়া ফেলল মুখে।

'কী হয়েছে ?'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটু রেস্টলেস হয়ে পড়েছিলেন, ঘুমোননি। ইঞ্জেকসান দেওয়া হয়েছে।'

দীপঙ্কর তখনো স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে, পাতা পড়ছে না চোখের।

নার্স বলল, 'বিকেলে আসুন। হয়তো দেখতে পাবেন—'

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। রোগিণী সম্পর্ক চেনে—রোগ নয় ; চিকিৎসাও নয়। যদি সে-রকম কিছু হয়ে থাকে, হয়তো এই মুহূর্তে মানসীও চিনতে পারত না তাকে। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর এই রকম ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

অল্পক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দীপঙ্কর। মনে মনে ভাবল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই কথার দুটো অর্থ হয় না। হলেও কি করার ছিল কিছু ? একই ধরনের দরজা পরপর সাজানো, একই রঙের পর্দা দুলছে হাওয়ায়। মাথার ওপর নাম্বারটা আছে বলেই সে ঠিক এই দরজাটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। মানসীর নাম্বার। মানসী না থাকলে ওই নাম্বারটা আর কেউ পাবে। তখন তার জায়গায় আর কেউ এসে দাঁড়াবে। নাম্বার মানুষ চেনে না।

যেদিক দিয়ে এসেছিল ঠিক সেদিক দিয়েই আবার ফিরতে লাগল দীপঙ্কর। করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি, তার পরেও সিঁড়ি। দিনের আলোয় মসৃণতা বেড়ে গেছে আরও। সাধারণত কোনো দিনই সকালে আসে না সে। আজও না এলে এই দৃশ্যটা দেখতে হতো না, ফিরতে হতো না এইভাবে। কেন এসেছিল ?

মনপ্রাণ জুড়ে একটি উত্তরই ঘোরে। টের পায় আচ্ছন্নতা আসছে, মস্তিষ্কের কোনো শূন্যে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা শরীরে। মানসীর জন্যে ? নাকি নিজেরই জন্যে ?

'আজকাল মনে হয় বাবার কথাটাই ঠিক। আমাদের বিয়েটা পুরোপুরি হয়নি ; আমি তোমার পুরো স্ত্রী নই—'

'কেন !'

আজ সকালের আগে এসেছিল কালকের বিকেলটা। মানসী তখনো রেস্টলেস হয়নি।

'যার স্ত্রীর এমন যায়-যায় অবস্থা, সে অফিস করে কী করে ! অন্য কেউ হলে সারাক্ষণ কাছে থাকত।'

'ডেভিলস্ ডেন !' এই সময় যেভাবে হাসতে হয় সস্নেহে, সেই ভাবেই হেসেছিল দীপঙ্কর ; আশ্বাসের হাত উঠে গিয়েছিল মানসীর কপালে, 'না হয় ছুটি নেবো, অফিসে যাবো না। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্স বাঁধা। থাকতে দেবে না —। তখন কোথায় যাবো ?'

'আর ভালো লাগছে না। তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।'

আজকাল মানসী আর লোভের কথা বলে না। শুধুই সঙ্গ চায়। দীপঙ্কর দেখেছিল, ওর মুখের ফ্যাকাশে বাদামির তলা থেকে ফুটে উঠছে টুকরো টুকরো সাদা। রক্ত বিদায় নিচ্ছে। আয়নায় তাকালে মানসী নিজেও দেখতে পেত। দ্যাখেনি। নাকি, রক্তের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে দৃষ্টিও, সে যা দ্যাখে মানসীর চোখে তা ধরা পড়ে না।

নিজের অন্ধতা আড়াল করার চেষ্টায় কিছুক্ষণের জন্যে সবই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল চোখের সামনে। এই বোধটা নতুন। একের আঁধার অন্যকে স্পর্শ করে না। সেই অবস্থায় দীপঙ্কর বলেছিল, 'আর কিছু দিন ধৈর্য ধরে থাকো, মানসী। তুমি পুরোপুরি না হলে আমিও কি হয়েছি!' বলেছিল, 'আসব।'

ইঞ্জেকসান দেওয়া ঘুমে মানসী এখন অচৈতন্য। এই ফিরে যাওয়াটা দীপঙ্কর নিজেই শুধু দেখছে।

হাসপাতালের দৃশ্যে পরিবর্তন হয় না কোনো। নিচে এসে খানিক স্মৃতিশূন্য দাঁড়িয়ে থাকল দীপঙ্কর। ঘুমের জের কতোক্ষণ চলবে জানা নেই ; নার্স যেভাবে বলল তাতে মনে হয় না খুব তাড়াতাড়ি কিছু হবে। সুতরাং, অপেক্ষা করে লাভ নেই। যেমন আসে তেমনি বিকেলেই আসবে। আজ ছুটির দিন ; ঠিক ঠিক বেরুলে সময়ের আগেই এসে পৌঁছতে পারবে। সকালের এই আসা এবং ফিরে যাওয়ার ঘটনাটা বলবার দরকার নেই মানসীকে। রেস্টলেস হওয়া মানে কী! হয়তো কষ্ট পাবে।

তবে, এসেছে যখন, একবার ডক্টর মিত্রের সঙ্গে দেখা করে যেতে পারে। ঠিক কী হয়েছে জেনে নেওয়া ভালো।

রাস্তা বদলে অফিসের দিকে এগিয়ে গেল দীপঙ্কর। ভিড়। একটা পর একটা লোক আসছে, প্রশ্ন করে যাচ্ছে। জবাবগুলোও একই রকম। ডক্টর মিত্রের খোঁজ করাতে শুনল, জরুরী অপারেসানে ব্যস্ত আছেন তিনি, এ-বেলায় দেখা হবার সম্ভাবনা নেই কোনো। বেরিয়ে এলো। এবার ফেরা। তখন মনে হলো, আজকের দিনটা তার জন্যে নয়—আজ সবই অন্য রকম হবে।

হাসপাতালের দৃশ্যে পরিবর্তন হয়নি কোনো। অন্যমনস্কভাবে একবার তাকাল বকুল গাছটার দিকে। দু'জন মহিলা উবু হয়ে বসে আছে ওখানে। একজনের মুখ দু' হাতের আড়ালে ঢাকা, অন্যজন কথা বলছে পিছন ফিরে দাঁড়ানো পুরুষটির সঙ্গে। মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি যুবক এক চোখে তাকাতে তাকাতে হেঁটে গেল তাদের সামনে দিয়ে। সিল্কের শাড়িপরা একটি বড়ো মেয়ে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে এমারজেন্সির দিক থেকে। গেটের কাছে বেঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যাম্বুলেন্স—সামনে তিন চারটি লোকের উদাসীন জটলা, রাস্তা পেলেই ঢুকবে। দীপঙ্কর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

অ্যাম্বুলেন্সটা যেখান দিয়ে ঢুকছে, ঠিক তারই পাশে গেটের দেওয়ালে গা ঘেঁসে চুপচাপ তারই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজশেখর। এক হাতে থলি, অন্য হাতে ছাতা। অল্প কুঁজো পিঠ। তাকানোর ধরনে বৈশিষ্ট্য নেই কোনো—মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছেন তাকে।

এড়ানোর সুযোগ নেই। ইতস্তত করে এগিয়ে গেল দীপঙ্কর।

'আপনি!'

'এই তো। ঢুকতে দিল না। চলেই যাচ্ছিলাম। তারপর ভাবলাম আর একটু থাকি!'

নাকের দিকে তাকালে মানসীকে চেনা যায়, চিবুকের গড়নেও কিছুটা। রঙ জ্বলতে জ্বলতে তামাটে। ভুরুর নিচে ঘোলাটে চোখদুটো কখনো উজ্জ্বল, কখনো নিষ্প্রভ। এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলেও অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে পারলেন না রাজশেখর।

'চলেই যান—', দীপঙ্কর বলল, 'এ-বেলা দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। বিকেলে আসতে পারেন—'

'ঠিক আছে। বিকেলেই আসব।' প্রায় বাধ্য গলা রাজশেখরের। থলিসুদ্ধ হাতটা হঠাৎ তুলে ধরলেন দীপঙ্করের চোখের সামনে। মুখে একটা হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটছে না। বললেন, 'ওর মা পাঠিয়ে দিয়েছিল। মালপোয়া। কড়াইশুঁটির কচুরি। জানো তো, মানসী ভালোবাসে। কাল ডাক্তার নিজে বলল আমাকে, এসব খেতে অসুবিধে নেই কোনো। এই তো ব্যাপার। এখন এগুলোর কী হবে!'

দীপঙ্কর চুপ করে থাকল। চোখ রাস্তার দিকে। গর্ভবতী বউটিকে হাতের আগলে জড়িয়ে রেখেছে পুরুষটি, রিক্সাটা ঢুকছে। সরে দাঁড়াল। মানুষের জন্ম মৃত্যুর কথা ভাবে না।

ইচ্ছেগুলো মরে গেছে। আগে বলত, এখন আর কোনো লোভের কথা উচ্চারণ করে না মানসী। শুধু সঙ্গ চায়; পুরোপুরি না পাওয়ায় ডুবে থাকে সারাক্ষণ। সঙ্গ ছুটে এলেও সাধ্য নেই ধরে রাখার। তার আগে আগে আসে ইঞ্জেকসান, ঘুম। এটা কিছুর প্রস্তুতি নয় তো?

জমে ওঠা নিঃশ্বাসটা জোর করে ভেঙে ছড়িয়ে দিল দীপঙ্কর। রাজশেখর না থাকলে সে একটা সিগারেট ধরাত।

'হঠাৎ এমন হলো কেন!'

'কী!'

'বুঝলাম না তো। শুনলাম ইঞ্জেকসান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে!'

'জানি না।'

ভঙ্গিতে ব্যস্ততা ফুটে উঠল দীপঙ্করের। মাঝখানে মানসী, দু' দিকে দুজন। বিশ্বাস হয় না যুদ্ধটা থেমে গেছে! থামলে এই মুহূর্তে সে রাজশেখরের জন্যে সহানুভূতি টের পেত বুকে।

'আমি চলি।'

'কোথায় যাবে?'

'দেখি—'

চোখ দুটো কখনো উজ্জ্বল, কখনো নিষ্প্রভ। মাটির দিকে চোখ রেখেই দীপঙ্কর অনুভব করল, রাজশেখরের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তার মুখের ওপর।

'যাবে আমাদের বাড়ি? যাও না তো।'

দীপঙ্কর মাথা নাড়ল। না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসল জোর করে।

'আপনি যান। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কিছু করার থাকলে আমি এসে করব।'

'তুমিই তো করছ।' হঠাৎ বললেন রাজশেখর; বলার আকস্মিকতায় অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল গলা, 'মাথার ওপর ভগবান আছেন, তিনিই দেখছেন তুমি কী করছ! মানু ভাগ্য নিয়ে এসেছিল—'

কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়েছে আরও, থলিসুদ্ধ হাতটা উঠে গেছে চোখ আড়াল করতে। ভারসাম্যে টান পড়ায় অন্য হাতের ছাতাটা বেঁকে গড়িয়ে যাবার আগে ব্যস্ত হাতে ধরে ফেলল দীপঙ্কর। রাজশেখরকে সামলে ওঠার সময় দিল।

'এসব কথায় কি মানু ভালো হয়ে উঠবে!'

রাজশেখর চুপ করে থাকলেন।

'রোদ বাড়ছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী!'

'হ্যাঁ। চলো।'

নিজেই দু' পা এগিয়ে গেলেন রাজশেখর। দুটো হাতই জোড়া, ঠোঁট মুছলেন কাঁধে।

'তপু কি গিয়েছিল তোমার কাছে ?'

'না।'

'বলেছিল যাবে। যাবে হয়তো—'

থেমে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে দীপঙ্করের দিকে তাকালেন রাজশেখর। এখন আর সঙ্কোচ নেই কোনো। ঘোলাটে চোখে লালের আভা। ঠোঁটের ওপরে ও নাকের নিচে সর্দি-মেশানো জলের দাগ। ঠোঁট কাঁপছে কি না, বোঝা যায় না। বললেন, 'সেদিন তোমার অফিসে গিয়ে বিব্রত করেছিলাম—'

জবাব দিতে হবে ভেবে ইচ্ছে করেই মুখ ফিরিয়ে নিল দীপঙ্কর। হাসপাতালের দৃশ্যে পরিবর্তন হয় না কোনো।

'পাঁচ আঙুল নিয়ে হাত। তবু বুড়ো আঙুলটাই সব। ওটা কাটা পড়লে হাতটাই অকেজো হয়ে যায়। তখন উল্টো-পাল্টা ভাবনা আসে—'

তেমন গুছিয়ে বলা নয়, তবু অনুষঙ্গটা ধরতে অসুবিধে হলো না দীপঙ্করের। 'কিছু বললেই বাবা আমাকে কলা দেখায়।' বিয়ের আগে যখন তারা কথা বলত, একদিন বলেছিল মানসী, 'কী যে মুশকিলে পড়া গেল !' রাজশেখরের কথায় নয়, মানসীর কথাটা মনে পড়ায় দুঃখিতভাবে হাসল দীপঙ্কর। প্রায় নিজেকে শুনিয়েই বলা ; রাজশেখর উত্তর চাননি।

'বেশ। তুমি তবে যাও—'

হঠাৎ ব্যস্তভাবে হাঁটতে শুরু করলেন রাজশেখর। রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেন একটু। তারপর আবার। চচ্চড়ে রোদ, তবু ছাতাটা খোলার দিকে নজর নেই কোনো। অন্য হাতে জড়ানো থলিটা দুলছে হাঁটার ছন্দে। অভ্যাসে হাঁটা। হঠাৎ দেখলে কেউই বুঝতে পারবে না কোথা থেকে আসা কিংবা যাবেনই বা কতো দূর। মনে হয় রাস্তাটাই অনুসরণ করছে তাঁকে। খানিক দূর পর্যন্ত দীপঙ্করও করল। সিগারেট ধরাল আনমনে।

রাজশেখর যেদিকে হাঁটছেন, সেটা তারও দিক। ইচ্ছে করলে সেও সঙ্গী হতে পারত—কিছু দূর গিয়ে বেঁকে যেত আবার। পরিবর্তে উল্টো দিকের রাস্তা ধরে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত হেঁটে এলো দীপঙ্কর। দাঁড়াল।

উর্ধ্বে উঠে সমান গতিতে নিচের দিকে নামছে ফোয়ারার জল। রোদের জন্যেই সম্ভবত মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জলের রেখা। চোখের ভুলও হতে পারে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চোখ টান রেখে হারানো জলের রেখাটা খুঁজবার চেষ্টা করল সে। পেল না। দেখল, জলের ভিতর থেকে একসঙ্গে অনেক লোক বেরিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে লবিতে—কাঁচের দরজা পেরিয়ে দু' চারজন বেরিয়ে আসছে বাইরেও। বোধ হয় ফাংসান আছে কোনো। এখন বিরতি। সিগারেটের ধোঁয়ায় জুত লাগছে না তেমন। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অনুভব করল দীপঙ্কর, গলার ভিতর ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে শুকনো একটা জ্বালা ; অস্বস্তিটা কোথায় ধরা যায় না ঠিক। অল্পবয়সী একটা ভিখারী হাত পেতে দাঁড়াল সামনে। উদাসীন ভঙ্গিতে সরে দাঁড়াল দীপঙ্কর। তারপর কিছু না ভেবেই শূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিল আধজ্বলা সিগারেটটা। পাক খেতে খেতে সেটা নেমে এলো রাস্তায়। কোনো দিকে না তাকিয়ে ছুটে গিয়ে সেই জ্বলন্ত টুকরোটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী শব্দে ব্রেক কষল একটা ট্যাক্সি। না, চাপা পড়েনি।

নির্বিকার হাসিমুখ। দু' আঙুলে সিগারেটটা টিপে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল ছেলেটি, পরিতৃপ্তভাবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসল দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে। এরই মধ্যে ভুলে গেছে তার প্রয়োজন, হাত পাতা। হয়তো এটাও অভ্যাস। অভ্যাসই থামিয়ে রাখে, অভ্যাসই চালায়। রোদ, হাওয়ার তাপ ও ঝাপটায় মাঝে মাঝে চাগিয়ে ওঠে প্রয়োজন ; কখনো বা বিবেক, দুঃখ, স্মৃতি, সম্পর্কের বোধ। অভ্যাসই ছড়িয়ে পড়ে, পরিণত হয় মায়ায়। নতুন পোশাক ওঠে গায়ে। পাল্টে যায় বেঁচে থাকার ধরন। নতুন গন্ধে ভরে ওঠে বুক। তখন কি মনে হয় এর আগে ঠিক এমনটি ছিল না ? হয়তো। তখন কি মনে হয়, এর পর অন্য কিছু হলে হঠাৎই অন্ধকার নামবে চারিদিকে।

এতো ব্যস্ত ও শব্দময় চারিদিকের মধ্যেও নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল দীপঙ্কর। অগোছালো ভাবনার মধ্যে কিছুই ধরা পড়ে না ঠিক ঠিক ; ঘুমে জড়িয়ে আসে শরীর—আশেপাশে তাকালে মনে হয় সবই অচেনা, মাঝখানের অনেকটা সময়ের কোনো স্মৃতি নেই মনে। শুধু টের পায়, একটা বদল আসছে—সারাক্ষণ সতর্ক থেকেও অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতায় ভেঙে পড়ছে তার সমস্ত প্রতিরোধ। ঝিমঝিম করে ওঠে মাথা।

রবীন্দ্রসদনের গেটে যাত্রী নামিয়ে মিটার তুলছে একটা ট্যাক্সি। খুব দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে সেটার কাছে পৌঁছে গেল দীপঙ্কর। উঠে বসল। এখন ফেরা। এখান থেকে ঢাকুরিয়া দূর নয় কিছু। ছুটির দিনের রাস্তা। ট্যাক্সিটা যেভাবে ছুটছে তাতে পনেরো কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। হয়তো তারও আগে পৌঁছুবে। ঠিকে কাজের লোকটিকে বলে এসেছে, মুখে দেবার জন্যে কিছু না কিছু থাকবে। ইচ্ছে হলে খাবে, না হলে খাবে না—রাত্রে হোটেলে গিয়ে একা-একা খাবার দায়টুকু বেঁচে যাবে তার।

এই সব ভাবনায় হঠাৎই ক্লান্তি এসে জেঁকে বসে শরীরে। সিটের পিছনে ঘাড়টা এলিয়ে দিয়ে পুরোদস্তুর আলগা হয়ে যেতে চায় সে। অসম্ভব হাল্‌কা লাগে নিজেকে। প্রাত্যহিকতায় বাঁধা জীবন থেকে কেমন অদ্ভুতভাবে একে একে চলে যাচ্ছে খিদে কিংবা তেষ্টার অনুভূতিগুলো। সামান্য কষ্ট লাগে না তবু। শরীর চিরলে, মনে হয়, অ্যানাটমির চার্টের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেলানো লম্বা ও গোল ও ডিম্বাকৃতি শিরা-উপশিরা, অন্ত্র ও নাড়ির জটগুলো ধরা পড়বে তাদের সমগ্র পরিচ্ছন্নতা নিয়ে। এতোটুকু ময়লা লেগে নেই কোথাও। আজ যা আছে, কাল আরও একটু পরিচ্ছন্ন হবে তার থেকে, পরশু আরও একটু। ভার কমে যাবে শরীরের। অফিসে মান্থলি চেক-আপ-এর সময় ভুরু তুলে তাকাবে ডাক্তার, ওজন কমে যাচ্ছে কেন! বলা যায়, স্লিম হচ্ছি। মানসী জানে না, রোগই শুধু ক্ষয়ায় না, অভিমানও নেয়। নিতে নিতে শুদ্ধ করে। ফিরে পাবার জন্যে বাজি ধরে সর্বস্ব ; প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে নতজানু হয় সেই অদৃশ্য শক্তিমানের কাছে, বাঁচা কিংবা মরার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে পিঠ ফিরিয়ে আছে তার দিকে। মানুষের প্রার্থনা কি অতো দূর পৌঁছয়!

পৌঁছে গেল। গলিতে না ঢুকে বড়ো রাস্তাতেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল। এক দিকে রেস্তোরাঁ, অন্য দিকে রেডিওর দোকান। রেস্তোরাঁর ভিতরে ভিড়, সামনে দাঁড়িয়ে ফুটবলের আলোচনায় মত্ত কয়েকটি ছেলে। চকিত শব্দ তুলে ভেঙে গেল একটা কাঁচের গ্লাস। খেয়াল করেনি, এরই মধ্যে কখন রোদ ঢেকে গেছে মেঘে। চাপা গুড়গুড় শব্দ উঠছে একটা। হয়তো মেঘের ডাক। পিছনের হাওয়ায় সামঞ্জস্যহীন ঠাণ্ডা, ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়ছে হালকা রৌদ্রতাপের আনাচে কানাচে। বৃষ্টির সময়—কাছেই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো। ইঞ্জেকসানের জের নিশ্চয়ই সহজে কাটবে না ; অচৈতন্য ঘুমের পর হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙবে,

মানসী কি ভাববে, তার অগোচরেই কেটে গেছে অনেকটা সময় ।

গেট পেরিয়ে বাঁ দিকের প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দীপঙ্কর দেখল, দোতলার রেলিঙ থেকে ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাড়িওলার দুটি মেয়ে । সোমা আর নন্দিনী ।

চোখাচোখি হতে সোমা বলল, 'অনেকে আপনার খোঁজে এসে ঘুরে গেছে—'

'কে ?'

'আপনার সেই বন্ধু আর তাঁর স্ত্রী । নীল ফিয়াট চড়ে আসেন—', সোমা বলল, 'আপনি বেরুবার পরই এসেছিলেন ।'

'কিছু বলল ?'

'না ।'

পকেট হাতড়ে ফ্ল্যাটের চাবিটা বের করল দীপঙ্কর । ভাবল কিছু । এগোবে, নন্দিনী বলল, 'আর একজনও এসেছিল । মানসীদির মতো দেখতে । খয়েরি শাড়ি পরা । হাতে একটা সবুজ প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিল—'

'মানসীর বোন ।' ওপরে চোখ তুলে ইচ্ছাহীন হাসল দীপঙ্কর । 'তুমি বেশ খুঁটিয়ে দ্যাখো তো !'

মানসী থাকতে নন্দিনী প্রায়ই আসত । এখনো ফ্রক ছাড়েনি । দীপঙ্করের কথাটা না বুঝেই বলল, 'দেখেই বোঝা যায় । একটু মোটা—'

'মোটা বলছিস কেন ! স্বাস্থ্য ভালো ।' সোমা শুধরে দিল বোনকে, তিরস্কারের ধরন । তারপর বলল, 'এই তো, মিনিট কয়েক আগে । আমরা বললাম আপনি ফিরবেন । কিছু না বলেই চলে গেলেন—'

'ও । আচ্ছা ।'

একটা দুটো জলের ফোঁটা গায়ে পড়ছে । বৃষ্টি নামল হঠাৎই । তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে এগোল দরজার দিকে । দরজাটা খুলল এবং বন্ধ করল ।

দিনের অন্ধকারে এক রকম রহস্য থাকে, দেখিয়েও দেখায় না । চারিদিকে চাপা একটা গন্ধ—দেওয়ালের, বিছানার, বই আর আসবাবের । নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে ফিরলে কোনো কোনো দিন এই সব গন্ধের সঙ্গেই মিশে যেত বিছানার ওপর ফেলে-রাখা মানসীর শাড়ি, ব্লাউজের গন্ধ, চিরুনিতে লেগে থাকা বাতিল চুলের গন্ধ । নেই, তাই এখনো এরা সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে তাকে । বিপন্ন আরামে ছেয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলো ।

দক্ষিণ দিকের জানলাটা খুলে দিল দীপঙ্কর । বাগান আর পাঁচিল পেরিয়ে পুকুর, আরও দূর দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন । ক'দিন থেকেই মাটি ফেলা হচ্ছে পুকুরে, তবু কিছুই ভরে ওঠেনি এখনো । কচুরিপানার সবুজ পেরিয়ে কালো জল । বৃষ্টি পড়ছে সেখানে । এখনো ততো জোরে নয় । তবে, আকাশের যা অবস্থা, জোরেই নামবে ।

বাথরুম ঘুরে এসে জানলার সামনে চেয়ার টেনে বসল দীপঙ্কর । একই দৃশ্য, বিশেষভাবে দেখায় না কিছু । একই ক্লান্তি জড়ো হয় শরীরে । অন্য কিছুর অভাবে আবার একটা সিগারেট জ্বেলে নিল দীপঙ্কর । হয়তো আসবে, বলেছিলেন রাজশেখর । কেন ? এসেই যখন ছিল তখন অপেক্ষা করতে পারত তাপসী । নন্দিনীর বর্ণনায় ভুল ছিল না কোনো । কতো দিন পরে নীল ফিয়াটটা ঢুকেছিল এই গলিতে—সেই বাটানগর থেকে আসা, দেখা হলো না শুভা আর সঞ্জীবের সঙ্গে । বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দীপঙ্কর ভাবল, সম্ভবত একটু বেশি অসামাজিক হয়ে পড়ছে সে । ক'দিন আগে অফিসে ফোন করেছিল

সঞ্জীব। তাকে পায়নি। নাম্বার রেখে দিয়ে ফোন করতে বলেছিল। মানসীর জন্যে তাদেরও উদ্বেগ কিছু কম নয়। মনে থাকতে থাকতে কখন যে ভুলে গেছে বেমালুম। কিছুই মনে থাকে না আর। স্মৃতি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়া।

ধোঁয়ার আড়াল থেকে উঠে আসছে স্মৃতি। এই মুহূর্তে আর সব মুহূর্তকে আড়াল করে দাঁড়াল।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে হোটেলে খেয়ে একসঙ্গে ফিরেছিল তারা। নীল ফিয়াটে দীপঙ্করের নতুন নেওয়া আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিল শুভা আর সঞ্জীব। এই ঘরটা শুধু ঘরই ছিল তখন ; নতুন কেনা বাল্‌বের আলোয় প্রকট হয়ে উঠেছিল ভাড়া-করা তক্তপোশ আর বিছানা, ভাড়া-করা বেতের সোফা সেট, ভাড়া-করা চেয়ার আর আলনা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে শুভা বলেছিল, 'ফুলশয্যার একটা গ্ল্যামার থাকে, স্বস্তি থাকে না। লোকজন, আড়িপাতা, সব নিয়ে দমবন্ধ একটা ব্যাপার। তুমি আরও কিছু বেশি পেলে, মানসী! একটা বাল্‌বের আলো ছাড়া তোমাদের আর কেউ ডিস্টার্ব করবে না।'

মানসী তখনো ঘোরের মধ্যে। চুপ করে ছিল। তার আগে ছকটা পাল্টে গিয়েছিল একটু। কথা ছিল, সেই রাত্রে বাড়ি ফিরে যাবে মানসী ; রাজশেখরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আস্তে আস্তে পাকা করে নেবে ব্যাপারটা ; ক্রমশ ফিরে আসবে দীপঙ্করের কাছে। বিয়ের পর নিজেই বেঁকে বসে মানসী। 'সকলেই প্রথম দিন থেকে শুরু করে', বলেছিল, 'আমি কেন মাঝখান থেকে শুরু করব!' গলার স্বরে তখনই মানসী থেকে দীপঙ্করের স্ত্রীতে বদলে গেছে মানসী ; সেই শব্দের সম্মোহন নিজের মধ্যে অনুভব করতে করতে দীপঙ্কর বলেছিল, 'তোমার জোর থাকলে আমারও আছে—'

স্মৃতিতে ভুল নেই কোনো। শুরু থেকেই শুরু করেছিল তারা। এক রাতের অন্ধকার আর শরীরী ঘুমের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা। এখন মনে হয় প্রত্যেকটি ঘটনাই আলাদা ঘটনা, প্রতিটি দিনই শুরু হচ্ছে নতুন করে। প্রথম দিন থেকে শুরু না করলেও ঘটনা একই রকম থাকত।

আঙুলের ভাঁজেই স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল সিগারেটটা। নখে অল্প জ্বালা অনুভব করতেই নড়ে উঠল চেয়ারে। শব্দটা শুনেছিল তারও আগে। কানেকসানে গোলমাল আছে কোথাও, কখনো বাজে, কখনো বাজে না। কলিং বেলের শব্দটা দ্বিতীয়বার কানে ঢুকতেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল দীপঙ্কর। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বেলা আন্দাজ করা যায় না। তবু বেলা যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কোনো। এই দুপুরে, বৃষ্টির মধ্যে, দীপঙ্করের কাছে—কে হতে পারে!

তাপসী। বৃষ্টি বাঁচানোর জন্যে আঁচলটা ঘোমটা করে তুলে দিয়েছে মাথায়। তবু ভিজেছে। খয়েরি শাড়ি। হাতে প্লাস্টিকের ক্যারিয়ার। প্রত্যাশিত না হলেও খুব অবাকও হলো না দীপঙ্কর। দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এসো।'

'অবাক হয়েছেন তো!'

'কিছুমাত্র না!' দরজাটা বন্ধ করতে করতে সহজ হবার চেষ্টা করল দীপঙ্কর, 'তুমি এসে ফিরে গেছো শুনলাম। কোথা থেকে ফিরে এলে আবার!'

ক্যারিয়ারটা মেঝেয় নামিয়ে রাখল তাপসী। আঁচলটা নামিয়ে নিল মাথা থেকে। সামান্য উত্তেজিত। এদিক ওদিক তাকিয়ে বসবার জায়গা খুঁজল। একপাশে তক্তপোশ

রাখতে কষ্ট হয় বেশ। গলা বুজে আসে।

তবু, নিয়মে ছেদ পড়ে না কোনো। দীর্ঘশ্বাস আড়াল করে লম্বা দুটি হাতে টলমলে পাঁচিলটা ধরে রাখে দীপঙ্কর। শক্ত হয়ে ওঠে চোয়াল। সময় যতো এগোয় ততোই আরো দ্রুত হাঁটতে থাকে সে।

গেট পেরিয়ে ইয়ার্ড, তারপর সিঁড়ি। সিঁড়ির পর করিডোর।

সংখ্যা চিনে একদিন কেবিনের দরজায় পৌঁছে গেল দীপঙ্কর। সাদা পর্দাটা উড়ে এলো মুখের ওপর। যেমন আসে।

গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মানসী জেগে আছে না ঘুমিয়ে, বুঝবার উপায় নেই। একটি নিঃসঙ্গ হাতে আগলে রেখেছে নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাতটা ওর কপালে রাখল দীপঙ্কর।

'আজ কেমন আছো ?'

'ভালো কি আছি !' রোগা শরীরটাকে ঠেলে উঠে বসবার চেষ্টা করল মানসী। পারল না। অস্বস্তিতে বেঁকে যাচ্ছে ঠোঁট। বলল, 'একে কি ভালো থাকা বলে !'

অনেক দিন হলো কথা ছেড়ে গেছে দীপঙ্করকে। অনুভব যতোটা দেয়, ঠিক ততোটাই ধরে রাখে বুকে। তবু, ভাষা দলা পাকাতে থাকে গলায়। এখনও চেষ্টা করতে হলো।

'খুব কষ্ট হচ্ছে, মানসী ?'

'না।'

বর্ণনাহীন চোখে দীপঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ঢলে পড়ল চোখের পাতা। ধরনটা চেনা। দেখতে দেখতে সব কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়গুলো। এখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবে, নিঃশ্বাসের মৃদু ওঠা-নামাই বুঝিয়ে দেবে এগিয়ে চলেছে সময়। মাঝে মাঝে মনে হয় ঘুম আর জাগরণ, স্পষ্টভাবে দুটো আলাদা জগতের মধ্যে নিজেকে ভাগ করে দিয়েছে মানসী—বোঝা যায় না সময়ের ভার কোন দিকে বেশি।

দীপঙ্কর তাকিয়ে থাকল। অনেক দিন ধরে দেখছে, তবু যতো দিন যাচ্ছে ততোই দেখার নেশাটা পেয়ে বসছে আরও। রক্তহীন, ফ্যাকাশে মুখ, গাল ভেঙে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোয়ালের হাড়। ত্বকের বাদামির চেয়ে বেশি স্পষ্ট বিক্ষিপ্ত ছোপ ছোপ দাগগুলো। শেষ বিকেলের আলোয় তবু অন্য রকম দেখাচ্ছে। হয়তো এটাই সত্যি, আলোই তফাত ঘটায়।

চোখ না খুলেই ডান হাতের একটা আঙুল নিজের মুখের ওপর তুলে নিয়ে গেল মানসী, থেমে থেমে বোলাতে লাগল চিবুকে, নাকের পাশে, গালে, কপালে। দাগগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে। হাতটা টেনে নিল আবার। চোখ খুলল।

'সকালে আয়নায় দেখলাম।' ঈষৎ হারানো গলায় বলল মানসী, 'রোজই নতুন নতুন দাগ। এগুলো কী ?'

'কিছু নয়। অনেক দিন একসঙ্গে ভুগলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সেরে উঠলে মিলিয়ে যাবে—'

মানসী কিছু বলল না। রুগ্‌ণ দুটি চোখের পাতা মেলে তাকাল দীপঙ্করের মুখের দিকে, তাকিয়েই থাকল। অল্প কাছে আসার চেষ্টা দেখা গেল শরীরে, হাতটা বাড়িয়ে দিল দীপঙ্করের দিকে।

কী চাইছে অনুমান করে নিজের হাতে ওর হাতটা তুলে নিল দীপঙ্কর। খসখসে হাত। হাড়ে চামড়ায় উত্তাপ নেই কোনো। তবু অল্প ঘাম অনুভব করল দীপঙ্কর। ঝুঁকে এলো ওর

মুখের কাছে।

'কিছু বলবে ?'

চোখের পাতা তেমনিই অপলক, দীপঙ্করকে দেখছে। এতোক্ষণে ক্ষীণ হাসি ছুঁয়ে গেল ঠোঁটে।

'তোমার কথা কতো দিন জিজ্ঞেস করি না। তুমি ভালো আছো ?'

আলগোছে মাথা নাড়ল দীপঙ্কর, স্বর ফুটল না কোনো। হাতটাই আরও শক্ত করল শুধু। মানসী বুঝবে।

'ভালো থেকো।'

মুখটা ঘুরিয়ে নিল দীপঙ্কর। বড়ো অস্বস্তিকর এই দেখা, এই কথা বলা। অন্য দিকে তাকিয়েও ও বুঝতে পারল, মানসী এখনো তাকিয়ে আছে তারই দিকে। আলো পড়ে আসছে ক্রমশ। ইতস্তত পাখির গলায় কুলায় ফেরার তাড়া। আর একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে।

হাতে টান পড়ায় মুখ ফেরাল আবার। আবার চোখ বন্ধ করেছে মানসী, অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে মুখের রঙ। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল কেবিনের। হাতটা আগেই আলগা করে দিয়েছিল দীপঙ্কর, এবার সেটা তুলে ওর বুকের ওপর গুছিয়ে রাখল। চোখে পড়ল বুকের ওঠা-নামা। ঠিক বোঝা যায় না দীপঙ্করের উপস্থিতি এখন আর ওর মনে আছে কি না। যদি না থাকে, তা হলেও সে জাগাবার চেষ্টা করবে না। অপেক্ষা করবে। অপেক্ষার পর উঠে যাবে আস্তে আস্তে। সময়ই থাকতে দেবে না। কাল আবার আসবে। তারপর পরশু, তারপর আর এক দিন। সময়ই টেনে আনবে।

অদ্ভুত একটা ঘোরে ছেয়ে যাচ্ছে মাথা। মানসীর সামনে থেকেও মানসীকে দেখছে না আর, পরিবর্তে বারবার নিজেরই মুখ ভেসে উঠছে চোখে। নিজেই বুঝতে পারছে না সে-মুখের গড়ন কীরকম। একটা আদল ফুটে উঠতে না উঠতেই হারিয়ে যাচ্ছে আবার। ক্রমশ গলতে শুরু করল। গলার কাছ অব্দি পৌঁছুতেই ভয়ে এলোমেলো হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। মনে হলো করিডোর দিয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে কারা—একই রকম শব্দ তুলে যারা যাচ্ছে তারাই ফিরে আসছে আবার। শব্দটা কেবিনের গোড়ায় এসে থামতেই ও ফিরে পেল নিজেকে।

একজন সিস্টার।

'সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আবার কাল আসবেন।'

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। একবার মানসীকে দেখল, একবার সিস্টারকে। প্রায় তখনই ডাক্তার এসে ঢুকলেন কেবিনে। অল্প আশ্বাস ছুঁয়ে গেল দীপঙ্করকে। আজকের অস্বস্তি নতুন কিছু নয়, ভাবল, কাল হয়তো অন্য রকম দেখবে।

কেবিনের বাইরে এসে ডাক্তারের অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দীপঙ্কর। একটা সংখ্যা মনে আসছে। পাঁচ। অন্য কিছুর অভাবে সংখ্যাটাকেই আঁকড়ে ধরল সে। বেশিক্ষণ নয়।

ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসছেন ডক্টর মিত্র। দীপঙ্করকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

'কিছু বলবেন ?'

বলার কথাটা মুখেই ফুটেছে। দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে থাকল।

'চেষ্টা করছি এখনো। তবে—', ডাক্তার এগোচ্ছেন, সঙ্গে দীপঙ্কর। বললেন, 'কিছু কি

করা যাবে। সিম্‌প্‌টম্‌স্‌ ভালো নয়। দেখা যাক। লাকও একটা ব্যাপার।'

কথাগুলো কানে গেল না দীপঙ্করের। গেলেও ধরে রাখতে পারল না। সমগ্র মুখমণ্ডল জুড়ে প্রতিক্রিয়া শুরু করেছে রক্ত। অস্ফুট উচ্চারণে সে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কবে ?'

'জানি না। যে-কোনো দিনই কোলাপ্‌স্‌ করতে পারে। কাল, কিংবা পরশু, কিংবা—। সরি—'

সংখ্যাগুলো গোনা যায় পরপর। তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ। ওরই কোনো একটায় ঢুকে পড়েছেন ডক্টর মিত্র।

সামনে সিঁড়ি। অভ্যাসে পা রাখল দীপঙ্কর। কাল, কিংবা পরশু, কিংবা—, সময় সকলেই একইভাবে গোনে। হয়তো কাল। হয়তো পরশু। লাকও একটা ব্যাপার। হয়তো ভাগ্যই জেতাবে।

নতুন কোনো বোধ যুক্ত হলো না চিন্তায়। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে শুধু একবার ওপরের ধাপগুলোর দিকে তাকাল দীপঙ্কর। তারপর এগিয়ে গেল। বকুল গাছের তলা দিয়ে গেটের দিকে। সকালে এক রকম, বিকেলে আর এক রকম। হাসপাতালের দৃশ্যে পরিবর্তন হয় না কোনো।

অন্য দিন যেমন, তেমনি আজও অভ্যাসে হাঁটতে লাগল দীপঙ্কর। অন্ধকার হয়ে গেলেও দিক চেনার ব্যস্ততা নেই কোনো। বড়ো রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম। পুলিসের সঙ্কেতে পার হয়ে নিরাকার ময়দানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটু কেঁপে উঠল অল্প, সামান্য এলোমেলো হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। আরও একটু দ্রুত হয়ে ময়দানের অন্ধকারে নেমে যেতে যেতে সে অনুভব করল, সবুজে সজীব একটা গন্ধ ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে। গন্ধটা চেনা। অনেক দিন আগে হঠাৎ একদিন ছুটে এসেছিল কাছে, তারপর আর যায়নি। আজও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো এই গন্ধটাই বাঁচিয়ে দেবে।

ময়দানের সবুজে আস্তে আস্তে বসে পড়ে দীপঙ্কর। সময়ের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ, তবু সময়ের কাছেই চেয়ে নেয় একটু একা হবার সময়। দু' হাতে জড়ানো দুই হাঁটুর ওপর আস্তে আস্তে নামিয়ে আনে বোধশূন্য, ভারী মাথাটা।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের হেরে-যাওয়া বড়ো ভয়ঙ্কর। শুধু অন্ধকারই পারে তাকে আড়াল করে রাখতে।
